

১৯



সহিত্য সংখ্যা
বৈশাখ ১৩৭৪

CUK - H04773-4-270681

756.3

০০৭/৭



4

সম্মাদিকা : নীলা রায়

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মডাক ৯৫০। ষাণ্মাসিক ৪৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

270681

লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলফ্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।
৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী

৩১২, গুলিবাগান

কলিকাতা-৪৭

JAYAS

Socio Cultural Be

Founded in

Advertisement R

Current from A

Ordina

Full Page : Rs 10

Half Page : Rs 5

Quarter Page : Rs 2

Cover Page

Second Cover : Rs 175.00

Third Cover : Rs 200.00

Fourth Cover : Rs 350.00

For Special Position contact Advt. Man. Jayasree.

Advertising Space 20.5Cm x 15.24Cm

(8" x 6")

Contact

Manager, Jayasree

312, Ganguli Bagan,

Calcutta—47

Phone : 46-4116

বর্ষ-স্মৃতি
বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৭৪

4

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	যদি ক্রমা করো (কবিতা), নিবেদিতা : স্বপ্ন এবং বাস্তবতা (কবিতা)	২৬ ৪৭৩	অরিন্দম সেনগুপ্ত	পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংকট (প্রবন্ধ) নেতৃত্বের সংকট : গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ)	৪৪৮ ৬৮৯
ডঃ অশোককুমার মজুমদার	এসো বাঁচি (কবিতা) ভিয়েতনাম (প্রবন্ধ), প্রভু নয় বন্ধু বা পাকিস্তানের রাজনীতি (প্রবন্ধ)	২৯৮ ৩৩ ৬৭৫, ৭৫৯	অশোকনাথ বসু আশাপূর্ণা দেবী আবদুল ওয়ুদ কৃষ্ণ ধর	ইউরোপে নেতৃত্বী স্বভাষচক্র (প্রবাসের চিত্র) যাত্রাপথ (গল্প) স্বভাষচক্র (কবিতা) ইচ্ছা হয় তোমাকে নিয়ে (কবিতা)	৭৩৫ ৩৫৭ ৬০৩ ৩০
অশ্রুকুমার সিকদার	রাজপথে স্তম্ভ দীপাধার (আলোচনা)	৭৭		নাম ধরে ডাকো (কবিতা)	২৯৬
অলোকনাথ মজুমদার	অস্তিত্ব (কবিতা)	১১৪		জীবনানন্দ : কবিমানস ও কাব্যভাবনা (আলোচনা)	৫৭
অনিল রায়	হায় ! (প্রবন্ধ)	২২৩	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	কেমন আছেন (কবিতা)	২৯৭
অন্নদাশঙ্কর রায়	আবার সেই প্রস্ন (প্রবন্ধ)	৩২১		ফুলের হৃদয় (কবিতা)	৭৫৫
অমিতাভ দাশগুপ্ত	কত করে মেঘের মিটার ? (কবিতা)		কালীপদ চক্রবর্তী	ভগিনী নিবেদিতা অরণে (কবিতা)	৫১৬
আর্ষ দেব	সুন্দরবন ভ্রমণের স্মৃতি সুন্দরবন উইলিয়াম কেরি (ভ্রমণ কাহিনী)	১১০ ২৫১	কালীচরণ ঘোষ জেনারেল কাওয়াবে	অতীতের শিক্ষা (প্রবন্ধ) পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দের রাজনৈতিক সংকট ও সামরিক শক্তি (ঐতিহাসিক ঘটনা)	৬২৬ ৬৯৯
অচিন্ত্যশ ঘোষ	আধুনিক সমাজে সম্ভাবিত্বের সমস্যা (প্রবন্ধ)	২৯৯		সে (কবিতা), পুনর্জন্ম (কবিতা)	২৬, ২৯৬
অপরাজিতা গোস্বামী	আজও ওরা কাঁদে (কবিতা)	৪৩৭	গোপাল ভৌমিক		

বর্ষ-সূচী
বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৭৪

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
গোবিন্দ যুগোপাধ্যায়	সমীক্ষা (কবিতা), তবু রক্তে (কবিতা) ৩১, ৩৮৬ ভাগিনী নিবেদিতা (কবিতা) ৫৩৫		দুর্গাদাস সরকার	মামুষ নিজে জানেনা নিজের দাম (কবিতা) ৩৮৩ পথ (কবিতা) ৮১৬ ক্রমশঃ বিনাশের দিকে (কবিতা) ১১৪ অভিভূততা (কবিতা) ১৫২ হে জননী, লোকমাতা (কবিতা) ৪৭৩	
গোবিন্দ সেনগুপ্ত	দার্জিলিঙ, মাক্ ভোগ বৌদ্ধ মন্দির (কাহিনী) ২৪৭		নটিকেশ্বর ভট্টাচার্য	কলিকাতার বাসগৃহ সম্বন্ধে (আলোচনা) ১৬২, ২০২	
গৌরীজ্য ভৌমিক	কিছুকাল অমরতা শিক্ষা নেব বলে (কবিতা) ৭২১		নিরঞ্জন হালদার	উচ্চারিত (কবিতা) ৩৮৫ ক্যালেন্ডার (গল্প) ৩৬৫ সমাজবাদ (প্রবন্ধ) ৩৪৭	
চিত্তভানু	নিবেদিতা (কবিতা) ৫১৫		নীহারকান্তি ঘোষ দত্তদার	স্বভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক রচনা) ৮, ৯১, ১৫১, ২১৪, ২৮৭, ৪৬৩, ৫৩৭, ৫২৫	
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী	অনির্বাণ (গল্প) ৬৭১		নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ভূমি বৃষ্টিবিহীন (কবিতা) ২৮ কাছে এসো (কবিতা) ২৮৫ তিনটি কবিতা ২৪৫, ৬৭৩ আত্মহত্যা (কবিতা) ৩৮৩	
জ্যোতিরিন্দ্র মজুমদার	পরশমণি (গল্প) ৮০৭		নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ	নিবেদিতা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (প্রবন্ধ) ৪২১	
ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী	বহির্মের স্বদেশ প্রেম (প্রবন্ধ) ১০৭ ভারতের সংহতি সাধনা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা (প্রবন্ধ) ২৩১		পবিত্রকুমার ঘোষ	একটি উজ্জল তারা (কবিতা) ৫২৭	
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	আমায় একটি কথা দাও (কবিতা) ২৭ গরে যাও (কবিতা), এখন আমার ২৭ বড় দুঃসময় (কবিতা) ৩৪৬		প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত		
দেবদাস জোয়ারদার	ছই সংস্কৃতি (আলোচনা) ৫৫ নিবেদিতার ভারত-চেতনা (প্রবন্ধ) ৫০১ স্বভাষচন্দ্রের মন (আলোচনা) ৬০৫		প্রভাতকুমার দত্ত		
			প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়		
			প্রভাকর মারি		

বর্ষ-সূচী
বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৭৪

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কাজ ফুরুলে (কবিতা) জনৈকের মৃত্যু (কবিতা), নিবেদিতা (কবিতা)	২৫ ২৯৫, ৫১৬	মণীন্দ্র ষটক	আর কেউ (কবিতা), শেষ হয়ে যাবে না (কবিতা) নিবেদিতা (কবিতা)	২৫, ২৯৫ ৪৭২
বিজয়কুমার দত্ত	সবুজ (কবিতা) প্রতিমা (কবিতা) নিবোধ (কবিতা) মুখশ্রী (কবিতা) নিবেদিতা : একটি বেগুনায় স্মৃতি (কবিতা)	৩২, ১১৩ ৪২৬, ৬৪৭ ৫১৫	মানস রায় চৌধুরী মণিভূষণ ভট্টাচার্য মহীতোষ বিশ্বাস	আরেক জনের কথাবার্তা (কবিতা) সৃষ্টি যেন (কবিতা) পত্রহীন (কবিতা) জল মাটি মন (ধারাবাহিক উপভাষ)	২৮ ৩৮০ ৩১ ১১৫, ১৮৪, ২৬৩, ৫৬৭, ৬৫৭ ৭১১, ৭৭১, ৮১২
ডাঃ বি. দে	সেই অরণ্য : কাহিনী	১৩৩		ডাউন ট্রেন (গল্প)	৪০৩
বাসুদেব দেব	কবিতার জন্ম (কবিতা)	৩৮৫		কণ্ঠভরা বিষ (ধারাবাহিক উপভাষ)	১২৫, ১৭৫, ২৫৫, ৫৫২, ৬৩৭, ৭০০, ৭৬৩, ৮১৮
বিজয়কুমার ঘোষ	চোরকাটা (গল্প)	৪০২		এই দেশে আমি আসবো আবার (কবিতা)	২৩৭
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	অপ্রকাশিত দিনলিপি (রোজ নামচা)	৪২৯	মিহির মুখোপাধ্যায়	বাতি জ্বলে দিক (কবিতা)	৪৩৭
বেলা দত্তগুপ্ত	আমেরিকার নিগ্রো আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য (প্রবন্ধ)	৩৫০, ৫১৭		শেষ নাহি যে—' (গল্প)	৪২৩
বিমানবিহারী মজুমদার	নিবেদিতার সমাজদর্শন (প্রবন্ধ)	৪২৫	মনোরমা সিংহ রায়	মোর হাতে থাকে যেন সিন্দুরের চাবি (কবিতা)	৪৩৮
বনফুল	নিবেদিতা অরণ্যে (কবিতা)	৪৭১			
বিজয় দেব	ভগিনী নিবেদিতা গ্রন্থপঞ্জী	৫৭২	মীরা বাগবন্তকনিয়ন মণীন্দ্র ভট্টাচার্য		
বীণা ভৌমিক	আমার বাবার সবচেয়ে প্রিয়ছাত্র (আলেখ্য)	৬১২			

বর্ষ-স্মৃতি
বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৭৪

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	শ্রাবণে জ্যোৎস্নায় (কবিতা)	৪৩৫	ডঃ শশধর সিংহ	ভাষা সম্রাট কি ও কেন (আলোচনা)	৬৬৭
	কবিতা শুদ্ধ (কবিতা)	৭৫৬		মুক্তি কোন্ পথে (প্রবন্ধ)	৭৪৭
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত	তবু অমুচ্ছন্ন (কবিতা)		শ্রীনিবাস আচার্য	সমকালীন ভারতীয় সাহিত্য (সমালোচনা)	৬২৫
	শেষ	৪৩৫		রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)	২৫
	পরিক্রমা (কবিতা)	৬৭৪		পনেরই আগষ্ট ১৯৬৭ (কবিতা), হে মুক্ত অসীম (কবিতা), ২০৭, ৩৮৩	
অধ্যাপক মোহিতকুমার রায়	ইন্দ্রিয়াতীত অমৃতব (প্রবন্ধ)	৭৪৩	শান্তশীল দাস	মহীয়সী নিবেদিতা (কবিতা)	৫৩৫
রাজর্ষি	একটি চিত্র	১৯১		স্বভাষচন্দ্র (কবিতা)	৫৯৪
	একটি মুখ দু'খানা হাত (প্রবন্ধ)	৩০৭		রবীন্দ্রনাথ ও অমৃতব (প্রবন্ধ)	৬৩
রত্নেশ্বর হাজরা	অসময় (কবিতা)	৪৩৫		গুণধন (কবিতা) কোন কোন কথায় (কবিতা), শিল্প	১৬৭
রাখালচন্দ্র দত্ত	মার্কসবাদের বিবর্তন ও ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ)	৩৩৭	শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়	আলোছায়া (কবিতা) অহঙ্কার ভালে (কবিতা)	১৬৮
রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার	নিবেদিতা ও জাতীয় শিক্ষা (প্রবন্ধ)	৫৫১		যোগ বিয়োগ (কবিতা)	৩৪৫
রাম বহু	আকাশের শেষ সীমানায় (কবিতা)	২৯৮		নিবেদিতা : অরণে (কবিতা)	৫১৬
ডঃ রবীন্দ্রনাথ রায়	বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ চিন্তা (প্রবন্ধ)	৩০২			
শঙ্করীপ্রসাদ বহু	নিবেদিতা লোকমাতা (প্রবন্ধ)	৪৭২			
	'যুদ্ধের কঠিন হাসি' (আলোচনা)	৬১১, ৬৮৩			
ডঃ শশধর সিংহ	শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গুটি কয়েক কথা (আলোচনা)	৬৪৭			

বর্ষ-সূচী
বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৭৪

লেখক	বিষয়—	পৃষ্ঠা	লেখ	বিষয়	পৃষ্ঠা
শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়	একজন নীলকণ্ঠ : গোপিক		হুনীল দাস	স্পীকারের সংকট	
	জন্মশত বর্ষ	৮২৭		(আলোচনা)	৩৯৩
	কবিতাশুদ্ধ	৮০৫		জ্ঞানদাল ভেদোক্ত্যাপী :	
শচীন্দ্রনাথ বসু	খাঁচা (গল্প)	৩২৫		ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির	
শিবদাস চক্রবর্তী	ওদের বলো না কিছু			নূতন কৌশল (প্রবন্ধ)	৭২৪
	(কবিতা)	৩৮২		আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপট	
অধাকান্ত রায়চৌধুরী	স্বাতিচারণ	১৩		(প্রবন্ধ)	৭২১
	স্বতিকথা (কালিদাস নাগ)		সমর গুহ	নকশাল বাড়ীর লাল নকশা	
		৮০১		(পর্যালোচনা)	১৬১
অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শান্তিনিকেতনের স্বতিকথা	২২		বিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও	
	সেই দেশের ভরে—			অভাষচন্দ্র (প্রবন্ধ)	৬১৫
	(গল্প)	৪১৯	হুশান্ত বসু	একা (কবিতা)	৩৮৬
	রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী		ডঃ হরভৈরব ঘোষ	মূল্যনীতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন	
	(স্বতিকথা)	৭২৯		ও নৈতিক মূল্যবোধ	
				(প্রবন্ধ)	৩৩১
সনরেন্দ্র সেনগুপ্ত	চিনতে পারিনি (কবিতা)		ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন	ব্যাক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ	
	রাজসাক্ষী (কবিতা)	২৯, ৩১৩		(প্রবন্ধ)	৩২৫
	ক্ষমতা (কবিতা)	৩৮৪	হুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	ছুটি অভিলাপ (কবিতা)	৩৮১
হুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	এই পর্যন্তই থাক (কবিতা)	৩০		ছোড়দি বলে টুকুর মতো	
	দিনরাত্রির কাব্য (গল্প)	৫৮৭	অদেশরঞ্জন দত্ত	(কবিতা)	৩৮১
হরজিৎ দাশগুপ্ত	ভাবের ঘরে চুরি (প্রবন্ধ)	৫৮	সাবিজীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	২৩শে জামুয়ারী (কবিতা)	৬০৪
হুনীল দাস	পশ্চিম এশিয়ার সংকট			অভাষচন্দ্র (চিত্র)	৬২৩
	(প্রবন্ধ)	৯৯	ডাঃ সরোজেন্দ্রনাথ রায়	ভারতের ভাষা বিভাগ	
	ভূমি সমস্যা (প্রবন্ধ)	৪৪৩		(প্রবন্ধ)	৩১৫

বর্ষ-সূচী
বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৭৪

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
সৌমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	দায় (কবিতা), নিবেদিতা	
৩৫	স্বপ্ন (কবিতা)	২২৫, ৪৭১
	অভিষেক (কবিতা)	৬৭৪
হরেন্দ্রনাথ সিংহ	নীরব ভাষা (কবিতা)	৪৩৬
হেনা হালদার	আজ নয় (কবিতা)	৩৮০
সম্পাদকীয়	১, ৮৩, ১৪৩, ২০৭, ২৮৩, ৪৫২, ৫২২, ৫২১, ৬৬১, ৭২৩, ৭৮৩	
বিশ্বাবর্ত	২০৩, ২৭৬, ৫৮৮	
বাংলায় গোকী	গ্রন্থপঞ্জী	৮২২
পুস্তক পরিচয়	১৩২, ১৪২, ২৭৩, ৭১৮, ৭৭৭, ৮৩২	

বার্ষিক টাঁদা প্রসঙ্গে বিজ্ঞপ্তি

চৈত্র ১৩৭৪এ ষাঁদের টাঁদার মেয়াদ শেষ হয়েছে, তাঁদের বৈশাখের জয়ন্তী প্রাপ্তির পূর্বেই টাঁদা পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ডাক মাশুল বৃদ্ধির জন্তু বাধ্য হয়ে জয়ন্তীর টাঁদা বৈশাখ ১৩৭৫, থেকে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক ৯.৫০/৪.৭৫ এর স্থলে যথাক্রমে ১০. ও ৫. টাকা ধার্য করা হল। আশাকরি জয়ন্তীর গ্রাহক গ্রাহিকা নতুন টাঁদার হারে টাঁদা দিয়ে পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করবেন।

প্রচার সম্পাদক, জয়ন্তী

সূচীপত্র

জয়ন্তী : চৈত্র : ১৩৭৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৭৮৩
আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপট (প্রবন্ধ) সুনীল দাস		৯১
রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী (স্মৃতিচারণ)		
	সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	৭৯৯
স্মৃতি কথা	সুধাকান্ত রায়চৌধুরী	৮০১
কবিতাশুদ্ধি	শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়	৮০৫
পরশমণি (গল্প)	জ্যোতিরিন্দ্র নাথ মজুমদার	৮০৭
কণ্ঠ ভরা বিষ (উপন্যাস)	মিহির মুখোপাধ্যায়	৮১১
পথ (কবিতা)	সুর্গাদাস সরকার	৮১৬
জল মাটি মন (ধারাবাহিক উপন্যাস)		
	মহীতোষ বিশ্বাস	৮২
একজন নীল কণ্ঠ : গোর্কী জন্মশতবর্ষ		
(প্রবন্ধ)	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	৮২৭
বাংলায় গোর্কী (গ্রন্থপঞ্জী)		৮২৯
পুস্তক পরিচয়		৮৩২

জয়ন্তী

বৈশাখ : ১৩৭৫

আলোচনা-সংখ্যা

সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিগত বছরের ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের কয়েকটি আলোচনা এই সংখ্যায় স্থান পাবে।

‘শ্রীল অশ্রীল সাহিত্য’ সম্প্রতি কলিকাতায় নতুন করে নানা সভায়, পত্র পত্রিকায় আলোড়ন তুলেছে। এই প্রসঙ্গে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হবে।

আর গত এক বছরের ইংরেজী বাংলায় প্রকাশিত দেশী-বিদেশী শতাব্দিক পড়ার মত বইয়ের একটি নির্বাচিত তালিকাও এই সংখ্যায় সংযোজিত হবে।

প্রবন্ধ সূচী

শ্রীলতা, অশ্রীলতা, সাহিত্য :	ভূদেব চৌধুরী
শ্রীল, অশ্রীল প্রসঙ্গে :	নারায়ণ চৌধুরী
ভারতবর্ষের ইতিহাস :	মঞ্জু দাশগুপ্ত
ভারতবর্ষ ও আধুনিক শিল্প :	সুজিত দাশগুপ্ত
কয়েকটি উপন্যাস : ১৩৭৪ :	বিজয় কুমার দত্ত
বাংলা কবিতা :	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
পরিবর্তনশীল জগতে ধর্ম :	রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার
সুই গান্ধী : ভারতীয় রাজনীতির সুই সীমান্ত :	
	পবিত্রকুমার ঘোষ :
বাংলা দেশের ইতিহাস	

দাম : ১.০০

সডাক : ১.৬৫

জয়ন্তী । ৩০৯ গান্ধীবাগান, কলিকাতা-৪৭



চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি ডাকে দিন তাহলে সেই দিনের ডাকেই যাবে

দিনের শেষে অফিস বন্ধ হওয়ার সময় এতো বেশী চিঠিপত্র ডাকে দেওয়া হয় যে পোস্ট অফিসগুলির পক্ষে তা একটু বড় সমস্যা সৃষ্টি করে। এতে কাজ খুব বেশী বেড়ে যায় ফলে সেগুলি বাছাই করে পাঠাতে দেরী হয়।

চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি ডাকে দিলে সেগুলি সে দিনই পাঠানো যায় এবং সেগুলির গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে দেরী হয় না।

এখনই ডাকে দিন। বিকেল পর্যাপ্ত অপেক্ষা করাবেন কেন ?



ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

সূচীপত্র

বৈশাখ, ১৩৭৪

সংস্করণ : ১ম

পৃষ্ঠা : ১০০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১
অভ্যাসচল	(ধারাবাহিক রচনা) পবিত্রকুমার ঘোষ	৮
স্বতীচারণ	শ্রীমতী রায়-চৌধুরী	১৯
শান্তিনিকেতনের স্বভিকশা	অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	২২
কবিতা :		
রবীন্দ্রনাথ	শান্তশীল দাশ	২৫
আর কেউ	নবীশ খটক	২৫
কাজ ফুরুলে	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৫
সে	গোপাল ভৌমিক	২৬
যদি কখনো	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	২৬
আমায় একটি কথা দাও	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭
সরে যাও	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭
আরেক জনের কথাবার্তা	মানস রায়চৌধুরী	২৮
তুমি বুড়ি বিহীন	প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	২৮
আমরা আজ	নচিকেতা ভরদ্বাজ	২৯
চিনতে পারিনি	সমরেন্দ্র দাশগুপ্ত	২৯
ইচ্ছা হয় তোমাকে নিয়ে	রুমু ধর	৩০
এই পর্যন্তই থাক	হনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩০
সমীক্ষা	গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	৩১
পত্রহীন	মণিচন্দ্র ভট্টাচার্য	৩১
সবুজ	বিজয়কুমার দত্ত	৩২
ভিয়েৎনাম	(প্রবন্ধ) ডঃ অশোক মজুমদার	৩৩
ছুই সংস্কৃতি	(আলোচনা) দেবদাস জোয়ারদার	৪৫
জীবনানন্দ : কবিমানস ও কাব্য-ভাবনা (আলোচনা)	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	৫৭
রবীন্দ্রনাথ ও অমুবাদ	(প্রবন্ধ) শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	৬৩
ভাবের ঘরে চুরি	(প্রবন্ধ) অরজিত দাশগুপ্ত	৬৮
রাজপথে গুল দীপাধার	(আলোচনা) অরুণকুমার সিকদার	৭৭

27068

জয়ন্তী

৩২ বর্ষ • প্রথম সংখ্যা • বৈশাখ ১৩৭৪

সম্পাদকীয়

পরলোকে ইন্দুমতী সিংহ

খ্রিষ্ট শতকের এক আশ্চর্য মহিলা, ইন্দুমতী সিংহ গত ৪ঠা মে (১৯৬৭) ৭০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। এই আশ্চর্য মহিলাটির সহিত ১৯৩১ এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৬ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত শিউড়ী ও হিজলী বন্দীশিবিরে একত্রে থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ১৯৩০ সনের চাঁটগা অজ্ঞাগার লুণ্ঠনের পরে যখন সেই লুণ্ঠনে অংশ গ্রহণকারী বিপ্লবী তরুণদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশাধিনের তীব্রতম অভিযান শুরু হয়েছে, যার সামনে নিকটতম আত্মীয় বন্ধুরাও তাদের প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আসবার সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি, এই অন্তঃপুরবাসিনী স্বল্পশিক্ষিতা মহিলা কি অমিত সাহস ও মনোবল সম্বল করে ভাই এবং স্নাতৃসম খ্রিষ্টচল্লিশটি তরুণের প্রাণরক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে আইনের শ্রেষ্ঠতম পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাবলে আশ্চর্য হতে হয়। স্ব-আরোপিত এই মহৎ দায়িত্ব উদযাপনের রূপক সংগ্রহে কল্পে তিনি ভারতের নানা স্থানে ঘোরবার কালে স্নাতৃতরুণ আইনে ধরা পড়েন। এতগুলি তরুণের প্রাণ-রক্ষার কোনও ব্যবস্থা হইবে না, এই উদ্বেগে সারারাত ঘুমাতো পারতেন না এবং নিজের শয্যার পাশে একটা ইজি চেয়ারে

রাতের পর রাত বিনিম্ব কাটাতে লাগলেন তখন তাঁর মনকে অত্যধিক আকর্ষিত করবার আশায় প্রস্তাব করি “আমুন না আমার নিকট ইংরেজী পড়ুন তাহোলে নিজেই কাগজে ভাইদের খবর পড়তে পারবেন” এ কথায় কি গভীর নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে কেবলমাত্র সামান্য বাংলা জানা এই মহিলাটি আমার নিকট ম্যাট্রিকুলেশন কোর্সের পাঠ্যক্রম পড়তে স্বীকৃত করেন এবং তিন বৎসরে পরীক্ষা দিয়ে ২য় বিভাগে পাশ করেন। তাঁর একাগ্রতা ও অতিনিবেশ সেসময় মুগ্ধ করেছিল আমাকে।

আজ মনে পড়ে আমার এই সামান্য সাহায্যের প্রতিদানে কি গভীর প্রীতি ও দরদের সহিত তিনি সামান্ততম অসুখ-বিস্মৃতি কি নিপুণ অকুরন্ত সেবাই না করতেন। তাঁর অসুস্থতার খবর কাগজে দেখে তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যাবার সঙ্কল্প করেও নিজেই গুরুতর পীড়িত হবার ফলে তাঁকে দেখতে যাওয়া অথবা তাঁর চিকিৎসার সামান্ততম ব্যবস্থা করা কোনটাই সম্ভব হয়নি এ বেদনা ভোলবার নয়। কিন্তু আশ্চর্য যে এই নির্যাতিতা বিশিষ্টা রাজনৈতিক কর্মীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার অনতিক্রম্য কর্তব্য থেকে বর্তমান ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার বিচ্যুত হয়েছেন। এ বিষয়ে

তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এ কর্তব্যচ্যুতি তাদের নিকট আশা করিনি। আরো আশ্চর্য আমাদের সংবাদ পত্রগুলি এই মহিলাটি সম্বন্ধে ভুল সংবাদই শুধু পরিবেশন করেননি তাঁর জীবন পরিচয় ও স্বদেশ সেবার সম্বন্ধে সর্বসাধারণকে জানানোর প্রয়োজনও বোধ করেননি। এই অবহেলা ও ঔদাসীন্য এ মহিয়সী মহিলাকে স্পর্শ করেনি বিন্দুমাত্র কিন্তু আমাদের জাতীয় চরিত্রের মূল্যবোধ সম্বন্ধে প্লানিজনক বিচ্যুতির পরিচয় দিল। বলিষ্ঠ জাতীয় চরিত্রগঠনের এ অমুকুল নয়।

ইন্সমতী সিংহের জীবন ও চরিত্রের উজ্জ্বল পরিচয় যাঁরা পেয়েছেন তাঁহের মধ্যে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে গৌরব বোধ করছি এবং তাঁর প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত এই সামান্য স্মৃতিতুর্পণ নিবেদন করছি।

শিশির দাস

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপরিচিত ব্যারিষ্টার, বিধান সভার প্রাক্তন সদস্য, সমাজসেবী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শিশির কুমার দাস মাত্র ৫২ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। শিশিরকুমার মেদিনীপুরের সংগ্রামী নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ভাগিনেয় ছিলেন, এবং স্বাধীনচিন্ততা ও স্বদেশিকতায় এই পরিবারের ঐতিহ্যবাহী ছিলেন। শিশিরকুমারের অর্থনীতি ও সংবিধান সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য, তাঁর সাহিত্যানুরাগ, অমায়িক ব্যবহার, শিশুর মত চারিত্রিক সারল্য তাঁকে বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। শিক্ষাব্রতী-রূপেও তিনি পরিচিত ছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

বর্ষারম্ভ

বৈশাখে জয়ন্তীর ৩২ বছর শুরু হল। এই দীর্ঘসময়

নানা ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে জয়ন্তী বাংলা সাময়িকী জগতে পঞ্চ কেটে কেটে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ বহন করে চলেছে এবং সেজন্তে অকাতরে ক্ষয়-ক্ষতিও যেমন স্বীকার করেছে তেমনি স্বকীয়তার সর্বাদায় প্রতিষ্ঠিত থেকে বাংলাদেশের পাঠক-সমাজের মধ্যে বিশিষ্ট ভূমিকাও গ্রহণ করেছে। নেতাজীর সমন্বয়বাদকে আশ্রয় করে, তাকে রূপায়িত করতেই জয়ন্তীর যাত্রা। আজ দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবনের অনিবার্যতা দেখা দিয়েছে। এই পুনরুজ্জীবনের বৈমলিক পথেই জাতির সামগ্রিক জীবনে নেতাজীর সমন্বয়বাদের সার্থক প্রয়োগ সম্ভব। জয়ন্তী সেই আকাঙ্ক্ষিত পথেই অগ্রসর হতে চায়। যারা পাঠক, যারা লেখক, যারা বিজ্ঞাপনদাতা কিম্বা অস্বাস্থ্য নানাভাবে যাদের শুভেচ্ছা ও সহমর্মিতা জয়ন্তীর প্রতি উৎসারিত হয়ে আসছে নূতন বছরের যাত্রার শুরুতে তাদের জয়ন্তীর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

জয়ন্তীর প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা সম্প্রতি গুরুতর সেরিব্রেল থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ঈশ্বরের আমুক্যে তিনি রোগমুক্তির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁর রোগমুক্তির জন্তু জয়ন্তীর অনুরাগীদের অন্তরঙ্গ শুভকামনায় জয়ন্তীর সম্পাদকীয় কর্মকর্তাদের ও পরিচালকদের পক্ষ থেকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কবিগুরু

কবিগুরুর জন্মলগ্নে জয়ন্তীরও যাত্রা শুরু হয়েছিল। কৃতজ্ঞচিত্তে আজ স্মরণ করছি জয়ন্তীর যাত্রাপথের পরতে পরতে কবিগুরুর আশীর্বাদ আকীর্ণ হয়ে আছে। জাতির মানসলোকে রবীন্দ্রনাথ যে অনিবার্ণ দীপশিখা জ্বলিয়ে গেছেন, তারই অমৃতরশ্মির বিচ্ছুরণ আমাদের ভাব ও ভাষাকে আলোকিত করে রেখেছে। বর্তমানে মননায় ও চিন্তায় যে দৈন্য দেখা দিয়েছে, তার কারণ সাময়িকের মধ্যে সমস্যাভীতে

উত্তরণের মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতি যে বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা যায় তা আমরা খুঁয়ে ফেলেছি। প্রাত্যহিকতার নিগড়ে জীবন যেখানে বন্দী, জীবনের পরিণতি সেখানে ক্লান্ত দীনতায়। ২৫ শে বৈশাখ বারে বারে আমাদের জীবনে সীমার মাঝে অসীমের উত্তরণের 'সর্বোত্তম বাণী যেন বরে'— এই আত্মান নিয়ে আসে। ২৫ শে বৈশাখের এই চিরন্তন বাণী জাতির জীবনে শঙ্কম হয়ে থাকুক এই প্রার্থনা জানিয়ে কবিগুরুর প্রতি আমাদের শ্রুতি জানাই।

বিদ্রোহী কবি

বিদ্রোহী কবি নজরুলের বাক্যহারা জীবনের আর একটি বছর উন্মিলিত হল। যে কবি বলেছিলেন 'আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত, সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ফন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধনিবে না'..... অদৃষ্টের ক্লট পরিহাস, সেই কবির জীবনকালেই 'উৎপীড়িতের ফন্দনরোল' আকাশ-বাতাস বিষিয়ে দিলো। কিন্তু সেই বিদ্রোহীর কণ্ঠ বিধাতার অভিশাপে বাক্যহারা হয়ে রইলো। তবুও আশার কথা বিদ্রোহী কবির প্রতিশ্রুতির সার্থক পরিপূর্ণতার জন্ত জাতির জীবনে মহৎ চেতনার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। সময়ের অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে উৎপীড়নেরও রূপান্তর ঘটে। মানবতার বিরুদ্ধে যারা উৎপীড়ক, জাতীয়তার বিরুদ্ধে যারা প্রবঞ্চক, তাদের উৎপীড়নও কম নয়। তাই সমগ্র মানবতা-বাদীদের যেমন, জাতীয়তাবাদীদেরও তেমনি হেঁকে বলবার দিন এসেছে 'আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ফন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধনিবে না।' মানবতার প্রতি, জাতির প্রতি এই প্রতিশ্রুতি আগামী ২৬ শে মে বিদ্রোহী কবির জন্মদিনে তাঁর প্রতি হবে আমাদের সর্বোত্তম শ্রদ্ধা নিবেদন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

লক্ষাধিক ভোটে ডঃ আকির হোসেনের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন

সম্মিলিত বিরোধী দলগুলির শোচনীয় অনৈক্যের পরিচায়ক। নির্বাচনী আয়োজন ও প্রচারের ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ডঃ আকির হোসেনের পরাজয় এবং শ্রীহুবা রাও-এর অনিশ্চিত জয় ঘোষণায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন, অথচ নিজেদের ঘর সামলানোর জন্ত তাদের তৎপরতা ছিল না। যদি তা থাকতো ডঃ আকির হোসেন এত বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হতে পারতেন না।

ডঃ আকির হোসেন-এর পরাজয় ভারতবর্ষে সেকুলারিজম-এর অস্তিমশয্যা রচনা করবে বলে যারা প্রচার শুরু করেছিলেন তারাই এই নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয়ী করে জন-সম্মত পক্ষ থেকে সরাসরি সাম্প্রদায়িক প্রচারের স্বযোগ করে দিয়েছেন। একদিকে জনসত্ত্বের এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতার প্রচার অন্যদিকে ডঃ আকির হোসেনের জয়-পরাজয়ের সঙ্গে ইন্দিরা-ক্যাবিনেটের-এর ভাগ্য জড়িয়ে আছে, ডঃ রামমোহন গোহরিয়া প্রবলভাবে এই প্রচার করে ডঃ আকির হোসেনের জয়ের পথ অগম করে দিয়েছেন। এই নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন আমদানী হওয়ায় ভারত-বর্ষের সেকুলারিজম সম্পর্কে অনেকের মনে শঙ্কা দেখা দিয়েছিল যার ফলে রাষ্ট্রপতি পদের জন্ত অন্তর্দল নিরপেক্ষভাবে অত্যন্ত জেদের সহিত ইন্দিরা গান্ধীর ডঃ আকির হোসেনকে মনোনয়ন দান বিরোধীদের এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বেশ কিছু সদস্যের— কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ তাদের অন্ততম—মনঃপূত না হোলেও সেকুলারিজমের স্বার্থে, দেশে এবং বিদেশে ডঃ আকির হোসেনের পরাজয় ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার জয় বলে প্রচারিত হবে এবং পাকিস্তান ও কাশ্মীরের প্রশ্নে ভারতবর্ষের নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপন্ন হবে, এই আশঙ্কা ডঃ আকির হোসেনের মনোনয়নের বিরোধীদের মধ্যেও এক বৃহদংশকে ভার প্রার্থীপদ সমর্থনে উৎসাহিত করে। তাছাড়া, ডঃ আকির হোসেনের পরাজয়ে ইন্দিরা-ক্যাবিনেটের পতন হয়ে কেন্দ্রে বিরোধীদের মুক্তভাবে ক্ষমতা লাভ হবে,

ডঃ রামমনোহর লোহিয়্যার এই প্রচার কংগ্রেসীদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। কেন্দ্রে কংগ্রেসের সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা, দশ-বার জন কংগ্রেসীর দলভাগেই গেছে গিয়ে কংগ্রেসের সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা যেখানে সর্বদাই উদ্ভূত খড়্গের মত ঝুলে আছে, যে-সময় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ক্যাবিনেট গঠন, রাষ্ট্রপতির পদে প্রার্থী মনোনয়ন ইত্যাদি প্রশ্নে কেন্দ্রে কংগ্রেস দলে প্রবল বিক্ষোভ দানা বেঁধে রয়েছে, ঠিক সেই সময়ই বিরোধীদের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সর্বনাশের পথকে ত্বরান্বিত করার কৌশল তাদের মধ্যে বিক্রপ প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাদের আভ্যন্তরীণ অনৈক্যকে ঐক্যমুখীন করে তোলে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এই কারণে কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্যে কোনো ভাঙন দেখা দেয় নাই।

কংগ্রেসীদের মধ্যে ভাঙন দু'রকম কথা এই নির্বাচনে বিরোধীদের অনৈক্য নথ্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কেরালার মুসলীম লীগ বিরোধীদের পক্ষভূক্ত হয়েছে ডঃ জাকির হোসেনকে ভোট দিয়েছে। অমৃতসর রাজ্যের বিরোধী মুসলমান সদস্যের পার্লামেন্টে এবং বিধান সভায় সমর্থনও বহুক্ষেত্রে ডঃ জাকির হোসেন পেয়েছেন বলে মনে করবার কারণ আছে। লোকসভায় প্রোগ্রেসিভ ব্লকের পক্ষ থেকে হুমায়ুন কবির ডঃ জাকির হোসেনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন যদিও এই ব্লকের আর, এস, পি ভুক্ত সদস্যরা কোনো প্রার্থীকেই ভোটদানে বিরত থাকেন। পশ্চিম বাংলায় সব চাইতে তাজব ব্যাপার ঘটেছে। এখানে বিধান সভায় কংগ্রেসের উপস্থিত সদস্যদের চাইতেও অতিরিক্ত এগারজন সদস্যের ভোট ডঃ জাকির হোসেনের পক্ষে গেছে। এন্স ইউ, সি ভোটদানে বিরত ছিল। কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে স্বব্বা রাওকে সমর্থন করা সম্পর্কে মতবৈধ ছিল এবং তাদের কাউন্সিলে এ-প্রশ্ন নিয়ে ভোটভাঙটি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে স্বব্বা রাওকে সমর্থন করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

আর একটি সাংবিধানিক প্রশ্নও রয়েছে। রাষ্ট্রপতির

ক্ষমতা নিয়ে বহু বাক-বিতণ্ড হয়েছে, নানা মতামত প্রচারিত হয়েছে এবং একজন 'স্বাধীন' রাষ্ট্রপতির দাবীতে স্বব্বা রাও-এর প্রতি সমর্থন প্রসারিত হয়েছিল কোনো কোনো মহল থেকে। এই 'স্বাধীন' রাষ্ট্রপতির আওরাজ্ঞও দেশে প্রবল বিপরীত জনমত সৃষ্টি করেছিলো এবং এই মতাবলম্বীদের আশঙ্কা হয়েছিল যে যারা 'স্বাধীন' রাষ্ট্রপতির দাবী তুলেছেন তারা শেষ পর্যন্ত সংবিধানের উর্ধ্বে রাষ্ট্রপতির স্থান নির্দিষ্ট করতে চান। শ্রী স্বব্বা রাও-র স্বপক্ষে এই প্রচার তার বিরুদ্ধেই গেছে বলে মনে হয়।

মোটকথা বিরোধীদের আদর্শনৈতিক পার্থক্য, দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ এবং ভ্রান্ত নির্বাচনী কৌশল, ডঃ জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রচার, শ্রী স্বব্বা রাও-এর জয়ের সম্ভাবনা নিমূল করে দিয়ে বিপুল ভোটে ডঃ জাকির হোসেনের জয় সম্ভব করে তুলেছে।

উপ-রাষ্ট্রপতি পদে শ্রী ভি ভি, গিরির নির্বাচনে কোনো সংশয় না থাকলেও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাপক হাবিবের সমর্থনে ভোটের সংখ্যা বিরোধীদের সমবেত ভোটের চাইতে অনেক কম ছিল। এ-থেকেই বোঝা যায় বিরোধীরা উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোনো গুরুত্ব দেন নাই। সে ক্ষেত্রে শ্রী গিরির বিরুদ্ধে কোনো প্রার্থী না দাঁড় করানোই বিরোধীদের পক্ষে শোভন হত।

বিদায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণ

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ তাঁর বিদায়ী ভাষণে দেশের সর্বনাশা দারিদ্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন : "Revolutions are made by people who are hungry and unemployed" অর্থাৎ যারা বুড়ুসু ও বেকার তারাই বিপ্লবের বাহক। তাছাড়া উদ্ভূত রাজ্যগুলিকে এবং স্বচ্ছল নাগরিকদের দেশের বঞ্চিত মানুষের সহায়তার জন্য সকল রকমভাবে চেষ্টা হতে আহ্বান জানিয়ে গেছেন।

সমসাময়িক রাজনীতিও বিদ্যায়ী রাষ্ট্রপতির কষাঘাতে জর্জরিত হয়েছে। গণতন্ত্র কেবলমাত্র সরকারের ছক নয়, জীবন দর্শন বিশেষ, এবং সুবিধাবাদী ঐক্য ও ক্ষুদ্র স্বার্থের টানাপোড়েন প্রতিনিধিমূলক সরকারের প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস উৎপাদনে সহায়তা করেন। এ-ছাড়া জাত-পাতের সন্ধীর্ণ রেযারেষি, ব্যক্তি স্বার্থের পরিপোষণ ও প্রশাসনে দুর্নীতি গণতন্ত্রের পরিপন্থী কয়েকটি উপাদানও দূর করতে হবে। ক্ষমতাসীনদের প্রতি বিদ্যায়ী রাষ্ট্রপতির বাণীই সব চাইতে মোক্ষম। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেছেন সরকারী পদগুলিকে যেন জনসাধারণের পক্ষ থেকে অছিন্নপে ব্যবহার করা হয় এবং কখনই যেন তারা ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহারের জন্ত প্রদূষ না হন। বিদ্যায়ী রাষ্ট্রপতির এই উপাস্ত আহ্বান ক্ষণকালের জন্ত হলেও শাসকদের কর্তব্যনিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করবে আশা করি।

নূতন রাষ্ট্রপতির ভাষণ

নূতন রাষ্ট্রপতির পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে স্বভাবতই শিক্ষা ও কৃষ্ণপূর্ণ স্থান পেয়েছে। প্রকৃত-পক্ষে দেশের শিক্ষার সঙ্গে দীর্ঘকালের সম্পর্ক তাঁকে এই সর্বোচ্চপদের আনন্দ প্রদানে উদ্বুদ্ধ বলে করেছে তিনি উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু রাষ্ট্রপতির ভাষণে আরও কয়েকটি প্রগতির উল্লেখ আছে স্বাভাবিকভাবে তার কোন প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রপতি সামগ্রিকভাবে ভারতীয় অতীত সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন, এবং দেশের সামগ্রিক সংস্কৃতির সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অঞ্চল ও ভাষা-নির্বিশেষে সমগ্র দেশের প্রতিও তিনি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন এবং জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে দেশের শক্তি ও জীবিত্বের জন্ত ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্তও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সম্পাদনের মধ্যেই এই মৌলিক আনুগত্য ও প্রতিশ্রুতিগুলি নিহিত রয়েছে। পৃথকভাবে এই

প্রগতির উল্লেখ রাষ্ট্রপতির ভাষণে কিছুটা প্রক্ষিপ্ত ও অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে। নির্বাচনের সময় তাঁর বিরুদ্ধে জনগণের সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগের উত্তরেই বোধহয় রাষ্ট্রপতি এই আনুগত্য ও প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করেছেন। এই উল্লেখ না থাকলেই ভাষণের মর্যাদা ও স্বাভাবিকত্ব উজ্জলতর মহিমায় বিকশিত হতো।

দ্রুতিফের পদধ্বনি

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের কোনো কোনো অঞ্চলে দ্রুতিফের লক্ষণ সম্প্রতি হ্রস্ব উঠেছে। বিশেষ করে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার ব্যাপক অংশ জুড়ে ধরার প্রকোপ ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। অন্নহীন, জলহীন, গবাদি পশুর খাদ্যহীন এই এলাকাগুলি থেকে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদও এসে পৌঁছেছে। কিছুদিন পূর্বে পশ্চিম বঙ্গের আনন্দেরী বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার এই অঞ্চলগুলি ঘুরে এসে বলেছিলেন এদের অবস্থা বিহারের মতই ভয়াবহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অঞ্চলগুলিকে ‘দ্রুতিক এলাকা’ বলে ঘোষণা করা হয় নাই। দ্রুতিক এলাকা ঘোষণার আনুগত্য দায়িত্ব পালন সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভব বলে মনে না হলেও, দ্রুতি এলাকার প্রকৃত অবস্থার প্রতি সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ত এবং দেশবাসীর কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্ত সরকারের উচিত অবিলম্বে এই অঞ্চলগুলিকে দ্রুতিক এলাকা বলে ঘোষণা করা।

কলকাতার আকর্ষণ

কলকাতার আকর্ষণ কমেছে কিনা তা বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতার রাস্তাঘাট, যানবাহন, জল সরবরাহ, বস্ত্র, জনবাহুল্য, বিকোভ, কল-কারখানা সব মিলিয়ে কলকাতা সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব কেনো কোনো মহলে সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য কলকাতার নাগরিক কিম্বা

ঘেরাও

বাংলাদেশের নাগরিকদের জীবনযাত্রা, আচার আচরণের যে দায়িত্ব রয়েছে, সে বিষয়ে সংশয় নেই। কিন্তু তার চাইতেই বড় কথা হল কলকাতার জন্য সর্বভারতীয় দায়িত্ব রয়েছে। শিল্প—ব্যবসা-বাণিজ্যের, রাজনীতির দিক থেকে সে সম্পর্কেও আলোচনা হওয়া দরকার। দেশবিভাগের পর কলকাতার উপর জনসংখ্যা, অর্থনীতি ও অন্যান্য বহুবিধ চাপ পড়েছে, এর অংশ গ্রহণে সর্বভারতীয় ব্যগ্রতা অকাতরে উৎসারিত হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন এসে যায়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পূর্ব-ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কলকাতার অবিসম্বাদী প্রাধান্য রয়েছে। তাছাড়া কলকাতা বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক। বাইরের চমক এবং চটকই যদি নাগরিকজীবনের আকর্ষণ হয় সেখানে কলকাতা অবশিষ্টই অনেক পিছিয়ে আছে এবং দ্রুত পদক্ষেপে সেই প্রতিযোগিতায় কলকাতাকে এগিয়ে আসতে হবে, যদি বেঁচে থাকতে হয়। তাই বলে কলকাতার আকর্ষণ কমে নি। শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস কলকাতামুখীন আকর্ষণের উপকরণ সাজিয়ে রেখেছে।

তপশীলি মন্ত্রী

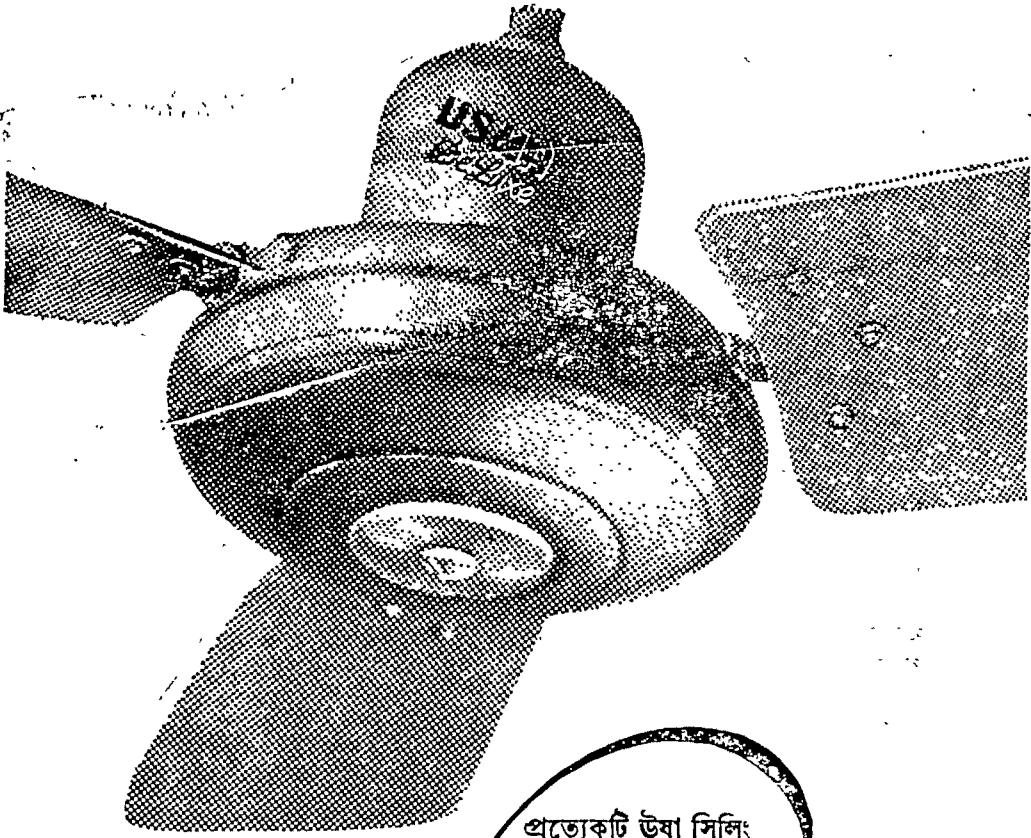
পশ্চিম বঙ্গ অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় কোনো তপশীলি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি না থাকায় তপশীলি সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তপশীলি জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলনে লোকসভার সদস্য পি, আর, ঠাকুরকে বলতেও শোনা গেছে যে তপশীলি সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধিকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণের অমরোধের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী নাকি তাকে জানিয়েছেন রাজ্যবিধান সভার তপশীলি সদস্যদের মধ্যে মন্ত্রী হবার উপযুক্ত কেউ নাই। ক্যাবিনেটে তপশীলি মন্ত্রী গ্রহণ না করলে মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে এবং মন্ত্রীসভার পতন ঘটাবার হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

শ্রী পি, আর ঠাকুর বাংলা কংগ্রেসের সদস্য, তাসত্ত্বেও তাঁর এই হুমকি কেন? এস, এস, পির পক্ষ থেকেও তপশীলি মন্ত্রীর দাবী উঠেছে। এই সমস্যার সমাধানে মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি কি, বাধা কোথায়—এই প্রশ্নগুলির দ্রুত সমাধান হওয়া প্রয়োজন। এ-সংবাদ মন্ত্রীসভার অন্তরঙ্গদের ইলান্না বহন করছে।

ঘেরাও নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে। ধর্মঘট, অবস্থান ধর্মঘট, কর্মবিরতি প্রভৃতি হাতিয়ারের সাহায্যে মালিকপক্ষের হাত থেকে শ্রমিকের দাবি আদায়ের অধিকার আইনে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু নূতন অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হবার পর ঘেরাও-এর ব্যাপক প্রয়োগে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। পশ্চিম বাংলার শ্রমমন্ত্রী ঘেরাও সমর্থনে বিবৃতি দেবার পরই ঘেরাও-এর জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ-কথা সত্য কংগ্রেসী আমলে পুলিশের সাহায্যে মালিক পক্ষ বহু শ্রমিক-স্বার্থ-বিরোধী কাজ করেছেন। সুতরাং নূতন মন্ত্রীসভা সত্ত্বে ভাবেই তার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে চাইবেন, যাতে শ্রমিক-শ্রমিকের শক্তি পরীক্ষায় পুলিশ মালিক পক্ষকে সাহায্য না করে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে ঘেরাওকে আইনসম্মত হাতিয়ার রূপে সমর্থন জানিয়ে সরকার শ্রমিক-মালিকের অর্থনৈতিক সম্পর্কে একটি আইনশৃঙ্খলার সম্পর্কে পরিণত করেছেন, যে সম্পর্ক রাজনৈতিক সংঘাতের সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ছাঁটাই, লে-অফ, বেতন-বন্ধ, ট্রাইবুনাালের রায়ের অপ্রয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এ-সাবং শ্রমিক পক্ষ প্রতিহত হয়েছে। জায়গীতির আশ্রয় এমন কি সরকারী আমুকূল্যও শ্রমিকের বিরুদ্ধে গেছে। কিন্তু এ-অবস্থার পরিবর্তন ঘটা সম্ভব ছিল নূতন মন্ত্রীসভার আমলে আইনের পরিবর্তনে এবং আইনের কঠোর প্রয়োগে। কিন্তু ঘেরাওয়ের প্রতি সরকারী অমরোদন নানাক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলার গণ্ডী পেরিয়ে শিল্পে বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্ক ছড়াতে সহায়তা করেছে। শিল্পে বিশৃঙ্খলা আরও বেকারীর সৃষ্টি করে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা অনিবার্য করে তুলবে।

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীসভার অন্তিম উদ্দেশ্য রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি নয়, একথা জোর করে বলা গেলেও মন্ত্রীসভার বিভিন্ন দলের দৃষ্টিভঙ্গির এ-বিষয়ে অবিসম্বাদিত পার্থক্য রয়েছে। তাই সমগ্রভাবে এই জটিল প্রশ্নটির এখনই মীমাংসা প্রয়োজন, নচেৎ, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সমর্থকদের একটি বৃহদংশকে বিরোধীর ভূমিকায় সরকার ঠেলে দেবে। অর্থনীতি যদি রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে ওঠে তার প্রতিবাদ ঘূর্বার হয়ে উঠবেই।



কার্যকারিতা
গুণ ও
সৌন্দর্য্য

প্রত্যেকটি উষা সিলিং
ফ্যান ডবল
বল-বেয়ারিং যুক্ত
সেইজন্য ইহা অনেক
বেশী দীর্ঘস্থায়ী

সহজ কিস্তিতেও পাওয়া যায়
প্রত্যেকটি ফ্যানের সঙ্গে ছুঁহরের গ্যারান্টি

উষা

পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য

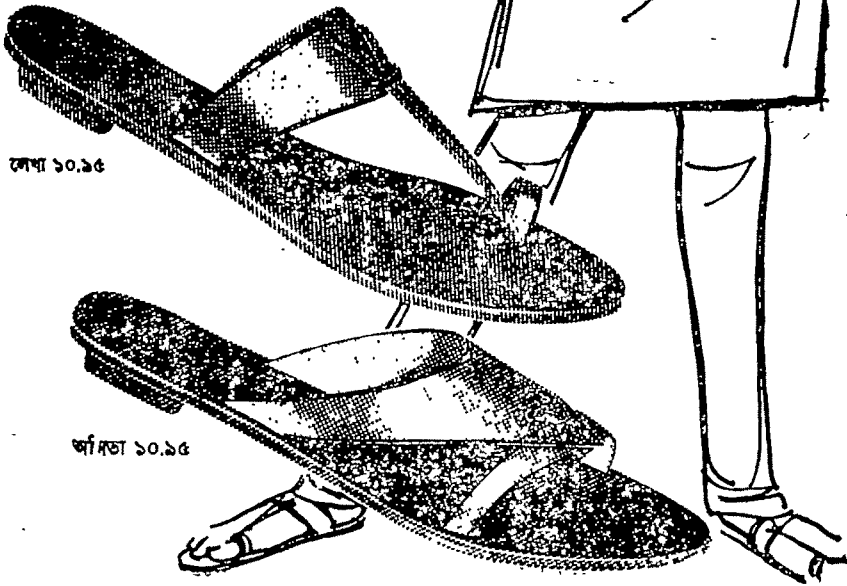
সর্বাত্মক

বিক্রয় হয়

হালকা, হালকিল, তব্বী— মেয়েলী ছাঁদে সজীব নকশা

হালফ্যাশানের সহযাত্রিনী এই বাটা সিনডারেলা—
মেয়েলী ছাঁদে এর অনাগাস, স্বচ্ছন্দ আকৃতি;
সজীব নকশা, সাবলীল প্রকৃতি।
সুন্দর বর্ষসম্ভারে এর নরম চামড়ার স্ট্যাপ, প্রায়
সব শাড়ি-পোশাকের সঙ্গে সচল। স্বাভাবিক যানানসই
ফিটিং, তার কারণ যদিও সিনডারেলা
আঙুল থেকে গোড়ালি পর্যন্ত কিছটো চাপা,
সামনের দিকে বেশ চওড়া, পা দিলেই তাই আনন্দ।
পায়ের ভল্লায় আরামদায়ক মোস্টেড মোহা,
সেই সঙ্গে প্রুটব্য ছোট্ট সুদৃশ্য হিল, বার ফলে
প্রতি পদক্ষেপই মনে হবে যেন নতুন।

Bata
সিনডারেলা
হালফ্যাশানের সহযাত্রিনী





ধারাবাহিক রচনা

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রথম কিস্তি

সুভাষচন্দ্র

যুবরাজ বয়স্কট

১৯২১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর প্রিন্স অফ ওয়েলস কলকাতায় এলেন। কলকাতায় তাঁর ভ্রমণের প্রোগ্রাম ছিল নিম্নরূপ :

শনিবার ২৪শে ডিসেম্বর

আগমন সকাল দশটায় (রেলের সময়) হাওড়ায়।

(তিনি আসছিলেন পাটনা থেকে।)

সকাল ১০-২৪ মিনিটে ডালহৌসি স্কোয়ারে কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক সম্বর্ধনা স্তম্ভান।

রয়্যাল ক্যালকাটা টার্মি ক্লাবের স্টুয়ার্ডদের সঙ্গে কলকাতা ক্লাবে মধ্যাহ্ন ভোজ এবং তারপর বেলা ১টায় রেলের মাঠে ঘোড়দৌড় দেখা (প্রিন্স অফ ওয়েলস কাপ)।

রাত ৮টা ১৫ মিনিটে নৈশভোজ ও নৃত্য উপভোগ।

রবিবার—ক্রীস্টমাস দিবস—

গীর্জায় প্রার্থনায় যোগদান ও সকাল ১০-৩০টায় 'সাদাম্পটন' জাহাজ দেখা।

সোমবার

সকাল ১০টায় পোলো খেলা।

দুপুর ১২ টায় কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে মণিপুরের মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

পবিত্রকুমার ঘোষ

দুপুর ১২টা ৪৫মিনিটে 'সোনামুখী' জাহাজের ওপর আসামের গভর্ণরের সঙ্গে একত্রে মধ্যাহ্ন ভোজ।

দুপুর ২-২০ মিনিটে রেলের মাঠে যাওয়া।

রাত ৯-৪৫ মিনিটে বল নাচ।

মঙ্গলবার

সকাল ১১-৩০ মিনিটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনারারি ডিগ্রী দেবেন।

দুপুর ১-১৫ মিনিটে ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ।

দুপুর ৩-৩০টায় ময়দানে জন সমাবেশ।

সন্ধ্যায় বাজি পোড়ানো।

রাত ৮-১৫ মিনিটে ডিনার পার্টি।

বুধবার

সকাল ১১টায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উদ্বোধন।

দুপুর ১-১৫ মিনিটে ক্যালকাটা ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ।

বেলা ৩-৩০ টায় পোলো।

বৃহস্পতিবার

সকালবেলা "এমপ্রেস থেটার" জাহাজে ব্যারাকপুর গমন।

বিকাল ৪-১৫ মিনিটে গভর্ণমেন্ট হাউসে উদ্বোধন পার্টি।

রাত্রি ৮-১৫ মিনিটে ডিনার পার্টি।

রাত্রি ৯-১৫ মিনিটে নাচ।

শুক্রবার

সকাল ১১ টায় কলকাতা যুদ্ধস্মৃতিস্তম্ভের উন্মোচন।

সকাল ১১-১৫ মিনিটে পুলিশদের পরিদর্শন ও মেডেল দান।

সকাল ১১-৩০ মিনিটে অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় অফিসার, সৈন্য ও কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

সকাল ১১-৪৫ মিনিটে বয়স্কাউট ও গার্ল গাইডদের পরিদর্শন।

দুপুর ১-১৫ মিনিটে বেঙ্গল ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ।

দুপুর ২-৩৫ মিনিটে "প্যাক্সি" জাহাজে আউটরাম ঘাট হতে বিদায়।

The Statesman, 23rd December 1921 থেকে উদ্ধৃত। ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা লিখল যে কলকাতা প্রিন্সকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাদের সংবাদের শিরোনামটি ছিল এই রকম :

Calcutta ready for the Prince

Great day Assured

Wonderful colour schemes

To-Night's Fairyland

সংবাদে লেখা হল যে হিজ রয়্যাল হাইনেস দি প্রিন্স অফ ওয়েলস আজ কলকাতায় আসছেন এবং নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগরী কলকাতার হাজার হাজার লোক তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে যাবে। আজ সময়ের পরিবর্তন যতই ঘটে থাকুক না কেন ভারতবাসীরা অন্তরে অন্তরে চিরকালই রাজভক্ত। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই একথা বলা যায় যে তাদের এই রাজভক্তি ও আতিথ্যপরায়ণতার নিদর্শন দেখে তিনি অতীব সন্তুষ্ট হবেন। মহামান্য অতিথিকে

সম্বর্ধনা জানাবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। যে মুহূর্তে যুবরাজ ট্রেন থেকে হাওড়ায় পদার্পণ করবেন— হাওড়ার ইতিমধ্যে রূপান্তর সাধন ঘটেছে—সেই মুহূর্ত হতে গভর্ণমেন্ট হাউসে পৌঁছানো পর্যন্ত he will see on every hand manifestations of affectionate loyalty. Calcutta, in brilliant morning sunshine, will present a picture unique in living memory. গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চলছে সারা কলকাতা শহরের মাজা ঘষা। সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী অট্টালিকাগুলি পবিত্র করা হয়েছে, নানাভাবে সাজানো হয়েছে এবং কলে কলকাতা শহর শ্রীমণ্ডিত ও মনোরম হয়ে উঠেছে। ডিউক অফ কনট কলকাতাকে বলেছেন "প্রাচ্যের লণ্ডন।" সত্যই কলকাতা যে কত সুন্দর তা যুবরাজ দেখবেন, আর দেখবেন কলকাতা কত বড় বন্দর। পৃথিবীর নানা দেশের শ্রেষ্ঠ জাহাজগুলির একটি সমাবেশ ঘটানো হয়েছে হুগলী নদীতে—যুবরাজ পর্যবেক্ষণ করবেন বলে। তাঁর যাতায়াতের পথগুলি হয়েছে সুসজ্জিত, বিশেষত ডালহৌসি ক্যোয়ার অসাধারণ রূপসজ্জা ধারণ করেছে। লালদীঘি ও তার চারপাশের বাড়িগুলি যেন রূপকথার রাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে—যুবরাজকে স্বাগত জানিয়ে কত যে লিপি জল জল করছে সমস্ত বাড়িগুলিতে। And at night with every building picked out in brilliant lights and lavish designs, Calcutta will be a veritable "fairy land." কলকাতার এই সাজসজ্জা ও যুবরাজকে অভ্যর্থনার যাবতীয় আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে বাঙ্গালী সমাজের সাগ্রহ সহযোগিতায়।

'স্টেটসম্যান' উপরোক্ত সংবাদের সঙ্গে একটি মানচিত্রও প্রকাশ করেছিল। যুবরাজের যাতায়াতের পথ বোঝাবার জন্য। পথের পাশে কোথায় দাঁড়ালে তাঁকে দেখার সুবিধা হবে মানচিত্রে ছিল সেই ইঙ্গিত।

‘স্টেটসম্যান’ ২৪ শে ডিসেম্বর তাদের প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও সুবরাজকে স্বাগত জানিয়ে লিখলো : প্রিন্স অফ ওয়েলস কলকাতায় এসে যে সাদর অভ্যর্থনা পাবেন সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। তিনি দৈর্ঘ্যযোগ্য যশের অধিকারী, কেননা তিনি শুধু ইংলণ্ডবাসীদের নয়, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া মুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের আধিবাসীদেরও হৃদয় জয় করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য এত অধিক যে এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক তাঁকে “সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজদূত” আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বৈদগ্ধ্য, হৃদয়ের কোমলতা, খোলাখুলিভাব ও বিনয়ী স্বভাব তাঁকে করেছে সর্বশ্রিয় : কিন্তু এইসব গুণ ছাড়াও তিনি একজন উপযুক্ত রাষ্ট্রনেতার প্রতিভার পরিচয়ও দিয়েছেন। যুরোপের একটি প্রাচীনতম বংশের সন্তান এবং পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের ভারী সম্রাটকে আমাদের আজ উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেই হবে। তিনি এসেছেন সেই ভারতবর্ষকে দেখতে যে দেশকে রাণী ভিক্টোরিয়া, তাঁর পুত্র ও তাঁর পৌত্র ভালবেসেছেন; আর কোন কারণ না থাকলেও শুধু এই কারণেই the Prince deserves to be received with the unbounded hospitality which Indians love to shower upon the children of an old friend. তিনি এসেছেন সেই দেশে যে দেশের শাস্ত্রসমূহ রাজাকে দেবতা স্তানে মামু ও শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে, ভারতবাসীর উচিত তাদের শাস্ত্রবাক্য অনুসারে সুবরাজকে পরম সম্মান প্রদর্শন করা। যদি ভারত তার সনাতন ভাবধারার অনুবর্তন করত, যদি নিজ জুনায বজায় রাখতে চাইত তবে ভারতের প্রয়োজনাত ঘটত; but at the present moment she stands disgraced before the nations by a childish exhibition of incivility, প্রকৃত ভারত, সনাতন ভারত চায় তার রাজ অতিথিকে সাদৃশ্যে বরণ করতে, but an evil spell seems to

have been cast upon her and she believes herself helpless. কেন? ভারত আজ অসহায়, তার কারণ বৃহত্তর জনসাধারণ বিনা প্রতিবাদে একদল সংখ্যালঘু মাহুষের দোঁরাঙ্গ্য মেনে নিচ্ছে। কয়েকজন গান্ধীপন্থী অসহযোগীদের কুকীতি হতে দেশকে যে বাঁচাতে হবে, আশা করি শিক্ষিত শ্রেণী তা বুঝবেন ও সুবরাজের সম্বর্ধনা যাতে অসম্পন্ন হয় তা দেখবেন।

‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকার সংবাদ-পরিবেশনে যে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের স্বর ছিল সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিও হ্রস্ব হয়েছিল সেই স্বরে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিষাদ ও সংশয়ের দোলা এসে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল যে চারদিকের রঙ বেরঙের সাজসজ্জার জৌলুষের আড়ালে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে, এদেশের সরকারী মহল ও যুরোপীয় সমাজের ভিতর। সেই আতঙ্কের কারণ কী?

সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পাশেই স্টেটসম্যান প্রকাশ করেছে দু'খানি চিঠি,—তাতেই সুবরাজের অভ্যর্থনার আসল স্বরূপ জানা যায়। পত্রলেখকস্বরূপ জানাচ্ছেন যে (১) কলকাতার আর সব কিছু মতো এমন কি নিউ মার্কেটেও হরতাল হবে, (২) মহাত্মা গান্ধী শেষ মুহূর্তেও এক তারবার্তায় জানিয়েছেন যে সুবরাজ যেহেতু ব্যুরোক্রেসীর অতিথি হয়ে এসেছেন অতএব হরতাল করতেই হবে।

পরদিন ২৫শে তারিখে স্টেটসম্যান সুবরাজের কলকাতায় আগমন ও বিপুল সম্বর্ধনা লাভের সংবাদ জানিয়ে লিখল যে যারা সম্বর্ধনা জানাতে গিয়েছিল, দুঃখের বিষয়, তাদের পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছিল, কেন না কলকাতার সব গাড়ি ঘোড়া গান্ধীপন্থীরা বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে পত্রিকাটির ফোভের অন্ত রইলনা। হরতালের সংবাদ দিয়ে ‘স্টেটসম্যান’ লিখল: কলকাতায় গতকাল হরতাল পালিত হয়েছে আংশিকভাবে। সমস্ত বাবসা-বাণিজ্য, কেনা-বেচা বন্ধ ছিল। বন্ধ ছিল নিউ মার্কেটও। কয়েকখানি

ট্রাম ও ট্যাক্সি রাস্তায় দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে গাড়ী ঘোড়া চলেনি। গৃহভৃত্যরাও কাজ করতে আসেনি। হরতাল ছিল শান্তিপূর্ণ, ফায়ার ব্রিগেডে দু'একটি টিল পড়া ছাড়া আর কোনো ঘটনা ঘটেনি। যুবরাজকে যারা সম্বর্ধনা জানাতে পথের পাশে সমবেত হয়েছিল তারা হল প্রধানত অ্যাংলো সম্প্রদায়, ইংরেজ, স্কট, ফরাসী, পার্সি ও চীনাওয়ান।

যুবরাজকে সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন বাঙালী জাতির সহযোগিতায় সম্পূর্ণ হয়েছে বলে আগের দিনই 'স্টেটসম্যান' যে প্রচার করেছিল পরের দিনই তা যে কতখানি মিথ্যা তা স্বীকার করতে হল। ২৫ ডিসেম্বর তারিখের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গান্ধীপন্থীদের দ্বারা সংগঠিত যুবরাজ বয়কটের কর্মসূচী যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে সে কথা প্রমাণ করার চেষ্টা ছিল। গান্ধীপন্থীদের সরাসরি goonda element নামে অভিহিত করে স্টেটসম্যান লিখেছেন যে মিলিটারি রাস্তায় নামানো হয়েছিল, কলে গুলারা গুলামি করতে পারে নি;—Hooliganism kept to its dens, গান্ধীপন্থীরা যে প্রচার করেছিল যে যুবরাজের আগমনের ফলে দেশে রক্তগল্লা বয়ে যাবে তাও তো ঘটেনি। ঘটনার গতি অর্থাৎ জনগণ কর্তৃক রাজকীয় অভ্যর্থনার বহর দেখে বোকা যাচ্ছে যে, যে হরতাল পালন করবার মতো সাধ্য গান্ধী নেই সে হরতালের ডাক দিয়ে তিনি নিজের স্বনাগ নষ্ট করেছেন। প্রিন্স অব ওয়েলসের মাথায় যে অপমানভার চাপিয়ে দেবার ইচ্ছা শ্রীযুক্ত গান্ধীর ছিল তা ভাগ্যক্রমে আজ তাঁরই মাথায় এসে চেপে বসল। গান্ধী বলেন যে যুবরাজের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ বা অসম্মান প্রদর্শন করা তাঁর ইচ্ছা নয়; বয়কটের উদ্দেশ্য হল ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসীর অত্যাচার বিচারের নীতিগত প্রতিবাদ জানানো। স্টেটসম্যান মনে করেন যে গান্ধীর মগজ সীমাহীন আত্মপ্রত্যারণ্য ভরা, তা না হলে তিনি কি করে বিশ্বাস করবেন যে ব্রিটিশ শাসনকে সমালোচনা করে, ইংরেজী ভাষার স্থলে দেশীয় ভাষার মহিমা

কীর্তন করে, ব্রিটিশ সিংহাসনের অপমান করে নিজের অমুপন্থীদের দ্বারা ব্রিটিশ প্রেম জাগানো সম্ভব? কলকাতার মানুষেরা গান্ধীর এবিধ বিশ্বাস বা যুক্তিধারা মেনে নিতে পারেনি। কারণ কলকাতাবাসীরা জানে যে ইংরেজ শাসনের ফলে তারা বহু স্বধ-স্ববিধার অধিকারী হয়েছে। যুবরাজকে আন্তরিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সম্বর্ধনা জানিয়ে তারা সে কথা প্রমাণও করে দিয়েছে।

কিন্তু এই কলকাতাবাসীরা কারা? স্টেটসম্যানের বর্ণনায় যতই ভাষার আড়ম্বর থাকুক আসল সত্যটাকে তাঁরা চাপা দিতে পারেন নি। যুবরাজের সম্বর্ধনা হাওড়া স্টেশন হতে শুরু হলেও ডালহৌসি স্কোয়ারেই নাকি চূড়ান্ত হয়। "The climax came when His Royal Highness reached the heart of the city—Dalhousie Square." কিন্তু সম্বর্ধনার এই ক্লাইম্যাক্স অবস্থার কারা অংশীদার হয়েছিল? স্টেটসম্যানের নিজস্ব ভাষায়: It was here that the European and Anglo-Indian Community in particular had congregated and it was here that the enthusiasm reached its highest pitch." কিন্তু এইখানে যুবরাজ সম্বর্ধনায় যারা প্রধানভাবে অংশ নিয়েছিল তারা হল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ইংরেজ নারীকুল। যুবরাজের মাধ্যমে তারা তাদের স্বদেশ (?) ইংলণ্ডকেই স্মরণ, মনন ও অভ্যর্থনা করতে এসেছিল। সাংবাদিকের বর্ণনাও এবিষয়ে প্রঞ্জল: "Ladies, in the smartest of dresses were most intensely sincere in the depth of their welcome. Indeed, the appearance of the Prince as the greatest representative of the Homeland beyond the seas, with a message of hope and cheer for all, touched the emotions very keenly. সেদিনের

রাজকীয় সম্বর্ধনার বহর যা দেখে স্টেটসম্যান গান্ধীপন্থীদের দ্বারা আহুত হরতাল ব্যর্থ হয়েছে বলে ঘোষণা করেছিল এবং গান্ধীকেও কয়েকটি উপদেশ এই প্রসঙ্গে শুনিয়েছিল,—সেই সম্বর্ধনায় সত্যই কারা যোগ দিয়েছিল, কোন মনোভাব নিয়ে ও কী উদ্দেশ্যে,—স্টেটসম্যানের বাস্তবায়ন সংবাদ-পরিবেশন হতে সহজেই সে কথা বোঝা যায়। বাঙালী বা ভারতীয় জনতা সে সম্বর্ধনায় যায়নি। গিয়েছিল মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক ইংরেজের প্রসাদজীবী ভারতীয় আর কলকাতার অ্যাংলো ও যুরোপীয় সমাজ। পথে তাদের জমায়েত দেখেই খুব বড় সমাবেশ বলে মনে হয়েছিল। সুবরাজের সম্বর্ধনায় ভারতীয়রা যে কাতারে কাতারে যোগ দিয়েছিল সে কথা প্রমাণ করার জন্য স্টেটসম্যান ২৫ শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় দুখানি খুব বড় আকারের ফটো প্রকাশ করে—দুইখানিই রেসকোর্সে তোলা। রেসের মাঠে ঘোড় দৌড় দেখতে অগণিত লোক সর্বদাই যায়, সুবরাজের সম্বর্ধনার সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। সুবরাজ রেসের মাঠে গেছেন কিনা, কলকাতার রেসপ্রিয় নাগরিকদের কাছে সেটা মোটেই উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। স্ততরাং রেসের মাঠের ভিড়ের ছবি ছাপিয়ে স্টেটসম্যান যখন বড় অক্ষরের শিরোনামায় লেখেন : Indians flock to see the Prince visit the races : তখন সেটা নেহাত চাতুরী বলে মনে হয়। বস্তুতঃ ২৪ তারিখের হরতাল ব্যর্থ হয়েছিল বলে ভারতের ব্রিটিশ সমাজের মুখপত্র স্টেটসম্যান নানাদিক হতে যে আলোক-সম্পাতের চেষ্টা করেছিল তা যে কতখানি ব্যর্থ অপপ্রয়াস মাত্র তার প্রমাণ ঐ সংবাদপত্রেই ২৫ তারিখে প্রকাশিত একজন ব্রিটিশ সামরিক অফিসারের চিঠিতে পাওয়া যায়। দমদমের সামরিক বাহিনীর শিবির হতে পত্রখানি লেখা। লেখকের নাম জর্জ গ্রাণ্ট। তিনি লিখেছেন যে তিনি দমদমের ব্রিটিশ ক্যান্টনমেন্টে থাকেন। এতদিন পর্যন্ত শান্তিতেই সেখানে তিনি ছিলেন। কিন্তু গত কয়েকদিন যাবৎ সে শান্তি ভঙ্গ

হয়েছে, কেননা দলং দলং লোক প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে “গান্ধী মহারাজ কি জয়” ধ্বনি দিতে দিতে চলেছে। এমনকি গান্ধীজীকে বাদশাহ নামেও লোকেরা অভিহিত করছে। তার ফল হয়েছে বিষময়। কারণ ভদ্রলোকের ভৃত্য এসে জানিয়েছে যে ২৪ তারিখে সে কাজে আসবে না, যেথরাষ্ট্র এসে বলেছে ২৪ তারিখে সেও কাজে আসবেনা, ধোপাও একই কথা বলে গেছে। রুটিআলা বলেছে তিনদিনের পক্ষে প্রয়োজনীয় রুটি সে একসঙ্গে ২৩ তারিখে দিয়ে যাবে, কেননা ২৪ তারিখ হতে তিনদিন সে তার দোকান বন্ধ রাখবে। এবং সবচেয়ে করুণ ব্যাপার হল এই,—সাহেব লিখেছেন, “My bhisti openly declares he will not supply my water on December 24. All this in a military cantonment! All this also at the time of the visit of our Prince.” পত্র-লেখক জানাচ্ছেন যে দমদমে তাঁদের কোন স্নানাগার নেই, এবং ওখানকার যুরোপীয় ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ ভিত্তির ওপর জলের জন্য সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। সেই জন্যই যদি ভিত্তি না দিয়ে যায় তবে সাহেব, যেম ও তাঁদের কাচ্চাচাচ্চাদের চলবে কি করে?

কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হতে সুবরাজকে যে স্বাগত ভাষণ জানানো হয়েছিল সে সভাতেও কর্পোরেশনের বাঙালী সদস্যরা অনেকেই আসেননি। তাঁরা ইচ্ছা করেই সুবরাজ সম্বর্ধনা বয়কট করেছিলেন। সেদিনের সরকার পক্ষ সেইসব অনুপস্থিত বাঙালী কাউন্সিলারদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। কাজেই স্টেটসম্যান conspicuous absentees বলে এঁদের নাম প্রকাশ করেন—রাজা ঋষিকেশ লাহা (তিনি বেঙ্গল চম্বার অফ কমার্শের চেয়ারম্যানও ছিলেন), এ. সি. ব্যানার্জী, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, বিজয়কৃষ্ণ বসু, কৃষ্ণলাল দত্ত।

সেদিনের সেই অসামান্য সাফল্যের পৌরবে ভূষিত

হরতালকে তুচ্ছ করে, ব্যর্থ রূপে দেখাবার প্রয়াস তাই ছিল বুধা। হরতালের সংগঠকদের সম্পর্কে স্টেটসম্যানের উক্তি তাই ক্রোধবশত: শুধু কঠোর নয়, উগ্র ও অশোভনও হয়ে পড়ে। ক্রোধ সেদিনের কলকাতা স্ব ইংরেজ সমাজকে ক্ষিপ্ত-প্রায় করেছিল। তাই তাদের মুখপাত্র বারবার করে ডালহৌসী স্কোয়ার ও রেসের মাঠের ভিড়ের কথা উল্লেখ করে হরতাল অসফল হয়েছে বলে ধূয়ো গাইতে শুরু করে। তাদের অশালীন ও মাত্রাস্তানহীন উক্তিটি ছিল এই, Those miserable persons who have been attempting now for days past to discourage the loyalty of the citizens of Calcutta would have been ashamed of themselves if they could have seen the loyal demonstration of the vast Indian public who gathered round Dalhousie Square. Their sinful action met with signal failure and the Prince is here today as the idol of many thousands of Indian hearts.

শুধু বর্ণনার মধ্যে বা কট্টকথার মধ্যে ইংরেজের ক্রোধ সেদিন থেমে থাকেনি। সুব্রাহ্মণ্য কলকাতায় আসার বেশ কয়েকদিন আগে হতেই কার্যক্ষেত্রে সেই ক্রোধ ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দাঁড়ায়। হরতালের সমস্ত সংগঠকই সরকারের দমননীতির প্রথামুসারে ধৃত ও কারাস্ত্রাণে প্রেরিত হয়েছিল। দেশবন্ধু জেলে—এবং কলকাতার অসাধারণ সাফল্যপূর্ণ হরতালের মুখ্য সংগঠক স্বভাষচন্দ্রও জেলে। জেল তখন গান্ধীপন্থী অসহযোগীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে। ২৪শে তারিখে গান্ধীজী তাই এক দীর্ঘ বিবৃতিতে সরকারের দমননীতির কঠোর নিন্দা করেছিলেন। তিনি ঐ বিবৃতিতে বলেছিলেন, আমরা তো aggressor নই, We have not taken the offensive. It is the Government that must stop its aggravatingly offensive

activity, aimed not at violence but at lawful disciplined, stern but absolutely non-violent agitation. গান্ধীজী আরও খোলাখুলি ভাবে বলেন, I have only to point to the unprovoked assaults being committed, not in isolated cases, not in one place, but in Bengal, in the Punjab, in Delhi and in the United Provinces. I have no doubt that as repression goes on in its mad career the reign of terrorism will overtake the whole of this unhappy land, গান্ধীজী আরও বলেন হিংসা বা অহিংসা যে পথেই আন্দোলন চলুক না কেন সমস্ত ভারতবাসীর মূল লক্ষ্য এক, এবং স্বাধীন মতামত সংগঠনের ব্যাপারে অধিকার দাবী করার সমস্ত ভারতবাসী একমত। “We have burnt our boats and we must march onwards till that primary right of human beings is vindicated” গান্ধীজীর এই দৃঢ় ঘোষণার মধ্যেও যে কথাটি প্রকাশিত হয়েছিল তা এই যে সুব্রাহ্মণ্য-বয়স্কটের কর্মসূচীকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সরকার সে সময় সারা দেশ জুড়ে চালিয়েছিল কঠোর দমননীতি কিছুকাল ধরে। কিন্তু সরকারের মুখপত্র অমানবদনে শুণ্ডামির দোষ চাপিয়ে দেয় গান্ধীপন্থী তথা হরতাল-সংগঠকদের ওপর।

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে আগরা ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কলকাতায় প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমন ও তাঁর অভ্যর্থনা বয়স্কট করার জন্য কলকাতায় হরতাল পালনের চিত্রটি ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকা হতেই এতক্ষণ দিয়েছি। তার কারণ ‘স্টেটসম্যান’ ছিল সেদিন সরকার ও ব্রিটিশ সমাজের মুখপত্র—আর ঐ পত্রিকাটি প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে হরতাল আদৌ সফল হয়নি। কিন্তু তাদের পরিবেশিত সংবাদ হতেই যে হরতালের বিপুল সাফল্যের চিত্রটি ফুটে ওঠে সেটাই আমার প্রতিপাল। বহুমতী, নায়ক,

সার্ভান্ট, অমৃতবাজার পত্রিকার মতো স্বদেশীবাদী পত্রিকার সাক্ষ্য আমরা পরে উদ্ধৃত করব—কেননা ঐ পত্রিকাগুলি উচ্ছৃঙ্খলভাবে হরতালের সাক্ষ্যের কথাই লিখেছিল। আপাতত আমরা নরমগছী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর পত্রিকা The Bengalee হতে সমস্ত ঘটনাটির আর একটি দিক ভুলে ধরি। ২৪ তারিখের হরতালের আগে ব্রিটিশ সরকার যে দমননীতি চালিয়েছিল সে সম্পর্কে গান্ধীজীর বিবৃতি হতে আমরা সাক্ষ্য উদ্ধার করেছি। সেই দমননীতির স্বরূপ সুরেন্দ্রনাথের ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকার মত ইংরেজিষা পত্রিকাও গোপন রাখতে পারেনি।

৮ই ডিসেম্বর তারিখেই সংখ্যায় দৈনিক সংবাদপত্র “দি বেঙ্গলী” শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর প্রেক্ষার সম্পর্কে তিনরকম ব্যাখ্যা সহ একটি সংবাদ প্রকাশ করে। সংবাদটির মূল বক্তব্য ছিল এই: শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের পুত্র শ্রীচিরঞ্জন দাস কংগ্রেস ও বিদ্যাকর্তী স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষ হতে সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ চালানোর ৬ তারিখ মঙ্গলবার রাতে তাঁকে প্রেক্ষার করা হয়। এই ঘটনাই আরও বড় আকারে দেখা দেয় গতকাল ৭ তারিখ বুধবার বধন চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, ভগ্নী শ্রীযুক্তা উর্মিলা দেবী ও শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবী সহ পঞ্চাশজন স্বেচ্ছাসেবক প্রেক্ষার হন। বুধবার অপরাহ্নে বাসন্তীদেবী, উর্মিলা দেবী ও সুনীতি দেবী বারো চৌদ্দো জন স্বেচ্ছাসেবক সহ বড়বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন—আইন অমান্য ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। নগ্ন পদ, খন্ডর পরিহিতা এই মহিলারা খন্ডর বিক্রয় করছিলেন। হ্যারিসন রোড পর্যন্ত আসা মাত্রই পুলিশ তাঁদের প্রেক্ষার করে। পুলিশের অভিযোগ এই যে ঐ তিনজন মহিলা ২৪শে ডিসেম্বর যুবরাজ বয়স্কটের জন্ত আহুত হরতালে যোগ দিতে সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। ২৪শে তারিখে দোকান পশার বন্ধ রাখার জন্তও তাঁরা আবেদন করেছিলেন। এই প্রেক্ষারের সংবাদ

মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তেই দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক এসে জড়ো হতে থাকে ও তারাও প্রেক্ষার হবার বাসনায় হরতালের কথা প্রচার করতে শুরু করে। পুলিশ তাদের প্রেক্ষার করে বড়বাজার ধানায় নিয়ে যায়। পুলিশের অহুসরণ করে বহু হিন্দু মুসলমান দর্শক একত্রে “গান্ধী মহারাজ কী জয়” ধ্বনি দিতে দিতে এগোয়। বড়বাজার ধানার সামনে রাশি রাশি বিলিভী কাপড় জড়ো করে জনতা তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সন্ধ্যা ছয়টার পর প্রেক্ষারিত সকলকে লালবাজার ধানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কংগ্রেসের বহু গণ্যমান্য ভ্রাতৃলোক সেখানে বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। লালবাজারের ধানার সামনে জমায়েৎ জনতার উদ্দেশ্যে নেতারা ভাষণ দেন। মধ্য রাতে মহিলা তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁরা জামিন নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

৯ই ডিসেম্বরের ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকার সংবাদে দেখা যায় যে পূর্বদিন ৮ তারিখ বুধবার বিকালে উর্মিলা দেবী ও সুনীতি দেবীর নেতৃত্বে শত শত লোক ২৪শে ডিসেম্বর যুবরাজ বয়স্কট উপলক্ষে হরতাল প্রচারার্থে শোভাযাত্রা পরিচালনা করে। কিছু সংখ্যক শিশু মহিলাও হরতালের প্রচারে যোগ দেয়। শোভাযাত্রাকারী স্বেচ্ছাসেবকরা ছিল অশৃঙ্খল ও অসংগঠিত, ছোট ছোট দলে বিভক্ত। পুলিশ প্রেক্ষার করতে শুরু করলে এক দল যেমন প্রেক্ষার হয়েছে, আর এক দল তখনই হরতাল প্রচারে নেমেছে। এইভাবে মোট ১৫০ জন পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক প্রেক্ষার হয়। জনতার ভিড় চারপাশে এত জমে যায় যে সমস্ত গাড়ি ঘোড়া বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্ররাও কলেজে না যেয়ে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকের খাতায় নাম লেখাচ্ছে।

ঐদিনের সংবাদপত্রে আরও প্রকাশিত হয় যে এলাহাবাদে ৬ তারিখে একই অপরাধে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও জহরলাল নেহরুও প্রেক্ষার হয়েছেন।

১১ই ডিসেম্বর তারিখে ‘বেঙ্গলী’ খুব বড় হরকে সংবাদ

প্রকাশ করেন যে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস গ্রেপ্তার হয়েছেন। ১০ই তারিখ শনিবার সকালবেলা মৌলানা আক্রাম খান, পণ্ডিত পদ্মরাজ ও ভোলানাথ বর্মণ নিজ নিজ গৃহে থাকাকালীনই গ্রেপ্তার হন। তাঁরা সবাই অসহযোগ আন্দোলনের নেতা। তাঁদের গ্রেপ্তারের সংবাদ কলকাতায় ছড়িয়ে পড়তেই খুব উত্তেজনা দেখা দেয়। কিন্তু উত্তেজনা চরমে উঠে যখন বিকাল বেলা চিত্তরঞ্জন দাস, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল গ্রেপ্তার হন। সংবাদ নিয়ে জানা যায় যে ডেপুটি পুলিশ কমিশনারদয় ম্যাকিনলি এবং কিড একদল যুরোপীয় সার্জেন্ট নিয়ে বেলা ৪-৩০মিনিটে চিত্তরঞ্জনের বাড়ি যান। চিত্তরঞ্জন তখন চা পান করছিলেন। বীরেন্দ্র শাসমল সেখানেই ছিলেন। পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে বাবার সময় মেয়েরা হলুদ্বনি দেয় ও শাঁখ বাজায় এবং সমবেত জনতা "গান্ধী মহাত্মা কি জয়" ও "দেশবন্ধু দাসের জয়" শ্লোগান দিতে থাকে।

ঐ একই দিনে স্ত্রীভাষচন্দ্রও গ্রেপ্তার হন। 'বেঙ্গলী' বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে :

Mr. Subash Chandra Bose was arrested at Forbes Mansion, Wellington Square at 7-30 p. M. and taken to Lalbazar yesterday. Mr. Bose is the Principal of the Kalikata Vidhyapit and the Secretary of the Publicity Board of the Provincial Congress Committee. It may be noted that Mr. Bose was a student of the Presidency College and having passed the B. A. examination went to England and graduated from the Cambridge University and competed for the I. C. S. He was selected but he declined to accept the appointment.

গ্রেপ্তারের সময় দেশবন্ধু জাতির উদ্দেশ্যে একটি বাণী

দেন। স্বরূপেই তিনি বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের নরনারীর কাছে এই তাঁর শেষ বাণী। তিনি বলেছিলেন বিজয় সন্মিষ্ট, দুঃখ ত্যাগের জন্ত প্রস্তুত থাকলে বিজয় করায়ত্ত হবেই। বর্তমানে চলেছে সেই দুঃখের সময়, এই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়ে গেলেই হবে জাতির নবজন্ম। সহ শক্তি সাহস ও স্বৈর্ঘ্যের সঙ্গে জাতিকে আজ তাই বেদনার ভার বহিতে হবে। আমাদের লক্ষ্য স্বরাজ ;—খণ্ডিত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্বরাজ নয়, অঙ্গ অঙ্গ করে পাবার মতো স্বরাজও নয়—পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক স্বরাজই আমাদের দাবী। ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসীর সঙ্গে আপোষ করে এ স্বরাজ পাওয়া যায় না—মডারেটদের অমুসৃত আপোষপন্থায় পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশ কোনো দিন স্বরাজ পায়নি। ছাত্রদের মনে রাখতে হবে পুণ্ডিত বিজ্ঞানী শিক্ষার শেষ কথা নয়। দেশকে মাতৃরূপে অনুভব করা ও সেই মায়ের জন্ত সর্বস্ব ত্যাগ করা—মায়ের জন্ত নিজেকে উৎসর্গ করে তাঁরই কাজ করা—এই হচ্ছে শিক্ষার সার কথা।

ইংরেজ সরকার সারাভারত জুড়ে যুবরাজ-বয়কট আন্দোলনকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী গ্রেপ্তারপর্ব শুরু করে দেয়। শুধু তাই নয়। তাদের উগ্র দমননীতি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছয় যখন দেশের লোককে শাসন করার ভার তারা সামরিক বাহিনীর ওপর ছেড়ে দেয়। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারি টহল দিয়ে ফিরতে থাকে। ৯ই ডিসেম্বর তারিখে অধ্যক্ষ হেরষ চন্দ্র মৈত্র সেনেট হাউস থেকে নিজ বাড়ি ফেরার পথে সৈন্তদের দ্বারা প্রকৃত হন প্রকাশ্য রাস্তায়—কোনো রাজনৈতিক কারণে নয়, সৈন্তদের স্বৈরা-তান্ত্রিক আচরণের কারণে।

দমন যত কঠোরই হোক জাগ্রত জাতীয় চেতনা সেদিন অবরুদ্ধ হয়নি। সারা ভারতবর্ষ গান্ধী মহাত্মার ডাকে সেদিন সাড়া দিয়েছিল। আর বাংলা দেশ যেন বহুদিন স্তব্ধ থাকার পর হঠাৎ বিপুল বেগে জেগে উঠল, কয়েকজন

অদেহত্বী বিদ্রোহীরা অসাধ্যসাধনের প্রয়াসরূপে নয়, প্রকাশ্যভাবে সংগ্রামের খোলা ময়দানে সে ছিল জনতার আগরণ। চিত্তরঞ্জন তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রগল্ভ বাণীতে অহিংসার পথে গণ-অসহযোগের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর গ্রেপ্তারের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী প্রতিটি মানুষকে “চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে সম্পূর্ণ অহিংসা রক্ষা করতে” আবেদন জানান। ১৯২১ সালের যুবরাজবরকট আন্দোলন তাই কোনমতেই সশস্ত্র বিপ্লব ছিল না, এমনকি সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতিও ছিল না—অজ্ঞান নিরীহ নাগরিকদের সম্মুখীন প্রতিবাদ জানানোর জন্য সেই আন্দোলন আহ্বান ও পরিচালনা করা হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ঘাবড়ে গেল, সেই আন্দোলনে যোগদেবার ব্যাপক প্রেরণা সারা দেশে দেখে। বাংলা দেশের কংগ্রেস সেদিন আন্দোলন পরিচালনার সর্বময় কর্তৃক দেশবন্ধুর হস্তে সমস্ত করেছিল। দেশবন্ধু ছিলেন সেদিনকার বাংলার জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে অতুলনীয় অধিনায়ক। আন্দোলনের তথা ইংরেজের সঙ্গে নিরস্ত্র সংগ্রামের উদ্বোধন ঘটালেন তিনি তাঁর পুত্র চিত্তরঞ্জনকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে। তার পরদিনই তিনি গ্রেপ্তার বরণের জন্য পাঠালেন তাঁর তিন অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মহিলাকে। তারপর গ্রেপ্তার হলেন তিনি নিজেই। এইভাবে দেশবন্ধু সেদিন বাংলা দেশের সামনে সর্বাঙ্গীন আত্মত্যাগের অনিবার্ণ শিক্ষা জাতিয়ে দিলেন। সেই অগ্নিশিখার আলোয় নিজেদের পথ চিনে নিতে বাংলার যুবকরা বিলম্ব করেনি, ভুলও করেনি। তাই দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার বরণের যেন একটা জোয়ার এসে গেল বাংলার যুবকদের মধ্যে। প্রতিদিন সংবাদপত্রে পঞ্চাশ, ষাট, একশো, দুইশো বা ততোধিক ছাত্র ও যুবকের গ্রেপ্তারের সংবাদ বেরোতে থাকল, কলেজের ছাত্ররা হরতাল করতে লাগল, এবং সরকার তাঁর প্রেসনোটে লিখলেন : “একথা

স্পষ্ট যে আন্দোলনের নেতারা সরকারের আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষমতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছেন। সরকার এই চ্যালেঞ্জের সমুচিত জবাব একটি উপায়েই দিতে পারেন। এই নেতারা এমন পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন যাতে সরকার মহিলা ও অপরিণত যুবকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বন করতে বাধ্য হন। তাঁরা এই অপরিণত যুবকদের দেশপ্রেমের ভাবাবেগকে উস্কে দিয়েছেন।” প্রেসনোটে আরও স্বীকারোক্তি ছিল : “পুলিশ কমিশনার কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় টহল দেবার জন্য মিলিটারিকে আহ্বান করেছেন।”

ফুলুয়াজির সরকারের এই দমননীতি ও কলকাতার পুলিশ ও মিলিটারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। গ্রেপ্তারের সংখ্যাও দিনে দিনে বেড়ে চলে। ১৭ই ডিসেম্বর কারান্তরালে অপসারিত দেশবন্ধুর পক্ষ হতে বাসন্তী দেবী একটি বিবৃতি প্রচার করেন। তিনি বলেন যে গত এক সপ্তাহে বাংলা দেশ যে আত্মত্যাগ বরণের উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তাতে তিনি তুষ্ট ও গর্বিত। কিন্তু সংগ্রামের এই তো মাত্র আরম্ভ, এখনো যেতে হবে বহু দূরে বহু কষ্টের ভিতর দিয়ে। কিন্তু ২৪শে ডিসেম্বর যে হরতাল প্রতিপালিত হবে তা হবে জাতীয় শোকদিবস পালনের মতো—অতএব সেদিন সকলের শিষ্টাচার সৌজন্য ও নম্রতার ভাব বজায় রাখাই কাম্য।

কলকাতায় শত শত বেচ্ছাসেবক ও নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার ও হাজতে রাজবন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রসঙ্গে লগুনে পার্লামেন্টের হাউস অফ কমন্সেও প্রশ্নোত্তর হয়েছিল, ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে। বাংলার গভর্নর লর্ড রোণাল্ডসে ১৯শে ডিসেম্বর আইন পরিষদে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি দমননীতির স্বপক্ষে, কলকাতায় মিলিটারি তলবের স্বপক্ষে ও অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি ও বক্তোক্তির অবতারণা করেছিলেন—কিন্তু যুবরাজবরকটের আন্দোলনে অসহযোগপন্থীরা কোনোপ্রকার গুণ্ডাবাজি করছে বা

লোককে হরতালে যোগদেবার জন্ত ভয় পর্বন্ত দেখাচ্ছে এ ধরনের অভিযোগ তিনিও করেননি। কিন্তু 'স্টেটসম্যান' পুনঃ পুনঃ এই কথাই প্রচার করে যে হরতাল সফল হয়েছে যেচ্ছাসেবকদের গুণ্ডাবাজি ও ভীতিপ্রদর্শনের নীতির ফলে। স্টেটসম্যানের এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। বস্তুতঃ হরতাল সফল হয়েছিল জাগ্রত জাতীয়তাবাদী চেতনা ও হরতাল সংগঠকের অসাধারণ কৃতিত্বের ফলে। সেই সংগঠক ছিলেন মুখ্যত স্বভাষচন্দ্র। হরতাল যেদিন অনুষ্ঠিত হয় সেদিন তিনি জেলে। কিন্তু তাঁর নির্মিত যেচ্ছাসেবকদের সংগঠন সক্রিয়, সতেজ ও সম্বলবদ্ধ। স্বভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম নেতৃত্বের পরিচয় সেই সময়ই দেশবাসী পায়। এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বেই তিনি ফিরে এসেছেন ইংলণ্ড হতে, ছাত্রজীবন শেষ করে। দেশবন্ধুর আস্থাভাজন হয়েছেন তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যেই—এবার এল তাঁর জীবনে দেশবাসীর আস্থাভাজন হবার পালা। লোকে জানল বাংলার অধিনায়ক

দেশবন্ধু,—কিন্তু দেশবন্ধুর নবীন উত্তরসাধকও তাঁর শিবিরে যোগদত। দেশবন্ধুর নেতৃত্বের ভিত্তি এবং তাঁর চারিত্রশক্তির উৎস যদি হয় সর্বভ্যাগ, এই তরুণ নেতা সেই সর্বভ্যাগের মন্ত্র উদঘাটন করতেই এসেছেন জাতীয় সংগ্রামের অঙ্গনে। কলকাতার মানুষ এক স্বভাষকে চিনত; সে বিদ্রোহী ছাত্র স্বভাষ। এবার কলকাতা ও বাংলার সর্বজনসমক্ষে এসে দাঁড়ালেন আর এক স্বভাষ, স্বদেশত্বতে তরুণ তাপস, সংগঠনপ্রতিভায় অদ্বিতীয়, সংগ্রামের অগ্নিদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। কিছুকাল আগে যার আই সি এস পদভ্যাগের সংবাদে দেশবাসী স্তম্ভিত হয়েছিল, এবার ইংরেজের কারাগারে অকুণ্ঠচিত্তে গমনে তাঁর জীবনের ক্রবগতি সম্পর্কে সবাই সচেতন হল। দেশবন্ধুর পাশে এই আর একটা নতুন মানুষের উদয়ে ব্রিটিশ ভাবিত, কিন্তু দেশবাসী আকৃষ্ট হল।

(ক্রমশঃ)

**সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে পুরনো,
সবচেয়ে ভাল ?**

এগুলোর কোনটাতেই আমাদের দাবী নেই।
কিন্তু আমাদের গর্ব এই যে, আমরা

আপনার ব্যাঙ্ক

আপনার শুভেচ্ছাই
আমাদের সবচেয়ে বড় মূলধন। আমাদের
সবচেয়ে বড় পুরস্কার আপনার
সন্তুষ্টি।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :

৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

আমরা
সেবার সাথে
দিই
আরও কিছু

BOB-2018
SSDD-2018

স্মৃতি চারণ

স্বধাকান্ত রায়চৌধুরী

একদিন সকালে চায়ের টেবিলে রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজ

শুধু একাদিন কেন আরও কতদিন সকালে বিকালে এণ্ড্রুজ সাহেব (সি, এফ, এণ্ড্রুজ) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাওয়া দাওয়া করেছেন। কিন্তু বিশেষ যে একদিনের স্মৃতি আমার মনে সমুদ্রল হয়ে আছে সেই স্মৃতিই গল্প বলার মতন করে বলছি।

একদিন সকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে বসে চা খেতে গিয়ে দেখি রবীন্দ্রনাথের ছোট চায়ের টেবিলের পাশে আর একটি বড় টেবিলে সাজান আছে একটি প্লেটে কয়েকটি পাকা কলা, দুটি ছোট ছোট তরমুজ আর বেশ মোটা দু' ফালি কাটা টকটকে রাঙা তরমুজ, পরিষ্কার সাদা স্ত্রাপ্কিনে ঢাকা। আর একটি প্লেটে কয়েকটি ছোট সাইজের পাকা আম, আর কয়েকটি পাকা লিচু। আর একটি প্লেটে আছে কয়েক স্লাইস টোস্ট করা রুটি, কয়েকটি সন্দেশ আর এই সঙ্গে প্রায়ই যেমন থাকতো মাখন, জ্যাম্ আর প্রয়োজনীয় কাঁটা চামচ ছুরি। ঐ বড় টেবিলের পাশেই আছে একটি শুল্ল চেরার। আর ঐ টেবিলের আশে পাশে ছদ্মিট মাঝারি সাইজের বাঁশ কাঠির মোড়া, মোড়ান্তলি ভাল স্ত্রী চামড়ার বাঁধান। রবীন্দ্রনাথের ঐ ছোট টেবিলে সাজান আছে ছুরি কাঁটা প্লেট আর সেই সঙ্গে একটি প্লেটে আছে দুটি পাকা কলা, দুটি পাকা আম আর যেমন থাকতো তেনি আছে একটি প্লেটে কিছু আখের গুড়, গজ্জলান ভিজ্জে ছোলা, দু' এক কুচি আদা।

হঠাৎ সেদিন চায়ের টেবিলে এই রকম জলযোগের আয়োজন দেখে ভাবলাম হয়তো নতুন কেউ তাঁর প্রিয়জন চা খাবেন তাই এই সব আয়োজন। তবু কৌতূহল হল জানতে কার জন্ত এই বিশেষ আয়োজন। রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করে তাঁর টেবিলের পাশে একটি মোড়ায় বসে জিজ্ঞাসা করলাম-আজ চায়ের টেবিলে এত আয়োজন কেন? তিনি বেশ রসিয়ে বললেন—বলছি কিরে এত আয়োজন। যিনি আজ খেতে আসবেন এই সব খেয়ে দেয়ে যদি কিছু বাকী থাকে তোর পাতে পড়বার মতন তাহলে বলবো তোর ভাগ্য। তাঁর কথা শেষ হতেই দেখি এণ্ড্রুজ সাহেব টিলে পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে আর ধুতি পরে এসে হাজির। হাজির হয়েই প্রায় যেমন করে থাকেন রবীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে শুভ সন্তোষ জানিয়ে ঐ বড় টেবিলের চেয়ারে বসে ইংরাজীতে যা বললেন তার মর্মার্থ হল—গুরুদেব এ কি করেছেন? এতসব কি আমি একাই খাব, না আর কেউ আসবে? রবীন্দ্রনাথ বললেন—আমার তো মনে হয় এ আয়োজন তোমার পক্ষে খুবই কম, তবু যদি তুমি খেয়ে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে স্বধাকান্ত তো রয়েছে সে তার সদ্যবহার করবে। কিন্তু ঐ দু' ফালি তরমুজ যদি তোমার সাহস থাকে খেয়ে ফেল। কিন্তু আমার পরামর্শ ঐ তরমুজ তুমি খেও না, একটু চাখতে পার। রবীন্দ্রনাথের এই কথা শেষ হতেই এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁর স্বাভাবিক প্রাণ খোলা হাসি হেসে বললেন—না, না, গুরুদেব তরমুজ খেয়ে বিপদে পড়িনি। কয়েক দিন

আগেই আমার পেটের অবস্থা একটু খারাপ ছিল। তবে এটা ঠিক যে সেবার আমার মারাত্মক অস্থির মূল কারণ তরমুজ এখানকার সকলের এই ধারণা। এগুজ সাহেব টেবিলে সাগান ভোজ্য একটার পর একটা খেতে খেতে বেশ রসিয়ে বলতে লাগলেন তাঁর এক সময়ের অস্থির কথা এবং কারণ। এগুজ সাহেব যা বললেন সবই ইংরাজীতে। যা বললেন সেটা শোনায় যেন গল্পের মতন কিন্তু ব্যাপারটা যা ঘটেছিল তার আগাগোড়াই সত্যি।—অনেক দিন আগে দিল্লী থেকে ট্রেনে শান্তিনিকেতনে ফেরবার পথে কোন একটা বড় ষ্টেশনে (যত দূর মনে পড়ে আসানসোল কিংবা বর্ধমানে) রেলের প্ল্যাটফর্মে যে সব ফেরিওয়ালারা লুচি, আলুর দম, জিলাপী, ইত্যাদি মিষ্টি আর কলা তরমুজ ইত্যাদি বিক্রি করে সেই সব ভোজ্য এগুজ সাহেব বিনা বিধায় খেয়েছেন। এগুজ সাহেব এই পর্যন্ত বলতেই রবীন্দ্রনাথ একটু মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—এই সব জিনিস কেনবার মতন পয়সা ছিল তোমার পকেটে? এগুজ সাহেব আবার প্রাণ খোলা হাসি হেসে বললেন—হু এক টাকা পকেটে ছিল কিন্তু আমাকে কিনে খেতে হয়নি। যে খাড়া ক্লাস কামরায় আমি ছিলাম সেই কামরার কয়েকজন অবাকালী ষাত্রী ষাদের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় না থাকলেও আমাকে চিনত। তারা ঐ সব খাবার কিনেছিল নিজেরা খাবে বলে, আমাকেও তারা ঐ সব খাবারের ভাগ দিল। যা দিলে তার মধ্যে অবশ্য তরমুজও ছিল, সবই খেলাম তৃপ্তিপূর্বক। আমি তৃপ্তি পূর্বক খেয়েছি দেখে তারা আমাকে লক্ষ্য করে নিজেরা বলাবলি করলে—‘সাহেব তো একদম হিন্দুস্থানী বন্ গিয়া।’ সাহেবের কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন—তুমি তো বেজায় দুঃসাহসী, তোমার পেটের অবস্থা ভাল ছিল না জেনেও ঐসব খাবার আর তরমুজ বিনা বিধায় খেয়ে ফেললে? উত্তরে সাহেব বললেন পেট ভরে খাইনি অল্প অল্পই খেয়েছিলাম। যাই হোক,

এসব খেয়েই হোক অথবা অল্প কিছু খেয়েই হোক মারাত্মক কলেরার কবলে পড়েছিলাম। আমি তো বাঁচব আশাই করিনি তবু বেঁচে গেলাম।

সেদিন কার সকালে চায়ের টেবিলে রবীন্দ্রনাথ আর এগুজের হাত্ত পরিহাসমৃদ্ধ গল্পে। আসর বেশ জমেছিল।

শুধু খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেই নয় এগুজ সাহেব সবদিক দিয়ে প্রায় আপনভোলা, অবৈষয়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। ভাল মন্দ দেশী বিদেশী খাবার যখন যা ক্ষুঁতেও স্বচ্ছন্দে খেয়ে নিতেন। পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও ছিলেন এলোমেলো। নিজের কাপড় চোপড় কত রকম কি আছে তারও হিসাব সবসময় থাকতো না। একবার, মনে নেই কোথেকে (হয়তো দিল্লীর থেকেই) এক বস্ত্রেই চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে এসেই অসহায় শিশুর মতন রবীন্দ্রনাথের পূজবধু প্রতিমা দেবীকে বললেন—আমার হটকেসটা বোধহয় দিল্লীতে যে বাড়ীতে উঠেছিলাম সেই বাড়ীতে ফেলে এসেছি। এখানে এসে আমার ঘরের বাজের চাবি খুজে পাচ্ছি না, বড়ই বিপদে পড়েছি। গুরুদেবের তো পাঞ্জাবী ইজের, অনেক আছে তা থেকে দুটো পাঞ্জাবী দুটি ইজের আপাততঃ আমাকে দাও, আজকের মতন কাজ তো চালাই। জহরী (এগুজ সাহেবের বাবুচি) দোকানে গেছে সে ফিরে এলে তাকে জিজ্ঞাসা করব তার কাছে চাবি রেখে গিয়েছিলাম কি না। প্রতিমা দেবী গুরুদেবের জামা কাপড়ের ড্রয়ার থেকে সাহেবকে দুটো পাঞ্জাবী আর দুটো ইজের আর একটা তোয়ালেও দিলেন আর আর বোধহয় দুটো কি তিনটে স্ফমালও দিলেন। সাহেবতো এই সব পেয়ে খুশী হয়ে ঐ সব জিনিস নিয়েই গুরুদেবের কাছে গিয়ে বললেন—আপনার এইসব কাপড় প্রতিমার কাছে থেকে চেয়ে নিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ একটু বিস্মিত হয়ে বললেন—আমার গায়ের মাপের ইজের পাঞ্জাবী তোমার গায়ে

মানাবে কি? এগুজ সাহেব উত্তর দিলেন আমার গায়ের পক্ষে এগুলো টিলেই হবে তাতে কিছু আসে যায় না, আমার কাজ চলে যাবে। এই বলে সাহেব ইজের পাঞ্জাবী বগলদাবা করে নিজের বাগায় চলে গেলেন। এগুজ সাহেবের অর্থের অভাব ছিল না। তাঁর নিজের খরচ খরচা বাদ দিয়ে যা কিছু থাকতো একে তাকে সাহায্য রূপে তা দিতেন। এরকম ভাবে সাহায্যরূপে টাকা দিয়ে এমনও ছ একবার হয়েছে যে পরের দিন প্রয়োজনীয় খাম পোষ্টকার্ড কেনার মত টাকা নাই। নাই তো নাই! ঐ অবস্থায় কারোর কাছে ছ চার টাকা ধার নিতেও তাঁর কোন সংকোচ ছিল না। এমনও দেখেছি যে কারোর কাছে পাঁচ টাকা ধার নিয়ে সেটা শোধ করেছো দশ টাকা দিয়ে—খেরাল থাকতো না কখন কার কাছে খুচরো কত হাওলাত নিতেন। কিন্তু টাকা শোধ দেবার বিষয়টা ভুলতেন না। যদি কেউ বলতো আপনি আমাকে বেশি টাকা ফেরত দিয়েছেন উত্তরে তিনি বলতেন—যা বেশি দিয়েছি তোমার কাছেই থাক। আবার যখন দরকার হবে চেয়ে নেব।

এই এগুজ প্রসঙ্গ শেষ করছি এমন সময় মনে পড়ে গেল আমাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কথা। এই চিঠি হয়তো, কোনো সময় অল্প কোনো প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে কোনো সাহিত্য পক্ষে ছাপা হয়েছে। ছাপা হয়েছে কি না ঠিক স্মরণ করতে পারছি না—তবু এই প্রসঙ্গে চিঠিটির অবিকল নকল নিয়ে দিলাম। কেন না চিঠিতে এগুজ

সাহেবের কথাও আছে এবং তা ফলাহার সম্বন্ধে, কাজেই চিঠিটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

চিঠিটি এই :—

ও

কল্যাণীয়েষু

আমি ছ' তিন দিনের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে যাব—অতএব ফলের ঝুড়ি বোলপুরে পাঠাস—পাবানাতই খুলে তখন খাবার চেষ্টা করব। একলা যদি না পারি দল বল আছে। রথী বৌমাও সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং দিমু। এগুজ আমার সঙ্গে আছে। অতএব হিসাব করেই পাঠাস।

আশীর্বাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই চিঠিতে তারিখ নাই এবং কোথেকে লিখেছেন তারও উল্লেখ নাই। তবু এটা বেশ মনে আছে যে তখন বৈশাখ কিম্বা জ্যৈষ্ঠ মাস এবং তিনি তখন সদল বলে কলকাতায় ছিলেন। আমি তখন গ্রীষ্মাবকাশ ভোগ করবার জন্ত দিলাম আমার মেজদার বাড়ীতে লক্ষ্মীতে। ঐ সময় ওদেশে ভাল ভাল স্বাস্থ্য আম, খরযুজ—প্রচুর পাওয়া যেত। রবীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্য অল্প মধুর আম খেতে ভালবাসতেন বলে তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম যে তাঁর জন্ত এক ঝুড়ি ফল পাঠাব। আমার সেই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি। এই চিঠিতে যাকে 'দিমু' বলা হয়েছে তিনি ৬ দিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং "রথী" রবীন্দ্রনাথের বড় পুত্র ৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতনের স্মৃতিকথা

ইংরেজি-শিক্ষক এণ্ড্রু ও রবীন্দ্রনাথ

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় (১২-১৪ বছর বয়সে) রবীন্দ্রনাথ ও এনড্রু সাহেবের (C. F. Andrews) কাছে ইংরেজি পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল।

১৯১৭-১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন “দেহলীতে” এবং এনড্রু সাহেব থাকতেন “বেণুজুড়ে”। অগরা বেণুজুড়ে ঘরের ভিতর এবং দেহলীর উপরতলায় এনড্রু সাহেবও গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথের) কাছে ক্লাশ করতাম।

এনড্রু সাহেব বাংলা জানতেন না। দু’একটা কথা অবশ্য বলতে বা বুঝতে পারতেন—কিন্তু তাকে বাংলা জানা বলা যায় না। সুতরাং পঞ্চম বর্গ বা Class VI-এ আমাদের—তিনি ইংরেজির মাধ্যমেই পড়াতেন। তিনি খুব ছোট ছোট বাক্য প্রয়োগ করতেন এবং অত্যন্ত সরল ইংরেজিতে কথা বলতেন—আমাদের বুঝতে খুব অসুবিধা হতো না। আকারে, ইনিতে এবং ভাঙা ভাঙা দু’চারটে বাংলা শব্দে তিনি আমাদের মোটামুটি বুঝিয়ে দিতেন। ইংরেজি উচ্চারণটা খুব ভাল করে শিখবার সুযোগ হতো আশ্রমের কিশোর-কিশোরীদের। কিশোরীদের সংখ্যা অবশ্য খুবই নগণ্য ছিল। যতদূর মনে আছে আমাদের সেই ক্লাসে কোনো ছাত্রী ছিল না।

এনড্রু সাহেব (বোধহয় Class VII এ) আমাদের দিয়ে Autumn Festival (‘শারদোৎসব’—ইংরেজি অনুবাদ) এর অভিনয় করিয়েছিলেন।

ইংরেজি ক্লাসে একদিন তিনি আমাদের বলেন ;

“আমি একবার গুরুদেবকে একটা গ্রীক ছন্দ শোনাই। তখনই তিনি সেই ছন্দে একটি বাংলা কবিতা লিখে ফেলেন।”

এই কথা বলেই এনড্রু সাহেব আমাদের সকলকে একেবারে অবাক করে দিয়ে আবৃত্তি করে উঠলেন :

“দুঃখের বরষায়

চক্ষের জল যেই

নামল,

বক্ষের দরজায়

বক্ষুর রথ সেই

ধামল।”

এনড্রু সাহেব যে একসঙ্গে এতটা বাংলা কবিতা আবৃত্তি করতে পারেন—তা আমাদের কল্পনার অতীত ছিল। তিনি হাতে পায়ে ভাল দিয়ে কবিতাটির (বা গানের) ঐ অংশটুকু নিচু লেগে গেলেন। অবশ্য তাঁর উচ্চারণটি তেমন প্রশংসনীয় হয় নি।

এনড্রু সাহেব আমাদের খুবই ভাল বাসতেন। গুরু গম্ভীর লোক হলেও তিনি বেশ হাসি খুশির সঙ্গেই আমাদের ক্লাশ নিতেন। মাঝে মাঝে রসিকতাও করতেন। তাঁর ক্লাসে আমরা আনন্দ পেতাম।

একেবারে খাস গল্পীগ্রাম থেকে আসা আমার মত

বালকের খাটি সাহেব দেখা—আবার তাঁর কাছে ইংরেজি শেখা এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

এবার রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ক্লাসের কথা বলি।

তাঁর পড়াবার পদ্ধতি এমনই সরস ছিল যে, যে-সব ছাত্রেরা ক্লাশ ফাঁকি দিতে ওস্তাদ, তারাও তাঁর ক্লাশে নিয়মিত আসতো। অনেক সময় আগে ঠাগে আসতো। তিনি ক্লাশ নিচ্ছেন না গল্প বলছেন না আমাদের সঙ্গে খেলা করছেন—বুঝবার উপায় ছিল না। ক্লাশের খণ্টা যে কোথা দিয়ে কখন শেষ হয়ে যেতো—তা জানতেও পারতাম না।

পরের খণ্টায় ক্লাশ না থাকলে আমরা তাঁর পরবর্তী ক্লাশেও বসে থাকতাম।

রবীন্দ্রনাথ পরে উত্তরায়ণে উঠে যান। উত্তরায়ণে প্রথমে দুটি খণ্ডে ছাওয়া মাটির বাড়ী তৈরী হয়। একটি গুরুদেবের জন্ম অষ্টটি এমডব্লুজ সাহেবের জন্মে।

উত্তরায়ণে বাসকালীন গুরুদেব ক্লাশ নিতেন পুরাণো খণ্টা ওলার এবং বর্তমান সন্তোষালয়ের (শিশু বিভাগের) মধ্যবর্তী স্থানে। সেখানে একটি “উটজ” নির্গিত হয় তাঁর ক্লাসের জন্মে। কয়েকটি খুঁটির উপর একটি গোলাকৃতি চালা। গোলাকৃতি অনতি-উচ্চ মাটির বেদীর তিনদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা বসতো—গুরুদেব বসতেন মাঝখানে। স্কুল কলেজ দুই-এরই ক্লাস রবীন্দ্রনাথ এখানে নিয়েছেন।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্গে (Class VI, VII, VIII), তিনি আমাদের “প্যাণ্ডোরার কাহিনী” “আন্টিয়াশ, হারকিউলিস ও বামনদের গল্প,” ম্যাথিউ আর্নল্ড, এর “সোরাব-রোস্তাম” এবং “রাসকিন” (Ruskin) এর কিছু অংশ পড়ান।

আমার স্পষ্ট মনে আছে তৃতীয় বর্গে (Class VIII-এ), তিনি ঐ “সোরাব-রোস্তাম” কাব্য কেমন করে পড়িয়েছিলেন। তাঁর সেই পড়ানোর বিবরণ এখানে দিই :

“সোরাব-রোস্তাম” কাব্যে ব্যবহৃত বাক্যের অমূরূপ

বাক্য তিনি তাঁর খাতাতে লিখেছিলেন। আবার সেই বাক্যের অমূরূপ অপেক্ষাকৃত সহজ বাক্যও তাঁর সেই খাতায় লেখা ছিল। এইভাবে চারদফা, ছয় দফা, কখনো কখনো আট দশ দফা, সহজ, সহজতর, এবং সহজতম বাক্যগুচ্ছ তিনি রচনা করতেন। ইংরেজি বাক্য এবং তার বিস্তৃত বাংলা প্রতিবাক্য।

প্রথমে সর্বশেষ দফার সহজতম ইংরেজি বাক্যে তিনি আমাদের খাতায় লেখাতেন। আমাদের তাঁর বাংলা অমুবাদ করতে হতো। সকলের বাংলা অমুবাদ করা হয়ে গেলে—তিনি তাঁর নিজের করা বাংলা অমুবাদটি আমাদের শোনাতেন এবং তাও আমাদের খাতায় লিখে নিতে বলতেন। আমাদের নিজের করা বাংলা বাক্যটির সঙ্গে, তাঁর তৈরি বাংলা বাক্যটি মিলিয়ে দেখতে বলতেন।

এরপর খাতা বন্ধ করিয়ে, মুখে মুখে ঐ বাংলা বাক্যটির ইংরেজি অমুবাদ করাতেন। শেষে, যে যার ইংরেজি অমুবাদ খাতার অপর পৃষ্ঠায় লিখতো। তিনি তা সংশোধন করে দিতেন।

এরপর “প্রথমে খাতায় লেখা” তাঁর সেই ইংরেজি বাক্যটির সঙ্গে আমাদের নিজের করা ইংরেজি অমুবাদ মিলিয়ে, উভয় ইংরেজি অমুবাদের দোষগুণ বিচার করতে হতো। আমাদের বাক্যের দোষ এবং তাঁর বাক্যের গুণ—আমরা একবাক্যে স্বীকার করতাম।

এইভাবে মাসাধিক ধরে তিন চার থেকে আট দশ দফা ইংরেজি ও বাংলা বাক্যের রচনা, আলোচনা এবং তুলনা করতে করতে, যখন আমাদের বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ ধার এবং বিছাতে কিঞ্চিৎ ভার হতো, তখন “সোরাব-রোস্তাম” কাব্যটির তাঁর রুত প্রাঞ্জল গদ্যরূপ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করতেন। তারপরে পঞ্চদশী মূল “সোরাব-রোস্তাম” গ্রন্থখানি আমাদের সামনে ধরতেন।

অতঃপর সেই কাব্যখানি আমাদের কাছে আর “পাণিনি

ব্যাকরণের” মত ভয়ংকর লাগতো না। তার রসগ্রহণ তখন কঠিন হতো না।

“আশ্রমের রূপ ও বিকাশে” কবি লিখেছেন :

“সবশেষে বলব, আমি যেটাকে সবচেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সবচেয়ে ছুঁত। তাঁরই শিক্ষক হবার যোগ্য ধারা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্নেহ যাদের স্বাভাবিক।”

তাঁর এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে চরিতার্থ দেখেছি—তাঁর নিজের মধ্যে। ২

সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত তাঁকে ক্লাশ নিতে দেখেছি। ছুপুরে তিনি সেই পাঠ তৈরী করতেন। এর জন্তে তাঁকে যথেষ্ট চিন্তা করতে হতো। সন্ধ্যাবেলায় “বিনোদন

পর্বে” তিনি প্রায়ই ছাত্রাবাসে আসতেন। ছেলেদের দিয়ে অভিনয় করাতেন। রাত নটার সময় তিনি পালা করে এক এক ঘরে গল্প বলতেন। রাতে ছেলেরা শুয়ে পড়লে ঘুরে ঘুরে দেখতেন—মশারী খাটানো হয়েছে কিনা—জানালাগুলো খোলা আছে কিনা। শীতকালেও জানালা বন্ধ করা চলতো না। শুধু জানালা কেন দরজাগুলোও খোলা থাকতো। আশ্চর্যের বিষয় ছেলেদের যাবতীয় জিনিষপত্র, বাজপেটারী এ খোলা ঘরেই থাকতো—কখনো খোয়া যেতো না।

এখন একথা কল্পনা করা যায় না।

১. “সোরাব-রোস্তাম (Sohrab and Rustum)”

blank verse এর চিত্র :

“And the first grey of morning filled the east
And the fog rose out of Oxus stream,
But the Tartar camp along the stream
Was hush'd, and still the men were plunged'
in sleep ;
Sohrab alone, he slept not : all night long
He had lain wakefull, tossing on his bed :

উপরোক্ত বাক্যগুলি হতে “grey” “fill” “out of” “along” “hush” “plunge” “lie wakeful” “toss on” এই শব্দ, ক্রিয়া, preposition ইত্যাদি ব্যবহার করে। ছাত্রদের পরিচিত এবং কৌতুকজনক বিষয় অবলম্বনে তিনি বাক্য তৈরী করতেন।

এইভাবে মূল্যের একটি বাক্যের জন্ত, কোথাও বা ৩৪টি,

কোথাও বা ৫৬টি কোথাও বা ৭৮টি বাক্য তাঁকে তৈরী করতে হয়েছে।

“পান্ডোরার পেটরার কাহিনী (Pandora's Box)” আন্টিয়াস (Antaes) হারকিউলিস (Hercules) ও বামনদের (Pygmies) গল্পেও তিনি এইরূপ মূল্যের একটি মাত্র বাক্যের জন্ত চার থেকে দশদফা পর্যন্ত অমূল্য বাক্য তৈরী করেছিলেন।

বড়ই পরিতাপের কথা, রবীন্দ্রনাথের সেকালের (১৯১৭-১৯) সেই মূল খাতাটি আজ পাওয়া যায় না। বহুকাল পরে তাঁকে অমরোধ করায়, তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে ঐ বাক্যগুলি ষথাসম্ভব উদ্ধার করবার চেষ্টা করেন।

পরবর্তী একটি খাতায়, এই উদ্ধার করা (সংক্ষিপ্ত) বাক্যগুলো (বিচিড়ায়) রক্ষিত আছে।

২। প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৬৮ ; পৃ ২৯৩-৫।

রবীন্দ্রনাথ : শান্তশীল দাশ

কত না আঁধার-ঘেরা জীবনের পথ,
এদিকে ওদিকে কালো ঘন মণীমাথা,
আর সেই পথে পথে অজস্র কাঁটার
যন্ত্রণা : সে-পথে নেই সাফল্য কোথাও।

সে-পথে অনেক ঝড়ী। তবু কই কারো
মাথে নেই এতটুকু বন্ধন কোথাও :
গম্ভীরাধা ছোট ছোট জীবন রচনা
করে তারা স্বপ্নী! আমি আর্ন্ত বেদনায়।

আলোকের স্পর্শ চাই। ভূমার প্রসাদ
চাই এই ভূমিতেই। আমার সমস্ত
যন্ত্রণা সফল করে কে দেবে আমার
সেই দিব্য আলোকের নির্ভয় আশ্বাস?

আমি চলি। রক্ত ঝরে ক্লান্ত ছুটি পায় :
নৈরাশ্রের আর্ন্তনাদ চারিদিক ঘিরে।
মনে হয় অর্থহীন অকারণ চলা—
তবু চলি আমি সেই যন্ত্রণার পথে।

সেই পথে অন্ধকার কাঁটার-ছড়ানো
এখনো তোমাকে দেখি, জ্যোতির্ময় রূপ।
কণ্ঠে জীবনের গান, শুনি কান ভরে,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই' এই বাণী।

ক্লান্ত রিক্ত জীবনের পথে বার বার
আল ভূমি, শুনি মন্ত্র 'অশোক অভয়',
এই ঘন অন্ধকার রাজি শেষ হবে,
এ আশ্বাস সেই মন্ত্রে—হে গুরু প্রণাম।

আর কেউ : নবীন ঘটক

বীণার একটি তার, যে তারে ঘুমিয়েছিল মন
সে তার কতো যে ঘুগ পড়েছিল অব্যবহারে,
আশে পাশে আরো তারে বেজে গেছে রণন ঝলন
প্রলাপের আতিশয্যে, উল্লাসের উদ্দাম বিকারে।

অনাদৃত সে তারটি ভুলে ছিল বিদ্রোহ চেতন ;
আবিল চোখের পাতে সর্কোতুকে নেচে গেছে কত
প্রতিবিম্ব প্রতিচ্ছায়া কুতূহলী প্রেতের মতন
তবু মন সেই তারে নিজেই খুঁজেছে অবিরত।

ভুলে যাওয়া গুলোমাথা কলঙ্কিত সেই তারে আজ
দিনশেষে কে বুলোলো চাঁপাকলি আঙ্গুলের তুলি,
মানিম পুরোনো ছবি ফিরে পরে নবতর সাজ
হরে হরে রেঙে ওঠে গত জীবনের দিনগুলি।
মন বলে, এ জন্মেরও আগে তুমি হয়ত বা ছিলে
সে কি জানে আর কেউ কোনো দিন ছিল না নিখিলে?

কাজ ফুরালে : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বৃকের মধ্যে মাণিক জ্বলে
মাণিক জ্বলে রে,
তার আলোকে দগ্ধ হবি, হবি রে উন্মাদ—
দে ছুড়ে ঐ বৃকের মণি ফলবসানো সুধার পাতালে।

পাতাল জুড়ে আলোর সভা
আঁধারে তুই শান্ত বসে থাক,
সভার মৌমাছির বৃকের কারুকার্যে গড়ুক মৌচাক
তোর কাজ নেই, ঘুম-কে বৃকে নে।

২৭ চৈত্র, ১৩৭৩

সে : গোপাল ভৌমিক

কার কাছে কি যে বলে
সে কি ছাই নিজেও তা জানে ?
ভাবে সে সকলে বোকা
অথবা সে নিজে ছোট কালে ।

দেঁতো হাসি হাসে যত
হাত মুখ নাড়ে চতুর্গ
কথার তীরেরা ছোট
যতক্ষণ ভরা থাকে তুণ ।

সময় বাঁচাতে চেয়ে
যা বলে সে সকলেই শোনে
চোখের বাহিরে গেলে
সকলে হরির নাম গোণে ।

আমি তাকে ভালবাসি
তাই বার বার ওকে বলি,
স্বতো ছাড়া হয়ে গেলে
খুলে নাও কথার ডকলি ।

বকাঝকা অর্ধহীন
প্রকোপায় শুধু উপদেশ
দেখি ও কাটিয়ে গেল
কথার দালালি করে বেশ ।

শুনি কি শুনি না তাতে
বড় বেশি আসে বা যায় না
খুলি সে নিজেকে দেখে
হাতে ধরে কথার আয়না ।

যদি কমা করো : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কমা করো যদি, বাঁতাসে তাহলে
মন্দিরা বাজে, বৃষ্টি বাদলে ।

এগিয়ে যাওয়াই স্বতঃস্ফূর্ত,
একটি কিশোর বাজার তুর্বা ।

স্বঃখই সেই অলম্ববৃত্ত,
ক্রম মুকুলের বাতাবৃত্ত ।

দৃঢ় পিনঙ্গ একটি পাহাড়
জেগে আছে, নদী তানপুরা তার ।

সারাটা আকাশ গম্ গম্ করে
রম্যবীণার অনাড়ম্বরে ।

আর যদি নামো আরকু কাজে,
কিছু না বাজুক, একতারা বাজে ।

অমীমাংসিত কুরুপাণ্ডব,
বেলে ওঠে তবু পটহ পণব—

সবি থেকে যায় অমীমাংসিত
মাদল বাজালে তবুও বাধিত

হতে পারি, শোনো, আমি যা-ই বলি,
তুমি অন্তত বাজিরো মুরলি ।

ভুল বোঝা ভালবাসারই অঙ্গ,
বাজে মৃদল, বাজে মৃদল ॥

আমার একটি কথা দাঁও : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাকে একটি কথা দাঁও, ঐ ঝল ভারনত যেন যেমন গাছের লক্ষ করপুটে,
সিস্ত ও সবুজ সমতাময় লাগণ্য রেখে যায়, যেমন রাত্রির দু-টি হাত
ভরে ওঠে শেষ চন্দ্রকলার অজস্র তীব্র ভাংপর্বে, যেমন
শুভ্র দ্বিপ্রহর ভরে স্বপ্ন ফলের মতো স্থতির বেলুন উড়ে আসে

যেদিন নৌকোর শ্রোত কেবল পিছিয়ে গিয়েছিল আর অতিকায় পালে
ভীষণ অজানা সব সাম্রাজ্যের হৃদিশ উৎকীর্ণ হয়ে উঠেছিল অকাতরে,
যেদিন বিকেলবেলা জনতার মধ্যে থেকে হঠাৎ দেহাতী বিরলতা :
কাঁচা হলুদের বর্ণ—ঘুলোয় জড়িয়ে জেগে উঠেছিল,
যেদিন নিষ্কল সব দুঃশাসার বর্ণাঢ্য ফতোয়া
তোমার বাড়ির ছাদে অমীমাংসিতের মতো ঝুলে ছিল

আমি শুধু একটি শব্দের জন্তে কুলুদি—দেবীপ্রসাদ—
বিছনার সমস্ত ভাঁজ হাতড়ে শেষে তোলপাড় করতে চেয়েছিলাম তোমার
দেহের সমস্ত রেখা—যদি কেউ একটি অক্ষর
খুঁজে দিতে পারে : সেই জীবনে জড়ানো না পাওয়ার
পিছনে পিছনে ছুটে রাজধানী-নগর সব অক্লেশে পেরিয়ে যায় তবু
নৌকোর অমুখে দোলে তোমার বেণীর আলোছায়া ।

সরে বাও

সরে বাও আমার চোখের সামনে থেকে : অতিপ্রাকৃত দু-ফালা তরমুজের মতো
অন্ত্যবামিনীর
অপক্কপা অন্দরী নিয়তি । হিম বিন্দু পায়ের নীচে ঝিখে যায়, প্রস্রবিত বৃকে
সময়ের পেঙুলায় শব্দ করে বাজে—সরে বাও,
দু-চোখের মৃত আঙনের দীর্ঘ হতাশা রাত্রির নীলিমায়
কীর্ণ হয়ে পড়ে—আর মগজের ক্লান্ত ভ্রায় দু-হাতে সরিয়ে নেমে আসে
বিবাস যক্ষিণী । সরে, চোখ-বৃক-হৃদয়-মস্তিষ্ক-নীল বামিনী—আমার পথছাড়া,
আমায় আমার থেকে অন্তত বেরিয়ে যেতে দাঁও ।

আরেক জনের কথাবার্তা : মানস রায়চৌধুরী

হাতে অনবরতই লাগছে রক্তের উষ্ণতা, তুমি আমাকে আড়ালে নিয়ে চলো

লোক চলাচল, ভিড়, পতন ও অত্যাশঙ্কিত ট্রাফিক সিগনালে

আমার দায়িত্ববোধ ক্রমে তুমি বাড়িতে চাইছে।

হয় তুমি চলো আরেক জনের দিকে, তোমার আড়ালে কিংবা

আমাকেই সরে যেতে দাও।

কথায় কথায় মুখে সমুদ্রের ফেনা, দাঁতে নিরস্ত্র লবণ

তোমার চুপন ও এক প্রহসনে আমার শরীর ছুঁয়ে থাকে

তাই তো আড়ালে যেতে চাই মুখোমুখি-ভ্যাগ ও তিতিক্ষা দিয়ে

পাথরের ক্রূশে খুঁজি আমাদের স্বপ্নের নষ্ট উচ্চাশাকে।

অথবা বালির নীচে নেমে যাই

নেমে যাই বৃষ্টির ফোটার মতো

অগ্নেয় মাটির অন্ধ উদাসীন হৃদয় গহ্বরে....

হাতে অনবরতই লাগছে যমস্ব, রক্তের চাপ

কোথায় আড়ালে তুমি নিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে চলো

শর্তহীনতায় আর আরেক জনের অভিমুখ।

তুমি বৃষ্টিবিহীন : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

একঘণ্টা বিহ্বলিত ব্যাধায় -

সমস্ত আকাশ জুড়ে ছুঁইনাচ ক'রে

ভারপরে, বৃষ্টি এলো না।

টবের নয়নভারী ফুটে উঠবে, কেউ বলেছিলো,

কেউ বলেছিলো, বেলফুল ;

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ছিলো শতেক শব্দী

নবহুর্বাদল-মেঘ আসে কি না আসে—

একঘণ্টা-বিহ্বলিত ব্যাধায়

সমস্ত আকাশ নিম্নে তোলপাড় ক'রে

ভারপরে, বৃষ্টি এলো না ॥

আমরা আজ : নটিকেতা ভরখাল

আমরা আজ সকলেই ভয়াবহ অস্বাভাবিকতার
অন্ধ উপাসনা-মত্ত । বিকৃত মুখোশে পরিবৃত
চারিদিক, দেশ-কাল পাত্রের রচনা
আজ ভ্রার চোখেই পড়ে না । আজ জীবনযাত্রার
বড় কোনো অর্থ নেই । অথচ এখনো অপরিচিত
মুখোশের অন্তরালে কণ্ঠস্বরে আহত যন্ত্রণা
গুনতে পারি । এরপরে তাও পারব না ।

কবি-শিল্পী-কর্মী-নেতা-সাধারণ মানুষেরা সকলেরই মুখে
মুখোশের সমারোহ, অসহায় বিকৃত স্বভাবে সমপিত
সকলেই । অথচ কী সঙ্কল্প অন্তর্নিহিত
চিন্তাগুলি, বহু বিষ সকলেরই বুকে
জমা হয়ে আছে—কেউ ফেলতে পারছে না ।
হাত পেতে নিতেছে যে সকলেই পরকীয়া দেনা ।

কুমারী নারীর বুকে আজ আর বিগুহ্ণ ভালবাসা নেই,
জননীর বুকে আর স্নেহ নেই, অঞ্জনের নেই শেষ সহানুভূতির
ক্লীণ আলো । বড় মানুষের আজ ভীষণ অভাব ।
কফি হাউসে, রেস্টোরাঁয়, বারে আজ ভয়ানক ভিড়,
উন্নাসিক লেখকের কলমে শুধু অক্ষম বিকৃতি,
পানোন্মত্ত জলসায়—সাহিত্যের বারবনিতার
বহু ব্যবহৃত রিস্ত অলঙ্কার । অর্থহীন উদ্গাদ প্রলাপ
কবিদের ক্লীণ কণ্ঠে । আজ শুধু চারিদিকে হুলভ বিবৃতি ।
কারো কণ্ঠে আজ আর যাকে-ডাকা সহজ ভাষার
উচ্চারণ নেই, আমরা ভুলে গেছি শিষ্ট ব্যবহার ।

সোনার হরিণ ছুটছে । আমরাও পিছনে পিছনে

অবিরাম ছুটে চলছি, ছদ্মবেশী আহত যুগের
রক্তাক্ত খুরের দাগ, দ্রুতকণ্ঠ । তবুও কী পশ্চাৎ ধাবন ।
নিশি-পাওয়া মানুষের মত আমরা অশেষা তৎপর
সকলেই । অথচ কী চাই আমরা—কোন জীবনের
কতটুকু আলোকিত সমন্বয়, জানি না । এ প্রতীকী মরণ
কেন তবে হল আমাদের ?

চিন্তে পারিনি : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

দূর থেকে মনে হয়েছিল
সামান্য পাহাড় ;
কিন্তু কাছে যেতে না যেতেই
এক স্বর্ণা শিশুর মতো
লাফিয়ে আলিঙ্গনের মধ্যে
এসে সারাশরীর ভিঙিয়ে দিল, বৃষ্টি
দূর থেকেই আমার সহরশরীরে
জমে ওঠা ধুলোর গেরুয়া
দেখতে পেয়েছিল । আমার
চোখের নিচেও বোধজাগরণের কালো
দাগ,—কর্ণা, তুমি তো আমার
ধুলোর গেরুয়া দেখে আমাকে সন্মাসী
বলে ভুল করেনি ? চোখের
কালো তো ভাবোনি তপস্তার
সংযতচিন্তের অভিধান ।

ভালবাসাও একদা ঠিক

এরকম ভুল করে তার
কবিতার প্রথম ঘোঁষন দিয়েছিলো,
আমি তার শরীরের শিশুকে ভখন
উচ্চভাবিজ্ঞানী পাথরভেজানো জল বলে চিনতে পারিনি ।

ইচ্ছা হয় তোমাকে নিয়ে : কক্ষ ধর

ইচ্ছা হয় সারাবেলা তোমাকে নিয়ে
এই রৌদ্রের ভিতরে ঘুরি
ঘুরে ঘুরে আবার ক্লাস্ত হয়ে তোমার কাছে কিরে আসি।
ইচ্ছা হয় এই বুলায় বসে তোমার সঙ্গে থেলা করি।
আমি আর মৃগনাভি খুঁজতে চাইনা।

কাল একইটু বুলা নিয়ে গিয়েছিলুম সভায়
তোমাকে দেখবো বলে
মঞ্চ থেকে অনেক দূরে বসেছিলুম
একটি রূপবতী কক্ষচূড়ার ছায়ায়
তার সারা দেহে কী অজস্র আগুনের মতো ফুল।
তখনও তোমার কথাই মনে পড়ছিল
সারা ছপূর তুমি নিরুদ্দেশ
আমি রৌদ্রের ভিতর ঘুরে ঘুরে
ক্লাস্ত হয়ে
আর তোমার কাছে যেতে পারলুম না।

বাড়ি ফেরার পথে আকাশের দিকে তাকিয়ে
মন কেমন করে উঠল
তোমার চোখের মতো আনত মেঘমালা
তখনি বৃষ্টি নামবে
আমি জানি সেই অবিরল জল ধারায়
কেবলি তোমার কান্নার কথা আমার মনে পড়বে।

এই পর্যন্তই থাক : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
এই পর্যন্তই থাক।

এর বেশি হয়ত তোমার আগার শক্তি নেই,
এর বেশি হয়ত তুমি আগতে চাও না।
কিন্তু আমার যে
এখনও অনেকটা যেতে হবে।
কি? কোথায়? কিছুই আমাকে শুধিও না।
এই পর্যন্তই থাক।

অথচ এই পথটা শেষ হবার আগে
মনে হয়েছিল
পথটার মত তুমি কোনদিন ফুরোবে না,
পথের পাশের ছায়াফেলা বৃক্ষবীথির মত
তুমি অচঞ্চল হয়েও
আমায় ছায়া দিয়ে দিয়ে নিয়ে চলবে।
কিন্তু সে সব কথায় কি হবে?
এই পর্যন্তই থাক।

এরপরে কিন্তু আর পথ নেই—
হৃদয়ের মত
দিগন্তজোড়া নিবিড় অরণ্য
আর উন্মুক্ত প্রান্তর পড়ে আছে।
হারালেও সেখানে আমাকে হাটতে হবে,
রোদে পুড়লেও
নিজের পোড়া হাতটা মেলে ছায়া ধরতে হবে।
শুধু তার মাঝখানে
অসমাপ্ত একটু পথ আর কণ্ঠস্বারী একটু ছায়া যদি পাই
সেদিন নিঃশব্দে বলব
আজ এই পর্যন্তই থাক।

সমীক্ষা : শোবিন মুখোপাধ্যায়

১. কৌতূহলে ভিড় করে আসছে যারা তারা থাক
কিছুটা আচ্ছন্ন চেতনায়।
তাদের বৃকের ক্ষুধা, তাদের মনের তৃষ্ণা, তাদের অবাক
চোখ দেখে হয়তো চেনা দায়।

তবু ওরা রেগে আছে, মনে হয়, রাগের উত্তাপে
সবকিছু তছনছ করবে, ফুলদানী, চেয়ার
টেবিল চুরমার করবে, আবেগের খাপে
জলতে থাকবে সেকালের তীক্ষ্ণ তলোয়ার।

কেউবা মিরিয়ে গিয়ে মার খাবে, সিগারেট শাবাড়
করবে, ঠাণ্ডা কফি খাবে, পয়সা থাকলে কয়েকটা পেগ
টেনে, ভোফা মগজেই খুঁজবে সে আবেগ—
যা-দিয়ে অন্তত কিছু করা যায়, কিছু করা যায়।

যারা ভিড়কে ভয় করে, ভিড়কে এড়ায়,
তারা যদি আড়ালে আবড়ালে থাকে, থাক ;
আর যারা ভাবতে ভাবতে এখন নির্বাক
তারা থাকবে পথে বা পথের প্রান্তে হয়তো নিরুপায়।

২. ক্যানভাসটা বড়ো করো, বিষয় ক্যানভাস-এ
অনেক হাতের তুলি রক্তাক্ত আঁচড় তুলবে, আর
প্রত্যেকে নিজের চিত্রে কালের ধর্মকে উপেক্ষার
দৃষ্টিতে দেখেই হাসি হাসবে উপহাসে।

৩. আমরা কি এগিয়ে বাছি যুগবদ্ধতায়
প্রতিদিন ? নাকি আমরা পিছু হটছি ? প্রাণান্ত চেষ্টায়

কেউ আজ আর একা থাকতে পারে ? কেউ
একক চেষ্টায় আর ঝুঞ্জেতে পারে সময়ের ডেউ ?
পোষা পাখীদের ঠোটে কখনো পৃথক
স্বর শোনা যেতে পারে হাওয়ার বদলে, কিংবা ভয়েই
নিছক।

রোদের আড়িনা থেকে বোধের দরজার
কেউ এসে মাথা ঠোকে, কেউ আবার পিছু হটতে চায়।

পত্রহীম : মণিভূষণ ভট্টাচার্য

ঈশ্বরের সূত্র্য হোলো গতকাল রক্তাক্ত সন্ধ্যায়।
ঈশ্বর এ বিট-এ রোজ চিঠি বিলি করত, বাড়ি ফিরে
সবুজ টেবিল থেকে চিঠিগুলো তুলে নিতে নিতে
বন্ধুদের কথা ভেবে ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিতাম।
নতুন পিওন এসে, ভয় হয়, কিছুদিন খুব
চিঠির গোলমাল করবে, আমার নামের আরেক জন
এ পাড়ায় থাকে, অথচ আমরা ভিন্ন লোক ;
নতুন পিওন, কিন্তু, কিছুদিন সেকথা বুঝবে না

গতকাল মাররাতে ঝনঝন কড়া ন'ড়ে ওঠে।
আলোর স্রোতের মধ্যে ঘুম চোখে দরজা খুলে শুনি—
'চিঠি নেই' ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে ঝুঁকে ঝুঁজো হয়ে
'আজ কিছু নেই' বলে একটু হাসে। 'তবে ডাকলে কেন ?'
মাররাতে কেন ভূমি, অপদার্থ, ঘুম নষ্ট করলে ?
'এমনই হঠাৎ হোলো, এমনই হঠাৎ কেন আমি....'
মারপথে থেমে গিয়ে অপরাধী অন্তরিকে গেল,
দরজা বন্ধ করে বেশি ঘুমের সমুদ্র নিভে গেছে।

সবুজ : বিজয়কুমার দত্ত
কোনদিন কি সবুজ হবার নেশা রক্তে ভরেছিল ?
সতেজ সবুজ চিহ্ন—গাছে গাছে রঙীন পাতায়
অশ্রু যৌবন দীপ্ত উজ্জ্বল ঘন কোলাহল
লোকালয়ে, পথের দুইদিক ভীড়ে, সমাজে সংসারে
কেন যে সবুজ আলো বুকের চৌরাস্তা জুড়ে
জলে উঠতে চেয়েছিল তীব্র এতকাল !
কচুরি পানির মত ভাগতে ভাগতে মনে পড়ে সব ।

সবাই স্বচ্ছন্দে যায় যাড়িয়ে যে বাস—
তাও জানি আশ্চর্য সবুজ । যেমন সবুজ
শ্রাওলা কচুরিপানা, দলিত পাতার
সমূহ ভীড়ের সমারোহ । তারই মধ্যে মরে মরে বাঁচা
কিংবা বেঁচে থেকে মরা, সবই সেই যৌবন প্রতীক ।

সবুজ হবার নেশায় দুইদিক আবেগে
গেঁথে রাখতে চেয়েছিল কেন যে জীবন
স্বপ্ন কাপেট জুড়ে প্রণয়ের লক্ষ্যভেদে অজান্তে নারীর
রমণীয় সূচীশিল্পে ? সৌরবর্ণালীর, সবুজ তরঙ্গ ভলে
ইধারে নীলিমা শূন্যে ভাগতে ভাগতে মনে পড়ে সব ।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ ভিসা অফিসের সামনে

বাংলা দেশ আজ ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক অর্থে বিভক্ত ;
কিন্তু তাই বলে উভয় রাজ্যের মানুষ গুলির বুকের মধ্য
খানটাও কি আজ ভাগ হয়ে গেছে ? আজ থেকে এক যুগ
আগে ভিসা অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে কবি বীরেন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় এ প্রশ্ন রেখেছিলেন । ইতিমধ্যে উভয় দেশের
মধ্যে দিয়ে দাঙ্গা এবং যুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে ; যা ঘটনার
দিক থেকে অধিকতর গম্ভীর । কিন্তু এইসব ঘটনার মধ্য
দিয়ে কবি তাঁর প্রশ্নের একটি স্পষ্ট উত্তরও আজ পেয়ে
গেছেন ; তা হ'লো, বাংলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ
উভয় বাংলার মধ্যে কামনা করে শত্রুতা নয়, বরং উভয়ের
বুকের মধ্য থেকে উঠে আসা একটিই রঙের অধিকার মনুষ্যত্ব ।

উচ্চারণ, ২১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ভিয়েতনাম

ডঃ অশোক মজুমদার

[চৈত্রের পর]

জেনিভা চুক্তির একটি সর্ত অনুসারে কোন পক্ষই বাহির হইতে অস্ত্র আমদানি করিতে বা সৈন্য সংখ্যা বাড়াইতে পারিত না। International Control Commission-এর (চারত, কানাডা পোলাণ্ড,) উপস্থিতিতে প্রকাশভাবে আমেরিকার Military Assistance Advisory Group, U. S. Operations Mission, অথবা C. I. A -র চরদের প্রকাশ কাজ করাও অসম্ভব হইয়া উঠিল। অতরাং পরোক্ষে এই কাজটি করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

পৃথিবীর ইতিহাসে বিশ্ববিজ্ঞালয়ের শিক্ষকগণ ব্যাপকভাবে গোয়েন্দাগিরি করিয়াছেন বলিয়া ইতিপূর্বে জানা যায় না; এইবার যুক্তরাষ্ট্রে তাহাও দেখা গেল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে মিচিগান বিশ্ববিজ্ঞালয়ের একজন শিক্ষক, ওয়েগলি ফিলেল, দিয়েমকে যুক্তরাষ্ট্রে লইয়া আসেন। তাহাকে এইবার (১৯৫৪) ভিয়েতনামে "adviser on government organisation" করিয়া পাঠান হইল। যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি নিক্সনের (Vice-President Nixon) অমুরোধে মিচিগান বিশ্ববিজ্ঞালয় ৫৪ জন প্রফেসর ভিয়েতনামে পাঠাইলেন, তাহাদের সহকারী হইল ২০০ জন ভিয়েতনামী।

দিয়েমকে জনগণ বিশেষ সমর্থন করিত না, বিশেষতঃ তাঁহার সাম্প্রদায়িক নীতিতে তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা হারাইয়া

ফেলিয়াছিলেন। অতরাং দেশশাসনের ক্ষমতা হ্রাস পুশি বাহিনীর প্রয়োজন। এই পুশি বাহিনী প্রস্তুত করিতে মিচিগান রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিজ্ঞালয়ের পুশি Administration স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ভূতপূর্ব মিলিটারী পুশিশের কর্ণেল Art Brandstatterকে পাঠান হইল। আমেরিকান প্রফেসরেরা Military Assistance Advisory Group-এর নিকট হইতে গুলি ও বন্দুক সংগ্রহ করিয়া দিয়েমের প্রাণীদের প্রহরীদের অসজ্জিত সৈন্যদলে পরিণত করিল।

ফরাসী থাকা কালীন বাও দাই Bin Xuyen নামে একটি দলের হাতে পুশিশের ক্ষমতা সমর্পণ করেন। তিনি ও ফরাসীরা কেন এই কাজ করেন, তাহা বর্তমান প্রবন্ধ লেখক অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারে নাই। আমেরিকান লেখকদের মতে Bin Xuyen আসলে একটি দস্যুদল। বাহাই হউক ইহারা দিয়েমকে সমর্থন করিত না, এবং সৈন্য বাহিনীও সম্পূর্ণভাবে দিয়েমকে সমর্থন করিত না। যুক্তরাষ্ট্রের দূত বোষণা করিলেন যে যে সকল সৈন্য দিয়েমের সমর্থক আমেরিকানরা কেবল তাহাদেরই বেতন দিবে। এই উপায় গ্রহণ করাতে দরিদ্র দেশে শীঘ্রই দিয়েম সৈন্যদলের আয়ুগত্য লাভ করিলেন ও তাহাদের সাহায্যে বিপক্ষবাদী Bin Xuyenদের ধ্বংস করিলেন (এপ্রিল ১৯৫৫)।

বিন জুয়েন'গ (Binh Xuyen) গেল, এখন পুশি

বিভাগ নতুন করিয়া গঠন করিতে হয়। এই দায়িত্ব-মিটিগান রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহোদয়েরা নিজেদের হাতে তুলিয়া লইলেন। তাঁহাদের জুলাই ১৯৫৫র মাসিক বিবরণীতে লেখা হইল :

"It has been generally agreed and the Ambassador has specifically asked that we concentrate almost exclusively on the police and field administration projects until the elections of next July.....It is now felt by the M S U (Michigan State University) team that in order to be in accord with U. S. policy locally it is necessary to engage almost exclusively in immediate impact programs until after the elections in July, 1956 and that the immediate impact programs in our programs are the field administration and the police project. 42".

১৯৫৫ নভেম্বরে প্রফেসারগণ তাঁহাদের মাসিক বিবরণীতে লিখিলেন :

"During the month of October we received a notice of Washington's approval of the recommended expanded police program submitted August 29 th. We started immediately to implement this program. Confer-

ences were held at U S O M (U. S. Operations Mission) on October 10th and the Embassy on October 23rd and 24th trying to co-ordinate Internal Security operations in Vietnam in which our government has an interest." 43

Scheer লিখিয়াছেন :

"With Washington's sanction, the professors reorganized the old French-sponsored surete into a new 'Vietnamese Bureau of Investigation,' which was modeled upon the FBI but would also be responsible for the many other enforcement duties that are peculiar to this part of the world, such as information and postal control etc. The police force was turned into a para-military unit, trained in particular to deal with uprisings on the part of the citizenry. Once Saigon was secured, it became essential to pacify the countryside, and so the Civil guard, a rural based militia of 40,000 men, was organized. The immigration authorities were trained to fingerprint the Chinese population, which was distrusted by the Diem Government, and all agencies of Government were trained in maintaining security dossiers. The monthly records of the project list a wide variety of guns, ammunition, vehicles, grenades, handcuffs, and tear-gas equipment that the Michigan State team

42 বর্তমান প্রবন্ধ মূলত : আমেরিকান ঐতিহাসিকদের গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া লেখা হইয়াছে। কেবল কোন কোন আয়গার, ফরাসী গ্রন্থকারদের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। Robert Scheer ব্যতীত ইহারা সকলেই হো চি মিনের বিরুদ্ধে।

passed on from 'official U. S agencies' to their Vietnam proteges. From 1955 to 1960 the Michigan team had the major responsibility for training, equipping, and financing the police apparatus for Diem's state. 44"

মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অবশ্য constitution তৈয়ার করা, শাসন যন্ত্রের উন্নতি কল্পে শিক্ষাদান প্রভৃতি কার্যেও মনোযোগ দিয়াছিলেন এবং অনেক মূল report প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু Scheer লিখিয়াছেন:

"These documents never mentioned the facts of dictatorship under which the Diem family consistently stood in the way of the reforms suggested, The M. S. U. team constructed a beautiful paper government that never was translated into reality. 45"

Scheer-এর গ্রন্থ হইতে দীর্ঘ বচন উদ্ধৃত করা হইল। কারণ ইহা পাঠ করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে কেন আজ হো চি মিন আমেরিকাকে একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। জেনিভা চুক্তির সর্ব এইভাবে আমেরিকা গুপ্তভাবে ভঙ্গ করিয়াছে; যদি আমেরিকানরা ভবিষ্যতে দক্ষিণ ভিয়েতনামে থাকিতে পায়, তাহা হইলে যে তাহারা সন্ধির সর্ব আবার ভাঙিবে না তাহার প্রতিশ্রুতি কে দিতে পারে। বোধহয় এই জন্মই হো চি মিন বলিতেছেন যে আমেরিকান সৈন্য সমূলে ভিয়েতনাম হইতে অপসৃত হইলে তবে তিনি সন্ধির আলোচনা করিবেন।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকান সংবাদপত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ

- | | | |
|-----|--------|-------|
| 44. | Scheer | P. 36 |
| 45. | Scheer | P. 36 |

সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রায়শই দেখা যায় যে আমেরিকান সংবাদদাতাগুলি যেমন অপদার্থ তেমনই মিথ্যাবাদী। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। ভিয়েতনামের বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আমেরিকান সংবাদপত্রে ভিয়েতনাম সম্পর্কে রবার্ট সিয়ার দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন এবং লাইফ টাইমস্ প্রভৃতি বিখ্যাত সংবাদপত্র হইতে লেখা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহারা কিভাবে আমেরিকান জনমতকে ভ্রান্ত পথে চালিত করিয়াছে। অবশ্য সর্বদাই সংবাদপত্রগুলি সরকারী সমর্থন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পাইয়াছে।

প্রথমে বাহা আরম্ভ হইল তাহাকে দিয়েমের পুত্র ভিন্ন আর কিছু বলা যায়না—যেমন আশুব থাকে আমেরিকান সংবাদপত্রগুলি এখনও করে। দিয়েমের শাসনে অনেক দোষ ছিল; সেগুলিকে ঢাকিয়া কৈকিয়ৎ স্বরূপ বলা হইল যে এশিয়ার অশিক্ষিত লোকেরা গণতন্ত্র বোঝেনা, দুবেলা দুমুঠা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে; তাহাদের জন্ম এইরূপ একজন জবরদস্ত শাসনকর্তা প্রয়োজন।

১৯৫৫ জুলাই মাসে, দিয়েম হো চি মিনের অনুরোধের উত্তরে জেনিভা চুক্তির সর্ব মানিতে অস্বীকার করিয়া প্রকারান্তরে জানাইলেন যে উত্তর-দক্ষিণ ভিয়েতনাম একীকরণের জন্ম জনগণের মত লওয়া হইবে না। এই আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গের জন্ম আমেরিকান পত্রিকায় দিয়েমকে সাধুবাদ দেওয়া হইল। লাইফ পত্রিকা লিখিল (১৯৫৭, ১৩ মে)

".....He (Diem) knew that it was not a question of who could win the projected plebiscite: it was a question of who the people would expect to win, and all too many of them would have hedged by voting on the assumption that the Vietminh might win. Diem saved his people from this agonizing

prospect simply by refusing to permit the plebiscite and thereby he avoided national suicide."

১৯৫৯ Yale Reviewer শারদীয় সংখ্যায় কিশেল (Kishel) লিখিলেন :

'On October 26, 1959, South Vietnam will celebrate its fourth anniversary as the Republic of Vietnam. The anticipated elections of 1958 have never been held and the Communist capability in Vietnam, south of the 17th parallel, has been reduced to one of sheer nuisance activity...It is one Asian area where Communism has been rolled back, and rolled back without war.'

এইখানেই আমেরিকানদের মন্ত তুল হইল। দিয়েম দক্ষিণ ভিয়েৎনামে শাস্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন কারণ হো চি মিনের বিশ্বাস ছিল যে জেনিভা চুক্তি দক্ষিণ ভিয়েৎনাম পালন করিবে,—চারটি বিশ্বস্ত্রিত স্বাক্ষরিত চুক্তিকে যে দিয়েম আমেরিকানদের উত্থানিতে এইভাবে পদদলিত করিবেন, তাহা হো চি মিন ভাবেন নাই। তৎসঙ্গেও দিয়েম কি ভাবে শাস্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা রবার্ট সিমার বর্ণনা করিয়াছেন :

"The Diem Government's contribution to the idea of civic action was to unleash a reign of terror upon the countryside. There were massive anti-Communist renunciation campaigns. Thousands of people suspected of sympathizing with the Viet Minh were sent to re-education centers. Those thought to be active Viet Cong agents were jailed or

shot. Prizes were offered for turning in one's parents or relatives....46'

আন্তর্জাতিক কমিশনের রিপোর্টে বারবার দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে জেনিভাচুক্তি ভঙ্গকারী বলিয়া অভিযুক্ত করা হইল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। (ফল হয়ত কিছু হইয়াছে; ভারতবর্ষ এই কমিশনের চেয়ারম্যান, হুডরাং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের দোষ দেখাইবার দায়িত্বের অঙ্গীকার; বোধ হয় এই কারণেই আমেরিকা কাস্মীর ব্যাপারে পাকিস্তানকে সাহায্য করিয়াছে, ভারত আক্রমণ করিবার ক্ষমতা পাকিস্তানকে প্যাটন ট্যাঙ্ক ইত্যাদি দিয়াছে।) যাহা হউক ১৯৫৯-এর পরে হো চি মিন তাঁহার ধারণা পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

ঐ বছরই আমেরিকায় দিয়েম-তত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশ হইতে বাধ্য হয়; আমেরিকা দিয়েমতত্ত্বকে চালু রাখিবার ক্ষমতা অকাতরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছিল (এখনও করে); এযাবৎ সংবাদপত্রগুলি লিখিতেছিল যে দিয়েম অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। এই-মিথ্যা ধরা পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে ভিয়েৎ কং দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বিদ্রোহ আরম্ভ করিল। দিয়েমের পক্ষ হইতে প্রথমে ভিয়েৎ কংয়ের গৈরিকের মৃত, আহত ও বন্দীর সংখ্যা অত্যন্ত ক্ষতি করিয়া দেখান হইল। তখনও যখন ভিয়েৎকং দমন করা গেল না তখন বলা হইতে লাগিল যে উত্তর ভিয়েৎনাম হইতে গুপ্তভাবে কম্যুনিষ্টগণ আসিয়া ভিয়েৎকংয়ের দল পুষ্ট করিতেছে।

যদিও আমেরিকান সংবাদপত্রে এই খবর প্রচার করা হইয়াছে, কিন্তু একজন আমেরিকান, George K. Tanham, ১৯৬০এ এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া আসিয়া ১৯৬১-তে তাঁহার প্রকাশিত বই **Communist Revolutionary Warfare** এ লিখিলেন :

"The so called Ho Chi Minh trail is no more than a series of paths that run north and south through the mountains and are not suitable for large arms shipments....To judge by equipment and arms that have been captured from the Communists, they have been fighting largely with home-made weapons and with such material of French and American make as they have been able to steal or capture."

উপসংহারে Tanham লিখিলেন :

"However the crucial fact today is that the Communists are arousing the people to fight and work for them. It is easy but wrong to attribute their success solely to terrorist methods. They are systematically creating the 'sea' that Mao thought essential for military success and eventual political control. Diem has been unable to win popular support either on a nationalist basis or with personal loyalty as a motivating force. Until his government has the active and continuing support of the Vietnamese masses and the troops, all the economic and military aid in the world, though it may delay it, will not halt the Communist advance."

ফরাসী লেখক Devillers লিখিলেন :

The insurrection existed before the Communists decided to take part, and they were simply forced to join in. And even

among the Communists the initiative did not originate in Hanoi, but from the grass roots, where the people were literally driven to take up arms in self-defence."

প্রায় একই কথা Edgar snow তাঁহার গ্রন্থ **The Other side of the River** এবং Oliver E. Clubb, jr তাঁহার **The United States and the Sino-Soviet Bloc in South-East Asia** নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন। কিন্তু এসব গ্রন্থের ভেতন আদর হইল না।

১৯৬০ এপ্রিল মাসের শেষে ভিয়েতনামের ১৮ জন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দিয়েমের নিকট এক আবেদন করিলেন : আবেদনে প্রার্থনা করা হইল যে শাসনতন্ত্রের কঠোরতা কমান হউক। আবেদনকারীরা অভিযোগ করিলেন যে দিয়েমের শাসনে কারাগারগুলিতে স্থানান্তার এবং সরকারী দপ্তরে অসাব্য এবং অপদার্য লোকদের আস্তানা হইয়াছে। আবেদনকারীরা সকলেই রক্ষণশীল এবং পূর্বজীবনে করাদী সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তৎসঙ্গেও তাঁহারা দিয়েমকে প্রকাশ্যে সাবধান করিয়া দিলেন যে অসহ্য নির্যাতনে ক্রিষ্ট জনগণের বিদ্বেষ ও রোষ তাহাদের বন্ধন শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। কিন্তু এই সতর্ক-বাণীতে কেহই কর্ণপাত করিল না।

১৯৬০, ২১ নভেম্বর, দিয়েমের প্যারাবাহিনী বিদ্রোহ করিল। সহস্র সহস্র বেসামরিক নাগরিক এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়া দিয়েমের প্রাসাদ আক্রমণ করিল। কিন্তু দিয়েম এই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইলেন। যাহা হউক এতদিনে আমেরিকান সংবাদপত্র গুলির কিছুটা চৈতন্যদায় হইল, এবং তাহারা দিয়েমতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে

আরম্ভ করিল। দিয়েমের অস্ত্রাস্ত্র আমেরিকান পৃষ্ঠপোষক-বর্গও এখন দিয়েম সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করিলেন।

কিন্তু দিয়েমের শৌভাগ্যক্রমে এই সময়েই আইর্সেনহাওয়ার অবসর গ্রহণ করিলেন ও কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হইলেন (জানুয়ারী, ১৯৬১) কেনেডি প্রেসিডেন্ট হইবার অব্যবহিত পরেই CIA-র পদস্থ কর্মচারী পূর্বোক্ত ল্যান্সডেলকে ভিয়েৎনাম সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার জন্য ভিয়েৎনামে পাঠান হইল। (এই সময়ে পদোন্নতি হইয়া ল্যান্সডেল মেজর জেনারেল হইয়াছেন।) ল্যান্সডেল ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিলেন যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পতন প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে, এবং দিয়েম-তন্ত্র বজায় থাকিলে কিছুতেই দেশরক্ষা পাইবে না, অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট হইয়া যাইবে।

এই রিপোর্ট পাইয়া প্রেসিডেন্ট কেনেডির আজ্ঞানুসারে ল্যান্সডেলের অধিনায়কত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। বহু বিতর্কের পর ইহারা স্থির করিলেন যে কম্যুনিষ্ট শক্তির অগ্রগতিতে বাধা দিবার দায়িত্ব ভিয়েৎনামে যুক্তরাষ্ট্রকেই বহন করিতে হইবে। তবে দিয়েমের মাধ্যমে না করিয়া হয়ত সোজা হস্তে করিতে হইতে পারে। জেনিভা চুক্তি অনুসারে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সেনা বাহিনীর সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল ১,৫০,০০০; এই কমিটির অমুমোদন অনুসারে জেনিভা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া সেনাবাহিনীর সংখ্যা হইল ২,৫০,০০০।

২রা নভেম্বর ১৯৬৩ দিয়েমের পতন হয়। ইহার জন্ত আমেরিকানদের দায়িত্ব কতখানি তাহা বোধ হয় কোন দিনই জানা যাইবে না। পতনের কারণ সংক্ষেপে এই:

পূর্বে বলা হইয়াছে যে দিয়েম নিষ্ঠাবান রোমান ক্যাথলিক ছিলেন, এবং সেই স্বত্রে আমেরিকানদের সাহায্য পাইতে তাহার সুবিধা হইয়াছিল। উত্তর ভিয়েৎনাম হইতে যে সকল বাস্তুহারা দক্ষিণে আসিল, তাহারাও অধিকাংশ

রোমান ক্যাথলিক; দিয়েম এবং আমেরিকানরা রোমান-ক্যাথলিকদের কম্যুনিষ্ট বিরোধী বলিয়া সাপরে আহ্বান জানাইলেন, এবং অনেকপ্রকার সুবিধা ও সুযোগ দিলেন। ক্রমে যতই ভিয়েৎকং গরিলা যুদ্ধে সাফল্য লাভ করিতে লাগিল, দিয়েম এবং আমেরিকানরা রোমান ক্যাথলিকদের উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন, কারণ তাহাদের ধারণা হইল যে আর সকলেই হো চি মিনের স্বপক্ষে। ভিয়েৎনামে শতকরা পচাত্তর জন বৌদ্ধ ও দশজন রোমান ক্যাথলিক। এযাবৎ তাহারা সংখ্যানুযায়ী সরকারী চাকরি ইত্যাদি ভোগ করিয়া আসিয়াছে; এখন তাহাদের বিদায় দিয়া রোমান ক্যাথলিকদের সেই জায়গার ভর্তি করা হইতে লাগিল। এই খানে বলা আবশ্যক যে দিয়েম ও আমেরিকানরা রোমান ক্যাথলিকদের যে রকম স্বজাতিপ্রীতিহীন মনে করিতেন, পরবর্তী ঘটনায় দেখা গেল যে তাহা সত্য নহে। তবে ফরাসী শাসনকাল হইতেই পাদ্রীদের প্ররোচনায় রোমান-ক্যাথলিকগণ দেশদ্রোহিতা করিয়া আসিয়াছে; সেই সকল লোক উত্তর ভিয়েৎনাম হইতে আসিয়া দিয়েমের দল গুঠ করিল।

১৯৫৩, এই মে দিয়েমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছয়ের (Huô) আর্চবিশপের জন্মদিন উপলক্ষে, স্থানীয় বৌদ্ধ সংঘের অধ্যক্ষ অভিনন্দন টেলিগ্রাম পাঠাইতে আদিষ্ট হইলেন। আদেশ করিলেন দিয়েমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্যান। অধ্যক্ষ এ আদেশ আমান্ত করেন।

এই মে তারিখে আর্চবিশপের জন্মোৎসব উপলক্ষে চাদিকে পোপের পতাকা তোলা হইয়াছিল, কিন্তু দুই দিন পরে ভগবান বুদ্ধের জন্মদিনে (৮ই মে) বৌদ্ধ মঠে পতাকা উত্তোলন নিষিদ্ধ হইল (মঠে ও মন্দিরে পতাকা উত্তোলন হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈনদের অতি প্রাচীন প্রথা। এখনও ভারতবর্ষের অনেক মন্দিরের শিখরে বা অস্ত্র কোনো স্থানে পতাকা দেখা যায়।) বুদ্ধের জন্মদিনে এযাবৎ সেদিনের

ধার্মিক অনুষ্ঠান বেতার-যোগে শোনান হইয়াছে; এইবার সরকার তাহাও বন্ধ করিলেন। সেদিন বিকালে ২০,০০০ শান্ত জনতা রেডিও-স্টেশনের বাহিরে একত্র হইয়া তাহাদের বিক্ষোভ জ্ঞাপন করে। এই জনতায় অনেক জীলোক ও শিশু ছিল। পুলিশ ইহাদের ভঙ্গ করিয়া দিবার চেষ্টা প্রথমে কাঁছনে গ্যাং ও পরে গুলি চালায়, নয়জন লোক মারা যায়, তন্মধ্যে সাতটি শিশু এবং কুড়িজন আহত হইলেন।

সরকারী ইস্তাহারে বলা হইল যে ভিয়েৎকং গরিলারা এই কুর্কম করিয়াছে। কিন্তু হুয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম জার্মানীর তিনজন প্রফেসর সমস্ত ঘটনা দেখিয়াছিলেন। বৌদ্ধ শ্রমণদের অনুরোধে তাঁহারা বাস্তবিক ঘটনা বিদেশী সংবাদপত্রাদির, রাষ্ট্রদূতদের, U. N. সেক্রেটারী জেনারেল প্রভৃতি সকলকে জানান।

কয়েক সপ্তাহ পরে এই তিনটি প্রফেসরকে ভিয়েৎনাম হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয়। বিশেষ দৃষ্টব্য এই যে আমেরিকান সাংবাদিকেরা প্রকৃত ঘটনা বাহির করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই, যদিও অস্ত্রের হাড়ির খবর বাহির করিতে তাহাদের অপরিণীম উৎসাহ। তাহার এক কারণ, আমেরিকানদের স্বষ্টি দিয়েমের যে কোনো রকম মানহানি হয় ইহা আমেরিকানরা পছন্দ করিত না; সুতরাং দিয়েমের সমস্ত অপরাধ তাহারা গোপন করিবার চেষ্টা করিত। দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকায় রোমান ক্যাথলিকদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি এবং প্রেসিডেন্ট কেনেডি রোমান ক্যাথলিক ছিলেন; সুতরাং বৌদ্ধদের একটু আধটু দমন বা অপমানকে তাহারা হয়ত খুব নিন্দার বিষয় মনে করিতেন না। বিশেষতঃ তাহাদের ধারণা ছিল যে সংখ্যালঘু রোমান ক্যাথলিকদের (শতকরা দশ জন) সাহায্য না পাইলে কমুনিষ্টদের দমন করা যাইবে না। হয়ত আমেরিকানরা ভারতবর্ষের ইংরাজ নীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু ফল হইল ভয়ঙ্কর।

প্রথমে বৌদ্ধরা পাঁচটি দাবী জানায়: বৌদ্ধরা পূতাকা উত্তোলন করিতে পারিবে; বৌদ্ধ ধর্ম রোমান ক্যাথলিক ধর্মের সমান মর্যাদা লাভ করিবে; বৌদ্ধ নির্ধাতন বন্ধ হইবে; বৌদ্ধদের ধর্ম অনুষ্ঠানে ও প্রচারে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে; ৮ই মের জলিতে নিহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ এবং দ্বায়ী পুলিশদের শাস্তি দিতে হইবে। দিয়েম কার্যতঃ একটি দাবীও মানিলেন না।

ইহার পর হইতেই বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে আরম্ভ হয়। এই সময় আমেরিকানরা বৌদ্ধদের সহিত মিটমাট করিবার জন্ত দিয়েমকে পরামর্শ দেয়। কিন্তু দিয়েম কোন পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না; বলা হয় যে এই সময় দিয়েম তাঁহার-অপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হু ও তাহার পত্নী স্রীমতি হু পরামর্শ লইয়াই সমস্ত কাজ করিতেন।

১১ই জুন, ১৯৬৩, ৭৮ বৎসরের বৃদ্ধ বৌদ্ধ শ্রমণ Thich Quang Duc, সাইগনে প্রকাশ্য পার্কে নিজবস্ত্রে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। চারিদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর দল স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিল; একটি পতাকায় লেখা ছিল আমাদের পাঁচটি দাবী যাহাতে গৃহীত হয় সেই জন্ত এই শ্রমণ প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

ইহার পর আরও অনেক বৌদ্ধ এইভাবে প্রাণ বিসর্জন করেন; বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচারের মাজাও বাড়িতে থাকে, বিশেষতঃ বৌদ্ধ মঠে পুলিশ হানা দিতে আরম্ভ করে। ব্যাপার ক্রমশঃ এমন গুরুতর হইয়া উঠিল; এবং নির্ধাতিত বৌদ্ধদের প্রতি বিশ্বব্যাপী এমন সহানুভূতির স্রষ্টি হইল যে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আর মৌনালম্বন করা সম্ভব হইল না। ২১ আগষ্ট ১৯৬৩ দিয়েমের সৈন্যগণ বৌদ্ধ প্যাগোডাগুলি দখল করার পর যুক্তরাষ্ট্র সরকার এক বিবৃতিতে দিয়েমের বৌদ্ধদের প্রতি ব্যবহারে অনাস্থা জানাইলেন। ২৬ আগষ্ট আর একটি বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করিলেন যে প্যাগোডা আক্রমণের জন্ত পুলিশ এবং স্পেশাল ফোর্স দ্বায়ী, আমি,

কমাও এই বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। ইহার উত্তরে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার ঘোষণা করেন, যে প্যাগোডা আক্রমণের জন্ত আমি কমাও সম্পূর্ণভাবে দায়ী। ইহার পরেই আমেরিকার দিয়েম নীতি বদলায়।

টাইমস অফ ভিয়েতনাম ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিল যে যুক্তরাষ্ট্রের C. I. A. গুপ্তচরগণ দক্ষিণ ভিয়েতনামে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্ত একটি ষড়যন্ত্রের (coup) ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছিল, কিন্তু সরকার সতর্ক হইয়া পড়াতে ব্যবস্থা কার্যকরী হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর এই অভিযোগ এককালে অস্বীকার করিলেন।

সেপ্টেম্বর ২৪ হইতে ১লা অক্টোবর (১৯৬৩) যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা সচিব, রবার্ট ম্যাকনামারা ও যুক্ত সেনানায়কদের প্রধান (Chairman of the Joint Chiefs of Staff) জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেসার দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার করেন; ২রা অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রাঙ্গণ হইতে এক বিবৃতিতে বলা হয় :

“Secretary McNamara and General Taylor reported their Judgment that the major part of the U. S. military task can be completed by the end of 1965.....the political situation in Vietnam remains deeply serious. The United States has made clear its continuing opposition to any repressive action in South Vietnam. While such actions have not yet significantly affected the military effort, they would do so in future...”

এই বিবৃতি গুরুত্বপূর্ণ। দিয়েমের হত্যার সঠিক কারণ জানা যায় না, ভবিষ্যতেও জানিবার আশা নাই। কিন্তু এই বিবৃতি হইতে দেখা যায় যে দিয়েম হত্যার এক মাস পূর্বেও যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ নেতারা বিশ্বাস করিতেন যে হো চি মিনের

বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় অনায়াসেই হইতে পারে, তবে দিয়েমের বিরুদ্ধে দেশে অভ্যুত্থান হোকিলে মুক্তিলাভ হইতে পারে। সুতরাং দিয়েমের অপসারণ প্রয়োজন। কিন্তু এখনও যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামকে সাহায্য দান বন্ধ করিল না, কারণ তাহা হইলে যুদ্ধের ক্ষতি হইতে পারে। এই সময়ে (আগষ্ট ২৩) প্রেসিডেন্ট ডি গল ভিয়েতনামে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এক বিবৃতি দেন। তৎক্ষণে আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তর ঘোষণা করিল :.....it would not appear to be in the interest of South Vietnam, of ourselves, or the other free world nations to consider negotiating away what has been accomplished by the courage and heavy expense in life and effort of Vietnam people.” অবশ্য এখনও পর্যন্ত “life” টা ভিয়েতনামীদের আর কেবল “expense” টা ছিল আমেরিকানদের। বাহা হউক এখন আমেরিকানরা বিনা যুদ্ধে জয় শান্তির প্রস্তাবে রাজি হইল না, কারণ তাহাদের এখন বিশ্বাস ছিল যে দিয়েমের পরিবর্তে একটি স্থানাসককে ভিয়েতনামের অধিকর্তা করিতে পারিলেই, যুদ্ধে জয়লাভ অনিবার্য।

দিয়েম বৌদ্ধদের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার কোনো কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না। বর্তমান যুগে এইরূপ ধর্মোন্মত্ততার উদাহরণ পাকিস্তানের বাহিরে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তবে মনে রাখিতে হইবে যে যদিও আমেরিকানরা হয়ত দিয়েমকে বৌদ্ধদের নির্ধাতন করিতে পরামর্শ দেন নাই, কিন্তু কমুনিষ্টদের বিরুদ্ধে একমাত্র রোমান ক্যাথলিকরাই নির্ভরযোগ্য, অতএব সরকারী চাকরি ইত্যাদিতে বৌদ্ধদের তাড়াইয়া তাহাদের চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে আমেরিকানদের যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। সুতরাং বৌদ্ধদের নির্ধাতনই দিয়েমের পতনের একমাত্র কারণ নাও হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে দিয়েমের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য মনে

রাধা প্রয়োজন। তিনি জীবনে অনেক ভুল করিয়াছেন, ফলে আততায়ী হস্তে নিহত হন। কিন্তু তাঁহার পূর্বজীবন আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তিনি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন: কোনোদিনও কোনোপ্রকারে ফরাসীর আত্মগত্য স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার সহিত শেষকালে আমেরিকানদের সম্পর্ক কিরূপ তিক্ততায় পর্যবসিত হইয়াছিল, তাহা জানা নাই, এবং জানিবার কোন উপায় নাই, তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দিয়েম আমেরিকানদের স্বাভাবিক এবং সহজাত ঔদ্ধত্য মানিয়া লইবার পাত্র ছিলেন না। আমেরিকানদের আর একটি বিশেষত্ব এই যে তাহাদের ধারণা যে পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান তাহারা সহজেই করিয়া দিতে পারে; সুতরাং অপরের ভুল ত্রুটির উপর তাহারা ঋণহস্ত। এ সময়ে আমেরিকানদের বিশ্বাস ছিল যে দিয়েমের ভুলের জন্তই Viet Cong গরিলাদের দক্ষিণ ভিয়েতনাম হইতে তাড়ান যাইতেছে না। দিয়েমের মৃত্যুর পর আজ তিন বছরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে; এই সময়ে যুদ্ধের সমস্ত ক্ষমতা আমেরিকানদের হাতে; দিয়েমের মৃত্যুর সময় সামান্য সংখ্যক আমেরিকান সৈন্য ভিয়েতনামে ছিল এখন তাহারা সংখ্যায় দুই লক্ষেরও বেশী; উত্তর ভিয়েতনামে অবিরাম বোমা পড়িতেছে, কিন্তু কই ভিয়েতকং ত দক্ষিণ ভিয়েতনাম ত্যাগ করিয়া গেল না। কিন্তু দিয়েম প্রাণ হারাইলেন।

এই প্রসঙ্গে রবার্ট সিয়ার লিখিয়াছেন :

"But by October 10, 1968....the U. S. government was thinking openly in terms of a coup, and Diem had come to be the source of all error and failure in Vietnam. The U. S position in Vietnam began to fall apart as the Buddhists rose in revolt against Diem. As the *National Review* pointed out at the time,

and as the United Nations report on Diem's treatment of the Buddhists corroborates, the government was not being unusually oppressive towards the Buddhists at the time of rioting in Hue. It was merely acting in a manner consistent with its general alienation, mistrust and hostility to the bulk of the population. But when Rev. Quan Duc set fire to himself in protest, the public relations fog shrouding Vietnam also burned away. When Diem took steps to crush the Buddhists with his police force, he finally ceased to be negotiable as a free world commodity. 47"

১লা নভেম্বর, ১৯৬৩, মধ্যাহ্নের অল্প পরে সাইগনে সৈন্তেরা বিদ্রোহ করে। দিয়েমের প্রাসাদের রক্ষীরা সারাদিন ও রাত্রি যুদ্ধ করে, কিন্তু ২রা নভেম্বর সকালে বিদ্রোহীগণ সকল বাধা দমন করিয়া প্রাসাদ অধিকার করিতে সক্ষম হয়। দিয়েম ইহার পূর্বেই প্রাসাদ হইতে পলাইয়া যান, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিদ্রোহীরা তাঁহাকে ও তাঁহার ভাইকে গ্রেপ্তার করে, এবং গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে।

দিয়েমের পতনের জন্ত অনেকেই আমেরিকানদের দায়ী করিয়াছেন, এবং অভিযোগ করা হইয়াছে যে দিয়েমের পতনের ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল আমেরিকানরা; তাহারাই তাঁহার হত্যার জন্ত দায়ী। ইহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। অবশ্য দিয়েম হত্যার কোনো উপযুক্ত তদন্ত অজ্ঞাবধি হয় নাই। এই প্রসঙ্গে অমূরূপ একটি ঘটনার কথা মনে হয়। দ্বিতীয়

নহাযুদ্ধের সময় ফরাসী আডমিরাল দার্লী (Darlen) এক সময়ে আমেরিকানদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। পরে মিত্র শক্তি (ইংরাজ ও আমেরিকান) উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ করিলে ধীরে ধীরে দার্লীর প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়, এবং তাঁহার উপস্থিতি নানাকারণে আমেরিকানদের পক্ষে অব্যাহতীয় হইয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে দার্লী এক আততায়ী হস্তে নিহত হন। আততায়ী গ্রেপ্তার হয়, এবং তাহার প্রাণদণ্ড হয়, কিন্তু কেন সে দার্লীকে খুন করিল তাহা জানা গেল না। সেই সময়েও অনেকে সন্দেহ করিয়াছে যে এই খুনের মূলে আমেরিকানবা; কিন্তু তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে দার্লী এবং দিয়েমের পরিণাম দেখিয়া মনে হয় যে আমেরিকানদের সহিত বন্ধুত্ব করা বিশেষ নিরাপদ নহে।

দিয়েমের মৃত্যুর পর কয়েকজন সেনানায়ক দক্ষিণ ভিয়েতনামে সরকার গঠন করেন। তারপর বহুবার সরকার বদল হইয়াছে। সেই সব ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিবার প্রয়োজন দেখি না; কারণ দক্ষিণ ভিয়েতনামের বাস্তবিক এখন কি অবস্থা, তাহা জানা যায় না। দেশে স্বৈরাচার, একনায়কত্ব, তত্বপরি আমেরিকানদের পীড়ন। সংবাদপত্র পাঠে মনে হয় যে বর্তমান সরকারও আমেরিকানদের পছন্দসই নহে, হুতরাং ইহারও পরিবর্তন হইতে পারে। অর্থাৎ যুদ্ধে পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের ক্ষক্ষে পূর্বেও চাপাইয়াছে, এখনও তাহাই করিবে। এই ভাবে যুদ্ধে নিজেদের শোচনীয় অপটুতার কাহিনী দেশবাসীকে জানিতে দেওয়া হইবে না।

সমুখযুদ্ধে পরাভূত হইয়া আমেরিকানরা উত্তর ভিয়েতনামে বিমান যোগে বোমা নিক্ষেপ করিতেছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশই এমনকি যুক্তরাষ্ট্রও তাহাদের ব্যবহারের প্রকাশে নিন্দা করিয়াছে এবং বোমা ফেলা বন্ধ করিতে বলিয়াছে, কিন্তু আমেরিকানরা তাহাতে কণপাত করে নাই।

যে সর্তে তাহারা বোমা ফেলা বন্ধ করিতে চায় তাহা মানিয়া লইলে হো চি মিনের পরাজয় স্বীকার করিতে হয়, এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম চিরকালের জন্য বিভক্ত থাকিয়া যায়। আমেরিকানরা মনে করেন যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম তাহাদের অধীনে না থাকিলে 'free world' এর ক্ষতি হইবে; 'স্বাধীন বিশ্বের' সত্তা থাকিবে না। একটি দেশের স্বাধীনতা সমূলে নাশ করিতে পারিলে 'বিশ্বের স্বাধীনতা' টিকিয়া থাকিবে, এই অপূর্ব সমাধান কোন কুটিল যুক্তির দ্বারা সাধিত হইয়াছে তাহা বোঝা অসম্ভব।

হো চি মিনও যুদ্ধে জেতেন নাই, এবং তিনিও শান্তি বৈঠকে বসিবার পূর্বে আমেরিকাকে যে সর্ত দিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইলে আমেরিকাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। তবে হো চি মিনের নৈতিক জয় হইয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকার সমস্ত দেশ তাহার সমর্থক। দ্বিতীয়তঃ হো চি মিনের প্রধান সর্ত শান্তি বৈঠক আরম্ভ হইবার পূর্বে সমস্ত আমেরিকান সৈন্যকে ভিয়েতনাম ত্যাগ করিতে হইবে—বুধা দস্তের পরিচায়ক নহে। আমেরিকানরা ভিয়েতনামে যাহা করিয়াছে তাহার পর যদি হো চি মিন তাহাদের বিশ্বাস করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। দিয়েম এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের পরবর্তী নেতাদের সহিত আমেরিকানদের ব্যবহারে দেখা যায় যে আমেরিকানরা ভিয়েতনামে—তথা এশিয়ায়—কাহাকেও বন্ধু বলিয়া গণ্য করে না; তাহাদের তথাকথিত স্বার্থের খাতিরে ও সাময়িক উত্তেজনায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। বিরাট দেশ, বিপুল ধনসম্ভার, যান্ত্রিক সভ্যতার পুরোভাগে; হুতরাং ভুলের খেসারত দিতে প্রস্তুত, ভুল স্বীকার করিতে নহে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল শক্তির ভুলনায় ভিয়েতনামের শক্তি অতি তুচ্ছ। তবুও তাহা অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ চালাইতেছে, এবং ইহা নিশ্চিত যে আমেরিকানরা বিশেষ স্তুতি করিতে পারিতেছে না। ভিয়েতনাম ও ভিয়েতকঙ্গ

অদ্ভুত সাহস ও দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। তাহাদের বিশ্বাস যে যদি তাহারা আমেরিকানদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে তাহা হইলে ফরাসীদের অধীনে তাহাদের যে দুর্দশা হইয়াছিল, আবার তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে। বোধ হয় আরও খারাপ অবস্থা হইবে : কারণ ইংরাজ, ফরাসী ওলন্দাজ প্রভৃতির সাম্রাজ্যের বিশেষত্ব ছিল এই যে, তাহারা দেশ জয় করিয়া দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিত, এবং দেশ শাসনের দায়িত্বও লইত। আমেরিকানরা ক্ষমতা চায়, দায়িত্ব লইতে চায়না ; দায়িত্ব সমর্পণ করে কতগুলি অপদার্থ স্তাবকের হাতে।

আমাদের মধ্যে অনেকে আমেরিকার ভিয়েৎনাম নীতি সমর্থন করেন ; তাহাদের যুক্তি মোটামুটি দুই : (১) আমেরিকা আমাদের খাতিদান করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, সুতরাং তাহাকে আমরা নৈতিক দৃষ্টিতে সাহায্য করিতে বাধ্য ; (২) আমেরিকা ভিয়েৎনামে আছে বলিয়াই চীন আমাদের আক্রমণ করিতে সাহস পাইতেছে না।

প্রথম যুক্তিটির অর্থ এইরকম দাঁড়ায় : আমাদের অপদার্থতার জন্য দেশে খাড়াভাব, সুতরাং আমেরিকার কাছে খাতিদা করা হইতেছে ; অতএব তাহার সমস্ত কৃতিত্বকেই সমর্থন করিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের অযোগ্যতার ফল ভোগ করিতে হইবে ভিয়েৎনামকে। কিন্তু তাহা হইলেও বোধ হয় নিস্তার নাই ; সম্প্রতি রাশিয়া আমাদের খাতিদা জোগাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং আমেরিকা বলিয়াছে যে রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশগুলি আমাদের খাতিদা সম পরিমাণ না দিলে, আমেরিকাও দিবে না। এই অবস্থায় কেবল আমেরিকাকে সন্তুষ্ট রাখিতে গেলে মহা অনর্থের সম্ভাবনা।

চীন যখন ভারত আক্রমণ করে আমেরিকান সৈন্য তখনও ভিয়েৎনামে ছিল ; তাহাদের ভয়ে চীন ভীত হয় নাই দেখা যাইতেছে। সুধীর বোধ রাখিয়াছেন যে আমেরিকা এক বিমানবাহী রণতরী পাঠানিতেই চীনেরা ভারত আক্রমণ

বন্ধ করিয়া পলাইয়া যায়। ভিয়েৎনামকে আজ এক বছর ধরিয়াও বোমা ফেলিয়া আমেরিকা ভয় দেখাইতে পারিল না, এদিকে বঙ্গোপসাগরে একটি বিমানবাহী রণতরী আসিতেই চীনা সৈন্য ভাগিয়া গেল, ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা। আসল কথা আমেরিকানদের propagandaর ক্ষমতা অসম্ভব, এবং আমাদের দেশে তাহাদের propaganda অদ্ভুত কাজ করিয়াছে।

আর একটি কথা। আমেরিকার বিমানবাহী রণপোত বঙ্গোপসাগর হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় বিমানগুলি ভারতবর্ষকে দিয়া গেল না কেন? আমেরিকার পাকিস্তানকে কেবল বিমান নয়, চীনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্যাটন ট্যাঙ্কও দিয়াছিল। পাকিস্তান হইতে চীনে ট্যাঙ্ক বাহিনী বোধ হয় ভারতবর্ষের ভিতর দিয়া যাইবার ব্যবস্থা ছিল। কারণ পাকিস্তান হইতে চীনে যাইবার কোনও রাস্তা নাই। যাহা হউক আমেরিকা চীনাদের বিরুদ্ধে ভারতকে অস্ত্র দিতে এই কারণে অস্বীকার করিল যে তাহাতে পাকিস্তান অসন্তুষ্ট হইবে। পাকিস্তানকে আমেরিকা অস্ত্র দেয়, কাস্মীরে সাহায্য করে, অজুহাত এই, পাকিস্তান চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করিবে। ভারতবর্ষকে অস্ত্র সাহায্য করিয়া চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাইলে পাকিস্তান চটিবে। সুতরাং দেখা যায় আমেরিকার প্রকৃত উদ্দেশ্য চীন দমন নহে পাকিস্তান ভোগ।

তাহার কারণ সম্প্রতি। পূর্বে ভিয়েৎনাম এবং পশ্চিমে পাকিস্তান নিজেদের অধীনে রাখিতে পারিলে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আমেরিকানদের প্রভুত্ব অব্যাহত থাকিবে। বাস্তবিক পক্ষে চীন ভারত আক্রমণ করায় আমেরিকার সুবিধাই হইয়াছে। কারণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকাকে একমাত্র ভারতবর্ষ বাধা দিতে পারিত। আজ ভারতবর্ষ শক্তিহীন—একদিকে চীন, আর দুই দিকে আমেরিকার অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত পাকিস্তান ; দেশে

খাড়াভাব; আমেরিকার কাছে হয় ভিক্ষা লও না হয় না খাইয়া মর। এই অবস্থার পূর্ণ স্বযোগ আমেরিকা নিতেছে।

বর্তমান প্রবন্ধে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আলোচনার বিষয় নহে, হুতরাং এবিষয়ে আর অধিক কিছু বলা বাহুল্য মনে করি। তথাপি এখানে শ্রীযুক্ত কানাইলাল মণিকলাল মুনসী মহোদয়ের একটি ভাষণের একাংশ উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীযুক্ত মুনসী স্বতন্ত্র পার্টির অল্পতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট। সকলেরই হয়ত জানা আছে যে স্বতন্ত্র পার্টি আমেরিকার বিশেষ অনুরাগী এবং শ্রীযুক্ত মুনসীর সহিত আমেরিকার পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৭) শ্রীযুক্ত মুনসী বসেতে এক বক্তৃতা প্রদানে বলেন :

“When China invaded India, our best pampered friends were non-aligned, America only promised us help.

And yet, India embarrasses U S A in implementing its foreign policy. Why is it so ?

First : But for the military help that USA gave to Pakistan, there would have been no Indo-Pakistan question, the problem of Kashmir would have been solved by friendly negotiations, our budgetary position would have been sound.

Secondly, they fail to realise that the Tito-Nasser-Nehru axis has succeeded in maintaining peace in Asia.

Thirdly, the psychological factor which works against America in our mind is its view that if we are their friends, we must pay the price of accepting their foreign policy and develop the American way of life. This immediately creates a barrier between us.

We may be a poor nation; we may be in difficulties; we may not have the ability to fight with modern weapons. But we are an ancient people proud of our heritage and we feel hurt every time an American author or a public man indulges in the snobbery of looking down upon our way of life. We sense in it cultural imperialism.

ভিয়েৎনামের ভবিষ্যৎ কি? কালের গতি দুস্তেয়, কিছুই বলা যায় না। তবে বোমা ফেলিয়া একটি দৃঢ় সংকল্পিত জাতিকে হারান যায় না। হিটলার বোমা ফেলিয়া ইংলণ্ড জয় করিতে পারে নাই; ইংলণ্ড আমেরিকাও বোমা ফেলিয়া জার্মানী জয় করিতে পারে নাই। জাপান আণবিক বোমা পড়িবার পূর্বেই আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায়; কারণ তখন জাপানের নৌ শক্তি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; ইতিপূর্বে আমেরিকার বোমায় টোকিও প্রভৃতি বিরাট শহর ধ্বংস হইলেও জাপান শান্তির প্রস্তাবে কর্পাত করিতে রাজি হয় নাই। অপরপক্ষে যাহারা আত্মসমর্পণ করে, তাহারা বোমা ফেলিবার পূর্বেই করে যেমন ফরাসী, ইটালী।

লণ্ডন, কভেন্ট্রি, হামবুর্গ, বার্লিন, টোকিও প্রভৃতি ঘনবসতিপূর্ণ বিরাট নগরীর উপরে বোমা বর্ষণ করিয়া যে ফল পাওয়া যায় নাই, উত্তর ভিয়েৎনামের ছোট ছোট নগর গ্রামের উপর বোমা ফেলিয়া কি সেই ফল লাভ করা সম্ভব? আমেরিকার প্রচেষ্টার তুলনায় ইংরাজ ও ফরাসীরা এই সকল এলাকায় এক রকম যুদ্ধ না করিয়াই সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। অথচ তখন অল্প শস্ত্রে দুই দলে এত পার্থক্য ছিল না। আজ এশিয়ার সে অবস্থা নাই : এশিয়াবাসী মনে করে যে শ্বেতাঙ্গের দাগধ্ব অপেক্ষা মৃত্যুও বরণীয়। ভিয়েৎনামের লোকেরা মৃত্যু বরণ করিয়াছে। আজ তাহারা এশিয়াবাসীর আদর্শ : হো চি মিন আজ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নেতা।

[সমাপ্ত]

দুই সংস্কৃতি

দেবদাস জোয়ারদার

পূর্বেও আমাদের দেশে উচ্চনীচের পার্থক্য ছিল। সমাজে প্রভু-দাস, ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-মুখ এদের মধ্যে পার্থক্য যে ছিল না, তা নয়। কিন্তু এ যুগের মতো এই পার্থক্য এমন দুস্তর ছিল না। জমিদার বাড়ির প্রাঙ্গণে যাত্রার আসরে, চণ্ডীমণ্ডপে, স্নানের ঘাটে, গ্রামের হাটেবাড়ারে, বার্ষিক মেলায়, পূজা পার্বণে, আনন্দে-উৎসবে সকলের মিলনের বিস্তর সুযোগ ছিল। গ্রামের সকলে একই মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের কাব্য ও ধর্মরস সমবেতভাবে পান করতেন। অবসর বিনোদনের প্রতিটি উপায় ছিল সামাজিক, ব্যক্তিগত ছিল না। সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথটি প্রশস্ততর ছিল। এ যুগের মতো একলা আরাম কেদারায় শুয়ে কবিতা পড়া হতো না বা ঘরের কোণে বেতার যন্ত্র খুলে গান শোনা হতো না। যা কিছু আমোদ আফ্লাদ সকলে মিলে তা করা হতো। এ যুগের অবসর বিনোদন মানুষকে করে রাখে নিষ্ক্রিয় ও নিঃসঙ্গ। খেলার মাঠে বড়ো জোর বাইশজন খেলোয়াড় সক্রিয়, আর হাজার হাজার দর্শক নিষ্ক্রিয়। যে সাহিত্যের রস আশ্বাদন করছি, তার সৃষ্টিতে আমার আপনার কোনো অংশই নেই। সেদিনকার রসাস্বাদনই যে শুধু সমবেত ভাবে হতো তা নয়; সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিও যেন সমবেত ছিল। সে যুগের অভিনীত যাত্রার রসাস্বাদন ও এ যুগের সিনেমার রসাস্বাদনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। প্রথমটিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন, দ্বিতীয়টিতে লোকে লোকারণ্য সিনেমা হলের সজ্জননির্জনতা উপভোগ। সিনেমাহলে মিলনের পথটি রুদ্ধ, এমন কি অভিনেতার সঙ্গেও; মানুষগুলিও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু যাত্রা বা

নাটকের মতো যৌথশিল্পে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভূমিকায় সক্রিয়। সেদিনকার সাহিত্য সৃষ্টি ও পুঁথি নকল করা থেকে আরম্ভ করে আসর জমিয়ে সে সাহিত্যের রসাস্বাদন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলিত হতো। এ যুগের সব কিছুই বড়ো বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সমাজ-বিচ্ছিন্ন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এ যুগেই সমাজতান্ত্রিকতার জয়গান উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে।

সে যুগে শিক্ষিত অশিক্ষিতের স্বতন্ত্র সাহিত্য-সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিলনা। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সর্বনাশ। দুর্বৃত্তিক্রম্য ব্যবধান এ যুগের একটি মস্তবড়ো অভিশাপ। জমিদার আর গ্রামের প্রজার সাধারণ প্রজার মধ্যে যে দূরত্ব বিনিময়ের সুযোগ ছিল, এ যুগে কারখানার মালিক আর শ্রমিকের মধ্যে সে সুযোগটি নেই। অভিজাত ও অনভিজাত সাহিত্য-সংস্কৃতির মিলনসূত্র বেদন ছিন্ন হয়ে পড়ে, সেদিন দুই সংস্কৃতিরই সর্বনাশ। অথচ আমরা দেখেছি, ভারতের ইতিহাসের যুগযুগান্তরের সাধনা এই মিলনসূত্রকে ছিন্ন হতে দেয়নি। তাই বহিরাগত আর্থ সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় অনার্থ সংস্কৃতির এমন বিষয়কর মিলন প্রাচীনযুগে সম্ভব হয়েছিল। অর্থবৈদেশের স্তরেই এই মিলন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ভারতের মহান অভিজাত সংস্কৃত সাহিত্যের ধারাটির পাশাপাশি অনভিজাত লোকায়ত সাহিত্যের ধারা সেদিনকার মৌখিক ভাষা প্রাকৃত-পালি। অপভ্রংশের খাতে প্রবাহিত হয়েছে। আবার কখনো এই দুটি ধারা মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। লোক-চেতনাকে অঙ্গীকার করেই তো একমাত্র মহান সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব। কালিদাসের শকুন্তলা বা গ্যায়টের

ফাউন্টের মূলে ছিল লোক প্রচলিত গল্প। ভারতের রামায়ণ-মহাভারত যে এমন কালজয়ী হতে পেরেছে, তারও কারণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়ানো যুগ যুগান্তরের বিচিত্র লোককথা ও গাথার সমাবেশ ঘটেছে এই দুই মহাকাব্যে। শুণ্ডাচ্যের মূল পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত বৃহৎ কথার গল্প যে কি ভাবে বাণভট্টের মতো উচ্চস্তরের শিল্পীর ‘কাদম্বরী’ রচনার মূলে কাজ করেছে, এই তথ্যও এ প্রসঙ্গে প্রদ্বার সঙ্গে অরণীয়। উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনীটিও যে আসলে লোক প্রচলিত কাহিনী ছিল, এমন মনে করার কারণ আছে। কেননা এই গল্পটিও কথার স্রবস্যাগরের। এই কাহিনীই ভাসের ‘স্বপ্নবাসবদত্তা’ নাটক থেকে যেমনভাবে বর্ণিত বৃদ্ধ কথাকোবিনদের মুখে বিচিত্র রূপে ঘুরে ফিরে এসেছে। একই চারুদত্ত-বসন্তসেনার কাহিনীই যে ভাসের ‘চারুদত্ত’ নাটক থেকে শূদ্রকের ‘মৃচ্ছকটিকম্’ পর্যন্ত আবর্তিত হয়েছে, এর মূলেও এমন কোনো লোকপ্রচলিত কাহিনী ছিল কি না, কে জানে! এ সব তথ্য ও অনুমান উল্লেখ করার একটি মাত্র লক্ষ্য। অভিজাত সাহিত্যের বনস্পতি লোকচেতনার মুক্তিকাতেই অঙ্কুরিত হয়, আর এই মুক্তিকা থেকেই রস সংগ্রহ করে পত্র পল্লব পুষ্পশোভিত হয়ে উঠে। সংস্কৃত ভাষার শব্দ ভাণ্ডার একই গ্রহণাত্মক উজ্জল প্রমাণ। জনসাধারণের মুখের ভাষার শব্দকে কী উদারভাবে গ্রহণ করে তার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে! রামায়ণ-মহাভারত, অশ্বমেধ, ভাস, শূদ্রকের স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে কালিদাসোত্তর যুগে যেদিন এই সংস্কৃত ভাষা কৃত্রিমতার মধ্যে আশ্রয় নিল সেদিন থেকে এই ভাষার সঙ্গে জনসাধারণের যোগ আর রইল না। এ যুগেই সংস্কৃতের পাশ কাটিয়ে মুখের ভাষা প্রাকৃতে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ হলো। আরো পরে বিবর্তনের স্বাভাবিক পথ ধরেই ভারতীয় মাতৃভাষাগুলিতে সাহিত্য রচনার পথ উন্মুক্ত হলো।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে চৈতন্যোত্তর পর্বে অভিজাত-

অনভিজাতের মধ্যে বিধাবিভক্ত সমাজে যে আশ্চর্য প্রাণশক্তির প্রেরণায় লগ্নবুদ্ধি দেখা দিবেছিল, এই ইতিহাসতো আমাদের আরো অব্যবহিত অতীতের ঘটনা। চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগেই কৃত্তিবাস লোকায়ত ভক্তিতেতনা আত্মস্থ ক’রে সংস্কৃত রামায়ণের পথ ছেড়ে এক নতুন রামায়ণ রচনা করেছিলেন। চৈতন্যোত্তর যুগে ছড়া আর পাঁচালির সঙ্গীর্ণ সীমায় বন্দী মুকুন্দরায়ের মতো ব্রাহ্মণ কবি লোকায়ত চণ্ডীর সঙ্গে পৌরাণিক চণ্ডীর এক সহজ সমীকরণ ঘটানোর ‘চণ্ডীগঙ্গল’ কাব্যে। এই সমীকরণের মূলেও ছিল ঐ সময়স্ববুদ্ধি। লোকচেতনার স্তরে যে রাধাকৃষ্ণের ভাব ও কাহিনী প্রচলিত ছিল, তাকে স্বীকার ক’রেই মধ্যযুগের ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মহান্ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। যা কিছু মধ্যযুগের কবির রচনা করেছেন, তার রসভোজের ক্ষেত্রে সকলের অবাধ নিমন্ত্রণ ছিল। তাই দার্শনিকতায় সমৃদ্ধ বৈষ্ণব কবিতার রসান্বাদনে অশিক্ষিতের কোনোদিন বাধাসৃষ্টি হয়নি। বরং এ যুগে লোকসাহিত্যের প্রচারক দীনেশচন্দ্র সেনকে প্রজ্ঞা ভরে বলতে হয়েছে যে লোকসাহিত্যের অনেক মহয়া-মল্লয়ার ভাব তিল তিল করে সংগ্রহের পরেই রাধার মতো তিলোত্তমা সৃষ্টি বৈষ্ণব কবিতার সম্ভব হয়েছে।

কাজের মধ্যেই মানুষ মানুষের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিলিত হয়। আর এই কাজের ছন্দইতো লোক সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ছন্দ। ধান কাটার গান-ধানতোলায় উৎসব, বাইচের গান, ছাদপেটানোর গান-এগুলিইতো লোক সংস্কৃতির সম্পদ। কাজে যেখানে যতি সেখানেই অবসর। কাজের মধ্যে মানুষ মানুষের সঙ্গে যে বন্ধনে বাঁধা পড়ে সেই স্রষ্টা আরো দৃঢ় হয় অবসর-বিনোদনের বিচিত্র উপায়ে-ঐ গানে, ঐ উৎসবে। যে মানুষের কাজ নেই তার মানুষের সঙ্গে মিলনের পথটি সঙ্গীর্ণ। সেই সঙ্গীর্ণতার অযোগেই আসে ভেদবুদ্ধি আর বিচ্ছিন্নতাবোধ। মাঠের হিন্দু-মুসলমান কৃষক

বা কারখানার হিন্দুমুসলমান শ্রমিক যেমন ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও কাজের বন্ধনে বাঁধা, এমন বন্ধন একজন শহরবাসী হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের নেই। তাই বর্তমান শিক্ষার পাদপীঠ শহরকে ঘিরেই হিন্দু-মুসলমান বা যে কোনো সাম্প্রদায়িক-প্রাদেশিক কলহের আগুন জ্বলে উঠে।

আজকের শিক্ষায় আমরা পরস্পরেব যে পরিচয় পাচ্ছি, তাও আবার ঐ ভেদবুদ্ধির পরিপোষক। আমাদের ইন্সকুলে কলেজে পড়া ভারতের ইতিহাস হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের ইতিহাস। তুলাতান মামুদ, মুহম্মদ বোরির ইতিহাস; আউল-বাউল-কবীর-দাদু নানক, শতাব্দীর ইতিহাস নয়। অর্থাৎ সমাজের উচ্চস্তরের ইতিহাস। বৈষয়িক কারণেই এই স্তরে মানুষে মানুষে বিভেদ বড়ো বেশি তীব্র। অথচ সমাজের যে নিম্নস্তরে মানুষ মানুষের সঙ্গে সহজে মিলিত হচ্ছে, তার বিন্দু বিসর্গ পরিচয় আমাদের ইতিহাসে নেই। তা না থাকার একটি কারণ বোধহয় আমাদের ইতিহাসের খসড়াটি তৈরি করেছিলেন বিদেশী শাসক সাম্রাজ্যের যুরোপীয় ঐতিহাসিকের দল। সেই ইতিহাস পড়া ঐ ছকে বাঁধা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি-সম্পন্ন এ দেশী ঐতিহাসিকদের পক্ষেও সে খসড়াটি ছারিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে না। এ দেশী ঐতিহাসিকদেরও অভিজাত মানসিকতার গভীর অতিক্রম করা অনেক সময় সম্ভব হয়নি। উনিশ শতকের এদেশী বুদ্ধিজীবীরা যে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছিলেন, সে দেশ চোখে দেখা রক্তে অনুভব করা ভারতবর্ষ নয়; সে ভারতবর্ষ বেদ-উপনিষৎ-শাস্ত্র পড়া ভারতবর্ষ। তাই বড়োবেশি অভিজাত। স্বাভাবিক কারণেই সে ভারতবর্ষে ছেদ পড়েছে প্রাচীনযুগের অবসানে। তাঁদের আবিষ্কৃত প্রাচীন ভারতের সঙ্গে হিন্দু-ভারতের এক সমীকরণ ঘটেছিল। তাই উনিশ শতকের শেষপাদের ইতিহাস হিন্দুদের পুনরুজ্জীবন নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। অথচ এই ভারতের জীবনধারা মধ্যযুগের বহিরাগত ইসলামি ভাবভাবনার ঘাতপ্রতিঘাতে সম্বয়ের পথ ধরে যে চলছিল,

সে ইতিহাস উনিশ শতকে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

এই ইতিহাস বাংলাদেশে ক্ষতিমোহন সেনের পূর্বে কেউ আলোচনা করেছিলেন কিনা জানিনা। বাংলাদেশের পটভূমিতে সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোকে এই ইতিহাস বোধহয় প্রথম তুলে ধরেন দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্রের প্রস্তুতি পর্ব বাদ দিলে এই দুই ঐতিহাসিকের ইতিহাস সাধনাই বিশশতকের ঘটনা। দীনেশচন্দ্রের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থেব দ্বিতীয় সংস্করণ পড়ে তাই রবীন্দ্রনাথকে স্বাভাবিক কারণেই বলতে হয়েছিল যে এই গ্রন্থে হুসেন শা, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁর সঙ্গে যেটুকু পরিচয় হয়েছে তাতে ইতিহাস অনেকটা সজীব হয়ে উঠেছে। হিন্দু-মুসলমান যে কতো কাছাকাছি ছিল, কলহ-বিবাদের উর্ধ্বেও তাঁদের প্রাণ-বিনিময় যে সাহিত্যের উদার প্রাঙ্গণে সম্ভব হয়েছিল, এ একটি ‘যথার্থই সত্যতব্য’ কথা, ‘প্রকৃতপক্ষেই ঐতিহাসিক’। এ ‘দেশের কথা’ এ ‘লোকবিশেষের সংবাদ বিশেষ’ নয়। হুসেন-শা, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁর উচ্চস্তর থেকে সমাজের অত্যন্ত নিম্নস্তরে হিন্দু-মুসলমানের যুগযুগান্তরব্যাপী প্রাণবিনিময়ের শুভসংবাদ দীনেশচন্দ্রই জাতির কাছে তুলে ধরেন আরো পরবর্তী কালে ‘পূর্ব বঙ্গগীতিকা’ ও ‘মৈমনসিংহগীতিকা’ সম্পাদনার মধ্য দিয়ে। ‘লোক বিশেষের সংবাদ বিশেষ’ সন্ধানের উর্ধ্বে যে আরো ইতিহাসের মহত্তর স্ফুট থাকতে পারে, এ সত্য আমরা যুরোপীয় ঐতিহাসিকদের ভিক্ষালব্ধ ধনে কি কখনো জেনেছিলাম? আমাদের ধারণা, উনিশ শতকের শেষপাদে ঐ হিন্দুদের পুনরুজ্জীবন নামক ঘটনাটির তীব্র আঘাতে সে যুগের শিক্ষিত মুসলমান সাম্রাজ্য মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধের পক্ষকূণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে যে ভাবে শিক্ষিত হিন্দু ও শিক্ষিত মুসলমানের ব্যবধানকে ত্বর করে তুলে ছিলেন, এই আত্মঘাতী ঘটনাটি দীনেশচন্দ্র ও ক্ষতিমোহনের সারাজীবনব্যাপী সাধনার ফল যদি আমরা অল্প গবেষকদের কাছ থেকে উনিশশতকের অন্ততঃ পক্ষে

শেষ পাদে পেতাম, তা হলে বোধহয় ঘটতেনা। তাই বা বলি কি ভাবে? এ যুগেও কি দীনেশচন্দ্র-কৃতি মোহনের আবিস্কৃত সত্যের আলোক ইংরাজিতে দেখা ও পরীক্ষার্থীর মুগ্ধ করা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিচ্ছুরিত হয়েছে? আর বিচ্ছুরিত হলেই কি আমাদের মন তাতে আলোকিত হয়েছে? প্রচলিত ভারতের ইতিহাসে আজো মধ্যযুগ দুঃস্বপ্নক্লিষ্ট রাত্রি রূপে অঙ্কিত রয়েছে। মধ্যযুগের ভারতের জীবনে ও সাধনায় হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়প্রত্যয়ের কলধ্বনি আমাদের কানে এসে পৌঁচোচ্ছেনা। তাই এ-যুগের ইতিহাসকে অনেক শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের শুধু রণোন্মাদনার ইতিহাস বলে অবস্থা করছেন। পক্ষান্তরে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে এযুগের খুব কম শিক্ষিত মুসলমানই নিজেদের ইতিহাস হিসেবে গ্রহণ করতে পারছেন। কিন্তু এ সমস্ত ইরানীয় মুসলমানদের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। তাঁরা অনায়াসে ইসলাম-পূর্ববর্তী ইরানের ইতিহাসকে নিজেদেরই ইতিহাস বলে গ্রহণ করেছেন। এখানেই শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের ভেদবুদ্ধির মূল প্রসারিত।

অথচ আজ পর্যন্ত বলা হচ্ছে, অশিক্ষাই আমাদের ভেদবুদ্ধির কারণ। অশিক্ষা না বলে বলা উচিত কুশিক্ষা বা ভুলশিক্ষা। কেন না সমাজের অশিক্ষিত নিম্নস্তর সাম্প্রদায়িকতার কখনো কলুষিত হয়নি। যদি হযেও থাকে সেখানে কাজ করে শিক্ষিতদের প্ররোচনা। কবীরের পুর্বনো কথা এ যুগেও সত্য 'ঈ-টা ঈ-টা আগ হৈ কাদো কাদো লাগ' অর্থাৎ ছুইদিকের ইট পাথরের চৌকাঠকিতে আগুন জ্বলে, মূর্খ সহজ কাদায় কাদায় যোগ লেগে যায়। 'পটি পটি তো পথর ভরা লিখি লিখি ভরা জো ঈ-টা' অর্থাৎ পণ্ডিতেরা শাস্ত্র পড়ে পাথর হলেন, লিখে লিখে তাঁরা নীরস দধি ঝাঝা বনেছেন। কাদায় কাদায় মিলন সম্ভব। মিলন সম্ভব হয়না ইটের সঙ্গে ইটের। শিক্ষা ও অর্থের আগুনে পোড়ানো ইটের মতো হিন্দুর সঙ্গে অমুরূপ মুসলমানের মিলন অসম্ভব।

সমাজের নিম্নস্তরে যে সহজ মিলনের ধারাটি প্রবাহিত হিন্দু-মুসলমানের মিলিত লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির খাতে, তার স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে আমাদের অনেক রাষ্ট্রনেতারই জানা ছিল না। এ যুগেরও রাষ্ট্রনেতাদেরও এ দিকে আজো দৃষ্টি পড়েছে বলে মনে হয় না। কেন না আমাদের ভারতবর্ষ নিতান্ত ইংরেজি পুঁথি পড়া দেশ। তাই লোক সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মৈনন্দিন জীবনচর্যার ক্ষেত্রে গ্রামে গ্রামে যে সহজ মিলনের ভিত্তি প্রতিদিন নিঃশব্দে রচিত হচ্ছে, সেই ভিত্তিকে হুড়ুত করার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়েনি। ভারতের স্বাধীনতা-যোদ্ধারা রাজনীতিক রণক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের বিনিময়ে সেই হিন্দু-মুসলমান মিলনের মায়া মরীচিকার পিছনে ছুটেছিলেন। তাই আজ শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগের কাঁটা বনে আমাদের ক্ষতবিক্ষত হতে হচ্ছে। খিলাফত আন্দোলনের ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে গান্ধীজীর অসহযোগের আপোষ যে কতো নিরর্থক ও আত্মঘাতী, এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী এদেশে অরণ্যে রোদন হয়েছে।

সবচেয়ে দুঃখের কথা, পরাধীনতার বেদনাও হিন্দু-মুসলমানকে এক করতে পারেনি। তার একটি কারণ, আমাদের রাজনীতিক আন্দোলন অধিকাংশক্ষেত্রে সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ আন্দোলন যখনই গণ-আন্দোলনের রূপ নিতে চলেছে, তখনই জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ার ভয়ে সমাজের ঐ উচ্চস্তর আন্দোলনের রাশ টেনে ধরেছে। নেতাজী স্বভাষচন্দ্র পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের ভাবসংঘাতে ভারতে ১৯৪৫-৪৬ সালে যে গণজাগরণ দেখা দিচ্ছিল, রশিদআলি দিবসকে ঘিরে হিন্দু-মুসলমানের যে মিলিত অভ্যুত্থান তরঙ্গিত হয়ে উঠছিল, তাকে একদিকে সাম্প্রদায়িকতার চোরাবালিতে রুদ্ধ করা আর অত্মদিকে আপোষের পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের চেষ্টায় ব্যর্থ করার ইতিহাসতো নিতান্ত সাম্প্রতিককালের। সে বেদনাবহ ইতিহাস এখানে আর নাই বা স্মরণ করলাম।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি বুদ্ধিজীবীদের উচ্চস্তর থেকে কৃষক-শ্রমিক-সৈনিকদের স্তরে অবধি ছড়িয়ে পড়তে পারতো, তাহলে ভারতের আজকের রূপ সম্পূর্ণ বিপরীত হতো। কেননা সমাজের নিম্নস্তরে ভেদবুদ্ধির গূঢ়গর্প এমন আকস্মিক কণা বিস্তার করার সুযোগ পেতেন।

সাহিত্য-সংস্কৃতিও পরাধীন ভারতে হিন্দু মুসলমানকে একত্রে বাঁধতে পারেনি। স্বীকার করি, সাহিত্যের উদার প্রাঙ্গণেই মিলনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। পূর্বেই বলেছি উনিশশতকের শেষপাদে হিন্দুদের পুনঃস্থান নামক ঘটনাটির ভাবসংঘাতে শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের কাছ থেকে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দূরে সরে এসেছিলেন। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আমরা যতো প্রশংসাই পোষণ করি না কেন, এ সাহিত্য দেশের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবনরসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেনি। সেযুগে মুসলমান সমাজ ছিল শিক্ষায় অনগ্রসর। আসলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যবধানের মূলে হিন্দু-মুসলমানের ব্যবধান ছিল না। ব্যবধান ছিল সমাজের উচ্চ ও নিম্নস্তরের। এ ভাবেই এই ঘটনটিকে একটি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সূত্রপাত হলো। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য প্রাচীন ভারতের সঙ্গে হিন্দুদের এমনই সমীকরণ ঘটিয়েছিল যে সেখানে শিক্ষিত মুসলমানের পক্ষে সহজে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। বাংলা সাহিত্যে যে মুসলমানী জীবনচেতনার প্রবেশ পথটি রুদ্ধ ছিল, এ সম্পর্কে মধুসূদনের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর একটি চিঠিতে লিখছেন যে আমাদের সাহিত্য রচনায় 'Indo-mussulman subject' গ্রহণ করতে হবে। রিজিয়ার ঘটনা অবলম্বনে নাটক লেখার সঙ্কল্প একই চিঠিতে তিনি প্রকাশ করছেন। এই চিঠির সতর্কবাণীটি অবিস্মরণীয় 'The prejudice against Moslem names must be given up.' কিন্তু দুঃখের বিষয় রিজিয়ার কাহিনী অবলম্বনে বাংলার নাটক লেখার সঙ্কল্প মধুসূদনকে

বাধ্য হয়ে ত্যাগ করতে হয় এবং আশ্রয় নিতে হয়, 'an entirely Hindu subject' এ। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কথা এখানে বলা উচিত। উনিশ শতকের সব সাহিত্যিকদের মধ্যে মধুসূদনের মতো এমন বিস্তৃত কবিধর্মের প্রেরণার আর কোনো স্রষ্টা বোধহয় তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার পরিচয় দেননি। এজন্যই বোধহয় আগেকের পূর্ববাংলায় মধুসূদন এমন সাদর অভিনন্দন পাচ্ছেন সেখানকার সমালোচনা সাহিত্যে।

উনিশশতকের বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে বাংলালোকসাহিত্য-সংস্কৃতির বিশেষ যোগ ছিলনা। যদি জন্মলগ্নেই এই যোগ স্থাপিত হতো, তাহলে সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভব হতো। কেননা লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির স্তরে এই মিলনের চেতনা চিরকালই কাজ করেছে। অথচ ইংরেজিসাহিত্যের ইতিহাস বলছে, Thomas Percyর Reliques of English Poetry (১৭৬৫) নামক লোকগীতিকা ও কবিতা সংকলনের সঙ্গে ইংরেজি রোমান্টিক কাব্য আন্দোলনের নিবিড় যোগ ছিল। উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্য বড়োবেশি অভিজাত ও সংস্কৃত বা ইংরেজি ঘেঁষা। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কালের মতো এতো তৎপন্ন শব্দের ছড়াছড়ি ছিল না। সেখানে ছিল বেশি তদ্ভব শব্দ। অর্থাৎ বাংলা ভাষা যে প্রাকৃত অপভ্রংশের স্তরের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করেছে তার অস্পষ্ট পরিচয় ছিল। তাই এ ভাষা ছিল অনেক 'মাটির কাছাকাছি'। তাই এ সাহিত্যে সকলের ছিল অবাধ প্রবেশাধিকার। কিন্তু আধুনিক যুগের বাংলাসাহিত্য একেবারে প্রথম দিকেই সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতের স্পর্শ পেয়ে এমন এক রূপ লাভ করলো যে মনে হলো, এই বাংলাভাষা সোজাঅজি সংস্কৃত থেকে এসেছে। উনিশ শতকের নূতন বাংলাগদ্য মুখের ভাষার তোয়াকা রাখেনি। অথচ ডক্টর শহীদুল্লাহের মতে সে যুগেই মুসলমানী পুঁথিসাহিত্যে যে গদ্য প্রচলিত ছিল সেখানে মুখের ভাষার স্থান ছিল। এ যুগের

সম্মান এই যুগের সংস্কৃতে পণ্ডিত বাংলাগত লেখকদের জানা ছিল না। এমনকি মধ্য যুগের বাংলাসাহিত্যও যে তাঁদের খুব জানা ছিল, তা মনে করারও কারণ নেই। কেননা দীনেশচন্দ্র সেনকেই মধ্য যুগের বাংলাসাহিত্যের আবিষ্কারক বলা চলে। তাই সংস্কৃত ও ইংরেজির আদর্শে যে ভাষা ও সাহিত্য এ যুগে গড়ে উঠলো তার সঙ্গে জনসাধারণের ভাষা ও ভাবের বিশেষ যোগ রইল না। এ সাহিত্যের আকস্মিক সমুদ্রাভয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনসাধারণ চলতে পারেননি বলে সাহিত্যের সঙ্গে জনসাধারণের ব্যবধানটি দৃষ্ট হয়ে উঠলো। এজ্ঞে এক যুগে দাঁশরথির পাঁচালির পরবর্তী নকল ব'লে অভিযোগ করা হতো। দাঁশরথি শুধু শেষ খাঁটি রাঙালী কবি বলার কারণটিও এখানে আছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য নকল—এমন অশ্রদ্ধেয় অভিযোগ স্বীকার না করলেও এই ব্যবধানের কথা একটি ঐতিহাসিক সত্যরূপেই তুলে ধরছি। এ নুতন সাহিত্য হলো পড়ার জিনিষ, শোনার জিনিষ আর রইল না। তাই মধ্যযুগের কৃষ্ণবাসীরামায়ণ বা বৈষ্ণব কবিতার সর্বজনীন আবেদনের তুলনায় মেঘনাদবধ বা রক্তিমের উপত্যাকার আবেদন সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। এ ভাবেই প্রথম শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্ম হলো। শিক্ষিত মানুষ একদিকে মধুসূদন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পড়তে লাগলেন, অল্পদিকে অশিক্ষিত মানুষ মহাভারত-মল্লয়ার পালাগান শুনতে বা কৃষ্ণবাসীরামায়ণ শ্রবণে পড়তে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো, এই দুইদলের কেউ কাউকে জানেন না বা জানলেও অন্তরের যোগ নেই।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ও শিক্ষিতদের এই বিচ্ছেদ যে কখনো কখনো ছ' একজনকে ব্যথিয়ে তুলেছিল, তার কয়েকটি প্রমাণ এখানে তুলে ধরতে পেরে আমরা আনন্দ পাচ্ছি। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিস্টাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের যুগ্ম সম্পাদনায় যে 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়,

তার লক্ষ্য ছিল অস্পষ্ট-ব্রহ্মশিক্ষিতদের বোধগম্য ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা প্রকাশ। এ পত্রিকার প্রতি সংখ্যার আরম্ভে লেখা থাকতো—“বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।” উনিশ শতকীয় আভিজাত্যের গভী পেরিয়ে বারবার সে যুগের কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী এগিয়ে এসেছেন। এমনই যুগান্তকারী উদ্যমের পরিচয় দিয়েছিলেন শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিলেত থেকে দেশে ফেরার পরে। তিনি ‘ভারত শ্রমজীবী’ নামে মাত্র এক পরমা মূল্যের সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেছিলেন শ্রমজীবী ও সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্তে। বোম্বাইয়ের লোখাণ্ডের ‘দীনবন্ধু’ পত্রিকাও শ্রমিকদের প্রেরণা দিয়েছিল। ‘ভারত শ্রমজীবী’ পত্রিকা নাকি সে যুগে পনেরো হাজার মাসে মুদ্রিত হতো ও সে যুগের কলেকারখানায় ও গ্রামে গ্রামান্তরে প্রচারিত হতো। আমাদের দেশের শ্রমিক কল্যাণের ইতিহাসে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি উজ্জ্বল নাম। অশচি সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের জয়ধ্বনিতে মুগ্ধ এ যুগের আমরা কজন তাঁর নাম শুনেছি? ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিধা বিহীন সমাজের বেদনায় কাতর বঙ্কিমের উপদেশ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করছি। কেননা এ উপদেশের সার্বিকতা এ যুগে বেড়েছে বৈ কয়নি। “অশিক্ষিত বাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাজালার সর্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু অশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। অশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা থাকা চাই” (লোকশিক্ষা)। অশিক্ষিতে অশিক্ষিতে মিলনের অফল সাহিত্যে কিভাবে দেখা দিতে পারে, এ প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিস্তম্ভ মন্ডের কথা এখানে বলা যেতে পারে। তিনি প্রথমজীবনে ‘দাসী’ পত্রিকায় বাংলাব বিভিন্ন অঞ্চলে লোকপ্রচলিত ভাষার শব্দের অর্থসহ একটি তালিকা প্রস্তুত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি দ্বিতীয়

বর্ষের 'প্রদীপ' (১৮৯৮ খৃঃ) পত্রিকার লিখেছিলেন, "তাহা হইলে অনেক তথ্যকথিত অপ্রচলিত শব্দ আর প্রচলিত বলিয়া বোধ হয় না, এবং বঙ্গসাহিত্যের শব্দসারিস্রোত দুই হইবে। ইহাতে আরও এক লাভ হয় যে অনেক সময় নূতন কথার সৃষ্টি করিতে হয় না। তত্ত্ব চাষাভুষার ভাষা কথাসাহিত্যে অধিক প্রচলিত হইলে উহা জনসাধারণের প্রেমের দৃঢ় ও প্রশস্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, এবং উহা বাঙ্গালীর প্রাণের কথা ভাল করিয়া বলিবার ক্ষমতা লাভ করে।" প্রায় সত্তর বছর আগেকার এই কথাগুলিতে রামানন্দের যে উপর মনের পরিচয় পাই, তাতে এযুগেও বিশ্বয়বোধ করার কারণ আছে। বাংলাসাহিত্যকে 'মাটির কাছাকাছি' নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে এযুগেই বা আমরা ক'জন এমন ভাবে ভাবছি? এখন পর্যন্তও তো বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার কয়েক খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি অভিধান সংকলন করা সম্ভব হয় নি। আমাদের যুগের কথায় যে মণিমুক্তো ছড়ানো রয়েছে, সেগুলি সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারলে অপ্রয়োজনে সংস্কৃত শব্দও যেমন এড়ানো যেতো, তেমনি সাহিত্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের পার্থক্যও ঘোচানো যেতো। শুনেছি, ঢাকায় সম্প্রতি আঞ্চলিক ভাষার এমন অভিধান সংকলনের কাজ চলছে। অভিধানের নির্বাসনলোক থেকে পূর্ববাংলার সাহিত্যে যদি সে শব্দগুলি মুক্তি পায়, তাহলে বলতে হবে যে সেখানে এক যুগান্তকারী শুভ ঘটনা ঘটবে। বাংলার সব অঞ্চলের ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণ করে যদি কলকাতার বাংলাকে সমৃদ্ধ করা হতো, তাহলে এই চলতি বাংলাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যথার্থই সব অঞ্চলের একটি 'মদ্বিত ভাষা' বলতে পারতাম। এ ভাষাকে সহজেই সকলে নিজেদের ভাষা বলতে পারতেন। কিন্তু দ্বংধের হলেও স্বীকার করতে হয়, আজকের চলতি বাংলাকে সকলে নিজেদের ভাষা বলে ভাবতে পারছেন না।

পরিভাষা কঠকিন্ত আধুনিক যুগে ভাষার ব্যাপারটি নিয়ে অল্প দৃষ্টিকোণ থেকেও ভাবা যেতে পারে। হাটোবাজারে

হিসেব রাখতে গিয়ে আমাদের ব্যবসায়ী মহাজনরা যে সর্বলোক-প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করছেন, এ গুলিকে অনারাসেই কঠিন সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে এ যুগের 'একাউন্টেন্ট'র পরিভাষারূপে স্থান দেওয়া যেতে পারে। আজকাল পলিটেকনিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষার দ্রুত প্রসার চলছে। এ সব বিভাগ শিক্ষিত তরুণদের সঙ্গে দেশের সাধারণ শ্রমিক-কৃষক-রাজমিস্ত্রি বা কাঠের মিস্ত্রিদের ভাষার ক্ষেত্রেও বিচ্ছেদ রয়েছে। এই বিচ্ছেদের মূল কারণ এই শিক্ষিতের দল বই পড়েছেন ইংরেজিতে বা ইংরেজি পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ সৌভাগ্যবশতঃ জানলেও শব্দগুলি বড়োবেশি কঠিন সংস্কৃত। অথচ এ দেশের আবহমানকালের শ্রমজীবীরা প্রত্যেকটি জিনিষ বা চিন্তারই অত্যন্ত সাধারণ একটি নাম দিয়ে কাজ করে চলছেন। সেই শব্দগুলির সঙ্গে শিক্ষিতদের পাঠ্যসূত্রেই পরিচয় করিয়ে দেওয়া একটি কর্তব্য। আমাদের অভিজাত শিক্ষা ব্যবস্থা কি এই কর্তব্য পালন করছে? ছাত্রজীবন থেকেই মাঠ বা কারখানার সঙ্গে ছাত্রদের যোগাযোগ রাখলে এই কর্তব্য আপনা আপনিই পালন করা হয়ে যায়। পরিভাষার ক্ষেত্রে ভাষায় হিন্দুয়ানির রুগ্ন ধরাতে গিয়ে অপ্রয়োজনে সংস্কৃত শব্দ না এনে আইন আদালত সম্পর্কিত আরবি ফার্সি শব্দ ব্যবহার করলে পাণ্ডিত্যের অয়ধ্বজা উড়ানো যায় না সত্য, তবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে অসাধারণ শিক্ষিতজনের ভাববিনিময় সহজ হয়। আমরা যে ভাববিনিময়ের চেয়ে পাণ্ডিত্যের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ি, তার কারণ জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ও তাঁদের প্রতি আমাদের অবজ্ঞা।

আবার সাহিত্যের কথায় আসা যাক। বাংলাসাহিত্যে ভাষাকে অচ্ছন্দ করে তোলার জন্ম চলতি বাংলার পক্ষে বিবেকানন্দই প্রথম জোর দাবি জানালেন তাঁর গণতান্ত্রিক মনের প্রেরণায়। অথচ 'সবুজ পত্র'কে ঘিরে প্রথম চৌধুরীর চলতি বাংলা প্রবর্তনের মূলে এই

গণতান্ত্রিক মন বিশেষ কাজ করেনি। কেননা এই বাংলা বড়ো বেশি বৈঠকখানার বাংলা, মাটির গন্ধ তাতে কম। আমাদের গ্রাম্যজীবনে যে সহজ প্রবাদ প্রবচন ছড়ানো আছে, তার ক'টির সঙ্গে আমাদের মতো শহরে শিক্ষিতরা পরিচিত আছি? আমরা যে ভাষা শিখেছি, তা বই পড়ে; কানে শুনে নয়। তাই এ ভাষায় যতো না আভিজাত্য, তার চেয়ে অনেক কম স্বাভাবিকতা। অথচ ইন্ডিয়ামেটিক ভাষাব্যবহার ইংরেজিকে কতো সজীব করে রেখেছে! অতি আধুনিক লেখকের দল যে বাংলায় লেখেন, তাতে অনেক সময় আমাদের মুখের ভাষার প্রাদুর্ভাব হয়, আর লেখার ভাষাও ইংরেজি বাক্যের মতো অঘয়ের বাড়াবাড়িতে হাই তুলতে থাকে। তারও একটি কারণ সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতি দিনের জীবনযাত্রায় আমাদের ছুস্তর ব্যবধান। এই দুই ভাষা ও সংস্কৃতির অভিশাপ থেকে এই তুচ্ছ প্রবন্ধের লেখকের পক্ষেও মুক্তিলাভ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই এই প্রবন্ধের ভাষাতেও জনসাধারণের মুখের ভাষার প্রাপটি থাকছে না। এই ভাষাবিক্ষেপের নদীর এক পারে বসে রবীন্দ্রনাথের 'হৃদ' কবিতায় প্রেমিকের মতোই অস্ত্র পারের চাষাভূষাদের বলতে বাধ্য হচ্ছি 'সে ভাষা তুলিয়া গেছি'। এই ভাষাহারা শিক্ষিতের দল আমরা বোবা সেজে বসে আছি সভ্যমঞ্চে বক্তা হয়ে বা গ্রামোন্নয়নে মন্তো। তাকিয়ায় বি, ডি, ও হয়ে। শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, ভাবের ক্ষেত্রেও সমাজের উচ্চস্তরে যে সাহিত্যিকের জন্ম, তাঁকে সাধারণ মানুষের মুকভাবনা প্রকাশ করতে গিয়ে শৌচনীয় ও অপরিহার্যভাবে ব্যর্থতা বরণ করতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষের অনুভূতি, ভাষার ও সংলাপে মধ্যবিন্ত মানসিকতার আরোপ চলছে। তাই গণসাহিত্যের নামে অনেক সময় চলছে একধরনের অস্বাভাবিক সৃষ্টি। এ বক্তব্যের সমর্থনে এখানে উদাহরণ আর নাই বা দেওয়া হলো।

লোকভাষা, ভাব ও চেতনাকে আত্মগাং করেই অভিজাত

সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটে। এ কথা আগেও বলা হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্য যে মহৎ তার একমাত্র কারণ এ নয় যে এ সাহিত্য একদিকে বৈদিক-ঐপনিষদিক-কালিদাসীয় ভাবধারা, অন্যদিকে যুরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান দর্শনের চেতনাকে আত্মস্ব করে সমৃদ্ধি লাভ করেছে; তার চেয়েও গভীরতর কারণ রবীন্দ্রসাহিত্য অনভিজাত লোকচেতনার সৃষ্টিকান্তর থেকে রস সংগ্রহ করে পত্রপুষ্প পল্লব শোভিত হয়ে উঠেছে। মধ্য যুগের ভক্ত সাধকদের ভাবকে উত্তরাধিকার স্বত্রে তিনি কখনো জ্ঞাতসারে এবং তার চেয়েও বেশি অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করেছেন। অর্ধউলবাউল-ফকির-দরবেশদের অনুভূতি-লোকেও তিনি অবলীলায় প্রবেশ করতে পেরেছেন। লোক সংগীতের স্বরকে অনায়াসে তিনি ক্লাসিকস্বরের পাশে অভিজাত-অনভিজাতের বেড়া তুলে দিয়ে একসঙ্গে বসাতে পেরেছেন। আমাদের চিরকালের মরমী সাধকদের ভাষার রূপক-ইঙ্গিত-রহস্যকে এমনই অবলীলায় তিনি গ্রহণ করেছেন যে তার সঙ্গে অভিজাত ভাব-ভাষার পার্থক্য থাকেনি। তাই 'The Religion of Man' বক্তৃতায় উপনিষদের জ্ঞানের কথা বা শেলির কবিতার কথা বলেই পরমুহূর্তে তিনি বাউলগানের কথা একইস্বত্রে বলতে পেরেছেন। নদী, মাঝি, খেরা পারাপার, যাত্রী-যাত্র, অল্পপরতন, ছন্দর সমুদ্র, ফুল ফোটানো, গন্ধ ছড়ানো, দেহের খাঁচা, অন্তর-পাশি, ভবের হাটে কেনাবেচা—এমনি কতো লোকচিত্তার রূপক রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। লোকহৃদ স্বরবৃত্তকে একই বেড়া ভাঙার উৎসাহে রামপ্রসাদের মতো কবিদের অনুসরণে তিনি তাঁর গভীর ভাব প্রকাশের উপযোগী করে তুলেছেন। আমাদের আলোচ্য দুই সংস্কৃতির বিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথকে যেমন বাধিয়ে তুলেছিল, এমন আর কারো কথা আমাদের জানা নেই। তাই এই বিচ্ছেদ যোচনের জন্য রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন তাঁর সারাজীবনব্যাপী

সাধনায়। তবু যে এ সাহিত্য জন সাধারণের গ্রহণযোগ্য হয় নি, তার কারণ জন সাধারণকে শিক্ষিত করে তোলায় আমাদের শোচনীয় ব্যর্থতা আর এ সাহিত্য-সংগীতকে আভিজাত্যের সঙ্গীত গণ্ডিতে আঁকড়ে রাখার ব্যর্থপরতা।

সাম্প্রতিক কাল থেকে এই দুই সংস্কৃতির বিচ্ছেদের দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুধর্মের সঙ্গীতায় আচ্ছন্ন উগ্র হিন্দী প্রেমিকের দল একই ভেদবুদ্ধির উৎসাহে জনসাধারণের মুখের ভাষা উর্দু যেশানো হিন্দুস্থানীকে পাশা দিচ্ছেন না। হিন্দী ও হিন্দুকে কোথাও কোথাও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে এক করে ফেলা হচ্ছে। হিন্দুস্থানীর পরিবর্তে তাঁরা সংস্কৃতভাষা এক কৃত্রিম হিন্দী চালানোর চেষ্টা করেছেন। অথচ গান্ধীজী থেকে নেতাজী পর্যন্ত সে যুগের সকল স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা ঐ সহজ সরল মুখের ভাষার হিন্দুস্থানীরই জয়ধ্বনি তুলেছিলেন। বাংলা দেশেও রবীন্দ্রযুগে এক কৃত্রিম মুসলমানী বাংলা, হিন্দু-মুসলমানের ভাষা বিচ্ছেদের জন্মে, একদল লেখক চালাতে চেয়েছিলেন। এ চেষ্টা প্রতিহত হয়েছে সম্প্রতি পূর্ববাংলায় বাংলাপ্রেমিক মুসলমানদের চেষ্টায়। বাংলা ভাষার স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়ে যে কোনো আরবি-ফার্সি শব্দই বাংলার চলতে পারে। তারই স্বাস্থ্যকর নমুনা পূর্ববাংলার সাহিত্যে আজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মধ্যবিস্ত ও জনসাধারণের মধ্যকার যে পার্থক্যের জন্ম উনিশ শতকে দুই সংস্কৃতির মিল, এ পার্থক্য মোচনের ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার উদীয়মান মুসলমান মধ্যবিস্তদের কর্তব্য ছিল। হিন্দু মধ্যবিস্তের সঙ্গে সাধারণের বিচ্ছেদের আত্মঘাতী দৃষ্টান্ত সামনে রেখে তাঁরা আজ এই পথ এড়িয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু পূর্ববাংলার কিছু কিছু ধবর বা জানতে পারছি, তাতে মনে হয়না যে তাঁরা এ পথ এড়িয়ে যাচ্ছেন। বরং সেখানে উনিশ শতকের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলছে। সেখানে স্তবিধা ছিল অনেক। এই উদীয়মান মুসলমান মধ্যবিস্তদের বাপচাচার এক পুরুষ

আগেও গ্রামেরই কৃষক ছিলেন বা এখনো আছেন। কেননা সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য এই মুসলমান মধ্যবিস্ত সমাজটির উদ্ভব পাকিস্তান সৃষ্টির পরে। বাস্তব্যাগী হিন্দুমধ্যবিস্তদের শূন্যস্থানে এই সমাজটির আবর্তিত। এই সমাজটির পক্ষে গ্রামাশ্রয়ী সংস্কৃতির সঙ্গে আঙ্গিক যোগ অনুভব করা হিন্দুমধ্যবিস্তের তুলনায় সহজ। শুধুমাত্র ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত লোকসংগীতের প্রাচুর্য বা পূর্ববাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যক্রমে লোকসাহিত্যের স্থান দানের মধ্যেই গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে মধ্যবিস্ত সমাজের প্রাণের যোগ প্রমাণিত হয় না। কিন্তু অস্ববিধা হচ্ছে, জীবনের পাদনীঠই পাণ্টে যাচ্ছে - গ্রাম থেকে শহরে। শহরগুলির সঙ্গে গ্রামের স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকেনা। যে ভাবেই হোক, আজকের দুই বাংলাতেই এক সমস্যা - দুই সংস্কৃতির সমস্যা। একদিন এই দুই সংস্কৃতির সমস্যাকে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা বলা হতো। অথচ দেখা যাচ্ছে, ঢাকার বাঙালী মুসলমান ব্যারিষ্টারের সঙ্গে গ্রামের বাঙালী মুসলমান কৃষকের মধ্যে ধর্মের এক্য থাকা সত্ত্বেও দুই সংস্কৃতির বিচ্ছেদ রয়েছে। গ্রাম ও শহরের ভিত্তিতে দুই সংস্কৃতির তিস্ততা সবদেশেই ইতিহাসের একেকটি যুগে থাকে। ইংরেজি ভাষায় অর্থের দিক থেকে Village এর সঙ্গে সম্পৃক্ত Villain এর অর্থ ছিল গ্রামের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ। আজকের ইংরেজী ভাষায় এ শব্দের অর্থপার্থক্যের মূলে আছে গ্রামের মানুষের প্রতি শহরের মানুষের অবজ্ঞা। নাগরিক অর্থে বাংলায় 'নাগর' শব্দের অবৈধ প্রণয়ীরূপে প্রয়োগের মূলেও শিথিল যৌন বোধে বিপর্যস্ত শহরের প্রতি গ্রামের মানুষের অবজ্ঞা কাজ করেছে।

গ্রামের সাধারণ মানুষের তবু একটা সাম্প্রতিক জীবন একদিন ছিল বা আজো কিছু কিছু আছে। কিন্তু শহরের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি বলতে প্রায় কিছুই নেই। জীবিকার ভিত্তিতে জীবনযাত্রার ছকটির সঙ্গে প্রতিটি মানুষের

সাংস্কৃতিক চেতনার নিবিড় যোগ আছে। আমাদের দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে এই জীবিকার ভিত্তিতেই সংস্কৃতিতে বিস্তার পার্থক্য। যাত্রা—পাঁচালি—লোকগীতির স্তরে কৃষকের মনের তবু কিছুটা মুক্তি; সে মুক্তি শ্রমিকের নেই। শহরবাগী শ্রমিক মনের দিক থেকে আরো রিক্ত। তাঁর অবশর বিনোদন তড়ি আর মদে বা রুচিহীন সস্তা সিনেমায়। শ্রমিকতো ‘রক্তকরবী’র ফাঙলালের ভাষায় “পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭৮”। কৃষকের মতো শ্রমিকের হুমুমান-সীতার কাহিনী বা বাউল-ভাটিয়ালিগান কোনো কিছুয় সঙ্গেই পরিচয় নেই। তাঁকে স্বাভাবিক গ্রামের জীবন থেকে টেনে আনা হয়েছে শহরের বস্তিতে। এই বস্তিতেও তাঁকে কোনো নূতন সাংস্কৃতিক জীবনের আশাদ দেওয়া হয়নি। শ্রমিককে শুধু রাজনীতিক মডলবজারি হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছে দাঙ্গায় বা মিছিলে।

এই আলোচনা থেকে মনে হতে পারে, দুই সংস্কৃতির বিচ্ছেদের মূল কারণ এখানে বলা হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষকে। ইংরেজি শিক্ষার প্রগাদ যদি সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়তো, তাহলে এই বিচ্ছেদের কথা এমনভাবে উঠতোনা। প্রথমদিকে যে Filtration Theory অর্থাৎ সমাজের উচ্চস্তর থেকে ইংরেজি শিক্ষার রসজ্যোত চুইয়ে পড়ার কথা হয়েছিল, তা কার্যকরী হলে অবস্থা অন্তরকম হতো। কিন্তু আজ পর্যন্তও তা হয়ে উঠেনি। কেননা ইংরেজি শিক্ষিতের স্তর থেকে এই শিক্ষার রসজ্যোত চুইয়ে পড়ার কোনো পথই খোলা রাখা হয়নি। এই বিচ্ছেদ এমন সর্বনাশা হয়ে উঠেছে। অষ্ট উনিশ শতকের আগে অভিজাত ভাবভাবনাকে সমাজের সর্বস্তরে লোক শিক্ষার বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। পৌরাণিক গালগল্পে গুঁড় সত্যকে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য ভাষায় একদিন দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই সে যুগের নিরক্ষরকে অশিক্ষিত বলা যেতোনা। সংস্কৃত বা আরবি-ফার্সিতে শিক্ষিতদের সংখ্যা সেযুগে এমনই মুঠিমের

ছিল যে তাঁরা একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারেননি। তাঁদের তুলনায় ইংরেজি শিক্ষিতদের সংখ্যা এযুগে বেড়েছে। তাই তাঁদের পক্ষে জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরে এসে একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ভিত্তি রচনা সম্ভব হয়েছে। লোক শিক্ষার নূতন নূতন আয়োজন এ যুগে হয় নি। যা হয়েছে তাও সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। রেডিও সিনেমার সুযোগ সাধারণ মানুষ কজন পাচ্ছেন? সিনেমার মধ্যে লোকশিক্ষার আদর্শের চেয়ে বাণিজ্যিক স্বার্থ বেশি কাজ করেছে। সরকারের Folk Entertainment বা লোকরঞ্জন শাখা নামে যে বিভাগটি আছে, এঁদের আয়োজিত নাটক বা ভ্রম্য অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষকে নিমন্ত্রণ বা প্রবেশ-পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, এই প্রবেশপত্র সরকারী কর্মের স্তরবিভাগ অনুযায়ী বণ্টন করা হয়। কৃষক-শ্রমিক-কুলি-মজুরদের কেউ কখনো এ সব অনুষ্ঠানের প্রবেশ পত্র পেয়েছেন বলে জানা নেই। অর্থাৎ লোকরঞ্জনের নামে এই সংস্কৃতির তেল তেলমাখায় ঢালা হয়।

আগল কথা, যাকে এখানে বলা হচ্ছে একটি সাংস্কৃতিক সমস্যা, সেটি আসলে আর্থিক ও তারই ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিভাগের সমস্যা। এক কথায় ধনবৈষম্যের সমস্যা। ‘রাশিয়ার চিঠি’তে রবীন্দ্রনাথ এই ধনবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে সে দেশে কিভাবে শহর ও গ্রামের বা ধনী ও দরিদ্রের সাংস্কৃতিক পার্থক্য ঘুচে যাচ্ছে, তার বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। ধনবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান নিহিত। এই সংগ্রামের উপযোগী পরিবেশ রচনার জন্মেও লোকশিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যাপক গণ-জাগরণ চাই। তাই এই মুহূর্তে অনেক কর্তব্য আছে। গ্রামগুলিকে তৃতীয় শ্রেণীর শহরে পরিণত না করে গ্রাম রেখেই উন্নত করতে হবে। শহর ও গ্রামগুলির মধ্যে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা চাই। শহর ও গ্রামের এই ঋণ-ঋণ সম্পর্ক প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে ছিল না। লোকশিক্ষার আধুনিক

মাধ্যম সিনেমা-রেডিও-প্রদর্শনীগুলিকে ভালো ভাবে কাজে লাগাতে হবে। ছবির আবেদন নিরক্ষরের মনেও লাগায়। প্রদর্শনীতে ছবির মধ্য দিয়ে গণচেতনতা লাগিয়ে তোলা অনেক সহজ কাজ। রবীন্দ্রনাথ বিদেশী ছাঁদের সভার পরিবর্তে মেলা বসানোর উপদেশ দিয়েছিলেন। এ উপদেশে তখন আমরা কান দিইনি, এখন বোধহয় কান দিতে পারি। এই সমস্ত আয়োজনকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে এনে লালফিডের ফাঁসি গলায় জড়িয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের মধ্যে যে আত্মশক্তি জাগানোর কথা বলেছিলেন সেই আত্মশক্তির দিকে দৃষ্টি ফেরানো অনেক ভালো। গত যুগের লোকশিক্ষার মাধ্যম যাত্রা-পাঁচালি-কথকতার আধুনিকীকরণ ও পুনরুজ্জীবন অবশ্য কর্তব্য। সবচেয়ে বড়ো কাজ নিরক্ষতার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ক্রান্তিহীন অভিযান। এ কাজে ছাত্রছাত্রীদের ছুটির দিনগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। তাহলে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি ও মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের আলো বাতাস ছড়িয়ে দেওয়ার জন্তে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার ছুটির দিনগুলিতে সমাবেশের একটি পাঠ্যক্রম আবশ্যিক করা চাই। আশার কথা, চতুর্থ নির্বাচনোত্তর মিলিত রাষ্ট্রসভা ও লোকসভায় প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণেও এই পরিকল্পনা স্থান পেয়েছে। ভাষণ থেকে এই পরিকল্পনাকে হাটে-মাঠে-কারখানায় মুক্তি দিতে না পারলে আমাদের বিছাও যেমন পুঁথি ঘেঁষা থেকে যাবে, তেমনি চিরকালের মতো দেশের বুদ্ধিজীবীরা দেশের মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকবেন। কৃষির উন্নতি থেকে জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণ,—আজকের ভারতের প্রতিটি সমস্তার সমাধানের চাবিকাঠি রয়েছে ব্যাপক লোক-শিক্ষার আয়োজনে। আর সর্বোপরি যাকে বলা হচ্ছে ছাত্র-বিশৃঙ্খলার উচ্ছ্রিত উৎসাহধারা তাও একটি স্বজনীশ্রোতে প্রবাহিত হতে পারবে ঐ আবশ্যিক পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের ফলে। শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকমূল্যবোধসৃষ্টির

উপর গুরুত্ব আরোপ করা চাই। কনভেন্ট, খৃষ্টানমিশনারী, রামকৃষ্ণমিশন, সরকারি-বেসরকারি ও পাব্লিক ইস্কুল কলেজের যাবতীয় শ্রেণী বৈচিত্র্য আজকের শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক হতে দিচ্ছে না। উচ্চস্তরের ইস্কুল কলেজগুলি ভাবীকালের শাসকসৃষ্টির কারখানা হয়ে উঠছে। শাসকের আত্মাভিমান ও জনসাধারণের জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ এ সব ইস্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মনে ছোটবেলা থেকেই গেঁথে দেওয়া হচ্ছে। ইস্কুল কলেজের এই শ্রেণী-বৈচিত্র্য তুলে দিয়ে এগুলিকে করতে হবে নিরাত্মক ও স্বল্প ব্যয়ের উপযোগী। বনীবরিস্ত্রের শিক্ষার ক্ষেত্রে গত যুগে অন্ততঃ পক্ষে এমন দুস্তর পার্থক্য দেখা দেয় নি। গ্রামের একই পাঠশালার সমাজের সর্বস্তরের ছেলেমেয়েরা পড়ার সুযোগ পেতো। তাতে আর যাই হোক শিশুমনে এই পার্থক্যবুদ্ধি এমনভাবে স্থায়ী হতোনা। সাধারণ জীবনের সঙ্গে একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় সেখানকার ছাত্রদের হতো। ভগবানচন্দ্র বসু তাঁর ছেলে জগদীশচন্দ্রকে সাধারণ ইস্কুলে পড়িয়ে মুচি-জেলেদের ছেলেদের সঙ্গে সহপাঠী হিসেবে মেশার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আর এই সুযোগে উদ্ভিদ ও জীবজগতের বিচিত্র রহস্যে বালক জগদীশচন্দ্র আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একথা তাঁর আত্মস্মৃতি থেকেই জানতে পারি। অন্য দিকে সমৃদ্ধ গৃহশিক্ষার বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে কাটিয়েও তাঁরই বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের জন্তে ঘোঁবনে পদ্মাতীরে বাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তবুতো রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত এ সুযোগ পেয়েছিলেন। আমাদের দেশের ধনী পরিবারের অনেক ছেলেমেয়েরা এই সুযোগ থেকে চিরদিনের মতো বঞ্চিত থাকে।

ইংরেজি শিক্ষাকে দিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নুতন নুতন শহরের জন্ম, বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের এদেশী অহুচর সৃষ্টি, মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিকতা থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজ-

ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে উত্তরণ আর স্বাভাবিক ভাবেই আংশিক শিল্পায়ন ভারতবর্ষকে এক মিশ্র অবস্থার মধ্যে রেখেছে। এগুলির কোনোটিই এদেশে সর্বব্যাপী হতে পারে নি। তাই সামন্তরাজাদের দাপট থেকে পুঁজিবাদীর আধিপত্য, গ্রামের শ্রীহীনতা থেকে শহরের চোখাখানো আলো সব কিছুই ভারতে পাশাপাশি রয়েছে। পুঁজিবাদের ক্রম প্রসারের পরবর্তী ধাপ হিসাবে ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে যেমন সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ছড়িয়ে পড়ছে, ঠিক তেমনি অল্প অঞ্চলে সামন্তরাজাদের স্বার্থরক্ষার জন্য শেষ মরণ কামড়ও দেখা যাচ্ছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনোত্তর ভারতে অকংগ্রেসী সরকারগুলির চরিত্রগত পার্থক্যের মধ্যেই এ দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। একদিকে কোনো দলের অবাধবাগিণ্ডের দাবি, পরিকল্পিত অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গো-হত্যার বিরোধিতা; আবার কোনো দলের অল্পদিকে ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় ব্যবসা বাগিণ্ডের জাতীয়করণের দাবি। এ ভাবে বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার আজকের ভারত আন্দোলিত হচ্ছে। আমাদের মনে গণসাহিত্য সৃষ্টির বা জনসাধারণের রাজনীতির ক্ষেত্রে যতো আগ্রহই জন্মাক না কেন, এ সাহিত্য বা রাজনীতির পথে মস্ত বড়ো অন্তরায় এই দুই সংস্কৃতির দ্বৈতক্রম্য ব্যবধান। গণতান্ত্রিক ভারতে যে ভাবে প্রাক্তন দেশীয় নৃপতি, শিল্পপতি বা উচ্চমধ্যবিত্তের প্রাধান্য চলছে, এদিকে তাকালেই এ কথা সত্য মনে হবে। এমনকি নির্বাচনের সময় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতার চেয়েও আমরা ঐ অভিজাত মানসিকতার অনির্দেশ্য আকর্ষণে নির্বাচনপ্রার্থীর বংশগত মর্যাদার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। ক'জন শ্রমিক বা কৃষকের ছেলে আজ পর্যন্ত নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন বা উচ্চতর প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন? অনেক আশ্চর্যকর যে দিন ভারতে দেখা দেবেন, সেদিনই এদেশের গণভ্রমের সাফল্য। শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনের নেতৃত্ব সেদিন মধ্যবিত্ত সন্তানের হাত থেকে ঐ শ্রমিক-কৃষকের ছেলেরাই নেবেন। আমরা সেদিনের প্রতীক্ষায় আছি। সেদিন শোখিন রাজনীতির শেষ হবে আর গণ-রাজনীতির আরম্ভ হবে। ভারতের যে সব অঞ্চলে পুঁজিবাদ ও শিল্পায়ন দ্রুত প্রসারের ফলে মধ্যবিত্ত নামে

চিহ্নিত সম্প্রদায়টি সর্বহারার পরিণত হতে চলছে সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জীবিকার ছক এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে এতোকালের মধ্যবিত্ত সন্তান কারখানায় ট্রেনিংয়ের বা পলিটেকনিকের ছাপ নিয়ে নিপুণ শ্রমিক বা রাস্তার ফুটপাথেব দোকানদার বা বড়ো ভোর কাটরার দোকানদার হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ দেখছে না। তাই আশা করা যায়, এমন দিন আসছে যে দিন সর্বহারার নবজাগরণে ভারতের এ সব অঞ্চলের মানুষই নেতৃত্ব দেবে। সেদিন কারিগরিবিদ্যায় নিপুণ শ্রমিকের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকের সাংস্কৃতিক পার্থক্যও লুপ্ত হবে। প্রাথমিক শিক্ষকদের সমর্থনে কলেজের শিক্ষকদের রাজপথে নেমে আসায় বা মাধ্যমিক শিক্ষকদের সমর্থনে শ্রমিকদের উৎসাহ—এ সব বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর মিলনের যে সম্ভাবনা মাঝে মাঝে দেখা যায়, তার মধ্যে যুগান্তরের লক্ষণ সূচিত হচ্ছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, মধ্যবিত্তের এই সর্বহারা চেতনার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের রূপান্তর পশ্চিমবঙ্গেই বেশ দ্রুত ও নিশ্চেষ্টে ঘটে যাচ্ছে। এই দ্রুত রূপান্তরের মূলে ১৯৪৭ সালের বঙ্গভঙ্গ। দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্ত সমাবেশ, লক্ষ লক্ষ মানুষের পায়ের তলার মাটি হারানো—এ সব ঘটনা বেশ সক্রিয়। তাই আশা করা যায়, মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্তের নবজাগরণে বাংলাদেশ উনিশ শতকে যে নেতৃত্ব দিয়েছিল, যে বাঙালী আজ সর্বহারা হয়ে যাওয়ার ফলে এই জাগরণের নেপথ্যে চলে যাচ্ছে, সেই বাঙালীই অচিরকালের মধ্যে ভারতের সর্বহারার বৃহত্তর ও মহত্তর নবজাগরণে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে সকলের অগোচরে প্রস্তুত হচ্ছে। তুর্কী আক্রমণের বিপর্যয় থেকে চৈতন্যমুগে বাঙালী যেমন নবজন্ম লাভ করেছিল, ঠিক তেমনি দেশবিভাগোত্তর বিপর্যয় থেকে বাঙালীর সম্ভাব্য নবজন্মের লগ্ন সেদিনই ঘনিয়ে আসবে। সীমান্তের ওপারেও পূর্ববাংলার মুসলমান বাঙালী চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে ধীরে ধীরে নবজন্মের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হচ্ছে। আশা করি, বাঙালীর সেই নবজন্মের দিনে দুই সংস্কৃতির অভিশাপ থেকে মুক্তি ঘটবে। সেদিন এই মুক্তির আলোয় সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

জীবনানন্দঃ কবিমানস ও কাব্য-ভাবনা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

এক

জীবনানন্দ দাশ আধুনিক বাংলা কবিতায় নির্জনতম কবি, প্রকৃত প্রস্তাবে বলা যেতে পারে নিঃসঙ্গতম কবি। প্রাকৃতিক পরিবেশে নৈসর্গিক দৃশ্যরম্যতায় যে কবি-প্রকৃতির স্বাভাবিক সৃষ্টি, উত্তরকালের কবিতাবলীতে সেই কবিই নাগরিক পরিবেশে নিঃসঙ্গ একক যাত্রায় নিরবধিকালের সঙ্গী, অন্ধকার থেকে আলোকের উজ্জ্বলতার উত্তরণের প্রত্যাশী। বস্তুত, জীবনানন্দ গোড়ার দিকে প্রকৃতির কবি হিসেবেই চিহ্নিত; তাঁর চিত্ররূপময় কবিতা বলীতে স্তম্ভর অলোকসামান্য দৃশ্যপট এবং এই দৃশ্য সমাবেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালী কাব্যপাঠক অসামান্য অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। এই অভিজ্ঞতার চিহ্নগুলি, আধুনিক বাংলা কবিতায়, ইতিপূর্বে আর এরূপ বিশদ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ধরা পড়েনি। প্রকৃতিকে জীবনানন্দ মুক্তি দিয়েছেন তাঁর কবিতায়, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নৈসর্গিক পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিষয়ক সমগ্র কাব্য পড়বার পরেও পাঠকের অমুভাবে সম্পূর্ণ নতুন; বাঙলা দেশের আকাশ বাতাস রৌদ্র আলো মাঠ নদী, নতুন দৃশ্যের উন্মোচন করতে থাকে। কিন্তু জীবনানন্দ কোনো মুহূর্তেই পরিতৃপ্ত কবি নন, এবং এখানেই তাঁর কবি হিসেবে যোগ্যতা। স্বপ্নের হাতে তিনি ধরা দিতে চেয়েছেন কিন্তু ধরা দিতে পারেন নি। মিনারের মতো মেঘ, সোনালি চিলের ডানা,

বেতের লতার নীচে চড়ুয়ের ডিম, নরম জলের নদীর গন্ধ, গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে খড়ের চালের ছায়া, নিবিড় বটের নিচে লাল-লাল ফল, বাতাসে ঝিঝির গন্ধ তাঁর কবিতায় আলো-অন্ধকার তরঙ্গিত মায়াবী জগৎ সৃষ্টি করলেও সমগ্র জীবনানন্দীয় কাব্য-শরীরে এই বিচিত্র জগতের অভিজ্ঞতা একটি পর্বায় বা অংশমাত্র, জীবনের প্রতি আগ্রহ বাঁচবার জন্তে আকাজকা এই অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু সেই সঙ্গে মাহুঘের শেষপরিণাম মৃত্যুতে এবং মৃত্যুজনিত আত্মবিলোপে—এই গভীরতর বেদনাসঞ্চার অমুভূতিতেও তাঁর কাব্যলোক স্পন্দিত। এই স্রষ্টাই ইতিহাসবোধ জীবনানন্দের কাব্য জগৎকে সং ও শ্রেষ্ঠ কবিতার অঙ্গাঙ্গী করে তুলেছে; সময় ও কাল সম্পর্কে তাঁর কবিতার সঞ্চারিত সেই সচেতনতা যা সজীবতার সাক্ষী, নিরন্তর প্রগতির নামান্তর।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' জীবনানন্দের কাব্য-রচনার প্রস্তুতিপর্ব; এখানে তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ নিজস্বতা অর্জন করেনি। তৎকালীন প্রচলিত কাব্যভাবনা ও কাব্য-রীতিতে সে-গ্রন্থের কবিতাবলী অমুরগিত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা থেকে 'ঝরা পালক'-এর উচ্চারণভঙ্গী তেমন স্বতন্ত্র নয়। 'মক্কু' 'বিথারিয়া' 'সমর্পিয়া' 'সন্তরি' এবং এ রকম আরো বহু শব্দাবলীর ব্যবহার অনায়াসেই তাঁর কবিতাকে প্রচলিত তৎকালীন কাব্যরীতির সমীপবর্তী করে তুলেছিল। বস্তুত,

কোন দূর জাহ্নপুর-রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি
বাস্তবের রক্তভটে আসিলে একাকী,
স্ফটিক আলোকে ভব বিখারিয়া নীলাম্বর খানা
মৌন স্বপ্ন-ময়ূরের ডানা।

প্রভৃতি স্তবক-বিশ্বাস যে জীবনানন্দেরই রচনা এরকম ধারণা করা তাঁর পরবর্তী কবিতার পাঠকের পক্ষে শক্ত। কিন্তু তৎসঙ্গেও 'স্বরা পালক'-এ জীবনানন্দীয় বৈশিষ্ট্যের অঙ্কুর লক্ষ্যণীয়। মাঝে মাঝে সেই সব পংক্তির হঠাৎ আলোর ঝলকানি, জীবনানন্দের পরবর্তী কালের কবিতায় যার সচ্ছন্দ বিশ্বাস কবিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উন্মোচিত করেছে। 'বনের ছায়ার নিচে কার ভিজে চোখ' কিংবা 'ভিজে ঘাস—হেমন্তের হিম মাস—জোনাকির ঝড়' ইত্যাদি 'স্বরাপালক' কাব্যগ্রন্থেই ইতস্ততঃ দ্রষ্টব্য।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকেই জীবনানন্দের প্রকৃত পথ-পরিক্রমা শুরু, এখান থেকেই তিনি চলেছেন মহাপৃথিবীর পথে, সাতটি তারার ভিমির অলৌকিক অমুভব এনেছে তাঁর কাব্যভাবনায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' সৌন্দর্যের, রসের অমুভবের লঘু মুহূর্তের উজ্জলতা।

আমি বলি এই কদম্বেরে

সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়।

এবং কবি কাব্যপাঠককে নিয়ে যেতে পারেন অমুভবের সেই একান্ত গভীরে যেখানে নতুন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক অভিনব জগতের ব্যাপকতা। এই জগতে সব দৃশ্যই রসঘন আনন্দ-ময়, যে-কোনো উল্লেখই রহস্যাবৃত উদ্দীপনা।

আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের' পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস রোদ, মাছ রাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস;

তাদের আনন্দলোক স্বভাবতই আন্তরিক উচ্চারণে,

নিরবিচ্ছিন্ন অমুভবে স্পন্দিত। 'আকাশ ছড়ায় আছে নীল হ'য়ে আকাশে-আকাশে' এবং 'শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে' আশ্চর্য ব্যঞ্জনার উদাহরণ। কবিতাকে মুখের ভাবার কাছাকাছি নিয়ে বাবার সাধনা তিরিশের কবি-সম্প্রদায়ের কাব্য সাফল্যের অত্যন্ত সূত্র; এবং জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এদিক থেকে সফল কবিত্বের সাক্ষ্য:

আমি সেই জ্বলন্তীরে দেখে লই—মুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিষোবার ঘেরি নাই—রূপ ঝরে পড়ে তার—

শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে;

এবং বলা বাহুল্য, খাঁটি বাংলা ভাষায়, দেশজ শব্দের সূক্ষ্ম ব্যবহারের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ এই সময়েই আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময়েই কবিকে লিখেছিলেন: 'তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাবলী সম্পর্কে এই উচ্চারণ পাঠকের উপলব্ধিকে পরিশীলিত করে। 'বোধ' 'নির্জন স্বাক্ষর' 'অবসরের গান' কিংবা 'স্বপ্নের হাতে'—এই সব কবিতাবলী আনন্দঘন স্বত্বফূর্ত স্মৃতিচারণার সাক্ষী। এইগব এবং 'পাশিরা' ইত্যাদি কবিতায় এমন এক নিসর্গ জগৎ, আধুনিক বাংলা কবিতায় আর যা কখনোই ফিরে আসবে না। অথচ সেই রূপরস গন্ধময় জগৎ জীবনানন্দের কবিতা পড়লেই এখনও অমূরণিত হয়, বাংলা দেশের আকাশচোয়ানো দিগন্তব্যাপী সৌন্দর্য চেতনাকে, নিসর্গ দৃশ্যের প্রতিটি চিত্রপটকে মুখোমুখী অমুভব করার পরিতৃপ্তিতে পাঠকহৃদয় আচ্ছন্ন হয়।

দুই

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র আনন্দচেতনা 'বনলতা সেন' কাব্য-গ্রন্থে পরিণত হয়েছে অভিজ্ঞানে। জীবন, সৌন্দর্য, সময়চেতনা কিংবা ইতিহাসবোধ সব মিলিয়ে একটি পরিব্যাপ্ত

সমগ্রতা ক্রমশই যেন পাঠকমনকে তাৎপর্যপূর্ণ অন্বেষণের পথে নিয়ে যেতে চায়। স্পষ্টই অনুভব করা যায় ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র সঙ্কীর্ণ প্রেমের জগৎ, সৌন্দর্যবোধের জগৎ থেকে অস্ত্র এক ব্যাপকতর জগতে কবির উত্তরণ, যে-জগৎ আবাহমানকালের ইতিহাসের অঙ্গীভূত। ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র কোনো কোনো কবিতায় প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় স্পষ্টতা ছিল :

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের’ পরে স্তরে হবে ?

এবং এই প্রেম নিঃসন্দেহেই প্রেমে অভিসিক্ত, যৌবনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত মানবমানবীর জগতের আবেগচেতনার ক্ষুরণ ঘটায়।

আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত যুগের মতো
যখন ধূসর রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে ?

কিন্তু বনলতা সেন পর্যায়ের কবিতাবলীতে এই বিশেষ কেন্দ্রকে অতিক্রম করেছেন কবি, বর্তমানকাল অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী দিগন্ত-রূপেই চিহ্নিত এবং সে-কারণেই বিদিশার অশোকের ধূসর জগতের সঙ্গে নাটোরের অন্তরতম সাযুজ্য চোখে পড়ে, একালের নারীর মূখে শ্রাবস্তীর কারুকার্য প্রত্যক্ষ করা যায়। এই পর্যায়ের কবিতাগুলির ছনিকা একটু স্বতন্ত্র ; ইতিহাসচেতনা, বিরহ, ভালোবাসা এবং সৌন্দর্য চেতনার উপাদানে স্থির ও স্থবিলম্ব শিল্প-প্রস্তুতি। কবি যেন এই কবিতাবলীতে বলাবাহুল্য উপযুক্ত কথা এবং ব্যবহার করার মতো উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পেয়েছেন এবং ভাব ও ভাষাকে একটি ‘সঙ্গত’ একে অখণ্ডতা দান করেছেন

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য,

(বনলতা সেন)

জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর
চিতার উজ্জল চামড়ার

শালের মতো অলঙ্কার করছিল বিশাল আকাশ।

(হাওয়ার রাত)

গভীর অন্ধকারে যুগের আশ্রমে আমার আশ্রা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ? (অন্ধকার)

এবং এ রকম পংক্তিবিচ্ছিন্ন আধুনিক বাংলা কবিতায় উল্লেখযোগ্য স্বাভাব্য নিয়ে এসেছিল এ তথ্য কাব্যপাঠকের অবদিত নয়।

জীবনানন্দের কবিতাবলীর সন তারিখ সর্বদা পাওয়া যায়নি। অনেক সময় খুব কাছাকাছি সম্ভবত কবিতাসমূহ লিখিত। অথচ ভাব ও ভঙ্গীতে সে-সব কবিতা বিভিন্নমুখী। কবির অনুভূতি এক এক সময় এক এক রকমভাবে শিল্পমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। কবি অনুভব করছেন ‘অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল ; মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবেন না সময় ; সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী।’ এবং অন্তরঃ ‘মরণের পরপারে বড় অন্ধকার। এই সব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো।’ অথচ মাটি-পৃথিবীর টানে মানব জন্মের পরে যখন আসতে হয় তখন : ‘দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়—শাশ্বত রাজির বৃকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।’

‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব কবিতাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছিল। ‘মহাপৃথিবী’ কিংবা ‘সাতটি তারার তিমির’-এর অনেক কবিতাও এই সময়ের অন্তর্গত। ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি ‘মহাপৃথিবী’র ‘হাজার বছর শুধু খেলা’ ‘সিঁদু সারস’ ‘হাওয়ার রাত’ ‘বিড়াল’ ‘নগ্ন নির্জন হাত’ এবং ‘আট বছর আগের একদিন’ উদাহরণত

উল্লেখ্য। ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থের ‘সমারুট’ ‘রাত্রি’ ইত্যাদিও এই সময়সীমায় প্রকাশিত। এই সব কবিতার মধ্যে যে কবিস্বপ্নের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তিক্ততা কি ক্লোভ অনুপস্থিত; ভদ্রীতে, ধনিতে, শিল্প শুদ্ধতায় এই সময়কার সমস্ত কবিতাই নতুন অভিজ্ঞতার বৃহৎ নীলিম গভীর আকাশ পাঠকের অনুভূতিতে সংলগ্ন ক’রে রাখে।

‘সাতটি তারার তিমির’ জীবনানন্দের কাব্যভাবনায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। যুদ্ধকালীন পৃথিবীর রক্তক্ষয়কারী পরিবেশে, ক্ষুধা ও অতৃপ্তির আবর্তে কবি অগ্রগতির পথ অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর মনে জেগেছিল গভীরতর জিজ্ঞাসা; এই জিজ্ঞাসা তাঁর কবিতার ভাষাকেও যেন ক্রমশই রূপান্তরিত করছিল। মানুষের হৃদয়কে কবি পেলেন না, দেখলেন স্বার্থসর্বস্ব অগভীর মানুষের সমাবেশ; লোভ, নীচতরে ও ইর্ষার বর্বরতা। অথচ জীবনানন্দর মতো শক্তিশালী বিবেকবান কবির অভিজ্ঞতার জগৎ বহু বিস্তৃত; মানুষের প্রকৃত মহিমায় তিনি আশ্বস্ত; ‘নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক’রে মানুষের চেতনার দিন’ ইতিহাস ভূবনে নবীনতা এবং মানবিক জাতীয় মিলনের উদ্বোধন করতে থাকে।

‘আছে আছে আছে’ এই বোধির ভিত্তরে

চলেছে নক্ষত্র রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষম হৃদয়;

জয় অন্তঃসূর্য জয়, অলপ অরুণোদয় জয়।

(সময়ের কাছে)

তিন

জীবনানন্দের কবিতায় হিন্দু দেবদেবীর প্রতীক একেবারেই নেই এটা উল্লেখ করবার মতো ঘটনা। স্বধীন্দ্র-নাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দেব কবিতায় এই ধরনের প্রতীকের ব্যবহার অনেক হ্রদর ও স্মৃতি স্মৃতির স্তবকের

বিস্তার ঘটিয়েছে। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে মহাশক্তি নেই কিন্তু মানুষ আছে; পার্বতী-পরেমেশ্বরের উল্লেখ নেই, আছে মানুষ মানুষীর উল্লেখ। বরং বলা যেতে পারে প্রথম যৌবনের অনেক স্মৃতিসঞ্চিত কবিতাবলীর জন্তে তিনি ইংরেজ কবিদের অভিজ্ঞতায় আশ্রয় হ’তে চেয়েছিলেন। কীটস্ ও ইয়েটস্ তাঁর কবিতাকে প্রভাবিত ক’রে থাকতে পারে, অন্তত এই দু’জন বিদেশী কবির পংক্তিবিস্তার কোনো কোনো সময় জীবনানন্দের কাব্য-ভাবনার নিকটবর্তী বলতে পারা যায়। কলরিজ বা ডি লা মেয়ার জীবনানন্দের জগতের আলো-আধারের রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে কোনো প্রভাব বিস্তার না করলেও তুলনা বা প্রতিতুলনার ক্ষেত্রে বিস্তৃত করতে পারে স্বাভাবিক রীতিতেই। কিন্তু নাগরিক কবি হিসেবে এলিয়ট কোনো কোনো শক্তিশালী বাঙালী কবিকে প্রভাবিত করলেও এলিয়টের নাগরিকতার সঙ্গে জীবনানন্দের নাগরিকতার পার্থক্য অস্পষ্ট। এলিয়টের নাগরিকতা পরিপূর্ণ বিকাশের পর, অমিতবিক্রম উন্নততর অগ্রগতির শেষে সংশ্লিষ্ট ও পতনোন্মুখ, জীবনানন্দের নাগরিকতার পরিবেশ যুদ্ধকালীন কলকাতা, যেখানে সামন্ততন্ত্রের চিরুণ্ডা বিলীন হচ্ছে ক্রমশ, গড়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে বণিক শস্যতা। এক কথায় বলা যেতে পারে, এলিয়ট কাব্যের মনোযোগী পাঠক হয়েও জীবনানন্দ স্বতন্ত্র; তাঁর কবিতার নাগরিক পরিবেশ তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। ‘এই সব দিন রাত্রি’ কবিতাটির কোনো কোনো স্তবক এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে। ‘বটতলা মুচিপাড়া তালতলা জোড়াসাঁকো— আরো ঢের ব্যর্থ অন্ধকারে / যারা ফুটপাথ ধ’রে অথবা ট্রামের লাইন মাড়িয়ে চলছে / তাদের আকাশ কোন্ দিকে ?

এই নাগরিক জগৎ সম্পূর্ণরূপে জীবনানন্দেরই সৃষ্টি। নাগরিক পরিসরে তাঁর কবিতার লাবণ্য কিংবা শৌন্দর্য মনে হবে যেন অন্তর্মিত, কোথায় যেন দ্বারদ্বন্দ্ব পথের দুর্গমতা।

‘সাতটি তারার তিমিরে’ প্রকৃতির নির্জনতম কবি যেন আরোও নির্জন, প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিলেন, অন্তত এক সময় তাই মনে হয়েছিল জীবনানন্দ দাশের কোনো কোনো ঘনিষ্ঠ কবিবন্ধুর কাছে, বুদ্ধদেব বহু বাদে অল্পতম। কিন্তু না, জীবনানন্দ হারিয়ে গেলেন না শেষ পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরে এলেন মানুষের আন্তরিকতার জগতে সেখানে ‘লোভ পচা উদ্ভিদ কুঠ মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে / সময়ের সমুদ্রে বার বার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে বলে।’

বলা বাহুল্য, জীবনানন্দের কাব্যভাবনায় রাজনীতির কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। তিনি মানুষের পরিণাম, মানুষের গন্তব্য সম্পর্কে ভাবিত হয়েছিলেন মাত্র। ‘বুসুর পাণ্ডুলিপি’র জগৎ থেকে ‘সাতটি তারার তিমির’-এর জগৎ যেন এক জীবন থেকে অল্প জীবনের দিকে, আলো থেকে অন্ধকারের পথে নিরুদ্ধে যাত্রা। প্রেম থেকে কবি এসে পৌঁছেছেন অপ্রেমের জগতে যেখানে পুরাতন মূল্য বোধগুলো লুপ্ত অথচ মানবহৃদয়ের কাছে পৃথিবীর ভবিষ্যতের কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। জীবনানন্দ চেয়েছিলেন অনিবিড় উদ্বোধন, অন্ধকার থেকে আবার আলোকে উত্তরণ। কবিতাকে জীবনের কাছে নিয়ে এসেছিলেন, জীবন তাঁর কাছে সম্ভবত কাব্যজিজ্ঞাসা হয়েই বার বার দেখা দিয়েছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন : ‘জীবনের যত কাছে কবিতা ও তার সংস্কার নিয়ে আসতে পারা যায় তত তাকে শিল্পপ্রসাদে শুদ্ধ করা সম্ভব।’ তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলি এই কাব্যভাবনার সাক্ষ্য।

মৃত্যু আছে, তবু সেই মৃত্যু ভেদ করে উড়ে যাওয়া, স্বর্ষ নেই, তবু সেই অয়নের স্বর্ষের বিশ্বাসে।

(নিবিড়তর)

এবং অল্প একটি কবিতায় :

পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ স্বর

আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

‘সাতটি তারার তিমির’ জটিলতাবর্জিত বলে যে-পাঠকের মনে হয় না জীবনানন্দের একেবারে শেষ পর্যায়ের কবিতা-বলীর অন্তত কয়েকটিতে কবিকণ্ঠেব আশ্চর্য স্বচ্ছতা তিনি অনুভব করবেন।

কোথাও পাখির শব্দ শুনি,

কোনা দিকে সমুদ্রের স্বর ;

কোথাও ভোরের বেলা র’য়ে গেছে—তবে।

(‘স্বর্ষভাসমী’)

উদ্ধৃত স্বরকে ‘তবে’ শব্দটির প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ।

॥ চার ॥

জীবনানন্দের মৃত্যু পর তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কবিতা নিয়ে সাময়িক আলোচনা খুব সম্প্রতি করেছেন অমূল্য বহু। * জীবনানন্দের কবিতার বিকাশের ধারা, ইতিহাস চেতনা, সমাজ চেতনা, প্রেম ও প্রকৃতির অভিব্যক্তি, প্রতীক, বাকশিল্প ইত্যাদি যাবতীয় প্রসঙ্গ এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থকার জানিয়েছেন : ‘সমকালীন কবিতার পটভূমিকায় জীবনানন্দের কবিকৃতি উপস্থাপিত করে তার মূল্যায়নের বিস্তারিত প্রয়াস আমরা করিনি।’ বরং বলা যেতে পারে জীবনানন্দ সম্পর্কে একটি সর্বতোমুখী অন্বেষণই এই কাব্য-জিজ্ঞাসার লক্ষ্য। এ রকম শব্দ অন্বেষণ অমূল্যবাবু প্রবন্ধবইটিকে সমৃদ্ধ করেছে বলতে পারা যায়। যদিও নিরন্তর কাব্যপাঠের মধ্য দিয়েই একজন কবিকে সবচেয়ে নিবিড়ভাবে কাছে পাওয়া সম্ভব তবু জীবনানন্দের মতো মহৎ কবির পরিচয় অংশত এই এম্পাঠেও লাভ করা যেতে পারে। প্রায় পনেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত আলোচনা

* একটি নব্বত্র আলে : অমূল্য বহু। প্রকাশক।
মৌহমী। দাম দশ টাকা।

সমূহে যতোদূর সম্ভব বিস্তারিত ভাবেই জীবনানন্দের কবিতা ও কবিস্বভাবের মূল্যায়ন।

জীবনানন্দের কবিতার প্রভাব খুব সাম্প্রতিক কালের তরুণ কবিদের রচনায়ও লক্ষ্যণীয়। একজন তরুণ সমালোচক 'জীবনানন্দীয় ঘোর' সম্পর্কে একবার উল্লেখ করেছিলেন। কাব্যপাঠকে এবং তরুণ কবিদেরও এই প্রভাব দীর্ঘকাল যাবৎ মস্তমুগ্ধ করে রেখেছে। অশুভ বহুর গ্রন্থটি কাব্যপাঠক এবং তরুণ কবিদের জীবনানন্দ সম্পর্কে

বিস্তৃত তথ্য পরিবেশন করতে পারবে, বলা বাহুল্য। তবে বইটি বড়ো বেশী বিস্তারিত, অনেক আলোচনায় দীর্ঘ-সূত্রতার দরুণ পাঠকের মনোযোগ খণ্ডিত হতে পারে। জীবনানন্দ সম্পর্কে এই বৃহদায়তন গ্রন্থটি সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিশেষ উল্লেখ্য বিবেচিত হবে, লেখক এজন্য ধন্যবাদাই।

শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বহুর লিখিত ভূমিকা এই গ্রন্থের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

একালের কবিতা ও কাব্যভাবনা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সমালোচনা সাহিত্যের এই নতুন গ্রন্থ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর পাণ্ডিত্যহীন সাহিত্যকীর্তি। আধুনিক কাব্য-আন্দোলনে শক্তিমান কবিরূপে দীর্ঘকাল সক্রিয় থাকার ফলে তাঁর কবিতা বিষয়ক আলোচনায় রয়েছে কবির অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র স্বাক্ষর।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'সময় ও সাহিত্য' (১৯৫১) এবং 'মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল' (১৯৬৪) গ্রন্থে তাঁর রচনার প্রসঙ্গ এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতার যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল আলোচ্য গ্রন্থে তা নতুন অভিজ্ঞতায় পরিণত। বস্তুত, কবিতা বিষয়ক প্রস্তাবে কবির পরিণত মানসের শাস্ত্র মূল্যবান বলেই এই গ্রন্থের আকর্ষণ আরও বেশী।

বিষয়-সূচীর আধুনিক কবিতার পশ্চাৎপট। আধুনিক কবিতার দুই যুগ। নতুন কবিতা, নতুন স্বাক্ষর। তিরিশ দশকের বাংলা কবিতা। বাংলা কবিতায় উত্তর তিরিশ। বাংলা কবিতায় অতি-সাম্প্রতিক। কবি মোহিতলাল : বিদ্রোহ ও সমর্পণ। টি. এস. এলিয়ট : কবি ও কবিকৃতি। এলিয়ট প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। তিরিশের কয়েকজন : জীবনানন্দ সূধীন্দ্রনাথ। অগ্নি চক্রবর্তী বিষ্ণু দে এবং সময় সেনের কাব্য-প্রকৃতির বিস্তারিত আলোচনা। কবিতার শব্দ জগৎ : জীবনানন্দ ও সূধীন্দ্রনাথ। কবিতায় আধুনিকতা।

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

রবীন্দ্রনাথ ও অমুবাদ

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় অমুবাদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অনেক বিশিষ্ট কবিই অমুবাদে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন; তাঁদেরও পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথ। অমুবাদ সম্পর্কে যে কটি সাধারণ সত্য আমরা যেনে থাকি রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অমুবাদ কবি বাছাই করার ব্যাপারে স্বভাবতই অমুবাদকের ভাললাগা মন্দলাগার প্রশ্ন ওঠে, অর্থাৎ অমুবাদক কবির মন তখন সমালোচকেরই ভূমিকা গ্রহণ করে। যুগের হাওয়াও যে অমুবাদকের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে একথাও অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কেন বদল্যার অমুবাদ না করে চিত্তের উগোর অমুবাদ করেছিলেন—এ প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে যুক্ত মধুসূদনের উগোর প্রতি নিবেদিত মৌলিক চতুর্দশপদীটির সৃষ্টি। বদল্যার যে এলিয়টোস্তর নবাবিকার একথা বাংলার বদল্যার-অমুবাদ সময়ের প্রতি ইংগিত করছে যেমন, তেমন পরিচয় দিচ্ছে অমুবাদকে বমনোভঙ্গির। রবীন্দ্রমানস যে রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধ ও ভারতীয় ঐশীধ্যানে পুষ্ট তার মধ্যে নেতিবাচক কোন কবির স্থান হত কি না সন্দেহ, সেরকম কোন কবির প্রতি অমুবাদকের দৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকাতেন বলে মনে হয় না। এ হল তাঁর প্রথম জীবনের কথা। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য আধুনিক কাব্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে, কিংবা ছন্দবিচারকালে আধুনিক বিদেশী কবিদের অমুবাদ করেছিলেন। হয়ত তেমন অমুবাদ যুগতাড়নার কিংবা নতুনস্বের আস্থার দেওয়ার জন্তেই তিনি

করেছিলেন। অমুবাদ কবি ছাড়া অমুবাদ কবিতার সমস্যাও আছে। সহজ কবিতা অমুবাদের একটা আকর্ষণ অবশ্যই আছে, তা ছাড়াও হয়ত আছে অমুবাদক-কবির সমালোচকের দৃষ্টি। যে কবিতা বিশিষ্ট বলে তিনি মনে করেন, কিংবা যে কবিতা তাঁর ভাল লাগে হয়ত সেই কবিতাই তিনি অমুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন।

‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি-অমুবাদ একদা রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের যে-ভূমিকা রচনা করেছিল পাশ্চাত্যমণ্ডলে, কিংবা স্বদেশে তাঁর ও তাঁর পরবর্তীকালের কাব্যে গদ্যকবিতার যে উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল তার সঙ্গে তুলনীয় কোন ভূমিকাই গ্রহণ করতে পারে নি তাঁর বাংলা অমুবাদ-কবিতাগুলি। অথচ তারা পরিমাণে যেমন অপ্রতুল নয়, তেমনই বহু দেশের বহু কবির অমুবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের মনের ব্যাপ্তির কথাই প্রকাশ করে তারা। রবীন্দ্র-মানস তথা রবীন্দ্রকবিকর্মের নির্ভরযোগ্য দলিলও বটে সেই অমুবাদগুলি। এগুলিতে রবীন্দ্রমানসের সৃষ্টিপ্রয়াসের বিভিন্ন পর্যায় ছাপ রেখে গেছে। ফলত রবীন্দ্রনাথের বাগ্‌ধারা বিভিন্ন সময়ের অমুবাদে বিভিন্ন রকম। কোন কোন কবিতার (যেমন, এলিয়টের ‘জাগি অব দি মেজাই’) অমুবাদ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী কোন বিশিষ্ট কবির (বিষ্ণু দে) পাশাপাশি তুলনামূলক বিচারের স্বযোগ করে দেয়।

‘প্রভাতসংগীত’ রচনার কালে তিনি উগো, শেলি, শ্রীমতী

ব্রাউনিং প্রমুখ কয়েকজন কবির কবিতানুবাদ করেছিলেন, এবং সেই সব অনুবাদিত কবিতার বাগ্‌ভঙ্গিমার দিকে তাকালে আমরা যেমন সেই যুগকে অরণ্য করতে পারি, তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রাক-যৌবন রোমান্টিক কবিতার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধিতে পারি। অনুবাদের মাধ্যমে তিনি যে কোন মৌলিক রীতির অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন সে কথা মনে পড়া আশ্চর্যের নয়। ভিক্টর উগো থেকে ‘স্বর্ষ ও ফুল’ নামক কবিতাটির অনুবাদের প্রতি দৃষ্টি দিলে মনে হয় এই কবিতাটিই কি তাঁকে পরবর্তীকালে ‘কণিকার’র নীতিগর্ভ ছোট কবিতা রচনায় উৎসাহ জুগিয়েছিল?

সেই, পরিপূর্ণ মহিমার আশ্রয়ে কুসুম
স্বর্ষ ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙা এক ভিত্তিপরে ফুল শুভবাস
চারিদিকে শুভ দল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে স্বনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে।
ছোটো মাথা তুলাইয়া কহে ফুলগাছে,
‘লাবণ্য কিরণছটা আমারো তো আছে।’

তাঁর প্রথম জীবনের কবিজীবন ও প্রেমজীবনের যে স্বাভাবিক ও বয়সনির্ভর আতি ছিল তা তাঁর নিজের মৌলিক কবিতায় যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় তাঁর অনুবাদ কবিতার নির্বাচনে। উগো থেকে ‘কবি’ অনুবাদটি যেমন,

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া,
কড় বা অবাক্, কড় ভকতি-বিস্মল হিয়া,....
কিংবা, শেলির এই প্রেম-কবিতার অনুবাদ :
আমার হৃদয় চায় উধাও উড়িয়া
প্রেমের স্বপ্নের রাজ্যে করিতে ভ্রমণ,
কিন্তু গুরুভার এই মরতের ভাষা
চরণে বেঁধেছে তার লোহার শৃঙ্খল।

‘কড়ি ও কোমল’ রচনাকালে শেলির বাসবীয় কিশোর-প্রাণ একটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন তিনি :

হাঁয় যোর নাই আশা, নাইকো আশ্রম —
ভিতরে নাইকো শান্তি, বাহির বিরাম
নাই সে সন্তোষধন
স্তানী ধ্বসি যোগিগণ
ধ্যান সাধনায় যাহা পায় করতলে—

নাকি এইসব অনুবাদ কবিতা নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর জীবনকথাই মাঝে মাঝে ব্যক্ত হয়েছে? প্রিয়জনবিরোগ-ব্যথায় তিনি প্রেমের আতি বিষয়ক কবিতাগুলি বেছে নিয়েছিলেন? ‘কড়ি ও কোমল’ এর কবিতাবলী রচনাকালে শ্রীমতী ব্রাউনিং কিংবা ক্রীস্টীনা রসেটির প্রগাঢ় প্রেম-কবিতার অনুবাদ তাঁর মৌলিক কবিতার পাশাপাশি রাখা যায়। এই কবিতাগুলির নির্বাচনে তাঁর প্রথম যৌবনের আতিই প্রকাশমান :

শ্রীমতী ব্রাউনিঙের কবিতাটি, যেমন :

এখন চাহিয়া দেখি, হায়,
ফুলগুলি শুকায় শুকায়।

যত চাপিলাম মুঠি

পাপড়িগুলি গেল টুটি—

কান্না ওঠে, গান থেমে যায়।

কিংবা, ক্রীস্টীনা রসেটির কাব্যানুবাদ :

ধাম্ ধাম্ ওরে হৃদয় আমার,

ধাম্ ধাম্ একেবারে,

নিতান্তই যদি টুটিয়া পড়িবি

একেবারে ভেঙে যা রে—

কবিকর্ষের দিক থেকেও ‘প্রভাতসংগীত’ ও ‘কড়ি ও কোমল’ রচনাকালীন কাব্যানুবাদ মৌলিক কবিতার রীতি-প্রকরণের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

অনুবাদ ও মৌলিক কবিতার অবলম্বন যখন ভাষাই, তখন মৌলিক কবিতাতে পরবর্তীকালে যেমন যেমন ভাষার পরিবর্তন দেখা যায়, অনুবাদ-কবিতাতেও তেমনই দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ জার্মান শিখেছিলেন। মূল কবিতা থেকে হাইনের ছোট কবিতা দুটির অনুবাদ মূলানুগামিতা তথা ভাবানুসরণ এই দুই সমস্তার নিরসন করেছে বলেই মনে হয়:

সেই,

ডু বিস্ট ভি আইমে ব্লুমে
জো হোল্ড উণ্ড শ্টোন উণ্ড রাইন
ইখ্ শাউ ডিখ্ আন, উণ্ড ভেমুট
প্লাইখ্ টু মিয়র ইন্স্ হার্ট্ স্ হিনাইন।
মিয়র ইন্স্, আল্জ্ অব ইখ্ ডি হেগে
আউফ্ জ্ হাউপ্ট্ ডিয়র লেগেন জল্ট
বিটেণ্ড, দাগ গট্ ডিখ্ এরহান্টে
জো রাইন উণ্ড শ্টোন উণ্ড হোল্ড।

এর অনুবাদ :

তুমি একটি ফুলের মত মণি
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর।
মুখের পানে তাকাই যখনি
ব্যথার কেন কাঁদায় অন্তর।
শিরে তোমার হস্ত দুটি রাখি
পড়ি এই আশিস মন্তর,
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর।

তেমনই সুন্দর 'ডেন ক্যানিগ ভিশ্বামিতের' অনুবাদ 'বিশ্বামিত্র বিচির এই লীলা'।

'কড়ি ও কোমল' শৃংগের একটি জাপানী কবিতার অনুবাদে বিচ্ছিন্নতার আশঙ্ক আছে, কিন্তু পরিণত বয়সে 'জাপানবাসী'র পাতায় তিনি যে ছোট ছোট জাপানী কবিতাগুলির অনুবাদ করেছিলেন তা আমাদের আরো

আকর্ষণীয়। জাপানী চরিত্রের সংযম আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন: 'এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে থাকে, এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট।....

পুরোনো পুকুর

ব্যাঙের লাক,

জলের শব্দ।

পচা ডাল,

একটা কাক,

শরৎকাল।

স্বর্গ এবং মর্ত্য হচ্ছে ফুল,

দেবতার এবং বৃদ্ধ হচ্ছেন ফুল—

মাঝের স্বপ্ন হচ্ছে ফুলের অন্তরায়।।”

জাপানী চরিত্রের বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন এই স্বল্পকায় কবিতাগুলির মাধ্যমে। কে জানে পরবর্তীকালে 'ফুলিঙ্গ' রচনার সময়ে (এতে ফরাসী কবি জঁ পীয়ের স্লিরির একটি কবিতার অনুবাদ করা গড়েও) জাপানী কবিতা তাঁকে কোন অনুপ্রেরণা দিয়েছিল কি না।

আধুনিকতার বিচার করতে গিয়ে বিশ্বকে নির্বিকার তদৃগত ভাবে দেখার যে ব্যাধা দিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে হাজার বছরের পুরোনো লি-পোর কয়েকটি 'আধুনিক' কবিতা তিনি অনুবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ভঙ্গি এই অনুবাদে একান্তই আধুনিক, যেমন,

নীল জল.....নির্মল চাঁদ,

চাঁদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেছে।

ঐ শোনো, পানিফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল
তার বাড়ি ফিরছে রাজে গান গাইতে গাইতে।

(‘সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

রবীন্দ্রনাথের দুটি গ্রন্থ ‘ছন্দ’; ‘সাহিত্যের পথে’ এক বছরের (১৯৩৬-৭) মধ্যেই প্রকাশিত। ছন্দ, গল্প কবিতা কিছু আগে থেকেই যেমন বাংলা কবিতায় একটা বিশিষ্ট রূপ নিচ্ছিল, তেমনি আধুনিক বাংলা কবিতায় রূপও প্রকাশ পাচ্ছিল এসময়ে। এলিয়ট, পাউণ্ড প্রভৃতি কবিদের চর্চা এই সময়েই শুরু হয়ে গেছে। এই কালের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের অনুবাদ একান্তই আধুনিক ও সেকারণে তাৎপর্যপূর্ণ।

গল্পকবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

“আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে গল্পে কাব্য রচনা করেছেন ওয়াল্টার হুইটম্যান। সাধারণ গল্পের সঙ্গে তার প্রভেদ নেই, ভুবু ভাবের দিক থেকে তাকে কাব্য না বলে থাকবার জো নেই।...”

লুইসিয়ানাতে লেখলুম একটি তাজা ওক গাছ বেড়ে উঠেছে ;
একলা সে দাঁড়িয়ে, তার ডালগুলো থেকে শাওলা পড়ছে
ঝুলে।

কোনো দোঙ্গর নেই তার, ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে তার
খুশিটি।
তার কড়া খাড়া ভেজালো চেহারা মনে করিয়ে দিলে আমারই
নিজেকে।”

রবীন্দ্রনাথ ‘পুনশ্চ’ আগে লিখে থাকলেও গল্পকবিতার ভাবচ্ছন্দরূপের সমর্থন এই সব করিতা থেকে পেয়েছিলেন কিনা কে জানে।

এমি লাওয়েলের ‘তুমি হৃদয়বী এবং তুমি বালি’ বলে কবিতার অনুবাদ কিংবা এলিয়টের ‘প্রিলিউডের’ সেই অনুবাদ

এ ঘরে ও ঘরে যাবার রাস্তায় সিঁদ্র মাংসের গন্ধ,
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।

বিছানায় থেকে তুমি কোলে দিয়েছ কখনটা,

চীৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,
কখনো স্বপ্নে, দেখছ রাত্রি প্রকাশ পাচ্ছে
হাজার খেলো খেলার ছবি
যা দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি।

মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে নাও।
দেখো, সংসারটা পাক খাচ্ছে, যেন বুড়িগুলো
ঘুটে কুড়োচ্ছে পোড়ো জমি থেকে।

—এতে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, তার মূল বস্তুপ্য পেশ করেছেন। আমরা তাঁর অনুবাদে সাবলীল হা দেখে মুগ্ধ।

এই প্রসঙ্গে এলিয়টের ‘জার্নি অব দি মেজাই’ কবিতাটির অনুবাদ পাশাপাশি রাখা চলে রবীন্দ্রনাথের, বিষ্ণুদেবের। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘তীর্থযাত্রী’ বিষ্ণু দে ‘রাজমিদের যাত্রা’ প্রথম কটি-পংক্তি তুলনামূলক বিচারের জন্যে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

A cold coming we had of it,
Just the worst time of the year
For a long journey, and such a long journey :
The ways deep and the weather sharp.
The very dead of winter.’ (এলিয়ট)

কনকনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা,
ভ্রমপটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সবচেয়ে খারাপ,
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট,
একেবারে স্তব্ধ শীত।’

(রবীন্দ্রনাথ)

আমাদের সে যাত্রা হিমে
বছরের সবচেয়ে খারাপ সময়ে
অভিযান, ওরকম দীর্ঘ অভিযান ;

পঞ্চাট কাদার গভীর, ধারালো হাওয়া
ছুর্গম পঞ্চস্তম্ভ, শীতের চরম।'

(বিষ্ণু দে)

রবীন্দ্রনাথ যে সেই বুদ্ধ বয়সেও কত উৎসাহমণ্ডিত ছিলেন
এবং কত আধুনিক তা এই ছুই কবির অম্মবাদের
তুলনামূলক বিচারে কোন উৎসাহী ব্যক্তি সহজেই দেখে
নিতে পারেন।

বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার কবিতার অম্মবাদ বা রবীন্দ্র-
নাথের 'রূপান্তর' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, এই প্রসঙ্গে আরো
নির্দেশ করে যে, তিনি একদেশদর্শী ছিলেন না। আমাদের
দেশের অল্প ভাষাভাষীর কবিতা-সমুদয়ে আমরা যে এখনো
পিছিয়ে আছি সে আমাদেরই মানসদৈন্ত, রবীন্দ্রনাথ
সেদিকেও আমাদের যোগ্য পথিকৃৎ।

কিরন

যেমন উজ্জ্বল তেমনি দীর্ঘায়ু

কিরন ল্যাম্প পৃথিবীর স্রেষ্ঠ
ল্যাম্পগুলির সমকক্ষ। কারণ পর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয়
যন্ত্রে সেরা কাঁচামাল থেকে এগুলি তৈরি। এবং এর
পেছনে রয়েছে দীর্ঘ জিশ বছরের অভিজ্ঞতা-প্রসূত কারিগরী দক্ষতা।

প্রস্তুতকারক : ভারত ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ
১৯, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১
এজেন্ট : বি ওরিয়েন্টাল মার্কেটাইল কোং লিঃ
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লী কানপুর

KIRON

ভাবের ঘনো ছবি

স্বরাজ্য দাশগুপ্ত

সে কালে আমরা এমন কী মন্দ ছিলাম যখন আকাশের দেবতাদের আর মাতা বসুমতীর করুণার উপর নির্ভর করে দিনযাপন করতাম? ওই নির্ভরতার সঙ্গে নিঃসন্দেহে অনেকখানি অনিশ্চয়তাও জড়িত থাকত। যে-বছর প্রকৃতি ক্রপণা হতো সে বছর অনাহারে মরতে হতো। কিন্তু তার বাইরে আপন ভাগ্যকে গড়ে তোলার জন্তে প্রাণান্ত প্রয়াস ও তার দরুণ উৎকর্ষা বা তান-টান সাধারণ মানুষের একরকম অজানাই ছিল। আমরা জানতাম যে পিতৃপুরুষেরা যে-জীবিকা বা পেশা বা বৃত্তি দিয়ে নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ করত তাতে আমাদের জন্মগত অধিকার। অস্ত্রাত পরিবেশে, অনভ্যস্ত জীবনের স্বিতমানে, কর্মের সন্ধানে অথবা জীবনে স্থান করে নেওয়ার মরীয়া সংগ্রামে অংশগ্রহণের আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা অবহিত ছিলাম বটে, কিন্তু সেসঙ্গে আমাদের মানসিক ভারসাম্য ছিল পূর্ণ, শাস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল অক্ষুণ্ণ। প্রায় চার হাজার বছর ধরে আমরা মোটামুটি একই ভাবে একই রকম জীবন অতিবাহিত করে এসেছি, অনাবৃষ্টি ভূমিকম্প দ্বিতীক মড়ক দেখা দিলে তাকে দেবতার অভিসম্পাত মনে করেছি এবং দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা প্রার্থনা ইত্যাদিতে সাহসনা পেয়েছি।

আমাদের এতদিনকার ঐতিহ্যবাহিত জীবনধারাতে বিপর্যয়ের সূত্রপাত হলো পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের ক্ষমতা দখলের পরে। ইংরেজ দেশের মালিক হলো না, মালিক হলো ক্ষমতাহীন আর তার ক্ষমতা কেড়ে ইংরেজরা তা

ব্যবহার করতে থাকল। এদেশের রীতিনীতি হাণ্ডালের কথা বিবেচনা না করে নিজেদের খুশীমতো ইংরেজরা ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করল, কখনও পাঁচ বছরের জন্তে কখনও দশ বছরের জন্তে এক-একবার এক-একজনকে সাময়িক ভাবে জমির স্বত্ব দিল। ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পরে প্রথম তিরিশ বছর এত ঘন ঘন দ্বিতীক হতে থাকে যে হাজার হাজার মাইল দূরে ইংলণ্ডের অধিবাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গও বিচলিত বোধ করে। একদিকে কোম্পানীর শাসন দেশীয় ভূমিব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে অতীকে পূর্বপুরুষদের ভূমি ও ভদ্রাঙ্গন ছেড়ে এল যারা তাদের সামনে জীবিকার নতুন নতুন পথ খুলে দিল। পুরুষাত্মক ধরে অনুকূলিত জীবিকা ছেড়ে অনেকেই বিদেশী বণিকদের সাগরদে হয়ে বিপুল বিশ্বের অধিকারী হতে থাকল। দেখা গেল যে বাণিজ্যের ঘাঁটিতে বিশ্ব উপার্জন করা সোজা আর বিশ্ববান হলে আকাশেও চড়া দামে খাদ্যবস্তু কেনা যায়, সন্ময়ে পূজাপার্বণ করে দেবতাদের প্রসন্নতা পাওয়া যায়, সবসময়ে বেশি সুযোগ-সুবিধে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়া যায়।

তরু হলো আন্তে আন্তে যুগ যুগ পালিত জীবনের শিকল কাটার পালা। পরমাধিক সিদ্ধির জন্তে শরের কোণে দেবতার আসন বানিয়ে রেখে শহরবাসীরা মন দিল জাগতিক সিদ্ধির জন্তে। শহর কলকাতাই হলো জাগতিক সাধনার পীঠস্থান। গ্রামাঞ্চলে বিরাট জমিদারীর মালিকেরাও জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্তে শহরবাসী হলো, বছরে

একবার খাজনা আদায় করতে জমিদারীতে গেলেই হলো, আবার কেউ কেউ শহরে বসে কি বছরের খাজনা পেলেই তুট্ট, তারা আর গ্রামের পথে পা বাড়াল না, গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি বা কৃষিব্যবস্থার উন্নতি করার কল্পনাকে তারা আমল দেওয়ার কারণ হারিয়ে ফেলল। ছোট ছোট গ্রামীণ সমাজে সবাই সবার পরিচিত ছিল, সবার গতিবিধি ছিল সবার চোখের উপরে, কেউ বেচাল হলে তা লুকনো কঠিন ছিল, সেজন্তে একঘরে করার সিদ্ধান্ত কার্যকর করাও সম্ভব ছিল। কিন্তু শহরের ভিড়ে কে কার গতিবিধির উপর নজর রাখবে! রেখেই বা কী লাভ। বেচালের জন্তে কাউকে এপাড়ায় একঘরে করলে সে অন্তপাড়াতে গিয়ে দিবি সমাজ চল হয়ে যাবে। শান্তি হিসেবে সামাজিক অসহযোগিতা নিরর্থক হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বন্ধন ও শাসনের প্রতি উপেক্ষা ব্যক্তির চেতনাতে দানা বাঁধতে থাকল।

পঞ্চাত্তরে ইংরেজরা যোলো আনা বিদেশী : বর্ণাশ্রম বা জাতিপ্রথা বা এদেশীয় সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি তাদের না ছিল শ্রদ্ধা না কোনও মমতা : তাদের উদ্দেশ্য বা স্বার্থ হাসিল করতে সক্ষম ব্যক্তিকেই তারা নিযুক্তির শিরোপা দিতে থাকল। জমি শুধু নিজেই অচল নয়, তা ব্যক্তিকেও অচল করে রাখে, নিজের সঙ্গে বেঁধে রাখে। জমির বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা বহু শতাব্দীর অনিদিষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন সমাজের বন্ধন থেকেও মুক্তি পেলাম, স্বতন্ত্র হিঁড়ে যাওয়ার মালার মূল্য থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম বটে কিন্তু স্বতন্ত্রতা মুক্তির মূল্য পেলাম। ঘরের জীবনে পুরনো বিশ্বাস ও সংস্কারকে মানলেও বাইরের জগতে আমাদের চলনে বলনে কেতায় পোষাকে আমরা আন্তে আন্তে প্রতীচ্যমুখী হয়ে উঠলাম, অনিশ্চিত ভাগ্যের স্বাধীন সন্ধানী হয়ে উঠলাম এবং ঘরের জগতের সঙ্গে বাইরের জগতের বৈষম্য দিনে দিনে বিস্তৃত হতে থাকল।

পলাশী যুদ্ধের ক্রিষ্ণদ্বিতীয় অর্ধশতাব্দী পরে রায়মোহনের

আবির্ভাব। প্রথম যৌবনে পরমাধিক সাফল্যের সন্ধান : ঐতিহ্যগত চিন্তাধারার বাধন কেটে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ ও স্বদেশী-বিদেশী বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর পৈত্রিক সম্পত্তির নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে স্বাধীন ভাবে জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে কোম্পানীর চাকুরিতে মধ্য যৌবন অতিবাহিত করে বিপুল জাগতিক সম্পদের অধিকারী হন। উত্তরকালে তাঁর লক্ষ্য হলো পরমাধিক ও জাগতিক অমুহুর্তির সমন্বয় সাধন। সে সঙ্গে শাসিতের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রশাসনের বিষয়ে শাসককে বাচক হয়ে পরামর্শ দিয়ে তিনি দেশীয় রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেন। স্বাধীন ভাবে ধর্মোচরণে, স্বাধীন ভাবে কর্মনির্বাচনে, ও স্বাধীন ভাবে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনীতিক শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যবস্থাদির মূল্যায়নে ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করে রায়মোহন এমন এক অনেকাংশ বিশ্ববের নান্দীপাঠ করেন যা ভারতবর্ষের চার হাজার বছর ধরে স্বীকৃত জীবনধারাকে সম্পূর্ণ নতুন পথে পরিচালিত করে। রায়মোহন একবার গোলা গড়িয়ে দেওয়ার পরে, অমুকুল বাস্তব পরিবেশে, তা আন্তে আন্তে ভরবেগ সঞ্চয় করতে থাকে : বেদের সর্বৈব অসামঞ্জস্যকে অগ্রাহ্য করে দেবেন্দ্রনাথ আল্পপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞান দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞাসাগর ও কেশবচন্দ্র সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত বাণনার ক্ষেত্রে এবং শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর অমুগামীরা ও পরে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর অমুগামীরা রাজনৈতিক ও অর্থনীতিক ধারণার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে পরমুখাপেক্ষিতার নিগড় থেকে মুক্তি দিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তির মুক্তির সংজ্ঞাতিকে নব জাগরণের প্রথম পর্যায় বলে অভিহিত করা হয়। নব জাগরণের সঙ্গে সনাতন ভারতবর্ষের আবিষ্কার অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত, কিন্তু সবার অলক্ষিতে নবজাগরণের চেতনা থেকে মধ্যযুগের সাতশ বছর ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রক্ষিপ্ত বলে বাদ পড়ে গেলে মধ্যযুগের পরিবর্তন যে আমাদের ইতিহাসের

ধারাবাহিকতাকেই পরাভূত করল এ-সত্য রবীন্দ্রনাথের আগে কারও চোখে পড়েনি, এদিকে চোখ কেঁরাবার জন্তে বারবার ডাক দিলেও আমরা তাঁর ডাকে কান দিইনি। পাশ্চাত্যের মধ্যযুগকে কিন্তু কেউ কখনও পাশ্চাত্য ইতিহাসের প্রকৃষ্ট অধ্যায় মনে করেনি, উপরন্তু মধ্যযুগের বিবর্তনের ধারা থেকেই পাশ্চাত্যে আধুনিক যুগ এসেছে, ডিমের খোলস ফাটিয়ে পাখির ছানা যেমন করে বেরিয়ে আসে। আমাদের দেশে কিন্তু মধ্যযুগের বীজ থেকে আধুনিকতা আস্তে আস্তে অঙ্কুরিত হলো না, বিদেশীর ধর্মে আমাদের দেশে আধুনিকতার অকালে জন্ম হলো, জনক রাজার মতো কুড়িয়ে পাওয়া এই কতটাকে রাজা রামমোহন লালন করলেন, কিন্তু তার জননীর পরিচয় জানিয়ে যেতে পারলেন না। এই যে জননীপরিচয়হীন আধুনিকতা তার প্রাণের কথা হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা। এদেশীয় ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ হলো বিদেশীর শাসনাধীনে। ফলে একদিকে মধ্যযুগের প্রতি আমাদের হৃদয়হীন অস্বীকৃতি, অল্প দিকে প্রাচ্যের বিদেশীর প্রতি নিবিচার প্রণতি, এই দুয়ের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার সংকটাপন্ন অবস্থান।

জমির ও সে সঙ্গে কৃষিমাালের বন্ধন থেকে আমরা যারা মুক্তি পেয়েছি তারাই ব্যক্তিস্বাধীনতার চেতনাতে উদ্বুদ্ধ। কিন্তু চিরচরিত বন্ধন থেকে মুক্ত জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ কি আজ মজুরির দাসত্বে কিংবা তার চাইতে আরও বড়ো বন্ধনে—বাজার চাহিদার বন্ধনে—আবদ্ধ হয়ে পড়িনি? কলকারখানার যে বিরাট মজুর শ্রেণী আজ গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে পুঁজির কোনও সম্পর্ক নেই, পুঁজি আছে শিল্পপতির কোটরে, সে যা উৎপাদন করে তার সঙ্গেও তার কোনও সম্পর্ক নেই, তা লাগে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন শ্রেণীর ভোগে অর্থাৎ পুঁজি বা উৎপন্ন দ্রব্য কোনওটাই তার নিজের নয়, দুটির একটির উপরেও তার কোনও অধিকার নেই, কেমন করে পুঁজি ব্যবহার করা যায় বা কোন দ্রব্য উৎপাদন করা

যায় সে সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা পরামর্শ দেওয়ার মতো তার অবস্থান নয়, সে শুধু মজুরির জন্তে খাটে, মজুরির কাছে তার দেহমন বিক্রীত, মজুরিই তার সমস্ত অস্তিত্বের মনিব, এক-একজন মজুর কারখানার যন্ত্রের সামনে এক-একভাবে দেহ সঞ্চালন করে তার ওই অমানবিক মনিবের ইচ্ছেমতো এবং মনিবের জন্তে খাটার যে সময় তার সবটাই মনিবের সময়, সেই সময়ের মধ্যে মজুরের নিজের সময় বলতে কিছু নেই।

মজুরি নামক মনিবকে তবু চোখে দেখা যায়, হাতে ধরা যায়, তার একটা স্পষ্ট রূপ ও চরিত্র আছে, কিন্তু এর উপরেও আর এক মালিক আছে যার মতিগতি, মজুরদের ঘুরে থাক, স্বয়ং পুঁজিপতিরও হুঁবোধ্য, সেই মালিকের নাম হলো বাজার চাহিদা। শিল্প-বিপ্লবের প্রথম পর্বে ইউরোপে বাজার চাহিদাকে পুঁজিপতিরাও ভয় পেতেন; উৎপন্ন দ্রব্যের কতটা কতদিনে ব্যবহৃত হবে তা হিসেব না করে উৎপাদন করতে করতে কিছুদিন পরে দেখা যেত, দ্রব্য বিক্রি না হওয়ার দরুণ চাহিদার তুলনাতে দ্রব্যের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে, বাধ্য হয়ে তখন উৎপাদন বন্ধ রাখতে হতো আর উৎপাদন বন্ধ থাকার কালে মজুরি দিয়ে লোক পোষা দারুণ লোকশান, তাই মজুর ছাড়াই করা ছাড়া পথ থাকত না। শিল্পের এই সংকটকে বলা হয় বাণিজ্য বৃত্ত। অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করে পাশ্চাত্য দেশগুলি উৎপাদন মাত্রা আর বাজার চাহিদার মধ্যে একটা সমঝোতা করেছে, তবু তারা সারাক্ষণ সজ্জত থাকে কখন আরার বাণিজ্য বৃত্ত দেখা দেয়। কিন্তু আমরা ওরকম কোনও সমঝোতার ঝগড়াট পোয়াতে চাইলাম না, কেমন করে তাড়াতাড়ি বিনা আয়াসে সহজে আধুনিক হওয়া যায় তার ফিকির খুঁজলাম।

স্বাধীন হওয়ার পরে দেশের বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিল্প-বিপ্লবের পরিকল্পনা করা উচিত ছিল, কিন্তু অবিবেচনা করে পরিকল্পনা না করার ফলে

আমাদের শিল্পদশা আজ যে-সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তা উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বাণিজ্য বুস্তেরই অন্তরূপ। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে নতুন ফরমাশ না পাওয়ার জন্তে ছোট ছোট কলকারখানার উৎপাদন চালু রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে এবং উৎপাদন বন্ধ রাখতে হলে বিপুল হারে কর্মী ছাটাই করা ছাড়া উপায় থাকবে না। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পোন্নয়নের প্রকল্পকে খাটো করার ফলে নতুন ফরমাশ দিতে অক্ষম। সম্ভাব্য ছাটাইয়ের কারণ যদি সত্যিই অনিবার্হ হয় তাহলে তথাকথিত স্বাধীন হাজার হাজার মজুরের জন্তে অনশনে মৃত্যুর পথ নির্বাচন করার স্বাধীনতা থাকবে। অবশ্য বড়ো বড়ো পুঁজিপতিদের কারখানার ছাটাইয়ের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম। আসলে আমাদের দেশে বাণিজ্য ও শিল্পে এসব বড়ো বড়ো পুঁজিপতিদেরই একচেটে সাম্রাজ্য এবং সরকারী পরিকল্পনার দিক নির্ধারণের কলকাটি এঁদেরই হাতে। একথা আজ সর্বজনবিদিত যে জাতীয় সম্পদ এরকম বড়ো বড়ো এক ডজন পুঁজিপতি পরিবারের কোটরে সঞ্চিত হয়েছে, দেশের অর্থনীতির উপরে একচেটে আধিপত্য বজায় রাখার জন্তে সরকারের পরিকল্পনা নীতির উপর চাপ সৃষ্টি করে এসব পুঁজিপতিরা আমাদের শিল্প-বিপ্লবকে অপূর্ণ বা অর্ধপথে বিরত রাখছেন।

অর্থাৎ ভারতের শিল্প-বিপ্লবের সাধন জনসাধারণের স্বার্থের উপরে নয়, বড়ো বড়ো পুঁজিপতিদের স্বার্থের উপর নির্ভর করেছে এবং এঁদের এই স্বার্থের অয়মাত্র্য পথে ভালোমন্দ পাপপুণ্যের বিচার নেই, সমস্ত মানবিক মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে যেন তেন প্রকারে দেশের অর্থনীতির উপরে একচেটে অধিকার কামের করাই এঁদের লক্ষ্য। দেশের মধ্যে এঁরা এমন এক খোঁকাবাজির আব-হাওয়া সৃষ্টি করে রাখতে চান যাতে মজুররা উন্নত কৃষিব্যবস্থার আকর্ষণে গ্রামে ফিরে না যায়, বাধ্য হয়ে কলকারখানাতেই গভীর বিক্রি করে ও পুঁজিপতিদের দয়ার উপর নির্ভর করে

থাকে। মাদ্রাসা যুগের কৃষিব্যবস্থাকে বহাল ও উৎপাদনের মাঝাকেকে দাবিয়ে রেখে শেওয়ার ফলে কৃষকসমাজের সঙ্গে ব্যাপক হতাশার জন্ম হচ্ছে, তারা নতুন জীবিকার খোঁজে শহরে আসতে প্রবৃত্ত হচ্ছে, ফলে শহরেও শিল্পক্ষেত্রে বতঃই মজুরক্ষীতি দেখা দিচ্ছে। মজুরক্ষীতির অনিবার্হ পরিণাম হলো মজুরিহাস। মজুরিহাসের তাৎপর্য পুঁজিপতিদের জন্তে মুনাফাক্ষীতি। কোনও রাজ্যের প্রগতিশীল সরকার পুঁজিপতিদের জন্তে স্বার্থের স্বর্গ ধ্বংস করতে চাইলেও আঁচড়টি পর্যন্ত ক্রটিতে পারবে না, কেননা তা করতে হলে কেন্দ্রে শাসনভঙ্গের রহবদল করতে হবে : বিকেন্দ্রীকরণের মহান প্রবক্তা মহাত্মা জীৱি ছবি সরকারী দপ্তরে দপ্তরে সাজানো থাকলেও জাতীয় পুঁজির পুঞ্জীভূত মূর্তিগুলির উপরে কেন্দ্র-নিরপেক্ষ ভাবে কোনও কর ধার্য করার ক্ষমতা কোনও রাজ্য সরকারের নেই।

বুনিয়াদী শিল্পের প্রকল্প ব্যতীত কোনও দেশে শিল্পবিপ্লব তথা কৃষিবিপ্লব হতে পারে না। ও দুটি বিপ্লব যে একই বিপ্লবের দুটি পা তা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের বা উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার ইতিহাসে পাতা ওলটালেই স্পষ্ট হয়। জহরলাল ভাই বুনিয়াদী শিল্প গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন; কিন্তু জন্ত স্বার্থের চাপে পড়ে তাঁকে পিছু হটতে হলো। শুধু ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নয়, জহরলালের মতো সর্বদেশীয় জনসাধারণ ব্যক্তির স্বাধীনতাও জন্ত স্বার্থের স্কন্দ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে। আমাদের বুনিয়াদী শিল্প নেই, আছে শৌখিন পণ্যশিল্প—আমরা বিদেশে ইলেক্ট্রিক ফ্যান, রেডিয়ো, রিসিপি জেরেটর, মোটর ইত্যাদি রপ্তানী করছি এবং শিল্পে আগ্রহ কতখানি আগ্রহের হয়েছি তারই অবিশ্রান্ত ঢকানিনাদ করছি। কিন্তু এসবই দেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির বিলম্ব, এসব জিনিস জনসাধারণের জরুরি প্রয়োজনগুলির একটিও মেটাতে অক্ষম। উপরন্তু এসব উৎপাদনকারীরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফেক্টুৱা কাগজে কাগজে সিনেমায় সিনেমায় বিজ্ঞাপন দিয়ে, এঁদের

দালালদের বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণের চোখের সামনে কান্নের গর্ভে চেতন-অবচেতন মনে এই বানানো সত্যকে গোঁধে দিচ্ছে যে এসব জিনিস ছাড়া বেঁচে থাকা অর্থহীন এবং দশচক্রে যেমন ভগরানও ভূত বনেন তেমনই অনেক বিদ্বান গুণী স্ত্রানীরও আজ পাকচক্রে পড়ে মনে হচ্ছে এসব জিনিস স্বাধীন করতে না পারলে সত্য বা সংস্কৃত হওয়া যায় না। নিজস্ব চিন্তাশক্তিকে গড়ে তোলার অবকাশ স্বাদের জীবনে আছে তাঁদেরই বোধবুদ্ধি যদি এভাবে স্তম্ভ স্বার্থ কড়ক প্রভাবিত হয় তাহলে সাধারণ অথবা নগণ্য মানুষদের চিন্তা কতখানি স্বাধীন ভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ফলে আজ যে-মধ্যবিস্তার তাজা পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য কেনার সামর্থ্য নেই তারাও কিস্তিতে বন্দী হয়ে রিক্রিজেরেটর কিনছে, যে-নিম্নবিস্তার সকাল থেকে রাত অবধি দম ফেলবার ফুরসৎ নেই তারাও রেডিও কিনছে, যে-হতভাগ্য ক্ষুতো-পালিশ করে রাতে শোওয়ার ঘরভাড়া জোটাতে পারে না তারাও হাত বাড়ি কিনছে। যে স্বাধীন দেশকে দু মূঠা অম্নে পেট ভরাবার জন্তে বিদেশের করুণার অধীনে থাকতে হয় সে দেশবাসীর প্রক্ষে এসব সাধ্যমিক উপকরণ সংগ্রহ করা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা নয়, স্বার্থান্বেষীদের প্রচারিত মন্ত্রে মুগ্ধ বিলাসিতার প্রমাণ মাত্র।

এই প্রভাব আমাদের চিন্তাকে এতদূর বিকল করেছে যে আজ বিভাগীরা কারিগরি শিক্ষা অর্জনের জন্তে বহার বেগে ধাবমান। তাদের ধারণা হয়েছে যে মানবিক বিদ্যা, এমন কি বিজ্ঞান বিদ্যা, আয়ত্ত করা নিরর্থক, কারিগরি বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারলেই স্বর্গে প্রবেশের ছাড়পত্র পাওয়া যাবে। কারিগরি বিদ্যা আয়ত্ত করার যে কোনও সার্থকতা নেই তা নয়, কিন্তু সব জিনিসেরই প্রয়োজনের একটা মাত্রা আছে। কারিগরি বিভার্জনের যে ছদ্মুগ আজ স্তম্ভ স্বার্থগড়ে তুলেছে এবং বিবাহের পাত্রীপক্ষ থেকে ছাত্রদের অভিভাবকপক্ষ পর্যন্ত যাকে-হাওয়া দিয়ে

উসকে দিচ্ছে তা বাণিজ্য বৃত্তের মতো এক দারুণ সংকটকে তরুণ সমাজের ভবিষ্যতের আকাশে ঘনিয়ে তুলছে, শিল্পের একচেটে মালিকেরা যখন শিল্পবিপ্লবের স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করছে তখন এর ফল অচিরেই কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ সমাজের উপর পড়তে বাধ্য। মজুবস্বীতির মতোই দক্ষ কারিগরস্বীতি যখন হবে তখন অধিকাংশেরই চাকুরি ছুটবে না, এত পয়সা খরচ করে এত কষ্ট করে শেখা বিদ্যা খাটাবার উপায় থাকবে না, এবং তরুণ সমাজের একাংশের দিনের পর দিন বেকার থাকার হতাশা তখন সমস্ত জাতির দেহে সংক্রমিত হবে। তখন চোখের সামনে মোটর গাড়ির মিছিল, ঘরে ঘরে ফ্রিজের শুঙ্কন, রেডিয়োর সংগীত, ক্যানের বাতাস আশাদের কোন্ সাধনা দেবে? জনৈক সাংবাদিকের কাছে এক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বলেছেন যে তাঁর প্রতিষ্ঠানে কোনও ছাত্র ভর্তি হতে এলে তিনি প্রথমেই কারিগরি শিক্ষার জন্তে প্রবেশপ্রার্থীর আগ্রহের বিশেষ কারিগরি জানতে চান, তাতে অনেকেই নিছক ভালো লাগার মুক্তি দেখায় এবং বিভাগীয় নির্ধারিত পাঠক্রমের বাইরে ধারা নিষ্কল সময় কাটায় তাদের মুখে ওই মুক্তি শুনলে কার না হাসি পায়! অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে ওই অধ্যক্ষ মহাশয়ের ধারণা হয়েছে, এবং সে ধারণা বহুলাংশে নিশ্চিত ভাবেই যথার্থ, যে অধিকাংশ অভিভাবকই জনশ্রুতিতে কারিগরি শিক্ষার মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী হয়ে ছেলের কারিগরী শিক্ষার্জনের জন্তে পাঠান।

স্বস্ত স্বার্থের অপিচারের বিরুদ্ধে লড়বার জন্তে বহু কল-কারখানাতে ও দপ্তরে কর্মীরা আজকাল সংঘ গড়ছে। এসব সংঘ প্রথম দিকে গড়ে উঠেছিল স্থানীয় চরিত্র নিয়ে। কিন্তু ভারত শুধু ভৌগোলিক বিস্তারে নয়, জনসংখ্যার হিসেবেও পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। তাই আস্তে আস্তে ওইসব সংঘ—বিশেষ করে রেলপথ, বীমা, ডাক ও তার, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সংঘ—সর্বভারতের ভিত্তিতে বিশাল

আকার ধারণ করতে থাকল এবং একবার যখন এসব সংঘের বিশালীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তখন ব্যাক্তের মতো অস্বাভাবিক বেসকারী প্রতিষ্ঠানের সংঘগুলোও ওইদিকে এগোতে থাকবে। কিন্তু সংঘের বিশাল আকার ধারণ করার ফলে কর্মীরা কি এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হবে না? ওইসব বিশাল সংঘের কেন্দ্রীয় দপ্তরের সঙ্গে দূরতর শাখা-দপ্তরগুলির যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন ও জটিল কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে রেলকর্মীদের সংঘসচিব প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন কর্মীর কাছে সর্বদাই স্মরণ ও নৈর্ব্যক্তিক সম্মতি, তাঁকে শরীরি চোখে দেখা তো প্রস্ফাভীত, রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে কল্পনা করার ক্ষমতা যে সকল সামান্য তথ্য জানা প্রয়োজন সেসবও ওই কর্মীর পক্ষে অধিগত করা হুঃসাধ্য। অথচ সংঘসচিবের নামে যে ধর্মঘট ডাকা হবে তাতে যোগ দিতে ওই কর্মী অলিখিত চুক্তিতে সম্মত, কখনও বা খেচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য এবং সংঘের সদস্যসমষ্টির স্বার্থের বেদীতে তার ব্যক্তিসত্তা সদস্ততালিকাত্ত্ব হওয়ার মুহূর্ত থেকেই বলিপ্রদত্ত ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার দরুণ চাকুরি গেলে আসন্নপ্রসবী স্ত্রীকে নিয়ে অস্বাভাবিক বরখাস্ত কর্মীদের চাইতে অনেক বেশি বিপন্ন হওয়ার ব্যক্তিগত আশঙ্কাতে সে যদি কাজে যায় তাহলে তার সমস্যার কথা বিবেচনা করে সংঘ তাকে রেয়াত করবে না, বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করে দেবে। আবার কখনও, ধর্মঘটের কারণে যেখানে স্বার্থ, সেখানেও, ক্ষমতা স্বার্থের চালে বা নানা অবস্থার চাপে সংঘনেতাদের দিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহত হতে পারে, তখন প্রত্যাহারের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি না পেলেও সংঘসদস্যকে কেঁচে গণ্ডুষ করে কাজে যোগ দিতে হবে।

বিশাল কর্মীসংঘও আসলে বিশাল আমলাতন্ত্রেরই রূপভেদ। এই আমলাতন্ত্রে একজন কর্মীর ব্যক্তিসত্তা স্বভাবতই অচির বুদ্ধ। অধিকাংশের বিচার মানেই যে তা প্রব এমনি মনে করার কারণ নেই, তাই কোনও একজন কর্মীর বিচার যদি স্বার্থ হয় অথচ অস্বার্থের বিচারের সঙ্গে না মেলে

তাহলে সংঘের আইনের খোঁপে সত্যপ্রস্তার বিচার টিকবে না, সেক্ষেত্রে অধিকাংশের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তই সত্যপ্রস্তা কর্মীর অবশ্যম্ভাব্য, সেক্ষেত্রে তার স্বাধীন স্বার্থ বিচারও আপন স্বার্থেরই স্তাসরক্ষক সংঘের সত্তাতে বিলীন হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রকারান্তরে এসব বিশাল সংঘ কর্মচারীর স্বার্থসংরক্ষণের নামে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে হরণ করে এবং তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে কর্মচারী জানতেও পারে না যে সে কখন তার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খুইয়ে বসেছে। মজুর বা কর্মচারী সংঘ আজ যাই কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে বৃহৎ আকার ধারণ করছে ততই তার অংশ হিসেবে ব্যক্তি নগণ্য ও তাৎপর্যহীন হয়ে যাচ্ছে, ততই ব্যক্তির মূল্য ও অধিকার হ্রাস পাচ্ছে। ইংলও বা ইউরোপের দেশগুলি আকারে ছোট আমেরিকার রাজ্যগুলিও ছোট, ফলে পাঁচাত্তো কর্মচারী সংঘ পরিচালনা করা যেভাবে সম্ভব ভারতের মতো বিশাল দেশে তারই অমুকরণ করতে গেলে ব্যক্তিকে আরও বিপন্ন করা হবে।

এভাবে সংঘ সংগঠন করার কল্পনা গণতান্ত্রিক আদর্শেরই অদভূত অভিযুক্তি। নির্বাচনের ভিত্তিতে গণতন্ত্র স্থাপনের কল্পনাটি আমদানী করা হয়েছে ইংলও থেকে যেখানে টিউডর আমল থেকে বিভিন্ন ও দীর্ঘ কালব্যাপী পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে আজ দীনজনেরাও রাজনীতি-সচেতন। আমরা যখন গণতন্ত্রের আদর্শকে বরণ করলাম তখন একবারও বিবেচনা করে দেখলাম না যে তার স্বার্থ নির্তর করে জনসাধারণের যে-সচেতনতার উপর তা এদেশে কতখানি শর্তসহ বিদ্যমান এবং তার অভাব মেটাবার ক্ষমতা শিক্ষাকে কতখানি অগ্রাধিকার পরিকল্পনাগুলিতে দেওয়া দরকার। ফলে দেশ স্বাধীন হওয়ার কুড়ি বছর পরেও জনসাধারণের শতকরা আশি ভাগ অস্বাভাবিক অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই জনসাধারণ ভালোমন্দ বা প্রার্থীদের যোগ্যতা বা রাজনৈতিক দলগুলির লক্ষ্যের সার্থকতা বিচার করতে অক্ষম; কখনও নিছক প্রচারের স্রোতে কুটোর মতো ভেসে গিয়ে, কখনও প্রতিপত্তিসম্পন্ন

বিস্তবান ব্যক্তিরদের সামান্য প্রসাদের প্রত্যাশাতে বা আদেশে বা আতঙ্কে, কখনও বা নগদ টাকা পাওয়ার লোভে এরা সংসদে বিধানসভাতে প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে, এই প্রতিনিধিরা আবার মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করে, মন্ত্রীমণ্ডলী নতুন নতুন কারবারের ছাড়পত্র বিলিয়ে কিংবা ষোগ্যব্যক্তিকে টপকে অব্যোগ্যব্যক্তির পদোন্নতি ঘটিয়ে কিংবা সমাজ-বিরোধীদের চাকুরি ছুটিয়ে প্রাকনির্বাচনকালে সমর্থক ও সাহায্যকারীকে আরও প্রতিপত্তিশালী আরও বিস্তবান আরও সমাজশত্রু হওয়ার সুযোগ দেয়, এবং এই বিষাক্ত চক্রের আবর্তন ক্রমাগত চলতেই থাকে, এই চক্রের মধ্যে সমাজ-ও-রাজনীতি-সচেতনতা ও শিক্ষা বিস্তার করার কোনও অবকাশ স্বভাবতই নেই।

দিন-কে-দিন ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা ব্যয়সাপেক্ষ হয় উঠছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্যেক দলকেই প্রচুর টাকা ঢালতে হচ্ছে, যাদের হাতে টাকা কম তাদের পক্ষে নির্বাচনে জয়লাভ প্রায় অসম্ভব। তবু যদি কোনও রাজ্যে খাতিবজ্ঞের গভীর সংকট জনিত অসন্তোষ অত্যন্ত ব্যাপক হয় তাহলে স্থিতিবস্থার বিপর্যয়ে সরকারের রদবদল হতে পারে। কিন্তু ইতিপূর্বেই যারা খাতিবজ্ঞের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিকে প্রদর্শন করে ফেলেছে, বিভিন্ন ছাড়পত্রের জোরে অসং ব্যবসায়ের ফাঁদ পেতে রেখেছে, জনস্বার্থবিরোধী প্রবণতাগুলিকে স্বপক্ষে সুপুষ্টি করে তুলেছে তাদের উৎখাত করা জনসাধারণের উৎসাহী সক্রিয় সহযোগিতা সত্ত্বেও নতুন সরকারের কাছে অত্যন্ত দুর্লভ কর্ম হতে বাধ্য। তাছাড়া এটাও মনে রাখা দরকার যে অজ্ঞানতার অন্ততম সুফল হলো প্রতিক্রিয়াশীল মুক্তির জন্মে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং প্রকৃতই এবারের নির্বাচনে কোন কোন রাজ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি খুবই জোরদার হয়েছে, এদের পেছনে রয়েছে জনস্বার্থবিরোধী বিস্তবানেরা, তারা ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকে বিস্তবানদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার জন্মে উদ্ভূত, কংগ্রেসী

শাসনে সাধারণ মানুষ যেটুকু স্বাধীনতা ভোগ করেছে সেটুকুও নানা ছলে প্রত্যাখ্যত হবে, তাছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এসব প্রতিক্রিয়াশীলরা সামান্য মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত করবে এমন আশঙ্কা সম্পূর্ণ অহেতুক নয়। কালোবাজারী বা মজুতদারী প্রভৃতির জন্মে গুরুতর শান্তি ব্যবস্থা দাবী না করে জনসাধারণের একটা অংশ যে আজ গোহত্যা নিবারণের দাবিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এটা ওই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠার একটি দুর্লক্ষণ এবং এটা তো জলের মতো পরিষ্কার যে ওই দাবির জন্মে আন্দোলন ও সমাবেশ খুব অপরিকল্পিত ও বহু ব্যয়সাপেক্ষ সংগঠন ব্যতীত অসাধ্য। জনসাধারণের বৃহত্তর অংশকে অশিক্ষার অন্ধকারে চেপে রাখলে তার মানসল একদিন দিতেই হবে, সে শিক্ষার আলোকে ঢেকে দিতে চাইবেই : “পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে”।

অবশ্য আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যে আলো দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট একথা ভাবা ভুল, বরং ওই শিক্ষা আলোর চাইতে কুহেলীই বেশি সৃষ্টি করেছে, তাতে গণ ভুলের আশঙ্কাই বেড়ে যাচ্ছে। এ-শিক্ষা আমাদের বুদ্ধিকে মুক্ত না করে তথ্যে সংবাদে মস্তিষ্কে ভারাক্রান্ত করে তুলছে ; আমাদের দেশে একদা ব্যাকরণের চর্চাকেই বলা হতো বিদ্বার্জন, এর বিরুদ্ধে ছিল রামমোহনের অভিযান, তিনি বিদ্বাকে এমন এক আলোকস্তম্ভ হিসেবে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যা ব্যক্তির কাছে দৈনন্দিক জীবনে দিকনির্দেশক হয়ে থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা রামমোহনের সে-উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেছে এবং এককালে সংস্কৃত ব্যাকরণ মুগ্ধ করার মতোই একালের শিক্ষাব্যবস্থা এমন সব তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করছে যা মনে রাখার প্রয়োজন পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খতম হয়ে যায়, ছাত্রজীবনের বিদ্বাকর্মজীবনে

আর কোনও কাজে লাগবে না। উপরন্তু মস্তিষ্কচালনার পক্ষে অনুপযুক্ত বিষয়ের চর্চন করতে করতে ছাত্রজীবনেই আমাদের মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে যায়, পরবর্তীকালে তা চালনা করতে গেলে দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও নবীন ইউরোপের প্রশস্তি ছাড়া সেখান থেকে নতুন কোন আওয়াজ বের হয় না এবং তা শুনে শুনে মনে হয় যে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও নবীন ইউরোপের খিচুড়ির চাইতে আদর্শ জিনিষ ভূভারতে আর নেই। তাই আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর একটা অংশ প্রাচীন ভারতবর্ষের নামে আঁধা একটা অংশ নবীন ইউরোপের নামে সমাধি লাভ করেন এবং এর মধ্যে শিক্ষিতদের যেটা বড়ো অংশ সেটা বাইরের আচরণে পরিচ্ছদে ভাষায় যথাসম্ভব নবীন ইউরোপের নকল করে আর ঘরের বিধানে সংস্কারে বিকৃত দেশীয় ঐতিহ্যের নকল করে। দেশকাণপাতের ভেদে যে জীবনের মূল্যবোধগুলি নির্ধারণ করা দরকার এই সত্যটি আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাতে একেবারেই উপেক্ষিত, এবং এখানেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে কোনও রাজ্যের পক্ষে শিক্ষাসংস্কার করা সম্ভব নয়, কেননা তার টিকি কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আবেগ বোধে রেখেছে।

ফলে একালের ভালো ছাত্রছাত্রী সভ্যতার অগ্রগতি সংক্রান্ত হিসেবে এতই ওয়াকিবহাল যে দুদণ্ড তাদের সঙ্গে কথা বললে মনে হবে বুঝি বা তাদের মগজ এক-একটি ছোট বিশ্বকোষের আধার, কিন্তু তাদের জ্ঞানের বাস্তব-প্রয়োগের অবকাশ সম্পর্কে তারা সাধারণত দৈনিক পত্রিকার কিংবা বড়ো জোর বিদেশী বিশেষজ্ঞদের অভিমতের বাইরে অসহায়। এর একটা কারণ অবশ্য জ্ঞানের বিশেষীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে মস্তিষ্কশোধন, কিন্তু বিশেষীকরণের অফল ও কুফল তো আজ কমবেশি সব দেশেই বর্তমান, তার চাইতে বড়ো কথা এই যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা স্বাধীন চিন্তামুক্তিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, এমন কি বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্তেও এদেশে গবেষণা

করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংকীর্ণ, ফলে তাদের বিজ্ঞানচর্চা চাকুরি রক্ষা করাতেই অবসিত। বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জন্তেই যদি এরূপ ব্যবস্থা তাহলে মানবিক বিজ্ঞানগুলির ক্ষেত্রে অবস্থা আরও কত শোচনীয় তা অনায়াসে কল্পনীয়। ইংরেজ আমলে পাঠ্যক্রম এমনভাবে নির্ধারণ করা হতো যা ইংরেজ শাসনের স্বপক্ষে আমলা সৃষ্টি করত, এখন পাঠ্যক্রম এমন হয়েছে যার লক্ষ্য হলো স্তম্ভ স্বার্থের ভূমিকা সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের বিচারহীন করে রাখা। পঞ্চাশতের এই শিক্ষা জীবন-যাত্রার উন্নতমান সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীর চেতনাত্তে এমন এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে যা সামাজিক ও অর্থনীতিক অসমতার তথা স্তম্ভ স্বার্থের পরোক্ষ-পরিপোষক। কারিগরি ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান বিচার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অত্যন্ত সমস্তকে মিলিয়ে না দেখলে ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোদয়ের পথ খুঁজে বের করতে না পারলে জীবনযাত্রার মান বাস্তবে অনুন্নত থেকে যাবে অনিবার্যভাবেই। আবার মানবিক বিস্তার ক্ষেত্রে আমরা ইতিহাস বলতে বুঝি রাজা-উজির মারা, অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি দর্শন বলতে বুঝি অনাবশ্যক অবাস্তব তথ্যের জঞ্জাল ও তত্ত্বের কচকচি, ফলে দেশের প্রকৃত সমস্তা ও স্বরূপ সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা সজ্ঞানই থেকে যায়, বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীন জ্ঞানের বোঝা বয়ে বয়ে ক্লান্ত হয়ে জ্ঞানের জগৎ সম্বন্ধে আগ্রহী হওয়ার যোগ্য হারায়।

মারকে পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন “ব্রহ্মহত পড়েছ?” মাঝি বলল, “না,” তখন পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন, “মমুসংহিতা পড়েছ?” মাঝি বলল, “না,” তাতে হতাশ হয়ে পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন, “পাণিনি পড়েছ?” মাঝি তার জবাবেও বলল, “না।” পণ্ডিত বিরক্ত হয়ে বললেন, “তোমার জীবনই দেখছি বিফল।” একটু পরে আকাশে মেঘ দেখে নৌকো চালাতে চালাতে মাঝি জিজ্ঞাসা করল, “মশায় সঁাতার জানেন তো?” পণ্ডিত বললেন, “না,” চিন্তিত হয়ে মাঝি বলল, “তাহলে আপনার জ্ঞান আঁধা এই

নদীর জলে ডুবে যাবে।” এই প্রাচীন কাহিনী থেকে এটাই শিক্ষণীয় যে ঝড়ের মুখে নদী পার হতে হলে সীতারের স্তান থাকা চাই। আমাদের সব স্তানই আছে, কিন্তু সেসব স্তান দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির সমস্যাগুলো সমাধান করা যাচ্ছে না। আমাদের স্বাধীনতা তাই আত্মহননের স্বাধীনতা হয়ে পড়েছে, “পথের পাঁচালী”-র বাগক নায়ক অপূর মতো ছাপার হরফের প্রতি আমাদের আত্মগত্য শর্তহীন, তার কাছ থেকে আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতা নামে একটি কথা শিখেছি, কিন্তু সেসঙ্গে অজ্ঞ প্রচার, প্রতিশ্রুতি ও হুকুমের অধীন হয়ে পড়েছি। স্বাধীনতা আর ছাড়পত্রের মধ্যে বিভেদ নির্ধারণে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা বাইরের ব্যবহারে মতটা উজ্জ্বল হয়েছি ততটাই আমাদের ভেতরে অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। মনে হয় নামের আগে মিস্টারের বদলে শ্রী কিন্তু পদবীর বেলাতে মুখোপাধ্যায়ের বদলে সাহেবদের বিকৃত উচ্চারণে মুখার্জি লেখাটাই আমাদের দেশের স্বাধীনতার লক্ষণ, কিন্তু আসলে এটি ঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিকতাকে মেলাবার ব্যর্থ প্রয়াসের প্রমাণ এবং এই প্রয়াসই আজ আমাদের সমগ্র সমাজে মারীভুটিকার মতো প্রকাশ পাচ্ছে। ছাত্রজীবনে ছাপার হরফের আর কর্মজীবনে কর্তার ভজনা করে আমরা মনকে চোখ ঠেঁরে বলছি যে আমরা কারও চকুম মানিনা, আমরা যেচ্ছার এই জীবন বেছে নিয়েছি। ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যক্তিদায়িত্বের কোনও তফাৎ নেই এ বিষয়ে আমরা অচেতন, কিন্তু মজা এই যে আমরা স্বাধীনতাটাকে নিজের আর দায়িত্বটাকে অপরের বলে মনে করি। আজ যখন আমরা বাংলা দেশে স্তম্ভ স্বার্থের আইনজীবীকুলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে গিয়েছি তখন ভাবের ঘরে চুরি না করে আমাদের নির্বাচিত সরকারের ঘাড়ে সব দায়িত্ব না চাপিয়ে নিজেদেরও দায়িত্ব বহনের সময় এসেছে এবং এ দায়িত্ব শুধু সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নয়, তাকে সমালোচনায়, তাকে জনস্বার্থের পক্ষে রাখারও দায়িত্ব।

অনিমল হান্দের

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩৫০ টাকা

“...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিষ্কৃত করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাত্ত।”
... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১২৫

“...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবগদ করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া ‘নান্ত পন্থা বিজ্ঞতে অয়নাম।’ (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology, সংক্ষেপে
এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়ন্তী—৩১২, গান্ধী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেনার লেন, কলিকাতা-৯

রাজপথে শুভ দীপাশ্রম

অশ্রুতকুমার সিকদার

বাংলা আধুনিক কবিতার ধারা আদি পুরুষ তাঁদের নিরলস কবিকর্ম দেখে মনে হয় মৃত্যু যদি অকালে কর্তরোধ না করতো তাহলে জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ আমাদের আরো অনেক অনবদ্য কবিতা উপহার দিতে পারতেন। প্রবীণদের অনর্গল রচনা সব সময়ে যে উপায়ে হয়েছে তা নয়, তবু অভিস্রুতার ঘনেষ্টে সেই সব কবিতায় কখনো কখনো বিরল উপলব্ধি ধরা পড়ে। 'যে প্রেমার নৈর্ব্যক্তিক, যা আমরা শিল্পকর্মে খুঁজি' তার সাধনায় বিষ্ণু দে যে সব সময়ে সার্থক হন তা নয়, * অমিয় চক্রবর্তীর সরল মানবতাবাদের মতো, তাঁর আশাবাদ মনে হয় অতি-সরল। 'আমি আশাবাদী বনো? আশা তো স্বভাবে।' সেই আশার প্রতীক হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে বিষ্ণু দে প্রায় প্রত্যেক কবিতাগ্রন্থে একবার করে বন্দনা করেন, এখানেও করেছেন। 'রাবীন্দ্রিক অন্ধরের' মতো কবিতার আশাবাদ ছকে-বাঁধা মনে হয়। 'ভেজা গেঞ্জি কাচি, কাকস্নান করি চৌবাচ্চার জলে', পরের পদক্ষেপে সহজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান, 'জাগে সেই রাবীন্দ্রিক অন্ধরের আনন্দিত সুর'। এই প্রৌঢ় কবির প্রেমের কবিতার জন্ত পাঠক ক্লান্ত বোধ করে। শরীর-রেখাহীন প্রেমের শাস্ত-গভীর উপলব্ধি বিষ্ণু দে-র কবিতায় মস্তের গাঙ্গীরে উচ্চারিত হয়।

সত্য উদ্ভাসিত হল প্রিয়া কাল ক্রম অন্ধকারে.

একা কম্পমান রাজি শুক্লতায় শিয়রে বাজায়

* সেই অন্ধকার চাই—বিষ্ণু দে। ভারবি।

নিজেরই স্বপ্নগন্ধ, বিনিময়ের স্বপ্নকে শাসায়
তোমার জাগ্রত রূপে...

প্রত্যক্ষ এবং নিকটবর্তী রাজনীতির কথা কবিতায় ব্যবহার করলে যে সমস্ত দেখা দেয় তার প্রমাণ এই গ্রন্থে পাই। ১৯৫৯ সালের একটি কবিতায় নাছুরিরিপাদ 'স্বকৃত্য সংহত তাঁর নির্বিবাদ স্বরে' আর ১৯৬০ সালের একটি কবিতায় 'আশা যেন নিকিতার অক্লান্ত সফরে'। কিন্তু ১৯৬২-র পরে যখন নিকিতা-সমর্থকে ও নাছুরিরিপাদে বিবাদ আরম্ভ হলো তখন বিব্রত কবি কী করবেন? প্রশ্নটি তুলে না জ্ঞাত পুণ্ড্রের মতো মধুর কবিতার গৌরবে অবশ্য সহজেই মগ্ন হয়ে যাই।

রাজে সে আসে না, শুধু বাগানের শিশির হাওয়ায়
গন্ধটুকু ভাসে।

রাজি কাঁচে অস্পষ্ট বিন্দিত এক একাকী মায়ায়
দিনের প্রত্যাশে।

দিন কোথা? দিন নেই, দিন প্রতি রাজি প্রতীক্ষায়
রাজি যায়, আসে।

দেশগত নষ্টালজিয়া ছিল অমিয় চক্রবর্তীর স্বরে ফেরার দিন বইতে,—বাংলাদেশের কেন্দ্রে প্রবাসীর স্বরে ফেরার ব্যাকুলতা। সম্প্রতি প্রকাশিত বইটিতে *** ভাবগত নষ্টালজিয়া। কোনো শুভবোধ, কোনো অমলিন মানবতাবাদ যদি উন্মার্গগামী বিধ্বস্ত হারানো সংসারে থাকে তারই সন্ধানে কবি নিরলস।

* হারানো অর্কিড—অমিয় চক্রবর্তী। ভারবি।

সেবগ্রামে শূন্য ঘর; শান্তিনিকেতন;

পোপ জন্ম

এবং সোয়াইটজর...

সন্দেহ নেই অতি সারল্যের ফলেই অমিয় চক্রবর্তী
লাস্বেইনের সন্ত ও রবীন্দ্রনাথকে সমান মর্যাদা দেন, তিনি
কি জানেন না অ্যালজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়
সোয়াইটজর ফরাসীদেশকে সমর্থন কবেছিলেন এবং কল্লোর
অন্তবিপ্লবের সময় কাটাঙ্গার শোষণে? জটিল জগৎকে উপেক্ষা
করে বা বুঝতে না পেরে অমিয় চক্রবর্তী টান দিচ্ছেন কেন্দ্রের
দিকে—

এইখানে এই ঘরে এইখানে

পৃথিবীতে আলো- জ্বলা পৃথিবীতে

জালি করা পথ দিয়ে

এইখানে এই ঘরে...

সনাতন স্তুতিতা ও পবিত্রতায় ফিরে যেতে চান বলেই
কি অমিয় চক্রবর্তী পয়োরের সনাতনে ফিরে আসছেন।

অভাষ মুখোপাধ্যায়ও অমিয় চক্রবর্তীর মতো বিরূপ
প্রতিবেশে 'still centre'-এর সন্ধানী। † অমিয় চক্রবর্তী
দেখেন ডুগেলডফের বোমাবাঙা অবসান, পঙ্কগীজ আঙ্গোলা,
কঙ্গো এবং 'পুড়ন্ত ভিয়েনাম'। অভাষ মুখোপাধ্যায়ের
প্রতিবেশ জগৎ জোড়া নয়। তিনি দেখেন 'দক্ষিণে ও বামে'
'নারদ। নারদ, অন্ধকারে' সাইরেনের শব্দ তাই, 'চাদনিতে
মুড়িমুড়কির মতো বিক্রি হচ্ছে টর্চ'। সাহিত্যের জগতেও
কোনো স্তুতিতা অক্ষুণ্ণ নেই—

উঠে আসছে শক, হুণ, কুষাণ, পহলবী

স্বপ্নাচ্ছ, কলমে; হচ্ছে ছাপাই বাধাই;

বই যা ভারি, বইতে পারে একমাত্র গাধাই—

কী মজা, লিখলেই সব হয়ে যাচ্ছে ছবি।

মগজে ডবল শিফটে তৈরি করে প্লট...

‡ কাল মধুমাশ—অভাষ মুখোপাধ্যায়। ভারবি।

অভাষ মুখোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী দুজনেই বিশ্বাসভঙ্গে
মাঝে মাঝে ব্যঙ্গের ধারে শাণিত। অমিয় চক্রবর্তীর পূর্ববর্তী
কাব্যগুলিতে ব্যঙ্গভীতির অনেক উদাহরণ পাই, এই গ্রন্থের
সর্বনাম হেঁয়ালি-নাট্যের কোনো কোনো অংশে পাই।

একটিবার দৌড়ে এসো

ও নদী ও স্মৃতি...

অভাষ মুখোপাধ্যায় কৈশোরের পবিত্র দিনের
নটালজিয়ায় স্মৃতির নদীর উৎসসন্ধানে বেরিয়েছেন। মমতাময়
পৃথিবী বোঝাতে অমিয় চক্রবর্তীর মতো তিনিও তাকে নাম
দিয়েছেন 'ভুবনডাঙা'

মেয়ের জন্তে তালপাতার তেঁপু

তোমার জন্তে ফলফুলের চারা

আর বাড়ির জন্তে

অন্দর পেতলের খাঁচায়

ছুটো বদরিকা পাখি।

পুলকিত পত্রশুচ্ছ বাতাসের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে হাত
নেড়ে এই কবিতায় বলে: বাঁধো, নীড় বাঁধো। এখন
শব্দনির্বাচনে তির্যক তীক্ষ্ণতা কম, ছন্দের বাঁধন শিথিল, এখন
স্বাভাবিকের সন্ধানী কবি। কাল মধুমাশ নামক দীর্ঘ নাট্য
কবিতাটি শৈশব কৈশোরের স্মৃতিরোমস্থান।

এখনকার বাংলা কবিতায় শুধু প্রবীণরাই যে স্মৃতিচারণে
ব্যস্ত, কিশোরকালের নিষ্পাপ বাসায় ফেরায় ব্যস্ত, তা যে
নয় তার প্রমাণ শান্তি লাহিড়ীর দীর্ঘ কবিতাটি। * 'পরজন্মে
আত্মাহীন, বর্তমানে অক্ষমতা, আমি আজ দাঁড়াবো
কোথায়?'

—অতরাং স্মৃতি বোমস্থানে ফিরে চলে। 'কৈশোরের
করমচাতলায়।' বাংলা কবিতায় এখন স্মৃতিচারণা ছাড়া
আরো দুটি স্বর শোনা যাচ্ছে—একটি নৈরাজ্যবাদী চীৎকার,
আর দ্বিতীয়টি প্রেমের ধনুতীর নম্রস্বর। শান্তি লাহিড়ীর

* নির্বাসিত কথামালা—শান্তি লাহিড়ী। সাহিত্য।

বিধাশ্রুত কণ্ঠে দুইটি স্বরের একত্র সমাবেশ পাই। একদিকে চুলছেঁড়া চীৎকার, হাহাকার, আর্তনাদ, মর্ষকাম—‘অন্ধ ভিক্ষুগীর দেহ কুড়ে খাচ্ছে ঋজু ভিক্ষাজীবী’; আর অল্পদিকে—

বিশ্বয়ে বিশ্বুদ্ধ আমি আরো কিছুকাল রব অবর্ণরেখার
উপকূলে,

পদ্মার গভীর চরে নৌকা নিয়ে কিংবা কোনো

সন্ধ্যার বিপিনে

বালায় ভাসিয়ে জলে ভাটিয়ালা কণ্ঠে বাড়ি ফেরা। যদিও অবিশংবাদী কবিত্বে বার বার মুগ্ধ হই (‘রক্তের নদীর চেয়ে অল্প কোনে বৈতরণী কামনা করি না।’) তবু মনে হয় মনীষার মেরুদণ্ড ছাড়া, প্রত্যর্কে অগ্রগতি ছাড়া, দীর্ঘ কবিতা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—ব্যক্তিরকে হয়ে ওঠে বিচ্ছিন্ন কবিতার সংলগ্নতাহীন সমাহার।

আমি বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করবো একা-একা

পাজী ওই গাছ ওই পাখি ওই নারী।

আলোক সরকার সেই সপ্ৰেয় নম্র স্বরের অতুল সাধক। সর্বশেষ গ্রন্থেও * তিনি ‘স্বাভাবিক স্বরের সন্ধানে একনিষ্ঠ। এই কবিতাগুলো কৈশোরের সেই কমনীয়তা আছে, যৌনতা এসে থাকে এখনো খুলিয়ে দেয়নি। ‘নিমগ্ন ধ্যানের মন্ত্র’ ‘শাস্ত্রিত স্বরূপের’ সন্ধানী এই কবিতায় কায়ের আতুড়তা নেই; এই কবিতায় মায়ের কথা যত প্রেমিকার কথা তত নয়।

তাঁর একটি কবিতার নাম ‘সমস্ত নিরালা’—বাস্তবিক সমস্তির সন্ধান ও নিরালা পরিবেশ আলোক সরকারের কবিতার বিষয়। ‘সমস্তিত হুপ’ যা তিনি পেয়ে যান, তা বড় দ্বিধাহীন সহজেই পেয়ে যান। বিকৃতির অস্বস্তি আঙুন, তাপের প্রেতের অপলাপ সহজেই উত্তীর্ণ হন, কারণ তাঁরই স্বীকারোক্তি ‘আমি কিন্তু অস্বস্ততা ছন্দোময় ভাবতেও পারি না’। একজায়গায় স্বভাবের বিরুদ্ধে বলেন ‘বিপক্ষে

* অন্ধকার উৎসব—আলোক সরকার। চতুর্দশ।

দৈব’। কিন্তু এই কবিতাবলীতে ‘দৈব’ সর্বত্র এক প্রবাহিত।’ মহান অশঙ্কগাছ কথা বলে, মাঠের উপর বরাপাতা কথা বলে, বাঁশ বনে হাওয়া আসে শুভ্র কথা বলে—এই কথা শেখার চেষ্টায় কবি বিনীত শিক্ষার্থী। রক্তকরবী পলাশ মন্দার কৃষ্ণচূড়া ফণিমনসা লঙ্কাধ্বা শিউলি শোভিত, জানলার বেলোয়ারি কাচে উজ্জল, খাঁচার পাখিতে মুগ্ধ, অশঙ্ক শালে ছায়াচ্ছন্ন এই পরিবেশে যা কিছু দৈনন্দিন তাকে অস্বাভাবিক লাগে—‘বড়ো রাস্তার গহনার দোকান কিংবা ডাক্তারখানার অসীমতা।’ আলোক সরকারের নতুন পথে পদক্ষেপের বা একই কথা নতুন করে বলার সময় এসেছে—নাহলে ছন্দ প্রকরণের অবিচিহ্নতায় পুনরুক্তিপরায়াণ তাঁর কবিতা পাঠককে ক্লান্ত করে তুলবে। প্রসঙ্গক্রমে কবিকে দুটি শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক করে দিই—‘অরব’ এবং ‘সম্পন্ন’।

নিজস্ব সীমার মধ্যে প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতার * পরিধি সংহত। এখানে কোনো মহৎ ভঙ্গিমা নেই, বিশ্বজাগতিক কোনো বক্তব্য নেই। ব্যক্তির দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বকেও দেখা নেই, এখানে নিজেকেই দেখা এবং সেই দেখার কথা নম্র স্বরে উচ্চারণ। ‘বাড়ির বিষয়ে আমি খুব কম জানি’। এই সংকলনের একটি কবিতার নাম, ‘স্বগতোক্তি’, কিন্তু শুধু এই বিশেষ কবিতাটি নয়, প্রায় সমস্ত কবিতাই স্বগতোক্তির লক্ষণে আচ্ছাদিত। ‘হাইনের স্বগতোক্তি কবিতাটির মধ্যে এই কবিতাগুলোর ধর্ম যথার্থভাবে বলা হয়েছে—

একাই থাকি; নেহাত জাহ্নবলে

প্রাণের ডাল আকাশ ছুঁয়ে আছে,

বন্ধু নয়, পুরোহিতের মতো

শুটি কয়েক মন্ত্র কথা বলে।

আপাতদৃষ্টিতে প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের জগৎ আলোক

* সদর স্ট্রীটের বারান্দা—প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। কৃত্তিবাস।

সরকারের প্রতিবেশী—ভয়ররঙিন গ্রাম, আমকুড়ানো ছেলে,
শিশিরে ঈষৎ-ভেজা ছুই চাঁপা তার বাসিন্দা। কিন্তু তাঁর
জগৎ একেবারে নিয়তি নির্বাসিত নয়।

আজ শুধু শীতের আলোর
ধবল নিঃশব্দ পাল
মেঘ-ছিন্ন, জলে পড়ে আছে,
পাখি মরে আছে,
পাখি শীতের ভেতরে মরে আছে।

পাখির ইমেজ এই কবির খুব প্রিয়—মাদারগাছের পাখি,
ধেমে ধেমে গেয়ে চলছে পাখি, তৃষ্ণার ভেতর থেকে পাখি
উঠে আসে, টিট্টিত পাখির ডাক ভেসে চলে গেছে, চতুর
পাখির মতো উড়ে গেছে পাতার রূপোলি এবং এই রকম
আরো।

প্রশবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতা—

এত ভীষণ শিখা, তাকে

যে-কোনো জলের কাছে, যে কোনো ঝড়ের কাছে

নিয়ে যেতে বড়ো দিখা হয়,

যদি নিভে যায়...

এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে এইটাই ভয়, এই স্পর্শকাতর
কবিতাগুলি যেন 'precious' না হয়ে যায়।

তৃতীয় স্তরের কথা বলেছি তার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য
প্রতিনিধি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *
নৈরাজ্যবাদী চিংকারে মুখর। তমসায় বদ্ধমূল অথচ রাত্রি
থেকে উদ্ধারের অক্ষম আকাজক্ষা এই চিংকারে প্রতিধ্বনিত।
কতোবার তিনি কর্কশ স্বরে চিংকার করে উঠেছেন—
'আমি চিংকার করলুম', 'রৌদ্রের চিংকারে সব শব্দ ডুবে
গেল।' শুধু ভয় হয়, কোন সময় চিংকারের আড়ম্বরে গলা
না চিরে যায়, গলা না ভেঙ্গে যায়। নিরর্থক প্রতিবেশে

* আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি—সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায়। কল্পিবাস।

কবিতার অর্থও আলোড়িত ধর্মিত হয়ে বিনষ্টের পথে গেছে।
এই ক্রোধের চরিত্র নৈরাজ্যবাদী, যে ক্রোধ এই কবিতাগুলোর
প্রেরণা। নৈরাজ্যবাদ রাষ্ট্রনীতিতে নিন্দনীয় হতে পারে,
কবিতায় কিন্তু নিন্দনীয় নয়, যতোকণ কবিতা। এই
ক্রোধের প্রতিক্রিয়ায় কবি সব কিছু সম্বন্ধে নিগিষ্ট হতে চান,
উদাসীন সম্মের শিক্ষা নিতে চান—যার মধ্যে সংলগ্ন
আত্মহার্য অবস্থা নেই, যে অবস্থার একাকীত্ব অনবলুপ্ত।

আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা

নিখিলেশ

এই কি মানুষ জন্ম? নাকি শেষ

পুরোহিত কঙ্কালের পাশাখেলা।...

এ সেই জগতের কবিতা যেখানে 'অতিরিক্ত অবিবাস
মানুষের পাশাপাশি হাঁটে,' যেখানে 'মানুষ না প্রতিবিম্ব'
বোঝা যায় না, কবি ও কবির বিকল্প নিখিলেশ' কে কখন
কথা বলছে বোঝা যায় না।

এখনকার সব চেয়ে ইন্টারেস্টিং কবি ক্রমাগতই ভালো
কবিতা লেখেন 'হঠাৎ নীরার জন্ত', 'রাত্রির বর্ণনা', 'আমার
খানিকটা দেরি হয়ে যায়,' 'হিমযুগ' দেখা হবে' ইত্যাদি।
কিন্তু কবি যে মাঝে মাঝে সপ্রতিভ চাতুরির আশ্রয় নেন,
সেইটে শেষ পর্যন্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে।

আমি স্তম্ভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত যে অমিতাভ
দাশগুপ্তের সর্বশেষ কবিতার বইয়ের নামটি * বড়ই আর্টি।
কিন্তু ভিতরের কবিতা নয়। স্মৃতিরোমন্বনের স্বর দিয়ে
কবিতাগুলোর স্বরপাত—'স্বাস্থ্য নিবাসের কোল থেকে।'।
সাঁওতালী ছড়ার ধরণ আছে অনেকগুলি কবিতায়—'দোলনা
পুলে', 'গৌরীহাটে একাকী বাব না' এবং কয়েকটি কবিতার
কোনো কোনো অংশে। আর খেলাধুলোর কথা যা কবিতায়
বিরল তাও অনেকগুলি কবিতায় আছে—ফুটবল, হকি ক্রিকেট
ডিস্কাস হোঁড়া থেকে গোজাছুট ডাঙলি বাবতীয়। কবি

* মৃত শিশুদের জন্ম টফি—অমিতাভ দাশগুপ্ত। সাহিত্য।

যে বলেন ‘আমার মতন কোনো অভিমাত্রী শিশু নাই পৃথিবীর
ফরে’—সেই শৈশবের দিনের স্মৃতিতে সাঁওতালী ছড়ার ধরণে
কবিতার জন্ম এবং খেলাগুলোয় মাটিমাখার কথা। কিন্তু
নিষ্পাপ শৈশব থাকে না, খেলার বল হারিয়ে যায়—

বেলা যায় মিছে কিশোর খেলার ছল

মধুরায় এসে হারিয়ে ফেলেছি বল।

তখন অভিমাত্রী সব কিছু ভাঙতে চায়—নেই নৈরাশ্রের
চীৎকার—বিকৃত স্বর; তখন বিভব সরসে আসক্তি, ফিরে
আসতে স্বকৃত বমনের কাছে—

এই বলে নারীকুল আ-রাত্র চুলোয় সেক্ষ করে

ভাজা যেন নটেশ্যকটি, পাল পাল যুবাদের ধোরা

চুলের গুহিতে বেঁধে রোদুরে শুকোতে দেয় রোজ। জন্ম
কিশোর শরীরসঙ্গকে বিভবস জেনে শিউরে ওঠে সেই
ছন্দমা ‘আর্সেনিকের গোলাপ’ কবিতায়। কিশোরস্বভাব
কাটে নি বলেই, নারী ‘স্বাস্থ্যল অলসতাগুলি মায়ীঠিগিলীর
মতো’, প্রেম ‘অজাগরী’, আর প্রেমিকেরা ‘হাগবুদ্ধি রাজপুত্র
বালকস্বভাবী’। অথচ ‘বসুংসব শিশুহত্যা হাজার’ শৈশব
থাকেনা, কৈশোর নষ্ট হয়, বিশ্ব এখন নির্ধাতন কক্ষ, কবিতা
সেই নির্ধাতনকক্ষের চীৎকারদীর্ঘ রিপোর্টে।

বিজয়কুমার দত্তের কবিতায় * এমন অনেক চরণ আছে
যা তাঁর কবিত্বের অবিসংবাদিত অভিজ্ঞান।

ছুখে তোমার ভালোবাসার আঙ্গুল হয়ে কাঁপে...

চকিত হাওয়ার মতো সন্ধ্যালোকে ঝরেছিল জল...

চোখের জলের চেয়ে অস্তুর ঝপ আমি রাখিনি কখনো।

তাঁর অধিকাংশ কবিতাই অবশ্য ভাষণ প্রধান, কিন্তু ভাষণ
অনেক সময় কবিতার সংরাগ লাভ করে—

* মুখশ্রী উল্লোচনে—বিজয়কুমার দত্ত। মানস।

আবেগ দেখাতে আজ লজ্জা করে। প্রবীণ মুখোশে
সকলেই ঢেকে রাখে রক্তের বসন্তবেলা রূপের জোয়ার
অথবা শরীর ঘিরে আবেগের মগ্ন হাহাকার।

কিন্তু তাঁর দীর্ঘতর কবিতাকে ধারণ করতে পারে এমন
কোনো চিন্তার জটিলতা বা গূঢ়তা শৈশবের মধ্যে নেই।
ভাষণপ্রবণতা, প্রথমে উপলব্ধি বলে তারপর বিস্তার, উপলব্ধির
দুর্বলতা এবং নিঃস্বপ্ন প্রকরণের অভাব তাঁকে যথার্থ সার্থকতা
অর্জন করতে দেয় নি।

সন্দেহ নেই গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ও যথেষ্ট কবি; তাঁর
এই * খুলে প্রথমেই মুদ্রা হই—

বিকচ পদ্মের পাপড়ি। ছিঁড়ে চের

কোথাও মধু নেই। মধুকর

কী তবে করে পান? হাওয়ার আনে পান।

ওঠে রাখে মধু জাহ্নকর।

হয়তো যুগোপযোগী হবার প্রয়োজনে তিনি লেখেন,
‘ভেজক্রিয় রশ্মিমালাে আমরা দৃষ্টি? এ যুগের লোক,’ অথবা
‘চেতনার দৃষ্টিকিঞ্চ ক্যানসার’—কিন্তু এই যুগযন্ত্রণাকে
তিনি কবিতার স্বরূপ দিতে পারেননি, বোধ হয় এ তাঁর
স্বাভাবিক স্বর নয় বলে। তাঁর কবিতায় ইমেজ বিরল,
সঙ্গীত অবিচ্ছিন্ন, ফলে অর্থনিষ্ঠর এই কবিতা অনেকটাই
ভাষণপ্রধান। কোনো অপ্রত্যাশিত অনিবার্যতা নেই যা
আমাদের মধ্যপথে ধামিয়ে দেয়। ‘প্রেম সাধনা’, ‘মস্তিষ্ক-
বিকৃতি’, ‘ইচ্ছা-রূপায়ণ’ ‘মেধাবর্ম’ এই রকম সমাসবদ্ধ পদ,
‘হাওয়া হানা দেয়,’ ‘ঘুমের নদীরা,’ ‘নির্জন প্রবালদীপ’ এই
রকম ক্লিষ্ট বাক্যাংশ কবিতাকে খর্ব ক’রে কেন তাঁর স্বভাব-
সিদ্ধ কবিত্বকে এইভাবে ক্ষয় করেন তিনি জানি না।

* পরিচিত মুখগুলি—গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য।

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.

THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.

NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.

THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS

BHARAT SUGAR MILLS Ltd.

GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

*** * ***

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

*** * ***

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,

159, Churchgate Reclamation,

BOMBAY - 1

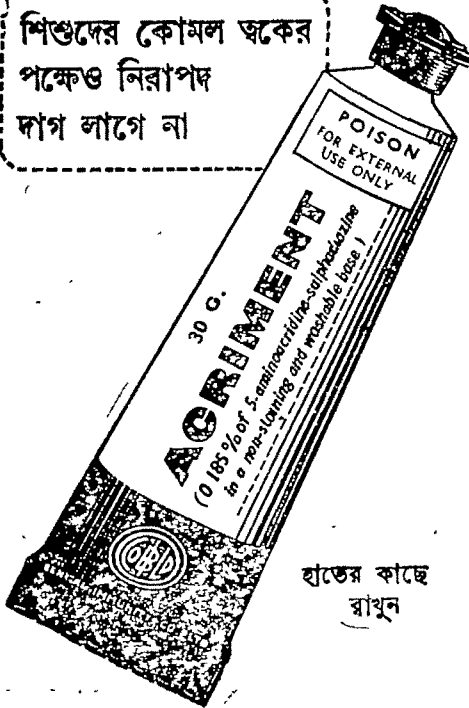
গোড়া কাটা গোকাল কামড়

এই সব আকস্মিক

দুর্ঘটনায়



শিশুদের কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ
দাগ লাগে না



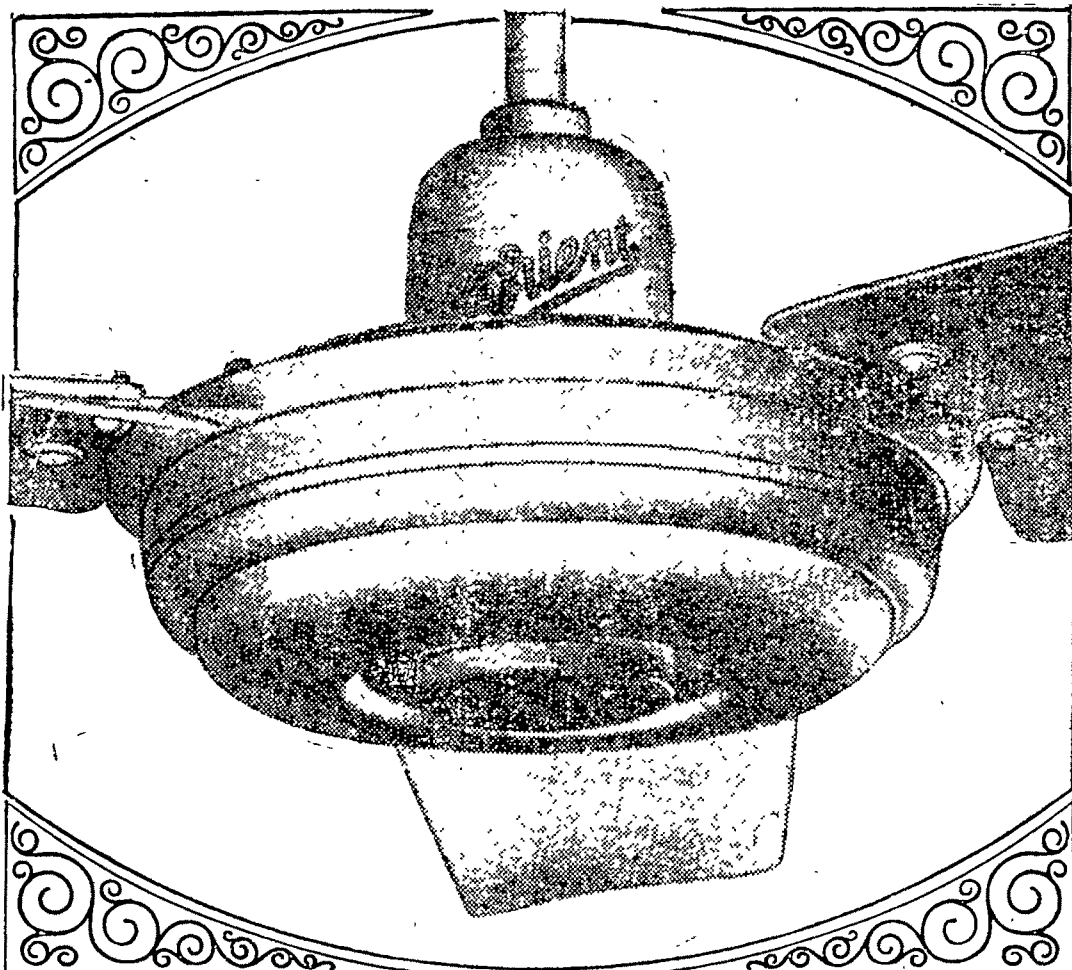
হাতের কাছে
রাখুন

এ্যাক্রিমেন্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যাক্রিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সস্তর আরামদায়ক

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী





**ENGINEERED
TO OUTLAST
MANY MANY SUMMERS**



CEILING FAN
GUARANTEED FOR TWO YEARS
ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD.
CALCUTTA-84

ASP/OGI-2/66



মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

গাছা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভূসরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই শিথিলকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্বদা প্রসূর ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনার মহা ভূসরাজ তৈল



সাধনা ঔষধালয়-ভাঙ্গা
দায়ক ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮

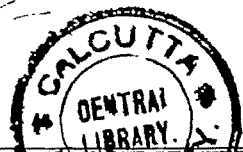


কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ মনোজেন্দ্র বোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলি) আধুনিকোচার্জ

অধ্যাপক প্রিয়োপেন্দ্র বোষ, এম. এ.
আধুনিক গার্ল, এম. সি. এস. (পত্র) এম. সি. এস. (আমেরিকান)
ভাদ্রনগর কলেজের ইন্ডিয়ান লিটারেচার বিভাগ

Central Registration No 2370/57 Per Copy R 75P With Postage P. 78P.

HEAD OFFICE JAYASREE 312 Ganguli Bagan, Naktala Calcutta-47



সম্পাদিকা : লীলা রায়।

জৈষ্ঠ

১৩৭৪

দ্বিবিধ উপকারী কেশ তৈল



- মাথা ঠাণ্ডা রাখে
- স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশবর্ধনে সাহায্য করে

জীবনের বিভিন্ন বৃত্তিতে আজ নরনারী নির্বিশেষে সকলকেই মাথা ঘামাতে হয়। তাই তাঁদের পক্ষে এমন কেশ তৈলই বিশেষ উপযোগী যা একাধারে তাঁদের মাথা ঠাণ্ডা রাখবে এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশবর্ধনে সাহায্য করবে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত ভূবরাজ লতা ও অম্লান্ত গাছগাছড়ার ভেষজ গুণসম্পন্ন সেই অতুলনীয় কেশ তৈল হ'ল—



ক্যালকেমিকোর

ভূবরাজ

স্বরভিত

মহাভূবরাজ কেশ তৈল

ক্যালকাটা কেমিকেল কর্তৃক প্রস্তুত

খরাক্লিষ্ট জনগণের জন্য সাহায্য হিসেবে

এখন

আরও বেশী দান করুন

“আমি আপনাদের কাছে যেমন আর্থিক সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি, অনারুষ্টি-ক্লিষ্ট জনগণের দুর্দশা, হৃদয় দিয়ে অনুভব করার জন্য আরও বেশী করে আবেদন জানাচ্ছি। এটা স্থানীয় সমস্যা নয়। এটা হ’ল ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর দুর্দশার সমস্যা।

“যাঁরা ইতিমধ্যে তাঁদের সাখানুযায়ী দান করেছেন তাঁদের কাছে আমি আরও সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। যাঁরা এখনও কোনও দান করেননি তাঁদের কাছে আমি মুক্ত হস্তে দান করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। এখনই যথাসাধ্য দান করার জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।”

জাতির উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা।

প্রধান মন্ত্রীর অনারুষ্টি সাহায্য তহবিলে
যথাসাধ্য দান করুন

ডাকযোগে এই তহবিলে অর্থাদি পাঠানো
হলে তার জন্য মনি অর্ডারের কমিশন, ডাক
মাশুল এবং রেজিস্ট্রেশন ফী দিতে হয়না।
ওষুধপত্র, বস্ত্রাদি টিনজাত খাত্তাদি বিনা-
মাশুলে বিমান যোগে নির্দিষ্টস্থানে পাঠানো
যায়। ডাক, বিমান ও রেল মাশুলে, ত্রায়-
করে আবগারি এবং বহিঃশুল্কও রেহাই
পাওয়া যায়।

প্রধান মন্ত্রীর অনারুষ্টি সাহায্য তহবিল,
কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট, রাষ্ট্রপতি ভবন,
নূতন দিল্লী—১

DAVP 67/F—3
BENGALI

সূচীপত্র

জয়ন্তী : জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৮৩
হৃভাষচন্দ্র	(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	৯১
পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট	(প্রবন্ধ)	৯২
বঙ্কিমের স্বদেশপ্রেম	(প্রবন্ধ)	১০৭
অন্দরবন ভ্রমণের ভূমিকা		১১০
প্রতিমা	(কবিতা)	১১৩
রাজসাক্ষী	(কবিতা)	১১৩
ক্রমশঃ বিনাশের দিকে	(কবিতা)	১১৪
অস্তিত্ব	(কবিতা)	১১৪
জল মাটি মন	(উপন্যাস)	১১৫
কণ্ঠ ভরা বিষ	(উপন্যাস)	১২৫
সেই অরণ্য	(কাহিনী)	১৩৩
পুস্তক পরিচয়		১৩৯

অগ্রণামী সংস্কৃতি পরিষদের

প্রকাশিত পুস্তিকা :

লোকসভাস্থ নেতাজী প্রসঙ্গ

মূল্য : দশ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান : ৩০২, গান্ধীবাগান, কলিকাতা-৪৭

৬৩/১, রাসবিহারী ঞ্চেতন্য, কলিকাতা ২৬

(দোতলা)



মন আজ
খুশীতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্থান্য ভাল রাখার জন্য সাধনার
অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর
ছুইবার করে দু'চামচ মুক্তসজীবনীর সঙ্গে
চার চামচ মহাজাফারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা



অধ্যক্ষ ডাঃ বোমেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লন্ডন),
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের স্নাতক
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

জয়ন্তী

৩২ বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • জ্যৈষ্ঠ-১৩৭৪

সম্পাদকীয়

নকসালবাড়ী

গত এপ্রিল মাস থেকেই দার্জিলিং জেলার নকসালবাড়ী, খড়িবাড়ী ও ফাঁদিয়েওয়া থানায় মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টদের সমর্থনে ও কৃষক সমিতির উদ্যোগে আন্দোলনের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল। এই আন্দোলন ধান লুণ্ঠ, জমি জবর-দখল, ক্ষেতের ফসল বিনাশ, লোকের উপর আক্রমণ প্রভৃতির রূপ নিয়ে আসছিল। ভূমি সংগ্রামের জন্ত এই আন্দোলন বিস্তারিত হলেও আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে যারা শায় দিতে পারে নাই তাদের উপর লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন নেমে আসে। ছোট জোতের যারা মালিক, সামান্য ধান বাঁদের সঞ্চয় তারাও রেহাই পায় নাই। মে মাসের মধ্যেই প্রায় আটটি এই ধরনের ঘটনা পুলিশের নজরে আসে। তারপর ২৪শে মে আন্দোলনকারীদের আক্রমণে একজন পুলিশ অফিসার নিহত এবং কয়েকজন আহত হন। তারপর দিন পুলিশের গুলিতে পাঁচজন নারী ও একজন শিশু নিহত হয় এবং তিন জন আহত হন। তারপর থেকেই নকসালবাড়ীর পরিস্থিতির গভীরতা সম্পর্কে সচেতনতা দেখা যায়।

এই শোচনীয় ঘটনাগুলির পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব মন্ত্রী

ও মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট লীগের ক্রমশঃ কোড়ার নকসালবাড়ী এলাকার সমস্ত সমাধানের জন্ত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাত করে এসেছিলেন। তার সফরের ফলাফল আর যাই হোক নকসালবাড়ীতে শান্তি স্থাপনের সহায়ক হয় নাই। কারণ, তার সফরের অব্যবহিত পরেই পুলিশের ইনসপেক্টর সোনাম ওয়াংদির আন্দোলনকারীদের শস্ত্র আক্রমণে গুরুতররূপে আহত হয়ে মৃত্যু হয়। নকসালবাড়ীতে এই ঘটনার সময় মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির পশ্চিম বঙ্গ শাখার এবং সর্বভারতীয় দলের সম্পাদকস্বয় হাজির ছিলেন। নকসালবাড়ীর দু'ঘটনা সম্পর্কে তারা নীরব থেকে গেছেন এমন কি শ্রীকোড়ার প্রচেষ্টার প্রতি তাদের প্রকাশ্য সমর্থনও পাওয়া যায় নাই, নকসালবাড়ী সফরকালে।

নকসালবাড়ীর ভৌগোলিক গুরুত্ব এ-সম্পর্কে উল্লেখ্য। দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার এই থানার দূরত্ব নেপাল সীমান্ত থেকে চার মাইল, পাকিস্তান সীমান্ত থেকে চৌদ্দ মাইল, দিকিম থেকে ত্রিশ মাইল, ভুটান থেকে পঞ্চাশ মাইল ও তিব্বত থেকে আশী মাইল। পাকিস্তান সীমান্তের সঙ্গে পনের মাইল ব্যবধানের অঞ্চলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

হয়ে গেলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পূর্বভারতের, উত্তর বঙ্গ ও আসামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করবে। তাছাড়া নকশালবাড়ী এলাকায় আইন ও শৃঙ্খলা গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত করে যে কোনো হাঙ্গামাকারী দল নেপালে ও পাকিস্তানে আশ্রয় নিতে পারবে। স্বতরাং ভারতের সার্ব-ভৌমত্ব ও স্বাধীনতা নকশালবাড়ী এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বিপর্যয়ে চূড়ান্তরূপে বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

নকশালবাড়ী সমস্যাকে ভূমিসমস্যারূপে কয়েকটি দল চিহ্নিত করেছেন। মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি তাদের অন্ততম। পশ্চিম বাংলার ভূমিসমস্যা দীর্ঘদিনের এবং গুরুতর সে-সময়ে সন্দেহ নাই। এখানকার ৬ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক পরিবার এবং ৭ লক্ষ ভাগচাষী পরিবারের জীবিকার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জমির প্রয়োজন, যদি এদের সবাইকে জমি থেকেই উপার্জনের সংস্থান করতে হয়। কিন্তু গোটা পশ্চিম বাংলায় প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ একর জমি সরকারে বর্তেছে এবং তার মধ্যে সরকারের দখলে এসেছে চার লক্ষ একরের কিছু বেশী। দীর্ঘদিনের নিগীড়ন, অবিচারের বিরুদ্ধে ও জীবিকার তাগিদে জমি জবরদখল অনিবার্য হয়ে উঠলেও এই তেরলক্ষ পরিবারের জীবনধারণের উপযোগী জমির সন্ধান হবে না, যদি না কৃষি থেকে শিল্পে এদের একটি বৃহৎ অংশের জীবিকার সংস্থানের আয়োজন করা না যায়। ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও এই সমস্যার আংশিক সমাধান সম্ভব এবং এই পরিবর্তন সাধনের জন্য কৃষকদের সংগ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। নকশালবাড়ীর এই সংগ্রাম মূলত ভূমি-সমস্যা সমাধানের সংগ্রাম, না রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম, নকশালবাড়ী এলাকার আন্দোলনের প্রকৃতি-বিচারে সে-সম্পর্কে গুরুতর সংশয়ের কারণ দেখা দিয়েছে। নকশালবাড়ীর ঘটনার গুরুতর তাৎপর্য শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলার ভূমি-সমস্যার মধ্যে নিহিত রয়েছে, না এই

ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করছে পশ্চিম বাংলার আগামী দিনের রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ, আইন-শৃঙ্খলার প্রয়োগ ও পূর্বাঞ্চল ভারতের নিরাপত্তা।

নকশালবাড়ী এলাকার গুরুতর পরিস্থিতি সামলাবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ ক্যাবিনেটের ছয়জন মন্ত্রী ক্যাবিনেটের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করতে ১৩ই জুন শিলিগুড়ি ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে গিয়েছিলেন। দার্জিলিং-এর ডেপুটি কমিশনার মন্ত্রীদের কাছে অকাট্য তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে এই আন্দোলনের উৎস ভূমিহীনদের ভূমির ক্ষুধা নয়। এই অঞ্চলের ভূমিহীনদের ভূমির ক্ষুধা পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে তীব্রতর নয় ডেপুটি কমিশনারের তথ্য তা সপ্রমাণ করেছে। গত ত্রিশ বছরে শিলিগুড়ি মহকুমার জনসংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ বেড়েছে এবং কৃষি জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বেশী বৃদ্ধি পায় নাই। যারা জমি জবর দখল করেছে, যারা নানানভাবে এই আন্দোলনে উৎপীড়নমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাদের সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক বিচার করে এবং এই আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের জমির মালিকানার পরিমাণ বিচার করেই ডেপুটি কমিশনার এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই আন্দোলন ভূমির ক্ষুধা থেকে উৎসারিত হয় নাই। যে ৬৯ জন জেলে আটক আছেন, তাদের মধ্যে মাত্র ৭ জন ভূমিহীন আর সকলেরই জমি রয়েছে। তাছাড়া এই এলাকার ৯,৭০০ একর সরকারে বর্তানো জমির প্রায় ৬,১০০ একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি-ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনকারীদের দলভুক্ত যারা, যারা এদের হুকুমে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দলভুক্ত হতে সম্মতি জানাচ্ছেন, জোতদার হলেও, তিনি রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন। অন্ততঃ লুঠপাট, নির্যাতন অবাধে চলছে অল্পদের ওপর। স্থানীয় বাংলা

কংগ্রেস, সংযুক্ত সমাজবাদী দলের পক্ষ থেকে এ-সবক্ষে গুরুতর অভিযোগ ক্যাবিনেট মিশনের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে।

লাঙল যার জমি তার, এই মূলনীতিতে স্থিতি থেকে কৃষকদের সংগ্রামের অধিকার অবশ্যই রয়েছে এবং প্রয়োজনবোধে নিপীড়িতদের বিদ্রোহেরও (Right of Revolt) অনস্বীকার্য অধিকার রয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের কিছা কৃষক সংগ্রামের নামে নির্বিবেক হত্যা এবং নির্বিচারে ধ্বংসকে প্রতিরোধ করা সরকারের অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য, যেমন তার কর্তব্য আইনের পরিবর্তন সাধন করে দ্রুত ভূমি-সমস্যার সংস্কার সাধন। দরিদ্র কৃষকদের ও গ্রামবাসীদের ওপর উৎপীড়ন করে, জোতদারদের পক্ষপৃষ্ঠে আশ্রয় দিয়ে এবং তাদের শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করে দলের সার্বভৌমত্ব স্থাপনের জন্য জোর-জবরদস্তি, লুণ্ঠতরাজ, হত্যা ও সম্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে মাক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি নকসালবাড়ীতে যে গুরুতর আইন-শৃঙ্খলার সঙ্কট সৃষ্টি করেছে, অন্যায়সেই সীমান্তবর্তী ঐ অঞ্চলে এই সঙ্কট পূর্বভারতের নিরাপত্তার সঙ্কটে পরিণত হতে পারে। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের তাই এ-বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে এবং আর কালক্ষেপণ না করে নকসালবাড়ীর বিপ্লব জীবনে কঠোর হস্তে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে ভূমি সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতে হবে। নতুবা, সারা পশ্চিম বঙ্গে আইন শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি হয়ে এই রাজ্যে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ডেকে আনবে, যে অবস্থা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষণের কামনার বস্তু। পশ্চিম বঙ্গ মন্ত্রীসভার মাক্সবাদী কম্যুনিষ্ট সদস্যদের খোলাখুলি এগিয়ে আসতে হবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে। অন্যথায় তাদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহই সন্দেহ থেকে যাবে।

খাদ্যসঙ্কট

পশ্চিম বাংলার গুরুতর খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়েছে। রেশনিং

বহিষ্ঠৃত এলাকায় চাউল-গম দুস্তাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বত্রই একটা আতঙ্কের মনোভাব। এরই মধ্যে বিভিন্ন শহরে গ্রামে লুণ্ঠ-পাট শুরু হয়ে গেছে। তারই অংশে খাদ্য সঙ্কটের নামে বাড়ী বাড়ী লোক চুকে নানা রকম অত্যাচার করেছে, শতিকাের মজুদদার ধরা পড়ছে কম। এ-ছাড়া, ট্রেন থামিয়ে যাতায়াতের পথে লরী থেকে খাদ্য ও অন্যান্য জিনিষপত্র লুণ্ঠপাট হয়ে যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলায় এই সর্বব্যাপী অবনতির মধ্যে খাদ্যের যোগান শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছে, অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক করে তুলেছে।

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অবস্থা দৃষ্টে কঠোর হস্তে অরাজকতা বন্ধ করবার জন্য পুলিশকে অবশেষে নির্দেশ দিয়েছেন। পশ্চিম বাংলা সরকার মজুতদার, মুনাফাখোরদের এবং অন্যান্য সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তারের জন্য নিবারণ আটক আইন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রেশন ও রেশন বহিষ্ঠৃত এলাকায় চালের উচ্চতম মূল্য যথাক্রমে ১২০ টাকা ও ১৩৫ বৈধে দিয়েছেন এবং এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উৎরাবার জন্য নানা রাজ্য থেকে শস্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। উড়িষ্যা ১৫০০০ টন চাল দিতে রাজী হয়েছে এবং এই প্রতিশ্রুত চাল এসে পৌঁছাতে শুরু করেছে, পাক্সাব ১০০০০ টন গম দিতে সম্মত হয়েছে। অন্ধ্রও ১০০০০ টন চাল দেবার সিদ্ধান্ত করেছে, কিন্তু প্রতিশ্রুত খাদ্য পশ্চিম বাংলায় পৌঁছাতে এবং বিভিন্ন দূর্গত এলাকায় পাঠাতে সময় নেবে। পশ্চিম বঙ্গের শস্য সংগ্রহ এ-পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। রাজ্যসরকার দুইলক্ষ টন চাউল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তারমধ্যে মাত্র ৯০ হাজার টন সংগৃহীত হয়েছে—পূর্বতন কংগ্রেসী সরকারের সংগৃহীত ৪০ হাজার টন চাউলের হিসাবও এই পরিমাণের মধ্যে ধরা হয়েছে। সংগ্রহের এই বাটতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পুরোপুরি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সংগ্রহ-নীতিকে দায়ী করলেও খাদ্য সরবরাহে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিকতাও বহুলাংশে বর্তমান পরিস্থিতির



সস্ত্র দায়ী। কারণ প্রতি মাসে ৭৫, ০০০ টন গম ও ১৫,০০০ টনের চাউল সরবরাহের কেন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই। গমের সরবরাহে এ-বাং ৪২,০০০ টন ঘাটতি ও জুনমাসের চাউলের সরবরাহেও ঘাটতি রয়েছে। এ-ছাড়া এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় খরার জন্ত যে শোচনীয় দুর্গতির সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে দুর্গতদের আংশিক রেহাই দেবার জন্ত রাজ্য সরকার অতিরিক্ত ৫০,০০০ টন গমও কেন্দ্রের নিকট চেয়েছেন, আউশ ধান না-ওঠা পর্যন্ত। পশ্চিম-এশিয়ার যুদ্ধে হয়েজ বন্ধ হবার জন্ত মার্কিনী গমের সরবরাহও বিলম্বিত হয়ে গেছে।

এই গুরুতর পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্খলা ধ্বংস পড়লে অরাজকতা দেখা দেবে, যার পূর্বাভাস ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। সে-অবস্থায় খাদ্যসঙ্কট আরও ব্যাপকতা ও আরও তীব্রতা লাভ করবে এবং সাধারণ মানুষ সব চাইতে বেশী দুর্গতি ভোগ করবে। কঠোর হস্তে রাজ্য সরকারকে মজুতদার-মুনাফাখোরদের হাত থেকে গোপন পাত্ত উদ্ধার করতে হবে এবং অন্তর্দিকে কঠোর হস্তে আইন শৃঙ্খলা বজায় রেখে রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং বাইরে সংগৃহীত খাদ্য স্তূহ বন্টনের ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে সকল শক্তি দিয়ে রাজ্যসরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। এই সীমান্ত রাজ্যে খাদ্য নিয়ে বিশৃঙ্খলা অল্পকালের মধ্যেই রাজ-নৈতিক বিশৃঙ্খলার পরিণতির সম্ভাবনা আছে। সুতরাং রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের পারস্পরিক দোষারোপে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাকারীদের জন্তই ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। আশাকরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রের খাদ্যমন্ত্রী এ-কথা স্মরণ রেখে দৃঢ়ভাবে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবেন।

কেন্দ্রীয় বাজেট

অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এবার পরোক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ট্যাক্স বৃদ্ধি করে আয়-ব্যয়ে সমান বাজেট পেশ করেছেন।

এই কর বৃদ্ধির ফলে চা, কফি, সিগারেট, ছুতা, এবং কোনো কোনো শ্রুতীদ্রব্যের উপর মূল্য বৃদ্ধি হয়ে মধ্যবিত্তের জীবনে আর্থিক বোঝা বৃদ্ধি করবে। এ-ছাড়া পার্শ্বের ব্যয়, ডাক যোগে বই পত্রিকা পাঠাবার ব্যয় প্রভৃতি এবং টেলিফোনের ব্যয় বৃদ্ধি হবে। পেট্রলের ব্যয় বাড়েবে। চটের ধলির ওপর রপ্তানী শুল্ক কমানো হয়েছে অথচ হেলিয়ান ও ধলির ওপর কর বাড়ানো হয়েছে।

প্রত্যক্ষ করের নিম্নতম সীমারেখা খানিকটা ওপরের দিকে ঠেলে দিয়ে অর্থমন্ত্রী নিম্ন আয়সম্পন্নদের খুশী করতে চেয়েছেন। অমুপার্জিত আয়ের কর-রেহাই-এর সীমানাও উপরে তোলা হয়েছে, তাছাড়া বছরে ৫০০ টাকা পর্যন্ত প্রাপ্ত হুদ বা ডিভিডেন্ডকে করমুক্ত করা হয়েছে। পরোক্ষ কর বৃদ্ধিতে এবারকার ব্যালালড বাজেটে মূল্যবৃদ্ধি হবেনা বলে এই বাজেটে দাবী করা হয়েছে। কারণ, কর বৃদ্ধির ফলে দেশে এই সকল ভোগ্য দ্রব্যের ব্যবহার কমবে এবং এদের রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে। যেখানে যেখানে অতিরিক্ত মুনাফা হচ্ছিল সেই সব ক্ষেত্রে পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করার ফলে,—যেমন রেশন, সিনথেটিক তন্তু, এলুমিনিয়াম ইনগট ইত্যাদি ক্ষেত্রে ওপর আরোপিত না হয়ে অতিরিক্ত মুনাফায় টান দেবে এবং যদি বা মূল্যবৃদ্ধি হয়, তার ফল সামাজিক দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত হবে না (Socially undesirable)। কেন যে মূল্যবৃদ্ধি হবে না অর্থমন্ত্রী দেশাই-এর এই তাত্ত্বিক আলোচনা তার কোনো পথনির্দেশ করতে পারে নাই। ডিম্বালু-রেশনের পরও শোনা গিয়েছিল সংশ্লিষ্ট আমদানী দ্রব্য ছাড়া মূল্যবৃদ্ধি হবে না। কিন্তু কাজের বেলায় দেখা গেল আলু-পটলের দামও বৃদ্ধি পেলো। সুতরাং ব্যালালড বাজেটের তেজীও মূল্য বৃদ্ধি রোধে ব্যর্থ হবে একথা অব্যর্থ।

এ-ছাড়া ট্যাক্সের হার উপরের স্তরে আদৌ বৃদ্ধি পায় নাই এবং নিম্ন আয়সম্পন্নদের চোখ ধাঁধানো যেটুকু কমানো হয়েছে তার বহুগুণ পরোক্ষ কর লুটে নেবে। আর একটি

কারসাপ্তিক করা হয়েছে বাজেটে। এ-সাবৎ শতকরা ২৫ ভাগ সঞ্চয় ট্যাক্সের আওতার বাইরে ছিল। এই সীমাকে শতকরা ত্রিশ ভাগে বাড়ানো হয়েছে। মোট আয়ের শতকরা ত্রিশ ভাগ সঞ্চয় করতে হলে, কোনো উপার্জনকারীকে অনেক বিষয়ে বঞ্চনা স্বীকার করতে হয়, যা হয়তো প্রায় অবাস্তব হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং অর্থমন্ত্রী চাইছেন লোকে উপোস থেকে সঞ্চয় করুক তবেই ট্যাক্স-মুক্ত পাবে।

সুতরাং ব্যালান্সড বাজেটের চাতুরীর আড়ালে সামুলী ট্যাক্স বৃদ্ধি, নিম্ন আয়সম্পন্নদের ওপর মূল্যবৃদ্ধির চাপ বৃদ্ধি এবং উপর স্তরের আয়সম্পন্নদের রেহাই দেবার ব্যবস্থা পুরোপুরি বহাল রয়ে গেছে।

রেলের ভাড়া বৃদ্ধি

রেলের ভাড়া ও মালের মাসুল আরার বৃদ্ধি পেলে। অল্প দূরত্বের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধি পাবে দুই, তিন অথবা পাঁচ পয়সার। ৫০ কিলোমিটারের ওপর ভাড়া বৃদ্ধি হবে শতকরা ৭ ভাগ এবং ৫০০ কিলোমিটারের ওপর ৮৫ পয়সা বৃদ্ধি পাবে। মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধি পাবে শতকরা ১২ ভাগ এবং এই বৃদ্ধির উৎসীয়া হবে ৪'২০ টাকা। এছাড়া রিসার্ভেশনের ব্যয় ও প্ল্যাটফর্ম টিকিটের মূল্যও বৃদ্ধি পাবে। মাসিক টিকিটের ভাড়াও বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া মালের মাসুল বর্তমান মাসুলের আয়ের শতকরা ৩'৭ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। ভাড়া ও মাসুল বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ব্যয় ও পণ্যবোঝার মূল্য বৃদ্ধি করবে। এবং ভাড়া ও মাসুল বৃদ্ধির দরুণ মূল্য বৃদ্ধিতে পরিণামে ইনফ্লেশনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

পশ্চিম বঙ্গে মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি

পশ্চিম বঙ্গ সরকার ২৩৭,০০০ সরকারী কর্মচারীর এবং বেসরকারী—স্কুল ও কলেজের ১৯৭,০০০ শিক্ষক ও অশিক্ষক

কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করেছেন। এই ভাতা বৃদ্ধি বাবদ ১১'৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের বোঝা পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে বহন করতে হবে।

সরকারী কর্মচারীদের শতকরা ৫১ ভাগ—১২,০০০ জন—১০৯ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেন। এদের বর্তমান মহার্ঘ ভাতা হার ৩০ টাকা, ৪৮ টাকায় উন্নীত হবে এবং সমপর্যায়ের কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের চাইতে এরা মাসে ১ টাকা বেশী পাবেন। ১১০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত কর্মচারীদের সংখ্যা ৬৫,০০০ অর্থাৎ মোট কর্মচারীর শতকরা ২৭.৫ ভাগ। এদের ভাতা ৩০ টাকা বৃদ্ধি পেলেও সমপর্যায়ের কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের শতকরা ৯০ ভাগ পাবেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষকদের ভাতা যথাক্রমে ২৫, ৩৬ ও ৪০ টাকা থেকে ৪৩, ৫৮, ৭০ টাকায় বৃদ্ধি পাবে।

ক্লাশ ফোর কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধি এই শ্রেণীর কর্মচারীদের আশাভীতভাবে উৎসাহিত করলেও, অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীদের মনে ক্ষোভ রয়ে গেছে। কারণ ইতিপূর্বে পশ্চিম বঙ্গের অর্থমন্ত্রী এদের ভাতা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সমপর্যায়ভুক্ত করবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বর্তমান ভাতা বৃদ্ধি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। তবুও বলতে হবে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধি করে প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

পাকিস্তানে সামগ্রিক প্রস্তুতি

সম্প্রতি প্রতিরক্ষা খাতে সামান্য বাজেট হ্রাস করে পাকিস্তান শান্তির সদিচ্ছা প্রচারে নেমেছিল। অবশিষ্ট ভারত গভর্নমেন্ট ও গ্রায় দুই শত কোটি টাকা প্রতিরক্ষা ব্যয় কমিয়ে পাকিস্তানের এই কূটনৈতিক প্রচারের জবাব দিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের এই শান্তি প্রচারের আড়ালে সম্প্রতি একদিকে যেমন ভারত বিরোধী প্রচার ও ভারত সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ

বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি সেনাবাহিনীর শক্তি বিগুণ করবার উদ্যোগ চলেছে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পাকিস্তান ইতিমধ্যে সামলে তো নিয়েছেই তাছাড়া বিমান বাহিনীর ফাইটার এবং ফাইটার বম্বারের শক্তিও ক্ষত বৃদ্ধি করছে।

মার্কিনী সমরোপকরণের যত্নাংশ পুনরায় সরবরাহের সিদ্ধান্তের পর থেকে পাকিস্তান ভারত-পাক যুদ্ধে একেজো ট্যাক এবং বিমানগুলি মেরামত করে নিয়ে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া চীন থেকে ট্যাক পেয়েছে এবং দুইটি পদাতিক বাহিনীর উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম পেয়েছে এবং প্রায় ১২০টি মিগ বিমান এবং দুই স্কোয়াড্রন IL-28 বোমারু বিমান পেয়েছে। সামরিক সরবরাহ বজায় রাখার জন্য পাকিস্তান সিনকিয়াং-এর সঙ্গে যোগাযোগের পথ ঘাট তৈরী করেছে। অন্ত্যন্ত ক্ষুদ্রও পাকিস্তান বিমান-বিসংসী কামান, যানবাহন, প্রচুর ছোট ছোট অস্ত্র, গোলাবাক্স এবং অন্ত্যন্ত নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছে। পাকিস্তানের নৌবাহিনীরও শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনটি নূতন সাবমেরিন এই বাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে।

পাকিস্তানের সামরিক উদ্যোগের আর একটি স্বাক্ষর পাওয়া যাবে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এলাকায় সেনাবাহিনীর বিগুণ বৃদ্ধিতে। এ-ছাড়া এই এলাকাতে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে গরিলাদের এবং সেনাবাহিনীর বহির্ভূতদেরও সামরিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সীমান্ত লঙ্ঘনের সংখ্যা বৃদ্ধি থেকেও পাকিস্তানের সামরিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬৭র মার্চ পর্যন্ত ১৫০০-র বেশী ক্ষেত্রে সীমান্ত লঙ্ঘিত হয়েছে। ইছোগিল খালের পিল-বল্লগুলি আবার তৈরী করা হয়েছে। নূতন খাল কাটা হয়েছে, সামরিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে রাস্তাঘাট তৈরী করা হয়েছে এবং নানা স্থিতিশীল প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা

তৈরী করে পাকিস্তান আবার নূতন করে আক্রমণের জন্য তৈরী হয়েছে।

চীন পাকিস্তানী যোগাযোগে ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক উদ্যোগ মিজো নাগাদের সশস্ত্রীকরণের মধ্য দিয়ে আর এক নূতন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এ-ছাড়া তিব্বত-ভারত এবং তিব্বত-সিকিম সীমান্তে চীনা সামরিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। চীনারা সীমান্তে সামরিক সরঞ্জাম বৃদ্ধি করেছে, রাস্তাঘাট এবং বিমান ঘাঁটিও তৈরী করে চলেছে। হুতরাং, পাক-চীন আক্রমণাত্মক কোণেলের আর একটি অধ্যায় উদ্ঘাটনের জন্য ভারত সরকার এবং ভারতবাসীর প্রস্তুতি অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

চীনা কূটনৈতিক আচরণ

সকল প্রকার কূটনৈতিক শিষ্টাচার জলাঞ্জলি দিয়ে সম্প্রতি চীনাদের তীব্র ও হিংস্র আক্রমণাত্মক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে পিকিং ভারতীয় দূতাবাসের দ্বিতীয় সেক্রেটারী শ্রীরঘুনাথের কূটনৈতিক লাঞ্ছনা ও অকথ্য দৈনিক লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে। সম্প্রতি চীনা সরকার অকস্মাৎ পিকিং-এ এই ভারতীয় কূটনীতিককে গুপ্তচর ঘোষণা করে এবং রাষ্ট্রদোষিতার অভিযোগে তার বিচারের দাবী করে। শ্রীরঘুনাথের জীবন এই ভাবে বিপন্ন হলে পর ভারত সরকারও পালটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে নয়া দিল্লীতে অবস্থিত চীনাদূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারী চেন-এর কূটনৈতিক মর্যাদা হরণ করে তার উপর বহিষ্কারের আদেশ জারী করে। অতঃপর চীনা সরকার রঘুনাথের উপরও বহিষ্কারের আদেশ জারী করলে হংকং-এর পথে সরকারী প্রক্রয়ে চীনা রেড গার্ডদের হাতে রঘুনাথ বার বার গুরুতরভাবে লাঞ্চিত হন। রঘুনাথের উপর বর্বরোচিত এবং হিংস্র আক্রমণের প্রতিক্রিয়াস্বরূপে নয়া দিল্লীর চীনা দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং সেখানকার চীনা অধিবাসীরা

এই বিক্ষোভকারীদের উপর ভাঙ্গা ফুলদানী, ইট ইত্যাদি ছুঁড়ে মারলে, তাদের উপর পালটা আক্রমণ হয় এবং তারই প্রত্যুত্তরে পিকিং-এর চীনাধিবাসে ভারতীয় কূটনীতিকদের পরিবারবর্গকে আটক রেখে দূতাবাসের সামনে চীনা তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। ভারত সরকার তখন নিরুপায় হয়ে নতুন দিল্লীর চীনা দূতাবাসে সকল চীনা কূটনীতিকদের আবদ্ধ রাখার আদেশ জারী করেন তারপরই পিকিং-এর চৈতন্তোদয় হয় এবং পিকিং-এর ভারতীয় দূতাবাসের অবরোধ ও তার অধিবাসীদের লাঞ্ছনার আপাতত অবসান হয়। চীনাদের এই বর্বরোচিত হঠকারিতা ভাবতবর্ষের বিরুদ্ধে স্নায়ু বর্ষাইয়েরই মহড়া শুধু নয় আগামী চীনা সংঘাতের পূর্বাভাসও বটে, এ-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই।

এই খরা

ক্ষুধার অগ্নি মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন। আর এই প্রাথমিক প্রয়োজন এই অপদার্ক কংগ্রেসী সরকার বিশ বছরে মেটাতে পারেননি। বেকারের সমস্যা আজ শহরের চেয়ে গ্রামে বেশী। বছরের ৬ মাসের বেশী কখনও এদের মাঠে কাজ থাকে না এবং কাজেই বাকী ৬ মাস এরা বেকার। চাষ ভিন্ন কোনও শিল্পের ব্যবস্থা গ্রাসে হয়নি। অথচ কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের কত পরিকল্পনাই না আমরা শুনে আসছি। মুনাফাখোরের পদপালে আজ দেশ ছেঁরে আছে। গ্রামের উৎপাদক সাগাছ অর্থের বিনিময়ে এদের নিকট বে-হাত করতে বাধ্য হচ্ছে। ধান ও কৃষি উৎপাদন ছাড়াও মাছ, মুরগী, ডিম, তরকারী প্রভৃতি যাবতীয় খাদ্য দ্রব্য এরা মুনাফাখোরদের হাতে ভুলে দিতে বাধ্য হয় এবং এই মুনাফাখোরেরা চড়া দামে শহরে জোগান দিচ্ছে। শহরবাসী নিশ্চিন্তে তা ভক্ষণ করে নিদ্রা যাচ্ছেন। অল্প দিকে গ্রামবাসী তার মুখের অন্ন দিয়ে নিজে নিরন্ন থাকছেন। বছরের পর বছর অন্নান্ধা ও শোষণ

বৃদ্ধি পেয়ে আজ সমগ্র ভারতে এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

কোনো স্বাধীন দেশে বিশ্ববছর শান ও তিনটি বছর পরিকল্পনার পরেও অনাবৃষ্টি ও খরার অজুহাতে কাতারে কাতারে মানুষ নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করে একমাত্র ভারতেই তা সম্ভব। একশ বছর পূর্বে খরা বা অনাবৃষ্টি জন্মিত দুর্ভিক্ষের কথা অর্থ হোত। কিন্তু আজ এই বিশবৎকে বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতির যুগে যেখানে মরুভূমিতেও ফসল ফলানো হচ্ছে, সে সময় স্বাধীন ভারতে কোটি কোটি টাকা সেচ ও নদী উপত্যকা পরিকল্পনায় ব্যয়িত হয়েও খরা দেখা দিলে বিশ্ব ও বিক্ষোভের কারণ ঘটে। অথচ কী আশ্চর্যের সুরে শাসকগোষ্ঠী বৃষ্টি হলেই দুঃখ দূর হবে এই দৈব প্রত্যাশার বাণী দিয়ে প্রচার করে যাচ্ছেন।

এই দুর্ধোগকে কাজে লাগাতে দুটি শক্তি চেষ্টা করছেন। সরকারী পক্ষ গদিতে বহাল থাকার জন্য মানুষের দুঃখ কষ্ট নানাভাবে ছায়াচিত্রে প্রদর্শন করে দৈবের দোহাই দিয়ে দেশ-বিদেশের সহায়ভূতি কামনা করছেন, আর এক পক্ষ ক্ষুধাভাঙিত মানুষের হাহাকারে বিপ্লবের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। তারই প্রস্তুতি বা প্রকাশ কোথাও কোথাও ইতিমধ্যেই সাময়িকভাবে দেখা দিয়েছে। যারা দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণ কামনা করেন, তাদের উচিত এই দুইপক্ষ সম্পর্কে সচেতন হয়ে অবিলম্বে নিজেদের সামর্থ্য অমুযায়ী দুর্ভিক্ষ কবলিত নরনারীর সাহায্যে এগিয়ে আসা। মনে রাখতে হবে এই কোটি কোটি গ্রামবাসীই খাদ্য উৎপাদন করে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন, সর্বস্তরের মানুষেরই এদের বাঁচাবার অনিবার্য দায়িত্ব রয়েছে।

পল্লীক্ষা শুণ্ডুলের জন্য দায়ী কে ও কারা

সমাজজীবনে যখন বিস্ফোরণ দেখা দেয় তখনই তা সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু যখন সবার অলক্ষ্যে বিস্ফোরণের

কারণ জমা হতে থাকে তখন প্রায়ই তার সংস্কার মাত্র হয়না। সম্প্রতি ওরা ছুন বি. এ পার্ট ওয়ান পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। খবরে প্রকাশ 'কলকাতা এবং মফঃস্বলের কয়েকটি কলেজের ইনচার্জ এবং গার্ডদের তাড়িয়ে পরীক্ষার্থীরা নিজেরাই পরীক্ষার ভার গ্রহণ করেন।' এর আগে রসায়ন অনার্স ও অর্থনীতিতেও ছাত্ররা অভিযোগ করেছেন। ওরা ছুন বিস্কুট ছাত্ররা যে দাবিপত্র দেন তার দাবিগুলি হচ্ছে (১) পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের আবার পরীক্ষা নিতে হবে।

(২) পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রে শতকরা ২০ নম্বর এবং গণিতে শতকরা ২৫ নম্বর গ্রেস দিতে হবে।

(৩) কনট্রোলার শ্রীঅরুণ রায়ের পদত্যাগ চাই।

(৪) ভবিষ্যতে প্রশ্নপত্র সহজ করতে হবে।

কোন অস্থ বুদ্ধি ব্যক্তি শ্রমিক ও ছাত্রকে সমপার্থ্যনত্ব করবেন না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রের সম্পর্ক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও শ্রমিকের সম্পর্কের সাথে তুলনীয় নয়। অতরাং আমরা শিক্ষার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোন ভাবেই ছাত্রদের হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী নই। কিন্তু বারবার প্রশ্ন পত্র নিয়ে ছাত্রদের অসন্তোষের কারণ অনুগদানও প্রয়োজন। সাময়িক

উদ্বেজনা অথবা কতিপয় ছাত্রের উপর দোষারোপ করে এই ঘটনাকে লঘু করা কিছুতেই যাবে না। সচেতন ছাত্র, দরদী শিক্ষক ও দায়িত্ববান অভিভাবক ও অস্থ জনমত এই ব্যাধির মূল উদ্বাটনে আস্ত সংস্কার সম্বন্ধে চিন্তিত বিচলিত। বিশ্ববিদ্যালয়কে স্পষ্ট জবাব দিতে হবে—এই সব পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত কিনা? যদি হয়ে থাকে তার জন্ত কে দায়ী এবং তাদের বিশ্ববিদ্যালয় কি শাস্তি দিয়েছেন? কলেজের পাঠ্য তালিকা শেষ করা হয় কিনা?

আমরা জানি কলকাতার অধিকাংশ কলেজে পাঠ্য-তালিকা শেষ হয় না, অধ্যাপক ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সে দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র রচয়িতা নির্বাচনে এবং এই ধরনের প্রশ্নপত্র রচনার একটি ব্যাপক চক্রান্ত রয়েছে বলে শোনা যায়। এই সকল অভিযোগ সম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত এবং এর মূলোচ্ছেদ হয়ে, শিক্ষাক্ষেত্রে এই অরাজকতা অবিলম্বে দূর না হলে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই স্বসে পড়বে। বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র থাকতে এ সম্পর্কে সচেতন না হলে কেবলমাত্র ছাত্রদের উচ্ছ্বাসভার উপর সব অনর্থ চাপিয়ে দিয়ে পায় পাবেন না।

সুভাষচন্দ্র

কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ

পবিত্রকুমার বোস

অমৃত বাজার পত্রিকার ১৯২১ সালের ২৯শে জুলাই সংখ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয় :

Mr. Subhash Chandra Bose, son of Rai Bahadur Janaki Nath Bose who was successful at the last I. C. S. examination but does not intend taking any Government service is now at Outback. He has not yet decided upon his future career.

এই সংক্ষিপ্ত সংবাদটি প্রকাশের উদ্দেশ্য কী তা বোঝা যায় না। আই. সি. এস পাশ করেছেন অথচ সরকারী চাকরি নেননি—গোটা আই, সি, এস. পরীক্ষার্থীদের ইতিহাসে এই ঘটনা তখন পর্যন্ত আর ঘটেনি। সেই কারণেই কি এই সংবাদের প্রকাশ? কিন্তু তাহলে অমৃত-বাজার পত্রিকাটি সে সংবাদটি ছাপাতে পারতেন যে মাসে, যখন সুভাষচন্দ্র বিলাতে থাকাকালেই তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন। তখন অমৃত বাজার এ বিষয়ে নীরবতা দেখিয়েছেন। কিন্তু জুলাই মাসের শেষে সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে কটকে বেড়াতে গিয়েছেন এটা একটা প্রচারযোগ্য সংবাদের মর্যাদা পেলে কেন? সে কি তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে উঠতে পারেননি এইটি লোককে জানানোর তাগিদে?

১৯২১ সালের জুলাই মাসের শেষেও সুভাষ তাঁর কর্মপন্থা

জ্যেষ্ঠ ২

স্থির করতে পারেননি এটি সত্যভাষণ ছিল না। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য কলকাতার ছাত্রাবস্থাতেই কী করে নির্ণীত হয়ে গিয়েছিল ইতিপূর্বেই আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। লণ্ডনে আই, সি, এস পরীক্ষার জট পড়াশোনার কালে দেশসেবার জন্ত নিজেকে তিনি কত কঠোরভাবে প্রস্তুত করেছিলেন তাঁর কিছু বিবরণ তাঁর সমসাময়িকদের সাক্ষ্যে, যেমন দিলীপ কুমার রায়ের রচনায় পাওয়া যায়। ইংলণ্ড হতে দেশে ফিরে তিনি কী করতে চান সে বিষয়ে লেখানে থাকতেই তিনি মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন। শুধু তাঁর জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যই যে তখন নির্ণীত হয়েছিল তা নয়, দেশে ফিরে রাজনৈতিক কর্মের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে কোন কর্মপন্থা তিনি অনুসরণ করবেন তাও তিনি স্থির করেছিলেন। কোন আন্দোলনে তিনি যোগ দেবেন? কার নেতৃত্বে ও কাদের সঙ্গে তিনি কাজ করবেন? এবং কোন অনির্দিষ্ট কাজটাই বা তিনি করবেন? এই সমস্ত প্রশ্নই গভীরভাবে বিবেচনা করে তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করেছিলেন এবং দেশে ফেরার পর তদনুসারেই কর্মক্ষেত্রে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। ইংলণ্ড থাকাকালে তাঁর দেশভাবনার কিছু পরিচয় এই পত্রাংশগুলিতে পাওয়া যাবে, যথা :

১। “এখানে এসে এবং এখানকার লোকজন ও কার্য-প্রণালী দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের দেশে দুইটা

জিনিস খুব বেশি রকমভাবে চাই—(১) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার (২) Labour Movement.

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে ভারতের উন্নতি চাষা, ধোপা, মুচী, যেকরের দ্বারা হইবে? কথাগুলি বড় ঠিক। পাশ্চাত্য জগৎ দেখাইয়াছে “power of the people” কি করিতে পারে। তার উজ্জতর দৃষ্টান্ত হচ্ছে—The first socialist republic in the world অর্থাৎ Russia। ভারতের উন্নতি যদি কোনদিন হয়—সেটা আসবে ঐ “power of the people”-এর ভিতর দিয়া।

আধুনিক জগতে যে সব দেশ উন্নত হইয়াছে সে সব দেশে ঐ power of the people-এর জাগরণ হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ “বর্তমান ভারতে” বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের আধিপত্যের দিন গেছে। পাশ্চাত্য জগতের বৈশ্য বর্ণ হচ্ছে—Capitalists and Industrialists, তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। Labour party হচ্ছে ভারতের শূদ্র বা অস্পৃশ্য জাতি। এরা এতদিন ধরে শুধু কষ্ট করে এসেছে। তাদের শক্তি এবং তাদের ত্যাগের দ্বারা ভারতের উন্নতি হইবে। সেইজন্য আমাদের এখন চাই Mass education and Labour Organisation. “(পত্রাবলী, পৃ: ১০৬—চাকরচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লেখা পত্র)

স্বভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা তাঁর তেইশ বছর বয়সের নবীন যৌবনকালে কোন ঋতে বহিঁছিল তা উপরোক্ত পত্র হতে অনুসরণ করা অসম্ভব নয়। রাশিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে গোড়া হতেই তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ ও সচেতনতা। বস্তুত ১৯২০ সালে—এই চিঠিটি লেখার সময়—রাশিয়ার বিপ্লবী সরকার গঠনাত্মক কর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বয়কর কিছুই করেনি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাদি তখনো বহু দূরে। কিন্তু জনশক্তির জাগরণের একটা দৃষ্টান্ত রূপে রুশ বিপ্লব তখনই স্বভাষচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছে—যদিও ওই প্রায় একই সময় রাশিয়া ভ্রমণ করে এসে

বার্ট্রাও রাসেলের মতো মনীষী রুশ কমিউনিজমের তীব্র নিন্দা করে পুস্তক লিখেছিলেন (১৯২১)।

মুজাফর আমেদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে স্বভাষচন্দ্র শ্রমজীবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন;—তাঁর রাজনৈতিক প্রগতিশীলতা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার চিন্তার ওপাশে যায়নি, শ্রীযুক্ত আগেনের অভিযোগের তাৎপর্য হচ্ছে এই। এই প্রসঙ্গটি যথাস্থানে ক্রমে আমরা বিচার করতে পারব। কিন্তু এখানে এটুকু শুধু উল্লেখ্য যে স্বভাষ ছাত্র-জীবনে বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, স্বাধীনতা ও বিপ্লবের সমস্যা নিয়ে গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়ন ও চিন্তার পর কয়েকটি বিশেষ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেন এবং পরবর্তী জীবনে সেই সিদ্ধান্তগুলিকে বাস্তবে রূপ দিতেই তাঁর সমস্ত সময় ও শক্তি ব্যয়িত হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তগুলির একটির পরিচয় পূর্বাঙ্কত পত্রাংশে আছে। দেশের সকল শক্তির উৎস যে শ্রমজীবী জনগণ এবং দেশের কল্যাণ বলতে মূল্যবত তাঁদেরই কল্যাণ বোঝায়—স্বভাষ একথা সর্বাঙ্গতঃ করণে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাঁর জীবনের শুরুতেই, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশেরও আগে। রাজনৈতিক জীবনে দেশের কোন্ শক্তির সঙ্গে তিনি চলবেন এবং কাঁদেরই বা স্বার্থে, তা তিনি স্থির করেছিলেন এমন একটা সময়ে যখন ভারতের আধুনিক শ্রমিকহিতৈষীর দল ভূমিষ্ট হয়নি। এবং সম্ভবতঃ ভারতের আর কোন উল্লেখযোগ্য নেতাই—জহরলাল সহ—জনগণের ভূমিকা সম্পর্কে তখনো স্বভাষের মতো স্পষ্ট ও ব্যর্থহীন চিন্তার পরিচয় দেননি।

২। “কিন্তু চাকুরিকেই কি আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? চাকুরিতে সাংসারিক সুখ পাওয়া যাইবে, কিন্তু সেটা কি আমাদের মূল্য দিয়াই ক্রয় করিব? আমার মনে হয় আই, সি, এস, গোষ্ঠীর কোন লোককে চাকুরির আইন কানুনকে যেভাবে মাথা নিচু করিয়া মানিয়া লইতে হয় তাহার সঙ্গে জীবনের উচ্চ আদর্শকে

মানাইয়া লইবার চেষ্টা ভাঙামি ভিন্ন কিছু নয়।.....আমার মত মনোবৃত্তির লোক যে চিরকাল “উদ্ভট” জিনিসেরই পূজা করিয়া আসিয়াছে তাহার পক্ষে প্রোতে গা ভাসাইয়া নিশ্চিন্ত হওয়াটাই শ্রেষ্ঠ পথ নহে। সংগ্রাম ভিন্ন, বিপদ ভিন্ন জীবনের স্বাদই অনেকখানি অন্তর্হিত হইয়া যায়। বাহার অন্তরের মধ্যে সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দংশন নাই তাহার নিকট জীবনের সংশয়, বিপদ ততটা ভয়াবহ নহে। উপরন্তু, একথা ঠিক যে সিভিল সার্ভিসের শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া দেশের সত্যকারের কাজ করা চলেনা। এক কথায় সিভিল সার্ভিসের আইনকানূনের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে জাতীয় ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে মেলানো চলেনা।” (পৃঃ ১০৮, আই, সি, এস পাতের পর শরৎচন্দ্র বহুকে লেখা ইংরাজি পত্রের বঙ্গানুবাদ)।

এই পত্র সম্পর্কে মন্তব্য নিম্নয়োজন। স্তম্ভচন্দ্র আই, সি, এস ত্যাগ করিলেন কোনো ভাবাবেগবশত নয়, বহুদিনের চিন্তার পর জীবনের যে কর্তব্যপথ তিনি স্থির করেছিলেন একনিষ্ঠভাবে সেই পথ অমূল্যরূপে করার তাগিদে। তাঁর একটা নিজস্ব জীবন-দর্শন ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছিল—তারও জন্ম গভীর অধ্যয়ন, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার পর্ব পার হয়ে আসতে হয়েছে তাঁকে—এবং সেই জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্ণয় করেছিলেন। কোনো হঠকারী বা আকস্মিক সিদ্ধান্ত আই, সি, এস ত্যাগের পিছনে ছিল না, বস্তুতঃ আই, সি, এস পরীক্ষা দিতে তিনি লগুন গিয়েছিলেন পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি পাবার উদ্দেশ্যে নয়, ইংরেজ জাতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে এবং দেশ-সেবার জন্ত নিজেকে সর্বতোভাবে ষোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে। স্তম্ভচন্দ্র আই, সি, এস ত্যাগের পর দেশে ফিরে আসার পরও তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করতে পারেননি একথা স্পষ্ট।

৩। “যদি চিত্তরঞ্জন দাশ এই বয়সে সংসারের সবকিছু

ছাড়িয়া জীবনের অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে পারেন তবে আমার সাংসারিক সমস্তাবিহীন তরুণ জীবনে এ ক্ষমতা আরও অধিক। চাকুরি ছাড়িলেও আমার কাজের বিন্দুমাত্র অভাব ঘটবে না। শিক্ষকতা, সমাজ-সেবা, সমবায় প্রতিষ্ঠানাদি, সাংবাদিকতা, গ্রাম-সংগঠন ইত্যাদি বহু কাজ রহিয়াছে—যাহাতে সহস্র সহস্র কর্মঠ তরুণকে ব্যাপৃত রাখিতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বর্তমানে শিক্ষকতা এবং সাংবাদিকতার দিকেই আকৃষ্ট হইতেছি। জ্ঞানানাল কলেজ এবং নূতন সংবাদপত্র “স্বরাজ্য” লইয়াই আমি এখন কিছুদিন কাটাইতে পারিব। আত্মত্যাগের আদর্শ লইয়াই জীবন আরম্ভ করিতে চাই, আমার কল্লনায় ও প্রবণতার অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চচিন্তা এবং দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত জীবনের আকর্ষণ প্রবল।.....অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার নিকট মহৎ, নিঃস্বার্থ অমুপ্রেরণার পথ, যদিও সে পথ রমেশ দত্তের পথ অপেক্ষা কণ্টকাকীর্ণ।” (পৃঃ ১১২, শরৎচন্দ্র বহুকে লিখিত পত্র)

নিম্নোক্ত পত্রাংশ সম্ভবত আরও গুরুত্বপূর্ণ:

৪। “এখন কাজের কথা বলি। সরকারী চাকুরী করিবার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই।.....আমাকে দেখাইতে হইবে আমি চাকুরী ছাড়িবার পর কি tangible কাজ করিতে চাই।.....এখন আমাদের দেশে কোন্ কোন্ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিবার সুবিধা আছে তাহা এখন থেকে বুঝিতে পারিতেছি না। তবে আমার মনে হইতেছে যে, দেশে ফিরিলে আমি কলেজে অধ্যাপনা এবং পত্রিকায় লেখা—এই দুই কাজে হাত দিতে পারিব। আমার ইচ্ছা—clear out plans লইয়া চাকুরী ছাড়িতে। তাহা করিতে পারিলে চাকুরী ছাড়ার পর আমাকে চিন্তায় সময় ব্যয় করিতে হইবে না এবং আমি চাকুরী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নামিতে পারিব।

আপনি আজ বাংলা দেশে স্বদেশ সেবা যজ্ঞের প্রদান

ঋদ্ধিক—তাই আপনার নিকট এই পত্র লিগিতেছি।.....
আমি আজ প্রস্তুত...আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন।...
আমার নিজের মনে হয় যে, আপনি যদি “স্বরাজ” পত্রিকা
ইংরাজীতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে আমি সেই পত্রিকার
sub-editorial staff এ কাজ করিতে পারি। তা ছাড়া
“জাতীয় কলেজের” নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে পারি।

কংগ্রেসের বিষয়ে আমার মনে অনেক প্রস্তাব আছে।
আমার মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী আড্ডা চাই।
তার জন্ত একটা বাড়ী করা চাই। সেখানে একদল research
student থাকিবেন—যাহারা আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন
সমস্যা লইয়া গবেষণা করিবেন। আমি, যতদূর জানি
Indian Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের
কংগ্রেসের কোনও definite policy নাই। তারপর
Native States দের প্রতি কংগ্রেসের কিরূপ attitude
হওয়া উচিত তাহা বোধ হয় স্থির করা হয় নাই।
Franchise (for men and women) সম্বন্ধে কংগ্রেসের
কি রকম মত তাহাও বোধ হয় জানা নাই। তাবপর
depressed classes দের লইয়া আমাদের কি করা উচিত
তাহা বোধ হয় কংগ্রেস ঠিক করে নাই। এই বিষয়ে
(অর্থাৎ depressed classes সম্বন্ধে) কোন কাজ না করার
দৃষ্ণ যাত্রায়ে আজ সব Non-Brahmin এরা Pro-
Government এবং anti nationalist হইয়াছে।

আমার নিজের মনে হয় যে Congress এর একটা
permanent staff রাখা দরকার। ইহার এক একটা
সমস্যা (problem) লইয়া গবেষণা করিবে। প্রত্যেক নিজ
নিজ বিষয়ে up-to-date facts and figures সংগ্রহ
করিবে। এই সব facts and figures সংগ্রহীত হইলে
Congress Committee প্রত্যেক বিষয়ে (problem এ)
একটা policy formulate করিবে। আজ অনেক জাতীয়
problem সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোন definite policy নাই।

আমার এই জন্ত মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী বাড়ী
চাই এবং স্থায়ী staff of research students চাই।

তা ছাড়া Congress-এর একটা Intelligence
Department খোলা দরকার। Intelligence Depart-
ment-এ দেশের সম্বন্ধে up-to-date সব খবর facts
and figures যাহাতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্যবস্থা
করিতে হইবে। Propaganda Department থেকে
প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় ছোট ছোট পুস্তক প্রকাশিত
হইবে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা
হইবে। এতদ্ব্যতীত জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা
লইয়া Propaganda Department থেকে এক একটি বই
প্রকাশিত হইবে। সেই পুস্তকে কংগ্রেসের policy বুঝান
যাইবে এবং কি কি কারণের নিমিত্ত কংগ্রেসের এইরূপ
policy হইয়াছে তাহাও লেখা থাকিবে।...আমার মনে
হইতেছে যে কংগ্রেস সংক্রান্ত বিপুল কাজ আমাদের সম্মুখে
পড়িয়া আছে। আপনারা ইচ্ছা করিলে আমি এ বিষয়েও
বোধ হয় কিছু করিতে পারিব। (পৃঃ ১১৫-১১৯, কেবলু জ
হতে ১৯২১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে
লিখিত পত্র)

অভ্যাসচক্র চাকরি ত্যাগ করেছিলেন একটা অনির্দিষ্ট
অস্পষ্ট উদ্দেশ্যের কথা ভেবে নয়, একটা অনির্দিষ্ট কর্মপন্থা
স্থির করে নিয়ে, তারপর, তিনি একথাও বুঝেছিলেন যে সেই
কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হলে দেশবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ
করা আবশ্যিক। এই নির্বাচন যে তাঁর ভুল হয়নি পরবর্তী-
কালে দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কই তার প্রমাণ।
এবং পক্ষান্তরে, দেশবন্ধুও অভ্যাস-রচিত প্রোগ্রামের সারবস্তা
স্বীকার করে দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জাতীয়
কলেজের অধ্যক্ষ, স্বপ্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের প্রধান চালক
এবং কংগ্রেস প্রোগাণ্ডা-বিভাগের সেক্রেটারি রূপে নিযুক্ত
করেন।

যদিও 'পত্রাবলী' গ্রন্থে এই পত্রগুলি সংকলিত হয়েছে এবং উৎসাহী পাঠক শেঙলি পাঠ করে নিতে পারবেন তবু খানিকটা বিত্বতভাবেই পত্রগুলি হতে উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন এই কারণে যে আজও একটা ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে এবং কোনো কোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল ও পক্ষ থেকে এই ধারণা প্রচার করা হয়ে থাকে যে স্বাধীন বর ভাবাবেগ ছিল প্রবল, স্বচ্ছ দৃষ্টি বা বাস্তব কর্মপন্থা কিছু ছিল না। অন্তিমের গাতি যে কতখানি মিথ্যা তার প্রমাণ উদ্ধৃত পত্রাংশগুলি হতে মিলবে আশা করি। বস্তুত ভারতীয় রাজনীতিতে এমন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও দূরপ্রসারী স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে আর কোনো নেতা প্রবেশ করেননি,—একমাত্র গান্ধীজীর একটা কর্মপন্থা ছিল, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে গান্ধীজী যখন ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ হয়ে গেছে—দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর কর্মপন্থা গড়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষে আসার পূর্বেই স্বভাষচন্দ্রের মনোভাব ও চিন্তার বৈশিষ্ট্য পরিষ্কৃত করার উদ্দেশ্যে তাঁর সেসময়ে লিখিত আর দুই একটি পত্র হতে উদ্ধৃতি দেব।

৬। “এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয় হইয়াছি যে জনসাধারণের মধ্যে থাকিয়াই আমি দেশের অধিক মঙ্গল সাধন করিতে পারিব, আমলাতন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নহে। চাকুরিতে থাকিয়া দেশের কোন উপকার করা যায় না ইহা আমার বক্তব্য নহে। আমি বলিতে চাহি যে তাহাতে যেটুকু মঙ্গল হইতে পারে আমলাতন্ত্রের শৃঙ্খলমুক্ত দেশ সেবার তুলনায় তাহা অতি নগণ্য।...সাংসারিক উন্নতির পথ একেবারে পরিত্যাগ করিলেই তবেই জাতীয় কর্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করা সম্ভব।” (পৃঃ ১২১, শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ)

৬। “সার্ভিসে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে আমার প্রধানতম যুক্তির ভিত্তি এই ছিল যে প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিয়া আমাকে এমন এক বৈদেশিক আমলাতন্ত্রের বশতা স্বীকার করিতে হইবে যাহার এদেশে থাকিবার নৈতিক অধিকার আমি বিন্দুমাত্র স্বীকার করি না। একবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলে আমি তিন বৎসর অথবা, তিন দিন কাজ করি তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি বুঝিয়াছি যে, আপোষ হীন স্বস্তি—ইহাতে মানুষের অধঃপতন এবং আদর্শের হানি হয়।...স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে জীবনান্তে সরকারী উপাধির মুকুট পরিয়া মন্ত্রীদ্বয়ের গদিতে আতীন হইতেছেন তাহার কারণ তিনি এডমণ্ড বার্ক বর্ণিত সুবিধাবাদের দর্শনে বিশ্বাসী। সুবিধাবাদীর নীতি গ্রহণ করিবার মত অবস্থা আমাদের এখনও আসে নাই। আমাদের এক জাতি গঠন করিতে হইবে এবং হাম্পডেন ও ক্রমওয়েলের আপোষহীন আদর্শবাদ ভিন্ন তাহা সম্ভব নহে।...আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে ব্রিটিশ সরকারের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করিবার সময় আজ উপস্থিত। প্রতি সরকারী কর্মচারী,—সে তুচ্ছ চাপরাশী অথবা প্রাদেশিক গভর্নরই হউক,—নিজের কাজের দ্বারা ভারতবর্ষে কেবল ব্রিটিশ সরকারের বুনয়াদকে পাকা করিতেছে। সরকারের অবসান করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাহার নিকট হইতে সরিয়া আসা।...আমার পত্রের উত্তরে চিন্তারঞ্জন দাশ মহাশয় সম্প্রতি দেশে যে কাজ চলিতেছে তাহার বিষয়ে লিখিয়াছেন। বর্তমানে আন্তরিকতাপূর্ণ কর্মীদের অভাব সত্ত্বেও তিনি অভিযোগ করিয়াছেন। সুতরাং দেশে ফিরিবার পর অনেক প্রীতিপ্রদ কাজ আমি পাইব।...আর কিছু আমার বলিবার নাই। ফিরিবার সব পথ রুদ্ধ করিয়া আমি বাঁপ দিলাম,—আশা করি ইহার ফল শুভই হইবে। (পৃঃ ১৩১, শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত ইংরেজি পত্রের বঙ্গানুবাদ)

এই পত্রটির উদ্ধৃত অংশের কয়েকটি দিক বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। ১৯২১ সালের ২৮শে এপ্রিল তারিখে কেম্ব্রিজ হতে লেখা এই পত্রে স্বভাষচন্দ্রের যে ভাবনার্ঠবশিষ্টের পরিচয় মেলে, পন্নিগত বয়সের রাষ্ট্রনেতা নেতাজী স্বভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা হতে কোন পার্থক্যই নেই। এই একই দৃষ্টিভঙ্গি হতে সারা জীবনের কর্তব্যাকর্তব্য তিনি বিচার করেছেন। “আপোষ হীন বস্ত্র—ইহাতে মানুষের এবং আদর্শের হানি হয়”—ভারতবাসীরা কাছে এইটাই ছিল তাঁর চিরকালের প্রধান বক্তব্য এবং এই বক্তব্য ১৯৩৮-৩৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সমক্ষে রাখতে যেয়েই তিনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সমবেত বিরোধিতার সম্মুখীন হন। প্রাদেশিক মন্ত্রী গ্রহণ সম্পর্কে তাঁর মতামতের ভিত্তি ছিল এই আপোষ-হীন আদর্শসাধনার প্রস্তাব আর সেটাই হয়ে দাঁড়ায় সেসময়কার ভারতীয় রাজনীতির সর্বপ্রধান অন্তঃসংঘাতের কারণ। স্বভাষের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি যে তাঁর জীবনের কৈশোর-যৌবনের সঙ্গিকালেই গঠিত হয়ে গিয়েছিল এটা তারই অন্ততম প্রমাণ। চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে এসে তিনি ভবিষ্যৎ কর্তব্য স্থির করতে পারেননি একথাও যে সর্বৈব মিথ্যা তা উদ্ধৃত পত্রের শেষ কয়েকটি লাইন হতেই বোঝা যায়। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বদেশ সেবার কাজে যোগদান করা স্থির করে স্বভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে কেম্ব্রিজ হতে লুথানি পত্র লেখেন—১৯২১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি এবং ঐ সালেরই ২রা মার্চ তারিখে। এই পত্র লুথানি লেখার সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল এত নিবিড় যে তার উভয় পত্রই তিনি লিখেছিলেন বাংলায়—বাঙালীজনোচিত সম্বোধন সহ। প্রথম পত্রটির অংশবিশেষ আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। দ্বিতীয় পত্রটিতে ছিল পাঁচ দফা কর্মপন্থার কথা, যা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি পালন করতে পারেন। দেশবন্ধু তাঁর সেই পত্র ও প্রস্তাব এত আন্তরিকভাবে অনুমোদন করেছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে অপরিচিত প্রবাসী ছাত্রটিকে তা

জানিয়ে দিতে তিনি ভোলেননি। পরমারফৎ স্বভাষ ও দেশবন্ধু একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যায়, সে যোগাযোগ শুধু ভাবের ক্ষেত্রে নয় কর্মক্ষেত্রেও অচিরে ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল এবং কাল তাকে দিয়েছে অক্ষয়স্থের মর্যাদা। স্বভাষ দেশে ফিরে এসে কটকে অবসর বিনোদন করছেন কেন না ইতিকর্তব্য স্থির করে উঠতে পারেননি—অমৃতবাজার পত্রিকা পরিবেশিত এই সংবাদের সঙ্গে এই তথ্যটির কি কোনো সামঞ্জস্য হয় যে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সের এক যুবক বিলাত থেকে দেশবন্ধুর মতো সম্মানিত প্রবীণ, সর্বজনমান্য নেতাকেও পরামর্শ দিচ্ছেন: “স্বরাজের ভিত্তির উপর আমাদের ভারতের Constitution তৈয়ারী করিতে হইবে। আপনি অবশ্য বলিতে পারেন যে congress এ’ন existing order ভাঙিতে ব্যস্ত হুতরাং ভাঙার কার্য সম্পূর্ণ না হইলে; constructive কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব, কিন্তু আমার মনে হয় যে, এখন থেকেই ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে নুতন করিয়া স্থাপি আরম্ভ করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের যে-কোন সমস্যা সম্বন্ধে একটা policy ঠিক করিতে গেলে অনেক দিনের চিন্তা এবং গবেষণা চাই। হুতরাং এখন থেকেই গবেষণা আরম্ভ করা দরকার। কংগ্রেস যদি complete programme প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে যেদিন আমরা ‘স্বরাজ’ পাইব সেইদিন কোন বিষয়ে কোন policyর জন্ম আমাদের ভাবিতে হইবে না। (পৃ: ১২৩-২৪, দেশবন্ধুর নিকট দ্বিতীয় পত্র)

এই যার চিন্তার আদল সেই ব্যক্তি কর্তব্য বিষয়ে মনঃস্থির না করেই চাকরি ত্যাগ করে দেশে ফিরে এসে কটকে চুপচাপ বসে রইলেন একথা শিষ্টাশ্র হতে পারেনা। কিন্তু অমৃত বাজার পত্রিকার সংবাদে আর একটি সত্য লুকিয়ে আছে—স্বভাষ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটনের পক্ষে সেবিষয়টির গুরুত্ব আছে।

স্বভাষচন্দ্র নিজের জীবনের এই পর্বের কথা সংক্ষেপে

উল্লেখ করেছেন তার Indian Struggle গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন : “১৯২০ সালে ইংলণ্ডে আমি ভারতীয় সিভিল সাভিস পরীক্ষায় পাশ করি, কিন্তু একই সঙ্গে উভয় প্রভুকে—ব্রিটিশ সরকার ও আমার স্বদেশকে—সেবা করা অসম্ভব দেখে ১৯২১ সালের মে মাসে আমি পদত্যাগ করি এবং ক্ষুণ্ণ ভারতে ফিরে আসি, সে সময়কার পূর্ণবেগে পরিচালিত জাতীয় সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে। ১৬ই জুলাই তারিখে আমি বোম্বাই পৌঁছাই এবং ঐদিন বিকাশেই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করি। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভের মূলে আমার উদ্দেশ্য ছিল, যে আন্দোলনে আমি যোগ দিতে বাচ্ছি সেই আন্দোলনের নেতার নিকট হতে তাঁর কর্মপন্থা সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে বিপ্লবী নেতারা যে সকল পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করেছেন সে সম্পর্কে বিগত কয়েক বছর যাবত আমি অধ্যয়ন করেছি এবং সেই জ্ঞানের আলোয় আমি মহাত্মার মন ও উদ্দেশ্য বুঝতে চাইছিলাম।” (পৃ: ৭৯-৮০, খ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম ভারতীয় সংস্করণ।)

গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনায় হুতাশ তৃপ্ত হননি, কেননা স্বাধীনতা লাভের জন্ত গণ আন্দোলনের পর্যায়ক্রম, পদ্ধতি ও সংগ্রামের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর সরাসরি প্রশ্নের সন্তুস্তর গান্ধীজী দিতে পারেননি। আলোচনাস্তে হুতাশের ধারণা হল : there was a deplorable lack of clarity in the plan which the Mahatma had formulated and that he himself did not have a clear idea of the successive stages of the campaign which would bring India to her cherished goal of freedom. ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বাঙ্গগণ্য নেতার সংগ্রাম পরিচালনা ব্যাপারে স্বচ্ছ ও হৃস্পষ্ট ধারণার অভাব

চব্বিশ বছরের যুবক হুতাশকে ব্যথিত, অবসন্ন ও হতাশ করে দিল। তখন তাঁর একমাত্র আশার স্থল রইলেন দেশবন্ধু। প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে কলকাতার পথে রওনা হলেন। তাঁর নিজের কথায় : “On reaching Calcutta, I went straight to the house of Deshabandhu Das.” প্রথমবার দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি, কেননা দেশবন্ধু তখন ছিলেন কলকাতার বাইরে। কয়েকদিন পর দেশবন্ধু কলকাতায় ফিরেছেন সংবাদ পেয়ে হুতাশ আবার গেলেন দেখা করতে। দেখা হল। হুতাশের নিজের বর্ণনায়, “আমাদের কথোপকথন কালে আমি অনুভব করতে আরম্ভ করলাম যে এই একজন পুরুষ জিনি জানেন তিনি কী চান—যিনি নিজের যথাসর্বস্ব দান করতে পারেন এবং অন্যদের নিকট হতেও ভাণ্ডের যা দেয় তা দাবী করতে পারেন—তারূপকে যিনি অপরাধ মনে করেন না বরং শুশ্ৰূষা বলে মনে করেন। আমাদের কথোপকথন শেষ হবার আগেই আমার মন আমি স্থির করে ফেলি। আমি অনুভব করলাম যে আমি একজন যথার্থ নেতার সাক্ষাৎ লাভ করেছি এবং আমি তাঁকে অনুসরণ করা স্থির করলাম।” (পৃ: ৮৩)

এই বর্ণনার পরেই একটি বাক্য হুতাশ লিখেছেন— ধীরে স্থির ভাবে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করতে কয়েকদিন সময় নিয়েছিলেন তিনি। (On settling down in Calcutta I proceeded to take stock of the situation in the country and particularly in the province of Bengal—p. 88)। এই সময়েই কটকে অল্পদিনের জন্ত তিনি গিয়েছিলেন। অমৃত বাজার পত্রিকার সংবাদের বয়ানে ভ্রান্তি ছিল কিন্তু, আন্দোলনে যোগ দেবার পূর্বক্ষেণে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচার ও বিশ্লেষণে হুতাশ যে নিমগ্ন হয়েছিলেন কিছু কালের জন্ত—সংবাদের অন্তর্নিহিত এই ইঙ্গিতটি মিথ্যা নয়।

জাতীয় সংগ্রামে হুতাশচক্রের সর্বস্বপণ করে যোগ

দেশের পূর্ব কাহিনী হচ্ছে এই। তারপর থেকে তাঁর ব্যক্তি জীবনের কাহিনী এবং আমাদের জাতীয় জীবনের কাহিনী একসঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে—তাঁর জীবন এদেশের ইতিহাসেরই একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছে। দেশের ইতিহাসের অন্তর্নিহিত দাবী তাঁর ভাবনা ও কর্মের রূপবৈশিষ্ট্যের কারণ, হয়েছে, আবার তিনি তাঁর ভাবনা ও কর্মের দ্বারা দেশের ইতিহাসকে গঠিত করেছেন। ঐতিহাসিক বোনো কালের ইতিহাস রচনার কাজে যেভাবে উপাদান সংগ্রহ, বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন—স্বভাষচন্দ্রের জীবনীলেখককেও অতঃপর সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তাই। সমকালীন সমস্ত তথ্য, প্রশ্ন, সাক্ষ্য ও দলিলই হবে তাই স্বভাষ-জীবনী রচনার প্রধান উপাদান—এবং স্বভাষের জীবনকথা হবে এ যুগের নতুন মহাভারতের কথা। অথচ ইতিহাসবোধ ভিন্ন সে জীবনপ্রসঙ্গ অনুসরণ করা সম্ভব নয়। স্বভাষজীবন কাব্যের রসাস্বাদনের প্রাকশর্ত তাই বর্ণনাকার ও পাঠকের সমভাবে সেই ইতিহাসবোধের শরিক হওয়া।

(ক্রমশঃ)

অনিম্ন নান্দেন

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩.৫০ টাকা।

“...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বগ্রাসী। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাত্ত।”
... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১.২৫

“...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া ‘নান্ত পন্থা বিজ্ঞতে অয়নায়।’ (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে
এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়ন্তী—৩১২, গাছুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট

হুনীল দাস

পশ্চিম এশিয়াতে বিগত কুড়ি বছরের মধ্যে তিনবার আরব-ইসরায়েল সংঘাত ঘটে গেলো। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলী রাষ্ট্র গঠিত হবার পরই প্রথম সংঘাত দেখা দেয়। ১৯৫৬ সালে সূয়েজ-যুদ্ধের সময় দ্বিতীয়বার এবং এবার তৃতীয়বার। মাত্র চারদিনের যুদ্ধে এবার আরব সেনাবাহিনী ইসরায়েলের সামরিক শক্তির নিকট বিপর্যস্ত হয়ে গেলো। আরববাহিনী এতো দ্রুত বিপর্যস্ত হবে কেনো রাষ্ট্রশক্তিই সেকথা ভাবে নাই। তাই আরব-হুনিয়ার এই ভাগ্য-বিপর্যয় বিশ্বায়ের সৃষ্টি করেছে।

ইসরায়েলের সৃষ্টি থেকেই আরব-ইসরায়েল সংঘাতের পটভূমি তৈরী হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধে আরবদের অকুঠ সমর্থন পেয়েও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সেদিন মধ্য-প্রাচ্যে আর একটি বন্ধুভাবাপন্ন গোষ্ঠির প্রয়োজন বোধ করে। কারণ তারা জানতো যুদ্ধোত্তরকালে এশিয়ায় ও আরব-প্রধান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের মুখে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই জাগ্রত জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠবে। তাই প্রথম মহাযুদ্ধে আরবদের বন্ধুরূপে ইংরেজের পাশে দেখা গেলেও, এদের উপর একান্ত নির্ভরশীলতার ভরসা নিয়ে ইংরেজ কূটনীতি যুদ্ধোত্তরকালে অগ্রসর হতে দ্বিধাগ্রস্ত হোলো। সেই সময় থেকেই প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জাতীয়ভূমি—“Jewish National Home”—রচনার ইংরেজের উদ্যোগ আরম্ভ হয়। ইংরেজের তাঁবে প্যালেষ্টাইনের ইহুদী জনসংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকে। প্যালে-

ষ্টাইনে ইহুদীদের বসতি দ্রুত বৃদ্ধি পায় জার্মানীতে হিটলারের ইহুদী-পীড়ন আরম্ভ হবার পর।

১৯৪৭ প্যালেষ্টাইনের ওপর ইংরেজের তাঁবেদারীতে ছেদ পড়ে। রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে আমেরিকার প্রতাবানুযায়ী প্যালেষ্টাইন দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক অংশ ইহুদীদের দখলে এবং অপর অংশ আরবদের দখলে যায়। এই প্যালেষ্টাইন বিভাগ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রসংঘের অস্তিত্ব স্বারী সদস্যদের সম্মতিক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল। ভারতবর্ষ অবশ্য সেদিন এই বিভাগের বিরোধী ছিল। প্যালেষ্টাইনের ইহুদী অংশের বসবাসকারী আরবদের পক্ষ থেকে এবং অস্তিত্ব আরব রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বৃহৎ শক্তিবর্গের এই সিদ্ধান্তের কোনো নড়চড় হোলোনা। আমেরিকার ক্রোড়পতি ইহুদীদের উদ্যোগে ও উৎসাহে ১৯৪৮ সনের ১৫ই মে তারিখে স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র ‘ইসরায়েলে’র উদ্ভব হল। দূরন্ত আরব প্রতিকূলতার মধ্যে এই স্বাধীন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ ও অনিশ্চিতি সত্ত্বেও ইসরায়েল সোভিয়েত রুশ সমেত বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বীকৃতি পেয়েছিলো। এই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট রুসভেন্ট মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন “A Jewish State in Palestine could be established and maintained only by military force.” কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের তেলের তাগিদে এবং সূয়েজের নিরাপত্তার খোঁজে মার্কিনী পুঁজিবাদীদের কাছে ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা

অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। আরবেরা ইসরায়েলের অস্তিত্বই অস্বীকার করে এসেছে তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এবং আরব-ইসরায়েল বিষয় ও বৈরিতা দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্য দিয়ে আরও কঠোর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসরায়েলের পত্তনের পর থেকে প্রায় পনের লক্ষ আরব বাস্তুচ্যুত ও নিপীড়িত হয়ে বিতাড়িত হয়েছে।

আরবদের যেমন ইসরায়েলে ঠাই নাই, হিটলার যেমন জার্মানীকে ইহুদীশূন্য করেছিলো, ইহুদীরাও তেমনি, হিটলারের মত ক্রুর না হলেও, ইসরায়েলকে আরবশূন্য করতে চেয়েছে। কিন্তু ইসরায়েলেরও শান্তি নাই। আরব জাতীয়তাবাদের জলী হাজার ও সীমান্ত সংঘাত ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিরবচ্ছিন্নভাবে বিঘ্নিত করে রেখেছে। আরব জাতীয়তাবাদের জলী সংহতির একমাত্র লক্ষ্য ইসরায়েলের বিলোপ। ইসরায়েলের উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত আরব জাতীয়তাবাদের শান্তি নাই। আরব-ইহুদীদের এই পারস্পরিক সম্পর্কে লক্ষ্য করেই মনীষী আইনষ্টাইন ইসরায়েল রাষ্ট্রের পত্তন উপলক্ষে বলেছিলেন : "It is important to reach an understanding with Arabs : to do this is the responsibility not of the Arabs, not of the British but of the Jews. And to reach such understanding is not less important than the founding of New Institutions in Palestine."

ইসরায়েল-আরবের সেতুবন্ধনের প্রধান অন্তরায় মধ্য-প্রাচ্যের তৈলসম্পদ ও এই অঞ্চলের ভৌগোলিক-রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থান।

মনীষী আইনষ্টাইনের এই সাবধানবাণীর মধ্যে আরব-ইসরায়েল পারস্পরিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিহিত থাকলেও আরবদের প্রতি ইসরায়েলের মৈত্রীর হস্ত প্রসারিত করার যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি আরব-ইসরাইল সম্পর্কের

পারস্পরিকতার উন্নতিসাধন আরবদেরও অনিবার্য দায়িত্ব রয়ে গেছে। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদ সে দায়িত্ব সাধে যেওয়া দূরে থাকুক এই বিশ বছরের মধ্যে ইসরায়েলের উৎসাদন ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্বের কথা তাদের মননায় ও ভাবনায় ঠাই পায় নাই। তাই ১৯৪৮, ১৯৫৬ কিংবা ১৯৬৭র আরব-ইসরায়েল সামরিক সংঘাতের পশ্চাতে আরব জাতীয়তাবাদের মারমুখীনতা থেকে মধ্য প্রাচ্যের তৈল সম্পদ রক্ষার কিংবা স্বেচ্ছায় নিরাপত্তা-বিধানের জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গের ইচ্ছা থাকলেও, ইসরায়েলের চির-বিপন্ন অস্তিত্ব, আত্মরক্ষার দুরন্ত তাগিদে তিনদিকে শত্রুবেষ্টিত এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিকে সামরিক, সাংগঠনিক ও মানসিক শক্তিতে দুর্জয় করে তুলতে সহায়তা করেছে। এই তিনটি যুদ্ধেই ইসরায়েলের সাফল্যের পশ্চাতে অস্তিত্বরক্ষার দুরন্ত প্রয়োজন ইসরায়েলকে মরিয়া করে তুলেছে।

আরব-ইসরায়েল সংঘাতের প্রকৃতি নির্ণয়ে এই গোড়ার কথাতেই বার বার ফিরে যেতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ-সাধনের জন্য ইসরায়েলের উদ্ভব, এই তত্ত্বের পশ্চাতে যুক্তি থাকলেও ইসরায়েলের জন্মলগ্নে এই নূতন রাষ্ট্রের প্রতি অস্বাভাবিক রাষ্ট্রের সহিত সোভিয়েট রুশের প্রসারিত স্বীকৃতি এই যুক্তির বাঁক অবিশ্বাস্যদিত ভাবে লঘু করে দিয়েছে ; কারণ সোভিয়েত রুশকে কোনো ক্রমেই সাম্রাজ্যবাদীদের ওল্লাবাহক বলা চলে না। চীনের কথা অবশিষ্ট স্বতন্ত্র। চীন, সোভিয়েত রুশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধে যেমন, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধেও মার্কিনী ওল্লাবাহকরূপে চিহ্নিত করতে ঘিধাবোধ করে নাই। সোভিয়েত রুশ অবশিষ্ট শুধু ইসরায়েলকে স্বীকৃতিই দেয় নাই; গোড়ার দিকে ইসরায়েলের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্নও ছিল। পরবর্তীকালে অবশিষ্ট সোভিয়েত রুশ সংযুক্ত আরব রিপাব্লিককে সর্বভোভাবে সাহায্য করে এসেছে। তা সত্ত্বেও গত বছর ইসরায়েল-আরব সম্পর্কের উন্নতি-বিধানের প্রয়োজনীয়তার কথা কায়রোতে প্রকাশ্য উল্লেখ

করতে শোনা গিয়েছিল মিশরের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে। সেই একই সময়ে ভারত-কাশ্মীর সম্পর্কে সোভিয়েত রুশের মূল্যায়নের পরিবর্তন শুরু হয়। গত বছর জুন মাসে সোভিয়েত ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী মাজুরফ রাওয়ালপিণ্ডিতে বলেছিলেন ভারত-পাকিস্তান বিরোধে অস্বাভাবিক প্রসঙ্গের মত কাশ্মীরও একটি প্রসঙ্গ, অর্থাৎ, কাশ্মীর অতঃপর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে সোভিয়েত রুশের কাছে পরিগণিত হবে না।

ভারতবর্ষও ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছে, এই নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভবের তিন বছর পর। কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ভারতবর্ষ আজও বিধাগ্রস্ত। ভারত সরকার বোম্বাইতে ইসরায়েলের একটি কনস্যুলেট খুলতে দিয়েও সেই কনস্যুলেট কর্তৃক গতবছর দিল্লীতে আয়োজিত পার্টি শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দিয়েছিল। এ-ছাড়া জহরলাল নেহেরুর আমলে ভারতের মধ্য দিয়ে সমগরত ইসরায়েল-রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাবার জন্ম চীফ অফ প্রোটোকল পাঠিয়েও যেটুকু সম্মান দেখানো হয়েছিল, ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ইসরায়েল রাষ্ট্রপতি এসকলকে ভারতের মধ্য দিয়ে নেপালে যাবার সময় সেটুকু স্বাগত জানাবারও সৌজন্য দেখা যায় নাই। উপরন্তু তার কাছ থেকে যানবাহন বাবদ তিন শত টাকাও আদায় করা হয়েছিল। তবুও বলতে হবে ভারতবর্ষ ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

মিশর ও আরব রাষ্ট্রগুলির ইসরায়েলকে স্বংস করার সঙ্কল্পই বিগত তিনটি যুদ্ধের উৎস এবং এই তিনটি যুদ্ধেই পরাজিত হয়ে মিশর ও আরব রাষ্ট্রগুলি পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানে অজুহাত বার করেছে। ১৯৪৮-এর যুদ্ধে বিপর্যয়ের জন্ম গাজা ফারুককে দায়ী করে কয়েক বছরের মধ্যে তাকে বিতাড়িত করে নেওইব-নাসের মিশরের রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালের যুদ্ধে ইসরায়েলের নিকট পরাজয়ের জন্ম মিশর স্বভাবতই ইল-ফরাগী সাম্রাজ্যবাদীদের

দায়ী করে। সেদিন জুয়েজ খাল দখলের জন্ম এরা কাপিয়ে পড়েছিল।

এবারকার যুদ্ধের ঘটনা অস্বরূপ। গত দশ বছর যাবৎ মিশর, সিরিয়া ও জর্ডন থেকে ইসরায়েলের উপর একটানা আক্রমণ চলেছে এবং এই সীমান্ত সংঘাত প্রতিরোধে উপযোগী পালটা ব্যবস্থাও ইসরায়েল করে এগেছে। সাম্প্রতিক কালে প্যালেস্টাইন মুক্তি ফৌজ নামে একটি সংস্থা আরব জাতীয়তাবাদের সামরিক অগ্রদূতরূপে ইসরায়েল সীমান্ত বিপর্যয় করে তুলেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে গাজা অঞ্চল থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের জরুরী বাহিনী সরিয়ে নেবার জন্ম মিশরের দাবী দ্বারা হয়ে ওঠে। ১৯৫৬ সালে ইসরায়েলের সিনাই অভিযানের পর মিশর সীমান্তে এই বাহিনী পর্যবেক্ষণের ও মিশরীয় সীমান্ত রক্ষার জন্ম রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিল। সেদিন ইসরায়েল সীমান্তে এই বাহিনী নিযুক্ত করার প্রস্তাবও রাষ্ট্রসঙ্ঘ উত্থাপন করেছিল। কিন্তু ইসরায়েল সে-প্রস্তাবে অসম্মত হয়। সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের সাম্প্রতিক সামরিক প্রস্তুতি যখন সমাপ্ত প্রায়, সে সময় থেকেই তাদের পক্ষ থেকে সিনাই অঞ্চলে অবস্থিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের জরুরী বাহিনী অপসারণের দাবী উঠলো। যুদ্ধ যে আসন্ন এই ঘটনার পর, তা আর কাকুর বুঝতে অস্ববিধা হোলোনা। তবুও যে তৎপরতা, বৃহৎ শক্তিবর্গের পক্ষ থেকে সংঘাত এড়াবার জন্ম সে-সময় দেখানো উচিত ছিল, মিশরকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী অপসারণে নিরস্ত করার জন্ম বৃহৎশক্তি বর্গের, বিশেষ করে সোভিয়েত রুশের যে ভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, বাস্তব তার কোনো স্বাক্ষর নেই। ১৮ই মে তারিখে অবশেষে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী গাজা পরিত্যাগ করতে সুরু করলো এবং তার কয়েকদিনের মধ্যে ২৩ মে তারিখে তিরাণ প্রণালী ও আকাবা উপসাগরে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র ইসরায়েলের জাহাজ ও ইসরায়েলের জন্ম বাহিত সামরিক প্রয়োজনের পণ্যপূর্ণ জাহাজ প্রবেশ বন্ধ করে দেয়।

আকাবা উপসাগরে জাহাজ প্রবেশ বন্ধ করাকে আমেরিকা আক্রমণাত্মক কাজ বলে চিহ্নিত করে, ইসরায়েল তে বটেই। আকাবা উপসাগর বন্ধ করার ফলে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয় এবং আরব-ইসরায়েল সংঘাত আসন্ন ও অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত আকাবায় ইসরায়েলী জাহাজ চলাচল মিশর বন্ধ করে রেখেছিল। ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে আরব দেশগুলি সমবেতভাবে ইসরায়েলের নিকট পরাজিত হয়ে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি করেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ এবং আকাবা উপসাগরের অবরোধ অব্যাহত রাখে। ১৯৫৫ সালে মিশর ৭২ ঘণ্টার নোটিশ সাপক্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাহাজ আকাবা উপসাগর দিয়ে চলাচলে সম্মত হয়। ১৯৫৬ সালে সিনাই যুদ্ধে ইসরায়েলের জয়ের পর তিরান প্রণালী ও আকাবা উপসাগরের আন্তর্জাতিক প্রকৃতি স্বীকৃতি পায় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাহাজের অবাধ চলাচল শুরু হয়। ১৯৫৮ সালে মিশর রাষ্ট্রসংঘের নিকট প্রতিশ্রুত ছিল যে তিরান প্রণালী দিয়ে অবাধে জাহাজ চলেবে। এটাই ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অফ ম্যারিটাইম ল (International Convention of Maritime Law)। অপরপক্ষে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের বক্তব্য তিরান প্রণালী ও আকাবা উপসাগরের উপর আরবদের সার্বভৌম অধিকার রয়েছে এবং এগুলি আন্তর্জাতিক অঙ্গপণ নয়। ১৯৪৮ সাল থেকে তারা এই কারণেই তিরানের মুখে পাহাড়া বসিয়েছিল। ১৯৫৬ সালে ইসরায়েল সামরিক শক্তির জোরে আরবদের এই অধিকারচ্যুত করেছিল। আরবেরা তা চিরদিন মেনে নেবে না। এবারকার অবরোধের দুইদিন পূর্বে সৌদী আরব ও জর্ডন—যে দুইটি আরব রাষ্ট্রও আকাবা উপসাগরের উপর অবস্থিত—তিরান প্রণালী বন্ধ করে দেবার জন্ত প্রচণ্ড দাবী তোলে। হয়তো বা এই রাষ্ট্রদ্বয়ের অবাধত দাবীর জন্তই সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র আর কলঙ্কপণ

না করে আকাবা উপসাগর ২৩শে মে তারিখে অবরোধ করে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন এই অবরোধ মোচনের জন্ত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের হুমকি দিলেও কার্যত তারা সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণে বিরত থাকে। অপর পক্ষে ফরাসী রাষ্ট্রপতি জঁ গল অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েট রুশ ও ফ্রান্সের বৈঠক করে মধ্য এশিয়ার সঙ্কট মীমাংসার জন্ত আবেদন জানালে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র সে আবেদন অগ্রাহ করে ঘোষণা করে আরবেরা কারো মুকব্বিয়ানা স্বীকার করবে না, মধ্য প্রাচ্যে তাদের সর্বভৌমিকত্ব অঙ্গজনীয়।—“The Arabs no longer accept the guardianship of the Middle-East by anyone.” সোভিয়েট রুশও এই আবেদন অগ্রাহ করে এই সঙ্কটের জন্ত ইসরায়েলকে দায়ী করে “Colonial Overseer”এর ভূমিকা বর্জনের জন্ত সতর্ক করে দেয়। মধ্য এশিয়ার সঙ্কটে ইসরায়েল ও আরব যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট মুখোমুখী এসে দাঁড়াল। যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি দায়ী করে যে মাসের ২৭শে নাসের বলেন “The U. S. A are the leading defenders of Israel..As for Britain it has no independent policy and trails behind the U. S.” আরব ইসরায়েলের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধে নাসেরের উদ্দেশ্য ঘোষিত হল: “The battle will not be limited to Syria or U. A. R. and our fundamental objective will be the destruction of Israel.”

আরবদের প্রতি সোভিয়েটের অকুণ্ঠ সমর্থন ঘোষিত হল কারো রেডিওতে “The U. S. S. R will stand at our side in the battle and will not allow the intervention of any country now that we have come back to the status quo of before 1956.” অর্থাৎ আকাবা অবরোধের পশ্চাতেও সোভিয়েতের

পূর্ণ সমর্থন আর একবার বিস্তারিত হল। শুধু তাই নয় ১৫টি গোভিয়েট যুদ্ধ জাহাজ আনবিক ক্ষেপণাস্রো সজ্জিত হয়ে কুম্ব সাগর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে অগ্রসর হল গোভিয়েট সমর্থনকে বাস্তব রূপ দিতে। ইতিপূর্বে পোলারিশ মিশাইলে সজ্জিত হয়ে গোভিয়েট সাবমেরিন ভূমধ্যসাগরে উপনীত হয়েছে। মার্কিনী ষষ্ঠ নৌবাহিনী এবং ব্রিটেনের যুদ্ধ-জাহাজও ইতিপূর্বে ভূমধ্যসাগরে ঠাঁই নিয়েছে। আকাবা উপসাগরের অবরোধ উন্মোচনের চেষ্টা হলেই গোভিয়েট ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের নৌ-বলের অনিবার্য পটভূমি তৈরী হয়ে রইলো।

১৯৪৮ ও ১৯৫৬-এর যুদ্ধে মিশর ইসরায়েলের সঙ্গে একটি ফ্রন্টে সংগ্রাম করেছে—সে হোলো সিনাই ফ্রন্ট। এবারকার আয়োজনে সিনাই ছাড়া সিরিয়া এবং জর্ডন সীমান্তেও ইসরায়েলের যুদ্ধ আবশ্যিক হয়ে উঠলো। স্তরং তিনটি ফ্রন্টে এবার ইসরায়েল যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়, নাসের সেই আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মিশর-জর্ডন-ইরাকের সামরিক জোট সংগঠিত করে ইসরায়েলের চারপাশে সামরিক বেঠন শক্ত করা হলো। দুই বছর আগে তিউনিসিয়ার সঙ্গে মিশরের মতবিরোধ হয়েছিল ইসরায়েলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সীমান্তের প্রান্তে। তিউনিসিয়া চেয়েছিল ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তির ও প্রতিবেশীর সম্পর্ক স্থাপিত হউক। মিশরের প্রবল বিরোধিতায় তিউনিসিয়ার সঙ্গে মিশরের সম্পর্কের অবনতি ঘটে, ফলে তিউনিসিয়া আরব লীগ বর্জন করে। কিছু বর্তমান যুদ্ধে তিউনিসিয়াও নাসেরকে সমর্থন জানায়। এ-ছাড়া আরব লীগে যারা নাসের-বিরোধী, আরব রাষ্ট্র গোষ্ঠির মধ্যে প্রগতিশীল রক্ষণশীল নির্বিশেষে, সৌদী আরবের রাজা থেকে শুরু করে জর্ডনের রাজা সকলেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নাসেরের সমর্থনে সমবেত হয়। আলজিরিয়াও নাসেরের সমর্থনে এগিয়ে আসে।

কিন্তু এতো আয়োজন সত্ত্বেও এই জুন স্বরিংগতি যুদ্ধ আরম্ভের চারদিনের মধ্যে সমবেত আরববাহিনী চূড়ান্ত পর্যায়ে বরণ করে নিলো। এই বিপর্যয়ের মূল কারণ যুদ্ধারম্ভের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্বরিংগতিতে আরবদের ২৫টি বিমানঘাঁটিতে অবস্থিত বিমানবাহিনী ইসরায়েলের বিমানবাহিনীর হাতে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আরবেরা গোভিয়েটের অকুণ্ঠ সামরিকসাহায্য পেয়েছিল—এমন কি রুশ ক্ষেপণাস্রো সিনাই মরুভূমিতে তৈরী ছিল,—যেমন পেয়েছিল ইসরায়েল মার্কিন-ব্রিটেনের সাহায্য। কিন্তু ইসরায়েলের সংগঠনের উৎকর্ষ, সামরিক তৎপরতা ও কৌশল, আঘাতের সময় নির্ধারণ এবং জাতীয় সত্তা রক্ষার সঙ্কল্পে আত্মনিবেশন, ইসরায়েলের এই জয় সম্ভব করেছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও ১৯৫৬ সালের সিনাই যুদ্ধের বিজেতা, মোসে ডায়ান বলেছেন; “Everybody fought for something that is a combination of love, belief and country.”

১১ কোটি আরবের সঙ্গে ২৭ লক্ষ ইসরাইলীর যুদ্ধে আরবদের সামরিক সংহতির অভাব ও নীতিগত ঐক্যের অভাব এই বিপর্যয় ডেকে এনেছে। ইসরায়েলের চাইতে সমবেত বিমান শক্তি আরবদের অনেক বেশী থাকে সত্ত্বেও এবং ট্যাঙ্কের বহুর প্রায় সমান সমান হওয়া সত্ত্বেও এবং মিশর, জর্ডন, সিরিয়া, ইরাকের সমবেত সেনাবাহিনী ইসরায়েলের চাইতে অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও আরববাহিনী ইসরায়েলের আক্রমণের সামনে দাঁড়াতেই পারে না। একমাত্র জর্ডনের সেনাবাহিনী কুতিদেহের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রায় ১৫,০০০ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়েছে। সিনাইয়ের যুদ্ধে মিশরের ৮০,০০০ হাজার বাহিনীর বেশীর ভাগই বন্দী হয়েছে। সিরিয়ার সেনাবাহিনী জর্ডন ও মিশরের ফ্রন্টে ইসরায়েলী আক্রমণের চাপ কমানোর জন্য কোনো উদ্যোগ করে নাই। আলজিরিয়ার বিমানবাহিনীর মিশরে পৌছতে বিলম্ব হয়। কারণ কোন বিমান বন্দরে তাদের



নামতে হবে সে-সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ তাদের কাছে মিশরীয় সেনাবাহিনীর কাছে থেকে পৌঁছাতে দেরী হয়। আলজিরিয় সৈন্তেরা তিউনিসিয়া সীমান্ত অতিক্রম করবার পূর্বেই শিনাইতে মিশরীয় বাহিনীর পতন হয়। তিউনিসীয় সেনাবাহিনীর নিকট কোনো নির্দেশই পৌঁছানো না মিশরে রওয়ানা হবার। আসলে আরববাহিনীগুলি বিচ্ছিন্নভাবে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ করেছে। শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যুদ্ধের কোনো মহড়া সামরিক সংহতির অভাবে তাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হয় নাই: The Arabs are basically fighting separate wars against Israel who is fighting just one war."

সোভিয়েত রুশ কর্তৃক সরবরাহিত অস্ত্র সম্ভার এবং সোভিয়েত রুশ কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত মিশরীয় সেনাবাহিনীর বিপর্যয়েও পক্ষে মিশরকে সাহায্য সোভিয়েত প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হোলোনা। সোভিয়েত রুশের এই অসহায় আচরণে আরব-জগতে সোভিয়েৎ-বিরোধী বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। তাই রাষ্ট্রসভ্যে সোভিয়েতের চেষ্টায় যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম দফায় মিশর ও সিরিয়া এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যদিও ইসরাইল যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হয় অবশ্য মিশর ও সিরিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ সাপক্ষে। সোভিয়েতের সাহায্যের আশা নিয়ে নাসের এই যুদ্ধে নেমেছিল কিন্তু শেষটা নিরাশ হয়ে যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য হয়।

অতঃপর সোভিয়েতের পক্ষ থেকে ইসরায়েলকে হুমকি দিয়ে এবং তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে কূটনৈতিক কসরত দেখিয়ে সোভিয়েত রুশ আরবদের মধ্যে লুপ্ত প্রভাব উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছে এবং কোসিজিন স্বয়ং জেনারেল এসেম্বলীর বৈঠকে হাজির হয়েছেন একই কারণে। কিন্তু আপাতত আমেরিকার সঙ্গে সরাসরি সংঘাত এড়াবার

জন্তই নাসেরের সাহায্যে সোভিয়েত রুশ অগ্রসর হতে ভরসা পেলোনা এ-সম্বন্ধে সংশয় নেই।

যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রুটেন ও আমেরিকা একই কারণে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে যদিও ইসরায়েলের সাহায্যে এরা প্রতিশ্রুত ছিল। আমেরিকা ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলকে বিমান বাহিনী দিয়ে সাহায্যের যে অভিযোগ নাসের উত্থাপন করেছেন সে অভিযোগ যে মিথ্যা তা সপ্রমাণ হয়ে গেছে। সোভিয়েত রুশ এই অভিযোগ সমর্থন করে নাই এবং রাজা হুসেনও এই অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত সোভিয়েত জাহাজ মার্কিন ও ব্রিটিশ জাহাজের ওপর কড়া নজর রেখেছিল সুতরাং, ব্রুটেন ও আমেরিকার হস্তক্ষেপ সোভিয়েত রুশের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতো না।

ভারত সরকারের নন-এলাইনমেন্ট নীতি পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটে বুলিসাং হয়ে গেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচাগলা-সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়ে বলেছেন "The creation of Israel has given rise to tension between Israel and Arab countries" অর্থাৎ ইসরায়েলের জন্মই আরব রাষ্ট্রসমূহ ও ইসরায়েলের মধ্যে বিরোধের কারণ। রাষ্ট্রসভ্যের উদ্যোগে বিশ বছর পূর্বে ইসরায়েলের জন্ম হওয়া সত্ত্বেও ভারত সরকার সেই রাষ্ট্রের উদ্ভবকে সংঘাতের জন্ত দায়ী করে আরবদের দৃষ্টিভঙ্গির পুরোপুরি সমর্থনে প্রকরাস্তরে ইসরায়েলের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের মীমাংসা চেয়েছেন। নন-এলাইনমেন্টের নামে আকাবা উপসাগর অবরোধের সমর্থন এবং অপরোক্ষে ইসরায়েলের উচ্ছেদ কামনা করে একদিকে যেমন আরব জঙ্গীবাদের কাছে ভারত সরকার আত্মসমর্পণ করেছে আর একদিকে চীন-ভারত ও পাক-ভারত সংঘাতের সময় মিশরের আচরণ ভুলে গিয়ে জাতীয় স্বার্থকেও বিপন্ন করে তুলেছে। যদি ভারত সরকার মনে করে থাকে পাকিস্তানের

সঙ্গে আগামী সংঘাতে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের সমর্থন পাবার জন্য ভারত সরকারের পক্ষে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রকে আগামী সমর্থন জানানো প্রয়োজন তবে যারাম্বিক ভুল হবে। সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র বুটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারত ও পাকিস্তানকে এই দুই রাষ্ট্রে নিশরের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে পাক-ভারতকে তুল্যমূল্য দান করেছে।

সিনাই, গাজা, গ্যালিলি, জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত সমস্ত এলাকা, জর্ডন অধিকৃত জেরুজালেম প্রভৃতি ইসরায়েল অধিকৃত এলাকা থেকে ভারতবর্ষ ৪৮৮ জুনের পারম্পরিক অবস্থান পর্যন্ত ইসরায়েলের পিছিয়ে যাবার প্রস্তাব উত্থাপন করেছে এবং এই প্রস্তাব অমুযায়ী ইসরায়েলকে আকাবা উপসাগর, তিরাপ, সার্ম এল শেখ ছেড়ে দিয়ে আবার এই সব অঞ্চল আরবদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আকাবার অবরোধই যেনে নিতে হয়। অর্থাৎ, আকাবার অবরোধই পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের আস্ত কারণ। ভারত সরকার এই প্রস্তাবের অর্থোক্তিকতা বৃদ্ধিতে পেরে ৪৮৮ জুনের সময়সীমা তুলে নিয়ে কেবলমাত্র ইসরাইলী অপসারণের কথা তুলেছে। 'আক্রমণের কলভোগ করতে দেওয়া হবে

না' ইসরায়েলের ক্ষেত্রেও এই নীতির প্রয়োগ করবার জন্য রুশ ও অন্যান্য রাষ্ট্র উত্তেজিত হলেও ইসরায়েল সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও পশ্চিম এশিয়ার শান্তি পাশাপাশি আলোচনা না হলে ইসরায়েল অন্য কোনো প্রস্তাবেই রাজী নয়।

পশ্চিম এশিয়ার মূল সমস্যাই ইসরায়েলের নিরাপত্তা এবং ইসরায়েল ও আরবদের মধ্যে শান্তি ও সহ-অবস্থানের পরিবেশ রচনা। ইসরায়েলের নিরাপত্তা স্বীকৃত হলে, ইসরায়েলকেও আরব উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে হবে এবং জেরুজালেমের সমস্যা সমাধানেও উত্তেজিত হতে হবে। ইসরায়েলের স্থিতি, প্রতিষ্ঠা ও প্রসার আজ একটি রূঢ় বাস্তব। এই বাস্তবকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র ইসরায়েলের পশ্চাতে পশ্চিমী ষড়যন্ত্র ও তৈল সম্পদের লড়াইয়ের চক্রান্ত দেখলে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের মীমাংসা দূরে থাকুক এই সঙ্কটের রূক্ষপথে বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠির সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে এবং পশ্চিম এশিয়াতেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামাঘা বেজে উঠবে। সেই যুদ্ধে শুধু পশ্চিম এশিয়া ছারখার হবে না, শুধু এই অঞ্চলের তৈল সম্পদেই আগুন জ্বলবে না, সারা বিশ্বই সেই আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.

THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.

NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.

THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS

BHARAT SUGAR MILLS Ltd.

GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,

159, Churchgate Reclamation,

BOMBAY - 1

বঙ্কিমেন্দ্র স্বদেশপ্রেম

ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিতকার তাঁর জীবনের একটি কাহিনী বিবৃত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবাসযাত্রার প্রাক্কালে গঙ্গাজলে মায়ের চরণ ধৌত করে দিলেন। মা সসঙ্কোচে বলে উঠলেন “করলি কি ? আমার পায়ে গঙ্গাজল ঢেলে দিলি।” মায়ের সঙ্কোচ দেখে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন ‘মা, গঙ্গা কি তোমার চাইতে বড় ? জননী স্বর্গের চাইতেও গরীমসী।’ বঙ্কিমের পরবর্তী জীবনেও এই কথাই ঘনিত হয়েছে তাঁর মাতৃবন্দনায়: “হুং হি হুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী.....বাণী বিভাদায়িনী নমামি স্বাহ।”

যাঁর সম্বন্ধে আজ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি তিনি ছিলেন একাধারে রসপ্রস্ঠা, মননশীল কবি, চিন্তাবিদ, মঙ্গলপ্রস্ঠা, সত্যদর্শী ঋষি, প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা সাহিত্যসম্রাট বলেছি। নীতিশাস্ত্রে যেমন সিংহকে পশুরাজ বলা হয়ে থাকে কারণ সিংহের মধ্যে যে দৃষ্ট মহিমা রয়েছে তার কাছে সবাই নতি স্বীকার করে। পশুকে কেউ রাজপদে অভিষিক্ত করেনি। তার শৌর্য্য সে রাজমহিমা লাভ করেছে। সেই একই অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রও সাহিত্যসম্রাট।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব দিবসে তাঁর দৃষ্ট মহিমা, প্রবল ব্যক্তিত্ব স্মরণ করছি। তাঁর মধ্যে ছিল তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্বের জ্যোতি। বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয়তাবাদের মন্ত্র শিখিয়েছিলেন তার তাৎপর্য্য আজ উপলব্ধি করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে ঈশ্বর গুপ্ত, রজনাল ও মণুসুন্দর স্বদেশপ্রেম প্রচার করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের স্বদেশপ্রেমের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর

স্বদেশপ্রেম তাঁর ধর্মসাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমাদের শাস্ত্রে, মুন্সীর মধ্যে চিন্ময়ীর সাধনা করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও মুন্সীর মধ্যে সেই চিন্ময়ী স্বদেশপ্রেমের বন্দনা করেছেন। এই ধর্মসাধনার মধ্যে বাংলার নূতন তাস্ত্রিক সাধনাও নিহিত রয়েছে। বন্দে মাতরম মন্ত্র এই তাস্ত্রিক সাধনার স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর স্বদেশ প্রেমের প্রথম স্পষ্ট স্মরণ ‘আমার হুগোৎসব।’

আনন্দমঠের অবতরণিকায় আছে “তোমার পণ কি ?... উত্তর হইল ভক্তি।” কিন্তু এই ভক্তি অঙ্গ ভক্তি নয়, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। সন্তানবর্মে দীক্ষিতদের প্রবল স্বদেশ প্রেমের উন্মাদনা যে পরিমাণে ছিল, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ছিল সেই পরিমাণে কম। তাই সত্যানন্দের অঙ্কপ্রেমের পাশে মহাপুরুষের প্রশান্ত স্বৈর্ষের বৈপরীত্য এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করেছে। যেদিন দেশের তরুণেরা মাতৃমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে উন্মাদ হয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাদের জানচক্ষু উন্মীলিত করে বলেছিলেন স্বদেশকে জান, স্বদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জান, তখনই ভক্তি সম্ভব।

ভারতবর্ষে সন্ন্যাসধর্মের দু’টি আদর্শ পাশাপাশি চলেছে। একটিতে ব্যক্তির মুক্তির, অপরটিতে লোককল্যাণ সাধনের, দেশের মুক্তির, সকলের মুক্তির আদর্শ। মহাবান বৌদ্ধগণ সবার মুক্তির জন্তু কাজ করছিলেন। মণুসুন্দর সরস্বতী, রামদাস স্বামী স্বদেশ-উদ্ধারের ত্রুত গ্রহণ করেছেন। বঙ্কিমের সন্ন্যাসধর্ম সেই সর্বমানবের

যুক্তির ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন সমাজ ও রাজনীতির পরিচালক হবেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ, সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ সর্বভ্যাগী সম্মানী দল। বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শে আমাদের দীক্ষিত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের অনুশীলন ধর্মে সর্বমানবতার দীক্ষা দান করেছেন। স্বদেশপ্রেম এই ধর্মের একটি অঙ্গ। আমাদের পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গহৃদয়ের মায়া হতে হবে। দেহ অস্থ ও পটু, জ্ঞান-বিস্তারনের সাধনা, কর্মে দক্ষতা, সৌন্দর্যবুদ্ধি জাগ্রত—সকল বৃত্তির সম্যক অনুশীলন ও সামঞ্জস্য চাই। প্রাচীন ভারতের ঋষিরা এই সামঞ্জস্যের শিক্ষাই দিয়েছেন। সামঞ্জস্যই ধর্ম। আমাদের কাম, ক্রোধ বৃত্তিরই কোনটিই পরিত্যজ্য নয়। ক্রোধ রিপু—কিন্তু অজ্ঞায় অবিচারের বিরুদ্ধে ক্রোধ কল্যাণকর। কামদেবকে দেখে নিবের ক্রোধের উল্লেখ হয়েছিল। এই ক্রোধ পবিত্র ক্রোধ। কিন্তু আতিশয্য যেন আমাদের অন্তরের সামঞ্জস্যকে বিনষ্ট না করে।

ধারা বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা গভীরভাবে চিন্তা করেন নি তাঁরা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ পাশ্চাত্যের আদর্শ। মিল, বেহাম, হার্বাট স্পেন্সার, ডারউইনের আদর্শ। কিন্তু একথা সর্বৈব ভ্রান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ সামঞ্জস্যের আদর্শ। এ-আদর্শ গীতার আদর্শ, মহাভারতের আদর্শ, পুরাণের আদর্শ। তিনি শাস্ত্রসিদ্ধ মন্বন করে প্রচার করলেন আমাদের দেশে মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শ কৃষ্ণ—যিনি বলেছেন “ধর্ম যজ্ঞে নহে, ধর্ম লোকহিতে।”—তিনিই শ্রেষ্ঠ মানব, তাঁকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার জানাই :

“নমো নমস্তেইস্ত সনৎকৃষ্ণ্যঃ।”

পুনশ্চ তুর্যোপি নমো নমস্তে ॥

প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ছিলেন তবুও তাঁর কবিতায় স্বাভিজ্ঞা দেখা গেছে। তিনি ‘মানসে’ লিখে তার গভীর চিন্তার ছাপ রেখেছেন। তাঁর প্রথম জীবনে নাস্তিক্যের কিছু প্রভাব দেখা গেলেও পিতৃপিতামহের ধর্ম

প্রবণতার লক্ষ্যণীয় প্রভাবও রয়েছে। কিন্তু আত্ম অতৃপ্তির বেদনার মূল সন্ধান করে তিনি উপলব্ধি করলেন ‘পর অর্থ বর্জন ভিন্ন স্থায়ী অর্থ লাভের অল্প কোনো পথ নাই।’ আরও গভীরে প্রবেশ করে তিনি উপলব্ধি করলেন ‘মহুগ্ধের সাধনায় যদি দীক্ষিত না হতে পারি, মন যদি ভগবৎমুখী না হয়, তবে শান্তি নাই।’

‘অনুশীলনে’ বঙ্কিম বলেছেন ছেলেবেলা থেকে মনে হয়েছে ‘এ-জীবন দিয়ে কি করবো।’ অনেক চিন্তার পর তিনি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন যে মানবতাতেই অর্থ। মানবতার আদর্শ-সকল বৃত্তির সম্যক উৎকর্ষ সাধন : শারীরিক দৃঢ়তা, মানস সমৃদ্ধি, কর্মনিষ্ঠা ও সৌন্দর্য-চেতনার পরিপূর্ণ সমন্বয় সাধন।

তাঁর পরিবারের ঐতিহ্য ছিল বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে, বয়োনিষ্ঠকে দীক্ষা নিতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র দীক্ষা দান কালে কোনো কনিষ্ঠকে বলেছেন—তুমি ব্রাহ্মণ কিন্তু যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত কাজ করেনা, তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কোরোনা। যে রাজা রাজধর্ম পালন করেনা তাকে আনুগত্য দেবার কোনো কারণ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র একজন যোদ্ধা। তিনি বৈষ্ণব কিন্তু তাঁর কৃষ্ণ বৃন্দাবনের রসিকশেখর কৃষ্ণ নন, তাঁর কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, গীতার ক্ষত্রিয় কৃষ্ণ। স্বাধীনচিন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ‘যা সত্য, তাই শাস্ত্র, যা শাস্ত্র তাই সত্য হয় না।’ ‘আচারের চেয়ে বিচার বড়’—এই কথায় তাঁর যুক্তিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ প্রচণ্ড স্বাভিজ্ঞাভিমানের গর্বে তিনি গবিত—তাই কারো কাছে তিনি নতি স্বীকার করেন নাই। কোনো এক সাহেব তাঁকে বলেছিলেন : ‘এই দেশবাসীর বিনীত হওয়া উচিত।’ বঙ্কিমচন্দ্র তার উত্তরে বলেছিলেন : ‘যতদিন ভূতলে অতুল্য ভাষায় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিব, ততদিন বিনীত হইতে পারিব না।’

আজকের যুগে আমাদের বঙ্কিমের প্রবল ব্যক্তিত্বকে

স্মরণ করতে হবে—নিজেকে সে স্তরে উন্নীত না করতে পারলে আমরা তাঁর পৌরুষের মর্যাদা বুঝবো না। এজন্য প্রয়োজন প্রাত্যহিক তাঁর রচনা পাঠ, আলোচনা-চক্রের পত্তন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমকে মানবতার আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নাই। এইখানেই তিনি স্বকীয়তার মহিমায় সমৃদ্ধ। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, গীতারাম—তাঁর ত্রয়ীগ্রন্থরূপে সম্মানিত। এই ত্রয়ীগ্রন্থে মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শই পূজিত। তা সত্ত্বেও শিল্পীর সার্থক উত্তরণও সম্ভব হয়েছে এই গ্রন্থ জন্মে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সন্তানধর্মের আদর্শে তাঁর নবমানবধর্মের আদর্শে দীক্ষিত হলেই তাঁর আদর্শকে আমরা উপলব্ধি করবো। আজ আমরা মানবতার আদর্শ থেকে স্রষ্ট। যেটিরিয়াল প্রসপারিটীর মোহে আমরা চির অতৃপ্তির পথে ছুটে চলেছি। সত্যের আদর্শ, কল্যাণের আদর্শ থেকে আমরা স্রষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের মানবধর্ম আমরা গ্রহণ করিনি।

বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করেছেন তাঁর—বিভাগ, বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্নদৃষ্ট সমাজ

ও রাষ্ট্রে সেই মানবধর্মের মহিমা ঘোষিত হয়েছে। তাঁর সমগ্রজীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে ছিল নুতন সমাজ ও রাষ্ট্র-গঠনের প্রয়াস, যে প্রয়াস ধ্বনিত হয়েছে পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবাক্তব উপাধ্যায় ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। স্বদেশপ্রেমের মূলকথা মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা, আত্মীয়তার আদর্শের ভিত্তিমূলেও রয়েছে মানবধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের অমুসরণে এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা চাই।

বঙ্কিমচন্দ্র সেকলে হয়ে যান নাই। তাঁর রচনা থেকে আজ আবার আমরা নুতন আলোক লাভ করতে পারবো, তাঁর স্বদেশপ্রেমে, তাঁর মানবপ্রেমে দীক্ষিত হব। তাঁর আদর্শে যদি দীক্ষিত হই, সেই দিব্যধামবাসী ঋষি আমাদের আশীর্বাদ করবেন। আমরা সকল ব্যর্থতা ও অবসাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব। *

* ১৩ই আষাঢ় ১৩৭৪ (২৮শে, মে ১৯৩৭)
রাসবিহারী কেল্স নাগরিক সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত
বঙ্কিম জন্মবার্ষিকী সভায় প্রদত্ত সভাপতির ভাষণের অমুসরণে
অনুলিখিত। [জঃসঃ]

সুন্দরবন ভ্রমণের ভূমিকা

আর্যদেব

১৯৬৭ সন আন্তর্জাতিক পর্যটক বর্ষ বলে ঘোষিত হয়েছে। ভারতবর্ষে—অতএব পশ্চিমবঙ্গেও—সে অমুযায়ী এ বৎসর পর্যটক বর্ষ বলে পালিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পর্যটনের পরিকল্পনায় ঘরের কাছে সহজগম্য সুন্দরবনকে যথোপযুক্ত মূল্য দিচ্ছেন না। অথচ এই বন-অঞ্চলে বহু দ্রষ্টব্য রয়েছে যা পর্যটকদের প্রভূত আনন্দ দিতে পারে। লেখক পর পর কয়েকটি লেখায় পাঠকদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষিত করবেন। জঃ সঃ

[“পর্যটন শান্তির সহায়” এই শ্লোগান দিয়ে রাষ্ট্রসংঘ ১৯৬৭ সালকে আন্তর্জাতিক পর্যটক বর্ষ বলে ঘোষণা করেছেন। পর্যটনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাববিনিময়ের জন্ত রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সদস্যদেশই এই বছরটিকে আন্তর্জাতিক পর্যটক বর্ষ বলে স্বীকার করে নিজের নিজের দেশে যথোচিত ব্যবস্থার আয়োজন করেছেন। পর্যটকদের পর্যটনের নানারকম সুবিধা করে দেওয়ার ভারও প্রত্যেক দেশ গ্রহণ করেছেন।

পর্যটনের মাধ্যমে যাতে দেশে দেশে সৌহার্দ্য দৃঢ়তর হয় তারজন্তে Unesco. এই ১৯৬৭ সালটিকে “আন্তর্জাতিক পর্যটক বর্ষ” বলে ঘোষণা করেছেন। ১৯৬৩ সালে রোমে রাষ্ট্রসংঘের International Travel & Tourism সম্মেলনের ৯৯তম সিদ্ধান্ত অমুযায়ী International Union of Official Travel Organisation-এর 196th সাধারণ সভায় এই বর্ষটিকে “আন্তর্জাতিক পর্যটক বর্ষ” বলে পালন করার কথা হয়।

IUOTO-এর ৯৫টি সদস্যদেশের সরকারী পর্যটক

প্রতিষ্ঠানগুলি সারা দেশে ও প্রদেশে এই বর্ষ পালন করছেন। “1967, International Tourist year” ও “Tourism Passport to Peace” এই শ্লোগান প্রভূত ব্যবহারের প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়।

ভারতবর্ষও এই প্রস্তাব গ্রহণ করে বছরের একটি মাস “জাতীয় পর্যটক মাস” হিসেবে পালন করবেন বলে ঠিক করেছে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার “পর্যটক সপ্তাহ” পালন করবেন। ভিসা, পাসপোর্টের সহজলভ্যতা সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নানারকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।

কিন্তু সুন্দরবন ভ্রমণের কোন কথাই তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই নি। এবছর পুজোর মরসুমটাই পশ্চিমবঙ্গে পর্যটক বর্ষ হিসেবে গণ্য করা হবে।]

ভ্রমণকৃত্য প্রারম্ভে বানিহাল পেরোলেই যেমন কাশ্মীর ভ্যালির নির্গ বৈচিত্র্য অনুভব করা যায় পপলারগাছের সারিতে, চিনারের রস্টিমাভায়, দূরপাহাড়ের তুষারশোভায়, আশাদের ঘরের কাছের সুন্দরবনেও তেমনি বৈচিত্র্য চোখে পড়বে এর

বিরাট বিরাট নদীর জলের লোনা স্বাদে, হাঙর-কুমিরভর্তি এই নদীসম্পর্কিত ভয়চেতনায়, এর বাণী-কেওড়া-হেঁতাল-গরান-এবং হুঁদরী গাছের অভিনবন্ধে, এর বৃক্ষবিহীন বহুবিধূত ধান উৎপাদনকারী দীপঙলিতে, এবং সবশেষে যে অংশে অংগ্য আছে সেই অংশের ঘনসংবদ্ধ অরণ্যদর্শনে—যে অরণ্যে বিরলদর্শন বাঘ আছে, হরিণ আছে, বুনো শুয়োর আছে। তাছাড়াও আছে নানারকমের পাখি যাদের কোনদিন কলকাতার ধারে কাছেও দেখা যায় না। ভ্রমণকারী মাইলের পর মাইল নদীর ধারের বাঁধ দেখতে দেখতে হয়ত ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, তখন হঠাৎ একটি ছোট্ট গ্রাম দেখা যাবে নদীর পাড়েই—কাকর বাড়ির ছোট বউ টুকটুকে রাঙা শাড়ি পবে জল আনতে চলেছে মাইলখানেক দূরের কোন নলকূপ থেকে—নলকূপ ত বাড়ি বাড়ি নেই, নশো থেকে বারোশো ফুট নীচে জল, কোথাও কোথাও অতখানি পাইপ নামিয়েও লোনা জল উঠে আসে, আবার কোথাও এত মিষ্টি জল যে তা শুনে স্ত্রানীজন লিখবেন প্রাচীনকালে এসব জায়গায় মিঠে নদীর প্রবাহ ছিল। ভ্রমণকারী যদি এখানে সেখানে এ-গ্রামে সে-গ্রামে নামেন ত দেখতে পাবেন এখানকার জনসাধারণের বেশির ভাগই তপশীলী হিন্দু কিংবা তপশীলী উপজাতি, মুসলমান আছে, কিছু খৃস্টানও আছে। নিম্ন বাংলার সেই সব মাছ-থেকে অন-আর্ঘ্য বাঙালীর উত্তর পুরুষই হয়ত এরা সব, সমগ্র বাংলায় কিংবা ভারতের জনপদে যারা জল-অচল বলেই পরিগণিত ছিল। সেই তপশীলী হিন্দুই গাজী সম্প্রদায়ের দৌলতে হয়ত কিছু কিছু ইসলাম গ্রহণ করেছিল তা ভ্রমণকারী বুঝবে এখানকার কিংবদন্তিতে, এখানকার ইতি কথায়। ভ্রমণকারী কৃষ্ণকায় উপজাতিদের দেখে চমকে উঠবে—সব উরীও, মুণ্ডা, ভূমিজশ্রেণীর লোক, ছোটনাগপুর থেকে যাদের পূর্বপুরুষ এসেছিল বাঙ্গায় জঙ্গল হাসিল করতে পঞ্চাশ থেকে একশো বছর আগে। স্থানীয় কোন কোন মিশনারি সংস্থার প্রচেষ্টায় কেউ কেউ যে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে

ভ্রমণকারী তাও বুঝতে পারবে। আর একটু খোঁজ করলেই দেখা যাবে কলিকাতার অনেক ধনীরাই জমিদারি বলতে হুম্মরবনের ‘লট’ বা ‘লাটের জমি’ বোঝায়, অনেক জায়গায় মেদিনীপুরের লোকের জমিজমা দেখে মনে হবে হুম্মরবন যদিও চব্বিশপরগণার দক্ষিণাংশ তবু এটা মূলত মেদিনীপুরের উপনিবেশ। ভ্রমণকারী হয়ত জোয়ারের সময় নৌকো থেকে পাড়ে নেমেছিল তখন নদীকে মনে হচ্ছিল বিরাট, বিস্তৃত, ঘণ্টা কয়েক পরে গ্রামের ভেতর দিক থেকে ফিরে এসে ভ্রমণকারী বিস্মিত হয়ে যাবে—ভাঁটা পড়ে গেছে নদীতে, নদী এখন শীর্ণ, জল এবং জলের ওপর ভ্রমণকারীর নৌকো অনেক নীচে। ভ্রমণকারীকে তখন একহাঁটু কান্না ভেঙ্গে নৌকোর গিয়ে উঠতে হবে, কিংবা মারি যদি বুদ্ধিমান হয় তবে সে নৌকেটা ওপরদিকেই বেঁধে রাখবে—ভাঁটা হলে কী এসে যায়, গ্রামের হুঁচারজন উৎসাহী সন্তান কিছু অশিক্ষিত লোক (এবং তারা দুর্ভাগ্য নর) নৌকেটাকে কান্নার ওপর দিয়ে ঠেলে নদীতে পাঠিয়ে দেবে—মাঝিও কায়দামাফিক বৈঠা চালিয়ে গতির সামাল দেবে। সজনেখালি বার্ড আংচুয়ারিতে পৌঁছে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে নীচে-অরণ্যভ্রমের মধ্যে মধ্যে পাখির বাসা দেখতে পাওয়া যাবে। ঋতুবিশেষে পাখি আসে, অস্ট্রেলীয় ফ্রেন, ক্যানারি, দিশী শামখোর আরো কত পাখি। বড় নদী থেকে ছোট একটি খাড়ি বনের মধ্যে দিয়ে আরো ছুটি সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাবে ভ্রমণকারীকে—কিন্তু বড় ভয় করবে যখন মাঝি বলবে বাঘগুলো পাখির বাসার নীচে বলে থাকে, বাচ্চা পড়ে গেলেই টপাটপ, আর কলকাতার মানুষ গেলে ত কথাই নেই। ভারতীয় টুরিস্ট সংস্থা যখন অস্তিত্ব অনেক বার্ড ও গেম আংচুয়ারির বিস্তারিত দেন, তখন এটার কথাই বা লেখেন না কেন একথাও ভ্রমণকারীর মনে হতে পারে। সবচেয়ে বেশি আচ্ছন্ন করবে এখানকার নির্জনতা; কোথাও কোথাও নদীর পাড়ে লেগে ছলাংছল শব্দ,

কিংবা সম্ভব হলে খুব দূর থেকে হরিণের একটা অদ্ভুত 'মাও, মাও' রব, বনে উৎসর্গকরা কোন গৃহপালিত যোরগের বস্ত্রকুটের রূপান্তরে আর্তস্বর, পাশদিয়ে ডাকাতে মত চলে-যাওয়া জেলে নৌকোর থিরথির শব্দ, এবং জলের বুকে এক আকাশ তারার ঝিকমিক সমস্ত মিলিয়ে সেই নির্জনতাকে আরো নিবিড় করে তুলবে। মাঝে মাঝে নদীর মাঝখানে বিরাট দৈত্যের মত হাজারমণী নৌকো দেখলে অবাক লাগবে, এইগুলিতেই কলকাতার পথে হাজার হাজার মণ খড় চালান হয়ে যায়। তাছাড়া পুর্বাতাত্ত্বিক কিছু কিছু গল্পও শোনা যাবে বৈকি! বনের মধ্যে কোথায় যেন মিঠেজলের পুকুর আর তার চারপাশে বাঁধানো ঘাট এবং ঘাট পর্যন্ত বকুলবাঁধি আছে। অনেকদিন আগে হয়ত সেখানে লোকের বসবাস ছিল। এত গেল বনের ভেতরের কথা। বাইরেও অনেক জায়গায় নদীর পাড়ে কিংবা গ্রামের ভেতরে ইটপোড়ামতন পাকা জায়গা দেখা যাবে, তারই আশেপাশে দেখা যাবে মাটির লম্বা লম্বা চোড়ার মতন গেলাস।

এইখানেই হয়ত উনুন জালিয়ে লোনা জল থেকে মুন তৈরি হত একথা ভ্রমণকারী বুঝতে পারবে। তা ছাড়া রায়দিঘির

কাছে প্রাচীন সেই 'জটার দেউল' নামের হৃদীর্ঘ দেউলটিও দেখবার জিনিস বটে! এত' গেল স্মরণরনের উত্তর ও মধ্যখানের কথা। দক্ষিণে ফ্রেজারগঞ্জ কিংবা বকখালির সমুদ্রতীর ও বাগিয়াড়ি বিশেষ দ্রষ্টব্য; সাগরতীরও রয়েছে, দক্ষিণ সাগরে বাগির প্রান্তরে কপিলমুনির মন্দিরের কথা ত সারা ভারতের লোকই জানে, তাবা কিন্তু যে দেবীটিকে জানে না সেই গ্রাম্যদেবী বনবিবিকে ভ্রমণকারী স্মরণরনের এখানে সেখানে দেখতে পাবে, তার পূজার মন্ত্র জানবার দরকার করে না, তাকে হিন্দুও পূজা করে, মুসলমানও পূজা করে, কোথাও তার মূর্তি আছে, কোথাও মাটির টিপিই তার প্রতীক। কোথাও কোথাও সরকারী ডাকবাংলো আছে বটে, কিন্তু ভ্রমণকারীর মনে হতে পারে এখানে দিনকয়েক কাটানোর জন্য জায়গায় জায়গায় 'টুরিস্ট হাট' কিংবা 'টুরিস্ট ক্যাম্প' থাকলে বেশ হত। ক্যানিং-এ প্রাশাদোপম সরকারী ষে-বাড়িগুলিতে আফিস রয়েছে, ভ্রমণকারীর মনে হতে পারে এগুলি 'টুরিস্ট লজে' রূপান্তরিত হলে বেশ হত। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন দল বেঁধে লঞ্চ ভাড়া করে বেড়ালেই দ্রুত এত দীর্ঘ ভ্রমণের সুবিধা।

প্রতিমা : বিজয় কুমার দত্ত

বুকের ক্যানভাসে আঁকা দীক্ষারী প্রতিমা

ক্রমশঃ হৃদয় শ্রোতে বারংবার আজ

বিসর্জিত হ'তে থাকে । অসম্পূর্ণ নীরাজনে বেলা পড়ে যায়

আরতি প্রদীপ নেভে অসময়ে রহস্য সন্ধ্যায়—

অন্ধকার নীল হ'য়ে জলে ওঠে শারীর নিয়মে ।

বাজার গঞ্জের সামনে প্রতিদিন শব্দ ওঠে,

পথে পথে মিছিলের ধ্বনি,

কেন এতকাল, সমস্ত চুরমার করে ভাঙনের গান

নিরন্তর আমাকে শোনাতে চায় ? নারী যদি প্রতিমা প্রতীক

রক্তের সংলাপে তবে কোন প্রশ্নের

অনির্বাণ অঞ্জলির মস্তুর সজীত ?

মন্দিরে মন্দিরে আর প্রার্থনার ধ্বনি কই জাগে ?

শব্দধ্বনি কেন যে বাজেনা সাক্ষ্য বাতাসে বাতাসে ।

আমি প্রশ্ন করার ছলে ধমকে দাঁড়িয়ে বাই,

চেয়ে দেখি বেদীর আসনে—

সমস্ত জীবন ভোর বত নারী হৃদয়ে আমার

আলো হ'য়ে জলেছিল, তারা

স্পর্শের দূরত্বে, স্থির অনায়ত্ত লোকে

সারি সারি পাথরের সজ্জিত প্রতিমা ।

রাজসাক্ষী : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

গ্রীবায ছিল পর্ব ; ছিল শব্দ হয়ে ওঠা

বুকে লুকানো সাগর ; যেন ফুঁ দেবদাজই

সাগর তার শরীরে এসে বেড়িয়ে যাবে ; হুহু

বাতাস চুল, শাড়ীতে, ক্রমে বয়স থেকে ভারী

মেঘ জমাবে ; আমি বৃষ্টি এলে জানালান্তলি

ভেজিয়ে দেবে । আর জানলা, আজো জানলা মানেই একা

কোন মানুষ তার নিজের কাছে দাঁড়িয়ে—দূর

গাছের মতো শামল সব অভিবাদন কেন

পাখীর সারীদেহের টানে প্রগাঢ় যুম

হয়ে উঠছে তার, অর্থ দর্শকের দায়

লক্ষ করে জিপিবদ্ধ করতে থাকা । শুধু

নিজের কোনো ব্যক্তিগত অন্ধকার যাতে

ভারা হয়েও জলে না ওঠে সেটুকু ভালভাবে

লক্ষ্য রেখে । কেননা কোনো অপরিসীম আলো,

আকাশহীন প্রয়োজনের বর্ণনায় মৌল

আদালতের সমান এক বিচারসভা হয়ে

ওঠে ; যেখানে গ্রীবার ভুল ধরিয়ে দিতে উকিল, জজ, সব

সবই ওই আকাশ, নীল সাগর, গাছ, যারা

রাজসাক্ষী হয়ে কবির প্রাণদণ্ড চায় ।

ক্রমশ : বিনাশের দিকে : নটিকেতা ভরদ্বাজ

আমাদের সকলের কণ্ঠে আজ একই কণ্ঠস্বর ।

কারণ আমরা আজ মোহানার দ্রুত সন্নিহিত

এসে গেছি । ঝাঁপ দিতে বিনাশের অনিশ্চয়তায়

সমবেত । আমাদের দিন রাত্রি কর্মের মর্মের উত্তর

একই দিনসিপি-ব্যাণ্ড : পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়

একই কথা উচ্চারিত—, বিনাশ ধ্বংসের

সম্মিলিত দ্রুত কোরাসের

অঙ্ককারে আন্দোলিত । আমরা জানি আজ জীবনের

কোন বড় অর্থ আর বেঁচে নেই,

বিবিস্তর আমরা এখানে

সমবেত— মৃত্যু নিয়ে খেলিতেছি সহজ সম্মানে ।

কারণ, আমরা জানি জীবনের কোনো আশা নেই ।

জেনে গেছি— শেষ অঙ্কে এ পথ দিয়েই

যেতে হবে আমাদের । জেনে গেছি স্ব নিরাময়,

জলের সমস্ত শিল্প, দ্রুত বালুকায়

ঢেকে যাচ্ছে । অবশিষ্ট কোথাও বিষয়

কিছু নেই । পরিচিত সমস্ত ছায়ায়

বিষবাস্প সংক্রমিত । আমরা তাই বুকের রুধিরে—

এ ভীষণ দাবদাহে— মিটাতেছি করুণ তৃষ্ণার

শেষতম আর্তনাদ । কোথা কোনো আলোক, বিশ্বাস

আজ আর বেঁচে নেই । পার তলে তুমি নেই তাই

ধীরে ধীরে

ডুবিতেছি : ক্রমশ : আসন্ন তাই মৃত্যুর বিস্তার

স্পষ্টতর দেখে আমরা সমবেত, সহস্র উল্লাস-

কোলহলে যেতে আছি । সকলেই পানপাত্র নিয়ে

উদ্দাম : তাই কবি কর্মী, শিল্পী—সবার স্বরের—

জন্তুরালে অঙ্ককারা দ্রুত ঝাঁপতালে

বাজাতেছি-জ্বালাতেছি নিজেদের ; তিলে তিলে অবক্ষয়ের

অন্তরালে ডুবিতেছি । সব গৃহ জড়-গৃহের

ভয়াবহ নিস্তরুতা নিয়ে জেগে আছে

অস্তিত্ব আয়েম আশ্বাসে ॥

অস্তিত্ব : আলোক নাথ মজুমদার

কোনো কোনো দিন মনে হয়

রাত্রির প্রহর গুলি কী যেন রহস্তে ঘেরা,

মনে পড়ে নিস্তরু বনের বৃকে দেখেছি তো আলোর নিষ্কার ;

রূপোলী মমতা তার

ঝরে পড়ে লতায় পাতায় ;

সেখানে নির্জন অঙ্ককার,

আলোর কুহকে কাঁপে প্রপাতের স্বর ।

এখানে শহর প্রান্তে আলো বীধি চলে গেছে

জোনাকীরা জলে আর নেভে সজী খেতে ;

আলোর অশেষ নদী যেন এঁকে বঁকে

হাতছানি ছায়

ছন্ডিস্তায় পথে যেতে যেতে

হঠাৎ সকল আলো নিভে যায় ।

চারিদিকে গাঢ় অঙ্ককার ।

কখনো বা নিস্তরু প্রহরগুলি শুধু রাত জাগার,

বিষম-করুণ কান্না বুকের ভেতর,

ব্যর্থতা জীবনে প্রেমে একাকার

ঘিরে অক্টোপাসের মতন ।

ফসলের স্বপ্নছিল মনে, অথচ খরায়

কি শেল হেনেছে বুকে, আলোহীন দেখি চারিদিক ।

আশানের মতো রাত্রি প্রহর জাগায়;

তবু স্বপ্ন জোনাকীর উড়ে বসে লতায় পাতায় ।

জন্ম

মাটি

মন

ম হী তো য বি খা স

৭১

“অ বউ—বউরে—! ক’নে গেলি—অ বউ—! কঁাতাখান
এটু বদলায়ে দে না!”

ভোর থেকে ট্যা-ট্যা করে চলেছে বলরামের পিসী।
ঐ এক কাপ হয়েছো আঁকাল। ভালো করে নড়তে
চড়তে পারে না। খাওয়া-শোওয়া সব এক জায়গাতেই।
মাঝে মাঝে বেঘোরে হয়ত কাপড়-চোপড় নষ্ট ক’রে পড়ে
থাকে। কাণের ফাঁকে ফাঁকে স্বাসীকে এসে পরিস্কার
করতে হয়। শরীর অচল হলে হবে কি! মুখটা এখনো
পড়েনি বুড়ীর। বায়নাঙ্কার শেষ নেই। একটা শেষ হলো
তো আর একটা ধরবে। সারাদিন ট্যা-ট্যা করেই চলেছে।

সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে কাঁধাকাপড় নষ্ট করে
হয়ত পড়ে আছে। কাজকর্ম সেরে স্বাসী এখনো এদিকে
আসবার ফুরসৎ পায়নি। বুড়ীর ধারণা—কেউ তাকে
দেখেনা। ওর অচল অবস্থা বলে সবাই ওকে ঘেন্না করে।

স্বাসীকে খানিকক্ষণ ডেকে ডেকে হয়রাণ হ’ল বুড়ী।
একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জ্বর করল। “আমারে
তোরা এটু দেখলি নারে—। এতো অহংকার তোগের
থাকবে না। ভগোমান মাথার পরে আছে। ভগোমান,
তুই দেখিল। আমারে ওরা এটু ছাখলো নারে—।

জ্যৈষ্ঠ ৫

ভগোমান, তুই এর পিতিবিধেন করিল। আমার চাইতে
দশগুনো শাস্তি ওগের দিল।—ভালো হবে নারে। আমারে
তোরা এটু দেখলি না। তোগের ভালো হবে না। আমার
মতন জলে জলে মরতি হবে তোগেরও। ছুনেদারীর সগোলে
তোরা জ্বলে পুরে মরবিরে—”

বারান্দায় চুপ চাপ বসেছিল বলরাম। হঠাৎ যেন
মাথায় ওর আঙুন চ’ড়ে গেল। তড়াক করে নেমে এসে
দাড়াশো একেবারে পিসী-বুড়ীর মাথার কাছে। মাথাটা
ধরে জোরে একটা কাঁকানি দিয়ে বললো—“তুই থামবি
কি না ক’ দেহি বুড়ী? তোর ভ্যাদ-ভ্যাদানির কিছু না
বুলে? কি হইছেডা কি তোর?”

বলরামের এমন মারমুখো চেহারা কোনোদিন দেখেনি
বুড়ী। ভয় পেয়ে কেমন যেন চুপসে গেল। গুটিহটি মেরে
পড়ে থাকল। ট্যাচামেচি শুনে ছুটে এলো স্বাসী।
বলরামকে আন্তে আন্তে সরিয়ে দিয়ে বললে—“তুমি যাওতো।
ঐদিগি যাও। তোমার কাজকম্মো জাহোগে। এসব নিয়ে
তোমার ভাবতি হবে না।”

বলরাম একবার কটমট করে তাকিয়ে সরে গেল।
স্বাসী বুড়ীর কাঁধাকাপড় সব পরিস্কার করে দিল। পরনের
কাপড় পালটে আর একখানা কাপড় পড়িয়ে দিল। বুড়ীর



সকালের খাবার এনে বিছানার পাশে রাখল। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, বুড়ীর তোবড়ানো গাল দুটো জলে ভেসে যাচ্ছে।

স্বাসীর মনটায় বড়ো খা লাগল। বুড়ীর মাথার কাছে বসে মাথায় একখানা হাত রাখল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—“তুমি কান্দে না মা। ওর কথা মনে ধরে রাইছে না। গৌয়ার-গোবিন্দ মানুষ। কি ক’তি কি কম তার ঠিক নেই।”

কেন্তী বুড়ী ছুঁহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল স্বাসী হাতখানা। কেমন যেন একটা গোড়ানো গলায় বলে—“এতো ভগোমান্নে ডাক্তিতি, তা জেবোন-ডা যে যায় নারে বউ।”

স্বাসীর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। আন্তে আন্তে বুড়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

বুড়ী বলতে থাকে—“আমার কথায় তোরা ভয় পাসনে বউ। ওতে ভোগের কোনো অমঙ্গল হবে না এতো যে ভাবি, ওসব কুকথাস্তলোন কবো না। তউ ক্যান্ যে গোড়ামুখ দিয়ে বারোয়ে যায়।

স্বাসী বুড়ীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—“তুমি ওর কথা ধরে না মা। ওর মনটা আজকে ভালো নেই। হাজরা-সন্দেশী হয়ে কাল হাজরাতলায় ভোগ দিতি গিলো। তা সেই ভোগের হাঁড়ি মাটিতে প’ড়ে ভাঙে গেছে।”

বুড়ী এক নিমেষে নিজের সমস্ত দুঃখস্বপ্নার কথা ভুলে গেল। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। স্বাসীর হাতখানা জোরে চেপে ধরে বলল—কি অমুকুনে কথাডা কলিরে বউ। এমন কথা যে বাপের জন্মে শুনিনি কোনোদিন। ওরে আমার কি হবে রে—”

বুড়ী আবার চীৎকার করতে শুরু করল। স্বাসী তাড়াতাড়ি বুড়ীর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল—“চুপ হও মা, চুপ হও। স্তনতি পালি আবার অনধ বাধাবেনে।”

কাঁদ হল কথটাইয়। চুপ করে গেল বুড়ী।

এ-ঘরের বারান্দায় এসে শুন্ হুয়ে বসে রইল বলরাম। একটা হাচণ্ড দাপানীতে মনটা গোমরাচ্ছে। রাগে না হুখে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

একটু বাধেই এলো বংশী। বলরামের ধমুখে মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা বলতে সাহস পেল না। বারান্দায় এক কোণে হুকো, তামাক আর আগুনের মালুসা রয়েছে। উঠে গিয়ে নিজেই হুকোটা সেজে নিয়ে এলো। বলরামের পাশে বসে চুপচাপ টানল খানিকক্ষণ। তারপর বলরামের দিকে হুকোটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—“নে, খা-”

বলরাম হুকোটা বা হাত দিয়ে সরিয়ে দিল। কটমট করে একবার তাকাল। তারপর বলল—“আমার খাওয়া লাগবে না। তুই টান যতো পারিস।”

বংশীর যেন এসব কথায় কিছু আসে যায় না। নির্বিকার-ভাবে আরো কয়েকটা টান দিল হুকোটার। তারপর হুকোটাকে বেড়ার গায়ে বাধিয়ে রাখতে রাখতে বলল—

—“না খাবি—না খাবি। তা অতো গুমোর ক্যান ? এটা কথা তো ক’বি শুনি। হইছে ডা কি তোর।”

বলরামের গলাটা যেন কে’টে পড়ে—

“কি হবেডা কি ? হবেডা কি আর ? কিছু হইনি, তুই বাড়ী যা। ব্যাহান-ব্যালায় আর জালান্লে আমারে।”

বংশী শান্ত গলায় জবাব দেয়—“সে না হয় জালালাম না। কিন্তুক পুজোর কাজকন্ডোডার কি করতিহিস ? আজকের দিনডা তো কোনোভাবে চালাতি হবে।”

“আমি জানিনা কিছু। আমারে কিছু ক’তি আসিস না আর।”—তেমনি করে ফেটে পড়া গলায় জবাব দেয় বলরাম।

বংশী অবাক হয়। বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—“তুই জানিসনে মানে ? তুই জানিসনে তো জানবেডা কেডা আর ?”

—“ডা আমি জানিনে।”—এক কথায় জবাব দিয়ে চুপ

করে গেল বলরাম।

বংশী একবার যেন একটু রাগল। গলাটা একটু চড়িয়ে বলে—“তাখ বলা, তোর পাগলামীডা রাখ এ-সোমায়। এসব ঠাউর-দেবতার কাজকন্ডা নিয়ে ছ্যাবশ্যমী ভালো ছাহায় না। কিছু ভানবি নে তো গোড়ায় ভার নিলি ক্যানো? ঠাউর-দেবতার কাজ অদ্ভুত করে ফেলে রাখলি তার ফল ভালো হয় নারে। এ হলোগে ঘরের মড়া। টা'নে ঘরের বা'রি ফেলবি তো ফেলবি। না ফেলবি তো তোর ঘরেই গোলন্দা হবে।”

বংশীর কথাগুলো শুনল বলরাম। কি যেন ভাবল একটুকণ। তারপর গলা নামিয়ে বলল—“নকুল কাকা ক'নে? পুজো খোলায় আইছে নাকি?”

বংশী বলে—“বুড়োর কথা বাদ দে। বুড়ো আর কয় দিনি বিচ্ছেন ছাড়ে ছাখ!”

—“ক্যান, নকুল কাকার আবার কি হলো?”—উৎসুক গলায় জিজ্ঞাসা করে বলরাম।

বংশী মুখ ভার করে বলে—“কাল বুড়ো মানুষটার বড়ো দু'গগতি গেছেরে। হাজরাতলার ভোগ ফেলে সগোলে তো পলালি কাল। তোণের পলাতি দেইছে বুড়োও দৌড় মারে। কিন্তুকি কি যে হলো কেডা জানে। খানিকদূর আসেই বুড়ো কি এটায় গু'তো নাগে ছমড়ি খাইয়ে পড়ে যায়। হাঁটুতি নাকি বেজায় চোট নাগিল। তা রাত্তিরি আর বেশী কিছু টার পায়নি। খোঁড়াতি খোঁড়াতি বাড়ী যাইয়ে শুয়ে ছেলো। ব্যাহান ব্যালায় ভো ঠাং ফুলে গোদা হইছে। নড়ার সাখি নেই।”

শুধু হয়ে বলরাম শুনল বংশীর কথাগুলো। কোনো জবাব দিল না। বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে সন্দেহ হল বংশীর। লক্ষণ তো ভালো দেখা যাচ্ছে না। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস পেলো না বংশী। যে মানুষ। বেকাস কিছু জিজ্ঞাসা

করলে এখনি হয়ত রেগে-মেগে মারতে আসবে।

বংশী এবার উঠল। যেতে যেতে বলে—“তুই তা'লি তাড়াতাড়ি আস। আমি ওদিগির যোগাড়-যন্তর দেহি গে। আর এটা দিন তো যোটে। একভাবে চালায়ে নে।”

বংশীর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল খানিকক্ষণ বলরাম। মনটা তার এমনভেই ভালো নেই। নকুল বালার পা ভাঙার কথা শুনে দুশ্চিন্তাটা আরো বাড়ল। কাল হাজরা-তলা থেকে পাগিয়ে এসে সোজা বাড়ী চলে এসেছিল বলরাম। লজ্জায় সঙ্কোচে কারো কাছে আর মুখ দেখাতে ভালো লাগেনি। কিন্তু সেই সারারাত ঘরেই ভেবে চলেছে। কাল সন্ধ্যায় কাঁটা-সন্ধ্যাসীপের গায়ে কাঁটা বিঁধেছে। ওরা নাহয় বোকা গেল—নতুন সন্ধ্যাসী হয়েছে। খেজুর গাছের মাখায় অদাবধানে এলোমেলো পা চালাতে গিয়ে গায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে বসে আছে। বিস্ক বলরাম? বলরাম নিজে? সে তো আর নতুন হাজরা-সন্ধ্যাসী হয়নি! তাহলে কেন সে কালরাতে হাজরাতলায় গিয়ে অমন কেলেকারীটা করে বলল?

এখন ভাবতে গিয়ে তলিয়ে দেখল বলরাম, ব্যাপারটা কিছুই নয়। হাজরাতলায় পাল-কে পাল শিয়াল থাকে। তারই কয়েকটা ডেকে উঠেছিল। অমন তো হামেশাই ডাকে। ওতে ভয় পাবার কি আছে? আর ঠিক সেই সময়টাতে এক স্বলক এলোমোলা হাওয়া এসেছিল। তাতেও-ভয় পাবার কিছু নেই। এখন চোত-বোশেখের সময়। ও রকম হাওয়া তো বইবেই। ওতেও ভয় পাবার কিছু ছিলনা।

ভয়টা কি তাহলে বাইরে নয়? ভয়টা তার মনের ভিতরেই? ভাববার চেষ্টা করল বলরাম। হাজরা-সন্ধ্যাসীর পবিজ দায়িত্ব নিয়ে পদ্মর নথ শরীরটার দিকে তাকিয়েছিল সে। মনে তার লোভ জেগেছিল। সেই লোভে তার মন চঞ্চল হয়েছিল। আর চঞ্চলতাই তো পাপ। চঞ্চল

মন নিয়ে গুরুদায়িত্বের কাজ করতে যাওয়ার মন বড়ো পাপ আর আছে কি? বলরাম সেই পাপ করেছে। সে পাপের যে শাস্তি, বলরাম তা মাথা পেতে নেবে। কিন্তু নকুল বাবা কেন তার পাপের গুনগার দিতে যাবে? বিনাদোষে বড়ো মাচুষটার এতোবড়ো শাস্তিটাকে বলরাম সহজে মেনে নিতে পারল না। এই মুহূর্তে বলরামের ভীষণ রাগ হল পদ্মর পরে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপরেও। কিন্তু যতই রাগ হোক, একটা কথা আজ বলরামের কাছে বড়ো স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। পদ্মর পরে টানটাকে এখনো সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ভেবেছিল ভুলতে পেরেছে পদ্মকে। সংসারের আর পাঁচ কথার মধ্যে বোধহয় হারিয়ে গেছে পদ্মর কথাটা। কিন্তু ভোলা যে অতো সহজ নয়, আজ তা বড়ো নির্মমভাবে বুঝতে পারল। পদ্মর প্রতি ভালবাসাটাকে এতোদিন সে ছাইচাপা দিয়ে ঢেকে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু কালকের এক মুহূর্তের দুর্বলতার হাওয়া লেগে সব ছাইটুকু উড়ে গেছে। নিলাজ, বেহায়া ভাবে আগল সত্যটা বেরিয়ে পড়েছে। পদ্মর সেই উদ্দল শরীরটার কথা যতই মনে পড়ছে, মনে ততই যেন একটা শিহরণ খেলে যাচ্ছে শরীরে-মনে। এক নিমেষের সেই সময়টুকুকে একটা যুগ বলে বোধ হচ্ছে।

বিকেলের সেই দৃশ্যটাকে আর একবার ভাবতে চেষ্টা করল বলরাম। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মর বলা কথাগুলোও মনে পড়ল। তাহলে পদ্মও কি তাকে আজও ভুলতে পারেনি? তা যদি না হবে তাহলে বলরামের ঐ পালিয়ে যাওয়াটা পদ্মর চোখে ত্রুণ করে ধরা পড়বে কেন? বলরাম পালিয়ে বেড়ায় পদ্মর নিকট থেকে। পদ্ম তা বুঝতে পেরেছে। পদ্ম কি তাহলে আজও ধরা দিতে চায়? ভাবনাটুকু বলরামকে যেন পাগল করে দিল। সমস্ত পাপবোধ আর মানির মধ্যেও এক অপূর্ব স্বাদে, রসে, রোমাঞ্চে বলরামের দেহমন ভরে উঠল।

পিছন ফিরে তাকাতেই বলরাম দেখতে পেলো, নারায়ণকে

কোলে নিয়ে স্বাসী এদিকে আসছে। কাছে এসে নারায়ণকে নামিয়ে দিল কোল থেকে। ছেলেটা ছুটে এসে বাপের কোলে উঠল। স্বাসী বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—“তোমারে বোংশে-ঠাউরপো ভাড়াভাড়ি যাতি কইরে গ্যালো।”

বলরাম স্বাসীর দিকে তাবিয়ে জিজ্ঞাসা করে—“বংশে আবার আইলো নাকি?”

স্বাসী জবাব দিল—“ঐ তো বাড়ীর নচে দিয়ে গেল। আমারে কইরে গ্যালো ভাড়াভাড়ি তোমাকে পাঠিয়ে দিতি।”

একটুকাল চুপ করে থেকে স্বাসী আন্তে আন্তে আবার বলে—“তোমার মনডায় কি হইছে কও দেহি? বোংশে ঠাউরপোও ক’য়ে গেল, তোমার মনডা নাকি ভালো নেই।”

একটুখানি হাসবার চেষ্টা করল বলরাম। ছেলেটাকে আদর করতে করতে বলে—“কি যে কও তুমি। মন খারাপের আবার দেখলে কি? ঐ হাজরাতলার ভোগের কথা ভাব’বেই মনডা একটু ক্যামোন করতিলো।”

ঠাণ্ডা গলায় বলে স্বাসী—“কিছু না হগিই ভালো। কি জানি কি হয়। তোমার মনডার কথা ভাবলি আমার যানো বড়ো ভয় লাগে। মুখখানা ক্যামোন ভার করে বসে থাকো।”

আর কিছু বলে না স্বাসী। কি-ই বা আর বলার আছে। পুরুষ মানুষ। সংসারের পাঁচটা ঝই-ঝকির ঝামেলা পোয়াতে হয়। কতো রকম ভাবনা চিন্তা তার মাথায়। কথায় কথায় ঘরের মেয়েমানুষের সে ভাবনা-চিন্তার হিসেব নিতে গেলে ভালো দেখায় না। আর অতো খুঁত ধরে চলতে গেলে সংসারটাও যে অচল হ’বে দাঁড়ায়।

নারায়ণকে নিয়ে স্বাসী নিজের কাজে চলে গেল।

বলরাম বুঝতে পারল, তার মনের আধাস্তরটুকু স্বাসীর চোখ এড়ায়নি। এমনিতে মানুষটা বড়ো হাবাগোবা। শাস্তিশিষ্ট। সাত পাঁচ কোনো কিছুতে থাকে না। সারা

দিনরাত বলরাম আর তার সংসারের সেবা করেই তার সব সুখ। কিন্তু স্ববাসীর চোখ ছুটোর মধ্যে কি যেন আছে। কেমন করে যেন তাকায়। আর ওর ঐ শান্ত, সরল চোখ-ছুটো দিয়ে যেন বলরামের সমস্ত অন্তঃকল্যাণ পরিষ্কার দেখতে পায়। বলরামের মনের কোনো কিছুই যেন ওর অজানা নেই। কদিন দেখেছে বলরাম, কোনো একটা জিনিষ হয়ত তার দরকার। মুখ ফুটে স্ববাসীর কাছে চায়ওনি। কিন্তু স্ববাসী বলরামের মূলেওদিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছে, কোন জিনিষটা তার দরকার। নিঃশব্দে সে জিনিষটা তার পাশে এনে রেখে গেছে। ওর বাবা স্বখলালের চোখ ছুটোও ছিল যেন ঐ রকম। চোখের দৃষ্টি দিয়ে মনের সব কথাগুলো যেন নিঃশব্দে জেনে নিতে পারত।

স্ববাসীর কাছে বলরামের চাকা-চাপার কোনো-কথাও নেই। সংসারের কাজকর্ম, ভালোমন্দ, নিজের ভাবনা-অমুভূতির সব কথাই জানায় বলরাম স্ববাসীকে। স্ববাসী শোনে। মন দিয়ে শোনে সব কথা। সামান্য ছ একটা ছাড়া কোনো মন্তব্য করে না। নিজের নীরবতার ভালবাসা দিয়ে স্ববাসীর সব কথাকে নিজের কথা বলে আপন করে নেয়। সব কথাই জানাতে পারে বলরাম স্ববাসীকে। তার মনের পাপপুণ্য ভাবনা-অমুভূতি কোনো কিছুই স্ববাসীকে জানাতে তার সঙ্কোচ নেই। কিন্তু কাল বিকেলের ঐ পাপের কথাটুকুকে বলরাম কেমন করে জানাবে স্ববাসীকে! সব কথা বলা যায়। কিন্তু মনের ঐ পাপটার কথা বলা যায় না ওকে। বলরাম আর পদ্মর জীবনের ঘটনাগুলো অল্পবিস্তর জানে স্ববাসী। তবে তা নিয়ে কোনোদিন কোনো কথা বলেনি স্ববাসী। তাছাড়া সে তো অনেক দিনের কথা হয়ে গেল। সকলেরই মন থেকে তা গুয়ে মুছে গেছে। কিন্তু আজ এতোদিন বাদে যদি নতুন করে কোনো কথা ওঠে, তাহলে কি ভাববে স্ববাসী? কি বলবে সে? হয়ত কিছুই ভাববে না। কিছুই বলবে না।

ওর ঐ শান্ত সরল চোখ ছুটো নিয়ে অসহায়ের মতন তাকিয়ে থাকবে বলরামের দিকে। সে দৃষ্টির সামনে বলরাম কি ভাবে দাঁড় করাবে নিজেকে? ওর ঐ নীরব চোখ ছুটো বলরামকে প্রশ্ন করবে—কেন তুমি এমন করলে! কি পাওনি তুমি আমার কাছে? আমার সব তো তোমাকে দিয়েছি। আমার ভক্তি ভালবাসা সব যে তোমাকে উজার করে দিয়েছি। তবু কেন তুমি আমাকে ঠকালে! কেন আমাকে বঞ্চনা করলে!—সে নীরব প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলার থাকবে না বলরামের।

একটা আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল বলরাম। চূপ করে বসে থাকলে চলবে না। যেমন করে হোক আজকের দিনের পুজোর কাজটা চালিয়ে নিতে হবে।

পুজোর কাজ অবশ্য আর বেশী কিছু বাকী নেই। এখনকার কাজগুলো সব আমোদ-আহ্লাদের কাজ। আমোদটা অবশ্য এবার আর ভেমন জমজ না। কিন্তু কাজ কর্মের বাদ থাকল না কোনোটা। দুপুর-বেলায় কেউদের বাড়ীর নীচে বটতলায় কাপা দিয়ে প্রকাণ্ড শিবের মূর্তি তৈরী করা হল। গ্রামের বউ-কি-রা এসে কলসী কলসী জল ঢালল শিবের মাথায়। তলে কাপায় জায়গাটা ছয়লাপ হয়ে গেল। পুরুষ ছেলেগুলো এসে কাপাটি খেলল। তারপর সকলে গিয়ে পুকুরে স্নান করল। সারা দুপুর জুড়ে আঙুন-সন্নাস, পাট-চালা—এমনি নানান ধরণের ক্রিয়াকলাপ চলল। সন্ন্যাসীদের ভোগ রান্না হল।

বিকেল বেলায় আড়ং। অর্ধাং মেলা। আড়ং বসল হাতিনাড়া গ্রামের শেষে মাথার বড় ভাগাড়টায়। অনেকখানি পতিত জায়গা জুড়ে বড়ো একটা গোচর মাঠ। কাঠুখালির বিলের সব গাঁয়ের থেকে মানুষ এসে মিলিত হয় এখানে। নানারকমের দোকান পাট বসল। অনেক রাত পর্যন্ত মেলাটা শরগরম হয়ে থাকল কাঠুখালির বিলের গ্রাম-গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষ আর ছেলে-ছোকড়াদের ভীড়ে।

পূজো-আচার দিন কটা যেতেই কাজের চাপ পড়ে গেল। বোশেখ মাসের কদিন হতে না হতেই কালবোশেখীর মেঘ উঠল। আর সঙ্গে নামল বিষ্টি। সে কি কানমাথা ছেঁড়া বিষ্টি। এতোদিনের খুক্‌নু জ্বলা খটখটে ক্ষেতগুলো ভিজে একেবারে হাপুল হয়ে উঠল। কাঠুখালির বিলের সব গ্রামগুলোতে সাড়া পড়ে গেল। খেয়ে না খেয়ে সব চাষের কাজ শুরু করে দিল। কোনো জমিতে আপাততঃ শুধু চাষ দিয়ে রাখল। আবার কোনো জমিতে চষা এবং বোনা—ছুটেই আরম্ভ করে দিল।

বলরামেরও কাজের বিরাম নেই। উদ্যান্ত সমানে খেটে চলেছে। এতোখানি জমি। সময়মতন চাষ দিয়ে ওঠা চারটিখানি কথা নয়। এ-সময় লোকজন পাওয়াও মুশকিল। যে যার জমির কাজে ব্যস্ত। যাদের জমি কম, তারাও অন্তের জমি ভাগে-বর্গায় চাষ করে। কেনা মজুরীতে এসময় বড়ো একটা কেউ কাজ করতে চায় না। বলরামকে তাই বড়ো ভোগান্তি পেতে হয়। এ-সময়টার কাজ তো র'য়ে ব'সে করলে চলবেনা। জমিতে 'জো' থাকতে থাকতেই কাজ শেষ করতে হবে। এদিকে বলরামের নিজের জমি ছাড়াও অল্প ঝাশেলা আছে। স্ববাসীর বাবা স্বখলাল মারা যাবার পর থেকে ওদের জমির চাষবাসের কাজটুকুও বলরামকেই করে দিতে হয়। সংসারে পুরুষমানুষ বলতে তো আর কেউ নেই। স্ববাসীর ছোট বোন বাতাসী আর মা। ছুটি মাত্র প্রাণী। ওদের দেখাশুনোর ভার এখন বলরামের পরেই। জামাই হল ছেলের মতন। মেয়ের বদলে ছেলে পাওয়া। আপদে বিপদে সেই জামাই যদি না দেখবে তাহলে সংসারে দেখবে কে?

আপনমনে বলরাম চাষ দিয়ে চলেছিল। কিন্তু বেলাটা একটু হলে পড়েই কখন যে আকাশের কোণে এক টুকরো কালো মেঘ দেখা দিয়েছে তা খেয়াল করেনি। সারা

আকাশ ছড়িয়ে মেঘখানা বখন সূর্যটাকে ঢেকে দিল তখনই বলরামের খেয়াল হল। আকাশের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল, বিষ্টি নামবে। তাড়াতাড়ি করে বগদ দুটোকে জোয়াল থেকে আলাগা করে দিল। নিজেও লাজল-জোয়াল কাঁধে নিয়ে গরু দুটোকে তাড়িয়ে ঘরের দিকে ছুটল। ঝড় বিষ্টি আসতে দেখে সব ক্ষেতেই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। সকলেই এখন ঘরমুখো। একটুখানি এগোতেই হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করল। রাজ্যের ছাই-বালি উড়তে লাগল চারিদিকে। সারা আকাশ জুড়ে কালো-কালো মেঘগুলো ঝড়ের বেগে ওলোট্ট-পালোট্ট খেতে লাগল। দেখতে দেখতে চড়বড় করে বিষ্টি নামল।

ভিজতে ভিজতে বলরাম এসে উঠল পুকুর পাড়টার। বিষ্টি পড়তেই গরু দুটো একছুটে বাড়ী চলে গেছে। বলরাম পুকুরের পাড়টা পার হ'তে গিয়েই দেখে,—পদ্ম ঝাচ্ছে। হয়ত পাড়ায় কোথাও গিয়েছিল। বিষ্টি নামতেই বাড়ী ছুটেছে। একেবারে ভিজে গেছে। ঝড়-বিষ্টিতেই কাপড়-চোপড় বেসামাল হবার জোগাড়। ভেজা কাপড় জায়গায়-জায়গায় গায়ের সঙ্গে সঁটে বসেছে। ছুটতে ছুটতেই পিছন ফিরে তাকাল একবার পদ্ম। বলরামের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল। বলরাম কাছে আসতে হেসে বলল—“পোড়ারমুহো বিষ্টির কাণ্ডা দেখলে বুনাই। পড়তি পড়তি এহেবারে কাউও ভিজে নু ভিজিয়ে দেছে। তা তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ী যাও। ম্যাধের গতিক য্যানো ভালো ঠেক্তিছেন। মনে কয়, ঝড় হতি পারে।

কিছু একটা বলতে গেল বলরাম। কিন্তু বলরামকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ছুটে পালাল পদ্ম।

এক মুহূর্তকাল সেদিকে হা করে তাকিয়ে রইল বলরাম। তারপর তাড়াতাড়ি করে আবার বাড়ীর দিকে ছুটল।

গরু দুটো আগেই বাড়ী চলে এসেছে। স্ববাসী ওদের গোয়াল ঘরে পুরে গোয়ালের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে

ভিজ্ঞ একেবারে একসা হ'য়ে বলরাম বাড়ী উঠল। বলরামকে দেখেই বারান্দা থেকে নারায়ণ চীৎকার শুরু করল—“বাবা, আম নেবো—বাবা আম নেব।”

স্বাসী ধমক দিল ছেলেকে—“থাম্ তো দেহি। মানুষ বাঁচে না মানুষির জালায়। আর তোর হলোগে আম খাওয়ার হাউশ। অতো নালোচে-পানা ক্যান্ হোর ?

বলরামের কানে গেল কথাটা। উঠানের পরে আমগাছ। ঝড়ের ঝাপটায় কতকগুলো কাঁচা আম পড়েছে উঠানে। জলবিষ্টির মধ্যে আমগুলো চক্চক্ করছে।

বলরাম উঠানে দাঁড়িয়ে স্বাসীকে বলল—“এট্টা ধামা ছাও দেহি।”

স্বাসী উদ্ভিগ্ন গলায় বলল—“এই ঝড়ের মধ্যি তুমি আবার আম কুড়োতি নাগ্লে নাকি ? আর সোমায় পালে না বৃষ্টি ?”

বলরাম বললে—“ছাও না এট্টা ধামা। তাড়াতাড়ি যা পারি কুড়োয়ে আনি।”

বলরামকে আম কুড়োতে দেখেই নারায়ণ আহ্লাদে হাত-তালি দিতে লাগল।

শাঁই শাঁই করে ঝড়ের শব্দ হচ্ছে। গাছের ডাল-পালাগুলো একবার উপরে উঠছে, আর একবার নীচে নামছে। ঝড়বিষ্টির মধ্যে বলরাম আমগুলো কুড়োতে লাগল। এবার আমের ফলন বড়ো কম। অনেক গাছে মুকুলই আগেনি। আমে ধান, তেঁতুলে বান। সেই আমের তো এই অবস্থা। আর ওদিকে তেঁতুল গাছ গুলোর অবস্থা দেখ। অমন যে শক্ত শক্ত ডালগুলো, তেঁতুলের ভারে তাও একেবারে বঁকে গেছে। কি আছে কপালে এবার কে জানে।

অন্তমনস্ক হয়ে বলরাম আম কুড়োচ্ছিল। হঠাৎ মড়-মড় করে একটা শব্দ উঠতেই তাড়াতাড়ি আমের ধামা নিয়ে বারান্দায় কোণটায় গিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে

প্রকাণ্ড একটা আমের ডাল ঝপাং করে ভেঙ্গে পড়ল মাটিতে। ঝড়ের বেগ বেন আরো বাড়ছে। দেয়া ডাকছে ঘন ঘন। রান্নাঘরের চাল থেকে অনেকগুলো খড় উড়ে গেল।

স্বাসী গম্ভীর চোখে বাইরের দিকে তাকাল। বলরামের দিকে একখানা শুকনো কাপড় বাড়িয়ে দিয়ে বলল—“আমার কথাটা কি তুমি শোনো না ? কতোক্ষণ ধরে কচ্ছি না যে, আম কুড়োনি লাগবে না। ডালখান যদি ঝড়ের পরে পড়তো মজাটা বুঝতো।”

ভিজ্ঞ গামছা দিয়ে বলরাম গা মাথা মুছল। স্বাসীর হাত থেকে শুকনো কাপড়খানা নিয়ে গাবে জড়িয়ে হাসতে হাসতে বলে—“তা কথাখান তুমি কইছো মন্দনা। ও ডাল ঝড়ে পড়লি আর দেখতি হতো না। সেই ছাগলা গৌদাইর মতন ঝড়-গন্ধান মুচড়ায়ে সশরীলি লগেগ চলে যাতাম।

শিউরে উঠে ধমক দেয় স্বাসী—“তোমার মুখখানায় কি কোনো কথা আটকায় না ? যতো রাজ্যির আকথা-কুখা। ছাও, এবার তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আনো।”

একসাথে এতোগুলো আম পেয়ে নারায়ণ মহা খুশী। কিন্তু ঝড় দেখে ভয় পেয়ে গেছে। বলরাম বারান্দায় উঠে দাঁড়াতেই গিয়ে জড়িয়ে ধরল। নারায়ণকে কোলে নিয়ে বলরাম বারান্দার পৈঠাটার পাশ ঘেষে বসল। ব'সে ব'সে বাইরের দিকটা দেখতে লাগল। প্রচণ্ডবেগে ঝড় হচ্ছে। এ-বছরে এতোবড়ো ঝড় আর হয়নি। অনেকেরই ঘর-দুয়ারের ক্ষতি হবে। বলরামের অবস্থা ভাবনা কম। সব ঘরেই নতুন খুঁটি লাগিয়েছে। চালে নতুন খড় দিয়েছে।

আরো ধানিকরুণ বাদে ঝড় ধামল। তখনো সামান্য একটু বেলা ছিল। ঝড়বিষ্টি ধামতে বলরাম পাড়ায় বেরোল সকলের খোঁজ-খবর নিতে। রাস্তায় এখানে ওখানে জল জমেছে। ভিজ্ঞ মাটিতে হুন্দর একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। ব্যাঙ আর ঝিলির ডাকে চারিদিক সুখর হয়ে

উঠেছে। ভিজ়ে ভিজ়ে স্নান সন্ধ্যায় কেমন যেন করুণ একটা ভাব।

বলরাম এর ওর বাড়ী একটু ঘুরেই গেল বাতাসীদের বাড়ী। বলরামকে দেখে বাতাসীর মা মাথার ঘোমটাটা টেনে দিল। গ্রাম-গাঁয়ের ঐ রীতি। জামাই হ'ল ছেলের মতন। তবু তাকে সমীহ করে চলতে হয় বৈকি।

বাতাসী তাড়াতাড়ি একখানা পিঁড়ি এনে বসতে দিল বলরামকে। স্ববাসীর পিঠোপিঠি বোন বাতাসী। এর মধ্যেই বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। বলরাম বাতাসীর দেওয়া পিঁড়িখানা টেনেনিয়ে বসলো। বাতাসীর মা বলল—“তোমাগের বাড়ীর সব খবর- অবর ভাল তো বাবা? যে বড় আঙ্গকে—ভয় পাওয়ায়ে দেছে।”—

বলরাম উত্তর দিল—“না, আমাগের কোনো ক্ষেতি-টেতি হয়নি।”

আসবার সময় বলরাম কয়েকটা কাঁচা আস নিয়ে এসেছিল। বাতাসীকে ডেকে বলল—“আমগুলো নে বাতাসী। আর ভূই কালকে যাস্ একবার। তোর দিদি বাতি কইছে। নেমন্তন না হলি তো তোর আর যাওয়ার সোমায় হয় না।”

বাতাসী মুখ মুচকে হেসে জবাব দিল—“তা যাবো ক্যানো? কুটুম বাড়ী বুদ্ধি কেউ বিনি নেমন্তনে যায়?”

বাতাসী হয়েছে স্ববাসীর ঠিক উল্টো। সাতচড়ে স্ববাসীর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। কিন্তু বাতাসীর মুখখানা সব সময় ফর-ফর বয়েই চলেছে। কথায় ওর সাথে পেরে ওঠবার জো নেই।

বারান্দা থেকে নামতে নামতে বলরাম বলল—“তা না, যাবি তো না যাবি। কেডা তোরে যাওয়ার জচ্চি খোসামোদ করতিছে। বুদ্ধিবি এর পরে ঠালাডা। এমন এক ধ্যাঙ্কেড়ে গোবিন্দ পুরি নিয়ে তোর বিয়ে দিয়ে দেবো যে, ছিরিমুখি আর বচন বারোবে না।”

বাতাসী ঠোট উলটে জবাব দিল “ইস, বিয়ে অমনি দিলিই হলো? অতো ঘুরি বিয়ে দিলি বিয়ে আমি করবোই না মোটে।”

বলরাম হাসতে হাসতে বলে—“ক্যামোন, এবার জঙ্ক তো?”

বলরাম বাইরে এসে ঘরের চারিদিক ভাল করে দেখল। ঘরে নতুন খুঁটি লাগানো দরকার ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি ক'রে হয়ে ওঠেনি। শুধু চারপাশে চারটে বাঁশের প্যালা দিয়ে ঠাক্য দিয়ে রাখা হয়েছে। সময় বুকে তাড়াতাড়ি খুঁটি গুলো পাল্টে দিতে হবে। বড়-বাদলের ভাবটা এবার ভালো না।

শান্তড়ীর কাছে এসে বলল—“আমি যাই তা'লি এবার। নারায় একা রইছে।”

বাতাসীর মা জবাব দিল—“যাও। কালকে একবার যাবো আমি।”

বলরাম নেমে এলো বাড়ীর নীচে। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এসেছে। অন্ধকারে বেশ লাগছে চারদিকটা। আকাশের দিকে তাকাল বলরাম। ঐ আকাশের দিকে তাকিয়ে কে বলবে,—ওখানেই খানিক আগে এতোবড়ো একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেছে। এখন আকাশটা একেবারেই শান্ত। কোথাও একটুকরো মেঘ নেই। অন্ধকার আকাশ জুড়ে রাশি রাশি তারা ফুটেছে। মা-কালীর গায়ের রূপোর চিকণলোর মতন চক্কম করছে।

বলরাম বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। একটুখানি এগিয়েই হঠাৎ পদ্মর কথা মনে পড়ল। এতোক্ষণ ওর কথা যেন মনেই ছিল না।

পদ্মর কথা মনে পড়তেই বিকেলের সেই ঘটনাটাও মনে এলো। পদ্মর সেই হাসিটুকু যেন চোখের সামনে সজীব হয়ে দেখা দিল। জলে ভেজা পদ্মর চেতারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। পদ্মর শরীরটা যেন কথা কয়। সেই

ছোটোবেলা থেকেই বলরাম দেখে আসছে পদ্মকে। কিন্তু আজো যেন পদ্মকে ওর নতুন মনে হয়। মনটাকে কেমন যেন টেনে ধরে। বিধবা হবার পর থেকে পদ্মর শরীরের সেই মাদক আকর্ষণটুকু যেন আরো বেড়েছে। এতোদিন বলরাম দেখেও দেখেনি। কিম্বা হয়ত এড়িয়ে গেছে। সংসারের আর পাঁচ কাজের মধ্যে ডুবে, ছেলে-বউকে নিয়ে ভুলতে চেয়েছিল পদ্মকে। হয়ত ভুলতেও পেরেছিল কিছুটা। কিন্তু হালধা-সন্ধ্যাসের দিনের ঘটনাটা ওর মনকে একেবারেই এগোমেলো ক'রে দিয়েগিয়েছে। সেই আগের দিনগুলোর মতন মনটা যেন আবার মাতাল হয়ে উঠতে চায়। সব কিছু নিষেধের বেড়া ভেঙে মনটা ছুটে যেতে চায় বিধবা পদ্মর কাছে। পরমুহূর্তে মনে পড়ে স্বাসীর কথা। নারায়ণের কথা। তার ছেলে। তার বউ। একান্তভাবে তারপরে নির্ভর করে বেড়ে ওঠা ছোটো অসহায় মায়া। কি একটা যন্ত্রণার যেন বলরামের মনটা কঁকড়ে যেতে চায়। কি নাম এই যন্ত্রণাটার? বিবেক? জানে না বলরাম? শুধু বুঝতে পারে, মনের মধ্যে তার অসহ্য একটা অশান্তির ঝড় চলছে। পদ্মকে ভালবেসে কোনোদিন শান্তি পায়নি বলরাম। পদ্মর ভালবাসা আগুনের মতন তাকে শুধু পুড়িয়েছে। আজো পোড়াচ্ছে। কিন্তু বলরাম পারছে কই সে আগুন থেকে সরে আসতে? পতঙ্গের মতন বলরাম ঘুরে ঘুরে এসে সেই আগুনেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মনের মধ্যে জ্বলতে থাকে বলরামের। স্বাসীর বুকভরা ভালবাসা, ছেলের ছ'খানি কচি হাতের বাঁধন,—কোনো কিছুই যেন বলরামের অশান্ত মনটাকে ঝেঁপে রাখতে পারছে না।

সামনেই পদ্মের বাড়ী। অন্ধকারের মধ্যে পদ্মর হাসি মুখখানা যেন ডাকছে বলরামকে। অন্ধকারের মতন অপার রহস্যময় পদ্মর শরীরটা যেন তারই জন্তু অপেক্ষা করে রয়েছে ওখানে। পদ্মের বাড়ীর দিকে পা বাড়ান বলরাম। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই আবার থমকে দাঁড়াল। সেই যন্ত্রণাটা

জ্যৈষ্ঠ ৬

আবার দেখা দিল মনের মধ্যে। এ-কি করছে সে? পদ্মর কাছে যাবার, পদ্মকে কাছে পাবার কোনো অধিকার তো তার আর নেই! গাঁয়ের লোকে তার নিন্দা করবে। পাড়ার সকলে ছি ছি করবে। তাও হয়ত সহিতে পারবে বলরাম। কিন্তু স্বাগী? নারায়ণ? ওদের কাছে কি বলবে? আজকে তার কাছে পদ্মর ভালবাসার চাইতে যে অনেক বেশী সত্য, অনেক বেশী বাস্তব, স্বাসী আর নারায়ণের অস্তিত্ব। পদ্মর কাছে গিয়ে নিজের মনের অগ্নিদাহের যন্ত্রণা হয়ত কমবে, কিন্তু ওদের কানে কোন্ শান্তির কথা সে শোনাবে?

আন্তে আন্তে বলরাম মুখ ফেরাল। নিজের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল।

বাড়ী গিয়ে বলরাম অন্ধকারে বারান্দার এক কোণে ঘাড় গুঁজে বসে রইল।

খানিক বাদে স্বাগী রান্নাঘর থেকে কুপি নিয়ে এ-ঘরে এলো। বলরামকে অন্ধকারে চূপচাপ বসে থাকতে দেখে অবাক হ'ল। কুপিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি কাছে গেল। বলরামের দিকে ডাকিয়ে বলল—“ভূমি আ'লে কোন্ সোমায়? নারায়ণ তোমার জন্তি কাঁদতিলো। কাঁদতি কাঁদতি ঘুমোয়ে পড়িছে। ওরে উঠোয়ে নিয়ে খাতি আসো। আমার রান্না হয়ে গেছে।”

খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে বলরাম শুয়ে পড়ল। বিকেলে এক-নাগাড়ে অনেকক্ষণ বিষ্টি হয়েছে। গরমটা কেটে গিয়ে বেশ একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব পড়েছে। পাতলা একখানা কাঁধা গায়ে টেনে নিল বলরাম। নারায়ণের সঙ্গে গল্প করল খানিকক্ষণ। তারপর একসময় বাপের কোল বেঁধে ঘুমিয়ে পড়ল নারায়ণ।

বলরাম শুয়ে শুয়ে সাত পাঁচ নানা ভাবনা জড় করতে লাগল মনের মধ্যে।

আরো খানিক বাদে কাকাকর্ম সেরে স্বাগী ঘরে এলো। ঘরের এলোমেলো কাপড় চোপড়গুলো গুছিয়ে রাখল

নারাণের মাথার বালিশটা ঠিক করে দিল। তারপর কুপিটা নিভিয়ে নারাণকে মাঝখানে রেখে বেড়ার পাশ ঘেঁষে শুয়ে পড়ল।

একটু বাদেই বলরামের একখানা হাত গিয়ে পড়ল স্বাসীর গায়ের উপর।

স্বাসীর শরীরটা রোমাঞ্চিত হল। বলরামের দিকে পাশ ফিরে শুতে শুতে বলল—“ও মাঃ! তুমি ঘুমোওনি? আমি ভাবলাম, তুমি বুকি ঘোম্‌প’ড়ে পড়িছো!”

বলরাম ওপাশ থেকে স্বাসীকে টেনে নিল নিজের কাছে। বলরামের বুকের পাশে শুটি স্রুটি হয়ে এলো স্বাসীর শরীরটা।

একটুকুণ পরে স্বাসী বলল—“ও-বাড়ী গিলে নাকি?”

ও-বাড়ী—অর্থাৎ স্বাসীর মার বাড়ী।

বলরাম বলল—“হয় গিলাম। তা ওগের ঘরে তো দেখছিছি খুঁটি নাগানি দরকার। ঝড় বাতাসের সোমায়। ফেলে ধোয়াডা ঠিক হবে না।”

সংসারের নানা কাজকর্মের মধ্যেও আবার স্বাসীর বোন আর মায়ের তত্ত্ব-তালাশ নিতে হয় বলরামকে। স্বাসী একজন্ম মনে মনে একটু সঙ্কট বোধ করে।

বলরামের কথার উত্তরে স্বাসী একটুকুণ চুপ করে থেকে বলে—“সে তুমি যা ভালো বোঝো করো। তুমি ছাড়া আর কেউই বা ওগের জাহার আছে।”—একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল স্বাসীর।

বলরাম স্বাসীর পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—“সেংসারে ওসব নিয়ে ছক্কু-ভাবনা করে কি ফলডা হবে কও? তা আগার খ্যামোতায় যেটুকু কুলোয়, সেটুকু আমার করতিই হবে। আমার মা কি এটা বুন থাকলি ভাগেরও তো দেখতি হতো।”

স্বাসী কোনো কথা বলে না। অনেকটা সন্ধ্যা কেটে যায়।

ধানিকক্ষণ ভাবল বলরাম। তারপর স্বাসীর শরীরটায় একটু নাড়া দিয়ে বলে—“ঘুমোলে নাকি?”

—“না ঘুমোইনি। কিছু কচ্ছো নাকি?” স্বাসী জবাব দেয়। একটু চুপ করে থেকে বলরাম বলে—“হয়, এটা

কথা কবো ভাবতিলাম তোমারে। কিন্তু কি যে কবো বুঝে উঠতি পারতিছি না।”

স্বাসী অবাক হয়। কি এমন কথা থাকতে পারে, যা বলতে ওর এমন বাধা বাধা ঠেকছে।

বলরামের চওড়া বুকখানার মধ্যে মাথা গুঁজে স্বাসী একটু হেসে ঠাট্টা করে বলে—“কি কথাডা তোমার কথাও না শুনি? আমরা তোমার ভালোলাগে না, তাই এটা সতীন আনবা বুঝি? এই নাকি তোমার কথাডা?”

বলরাম বলে—“হাসি ঠাট্টার কথা নয়। ধরো, সত্যি সত্যিই সে র’ম কিছু কানে যায় যদি তোমার, তুমি কি করবাডা তা’লি।”

বলরামের বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে রেখে স্বাসী বলে—“এতে আর করাকরির কি আছে? সে তো বেশ একখান তামসা হবে। আব এটা মানুষ আসবে। নাট-সারেবের বিবির মতন আমি ঠ্যাং-য়ের পরে ঠ্যাং থুয়ে বসে বসে মিথুতারে হকুমির পরে হকুম করবো। কুটো গাছও আমার আর ভাঙতি হবে না। কি স্মৃতিই যে আমার হবে। তা সে সতীনডারে আমার কবে আনতিছো কও দেখি?”

বলরাম চুপ ক’রে থাকে।

একটুকুণ বাদে বুঝতে পারে, স্বাসীর ঘুম এসে গেছে। নিশ্চিন্ত নির্ভরভায় বলরামের বুকের উপর মাথাটা রেখে ঘুগিয়ে পড়েছে। নিজের মনে ওর কোনো ধুলো-ময়লা নেই। আর কারো মনের ধুলো ময়লাটুকুও তাই ওর চোখে পড়তে চায়না। নিজের মনের ভক্তি আর ভালবাসার মধ্যেই ডুবে আছে। স্বাসীর বুকটুকু ওর পরম নির্ভরতা আর নির্ভয়ের স্থান। সেখানে যে কোনো চোরাবালি থাকতে পারে, এ-তার ভাবনার বাইরে। এই সহজ সরল মানুষটাকে ফাঁকি দেওয়া বড়ো সোজা। কিন্তু এ-মানুষটাকে ফাঁকি দেবে কি করে বলরাম? যে তোমাকে তার সব দিয়েছে, নিজের পায়ের তলার নির্ভরতার মাটিটুকু পর্যন্ত তোমার মধ্যে লীন করে দিয়ে তোমার সঙ্গে মিশে গিয়েছে, তাকে তুমি কোন্‌ প্রাণে বঞ্চনা করবে?

নিবিড় মনতায় বলরাম হাত বুলিয়ে শেম ঘুমন্ত স্বাসীর মাথায়। তারপর আন্তে আন্তে ওর মাথাটা নামিয়ে রাখে বালিশের উপরে।

(ক্রমশঃ)

: উপভাস :

কঠি ভরা বিষ

মি হির মুখো পাখ্যায়

চক্ৰবৰ্ত্ত

বাদশাহী সড়ক ধরে যাচ্ছিল রঘুনাথ। প্রায় পঁচিশ ক্রোশ
রাস্তা। বেশি ছাড়া কম নয়।

ঘোড়ায় চড়ার তেমন অভ্যাস নেই রঘুর, থাকলে সুবিধে
হ'ত। বৰ্ধমান থেকে আসার সময় প্রায় সারারাত, সারাদিন
হেটে বত তাড়াতাড়ি এসেছিল। যাবার সময় অত
তাড়াতাড়ি যেতে পারছে না। সন্ধ্যার পর পথচলা নিরাপদ
নয়। আগের দিন সকালে পাণ্ডুয়া থেকে বেরিয়েছে।
সারাদিন হেটে সন্ধ্যার আগেই পথের পাশে এক মুদি
দোকানে আশ্রয় নিয়েছিল। সারারাত ভাল ঘুম হয়নি।
হবে কি করে, সঙ্গে এতগুলি টাকা।

আজ সন্ধ্যার আগেই বৰ্ধমান পৌছে যাবে। কিন্তু শীতের
বেলা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে।

রোদুজ্বরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটছে রঘুনাথ। দুপাশে ধান
ক্ষেত, পথের পাশে বাবুলা গাছ। মাঝে মাঝে বট
অশ্বথের ছায়া। মাঠের দিকে অনেক দূরে একসার
ভালগাছের পেছনে সূর্য নেমেছে। পাকা ধানের গন্ধ।
খড়বোকাই গরুর গাড়ি যাচ্ছে। ধান কাটার কাজ প্রায়
শেষ হয়ে এল। একবার পেছন ফিরে তাকাল রঘুনাথ।
সেই লোক দুটো সমানে আসছে। ফরাসডাঙ্গা থেকে নাকি
আসছে লোকদুটো। গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেছিল।
তেমন আমল হয়নি রঘু। লোক দুটোর চাউনি ভাল নয়।

কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ। এমনি সব সাত-সতেরো কথা।
আর আশ্চর্য রঘুনাথ জোরে হাঁটলে, ওরাও জোরে হাঁটে,
আজ্ঞে হাঁটলে ওরাও আজ্ঞে হাঁটে। কোথাও একটু থামলে,
ওরাও থেমে দাঁড়ায়। প্রায় পঁচিশো হাতের ব্যবধান ঠিক
আছে।

আজ সকাল থেকে সমানে আসছে। আগের দিনও পেছনে
ছিল কি না ঠিক লক্ষ্য করেনি।

অবশ্য ফরাসডাঙ্গা থেকে বৰ্ধমান যাবার সোজা রাস্তা এই
বাদশাহী সড়ক। ওদের কথা সত্যি হলে এই পথেই যেতে
হবে ওদের। কিন্তু ওদের চাল-চলন ভাল মনে হচ্ছে না
রঘুনাথের।

গায়নে নন্দলাল চক্রবর্তীর বাড়ী। তারপর আরো ক্রোশ
থানেক গেলে পর খাস শহর।

আজ রাতটা না হয় চক্রবর্তী মশাইর বাড়িতেই কাটাবে।
সন্ধ্যা হয়ে এল। আর পথ হাঁটা উচিত হবে না। বিশাল
মাঠের আকাশে সূর্য অস্ত গেল। পশ্চিম দিগন্তে কয়েকখণ্ড
যেবে সিঁহুরের রঙ লেগে আছে। শহরের দিক থেকে দলে
দলে কাক উড়ে যাচ্ছে গ্রামের গাছ-গাছালির আশ্রয়ে।
পাখির স্রবণে ফিরছে। বাদশাহী শরকের পাশেই
চক্রবর্তী মশাইর বাড়ী। বাড়ির উঠানের দিকে কয়েক পা
এগোতেই খুব অবাক হয়ে দেখতে পেল রঘুনাথ, চৌচালা
বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় লোচন দাস দাঁড়িয়ে আছে।

এই সঙ্কে-বেলায় লোচন এখানে কেন? সিঁড়ি ধরে নাযতে নামতে জিক্সেস করল সে—কে হে রঘু নাকি, এই ফিরলে বুঝি—

—হ্যা এই তো আলাম, তা তুমি এখানে কি জন্মি—

—আর বলো কেন, তোমার ছোটকর্তা ছুবেলা আমাকে পাঠাচ্ছেন, রঘু এল কিনা খোঁজ নাও, চক্কোস্তি-মশাইর বাড়িতে জিক্সেস করে এস, কি হ'ল রঘুর আসছেন কেন, সাউদিন হয়ে গেল, বুঝলে, রঘু রঘু করে তোমার ছোটকর্তা হেদিয়ে উঠেছেন, আমার হয়েছে মহা জ্বালা, ছুবেলা এই এক কোশ রাস্তা হেটে হেটে পায়ের নলা ছিঁড়ে গেল, কি ব্যাপার বলো দিকি—

কি ব্যাপার কিছু বললো না রঘু শুধু জিক্সেস করলো।

—চক্কোস্তি মশাই কোথায়, তাকে ডাক দাও—

—তিনি তো বাড়ি নেই, তিনি গেছেন ভাটপাড়া—

—অ্যা, হঠাৎ ভাটপাড়া কি জন্মি—

—এই কাল্‌গুন মাসে মেয়ের বিয়ে শেবেন, ছেলের বাড়ি

ভাটপাড়া, কথাবার্তা সব পাকা করতে গেছেন—

লোচনের কথা শুনে ভাবনা হল রঘুর। চক্রবর্তী মশাই বাড়ি

নেই, তা' হলে সে থাকবে কি করে।

সেই কথাই বললো রঘু—আমি যে এখানে রাস্তিরখান থাকবার চাইছিলাম।

—সে কি, এখানে থাকবে কেন, এই টুকুন রাস্তা, সবে তো সঙ্কে লাগলো, জ্বজনে গল্প করতে করতে চলে যাব, চলো চলো, তোমার ছোটকর্তা ওদিকে ভেবে মরছেন আর তুমি কি না—

লোচনের কথায় আবার পথে নামল রঘুনাথ। ভাবল,

কি আর হবে, ছোটকর্তা ভাবছেন, বড়ডো ভাবনার মধ্যে ছিলেন এই কটা দিন। এত কাছে এসে, আরো একটা রাত তাকে আর ভাবনার মধ্যে রাখা ঠিক নয়। লোচনের সঙ্গে গল্প করতে করতে চলে যাবে। সন্ধ্যা উতরে গেছে

বটে, তবে পথে লোকজন এখনো চলছে। তরিতরকারী

বোঝাই ছ' একখানা গরুর গাড়ি যাচ্ছে শহরের দিকে।

হাতে লাঠি আছে, শরীরের শক্তি আছে, বুকে সাহস

আছে। ভয়টা কিসের। শুধু এতগুলি টাকা

সঙ্গে, সোনার গয়না, রাণী-মার গায়ের গয়না, পাঁচখানা

আঁকবরী মোহর—এই জন্ম বা চিন্তা। পাশাপাশি

ইটিছে জ্বজনে। লোচন আর রঘুনাথ। দেশ-

গাঁয়ের হালচাল জিক্সেস করেছে লোচন, খোঁজ-খবর

বলছে। ছোটকর্তা এই কটাদিন কেমন ছিলেন, কি

করেছেন, কি খেয়েছেন, তাও বললো। আপন মনেই

বক্বক করেছে লোচন। ভাল মন্দ কিছু বলছে না রঘু।

সাবধানে ইটিছে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে আবছা অন্ধকার পথের

উপর। ছ'একবার পেছন দি রেও দেখে নিল।

লোচন জিক্সেস করল—পেছনে কি দেখছে?

—অমনি দেখলাম—বেশি কথা না বলে জোর পামে ইটিছে

রঘু।

—আরে আশ্চর্য যাও, তুমি যে ছুটতে লেগেছো, ব্যাপার কি

—আবার বললো লোচন।

কোন জবাব না দিয়ে যেমন যাচ্ছিল, তেমনি যেতে

লাগলো রঘুনাথ। সামনে এক ক্রোশ পথ। পথের পাশে

বাবলা গাছ, কুল গাছ। দু'পাশে ফসল শূন্য

মাঠ। এখনো শহরের সীমানা শুরু হয়নি। আমবাগান,

বাঁশঝাড়। সামনে একটা বিশাল অশ্বখ গাছ। অনেকটা

জায়গা জুড়ে অন্ধকার করে রেখেছে, আবছা অন্ধকারে

ছোটো মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মনে হ'ল।

আরো কাছে আসতেই ওদের একজন বলে উঠল—এই যে,

আরে কোথায় গিয়েছিলে হে—

সেই লোক ছোটো। ধমকে দাঁড়াল রঘুনাথ—ক্যান্ তোমাগোর

কি কাম আমার লগে, আমি যেমন খুশি যাই বা

না যাই—হঠাৎ অশ্বখের অন্ধকার থেকে যেন প্রেতের

মতো লাঠি হাতে চার পাঁচটা লোক এসে রঘুনাথকে ঘিরে দাঁড়াল।

—এই ব্যাটার বড় গরম গরম কথা, দে তো ঠাণ্ডা করে—
চেনা গলার কথা শুনেই চমকে উঠল রঘুনাথ। পরমুহুর্তেই
একটা লাঠির আঘাত লাগলো মাথায়। বাঁ পাশে কপালের
কাছে কেটে গেল। তপ্ত রক্তের ধারা বাঁ চোখটা প্রায়
ঢেকে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে রঘুও লাঠি ঘুরিয়ে মারলো
সামনের লোকটাকে।

লোচন দাস—বাবা গো, মেরে ফেললে—বলেই এক দৌড়।
সামনের লোকটিও রঘুর লাঠি খেয়ে বাপ্পে, বলে কয়েক পা
পিছিয়ে গেল। পরক্ষণেই একসঙ্গে তিনচারটি লাঠির
আঘাত।

লাঠি তুলে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করলো রঘু। কিন্তু সব কটা
আঘাত আটকাতে পারলো না। চারদিকে ঘিরে ধরেছে।
মাথায়, ঘাড়, কাঁধে আরো কয়েকটা আঘাত পড়লো।
মাথার পেছনেও ফেটে গেল। রক্ত মাথা পাগড়ির কাপড়টা
খুলে কাঁধের উপর ঝুলে পড়ল। কিন্তু রঘুর কোন হুঁস
নেই, কোন যন্ত্রণা বোধও নেই। আহত বাঘের মতো
চারপাঁচটা লোকের সঙ্গে লড়াতে লাগলো। শুধু লাঠির
শব্দ, পায়ের দাপাদাপি।

অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না। কপাল কেটে রক্ত ঝরে
বাঁ চোখটা প্রায় অন্ধ।

ওর মধ্যেই ছুটো লোক রঘুর লাঠির ঘায়ে লক্ষ্য হ'ল, কিন্তু
শেষ রক্ষা হ'ল না।

আচমকা ডান হাতের কব্জিতে চোট লেগে লাঠি ছুটে
গেল। সমানে লাঠির আঘাত লাগছে সর্বদেহে।

আঘাতের পর আঘাত। রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পড়ে গেল
রঘু। মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। উপর হয়ে মাটিতে পড়ে
কোমরের কাছে টাকার খলিটা হুঁহাতে চেপে ধরে রইল।
অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে শুনতে পেল সেই চেনা

গলা—ভাল করে খুঁজে ভাখু ওর কাছে নিশ্চয়ই টাকা
আছে—

শেষ রাতের দিকে জ্ঞান এল রঘুর। চোখ মেলে তাকাল।
সব অস্পষ্ট, আবছা অন্ধকার। একটা প্রদীপ জ্বলছে।
আলোটা কেমন ঝাপসা। বড়ডো জলতেটা পেয়েছে।
অতিকষ্টে বিড়বিড় করে বললো—জল, একটু জল,—

—কিরে জল খাবি, এই যে দিচ্ছি—ছোট কণ্ঠার গলা।
ছোটকণ্ঠা কি করে এলেন। কোথায় শুয়ে আছে সে।

মাথা তোলার চেষ্টা করল রঘু আর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদেহে সহস্র
খুচ ফোটার যন্ত্রণা হ'ল।

—উঃ মাপো—রঘুর কাতর কণ্ঠ শুনে বললো ভারত—
উঠিস না, শুয়ে থাক, আমি জল দিচ্ছি।

তামার কুণ্ডিতে একটু একটু করে রঘুর মুখে জল দিল ভারত।
অল্প অল্প করে অনেকটা জল খেয়ে একটু যেন হুহু হ'ল
রঘুনাথ, চোখ বুজে আঙুলে আঙুলে বললো—আমি ক্যাম্‌নে—

—কথা বলিস না, চুপ করে শুয়ে থাক—ছোটকণ্ঠার কথা
শুনে আবার তাকাল রঘু। এবার সে অনেকটা স্পষ্ট
দেখতে পাচ্ছে। আবার আঙুলে আঙুলে জিজ্ঞেস করল—
আমি ক্যাম্‌নে আলাম এখানে—

—আমরা তোকে নিয়ে এসেছি, লোচন এসে খবর দিল,
তোকে ডাকাতে ধরেছে, খবর পেয়েই ছুটে গেলাম, আমার
সঙ্গে গোপাল দত্ত মশাই, মিশিরজী, পাড়েকী, রামলাল
পাইক, গিয়ে দেখি তুই রাস্তার মধ্যে পড়ে আছিস
কাছাকাছি জনমানুষ নেই—

চুপচাপ শুন্‌ল রঘুনাথ। লোচনের নাম শুনে সব মনে পড়ে
গেল। মামুষটা ভীত। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। তারপর
কি ভেবে হাত ছুটো তোলার চেষ্টা করলো রঘু, ব্যাথার
টনটন করে উঠল।

তবু কোমরের কাছে হাতড়ে হাতড়ে কি যেন খুঁজল।

ভারপর ভাঙা ভাঙা গলায় টেঁচিয়ে উঠল—সব্বানাম হইছে
গো কর্তা—

—কিরে, কি হল—ভারত মুখের উপর ঝুকে পড়ল।

—টাকা, টাকা নাই, লুট কইরে নিছে—ডুকরে কেঁদে উঠল
রঘু।

—সে কি রে, কত টাকা ছিল—

—অনেক টাকা, রাণীমার গায়ের গয়না—কামায় রঘুব গলা
আটকে গেল।

—যা কপালে ছিল, তাই হয়েছে, ওজ্ঞে আর ভাবিস্ না—
মিথ্যে সাধুনা দেবার চেষ্টা ক'ল ভারত—তুই কি তাদের
চিন্তে পেরেছিস, কারা নিয়েছে কিছু আন্দাজ করতে
পারিস—

ছোট কর্তার জিজ্ঞাসার জবাবে একটু ভেবে ফিস্ ফিস্ করে
বল্লো রঘুনাথ—আমি চিনতি পারছি, কালাচাঁদ,
কালাচাঁদের দল—

পাঁচিশ

দেওয়ান রাজবল্লভ রায় বল্লেন—তোমাকে একপক্ষ সময়
দিস্, কই কোন ব্যবস্থা তো করতে পারলে না—

হতাশাবে জবাব দিল ভারত—কি করবো বলুন, রঘুকে
পাঠিয়েছিলুম ভুরগুট, কিছু টাকা এনেও ছিল, পথে ডাকাতে
লুটে নিয়েছে—

—ওসব কথা আমাকে বুদ্ধিওনা, বর্ধমান রাজের মুন্সুকে
চুরি ডাকাতি নেই—

—আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমি মিথ্যে বলছি না, কি
করবো, সবই আমার কপাল, অভাগা যেদিকে চায়—

—থাক তোমার ওসব শ্লোক শুনেতে চাই না আমি, তোমার
কথা বিশ্বাস করেই বা আমার লাভ হবে কি, টাকা তো
তুমি দিতে পারছো না আর টাকা দিতে না পারলে কি হবে
জানো—রাজবল্লভ রায় গড়গড়ার নলটা সরিয়ে রেখে উঠতে

উঠতে বল্লেন—দরবারে যাচ্ছি আমি, মহারাজাকে সব
কথা বলবো, ভারপর তিনি বা হুকুম দেবেন। তাই হবে,
তবে ও সম্পত্তি খাস হয়ে যাবে, তোমরা রাখতে পারবে না
—দরবারের দিকে চলে গেলেন রাজবল্লভ রায়। তার চলে
যাবার দিকে তাকিয়ে রইল ভারত। পিতানহ সদাশিব
রায়ের কথা মনে পড়ল। সদাশিব রায়েরা ছিলেন ছয় ভাই।
জ্যেষ্ঠ সদাশিব রায়। দ্বিতীয় চাকু রায়, তৃতীয় এই রাজবল্লভ।
ভারপর আরো তিন ভাই কিশোর রায়, কন্দর্প রায়, বাণেশ্বর
রায়। শেষের দুজন—কন্দর্প আর বাণেশ্বর এখনো বেঁচে
আছেন। একজন হুগলীতে আরেকজন দোগাছিয়ায়।
আর বেঁচে আছেন এই রাজবল্লভ রায়। বড় প্রবলভাবে
বেঁচে আছেন।

যতই বিক্রমতা করুন, শয়তানী করুন, মামুষটির ক্ষমতার কথা
কুটবুদ্ধির কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। সাতানটা পরগণায়
বর্ধমান-রাজের অধিকার। কোন্ পরগণার কোথায় কি হচ্ছে
না হচ্ছে—সব দেওয়ানজীর নখদর্পণে।

মহারাজা কীর্তিচাঁদ, সব ব্যাপারে এই প্রবীণ দেওয়ানের
পরামর্শ শোনেন। পাঁচাস্তরের মত বয়স রাজবল্লভের।
পঞ্চাশ বছরেও বেশি বর্ধমান রাজ-সরকারে কাজ করছেন।
সাধারণ হিসেব-রক্ষক কারকুণ থেকে ধাপে ধাপে উঠে
দেওয়ান হয়েছেন। গুণ না থাকলে, যোগ্যতা না থাকলে—
এ সব হয় না। এও একরকম শক্তির প্রকাশ।

হয়তো সকল ক্ষেত্রে, সবার পক্ষে শুভশক্তি নয়। লোভ
আছে, স্বার্থপরতা আছে, ক্ষমতার অহঙ্কার আছে। কিন্তু
এও মহামায়ার লীলা, ভারতের অদৃষ্ট খারাপ। এই প্রবল
শক্তির কোপ দৃষ্টিতে পড়েছে। দুর্দৈব যখন ধরে, ভাল কর্ম
মন্দ করে।

এখন আর বুঝিয়ে কিছু হবে না। যা আছে
কপালে তাই হবে। ওদিকে শেষ রাত্রি থেকে জ্বর উঠেছে
রঘুর।

জরের ঘোরে বেহাশ হয়ে ভুল বকছিল। কখনো বাবাকে ডাকছে, কখনো রাণীমাকে ডাকছে।

কখনো বলেছে—পালান ছোটকর্তা, এখানে থে পালিয়ে যান—
বিজ্ঞানের গোমস্তা গোপাল দত্ত মশাই যথেষ্ট করেছেন।
কবিরাজ ডেকে ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করেছেন, লোচনকে
বলেছেন সব সময় কাছে থাকতে। সারারাত জেগে বসেছিল
ভারত। সকালবেলা হাতমুখ ধুয়ে সন্ধ্যা-আফ্রিক করে রাজ-
বাড়ি এসেছে সে-স্তায় হাজিরা দিতে।

—কি ভাবছেন অত রায়-মশায়—মুখ নিচু করে সেরেস্তার
বারান্দায় বসেছিল ভারত, ষষ্টিপদর কথা শুনে তাকাল।

দেওয়ানজী খান-মুনসী ষষ্টিপদ হালদার, বাঁ-চোখ ছোট
করে বললো—টাকার ব্যাঘ্র কিছু করতে পারলেন।

—কই আর পারলুম, টাকার যে ব্যবস্থা করেছিলুম তা'তো
ডাকতে লুটে নিল।

—ওসব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না রায়মশাই, মহারাজার
রাজস্ব চুরি ডাকাতি একরকম নাই বললেই হয়—ষষ্টিপদর
কথা শুনে ফুক কণ্ঠে জবাব দিল ভারত—আমি মিথ্যা কথা
বলছি না—

—তা যাই হোক, আপনার সত্যি মিথ্যা আপনার
কাছে, কিন্তু টাকা না হলে তো চলবে না, কথায় বলে
ফ্যালো কড়ি মাখো পেল, কড়ি ফেলুন, দেখবেন আপনার
সব কথা সবাই বিশ্বাস করবে, কড়িদিলে সর্বকার্য সিদ্ধি
জানেন তো, কড়িতে বাঘের দুধও মেলে—

অত দুঃখ-দুঃশিস্তার মধ্যেও ষষ্টিপদর কথা শুনে হাসি পেল
ভারতের, কেন যেন পাল্টা জবাব দেবার ইচ্ছে হল,

—হালদার মশাই, ওসব প্রবাদ কিছু কিছু আমিও জানি,
আমাকে আর কি শোনাচ্ছেন, শুনবেন একটা শ্লোক, তাহলে
শুধুন—

চোখ বুজে একটু ভেবে মাথা নেড়ে নেড়ে বললো
ভারত—

কড়ি কটকা চিড়া দই, বন্ধু নাহি কড়ি বই

কড়িতে বাঘের দুধ মিলে,

কড়িতে বুড়ার বিয়া, কড়ি লোভে মরে গিয়া

কুলবধু ভুলে কড়ি দিলে।

ষষ্টিপদ হালদার অবাক। তার বাম চোখটা আর ছোট
রইল না। দুই চোখ সমান বড় বড় করে বললো—বাঃ বাঃ
আপনি তো বেশ ছড়া বানাতে পারেন রায়মশাই, চমৎকার
—তারপর একগাল হেসে—এটা বেশ বলেছেন, কুলবধু ভুলে
কড়ি দিলে, আপনি তো বেশ রসিক আছেন।—

মুহূ হেসে জবাব দিলেন ভারত—আপনারা আর রসিক
থাকতে দিলেন কই, রসকস যা ছিল আপনাদের পাঞ্জায় পড়ে
শুকিয়ে গেছে—

—আহুন, আহুন, আমার দণ্ডবে এসে বহুন, এক ছিলিম
তামুক খান—সমাদর করে ডেকে নিল ষষ্টিপদ। দেওয়ানজীর
খান কামরার পাশেই খান-মুনসীর দপ্তর। সেখানে গিয়ে
বসতে হল। সেরেস্তার চাপরাসী বামুনের হুকোয় তামাক
দিয়ে গেল।

ষষ্টিপদ বললো—রায়মশাই, লোকে যাই বলুক, বিশ্বাস করুন,
আমি মাহুয়াটা তত খারাপ ছিলুম না, স্ত্রী, গুণীর কদর
বুঝি, পাচজনে হয়তো আমার নামে পাঁচরকম কথা
বলে, আপনিও শুনে থাকবেন, আমি ঘৃণ্যের, অর্থপিলাচ,
কিন্তু কি করবো বলুন, আমার যে হাত-পা বাঁধা—একটু
সামনে ঝুঁকে গলা নীচু করে বললো—দেওয়ানজী যা
করাবেন, তাই করতে হবে, যাই বলাবেন তাই বলতে হবে—
তারপর আবার স্বাভাবিক গলায়—তার উপর আমার এই
ঘাড়ে মস্ত সংসার, বুড়ি-মা, দুই জী, দুপক্ষের এগারটি সন্তান,
আর দিনকাল যা পড়েছে, উপরি কিছু না পেলে বুঝলেন না,
টাকা-টাকা করি কি আর এমনি-এমনি, সে যাকগে, আপনি
কি উপায় ভাবলেন বলুন—ষষ্টিপদের কথা শুনে মুন-
ভাবে জবাব দিল ভারত—আমি তা কোন উপায় দেখছি না।

এখন বিজ্ঞানধর্মের আশায় বসে আছি, খবর পেয়েছি নবাব বাহাদুর উড়িয়া অভিযানে বেরোবার পর বিজ্ঞান ফিরে আসবে, হয়তো মাসখানেকের মধ্যেই এসে পড়বে—রায় মশাইব জবাব শুনে প্রায় আঁতকে উঠল বৃষ্টিপদ—ও বাবা, এবমাস সে তো অনেক দেরি, এদিকে আপনার একপক্ষের মেয়াদ তো ফুরিয়ে গেলো—

ভারত খুব বিপন্ন হয়ে বললো—আপনি একটু দেওয়ানজীকে বুঝিয়ে বলুন না, উনি আমায় সব কথা না শুনেই চলে গেলেন বিজ্ঞান এলে টাকা আমি ঠিক দিতে পারবো—

—দেখি চেষ্টা করে, আমি বুঝিয়ে বলবো দেওয়ানজীকে, আপনি বসে থেকে আর কি করবেন, বাড়ি চলে যান—

হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি—উঠতে উঠতে বললো ভারত—আমার চাকর রঘুনাথ গুরুতর জখম হয়েছে, জখমের জন্তু জ্বরও হয়েছে—

—কি করে জখম হল—বৃষ্টিপদের প্রশ্ন শুনে আবার বললো ভারত—ওই যে বললুম, ডাকাতে মেরেছে, ওই তো টাকা নিয়ে আসছিল—

—তাহলে তো কথাটা মিথ্যে নয়, আপনি দেওয়ানজীকে বলেছেন এসব কথা—

—বলার আর সুযোগ পেলুম কই, টাকার ব্যবস্থা হয়নি শুনেই তো উনি রেগে মেগে উঠে গেলেন—

সূর্য ওঠার পর দিনের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে অর কমে এল রঘুর। একটু একটু করে আবার হাঁস হল।

রাপসা চোখে তাকিয়ে বললো—জল, একটু জল ছান—গলা শুকিয়ে কাঠ, খালি জল ভেঙা পাচ্ছে।

কে যেন একটু একটু করে মুখে জল দিল। ভালভাবে তাকাল রঘু। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর কুণ্ডিতে করে অল্প অল্প জল দিচ্ছিল লোচন। রঘুকে তাকাতে দেখে বললো—কিরে আর জল দেব, কেমন লাগছে ?

কোন কথা না বলে একটু কাল তাকিয়ে রইল রঘু। তারপর আঙুলে আঙুলে বললো—তুই পালায় আলি ক্যান—

—কি করবো, ডাকাতে হাতে মার খাব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আমি এসে খবর দিলাম বলেই তো তাকে নিয়ে আসা গেল—

—তোরে মারতো না—রঘুর কথা শুনে খোলা দরজার দিকে একবার তাকাল লোচন, তারপর চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো

—কি করে বুঝলি যে আমাকে মারতো না—লোচনের কথা শুনে একবার তাকাল রঘু, তারপর চোখ বুজে বললো—তুই কালাচাঁদের লোক দেওয়ানজীর চর।

লোচনের মুখশুকিয়ে গেল, পরক্ষণেই একটু হাসার চেষ্টা করে বললো—জরবিকাবে তোর মাথা ধারাপ হয়ে গেছে, ভুল বকছি তুই, চুপ করে ঘুমো এখন—

—আমি ঠিকই কইছি—চোখ বুজে বললো রঘু—ছোট কর্তায় গ্যাছেন কই ?

—রায় মশাই তো সারারাত বসেছিলেন, সকাল বেলা রাজবাড়ি গেছেন, আমি যাচ্ছি এখন, তুই ঘুমো—আঙুলে দরজা ভেঙিয়ে চলে গেল লোচন।

ছাবিবন্দ

উড়িয়া অভিযানের জন্তু তৈরী হলেন নবাব হুজা-অল্-মুল্ক -হিসাদ্দৌলা মুহম্মদ আলিবর্দি খাঁ মুহম্মত জঙ্গ বাহাদুর।

উড়িয়ার নায়েব-নাজিম রুস্তমজঙ্গ বিদ্রোহ করেছেন। নবাব হুজাউদৌলা আসাদ জঙ্গ বাহাদুরের জামাই রুস্তম জঙ্গ।

নবাব শিদ্দকুলির আমলে রুস্তম জঙ্গ ছিলেন হুগলীর ফৌজদার। তারপর হয়েছিলেন ঢাকার নায়েব-নাজিম। শেষে এসেছেন উড়িষ্যায়।

উড়িষ্যায় এসেই নানারকম ঘোট পাকাতে শুরু করেছেন। সরকবাজকে হটিয়ে আলিবর্দি খাঁ

নবাব হলেন। তবে বাংলার পক্ষে সেটা ভাল হলেও রুস্তমজঙ্গের ভাল লাগেনি। উড়িষ্যার কিছু জমিদার যোগ

দিয়েছে তাঁর দলে। মুর্শিদকুলি খাঁ কিষা শুজাউদৌলার

নিমক খেয়েছে এমন কিছু আমীর-ওমরাও এসে ছুটেছে। শুজাউদ্দৌলার নিমক তো হাজী আহম্মদ ও খেয়েছিলেন, আলিবর্দিও খেয়েছিলেন। রাজনীতি-কূটনীতির খেলায় নিমকহারামী করা নতুন কিছু নয়, পাপও নয়। বরং মামুষ হিসেবে, শাসক হিসেবে, রণকুশল সেনাপতি হিসেবে আলিবর্দি খাঁ যোগ্যতম নবাব। একমাত্র মুর্শিদকুলি খাঁর কথা বাদ দিলে সেই আঠারো শতকের প্রথম অর্ধে আলিবর্দির তুল্য আর কেউ ছিলেন না।

পবিত্র রমজান মাস শেষ হল। মুর্শিদাবাদে ঈদ-উল-কেতরের উৎসব হল খুব জাঁকজমকের সঙ্গে। তারপর অভিশানের আয়োজন শুরু করলেন নবাব। ফিরিজী বেনিয়াদের কুঠি থেকে গোলাবারুদ কিনছেন নবাব, রসদ-পত্তর যোগাড় করছেন।

বিভাধরও মুর্শিদাবাদে রয়ে গেছে এই কঁাকে কিছু বাণিজ্য করার আশায়। নবাবের মেজাজ-মরজির উপর যেমন দরবারের আমীরদের ভাগ্য নির্ভর করে তেমনি এইসব মুক্ত-বিগ্রহের সঙ্গে ব্যবসায়ীদেরও ভাগ্য জড়িয়ে থাকে। জিনিগ পত্তরের দরদাম ওঠা-নামা করে। যুদ্ধের সময় অনেক খরচ। নবাবকে খুশি রাখার জন্য বাণিজ্যে অবিধে পাবার আশায়, ব্যবসায়ীরা হয়তো মোটা টাকা খুঁজছিলেন, নজরানা দিলেন। তারপর সেই নবাব যদি লড়াইতে হেরে যান, হেরে গিয়ে শহীদ হ'ন, তা'হলেতো সর্বনাশ। ঋণের টাকাও গেল, ব্যবসায়ও যায় যায়। রঘুনাথের মাথায় জল দিতে দিতে নানা কথা ভাবছিল ভারতচন্দ্র। খুব করে মাথায় জল দিতে বলেছেন কবিরাজমশাই। তারপর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। রোজ তিনবার করে মাথায় জল দিচ্ছে। সময় হিসেব করে ওষুধ খাওয়াচ্ছে। গরম সৈক দিচ্ছে। কবিরাজি ওষুধের নানা অম্লপান। সব যোগাড় করেছে ভারত। রঘু তার মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো। ভাইয়ের চেয়েও বেশি। ভাইএরা যা করেনি রঘু ভাই করেছে। সেদিন ষষ্ঠিপদ

জ্যেষ্ঠ ৭

সঙ্গে কথা বলার পর আর দেওয়ানজীর সেরেস্তায় যেতে পারেনি ভারত। এদিকে সেই একপক্ষ কালের মেয়াদও শেষ হয়েছে বোধহয় গতকাল। হিসেব রাখেনি ভারত। রাখা সম্ভব ছিল না। রঘুর জন্তাই এই কটাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। অল্প কোনদিকের কোন কিছু ভাবার অবসর পায়নি।

রঘুর জরের প্রকোপটা অনেক কমেছে, কিন্তু ডান হাতের কবজি এখনো ফুলে আছে, ভাগ্য ভাল হাত ভাঙেনি। সর্বাঙ্গে ব্যথাও রয়েছে। মাথার ঘা শুকোতে অনেকদিন দেয়ি হবে, বলেছেন কবিরাজ মশাই।

ওদিকে কালাচাঁদ তখন চুপিচুপি বলছিল—আর দেয়ি করবেন না কর্তা, ওই নাপিত ব্যাটা আমাকে চিনতে পেরেছে।

নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় বসেছিলেন দেওয়ান রাজবল্লভ রায়। সন্ধ্যা হয় হয়। গৃহ-দেবতার মন্দিরে কাঁসর-ঘন্টার শব্দ হচ্ছিল। আত্মিক শেষ করে বৈঠকখানায় এসে বসেছেন রাজবল্লভ রায়। রোজ এই সময় কালাচাঁদ এসে সারাদিনের খবরাখবর বলে। বিকেল বেলা রাজবাড়ির সেরেস্তা থেকে ফিরে আসেন দেওয়ানজী। কোন কোন দিন জরুরী পরামর্শ সভা থাকলে সন্ধ্যার পর আবার রাজবাড়ি যেতে হয়। অনেক রাত অবধি বৈঠক চলে। ভাল-মন্দ নানারকম খবর নিয়ে আলোচনা হয়, গোপন পরামর্শ হয়। কদিন ধরে মহারাজ কীর্তিচাঁদ অসুস্থ। আম-দরবারে আর বসেন না, খাল-কামরায় বসে জরুরী কাজকর্ম করেন। আজও সন্ধ্যার পর যাবেন দেওয়ানজী। যাবার আগে কালাচাঁদের মুখে খবর শুনে বললেন—তোকে চিনল কি করে, তুই যে বলছিলি তখন খুব অন্ধকার ছিল—

—কি করে চিনল ঠিক বুঝতে পারলুম না, লোচন বললো কথাটা—কালাচাঁদের জবাব শুনে একটু চুপচাপ কি যেন ভাবলেন দেওয়ানজী, শেষে বললেন—তুই পাল্‌কি নিয়ে যা' ছোড়াকে নিয়ে সোজা দেবী সিংএর হেফাজতে পৌঁছে দিবি

—কিন্তু পরোয়ান না পেলে—কালার্টাদের কথা শুনে ধমক দিলেন রাজবল্লভরায়—সে ভাবনা আমার, তোকে যা বলছি তাই করবি, আজ বৈঠকেই মহারাজকে দিয়ে পরোয়ানা সই করিয়ে দেবী সিঙের কাছে পাঠিয়ে দেব আমাকে রাজবাড়ী পৌঁছে দিয়ে তুই পালকি নিয়ে চলে যাবি—

নমস্কার করে বেরিয়ে গেল কালার্টাদ। উঠোনে দেওয়ানজীর সেই আটবেহারার মকরমুখো পালকি মোতায়েন। একটু পরেই রাজবল্লভরায় রাজবাড়ি চলে গেলেন।

ভারত তখন রঘুনাতনের মাথা বুয়ে দিচ্ছিল? অনেকক্ষণ ধরে জলের ধারা দেবার পর আঙে আঙে মাথাটা মুছে দিল।

রঘুনাতন বললো—আপনে নালিশ করেন ছোটকর্তা, কালার্টাদ টাকা নিয়ে আমি চিন্তি পারছি—

—কি করে হবে, প্রমাণ আছে কিছু—ভারত জবাব দিল—তুই তো আর চোখে দেখতে পাসনি, শুধু গলার আওয়াজ শুনে—

—তা'বলি, অমনি ছাইড়ে দেবেন, কিছু করতি পারবেন না—রঘুর কথা শুনে বললো ভারত—কি করতে পারব বল, কালার্টাদের পেছনে হয়তো দেওয়ানজীর—

আবার বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে বললো রঘু—তা'হলে পালায়ে যান কর্তা, এখানে থাকলি বিপদ হবে—

—তোকে ফেলে যাই কি করে—বেপরোয়ান মত জবাব দিল ভারত—কোথাও যাব না, যা আছে কপালে তাই হবে, তুই ভাল হয়ে ওঠ, বিভাধর ফিরে আসুক, তারপর ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে—

রঘুকে ওষুধ দিল ভারত, পথ্য দিল দুধ সাবু। তারপর স্নান সন্ধ্যা-আঙ্গিক সেয়ে কাঁচকলা সেদ্ধ দিয়ে ভাত রান্না করল। একটু বি, একটু দুধ দিল। খাওয়া শেষ হতে হতে রাত এক প্রহর গড়িয়ে গেল। তারপর নিজের ঘরে এসে প্রদীপ জেলে পুঁথি-পস্তর নিয়ে বসল ভারত। বিশেষ কোন কাজ থাকলে রোজ এই সময় একটু পড়ালোনা করে। নানা

দুঃখ-দুঃশিক্ষার মধ্যে এইটুকুই যা শান্তি। বিভাধর থাকলে একএক দিন পাশা খেলতে ডাকতো কিন্তু কখনো অযোগ্য হলে যেত রূপমঞ্জরীর গানের আগরে। বিভাধরের পাশার আড্ডায় দু'চারজন শহরের বন্ধু-বান্ধব

আসতো। হই-হই করে অনেক রাত অবধি পাশাখেলা হতো। দু'একবার গিয়ে বসেছে ভারত। কিন্তু তেমন আরাম বোধ করেনি। পাশা খেলার চেয়ে এই পুঁথি-পস্তরের মধ্যেই অনেক আনন্দ, অনেক শান্তি।

নন্দলাল চক্রবর্তী মশাইর বাড়ি থেকে একখানা পুঁথি সংগ্রহ করেছিল। বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য-দর্পণ। সেখানাই একটু একটু করে নকল করেছে। নানা ভাবনা-চিন্তার জন্ত শবদিন যন লাগাতে পারে না। গত দশ বারো দিন কিছু কাজ হয় নি। রঘু তুরন্তই যাবার পর খুব অস্থির ছিল কটা দিন। কিন্তু আহত, অস্ত্রান রঘুকে দেখার পর থেকে কেমন শান্ত স্থির হয়ে গেছে ভারত। বুঝতে পেরেছে, ভাগ্য ফলতি সর্বত্র, ন চ বিভা, ন পৌরুষম। শুধু শুধু অধৈর্য হয়ে অস্থির হয়ে কোন লাভ নেই। তার সাধ্যমত যা করার সে করেছে। বিভাধর ফিরে না আসা পর্যন্ত আর কিছু করার নেই। আর কোন পথ সে দেখতে পাচ্ছে না।

একপ্রহর রাত গড়িয়ে গেছে। দারোয়ানদের ঘরে রামশরণ পাণ্ডে স্বর করে “রামচরিতমানস” পড়ছে। গোমস্তা গোপাল দশ মশাই দপ্তর বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছেন সন্ধ্যা লাগার কিছু পরেই। সদর-অন্দরের আর কোথাও তেমন সাড়া শব্দ নেই। দেউড়িতে মশাল জলছে। আর একটু পরেই দেউড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। তন্নর হয়ে সাহিত্য-দর্পণ পাঠ করছিল ভারতচন্দ্র। পালকি-বেয়ারাদের হুমহুম শব্দ শুনে চমকে উঠল। এত রাতে কে এল। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বারান্দার দাঁড়ান ভারত।

দেওয়ানজীর পালকি। দু'জন মশালচি, আটজন বেহারী, চারজন পাইক, সকলের সামনে কালার্টাদ মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি। মাথা নিচু করে সেলাম দিয়ে বললো—দেওয়ানজী তলব দিয়েছেন, রায়মশাই, আমার সঙ্গে যেতে বলেছেন।

—সে কি এত রাতে, কি ব্যাপার—

—সে আমি কিছু জানি না, আমাকে যা হুকুম দিলেন, তাই বলছি—

একটু ইতস্তত করে বেনিয়ান গায়ে, চাপর কাঁধে বেরিয়ে এল ভারত, লোচনকে ডেকে বললো—তুই রঘুকে একটু দেখিস লোচন, আমি কখন ফিরব বলতে পারছি না—

(ক্রমশঃ)

সেই অনল

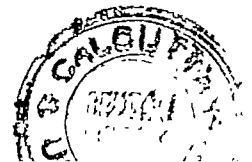
(আনন্দী ও অপলপা)

ডাঃ বি. দে

সরকারী চাকুরীর বনবাসপর্ব চলছে (তখনকার সময় তিন বৎসর পাহাড়ে চাকুরী-করা বাধ্যতামূলক ছিল)। লোহিত ভোলির ডেনিং হাসপাতালের চার্জ নেবার কয়েক-মাসের মধ্যেই পৌষ সংক্রান্তিতে পরশুরাম কুন্ত, দর্শন করার সুযোগ ঘটে গেল। সংক্রান্তি উপলক্ষে বিস্তর যাত্রী সদিয়া-শোনপুরা-তেজমুখ হয়ে হাঁটপথে বা গরুর গাড়ীতে এসে টিমাইমুখে জড় হতেন ও পরে ব্রহ্মপুত্র (লোহিত ?) নদ পার হয়ে আরো মাইল তিনেক হেঁটে ব্রহ্মকুণ্ড ও পরশুরাম কুণ্ডে পৌছোতেন। সৌভাগ্যক্রমে সদিয়ার এক বন্ধু সজীক তীর্থে মকর সংক্রান্তিতে স্নানদানাদি করতে যাচ্ছিলেন—আমি ডেনিং হতে রওনা হয়ে তাদের সঙ্গে তেজমুখ ক্যাম্পে যোগ দিলাম। সন্ধ্যা হবার আগেই যাত্রীরা সব আবার রওয়ানা হল, রাস্তা খুব ভাল নয়—বিশেষতঃ হাড়ির উপদ্রব লেগেই আছে।

শীতের রাত, নদী কাছেই—যেমন ঠাণ্ডা তেমনই ঘন কুয়াশা। মশাল জালিয়ে, হৈ হুজা করতে করতে টিমাইমুখ ক্যাম্পে রাত প্রায় ৮ টায় পৌঁছিয়েই সকলে আস্তানা খুঁজতে লেগে গেল। আমাদের জন্তু অবশিষ্ট রেস্ট হাউসের একটি কামরা খালি রাখা হয়েছিল। আর একটি কামরাতে ন স্থানং ভিল ধারণং গোছের অবস্থা। সব বাঙ্গালী তীর্থ যাত্রী, সকলেই সজীক। একটু বিশ্রাম করেই চৌকিদারকে নিয়ে ক্যাম্প ঘুরে দেখতে গেলাম—উদ্ভেদ ঔষধ বিতরণ,—সরকারী কর্তব্য সাধন। সাধুসন্ন্যাসীরা ধুনি জালিয়ে

বসেছেন, কেহ ভজন পূজন, কেহ জপতপ কচ্ছেন। টিমাই নদী এখানে ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে মিশেছে। পাহাড়ীয়া নদী ছোট কিন্তু বেগবতী।—ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের বেগের বর্ণনা করা বাতুলতা—হুই স্রোতের তাড়নে যে ঘনকুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছিল, তার সাথে চারিদিক থেকে ধূনির ধোয়া মিশে এক “ঘন আবরণে আচ্ছন্ন” বলতির সৃষ্টি হয়েছে। সাধু সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ একটু ষায়ের মলম চেয়ে নিলেন—অনেকেই কোনো ঔষধপত্র গ্রহণ করলেন না। অন্ত্যস্ত তীর্থযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। এদিকে চা ও খাবার তৈরী, বন্ধুপত্নী সমাদরের সহিত পরিবেশন করলেন। খাবার শেষ করে বিছানা একপাশে বিছিয়ে নিলাম। একটু পরেই আবার যেটুকু কাজ-বাকী ছিল, তা শেষ করতে আর এক চকরের জন্তু বেরিয়ে পড়লাম। সরকারী “চাঙ্গ বাথলোর” পাশেই এক বয়স্ক যাত্রী ও একটি মেয়ে ধুনি জালিয়ে বসেছিল। দুজনেই গুন্‌গুন্ করে রামনাম কচ্ছে—যেয়েটি কাপড়ের টুকরো গরম করে বয়স্ক যাত্রীর হুঁচোখে সঁক দিচ্ছে। চোখের কি অসুখ খবর নিয়ে বুঝতে পারলাম তখনকার দিনের দুরারোগ্য Trachoma রোগ। Pannier বাক্সে যে যে ঔষধ ছিল, তাই দিয়ে, কতদিনের রোগ ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতে,—যাত্রীটি বললে, “বাবুজী বৈঠিয়ে—আনন্দীমাদে ইনুনে তো ডাকদর ছায়—সবকুছ তুম্বনে উনুকো বাতলাও।” আনন্দী অষ্টাদশী স্ত্রী, গৌরবর্ণ, দীর্ঘাজী। মুখখানাতে যেন বেধনার ছায়া,—দীর্ঘদিনের



পথচলাতে বড় ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছিল। মাথায় চুলের বোঝা অবিভক্ত—কিন্তু রুদ্ধ; ছুটি চোখ বেশ বড় বড়; চোখের কোলে—কালি পড়েছে—নিরাভরণ। শুধু একখানা কমল জড়িয়ে বসেছিল।

—“টিক হায় পিতাঙ্গী, আপত আরাম করিয়ে” বলে সে তার বাবাকে অতি যত্নের সাথে শুইয়ে দিয়ে গিয়ে কমল ঢাকা দিলে। তারপর আমাকে তার বাবার অস্থির কথা বললে। এখান থেকে তারা সাধুদের সঙ্গে কলিকাতা হয়ে পুরীধাম যাবে। আমি কলকাতার বড় হাসপাতালের সব টিকানা লিখে দিয়ে তার বাবার চোখ সেখানে দেখাতে বললাম। আনন্দী তার বাবার চোখ ভাল হবে এই আশ্বাস পেয়ে বারবার বিধাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে থাকল। যিনি দুঃখ দিয়েছেন, যিনি দুঃখের কষ্টপাথরে পরীক্ষা করছেন, তিনিই এই নীরব প্রার্থনার সাক্ষী থাকলেন।—তার সেই সরলতামাথা হৃদয়ের মুখখানা সেই আশ্বনের আলোতে আরো হৃদয়ের মতো মনে হল। মনে হল আমার সামান্য ভরসা পেয়ে সে যেন আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেয়েছে। আমি তার বিষাদে ভরা হৃদয়ের মুখখানির দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিলাম—আনন্দী জিস্ট্রেস করলে আমি কেন তার মুখের দিকে অমনভাবে তাকিয়ে রয়েছি। অপ্রভিত হয়ে শুধু বললাম—“তোমার বাবাকে নিয়ে কোনো হাসপাতালে না যেরে তীর্থ করতে বের হয়েছ কেন, তাই ভাবছিলাম।” আনন্দী কোন ভূমিকা না দিয়েই বললে, “বাবুদা, পথে ইচ্ছে করে বের হইনি, পথই আমাদের ডেকে বের করেছে। বাবার তীর্থ করার ইচ্ছে বহুদিন থেকে ছিল। আমিই এখন তার সম্বল, আমার শক্তির বাঁকি—তবু আমার বাবার এই ইচ্ছে পূরণ করতে তাকে নিয়ে সাধুদের সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছি—বাবা চোখে ভাল করে দেখতে পায় না, তবু এই তীর্থভ্রমণ তার মনে বৃদ্ধি শান্তি এনে দিয়েছে। আমার বাবা বড় দুঃখী—আমি

আমরণ তার সেবা করব, তার দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করব। আমাদের দেশের লু-এর গল্প শুনেছ—এই লু যখন চলে তখন ঘর থেকে বাইরে কেউ বেরোয় না—এরকম একদিন দুপুর বেলায় আমি আমার এক সই-এর বাড়ি যেয়ে আটকা পড়ি—বাড়িতে মা ও আমার ছোট ভাই কুঁড়ে ঘরের ভেতর দোর দিয়ে শুয়েছিলেন—বাবা কাজে বেরিয়ে গেছেন। এমন সময় পাড়ায় আশুন লাগে—এই আশুনের বেড়াগুলো আমার মা আর ছোট ভাই পুড়ে মারা যায়। সে গ্রামে ঘরবাড়ী বলে কিছু থাকল না। খবর পেয়ে শহর থেকে আর্ধ্যসমাজ আমাদের সাহায্য করতে এসেন। ধীরে ধীরে আবার একটু একটু ঘর তৈরী হলো—আর্ধ্যসমাজ আমাদের খাওয়া পড়ার ও ছোটখাটো কাজ করে মেয়ে-পুরুষের রোজগারের উপায় করেছিলো। ছেলেমেয়েদের স্কুল-খুললো।

এদিকে বাবা সেই খবর শুনেই লু-এর মাঝেই ছুটে আসেন রাস্তায়। চোখে বালি পড়ে, তারপর সেই খোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর পাগলের মত ছোটোছুটি করে আমার মা ও ভাইকে খুঁজে বেড়ান—যখন টের পেলেন তারা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তখন হায় হায় করতে লাগলেন। সেই থেকে তার চোখের অস্থি। আমার বয়স তখন ১৪।১৫—যেহনৎ করে, গম ভেঙ্গে দিয়ে—সমাজ থেকে কিছু কিছু পাই, তখনও লজরখানায় আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা চলেছে—। সব ছেলেমেয়েদের কিন্তু খুব ভোরে পড়াশুনা করতে ইস্কুলে যেতে হয়। মেয়েরা সব একটা গাছতলায় বসে পড়ত—শহর থেকে মেয়েরা আসতেন, আমাদের পড়াতেন—অনেক রকমের হাতের কাজ শেখাতেন।—

দিন যায়, সকলে আবার গিলেদের ওপর বিশ্বাস যেন ফিরে পেয়েছে—আবার ঘর সংসার করতে হবে এই আশায় সকলে বুক বেঁধেছে। পড়াশুনা আমার বড় ভাল লাগত—ছোটবেলায় যা শিখেছিলাম তা আমার এই সময়

খুব কাজে লাগল—অল্পদিনের মধ্যেই আমি বাবাকে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে শোনাতে পারলাম। স্কুলে সকলে মিলে হুঁর করে ভজন গাইত—আমি ভজন গাইতে শিখলাম—বাবাকে ভজন গেয়ে স্তনাতাম—বাবার কত যে ভাল লাগত তা আর কি বলব। অনেকদিন পর নতুন একজন কর্মি আমাদেরকে পড়াতে এলেন। তাকে প্রথমদিন দেখেই মনের মধ্যে কেমন একটা আনন্দ বোধ করতে থাকলাম। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমি তার হৃদয়ের মুখখানাও দিকে তাকিয়ে থাকতাম। যাক “বাবুসাব”—সে সব কথা তোমাকে বলতে পারব না—আমি তাকে আমার সবকিছু দিয়ে হারালাম নিজেকে। তিনি আমাকে বিয়ে করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। এদিকে পাড়ায় কানাকুসুম চলছিল, বাবা তা শুনতে পেয়ে পণ্ডিতকে ডেকে বিয়ের কথা বললেন।—তিনি তার বাপমারি অনুমতি চাইতে বাড়ী গেলেন, কিন্তু আর ফিরে এলেন না। তার বাপ মা খবর পাঠালেন—যেয়ের বয়স বেশী, তার উপর সমাজে আমার ঠাই হবার নয় ইত্যাদি.....ইত্যাদি। আসলে তারা নাকি আমার চরিত্র ভাল নয় বলে খবর পেয়েছিলেন। বাবা পাড়ার লোকদের ধরে যেমন তেমন করে একটা পাত্র বোগাড় করলেন। আমি কলঙ্কিনী চরিত্রহীন—বিয়ে দিয়ে দেওয়াই মজল। বিয়ের তারিখ ঠিক হল—“সগাই” হল, কিন্তু বিয়ে আর হল না। —তার আগেই “গুটী” বন্ধ হয়ে চোরার আমার হাত থেকে রেহাই পেল। “সাগাই” হওয়া মেয়ের আর বিয়ে হোলো না। বাবা হুঃখে কষ্টে বিছানা নিলেন শুধু মুখে একটি কথা—আমি তীর্থে যাব—আর্য্যসমাজীরা ব্যাবার বললেন এসব করবার কোনো দরকার নেই—কিন্তু “মুগীয়ারা” তা মানলে না। আমার জীবনের সব সাধ আফ্লাদ সেই শেষ হলো—।

ইতিমধ্যে একদল সাধু “দ্বারকাধাম” দর্শন করে আমাদের গাঁয়ের কাছেই আশ্রয় নেন। তারা হরিদ্বারে কুন্তলান করে

তীর্থ দর্শনে বেড়িয়েছেন। বাবা সে খবর পেয়ে, তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, তাকে সঙ্গে নেবার জন্ত সে কি কাকুতি দিনতি। বাবাকে সঙ্গে নিতে কেউ আপত্তি করলেন না।—কিন্তু আমাকে নিয়েই মুক্তি দিচ্ছেন। সে মুক্তির আসান হলো এক বুড়ো সন্ন্যাসীর কৃপায়। তিনি আমাকে ডেকে বললেন,—বেটা তুমি ভয় করো না—আমরা ত অত হাটতে পারি না—তুমি আমার দলের সঙ্গে তোমার বাবাকে নিয়ে চলতে পারবে। শেষ পর্যন্ত তাই হলো—তার কৃপার আজ আমরা এই তীর্থে এসেছি। আমার মা ভাইয়ের শেষ চিহ্ন, আমার জনমস্থান, সন্ন্যাসীদের ছেড়ে আসতে বুক ফেটে হাহাকার উঠলো, কিন্তু পাছে বাবার মনে হুঃখ দেই সে ভয়ে চোখের জল পর্যন্ত শুকিয়ে গেল।

ঘুরে ঘুরে আমরা কানীধানে যাই—সেখানে ভেলুপুরার এক আশ্রমে আমরা কিছুদিন ছিলাম। স্নান দর্শন হয়ে গেলে গয়াধাম যাই সেখান থেকে কানীধাধাম হয়ে এখানে এসেছি। আমার বাবা আর যে হাটতে পারেন না—আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে—রামজী কি ইচ্ছে তিনিই জানেন। বাবুসাব, আমার মত অভাগিনী কেউ নেই—আমার মুখের দিকে তাকিও না।—তোমার আশীর্বাদ নিয়ে যাচ্ছি, বাবার চোখ যেন রামজী ভাল করে দেন।

জড়বুদ্ধির মত বসে বসেই স্তনলাম। কি অপূর্ব নিষ্ঠা গ্রামের দরিদ্র পরিবারের—সাধারণ মেয়ের এ কি কর্তব্য-জ্ঞান। আজ এই ঘটনার সহিত আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর জীবনের তুলনা করে বড় হুঃখ হল। একমাত্র সন্তানকে—“মামুসাব” করেছিলেন, বড় আশাকরেই। আজ প্রায় অন্ধ হয়ে জীকে নিয়ে পরের অশ্রুগ্রহে দিন কাটাচ্ছেন। সন্তানটা উধাও।

রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে—বিশ্রাম আর হবার আশা নেই—ভেবে জিনিষ পত্রের আবার গোছপাছ করতে রেষ্ঠ হাউসের

বারান্দায় শুধু পা দিতেই, পাশের কামরার এক ভদ্র লোক আমার হাতধরে সেই কামরার প্রায় টেনেই নিয়ে গিয়ে একটা মহিলাকে দেখিয়ে বললেন,—“আমার জ্বর মুচ্ছা হয়েছে, একটু দেখুন।” জ্ঞানানো মোমবাতির আলোকের মাঝে মহিলাটি শুয়ে আছেন—জ্ঞান নেই। তাহার বাঁ হাত খানাতে নাড়ি দেখতে গিয়ে দেখতে পেলাম উচ্চা দিয়ে নাম লেখা রয়েছে “অপরূপা”—নাড়ি পরীক্ষা করে ভদ্রলোককে বললাম, “ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিন—ভয়ের কিছু নেই।” তার এই হিষ্টিরিয়ার ব্যাখ্যার বিবরণ দিতে যেয়ে বললেন, “ডাক্তারবাবু, আপনাকে দেখে অবশি শুধু বলছেন “আমার ছেলে ফিরে এসেছে”—আপনাকে দেখার পর পাশের কামরায় মেয়ে আপনার সব খবর নিয়ে এসে বললেন—এই ছেলেটা ডাক্তার, আমার ছেলের নামেই ওর নাম, দেখ সেই চেহারাই—সেই সব কিছু—তারপরই মুচ্ছা যান। আমাদের একমাত্র ছেলে ডাক্তারী পাশ করে ময়মনসিংহের একটি মফঃস্বলের হাসপাতালে চাকুরী নিয়ে যার। পূজার সময় বাড়ি আসবে বলে চিঠি দেয়—ঠিক সময়ে নৌকা করে রওয়ানাও হয়—তারপর তার আর খোঁজ নেই।—খবর নিয়ে শুধু জানতে পারি—ঐ দিন রাত্তিরে ঝড়ের মুখে কয়েকখানা নৌকা বড় নদীতে যেয়ে পড়ে—হয় সে সব নৌকা ডুবেছে, না হয় কোথাও ভেসে গেছে—আমার বাছা আর ফিরে এলো না।

ভাবলাম, কি দুর্দৈব ব্যাপার, আজকের দিনটা কেটেছে রাস্তা চলার কষ্টে আর রাতটা কাটিছে সব দুঃখের কাহিনীর ভেতর দিয়ে।

ভোরবেলা হাতমুখ ধুয়ে রওয়ানা হতে যাব, এমনই সময় পাশের কামরায় বাবার জন্ম ডাক পড়ল। মহিলাটি অস্থির হয়ে দেশ থেকে যে সব খাবার এনেছিলেন, তাই-একটি রেকাবীতে নিয়ে বসেছিলেন। যেতেই শুধু বললেন “খেতে বসো”—সে অমরোধ্য উপেক্ষণীয় নয় ভাই দিরঙ্গিন না করে

বলে পড়লাম,—কিন্তু একেও সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেলাম না।

অস্তিত্ত সব যাত্রীদের নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করে—আমি আমার বন্ধু আরো ২৪টা সরকারী কর্মচারী সহ যখন নদী পার হলো তখন বেলা শেষ হয়ে আসছে। তীর্থে পৌঁছুতে রাত হল। পাতার তৈরী কুড়ে ঘরে অভিন জেলে (সেখানে রাজিতে ঝড়ের মতন বাতাস বইতে থাকে) কাটানো গেল। উষা স্নান করেই যাত্রীদের ভিড়ে মিশে গেলাম। অপেক্ষা করার উপায় ছিল না, সেদিন সন্ধ্যায়ই ডেনিং পৌঁছুতে হবে।

ব্রহ্মকুণ্ডের জল বরণা হয়ে পাহাড়ের বুক চিরে বইছে, আর সে জল পাশেই ব্রহ্মপুত্রের ঘূর্ণীপাক খাওয়া জলের সঙ্গে মিশেছে। এই জলের তিন দিকেই উঁচু পাহাড়। একটা উঁচু অংশ ব্রহ্মপুত্রের পাড় হতে কিছুটা জলের ভেতর পর্যন্ত চলে গেছে—সেই হেন পাহাড়ের মাঝখানে একটা মস্ত বড় পাথর আটকানো রয়েছে—ঐটেই পরশুরামের কুঠার। ব্রহ্মকুণ্ডের জল পাহাড় ভেদ করে বেরিয়ে এসেই ব্রহ্মপুত্রের জলের সঙ্গে মিশেছে—সে জল বরফগলা জল, ভয়ানক ঠাণ্ডা সেই জলে প্রথম স্নান করতে হয়—। বাস্তুর পাত ঢালু হয়ে ওলের নীচে ভলিয়ে গেছে—পাড়ের কাছে জলের স্রোত নেই বলে সবাই সেখানে স্নান করেন। কবে সে কুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে তা ঠিক উল্লেখ করতে পারেনা—সেখানে স্নান করে ব্রহ্মকুণ্ডের জলে স্নান করতে হয়। সে জল গরম বলে ঠাণ্ডা জলের স্নানের পরে শরীরেরমানি দূর করে। সেখানেই দুই পাশের হুউচ্চ পাহাড় ঘন বনানী স্থানের মাহাত্ম্যও যে বাড়িয়ে দিয়েছে। স্রোতের বেগ অবর্ণনীয়—কোথাও বড় বড় পাথরের উপর জল ধাক্কা খেয়ে উপড়ে ছিটকে পড়ছে কোথাও ঘূর্ণী পাক, কোথাও ঘন পুঞ্জীভূত ঘন চোখের নিমেষে ভেসে যাচ্ছে—অপূর্ব কিন্তু ভয়ানক দৃশ্য।

স্নানান্তি শেষ করে তথাকথিত ঘরে ফেরার সময় অপরূপা

দেবীর সে কি কামা। পোটলাতে বেঁধে খাবার সঙ্গে
মিলেন। ভাবলাম তীর্থে এসেও উনি শাস্তি পান নাই।

আনন্দী আমাকে দেখে একটু স্নানহেসে বললে বাবুসাব
চললে—ভগবান তোমার ভাল করুন। তাঁর কাছে আমার
বাবা যাতে ভাল হন আমার জীবনের দুঃখ কষ্ট যাতে দূর হয়
তার জন্য বলো—। স্নানলিভ কর্তে তার বাবাকে গাইয়ে
শোনাতে লাগল রামচরিত মানস—

আমু বহু মৈ ধন্ত অতি যত্ন্যপি সব বিধিহীন

নিজ জন জানি রাম যোহি সন্ত সমাপন দীন।

ভারাক্রান্ত মনে—হুটী ছুধিনীর জীবনের দুঃখের কাহিনীর
স্মৃতি নিয়ে দেয়ার পথে পা বাড়লাম। *

* (১তম ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

খানকস্নেক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
শ্রীগীতা	৬.০০	বাংলার ঋষি	৩.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫.০০	বাংলার মনোবী	১.৩০
ভারত-আত্মার বাণী	৫.০০	বাংলার বিদ্বান	২.০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১.৫০	বীরভৈ বাঙালী	১.৫০
কর্মবাণী	১.২৫	ব্যয়ামে বাঙালী	২.০০
Soul of India Speaks	5.00	বিজ্ঞানে বাঙালী	৪.০০
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.		রাজর্ষি রামমোহন	১.৫০
বিজ্ঞানাগর	২.২৫	রবীন্দ্রনাথ	১.২৫
মানুষের মত মানুষ	৭৫	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১.৫০
শিশু রামায়ণ	৬২	আচার্য জগদীশচন্দ্র	২.৫০
শিশু মহাভারত	৭৫	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১.৫০
		॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥	
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :		১৫ কলেজ স্কোয়ার :	কলকাতা-১২

দীপ্তি

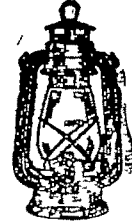
আপনার নিত্য প্রয়োজনে

দীপ্তি লম্বম—এর পরিচয় নিম্নরোজন,
এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে
আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর
কম কেরোসিন খরচ।

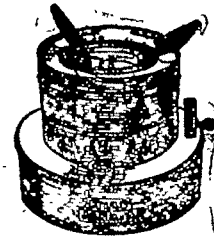
খাস জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য
প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ।
এই কেরোসিন ঠোড ব্যবহারে কোন
ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে
সুন্দর, খরচে লাভান্বিত। অল্প সময়ে যে
কোন রান্না করা যায়।

‘দীপ্তি’ মার্কা এম্বামেলের বাসন—
অল্প বিনয়ের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর
গুণের দ্বারা সম্বদ্ধ হচ্ছে।

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল
ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
৬১ ও ১২ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২



দীপ্তি লম্বম



খাস জনতা



এম্বামেলের বাসন

Kaipana am...

পুস্তক পরিচয়

উপন্যাস

সীমান্ত শিবির—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়;
গ্রন্থপ্রকাশ-৫-১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা—৯;
দাম—আট টাকা।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একটি লোককান্ত নাম। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে সাহিত্যে যে সীমানাকে বাংলা দেশের তুলসী মঞ্চ, সজনে ফুল পুঁইমাচাকে ছাড়িয়ে দুরায়ত দিনান্তে প্রসারিত করায় প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করেছি শচীন্দ্রনাথ সেই সাধনা-ধারার একজন সিদ্ধিলব্ধ শিল্পী।

অভয়াকে নিয়ে বার্মা যাত্রার চিত্র অথবা সে যুগের কিছু কিছু ভ্রমণ চিত্রে বাঙালী চরিত্রকে দূরের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রবণতা দেখেছি শচীন্দ্রনাথের শিল্পীমন সেখান থেকে ভিন্ন পথগামী। সিন্দুর টিপ, নীলসিন্দু বিশেষত দেবদাসী প্রকাশিত হবার পরে এই লেখকের কাছ থেকে যে প্রত্যাশা আমরা করেছিলাম সীমান্ত শিবির তার সার্থক পরিণতি।

সীমান্ত শিবিরের পটভূমি দক্ষিণাভ্যে উটকামণ্ড জনপদ। বিশ্বব্যাপী যে Totalitarianism এর উত্তাল তরঙ্গ প্রবহমান তাতে বহু জাতির অবলুপ্তি ঘটেছে, দক্ষিণাভ্যে টোডা জাতি তার থেকে বাদ যায়নি। সীমান্ত শিবির এই অবলুপ্তির শেষ পর্যায়ের এক অশ্রুসজল কাহিনী।

এই কাহিনীর সময়কাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বাংলা দেশের অসহযোগ আন্দোলনের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

ভৈর্য ৮

কুসংস্কারের বেড়ালালকে ডিঙিয়ে একটা জাতির শেষ ধারা কি ভাবে ধীরে ধীরে বর্তমানের সময় তরঙ্গের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে শচীন্দ্রনাথ হুনিপুন শিল্পীহস্তে তা বিবৃত করেছেন। আর এই মিশে যাওয়ার সন্ধিলগ্নের ওপর কতিপয় ভীত সম্ভ্রান্ত নরনারীকে এনে দাঁড় করিয়েছেন।

চরিত্র উপভাসে অনেক। Saga ধর্মী তিন পুরুষের কাহিনী বিবৃত করতে গেলে এটাই স্বাভাবিক। পথের পাঁচালীর শুরু হয়েছিল হরিহরকে দিয়ে শেষ হয়েছে কাঁজলে এসে। এ কাহিনীরও শুরু টুরার মাকে দিয়ে শেষ হয়েছে তার পৌত্রীতে এসে। দীর্ঘ জীবন ধারার এক বিস্তৃত তরঙ্গ।

সীমান্ত শিবির শান্তরগের কাহিনী। ক্রোধ ক্ষোভ ঘৃণা বিদ্বেষ সব কিছুকে ছাপিয়েও যে রস এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে তা বোধহয় আমাদের বলতে চায়—“ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়া লাভ কি, কেমন হৃদয় এই শান্ত যমুনার জল কালের তরঙ্গে বহিয়া যাওয়া কত আনন্দের.....” এই বহিয়া যাওয়ার কাহিনীটির মূলহর বোধকরি কালজয়ী হবে। সাহিত্য জীবন মহন জাত বিষামৃত। টুরা, বিশ্ব, স্বপ্না, পণ্ডিত, গেম্বা,—তাদের পশ্চাদভূমিতে ট্রিয়েকজি দেবী, Nomadic cult এর একটি বাতাবরণ এই কাহিনীটিকে এমন একটি পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করেছে যে পাটকণ্ঠও কাহিনীর তরঙ্গে তরঙ্গে নিজের অজান্তেই যেন সেই জগতে গিয়ে হাডির হয়। কাহিনীর সমাপ্তিতে এসে যখন সে নিজের ভূমিতে আবার প্রত্যাবর্তন করে তখন মনটা

আগুনতেই ভারী হয়ে থাকে। এই ভারী হওয়ার আধাদটুকুই অমৃতের আশাদ। শচীন্দ্রনাথ সেই ব্রহ্মবাদ সাহোদর রসের ভগীরথ হিসাবেই উপজ্ঞানের নেপথ্যালোকে রয়েছেন। বাঙ্গালী পাঠক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বিজয়কুমার ঘোষ

নূতন কাব্য গ্রন্থ

মৃত শিশুদের জন্ম টকি। অমিতাভ দাশগুপ্ত। সাহিত্য
মগ্ন বেলাভূমি। মৃণাল বসুচৌধুরি। সাহিত্য

মুজুন তরুণ কবির দুটি কাব্যগ্রন্থ, শেষের জন তরুণতর। অমিতাভ দাশগুপ্তের রচনা আমাদের ভাবায়, ভাবায় এই কারণে যে তাঁর বিক্ষুব্ধ মনের মুখোমুখি হই আমরা। বুদ্ধি-দীপ্ত এক তরুণ চারিত্র্য এই অবক্ষয়ী যুগের নানা পারিপার্শ্বিকে নিজেকে প্রকাশ করার আগ্রাণ চেষ্টা করছে। তাঁর চিত্রকল্প, বাস্তবজগৎ সমস্তই এক সংবেদনশীল মনের তীব্রতাকে প্রকাশ করে। কোন একটি কবিতার বিশ্লিষ্ট একেই ভাই অনুভব করা যায় না, সব কটি কবিতা মিলে যেন এক উচ্চগ্রাম অর্কেষ্টার ধ্বনি-প্রতিক্রিয়া প্রবলভাবে ঘুরে ফেরে চারদেয়ালের মাঝখানে। এরি মধ্যে মাঝে মাঝে স্তম্ভিত পদাবলীতে বিরামের আভাস আছে : মহারাগী মালাকার / অঙ্গল সময়ে মালা গাঁথা / বচনকুহল উপহার / নিলে ধস্ত হবে কথকতা...। কিংবা সেই আশ্রয়ভাষণ : একেকটি নক্ষত্র নেভে বড় অসহায় মনে হয় / আগারো প্রত্যয় চাই উত্তর-তিরিশে / কিছু পদচারণার যোগ্যভূমি পুন্ডিত কানন / ক্ষরিত শোণিত থেকে উড়ে যায় লক্ষ কানামাছি...।

মৃণাল বসুচৌধুরীর কাব্যভাষা শাস্ত্র ধীরগতিতে বহমান।

নতুন যুবার অকারণ অভিমানের মত জীবন সম্পর্কে তাঁর অনেক অভিমান ফুটে উঠেছে। অত্যন্ত ধীরে সলজ্জ ভাষণে তিনি যেন নিজের কথা বলতে চেয়েছেন : অথচ এখন ম্লান হয়ে এলো বেলা / রোদুখ ক্রমে বিধাদিত অভিমানে : তোমার চোখের সন্ধান অবহেলা / আমার পৃথিবী স্পন্দন উঠানে—/ ম্লানতায় কেন ছায়া ফেলে বিধাহীন। কিংবা, তোমাকে দেবার মতো আর কিছু নাহি যে আমার / সামান্য প্রেমিক আমি পড়ে আছি অন্ধকার ঘরে /

তাঁর কবিতার পরিচ্ছন্নতা যে কোন পাঠকেরই ভাল লাগবে।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

অবেলায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ কোং। ৩৭৫

যদ্বান্তর নিম্নগণ্যবিস্তৃত বাঙালী সমাজের ছবি আমাদের প্রিয় কথাসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর হাতে ভাল খোলে। আলোচ্য উপজ্ঞানটিতে আমরা সেই সমাজই চিত্রিত হতে দেখি ; এবং উপজ্ঞানটি আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ এই কারণে যে এর নায়ক ও পার্শ্বনায়কে বা সবাই তরুণ যুবক, মাঝে মাঝে এদের ‘টিন-এজার’ ভাবতে ইচ্ছে করে—এরা বয়সে ছোট হলেও জীবনের অনেক কিছু জানে, এরা ‘দরকারে সদরকারে’ উঁচু গলায় হাসে, জোরে কথা বলে, প্যাকিং বাস্তব ওপর চাটি মেরে তবলা বাজায়, আর যখন খুশি হয় মুখের ভিতর হঠাৎ আঙুল গুঁজে দিয়ে শিট দেয়।” কেউ কেউ হয়ত এদের সমাজের ‘আগারডগ’ বলতেও বিধা করেন না, কারণ এদের চাকরি নেই, বারোয়ারি পুজোর টানাতোলা এদের পেশা, কখনো কখনো বকাসিও করে এরা, কিন্তু এরাই আবার সমাজের ভদ্রলোকদের বাঁচিয়ে রাখার জন্তে নিজেদের প্রাণ দিয়েও আপদেবিপদে কাঁপিয়ে পড়ে। এই বিক্ষুব্ধ যুগেরই

প্রতিচ্ছবি যেন স্বপ্নাম, 'কাজেই সব অসং ভাবতে গিয়ে কেমন যেন একটা গোলকধাঁধায় পড়ে গেল স্বপ্নাম। দরকার নেই বাবা সৎ হয়ে, মনে মনে সে হেসে বলল, বরং আমি নিজেকে হাসপাতালের একটি রুগী বলে কল্পনা করছি। হাসপাতালের বেড-এ শুয়ে কোন একটা জানালা দিয়ে আকাশের তারা দেখছি। অস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকার মতো আরাম পৃথিবীতে আর কিছু নেই।' নায়ক চিন্তা করে 'সংসারে প্রেম ভালবাসা বলতে কিছু নেই—সব ছেঁদো কথা। যেন স্বপ্নামের কানে ভলুটু মন্ত্র দিয়ে গেল। দুনিয়ার সবাই যার যার স্বার্থ নিয়ে আছে। তবে কি না, আমি তোমার ভালবাসি—তোমার ওপর আমার টান আছে। স্বার্থসিদ্ধির ওস্ত মারে মারে এমন ভান করা দরকার।' নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের স্বথঃখের কাহিনী এই উপন্যাস। অজপ্রচলিত এই উপন্যাসে, ইনটেনসিভ ধরণের রচনা হয়ে গেছে। দেড়শো পাতার মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে দেড়হাজার পাতার এক্সটেনসিভ উপন্যাস হলে এই বিফল যুগের সক্ষম মহাভাড়া হয়ত রচনা করতে পারতেন লেখক।

আর্য দেব

অমৃত আলোতে। হেরমান হেসে। অমুবাদ : শিউলি মজুমদার। রূপা এণ্ড কোং। ছ' টাকা।

ভারতীয় মিশনারি সম্প্রদায়ের মধ্যে জার্মানিতে ১৮৭৭ সালে হেসসের ওয়াল বলে তাঁর প্রতি আমাদের কিছুটা দুর্বলতা থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর নিজের রচনার ক্ষেত্রে তিনি টমাস মর্ন কিংবা কাফকার সমগোত্রীয়, যদিও মানের ব্যাপ্তি ও কাফকার দৃষ্টবোধ তত প্রবলভাবে তাঁর মধ্যে নেই। তিনি একাধারে কবি এবং ঔপন্যাসিক। তাঁর প্রতিভার বিকাশে

লিরিক থেকে এরিকে অগ্রসর হই দেখা যাবে। হেসসের একটি বিশিষ্ট শিল্পপ্রকরণ আছে—ছুটি চরিত্রেব মধ্য দিয়ে তিনি দুটি চরম সত্যকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে সম্বন্ধের পথ খোঁজেন। আলোচ্য গ্রন্থেও একদিকে একজন জীবনশিল্পী অপরিদিকে একজন তরুণ তাপস রয়েছেন। তাঁদেরই জীবনের সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে এখানে। শ্রীমতী মজুমদারের স্বরস্বরে অমুবাদ পাঠকের ভাল লাগবে। প্রায় দুশো পাতার বই ছ' টাকা—দামটা একটু বেশি মনে হয়।

আর্য দেব

একটি গুলির শব্দে। বাহুদেব দেব। পরিবেশক : গ্রন্থ নিগম, ৪৮১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—১। মূল্য ছ' টাকা।

বাহুদেব দেব একজন উল্লেখ্য নবীন কবি। বাঙলা দেশের বিভিন্ন সাহিত্যপত্র এবং বার্তানিবাণ পত্র পত্রিকাতে তাঁকে নিয়মিত দেখতে পাই। এমন একজন কবির প্রতি আগ্রহ স্বাভাবিক আগ্রহ সত্ত্বেও এই গ্রন্থের আলেখ্য লিখতে কম-বেশী তিন মাস নেগে গেল। মাঝেমাঝেই সম্পাদকের তাগিদ এসেছে। এই বিলম্বের হেতু বুজতে গিয়েই সম্ভবত আমি গ্রন্থটি সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া জানাতে পারবো।

বাঙলা কবিতার পাঠকদের আর জানতে বাকি নেই যে কবিতা এখন আর ছন্দ, মিল, Syntax-এ নিখুঁত নিটোল ভাবে বলাহো হয় না। অন্তত ষাঁদের রচনায় সেই প্রয়াস থাকে তাঁদের প্রতি আধুনিক পাঠকের গভীর অনাগ্রহ। এই কবিতাগ্রন্থ হাতে নিয়ে প্রথমে মনে হয়েছিল বাহুদেব আমাদের সেই সব নিখুঁত নিটোল ব্যাপারে নিয়ে যেতে চান যেখানে কবিতা নিছকই শিল্প—জীবনের প্রাত্যহিকতার ঘাম, তেল আঁশ, মূন যেখানে আদৌ অপরিহার্য নয়। বস্তুত প্রথম

দু-তিনটি এবং ভিতরের আরো দু'একটি রচনায় এই অস্বস্তিকর অবস্থার আভাস পেয়ে রইতি মুড়ে রাপি। ধরে নিই বাহুদেব আমার কবি নন। কয়েক সপ্তাহ বাদে এক আকাশ বর্ষণের সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যখন বাড়ি ঘর মানুষজন সব কিছুকে অর্থহীন আর নিজেকে বহির্বিধ থেকে ভীষণ বিচ্ছিন্ন বোধ হচ্ছিল তখন অন্তমনস্কভাবে “একটি গুলির শব্দে”র পাতা উন্টাতে গিয়ে তার অমোঘ পংক্তিগুলি আবিষ্কার করতে পারি। বুঝতে পারি এই অনুপ্রবেশ প্রায় প্রত্যাদেশের মত, বাহুদেব দেবের কাব্যজগৎ আমার কাছে ক্রমে দৃশ্য হয়ে ওঠে। সত্যিই যেন তিনি তুড়ি দিয়ে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেওয়ার স্পর্শ রাখেন—

“তুড়ি দিলে এই যান্ত্র

বীজ থেকে গাছ উঠবে, গাছ ভবে পাতা ফুল ফল।

তুড়ি দিলে ফাঁকা বাতাস ভরে যাবে রঙীন কাগজে।

এক বাঁক কবুতর বুক থেকে কেমন সহজে

উড়ে যাবে, অদৃশ্য রুমাল ওড়ালে অবিকল

চৈতন্যের চাঁপার গন্ধে ভরে দেয় ঘর।”

এই আলোচনাব পাঠক নিশ্চয়ই উপরোক্ত স্তবকে একজন অতি-লৌকিকতায় বিশ্বাসী কবিকে খুঁজে পাচ্ছেন। বলতে দ্বিধা নেই, ক্ষীণতম এই গ্রন্থের অনেক কবিতার এই মিষ্টিসিঁজম্ আমাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। উদাহরণতঃ “হঠাৎ ডেকে” “অলৌকিক বীণা” “বুকে নিয়ে সুর্যোদয়” প্রভৃতি কবিতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। “অলৌকিক বীণা” কবিতায় ছটি লাইন ভূতগ্রস্ত বর্তমানের বিলানের মূর্তিতে পাড়িয়ে আছে যেন—

“কলম ধরলে হাত কাঁপতে থাকে” যেন ৩০২-এর আসামী।

আরেকটি হত্যার দায়—ডেটলে সাবানে হাত বুই।

নির্জনতা নান্নী এক ভূতে পাওয়া আধ যুবতীকে

একটি ভোট দিয়ে শেষে বিছানায় শুই

বাজারে নারীর সঙ্গে—ভয়ে তার মুখও দেখিনা।

বহুকাল শুনিয়া যে অলৌকিক বীণা।”

ছন্দ মিল প্রসাধন ছাড়াও সংলাপের যে কবিত্ব কথোপকথনের মাঝেও আমাদের আশ্রয় বিদ্ধ করে সেই সংলাপ জীবন থেকে নির্বাচনের অসাধারণ সক্ষমতা তিনি দেখিয়েছেন।

“ইনসমানিয়া” কবিতার প্রথম পংক্তিতেই আছে চমক

“চোখের উপর উট হাঁটতে থাকে। বাপির হৈ-চৈ এই কবিতায় আবার যখন দেখি

“—লু বইছে রেটিনার

নির্ঘেষ মরুতে। ডিসপোজালে কেনা টাইমপিস

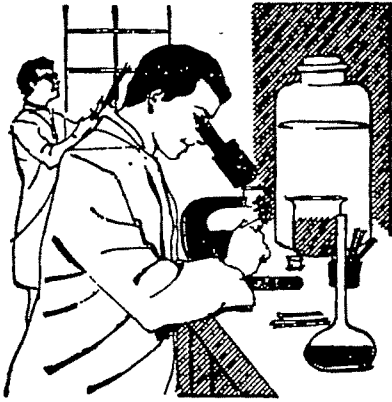
ছুটো টিকটিকি, তিনটে আরন্তলো নিয়ে ক্যানিউট

তখন নিদ্রাহীনতার স্মারক ছবি আঙুন রঙে ধরা পড়ে। কিন্তু বাহুদেবের কবিতায় অনেক ক্ষেত্রে যে নিষ্ঠুর, নিরাসক্তি লক্ষ্য করা যায় কবিতা নির্বাচনে তা কেন অনুপস্থিত, সেটা বুঝে উঠতে পারিনি। “নিজের প্রস্তাব” ও “প্রতীক্ষা আছি” এই দুটি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী আধুনিক রচনার মাঝখানে “অন্ধকারের গন্ধরাজ” পড়ের “অন্ধকারের গন্ধরাজ ছুঁলের রাতে কাঁপে” ইত্যাদি আমাদের বিমুগ্ধ করে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের পর বাহুদেব এখন নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় মেতে উঠেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক রচনা লক্ষ্য করলে মনে হবে এই গ্রন্থের যে সব পরীক্ষা কিছুটা সার্থকতা পেয়েছে সেগুলির পুনর্বিচারে তিনি এখন যথ। একজন যথার্থ আধুনিক কবির বিবর্তনের সূত্র হিসাবে এই গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান। তবে গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই ও মলাটের ব্যাপারে কবি চরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

মানস রায়চৌধুরী

দ্বিবিধ উপকারী কেশ তৈল



- মাথা ঠাণ্ডা রাখে
- স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশবর্ধনে সাহায্য করে

জীবনের বিভিন্ন বৃত্তিতে আজ নরনারী নির্বিশেষে সকলকেই মাথা ঘামাতে হয়। তাই তাঁদের পক্ষে এমন কেশ তৈলই বিশেষ উপযোগী যা একাধারে তাঁদের মাথা ঠাণ্ডা রাখে এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশবর্ধনে সাহায্য করবে। আয়ুর্বেদীয় মতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত ভৃঙ্গবাজ লতা ও অমৃত গাছগাছড়ার ভেষজ গুণসম্পন্ন সেই অতুলনীয় কেশ তৈল হ'ল—



ক্যালকেমিকোর

ভৃঙ্গবাজ

স্বরভিত
মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল

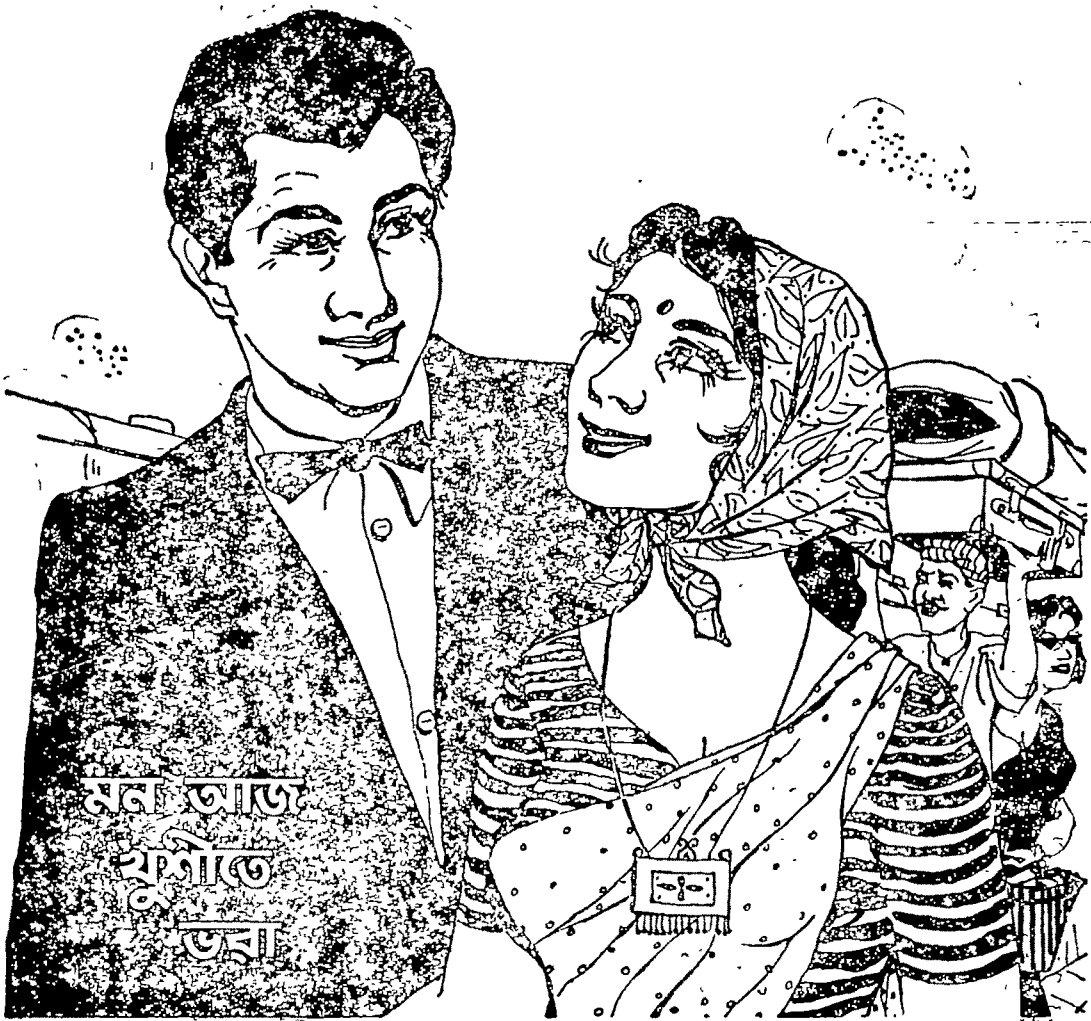
ক্যালকাটা কেমিকেল কর্তৃক প্রস্তুত

লেক্স তামাকটা ঠিক বলে টেকা দিয়ে চলে!

ক্ষত কাটতির দিক দিয়ে এদেশে তো বটেই, ভারতের বাইরেও রপ্তানি
সিগারেট হিসেবে লেক্স বাজি মাৎ কবেছে। লেক্স সবার সেরা—না
খুব মিঠে, না খুব কড়া। লেক্স—এর আসল জাদু সেইখানেই।

সবার সেরা
তামাকে গড়া...
না খুব মিঠে,
না খুব কড়া...





মন আজ
খুসীতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার
অব্যর্থ মহোষধ প্রতিদিন আহারের পর
দুইবার করে দু'চামচ হুডসজীবনীর সঙ্গে
চার চামচ মহাজাকারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্রান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা



বধ্যাক ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আয়ুর্কোমিশনারী, এফ, সি, এস, (লন্ডন),
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাঙ্গলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের কৃতপূর্ব
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি, বি-এস, আয়ুর্কোমিশনারী।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় বোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

দীপ্তি

আপনার মিতা প্রয়োজন

দীপ্তি লম্বম—এর পরিচয় নিম্নরোজন,
এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে
আছে মজবুতী গঠন, স্নানর আলো আর
কম কেরোসিন খরচ।

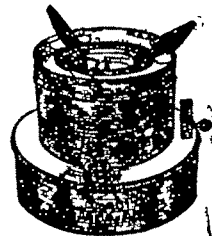
খাস জনতা কেরোসিন কুকার—নিভা
প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ।
এই কেরোসিন ঠোত ব্যবহারে কোন
ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে
সুন্দর, খরচে সাশ্রয়। অল্প সময়ে যে
কোন রান্না করা যায়।

‘দীপ্তি’ মার্কা এম্বায়েলের বাসন—
অল্প বিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর
গুণের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে।

**বি ওরিয়েন্টাল মেটাল
ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড**
৩৭ ও ৭৭ বিপিন বিহারী পান্ডুলী ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-১২



দীপ্তি লম্বম

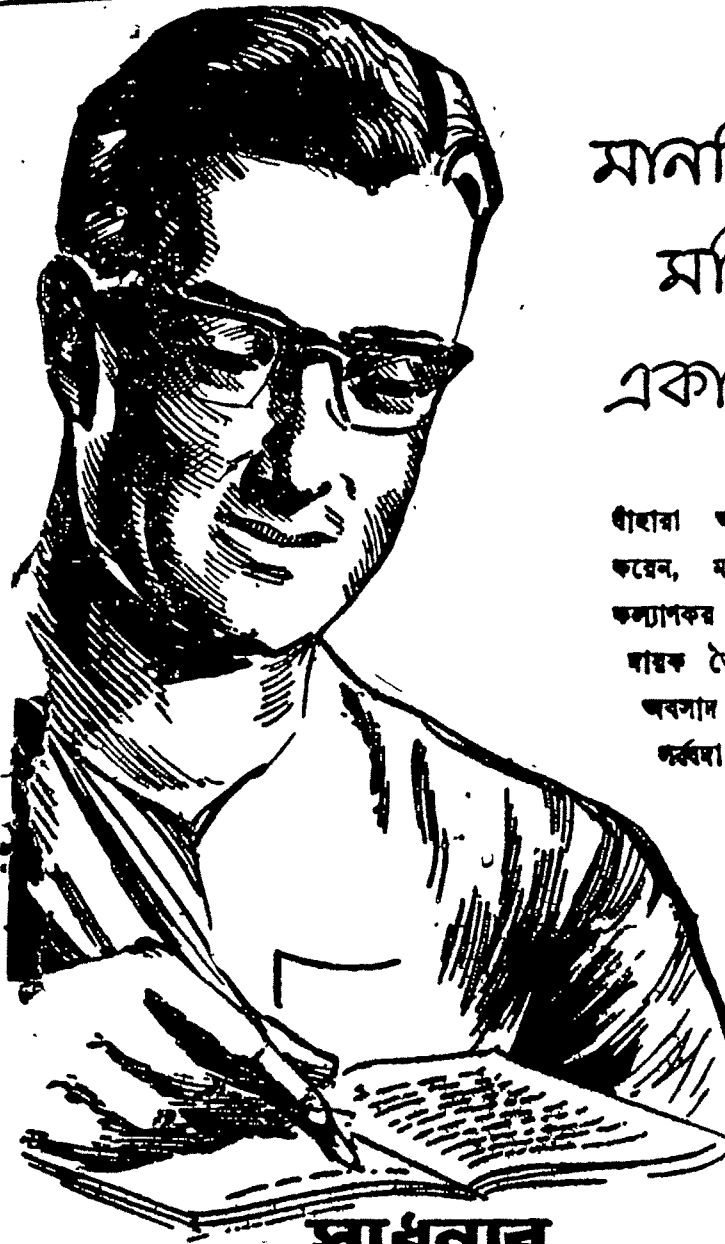


খাস জনতা



এম্বায়েলের বাসন

Katpans



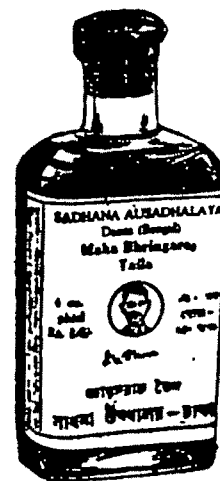
মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম
করেন, মহাভুঙ্গরাজ তাঁহাদের পুরম
কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-
দায়ক তৈল লক্ষ্যপ্রকার ক্লান্তি ও
অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে
লক্ষ্যপ্রকার প্রফুল্ল ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনার মহা ভুঙ্গরাজ তৈল



সাম্রাজ্য ঔষধালয়-কলকাতা
সাবনা ঔষধালয় গৌড় কলিকাতা-৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলি.) আনুর্ভোচাৰ্ঘ্য

অধ্যক্ষ প্রিবোপেনচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আনুর্ভোচাৰ্ঘ্য, এম. বি. এস. (কলি.) এম. বি. এস. (আমেৰিক)
ভাৰতপুৰ কলেজের ইন্ডিয়ান পাঠ্যের কৃতপূৰ্ণ অধ্যাপক



স্বাদিকা : নীলা রায়

আষাঢ় ১৩৭৪

বসিষ্টদ্যাক্ষর

চিঠিপত্র ১০

দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্রের সংকলন। দীনেশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দীনেশচন্দ্রের কয়েকটি পত্র এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থপরিচয় সংবলিত। মূল্য ২'৫০ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ-এগুরুজ পত্রাবলী

Letters To A Friend গ্রন্থের অনুবাদ

দীনবন্ধু চার্লস ফ্রিয়র এগুরুজকে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত পত্রাবলী। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এগুরুজ ও উইলিয়াম পিয়রসনের অনেকগুলি পত্রও এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় আনুষঙ্গিক তথ্য সংযুক্ত। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল-অঙ্কিত বহুবর্ণ-চিত্র সংবলিত। মূল্য ৬'০০ টাকা।

সচিত্র চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা প্রথম প্রকাশ-কালে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের আঁকা যে চিত্রাবলী এই কাব্যগ্রন্থখানিকে অলঙ্কৃত করেছিল, সেই চিত্রগুলিসহ একটি স্বতন্ত্র শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ছবিগুলি ভিন্ন রঙে মুদ্রিত। মূল্য ২'৫০ টাকা।

রূপান্তর

সংস্কৃত পালি প্রাকৃত থেকে তথা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে অনূদিত বা রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ত কবিতাবলী—নানা মুদ্রিত গ্রন্থ, সাময়িকপত্র ও পাতুলিপি থেকে মূল-সহ এই গ্রন্থে একত্র করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ও রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি সংবলিত। মূল্য ৭'০০ টাকা।

খাপছাড়া

‘সহজ কথা’য় লেখা ১২৪টি কবিতার সংকলন। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত রঙিন ছবি ও রেখাচিত্রে ভূষিত। পরিবর্ধিত সংস্করণ। মূল্য ১২'০০ টাকা।

সংগীত-চিন্তা

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এবং সংগীত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এই গ্রন্থে সংকলিত। এর অনেকগুলি রচনা ইতিপূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয় নি। মূল্য ৭'০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

* * *

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

* * *

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY - 1

সূচীপত্র

জয়ন্তী : আষাঢ় : ১৩৭৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৪৩
সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক রচনা)	পবিত্রকুমার ঘোষ	১৫১
নকশাশিল্পীর লাল নকশা (পর্যালোচনা)	সমর গুহ	১৬১
গুপ্ত ধন (কবিতা)	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৬৭
কোন কোন কথায় (কবিতা)	"	১৬৭
শিল্প আলোচনা (কবিতা)	"	১৬৮
অহঙ্কার ভাঙে (কবিতা)	"	১৬৮
কলিকাতার বাসগৃহ সমস্তা (আলোচনা)	নিরঞ্জন হালদার	১৬৯
কণ্ঠ ভরা বিষ (ধারাবাহিক উপস্থাপন)	মিহির মুখোপাধ্যায়	১৭৫
জল মাটি মন (ধারাবাহিক উপস্থাপন)	মহীতোষ বিশ্বাস	১৮৪
একটি চিত্র	রাজর্ষি	১৯১
পুস্তক পরিচয়		১৯৫
বিশ্বাবর্ত		২০৩

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.	শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.
শ্রীগীতা ৬.০০	বাংলার ঋষি ৩.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ৫.০০	বাংলার মনীষী ১.৩০
ভারত-আত্মার বাণী ৫.০০	বাংলার বিদুষী ২.০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১.৫০	বীরত্বে বাঙালী ১.৫০
কর্মবাণী ১.২৫	ব্যায়ামে বাঙালী ২.০০
Soul of India Speaks 5.00	বিজ্ঞানে বাঙালী ৪.০০
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.	রাজর্ষি রামমোহন ১.৫০
বিভাসাগর ২.২৫	রবীন্দ্রনাথ ১.২৫
মানুষের মত মানুষ ৭৫	মুগাচার্য বিবেকানন্দ ১.৫০
শিশু রামায়ণ ৬২	আচার্য জগদীশচন্দ্র ২.৫০
শিশু মহাভারত ৭৫	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১.৫০
	॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :	১৫ কলেজ স্কোয়ার :
	কলকাতা-১২

দীপ্তি

আপনার
নিত্য
প্রয়োজন

দীপ্তি লম্বন—এর পরিচয় নিম্নরোজন,
এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে
আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর
কম কেরোসিন খরচ।

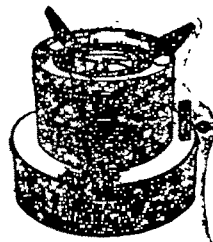
খাল জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য
প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিস।
এই কেরোসিন চৌদ্ধ ব্যবহারে কোন
সামেলা নেই। গঠনে মজবুত, বেধেতে
সুন্দর, খরচে সাশ্রয়। অল্প সময়ে যে
কোন দ্বারা করা যায়।

‘দীপ্তি’ বার্কী এমামেনেলের বাসন—
অল্প বিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর
অপেক্ষা দ্বারা সমাপ্ত হচ্ছে।

বি ওরিয়েন্টাল মেটাল
ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
৩৭ ও ১৭ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট,
কলিকাতা-১২



দীপ্তি লম্বন



খাল জনতা



এমামেনেলের বাসন

১৯৫৫



ডায়ারী

৩২ বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা • আষাঢ় ১৩৭৪

সম্পাদকীয়

নকসালবাড়ীর পরিস্থিতি

কয়েকদিন রুট মার্চ করবার পর গত ১২ই জুলাই শেষ রাতে পুলিশ নকসালবাড়ীর হাতিঘিসা অঞ্চল ঘিরে ফেলে গ্রচুর পরিমাণে তীর, ধমুক, বর্ষা, তেলোয়ার, কুড়াল ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র ও লাউড স্পীকার সহ ৭৫ জন মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট দলের বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করে। বিদ্রোহীদের অস্ত্রতম খোকন মজুমদার ওরফে আব্দুল হামিদ পুলিশের বেড়ালাল ডিঙিয়ে পলায়ন করলেও পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদকের স্বাক্ষর সম্বলিত তার নামে দলীয় সদস্যদের লাল কার্ড ও অন্তান্ত দলিল পাওয়া গেছে। বর্ষায় প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চলে জল-কাদা পুলিশের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টির ফলেই বিদ্রোহীদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয়ের পলায়ন সম্ভব হয়েছিল। ১৩ই জুলাই কান্ন সান্তাল, কদম মল্লিক, খোকন মজুমদার পরিচালিত ২৫০০ বিদ্রোহীদের একটি সশস্ত্র দল খড়িবাড়ী খানার রায়মাটিজোতের পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করলে পুলিশ বাহিনী এদের ঘিরে ফেলে প্রায় তিনশ আক্রমণকারীদের অস্ত্রশস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করেছে। খবরে প্রকাশ কান্ন সান্তাল, কদম মল্লিক প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্রোহী নেতা তাদের অমুচবদের ছেড়ে পলায়ন করে।

এই দিন পুলিশের আঘাতে একজনের মৃত্যু হয় এবং দুইজন পুলিশ সহ ৫০ জন আহত হয়। এ-পর্যন্ত ৫০০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। বর্ষার আগে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান শুরু হলে পুলিশের পক্ষে কাজ সহজতর হতো এবং বিদ্রোহীদের নেতৃস্থানীয়দের পক্ষে পলায়ন সম্ভবপর হতো না। এরা ষতদিন বাইরে থাকবে নকসালবাড়ী এলাকার নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসা সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যাবে, যে অবস্থা ফিরে না এলে এই অঞ্চলের চাষ এবার ব্যাহত হবে।

পলাতকরা নেপাল কিম্বা পূর্ব পাকিস্তানে পাড়ি দিতে পারলে আন্তর্জাতিক জটিলতা বৃদ্ধি পেয়ে সীমান্তের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয়ে উঠবে। গত ২৮শে ও ৩০শে জুনের পিকিং রেডিওতে নকসালবাড়ী সম্পর্কে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে পশ্চিম বাংলার উগ্রপন্থী মার্কসবাদী কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে যে সশস্ত্র বিদ্রোহের এবং এই সীমান্তবর্তী এলাকাকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার আহ্বান জানানো হয়েছে, তা থেকেই একথা সপ্রমাণ হবে। তাছাড়া পিকিং রেডিওর প্রচার নকসালবাড়ীর মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট উগ্রপন্থীদের, মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট নেতৃস্থানীয়ের বিরুদ্ধে

প্ররোচিত করে প্রকাশ্য বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এই প্রকাশ্য বিদ্রোহের ভূমিকায় উগ্রপন্থীরা অগ্রবর্তীর স্থান নেবে সন্দেহ নাই, কিন্তু মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট দল এমন কি দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং মার্কসবাদীদের লেজুড় দলগুলি কি ভূমিকা নেবে সে সম্পর্কেও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই সব দলের পক্ষ থেকে নকসালবাড়ী-বিদ্রোহের প্রকৃতি নির্ণয়ে নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নকে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে কেবলমাত্র ভূমিক্ষুধার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। গত ১৩ই এপ্রিল এস, এস, পি ও পি, এস, পি'র নেতৃবৃন্দ সরেজমিনে নকসালবাড়ীর উপদ্রুত এলাকা ঘুরে বলেছেন যে বিদ্রোহের পরিচালনায় ক্রোতদার শ্রেণীর মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট সদস্যরা রয়েছেন এবং ছোটজোতের মালিকেরা লুণ্ঠিত ও নির্যাতিত হচ্ছেন এবং এই আন্দোলনকে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্টদের প্রভাব বিস্তারের জন্য সুপ্ররিকল্পিত রাজনৈতিক আন্দোলনরূপে চিহ্নিত করেছেন।

পিকিং বেতারের চোখে নকসালবাড়ীতে ভারত সীমান্তে মুক্ত অঞ্চল গঠনের জন্য কম্যুনিষ্টদের বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে এবং এই আন্দোলন পিকিং এর পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে। তাসখন্দে অবস্থিত সোভিয়েত রুশের 'শান্তি ও প্রগতি' রেডিওতে ও নকসালবাড়ীর ঘটনাকে ভূমিসমস্তা রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গির উৎসভূমি এই দুইটি রেডিওর প্রচারের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

অন্য আইনের ৪, ১১ ও ১৩ ধারা অনুযায়ী বিনা লাইসেন্সে, তীর ধনুক ও বর্জন ব্যবহার ও এই অস্ত্রগুলি আবাদী ও পরিবহন শিলিঙড়ি মহকুমায় নিষেধকারী কেন্দ্রীয় নির্দেশকে কেন্দ্র করে মন্ত্রীসভার গুরুতর মতামত যুক্তফ্রন্ট সরকারে যৌথদায়িত্ব তচনচ করে দিয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর সন্মতিক্রমে এই আইন প্রয়োগ হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্তগতী প্রকাশে তার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ক্যাবিনেটে এই বিষয়ে

গুরুতর মতভেদের সংবাদ প্রকাশিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মর্বাদ ও শক্তি প্রভূত পরিমাণে খর্ব করে দিয়েছে। তার পরিণামে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীরা আরও প্ররোচিত হবে- অরাজকতা বৃদ্ধিতে এবং যারা যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে চান তাদের শক্তিবৃদ্ধি হবে। চীন রেডিওর উদ্দেশ্যও তাই। কংগ্রেসও যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের জন্য ওঁত পেতে আছে। যৌথদায়িত্ব ভাঙ্গন ধরিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শক্তিশালী শরিক মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টদের আচরণও এই ভাঙনেরই পরিপোষকতা করছে।

ট্রাম পরিচালনার ভার সরকারী হাতে গেল

সংবিধানের ৩১এ (খ) ধারা অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার অকংগ্রেসী সরকার গত ১৮ই জুলাই কলকাতার ট্রাম পরিচালনার ভার তিন বছরের জন্য গ্রহণ করে, পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের দখলদারী হয়েছেন। অকংগ্রেসী কলিকাতা ট্রামওয়েস কোম্পানী এমন অবস্থার সৃষ্টি করলো, যে সরকারের পক্ষে ট্রাম পরিচালনার দায়িত্ব না নিয়ে আর উপায়ও ছিল না। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে হঠাৎ ট্রাম কোম্পানীর বিলেতী অফিসারেরা ইংলণ্ডে প্রস্থান করেন এবং সেগান থেকে ট্রাম কর্মচারীদের বেতন দেবার নির্ধারিত দিনের কয়েকদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তারবার্তায় জানান যে তাদের তহবিলে কর্মচারীদের পুরো মাসের বেতন দেবার সংগতি না থাকায় সরকার যদি ২০ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুরী সুপারিস না করেন, তারা নিরুপায়। দৈনিক তের হাজার টাকা লোকসানের হিসাব দেখিয়ে কোম্পানী অবিলম্বে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য যথাক্রমে ১৫ ও ১২ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি সাপেক্ষে ট্রাম পরিবহন বজায় রাখা সম্ভব হবে বলে জানান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১২ লক্ষ টাকা ঋণের মুঁকি নিতে স্বীকার করলেও ভাড়া বৃদ্ধিতে সম্মতি না দিলে প্রস্তাবিত এই ঋণ নিয়ে কোম্পানী কর্মচারীদের বেতন দিতে সক্ষম হয় নাই।

সরকার ট্রাম কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা অনুসন্ধানের জন্ত একটি কমিশন বসিয়ে ছয় সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট চেয়েছেন। এই কমিশন ভাড়া বৃদ্ধির সুপারিস করলে, ভাড়া বৃদ্ধিও অনিবার্য। এই ঘটনা কোম্পানীরও অজানা নেই। তা সত্ত্বেও হঠাৎ সঙ্কট সৃষ্টি করে কোম্পানী জনসাধারণ ও সরকারকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন করে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিল। সরকার তিন বছরের জন্য কোম্পানী পরিচালনার ভার নিয়ে তার সমুচিত ঋণ প্রদান করেছে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বিরোধীদের এবং কেন্দ্রের অকুঠ সমর্থন পেয়েছে। ট্রাম পরিচালনার অত্যন্ত দলীয় রাজনীতির অমুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সকল পক্ষকেই সজাগ থাকতে হবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের, বিশেষভাবে সংখ্যাগুরু ইউনিয়নের, দায়িত্ব সর্বাধিক।

ট্রাম কোম্পানী নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর পশ্চিম বঙ্গ সরকারের উপর ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনারের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক চাপ এসেছিল। পশ্চিম বঙ্গ সরকার ট্রাম কোম্পানীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করলে পশ্চিম বাংলায় ব্রিটিশ লম্বীর ভবিষ্যৎ ব্যাহত হতে পারে, এ ধরনের প্রচলিত হুমকি দিয়ে শেষ মুহূর্তেও সরকারকে নিরস্ত করতে ব্রিটিশ কূটনীতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অতঃপর পরিচালনার ভার হাতছাড়া হয়ে গেলে ট্রাম কোম্পানীর গুণবৃদ্ধি জাঘত হয়েছে। ১৯৫১ সালের আইনের ক্ষতিপূরণের সর্ব-নিম্নে ট্রাম কোম্পানী অবিলম্বে জাতীয়করণের প্রস্তাব আলোচনায় সম্মত আছে বলে জানা গেছে। ট্রাম কোম্পানীর এই চালেও শেষ রক্ষা হবে না। কারণ ট্রাম পরিচালনার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণের পর জাতীয়করণের জন্ত সরকারের আর কোনো তাড়া নেই। ব্রিটিশ পুঞ্জির স্বার্থ বজায় রাখবার অত্যন্ত আগ্রহে শেষ পর্যন্ত কোম্পানীটি এভাবে হঠাৎ হাতছাড়া হয়ে যাবে, কোম্পানীর ব্রিটিশ

মালিকরা সে কথা আদৌ ভাবে নাই। চতুর মালিকেরা কোম্পানীর দুর্ব্যবস্থার যে চিত্র বার বার তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন জাতীয়করণের সম্ভাবনা সত্ত্বেও লগুনের শেষার বাজারে ট্রাম কোম্পানীর শেষারের দর বৃদ্ধি পেয়ে সেই প্রচার যে মিথ্যা তা প্রমাণ করেছে। ট্রাম কোম্পানীর পরিচালনা সরকার হাতে নিয়ে ব্রিটিশ পুঞ্জির কূটকৌশলের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিয়েছে। স্বপ্নের বিষয় পশ্চিম বাংলায় সকল রাজনৈতিক দল—কংগ্রেস সহ—এই পরাজয় ঘটাতে জড়ত্ব গিয়ে এসেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন

গত ৬ই ও ৭ই জুলাই দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে দেশের বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার আভাস পাওয়া গেল। এ যাবৎ মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনগুলির দর কষাকষির দরবারের চাইতে বেশী তাৎপর্য ছিল না। এবারও প্রচার ও দর কষাকষি হয়েছে, আরও টাকার দাবী উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলোচনার বাস্তবমুখীনতা উপেক্ষা করা যায় না।

ক্ষুদ্র সেচের জন্ত দাবী সোচ্চার হতে দেখা গেছে। এই খাতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের দাবী শোনা গেছে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে। ক্ষুদ্র সেচ অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে এবং তার জন্ত কিছু অতিরিক্ত ব্যয় ও বরাদ্দ করা হবে, যদিও বর্তমান বছরের জন্ত রাজ্য প্ল্যানগুলিতে এ-বাবদ ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এই খাতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ গেলে চতুর্থ পরিকল্পনার পূর্বেই খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ভরসাও মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন থেকে পাওয়া গেছে।

আরও দুটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবও শোনা গেছে। প্রতি বছরে ব্যয়িত খাতে প্রায় ১০০ কোটি টাকার সাবসিডি খাত উৎপাদনের জন্ত ব্যয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া আগামী তিনবছর খাত আমদানীর জন্ত যে অর্থ ব্যয় হবে,

সেই পরিমাপ অর্থ ষাট আমদানীতে ব্যয় না করে উৎপাদনে ব্যয় করলে তিন বছরের মধ্যে ষাট সমস্তার সমাধান হয়ে যাবে বলে সম্মেলনে দৃঢ় মত পাওয়া গেছে।

কিন্তু এর চাইতেও তাজ্জব- ব্যাপার ঘটেছে- অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্ত গঠিত গণেশগনকর কমিশনের ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রায় সকল মুখ্যমন্ত্রীই বিরোধিতা করেছেন। এই ভাতা বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং এই বৃদ্ধির অনিবার্য ফল স্বরূপ রাজ্য সরকারগুলির কর্মচারীদের যে ভাতা বৃদ্ধি হবে সেজন্ত ৭০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। অথচ রাজ্য সরকারগুলির সে-সম্মতি নাই এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাধ্য নাই এ-বাবদ কোনো প্রকার সাহায্য দিতে পারে। এ-মারুটা ঘাটতি ব্যয় (deficit financing) বর্জনে কেন্দ্রীয় সরকার বদ্ধপরিকর। কারণ মূল্যবৃদ্ধি রোধে এই ব্যয় বন্ধ করতেই হবে। দফায় দফায় মহার্ঘ ভাতার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি, রাজ্যের উন্নয়নমূলক ব্যয়ের বরাদ্দ ক্রমশ হ্রাস করে দিয়ে উৎপাদন হ্রাস করবে, যার পরিণতিতে আবার মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে উঠবে।

হুতরাং, মূল্যবৃদ্ধি-বেতনবৃদ্ধি-মুনাকাবৃদ্ধি এই চক্র ভাঙবার অর্থনৈতিক ভাগিদে মুখ্যমন্ত্রীদের মূল্য, বেতন ও মুনাকা বৃদ্ধিতে অবিলম্বে ছেদ টানবার সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে। রাষ্ট্রাঙ্গনিকে কেন্দ্র পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে আর কোনো রকম অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া সম্ভব হবে না। এমন কি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রাজ্যের ও ভারতব্রাঙ্কের সীমানাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যে সীমানা লঙ্ঘন কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকা দিতে অস্বীকার করবে। এই সীমা বেঁধে দেবার ফলে এবছর রাজ্যের প্রায় বরাদ্দ ৫৩৫ কোটি টাকা থেকে ৫৯০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই রাস্তা-কটিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মুখে মূল্য-বেতন বৃদ্ধি বর্জনে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি দিলেও দেশে বেতন

বৃদ্ধি বর্জনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। মূল্য বৃদ্ধি রোধের পরীক্ষায় সরকারের শৌচনীয় ব্যর্থতা এই-বিক্ষোভকে তীব্রতর করে তুলেছে। বেতন-বৃদ্ধি বর্জনের প্রশ্ন মূল্যবৃদ্ধিরোধের সার্থক প্রয়োগ ব্যতীত অবাস্তব। ভারত সরকার সেই পরীক্ষায় আগে আন্তরিকতা ও সাফল্যের পরিচয় দিক, তবেই বেতন-বৃদ্ধি বর্জনের প্রশ্ন উঠবে। তার আগে নয়।

শিক্ষা সংস্কার

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর উদ্যোগে ত্রিশজন সদস্য নিয়ে গঠিত সংসদীয় কমিটি শিক্ষা ও ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ভাষার ও শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রশাসনিক নৈরাজ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ওটল সঙ্কট সৃষ্টি করেছে সংসদীয় কমিটির সুপারিশগুলি রূপায়িত হলে ভাষা শিক্ষার স্বর্গ পরিকল্পনা ও শিক্ষা সংস্কারে পরিচ্ছন্ন ও সুনির্দিষ্ট পথ অনুসৃত হবে বলে আশা করা যেতে পারে। এই সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার সকল বিষয়ে সর্বস্তরে ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। একশ বছর পূর্বে ১৮৬৭ সালের আগষ্ট মাসে ভাষা আন্দোলনের স্মরণার্থে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তৎকালীন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল নিকট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় ভাষা শিক্ষাদানের জন্ত আরকলিপি দাখিল করা হয়েছিল। আগামী ১৫ই আগষ্ট এই আন্দোলনের একশত বছর পূর্তিতে ভারতীয় ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত ভারত সরকার ঘোষণা করবেন বলে স্থির করেছেন।

সংসদীয় শিক্ষা কমিটি স্কুলগুলিতে বর্তমান ত্রি-ভাষার স্তরের পরিবর্তে কার্যত দ্বি-ভাষা স্তরের সীমান্সা দিয়েছেন। ১৯৬৫ জানুয়ারীতে দক্ষিণ ভারতে গুরুতর ভাষা-দাঙ্গা শুরু হলে সেই দাঙ্গা প্রশমনের জন্ত ভাষা-স্তর আবিষ্কারের চেষ্টায়

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, ক্যাবিনেট এবং বার কয়েক রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে পাঁচ মাস অভিযাহিত হবার পর ১৯৬৬র ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে স্কুলে ত্রি-ভাষা শিক্ষার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। সেই সঙ্গে ইংরাজী ভাষাকে additional or associate official ভাষারূপে স্বীকৃতির নেহেরু প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে আইনে রূপদান এবং ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা গ্রহণে ১৪টি ভাষার ব্যবহার স্বীকৃতি হয়েছিল। ১৪টি ভাষায় সর্বভারতীয় সরকারী চাকুরীর প্রার্থী নির্বাচনে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন তৈরী হচ্ছেন। যদিও এই প্রস্তাবের কার্যকারিতা সম্পর্কে গুরুতর আশঙ্কা রয়েছে। নেহেরু-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইংরাজীকে অতিরিক্ত বা সহযোগী সরকারী ভাষার মর্যাদা দানের জন্য আইনের বিধান এখনও অনিশ্চিত। রাষ্ট্রপতির ভাষণে এই আইন প্রণয়নের উল্লেখ থাকলেও এবারকার পার্লামেন্ট এই বিল উত্থাপিত হবে না। পার্লামেন্টের ইংরাজী-বিরোধী ও হিন্দি-প্রেমী দুই শত জন সদস্য—তাদের মধ্যে কংগ্রেস এবং বিরোধী উভয় পক্ষের সদস্যরাও আছেন—প্রধান মন্ত্রীর নিকট পত্রযোগে এই আইন উত্থাপনের প্রবল বিরোধিতা করেছেন।

অহিন্দীভাষীদের হিন্দীকে একমাত্র সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতিদান সাপক্ষে অনির্দিষ্টকালের জন্য ইংরাজীকে সহযোগী বা অতিরিক্ত সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি দানে অসম্মতি ভাষা-সাম্যকে অনিবার্যভাবেই বিঘ্নিত করবে এবং ১৯৬৫ সালের মত বিস্ফোরক অবস্থা সৃষ্টি করে ‘দক্ষিণ-ভারত’কে বিশেষভাবে আবার হিন্দীকে আদৌ সরকারী ভাষার মর্যাদা দানের বিরোধী করে তুলবে। প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা, সংবিধান সংশোধন করে ইংরাজীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সরকারী ভাষারূপে সংবিধানিক স্বীকৃতিদানের দাবী দ্বার করে তুলবে। মাদ্রাজে ডি, এম, কে মুখ্যমন্ত্রী

আল্লাহুরাই সেই সঙ্কেত দিয়ে বলেছেন, এ-বিষয়ে অস্ত্র কোনো পথ নেই—“no escape”।

হিন্দি-অমুরাগীদের অসম্মত জেদ হিন্দি-বিরোধীদের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে মাদ্রাজে ত্রি-ভাষাসূত্রের প্রয়োগ-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত থেকে তা বোঝা যাবে। ত্রি-ভাষা সূত্রের প্রয়োগ ইংরাজীর বিসর্জনে পরিণতি পাবে যারা ভেবেছিলেন, ডি, এম, কে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে তাদের চৈতন্ত্যোদয় হয়েছে। কারণ তারা বলেছেন মাদ্রাজে ত্রি-ভাষার প্রয়োগে হিন্দি বাতিল করে তামিল, ইংরাজী এবং উচ্চতর তামিল বোঝাতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের নূতন ত্রি-ভাষা সূত্রের বিচার করতে হবে। এই নূতন সূত্র অনুযায়ী স্কুলে প্রাথমিক স্তরে আঞ্চলিক ভাষা অথবা মাতৃভাষা, মাধ্যমিক স্তরে দশম ক্লাস পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষা সমেত ইংরাজী অথবা সংবিধানের অষ্টম সিডিউলের অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা শিক্ষা করতে হবে। অষ্টম শ্রেণী থেকে ঐচ্ছিকরূপে তৃতীয় আর একটি ভাষা শিক্ষা করতে পারে।

এই কমিটি স্কুলের শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ে দশ বছরের মধ্যে সমাপনের সুপারিশ করেছেন এবং স্কুলে আঞ্চলিক ভাষা, মাতৃভাষা, হিন্দি এবং ইংরাজী অথবা অস্ত্র কোনো ভাষা শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আঞ্চলিক ভাষা সমেত আর একটি অতিরিক্ত ভাষা শিখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে কোনো ভাষাই আবশ্যিক হবে না। কলেজে ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ঐচ্ছিক ভিত্তিক হবে। এ-ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরে আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে কমিটি স্বীকৃতি দিয়েছে। যদিও কমিটি শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলি প্রয়োগের পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমরূপে আঞ্চলিক ভাষার প্রচলন সুপারিশ করেছেন, ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে এই সময়-সীমা অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে।

সর্বভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরাজী ও হিন্দির মাধ্যমে শিক্ষা দান, এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠের স্বযোগ থেকে কোনো ভাষাভাষীকেই বৈষম্যের সম্মুখীন না হতে হয়, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষাসমূহ আঞ্চলিক ভাষায় গ্রহণ, এবং অহিন্দি ভাষী বাজ্যগুলি ইংরাজীর পরিবর্তে হিন্দির প্রচলনে সম্মত হলে আন্তঃরাজ্য যোগাযোগের জন্ত হিন্দির প্রয়োগ, কমিটির অন্ত্যস্ত সুপারিশের অন্তর্গত।

ভাষা-সমস্যার বিক্ষোভক সম্ভাবনাকে দূর করে অর্হু সমাধানের যে বিধান, সাম্প্রতিক সরকারী ভাষানীতিতে ঘোষিত হয়েছে, তার সার্থকতা নির্ভর করবে হিন্দিভাষীদের হিন্দি-প্রচারকে স্বরাস্থিত করবার উচ্চম ও উৎসাহ সংবরণে। আঞ্চলিক ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হলে, ইংরাজীর প্রভাব বহুলাংশে লোপ পাবে। ইংরাজীর নির্বাসন সংযোগরক্ষাকারী ভাষারূপে আর একটি ভারতীয় ভাষার সম্মুখে যে স্বযোগ এনে দেবে, হিন্দি-ভাষীর উগ্রপ্রচাবের প্রলোভন সংবরণ করলে, হিন্দির পক্ষে সে-স্থান গ্রহণ করা অসম্ভব নাও হতে পারে। তবে ধৈর্য ও বিনয়ের প্রয়োজন রয়েছে হিন্দি-ভাষীদের পক্ষ থেকে।

ফতিমা জিন্না

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলি জিন্নার ভগ্নী স্রীমতী ফতিমা জিন্না গত ১ই জুলাই ৭৪ বৎসর বয়সে করাচীতে পরলোকগমন করেছেন। স্রীমতী ফতিমা জিন্না ভ্রাতা মহম্মদ আলি জিন্নাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে তাঁর সেবার নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। জিন্না জীবিত থাকাকালীন ফতিমা জিন্না কখনও প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগ দেন নাই। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর জিন্নার আদর্শ পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছে অম্মান রাখবার জন্ত ধীরে ধীরে রাজনীতির সদরে এসে দাঁড়ান। ফলে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে তার সংঘাতও দানা বেঁধে ওঠে।

পাকিস্তানের সাময়িক শাসনের যুগে জিন্নার অবহেলিত আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্তই ফতিমা জিন্না তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন এবং শেষ পর্যন্ত ৭০ বৎসর বয়সে সাময়িক শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রতীকরূপে পাকিস্তানের সংগ্রামী জনগণের পক্ষ থেকে ১৯৬৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আয়ুর্ভের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে ফতিমা জিন্নার স্থান পাকিস্তানের ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে থাকবে। তাই শেষ বয়সে ফতিমা জিন্না ‘গাদারে মিল্লাত’—জাতির জননী—জনতার এই সম্বোধনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। আমরা এই মহিমাময়ী নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা স্তাপন করছি।

বঙ্গীর ছুর্নীতি

জহরলাল নেহরুর যে কয়টি প্রিয়পাত্র বিভিন্ন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আসন উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন এবং যাদের বিরুদ্ধে বার বার নানা অভিযোগ উত্থাপন করেও কোনো ফল হয় নাই, কাশ্মীরের বঙ্গী গোলাম মহম্মদ তাদের অন্ততম। সর্দার প্রতাপ সিং কায়রো এবং বিজু পট্টনায়ক—নেহরুর অন্য দুই রাজনৈতিক পোষ্যের কীর্তিকলাপ ইতিমধ্যে সাধারণ্যে বহুল প্রচারিত হয়ে গেছে। বঙ্গী সম্পর্কিত জাষ্টিস রাজা গোপাল আয়েদারের একক তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট তৃতীয় পোষ্যের কীর্তি উদ্ঘাটন করেছে। অল্প আলোচনায় না গিয়ে বঙ্গীর বিষয় সম্পত্তির যে হিসাব আয়েদার কমিশন দাখিল করেছেন তাতেই পর্বত প্রমাণ ছুর্নীতি ঘোষিত হয়েছে। ১৯৫৭ সাল থেকেই বঙ্গী ক্ষমতা অপব্যবহার করে স্বজনদের অস্বাভাবিক অর্থাগমের স্বযোগ করে দেন। কিন্তু ১৯৬০ সাল থেকে ছুর্নীতির জোয়ার স্রব হয়। আয়েদারের রিপোর্টে প্রকাশ বঙ্গীর ক্ষমতার অপব্যবহারে তার পরিবারবর্গ ৫৪ লক্ষ টাকার অস্বাভাবিক উপার্জনের স্বযোগ

পেয়েছে। আয়েদার কমিশনের মতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত বঙ্গীর সম্পত্তি ১০ থেকে ২৫ লক্ষে পৌছায় এবং পরবর্তী সাত বছরে এই সম্পত্তি পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ২৫ লক্ষতে পৌঁছেছে। বঙ্গীরা এই লুট উদ্ধারের কি ব্যবস্থা হয় দেশবাসী তা দেখবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করলে।

রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা

বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা পরিষ্কৃত হয়ে উঠেছে, সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার মধ্যে দিবে। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশে রাজ্য বিধান পরিষদে তিনটি আসনে এবং রাজ্যসভার একটি আসনে সরকারী সংযুক্ত বিধায়ক দল প্রার্থীর পরাজয়ে সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠিত সরকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে। এদের মধ্যে উত্তর প্রদেশের পরিবহন মন্ত্রী জনসজ্জ প্রতিনিধি মান সিং ভর্মাও রয়েছেন। মানসিং ভর্মা ৪৮ ভোটে পরাজিত হয়েছেন, অথচ বিধায়ক দলের রাজ্যসভার প্রার্থী ১৪ ভোটে এবং গরিষদের অপর দুই প্রার্থী যথাক্রমে ১১ ও ৪ ভোটে পরাজিত হয়েছেন। মন্ত্রীর এই শোচনীয় পরাজয় জনসজ্জের প্রতি বিধায়ক দলের সদস্যরা কত বিরূপ তারই স্বাক্ষর বহন করছে।

হরিয়ানাতেও মুখ্যমন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং শ্রীদেবীলাল গোষ্ঠীর দুই জন মন্ত্রীকে বর্জন করে দ্রুত নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন। দেবীলাল অতঃপর বীরেন্দ্র সিংয়ের মন্ত্রীসভার পতনের জন্য উত্তোষিত হয়েছেন।

মধ্য প্রদেশে ৩৪ জন কংগ্রেস সদস্য বিরোধীদলে যোগদানের ফলে ২৯৬ সদস্য বিশিষ্ট বিধান সভায় বিরোধীদের শক্তি ১২০ থেকে ১৫৪ তে বৃদ্ধি পেলে অকস্মাৎ ২০শে

জুলাই তারিখে রাজ্যপাল বিধান সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলত্ববী রেশে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে ডি, পি মিশ্রকে রক্ষা করেন। রাজ্যপালের সংবিধান-বহির্ভূত আচরণ এক অভূতপূর্ব নজীরের সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত ডি, পি. মিশ্রকে বিধান পরিষদের অনাস্থার সম্মুখীন হয়ে বিদায় নিতে হবে। মধ্য প্রদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিণতি অনির্ণয়।

পশ্চিম বাংলায়ও বিধান সভায় যুক্ত ফ্রন্টের পাঁচজন সদস্য দলভ্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। অতঃপর ২২শে জুলাই বিধান পরিষদের দুটি আসনের নির্বাচনে একটি আসনে যুক্ত ফ্রন্টের প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন। একটি আসনে ১৪২-১৩৫ ভোটে যুক্ত ফ্রন্ট প্রার্থী জয় হয়েছে এবং আর একটি আসনে ১২৮-১৪৮ ভোটে যুক্ত ফ্রন্ট প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন। অথচ যুক্ত ফ্রন্ট ও কংগ্রেসের আসন সংখ্যা যথাক্রমে ১৫২ ও ১৩২; ভোট দিখেছিলেন ২৮৩ জন। অবশ্য এই নির্বাচনের পরেও বিধান সভায় ভোটে যুক্ত ফ্রন্ট কংগ্রেসকে অজ্ঞায়সেই পরাজিত করেছে বাজেট বরাদ্দের দাবীর ওপর।

বিহারের ৩১৮ জন সদস্যের মধ্যে সংযুক্ত দলের ১৬২ জন সদস্য এবং ৮ জন সমর্থক সম্মুখে বিহার বিধান সভায়ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা রাজনৈতিক অনিশ্চিতির আবর্ত সৃষ্টি করবে। রাজনৈতিক স্বাভাৱ্য-সম্পন্ন দলগুলির সংহতিই এই অনিশ্চিতিতে ছেদ টানতে পারে এবং পরিণামে সঙ্কট প্রতিরোধের উত্তোষে অগ্রণী হতে পারবে।

বর্ষার পথে সাবধান!

আসন্ন বর্ষার কথা ভেবে আজই একজোড়া বাটার
ওয়াটারপ্রুফ জুতো কিনে রাখুন। এর ঘন ব্যবহার হিল
অন্য সোলে এমন খোদাই নকশা যা পাকতপক্ষে হড়কাবে না।

প্রসঙ্গত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলিও লক্ষ্য করুন : উপরিভাগে
বোলোআনা জলরোধক উপাদান, আরামের জন্য
নরম সূতীর আস্তরণ, ক্ষয়শীল সম্মিশ্রণে অতিরিক্ত
সংযোজন, আর জলকাগাদারোধী দৃঢ় ব্যবহারের
বন্দনী। সব মিলিয়ে বর্ষার ভেজাপথে নিশ্চিত নির্ভরতা।

বিভিন্ন রঙ ও বিবিধ নকশায় বাটার ওয়াটারপ্রুফ
জুতো, আপনার নিকটেই যে বাটার দোকান সেখানে
পাওয়া যাবে। আসুন, আজই বেছে নিন
আপনার মনের মতো জুতো।

ওয়াটারপ্রুফ
ক্যাঙ্কাল ৭.৯৫

ওয়াটারপ্রুফ
অক্সফোর্ড ৭.৯৫

Barter

বর্ষার ভেজাপথে নিশ্চিত নির্ভরতা

উজ্জোগ পর্ব

সুভাষচন্দ্র যখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যোগ দিলেন তখন সেই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর এই নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ক্রমে ক্রমে, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর নির্ভীক সংগ্রাম ভারতবাসীর স্বপ্নে তাঁর প্রতি প্রজ্জ্বলিত উজ্জ্বল করে তুলেছিল। ভারতে এসে গান্ধীজী রাতারাতি নেতৃত্বের আসন দখল করে নেননি, বেশ কয়েকটি বছর সেলস্ক তাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অরবিন্দ রাজনীতি হতে বিদায় নিলেন, তিলকের মৃত্যু হল, সরোজিনাথ প্রমুখ নরমপন্থীদের কার্যক্রমে দেশবাসী সায় দিল না, বিপিন পাল নিপুণ হয়ে পড়লেন— এমন এক শূন্যতার সময়ে গান্ধীজীর নেতৃত্ব দেশ মেনে নিল। ১৯২১ সালে সুভাষ রাজনীতিতে খোলাখুলি যোগ দেন— গান্ধীজীর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতে তখন আর নেই। অথচ একথাও সত্য যে গান্ধীজীর নানা বিষয়ক মতামতকে দেশ স্বীকার করে নেয়নি, শিক্ষিত শ্রেণী তাঁর কোনো কোনো মত সম্পর্কে বিজ্ঞপাঙ্গক মনোভাব পোষণ করে—অথচ তাঁকে না মেনেও আর কোনো উপায়ে চলা সম্ভব ছিল না। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁর এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী দৃশ্যতা ও প্রভাব কীভাবে চূড়ান্তরূপে স্থির হয়ে গিয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ হতেই আমরা আমাদের কাহিনী শুরু করব। কারণ তদানীন্তন ভারতীয় আশা ২

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

রাজনীতির বা ভাবতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল বৈশিষ্ট্য ওই ঘটনার বিশ্লেষণেই পরিষ্কৃত হবে।

১৯২০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে “স্টেটসম্যান পত্রিকায়” কলকাতার উড স্ট্রীটে আর্টার্ডে ক্লাব ভবনে সম্মেলন হইল। দ্বিবার্ষিক উপলক্ষে প্রদত্ত বাংলার লার্ড লর্ড রোলাণ্ডের একটি ভাষণ প্রকাশিত হয়। লার্ডগাহেব গান্ধীজীকে নিয়ে অনেক পরিহাস ও তামাশা করেছিলেন। কলকাতার লর্ড বিশপ, বাংলার প্রধান বিচারপতি, বর্ধমানের মহারাজা, স্যার হেনরি হইলার, স্যার চার্লস স্টিভেনসন মুর, মেজর জেনারেল ক্যাম্বিট, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রভৃতি আরও বহুবিধ বিশিষ্ট ব্যক্তির উজ্জ্বল উপস্থিতি-দৃশ্য সেই সভা শব্দন করতালি ঘারা লার্ডগাহেবের বিজ্ঞপ্তি ও প্রেষণিত গান্ধীচর্চাকে অভিনন্দিত করে। গান্ধীজী এক বছরের ভিতর স্বরাজ লাভের যে স্লোগান দিয়েছিলেন, রেলওয়ে, ডাক্তার, আইনজীবী, বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলেছিলেন লর্ড রোলাণ্ডসে সেগুলি একে একে উদ্ধৃত করে শোনান ও সেইসব উদ্ধৃতি উপস্থিত ভ্রমবৃন্দের হাসির খোরাক জুগিয়েছিল। কিন্তু ছোটলাট কিছু গুরুতর অভিযোগও করেছিলেন গান্ধীজীর বিরুদ্ধে। গান্ধীজীর আধুনিক সভ্যতা-বিরোধী মতবাদ দেশ পছন্দ করে না, অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশে আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ছে,

অধিকারের অপশক্তির জেগে উঠছে, জাতিবিদ্বেষ বেড়ে চলেছে—এইগুলিই ছিল ছোটলাটের অভিযোগ গান্ধীজীর বিরুদ্ধে। তিনি কথাটা আরও স্পষ্ট করে বলেন :
 Indeed any one making a comprehensive survey of the non-cooperation movement could scarcely be blamed if he came to the conclusion that the only pass-word required to give admission to the non-co-operation camp was "race-hatred"—And is Bengal going to tolerate a movement based upon hatred, and, therefore, rooted in evil? জাতিবিদ্বেষ যে কতখানি বিষময় পাপ তা কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাবলীর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করিনি? জব চার্ণকের প্রতিষ্ঠিত শহর কলকাতার ও বাংলার অধিবাসীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চল স্বায়ত্তশাসন পরিচালিত দেশ চায়, গান্ধীজীর মতো সভ্যতা-বিরোধী জাতিবিদ্বেষ পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী তারা নয়। ভারত ও ইংলণ্ডের ভাগ্য একসূত্রে বাঁধা, এই দুটি দেশ চিরন্তন কাল ধরে চলবে পাশাপাশি—নিয়তির এই হচ্ছে বিধান, তা ফলাফল ভালোই হোক আর মন্দই হোক। ইংলণ্ড তার নীতি পরিকারভাবে ও খোলাখুলি ঘোষণা করেছে—এখন-সেই নীতির সঙ্গে সহযোগিতা করার দায় ভারতের। সেই দায় পালন করলে ভাবত তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বশাসনের অধিকার পাবে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাধীন ও গর্বের আসনও লাভ করবে। শাস্ত ও অপরিবর্তনীয় ভায় ও অধিকারের আদর্শে যার বিশ্বাস আছে সে কি ক্ষণভরেও এই বিষয়ে সংশয়াহিত হতে পারে যে ভারত কোন পথ চূড়ান্তভাবে বেছে নেবে? নিশ্চয়ই না, এবং ভবিষ্যতে অকম্পিত আস্থা রেখে আমি বলতে পারি যে "এই দেশ আমাদের।"

লর্ড রোনাল্ডসের এই নিঃসংশয় ভবিষ্যৎ বিচার আজ

হয়তো হাস্যকর মনে হবে কিন্তু ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রধান নেতাক্রমে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিষ্ঠা যে শেদিন কতখানি অবিসংবাদী ছিল তার শাস্ত্যব্রূপ রোনাল্ডসের এই বক্তৃতা উদ্ধৃত করা যায়। তা ছাড়া ভারতের নতুন সভ্যগ্রহ বা অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি ইংরেজ শাসকবৃন্দের মনোভাব কী ছিল তারও পরিচয় বিদ্যুত আছে এই বক্তৃতায়।

পরদিন ২রা ডিসেম্বর 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লর্ড রোনাল্ডসের বক্তৃতাটি বিশদভাবে আলোচিত হয়। সম্পাদক লেখেন : আধুনিক সভ্যতার নানা উপাদান, যথা, রেলওয়ে, হাসপাতাল, আদালত ইত্যাদি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর বিচিত্র মতামত এ দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর সমর্থন পায়নি বাটে, কিন্তু মহাত্মার এই সকল চারিজনবৈশিষ্ট্যের জন্মই ভারতের অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট তিনি এত প্রিয়। তাঁর অনাড়ম্বর ভোগকুষ্ঠ জীবন ও বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য তাঁর প্রতি মানুষকে অক্ষাৎসর্গ করে তুলেছে। তাঁর মতামতগুলি জনসাধারণের কালাগত বিশ্বাস ও জীবনযাপনের অভিজ্ঞতার বড়ো কাছাকাছি। আদালত আর হাসপাতালকে গ্রামের মানুষ আজও সত্যি ভয় পায়—তার কারণ মাংসা ও ডাক্তারী চিকিৎসা এই দুইই তাদের জীবনে বয়ে এনেছে ভীষণ অভিজ্ঞতা। গান্ধী মতামতে তাই সাধারণ শ্রেণীর মানুষের কোন আপত্তি নেই।

গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠা ও সেই প্রত্যস্তার মূল রহস্য দুইই উদ্ঘাটিত করার পর ইংবেজ রাজপুরুষরা চিন্তা করতে লাগলেন যে সেই প্রতিষ্ঠাকে খর্ব করা যায় কীভাবে। 'স্টেটসম্যান' উপরোক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেন যে দেশের মডারেট নেতারা যদি একজোট হয়ে চেষ্টা করেন ও বিকল্প নেতৃত্ব স্থাপন করতে পারেন গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠা তবেই খর্ব হতে পারে। ১লা ডিসেম্বর বিলাতে হাউস অফ লর্ডসে লর্ড সেলবোর্ণ বলেন যে ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী কুংসার বস্তা বয়ে চলেছে এবং ভারত সরকারের প্রচারকেন্দ্র নীরব হয়ে

বলে আছে—কুংসার প্রতিরোধ করার কোনো চেষ্টাই সরকারী তরফে নেই। (there had never been a greater, more malignant, and more persistent stream of calumnies and lies than was at present flooding India against the intentions of the Government of India, the Imperial Government and the whole British policy towards India) তাঁর মতে এই ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব বা আন্দোলন দমিত হতে পারে যদি সরকার শুধু তাঁর প্রচারশক্তি কে সক্রিয় রাখে। ব্রিটিশ শাসনের সমস্ত অফিস এবং ব্রিটিশ সরকারের মহৎ ও উদার অভিসন্ধিগুলি লোকের কাছে ব্যাখ্যা করে বুদ্ধিয়ে বললেই সরকার-বিরোধী আন্দোলনে লোকে আর সাহায্য দেবে না। (স্টেটসম্যান, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯২০)

ভারতে থেকে বারা দেশ শাসন করত সেই ইংরেজরা জানত যে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। ভারতের ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের ভিত্তি এত হালকা ছিল না যে শুধু প্রচারকলার সাহায্যেই তাকে ধুলিসাৎ করা যেত। তাই জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে যত জোগানই উত্তম পন্থা মনে করে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা বেগ প্রশমনের দাওয়াই সরকার কোন পথে সেদিন বাংলাতে চেয়েছিল তার হৃদয় মিলবে নিম্নলিখিত সংবাদে :

Non-co-operation
A Dacca Conference
(Associated Press)

Dacca, Dec 7

At a select conference of the representative Mahomedan citizens of Dacca it has been decided to convene a special conference in

order to take the necessary steps to check the evils that are spreading as a result of the Non-cooperation movement now prevalent in the country. The Nawab of Dacca as a convener of the meeting has invited leading men from all over the Province to a conference which will be held on Sunday next in the Bioscope Hall, Armanitola, Dacca.

(Statesman 8th Dec)

গান্ধীজী ভারতের আপামর সাধারণের নিকট অভুলনীর প্রজ্ঞা পেয়েছেন একথা স্বীকার করেও ইংরেজরা বলত যে তিনি শয়তানের চর, দুষ্ট শক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী। লর্ড রোনাল্ডসের ভাষণেই সে ইঙ্গিত আছে।... তাঁর প্রায়ই অসহযোগ আন্দোলন ছিল ইংরেজর চোখে অপশক্তির অভ্যুত্থানের ভূমিকা। তারই প্রতিবিধানে ইংরেজ কোন দুর্ভাগ্য ও প্রগতিশীল শক্তিকে জনসমক্ষে টেনে নিয়ে এল উপরের সংবাদটুকু হতে তার পরিচয় নিশ্চিতই মিলবে।

১৯১৫ সালের অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি লর্ড সিংহ ও বিহারের সম্মানিত নেতা মিঃ সৈয়দ হাসান ইমাম অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন এই সংবাদ যেদিন এদেশস্থ ইংরেজ সমাজের মুখপত্র সোল্লাসে প্রকাশ করে (লর্ড সিংহ বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ভারতবর্ষে খুবই কম—যত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়বে ততই দেশের মঙ্গল। মহাত্মা গান্ধী যদি নতুন নতুন শিক্ষালয় গড়ে তুলতেন তবে তা সর্বতোভাবে সমর্থনীয় হত। কিন্তু তিনি তা করিতে বধন অক্ষম তখন প্রচলিত স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ধ্বংস করে ছাত্রসমাজের ও দেশের ক্ষতি সাধনই করছেন। দ্বিতীয়ত মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয় ও উন্নাদনার প্রশ্ন দিয়েছেন—তাতে

আন্তর্জাতিক দিক হতে তিনি প্রচণ্ড জনসমর্থন পেয়েছেন বটে কিন্তু এর পরিণাম হবে ভয়াবহ।—Once you set these religious animosities and racial hatred in motion you will soon be powerless to stem the tide. It will be beyond your power to stop the evil which has been done—Statesman, Dec 10, 1920) সেই তারিখে আরও একটা সংবাদ তারা মুদ্রিত করে যা হতে গান্ধীজীর অসহযোগ ও শিলাফত আন্দোলনের যুগ্ম অভিযান যে কতখানি ব্যাপকতা ও শক্তি অর্জন করেছিল সেসময় তা বোঝা যায়। সংবাদটি এই যে দিল্লীর চীফ কমিশনার গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়ে কয়েকটি সেচ্ছাসেবক সংস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। শ্রেণী বিবেচ্য, কোনো কোনো ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে বয়কট করা, সরকারী কর্মচারীদের ও অমুগত নাগরিকদের মনে শঙ্কাসৃষ্টি, বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রতীকপ্রকাশ এবং উগ্র সরকার-বিরোধী প্রচার—এই সব দোষে দুই বঙ্গে ওই সংস্থাগুলি অবৈধ ঘোষিত হয়। সরকার যে গান্ধীজীর আন্দোলনে সতাই ধাবড়ে গেছে তখন এই সব সংবাদ হতেই তা বোঝা যায়।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঢাকায় যে মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা আগেই উল্লেখ করেছি সেই সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দেন ফজলুল হক। স্কুল কলেজ বয়স্কদের আহ্বানের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর একমাত্র বক্তব্য, সর্বাত্মকভাবে অসহযোগ আন্দোলনের নিন্দা তিনি করেননি—গান্ধীজীর তো প্রশংসাই করেছিলেন (One who is held in the highest respect and reverence by millions of India); কিন্তু তাঁর মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়স্কদের আহ্বান সমূহ জাতীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা ভারতের শতকরা তিনজন মাত্র শিক্ষিত—অশিক্ষা সর্বব্যাপক; এই অবস্থায় সরকার যাতে

শিক্ষার প্রসারের জন্য অধিকতর সচেষ্ট হয় ও অধিকতর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে সেইভাবেই সরকারের ওপর চাপ দেওয়া উচিত; ভারতবর্ষের মানুষের নিকট হতে সরকার যে রাজস্ব আদায় করে তাইই সামান্য একটা অংশ সে ভারতে শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে—বস্তুতঃ সেই টাকায় যেসব স্কুল কলেজ চলে সেগুলি আমাদেরই টাকায় চলছে ধরে নিতে হবে, অতএব এই টাকায় পরিচালিত স্কুল কলেজ বয়স্কদের প্রশ্ন অর্থহীন। জাতীয় বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা খুবই দরকার কিন্তু সেজন্য তো বর্তমান স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখনই ভেঙে ফেলা দরকার নেই—বিশেষত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন রাতারাতি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। ইংরেজি শিক্ষা বয়স্ক করে ছাত্রদের সরে আসার ফল, বিশেষত মুসলিম সমাজের পক্ষে হয়ে দাঁড়াবে মারাত্মক—ফজলুল হকের ভাষায় তাই গান্ধীজীর আন্দোলন হচ্ছে—a movement which is bound to spell disaster all round and reduce the Mussalman population of India to the position of political helots.

জিন্নাও গান্ধীজীর আন্দোলনকে স্বাগত জানাননি। অসহযোগ আন্দোলনের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। ১৯২০ সালের ২০শে ডিসেম্বর পুনার ফাউন্সন কলেজের ছাত্রদের এক সভায় জিন্না ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন যে গান্ধীজীর কর্মপন্থা সঙ্গোচিত নয়, বিদেশী দ্রব্য বয়স্কট অবাস্তব এবং জোব করে তা চাপাতে গেলে সাধারণ লোকের জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। তাঁর মতে বয়স্কটের প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস তার মর্যাদা হানি করেছে।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথও সর্বাংশে সমর্থন করেননি, বয়স্কট আন্দোলনকে তো নয়ই। বস্তুতঃ লর্ড সিংহ, ফজলুল হক বা জিন্নার বক্তব্য অর্থোক্তিক ছিলনা। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের প্রাবল্যকে লাভ-লোকসানের যুক্তি

দিয়ে সেদিন বেঁধে রাখা সম্ভব ছিল না এবং আন্দোলনকে জাতীয় সংগ্রামের স্তরে নিয়ে যাবার পক্ষে বয়স্ট প্রস্তাবেরও প্রয়োজন ছিল। সেকথা পরিকারভাবে স্বীকার করেছিলেন ইংলণ্ড হতে আগত লেবার পার্টির কয়েকজন প্রতিনিধি—বেন স্পুর ছিলেন তাঁদের অন্ততম। ১৯শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে এক সংবাদ প্রতিষ্ঠানের কাছে তিনি বলেন, "লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে যে ভারতবর্ষের জনগণ অসহযোগের আদর্শকে মেনে নেবে। আমি ভারতের যত স্থানে গিয়েছি মহাত্মাজীর আবিসংবাদী নেতৃত্বের স্বীকৃতি সর্বত্র দেখেছি। তাঁর এই জনপ্রিয়তার কারণ হল তিনি জনতার মর্মের ভাষা বোঝেন ও তাদের আন্তর ইচ্ছাকেই অবিসংবাস্ত করেন। সেই কারণেই আমার মনে হয় গান্ধীজী বা অস্ভাচ্ছ নেতারা যদি অপসারিতও হন তাহলেও জনতার ইচ্ছাই এই আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। অত্যাচার করা হলে আন্দোলনের আগুন দাউ দাউ করে জ্বল উঠবে।"

এইরকম পরিস্থিতিতে—যখন গান্ধীজীর অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন বহু মনীষী ব্যক্তি ও নেতা এবং সরকার পক্ষের বিশেষিতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে তখন ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে নাগপুরে বসল জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। গান্ধীজীই ছিলেন সেই অধিবেশনের প্রধান পুরুষ। সচ্য পরলোকগত তিলক ও গান্ধীজীর ছবি একই সঙ্গে পাশাপাশি মণ্ডপের শোভাবূদ্ধি করেছিল। তিনি অধিবেশন-কালে বসতেন পুরোহাৎ,—এবং মণ্ডপের বাইরে খোলা মাঠে উৎসব জনতার সামনে এসে মাঝে মাঝে দাঁড়াতেন; বিনা আয়োজনেই তিনি বড় বড় সভাও করতেন সেখানে এবং বক্তা থাকতেন একগাত্র তিনি নিজে। অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বিজয়রামবাচারি এবং তিনি সভাপতির অভিভাষণে মূল-কলেজ বয়স্ট ও আইন-আদালত বয়স্ট—এই দুই প্রস্তাবেরই তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন; কিন্তু গান্ধীজী নিজেই যখন তাঁর তিন দফা

বয়স্টের প্রস্তাব—আইন পরিষদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আদালত বয়স্ট—বিষয়নির্বাচনী সমিতির কাছে পেশ করলেন তখন তা গৃহীত হয়ে গেল বিপুল ভোটাধিক্যে—(১০০ ভোট পক্ষে ও ৩০ ভোট বিপক্ষে)। গান্ধীজীর প্রস্তাবে উল্লিখিত ছিল, যে এক বৎসরের ভিতরই স্বরাজ আসবে। তিনি তাঁর আন্দোলন পরিচালনার তিনটি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন,—খিলাফৎ সম্পর্কে জব্বারের প্রতিকার অর্থাৎ খলিফার সাম্রাজ্য খলিফাকে প্রত্যর্পণ, পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিকার এবং স্বরাজ লাভ। গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাবে অসহযোগের সঙ্গে অহিংসাকেও অঙ্গীভূত করে নেবার কথা বলেন এবং কার্ণে ও বচনে অহিংসার পূজারী হতে জাতিকে আহ্বান করেন, এবং গণতান্ত্রিক ভাবধারা বিকাশের পক্ষে ও সফল-ভাক্তে আন্দোলন পরিচালনার পক্ষেও হিংসা কৃতিকর হবে বলে মত প্রকাশ করেন। (This Congress desires to lay special emphasis on non-violence being the integral part of the non-co-operation resolution and invites the attention of the nation to the fact that non-violence in word and deed is as essential among ourselves as it is on the part of the nation in respect of Government and this Congress is of opinion that the spirit of violence is not only contrary to the free growth of the truly democratic spirit, but actually retards the enforcement if necessary of the other three stages in non-co-operation leading to the suspension of taxes.)

গান্ধীজী কংগ্রেসের সংবিধান পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যেও একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর প্রস্তাবটি ছিল: "That the object of the Congress is the attainment of Swaraj by the people of India

by all legitimate and peaceful means.' এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে যেহে প্রস্তাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন যে, ইংরেজ সরকারের ওপর আর কোনো প্রকার আশা রাখা সম্ভব নয়, শিলাফং ও পাজ্জাবের ঘটনাবলী প্রমাণিত করেছে যে অত্যাচারের প্রতিকার এই সরকারে পক্ষে করা সম্ভব নয়। আইনতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন পরিচালনা করে যে কোনো স্বতন্ত্র পাওয়া যায় না তাও পুনঃপুনঃ প্রমাণিত হয়েছে। ভারত তাই এখন তার দাবী আদায়ের জন্য ভিন্ন এক পথ গ্রহণ করতে চায়,— সে পথ রক্তপাতের পথ নয়, তার কারণ রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে যাবার জন্য ভারত এখনও প্রস্তুত নয় (India is not ready at present for violence)। স্বরাজ লাভই ভারতের আস্ত উদ্দেশ্য—কিন্তু সে স্বরাজ কি হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা অথবা সাম্রাজ্যের বাহিরে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার—গান্ধীজী বলেন যে এই দুইভাবেই প্রস্তাবটির ব্যাখ্যা করা চলবে—যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে ভারত লাভবান হয় তবে সে সম্পর্ক থাকবে, আর যদি লাভবান না হয় তাহলে সম্পর্ক থাকবে না। গান্ধীজী পুনঃপুনঃ বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, তাঁর প্রস্তাবটি এমন বহু অর্থব্যঞ্জক ও প্রসারধর্মী যে বাংলার বিপ্লবীরা এবং গান্ধীপন্থী অহিংসাবাদীরা একই সঙ্গে এই প্রস্তাবের সমর্থনে মিলিতভাবে দাঁড়াতে পারেন। (There is room enough in the proposed creed for all parties.)

গান্ধীজীর প্রস্তাব ও তৎসমর্থনে তাঁর বক্তৃতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় এই কারণে যে, এই বক্তৃতার মধ্যে ও প্রস্তাবে বিপ্লবীদের সঙ্গে সমঝোতা করার একটা ইচ্ছা ফুটে উঠেছে—কোন নৈতিক কারণ দেখিয়ে তিনি রক্তাক্ত বিপ্লবের পথকে নাকচ করেননি, বলেছেন শুধু যে সে পথে যাবার জন্য ভারত এখনো প্রস্তুত নয়। ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্তশাসন অথবা পূর্ণ স্বাধীনতা চায় এ প্রক্ষেপে কঠোর

অনমনীয় মনোভাব তাঁর ছিলনা,—অর্থাৎ গান্ধীজী সে সময়ে কংগ্রেসে ও দেশে সকল মতবাদীদেরই সম্মুখ করে নিজের নেতৃত্বতলে সমবেত করতে চাইছিলেন। এই নাগপুর কংগ্রেসেই দেশবন্ধু, বিপিন পাল প্রভৃতি বাংলা দেশের নেতাদের সঙ্গে গান্ধীজীব একটা আপস চুক্তি হয়েছিল এবং তার ফলে বাংলার বিপ্লবী সম্প্রদায়েরা ভিতরেও গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়। বিপিন পাল গান্ধীজীর প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতাও করেন।

নাগপুর অধিবেশনে জিন্নার জীবনের একটা তিক্ত অধ্যক্ষকোতুককর ঘটনাও ঘটেছিল। জিন্না বক্তৃতার শুরুতেই বলেন যে রক্তপাত ছাড়া ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে না। শ্রোতৃমণ্ডলী একধার তীব্র আপত্তি জানিয়ে প্রতিবাদ-ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকল। জিন্না বলেন স্বাধীনতা লাভের অকাঙ্ক্ষা ভারতের থাকতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ্য তার নেই।

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে জিন্না গান্ধীজীর নাম উল্লেখ করেছিলেন “মিঃ গান্ধী” বলে,—তাতে চারদিক হতে দাবী উঠতে থাকে যে “মহাত্মা গান্ধী” বলতে হবে। সে দাবী জিন্না মেনে নেন। কিন্তু মহম্মদ আলিকে মিঃ মহম্মদ আলি বলায় শ্রোতৃবৃন্দ ষখন চিৎকার করে ওঠে যে ‘মৌলানা মহম্মদ আলি’ বলতে হবে তখন জিন্না কিছুতেই রাজি হননি। কংগ্রেসের সঙ্গে জিন্নার সম্পর্ক এই অধিবেশন হতেই তিক্ততার দিকে মোড় নেয়।

কিন্তু দেশবন্ধুর সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্ক এই অধিবেশনে নিবিড় হয়ে উঠে। ‘স্টেটসম্যান’ সংবাদ দিয়েছিল (৩০শে ডিসেম্বর) যে দেশবন্ধুর সঙ্গে গান্ধীজীর একটা আপোষ চুক্তি হয়েছে। তার ফলে প্রকাশ্য অধিবেশনে দেশবন্ধু গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন না। বিরোধিতা তো দেশবন্ধু করেনইনি, গান্ধীজীর প্রস্তাবকে তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই অসহযোগ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ নতুন

প্রভাব তিনি নিজেই উত্থাপন করেন। তাঁর হুঁচকিত মেনে বিপিনচন্দ্র পাণ্ডা গান্ধীজীর প্রভাব সমর্থন করেন, কেবল প্রভাবে 'সরাস' শব্দটির পূর্বে 'গণতান্ত্রিক' শব্দটি যোগ করে দেওয়া হোক, এই একটিমাত্র অমুরোধ তিনি জানান।

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গান্ধীজীর নেতৃত্ব যখন সর্বজনস্বীকৃত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল—এমন কি যুক্তিবাদী ব্যারিষ্টার জিন্নাও যখন তাঁকে মহাত্মা বলে প্রকাশ্যে সম্বোধন করেন,—গান্ধীজীর বিরোধী বাংলায় প্রতিনিধিবৃন্দ—দেশবন্ধু ও বিপিন পাণ্ডার নেতা—তাঁরাও যখন গান্ধীজীর নেতৃত্ব সর্বাঙ্গতঃ বরণ করে নিলেন তখন সারা দেশের অবস্থাটা কেমন ছিল? ইংলণ্ডের পেরার পার্টির প্রতিনিধি বেন স্পুর্স কংগ্রেস অধিবেশনে ভাষণ দিয়ে বলেছিলেন যে সারা ভারতে জাতীয়তার অভূতপূর্ব আগ্রহ এবং অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায়,—সর্বোপরি লক্ষ্যবীর গোটা দেশের ঐক্য। কিন্তু কংগ্রেস বা গান্ধীজীর বিরোধী মতামতও যে দেশে ছিল তারও উল্লেখ ইতিপূর্বেই আমরা করেছি। কংগ্রেস বিরোধীদের ফিরাকানাগের সন্ধানও এই প্রশ্নে রাখা আবশ্যিক।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন বসেছিল। বস্তুতঃ সেই অধিবেশনেই গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা পাকাপাকিভাবে শুরু হয়। গান্ধীজী তাঁর জিম্মা বয়কটের প্রভাব সেই অধিবেশনেই পাশ করিয়ে নেন। বয়কটের একটি দফা ছিল আইন সভার প্রবেশের বিরুদ্ধে;—কংগ্রেস তাই আইন সভার নির্বাচনে কোনো প্রার্থী দাড় করায়নি। কলকাতায় আইনসভার জন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্রা ডিসেম্বর। কলকাতায় সেবার মোট পনেরটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। এই সব কেন্দ্রের কাছে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়েছিল: পাঞ্জাবের ঘটনা মনে রেখো, গান্ধীজীর উপদেশ মনে রেখো

—সহযোগিতা দূর করো, অসহযোগ চালাও, কাউকে ভোট দিওনা" ইত্যাদি। কুটিশ চার্চ কলেজ ও সিটি কলেজের ছাত্ররা ঐ দুই কলেজের স্থাপিত ভোটকেন্দ্রে ভোটদানে বাধা দেবার চেষ্টা করে। কুটিশ চার্চ কলেজের সামনে প্রায় দুই হাজার ছাত্র ভোটদানের সনির্বন্ধ অমুরোধ জানাতে থাকে যেন তারা ভোট না দিয়েই বাড়ি ফিরে যান। সমস্ত গাড়ি থামিয়ে তাদেরও ফিরে যেতে বলে। সংবাদ পেয়ে সহ-পুলিশ কমিশনার ও কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রদের নিবৃত্ত করতে আসেন। ছাত্ররা নিবৃত্ত না হলে পুলিশ কমিশনার অসংবহ পুলিশ সহ আসেন, লাঠি চালনা হয় ও এগারো জন ছাত্র গ্রেপ্তার হয়। সিটি কলেজের সামনেও অমুরূপ ঘটনার ফলে তিনজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

নির্বাচনে ঐরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী, সরকারের সমর্থকও বটে। হিন্দু, মুসলমান ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের পৃথক পৃথক নির্বাচন কেন্দ্র ছিল। আইন সভা ও বঙ্গীয় আইন পরিষদ এই সংস্থায় নির্বাচিত হয়েছিলেন সেবার ভার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, মিঃ এস. আর. দাগ, রায় রাধাচরণ পাণ্ডা, ডাঃ হরিধন দত্ত, মিঃ এ. সুরাবর্মা, মিঃ জেড সুরাবর্মা, এইচ. বার্টন, এ.ই. এ. স্টার্ক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে এঁদের যোগ থাকা দূরের কথা, কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবেই শত্রু ছিলেন। বাংলা দেশের মন্ত্রীসভায় নবনির্বাচিত স্তার হরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং প্রভাসচন্দ্র মিত্র স্থান লাভ করেন। হরেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের ভার এবং প্রভাসচন্দ্র হয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। বঙ্গীয় আইন পরিষদের অধ্যক্ষ মনোহীত হয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের জজ শামসুল হুদা।

নাগপুরে যখন কংগ্রেস অধিবেশন চলছিল তখন বাংলা দেশের রাজনীতিতে এই সকল ঘটনা ঘটছিল। সর্বভারতীয় রাজনীতিতেও কংগ্রেসবিরোধী শক্তি সম্ভবতঃ হতে চেষ্টা

করছিল। কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ময়েই আমরাও তিতে বসেছিল মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন। অসহযোগিতা-আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে এই সম্মেলনে ভাষণ দান করা হয়েছিল এবং প্রস্তাবাদিও গৃহীত হয়েছিল। খিলাফত আন্দোলনে মুসলমানেরা যুক্ত হয়ে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যাতে জড়িয়ে না পড়ে সেই উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন আহ্বত হয়েছিল।

ঐ একই সময়ে নাগপুরেই নিখিল ভারত আইনজীবী-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল—কলকাতার স্তার আন্তোষ চৌধুরী ছিলেন সভাপতি। গান্ধীজীর ত্রিমুখী বয়কটের অন্ততম অঙ্গ আদালত-বয়কটের ঘোর বিরোধিতা করে এই সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলকাতায় নিখিল ভারতীয় খৃষ্টান সম্মেলনও এই সময় অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সম্মেলনে একটি মধ্যপন্থী রাজস্বগত রাজনৈতিক পার্টি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। মাদ্রাজে সি. সি. ওয়াই চিন্তামণির সভাপতিত্বে National Liberation Federation একটি রাজনৈতিক দলের অধিবেশন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের একই কালে বসেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করে এই দলটিও প্রস্তাব গ্রহণ করে। ইংলণ্ডের “ডেইলি টেলিগ্রাফ” সংবাদপত্র “গান্ধী ও বদমায়েসগণ” নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে ঠিক এই সময়েই লেখে যে ভারতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। গান্ধী তাই এখন শুণ্ডাদের সাহায্যে তাঁর আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করছেন। ভারত সরকারের উচিত ভারতবাসীর স্বার্থেই এই আন্দোলন কঠোর ভাবে দমন করা। (We are bound to say that social stability is not jeopardised by the unscrupulous ambition of a handful of agitators, and the ruffianism of town mobs.) এমন কি নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেবার ক্ষমত বিলেতের লেবার পার্টি

যে দুজন শ্রমিক নেতাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের অন্ততম কর্নেল ওয়েজউড কলকাতায়ই কয়েকটি সভার বক্তৃতা করে বলেছিলেন যে অসহযোগ আন্দোলন হচ্ছে জৈবী, ঘৃণা ও বিদ্বেষপ্রসূত,—তাই আন্দোলন যত শীঘ্র থেমে যায় ততই মঙ্গল। তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না এবিষয়ে যে গান্ধীজীর কার্যকলাপের ফলে ভারতের উপকার যতটা হচ্ছে, ক্ষতি হচ্ছে তার তুলনায় অনেকগুণ বেশি। গান্ধীজীর ত্রিমুখী বয়কট নীতি আত্মসম্মতি ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতীয়দের কাছে কর্নেল সাহেবের উপদেশ ছিল, বিপ্লব করে কিছু হবে না, আর ধরাধ নিয়েই বা কী হবে যদি এদেশের লোকদের প্রতিভার বিকাশ না হয়?

এই সকল দিকের বিরোধিতা ও অসুস্থসাহের মধ্যে ভবিষ্যতের আশাজনক ইন্দিতও ঐ সময়কার দু একটি সংবাদে পাওয়া যায়। নাগপুরে ঐ সময়েই অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন এবং ত্রিমুখী বয়কট নীতি সমর্থিত হয়। কংগ্রেস লীগের এই সমন্বয়িত ও সৌহার্দ্য স্বামী হয়নি, কাজেই আশার ইন্দিত এই ঘটনার মাঝে খোঁজা বুঝা। আশার ইন্দিত ছিল সর্বভারতীয় ছাত্র-আন্দোলন ও ছাত্রসংগঠন গড়ে ওঠার সম্ভাবনাসম্পূর্ণ সংবাদে। নাগপুরেই কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে এই নিখিলভারত ছাত্র সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে অসহযোগ আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেসের কার্যধারাকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়। জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় ভাষার মর্যাদা, স্বদেশী ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রদের নিকট একটি আবেদন রেখে বলা হয় যে ছাত্রদের এইসকল ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

উত্তরকালে স্বভাষচন্দ্র এই ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হয়েছিলেন এবং ছাত্র ও যুবকদের আন্দোলন ও সংগঠনের তিনি বরাবরই ছিলেন একজন আন্তরিক সমর্থক। কিন্তু তাঁর জীবনের কর্মবৈশিষ্ট্যের কথা

স্বরণ করলে আর একটি সংবাদের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। সংবাদটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু স্বভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কর্মধারার পক্ষে এই ক্ষুদ্র সংবাদের ভিতরই একটি বিরাট সম্ভাবনা নিহিত ছিল। সংবাদটি এই :

ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সম্মেলন

সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

নাগপুর, ২৮শে ডিসেম্বর

গতকাল সন্ধ্যায় কংগ্রেস মণ্ডপে প্রথম নিখিল ভারত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ও পঁচিশটি বাহিনীর প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। প্রথম প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে গণ-অনুষ্ঠানগুলিতে অধিকতর সেবা দানের জন্য সমগ্র ভারতের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগুলিকে একত্রিত করে একটিমাত্র সংগঠনের অধীনে আনতে হবে—তার ফলে উন্নত শিক্ষা প্রণালীর সাহায্যে একটি অশৃঙ্খল সর্বভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে উঠবে।

নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশনের ফলশ্রুতি বিশ্লেষণ করে উত্তরকালে স্বভাষচন্দ্র লিখেছিলেন : ‘১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে মাদ্রাজের প্রবীণ নেতা শ্রীবিজয় রাঘবাচারিয়ারের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবটি (অহিংসা অসহযোগ) বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হয়। শ্রীচিন্তরঞ্জন দাস ও তাঁর অনুগামীরা নাগপুরে পুনরায় সমবেত হয়েছিলেন গান্ধীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু গান্ধীজী নিপুণ কুশলতার দেশবন্ধুর সঙ্গে একটি চুক্তিতে আসেন। আইনসভা বয়কটের নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন দেশবন্ধু, কিন্তু ইতিপূর্বেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যাবার ফলে বয়কট প্রসঙ্গটি তখন আর জরুরী

আমি ৩

ছিল না। ফলে দেশবন্ধুকে বুঝিয়ে একটা চুক্তির ভিতর আনা গান্ধীজীর পক্ষে অসম্ভব হয়নি। গান্ধীজী যখন দেশবন্ধুকে স্বমতে আনলেন তখন পণ্ডিত মালবা, মিসেস বেশান্ত, মিঃ জিন্দা বা বিপিনচন্দ্র পালের বিরোধিতা সত্ত্বেও অসহযোগ বিষয়ক প্রস্তাবটি প্রায় ঐক্যমতের সঙ্গে পাশ করানো গিয়েছিল।

ক্রমব্যাপক অসহযোগের প্রস্তাব যার তিনটি অঙ্গ হল আইনসভা, আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কট সমর্থন করা ছাড়াও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংবিধান পরিবর্তন করার মাধ্যমে নাগপুর কংগ্রেস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এভাবে কাল পর্যন্ত কংগ্রেস সংবিধানের বর্ণনা অনুসারে কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ‘স্বায়ত্তশাসন।’ এই লক্ষ্যের ফলেই কংগ্রেসের যোগসল সদ্ভূত ইংরেজের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার আত্মশীল ছিলেন কিংবা যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বন্ধন মুক্ত হয়ে থাকাকে মানতে চাননি তাঁরা এতদিন ক্ষুব্ধ ছিলেন। বামপন্থীরা যাতে কংগ্রেসপন্থিদের ক্রিকে আসতে পারেন সেজন্য ‘স্বরাজ্যই’ কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হল (স্বরাজ্যের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে স্ব-শাসন) এবং প্রত্যেক কংগ্রেস সদস্যকে নিজের মনের অভিপ্রায় অনুযায়ী স্বরাজ্যের ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হল। মিঃ গান্ধী কিন্তু ‘স্বরাজ্য’ বলতে বোঝালেন ‘যদি সম্ভব হয় তবে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থেকেই স্বায়ত্তশাসন লাভ আর যদি সম্ভব না হয় তবে সাম্রাজ্যের বাইরে থাকা।’

নাগপুর কংগ্রেসের পূর্বে কংগ্রেসের সংগঠন ছিল শিথিল। শুধুমাত্র বড় বড় শহরেই ছিল কংগ্রেসের শাখা, এবং সারা বছর ধরে কোন অনিদিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক কাজ করা হত না। নাগপুরে স্থির করা হল কংগ্রেসকে দেশব্যাপী ভিত্তিতে পূর্ণগঠন করা হবে। কংগ্রেসের ক্ষুদ্রতম ইউনিট হবে গ্রামের কংগ্রেস কমিটি। এই রকম কয়েকটি কমিটি মিলে গঠিত হবে ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটি। তারপর

ক্রমাগত গঠিত হবে মহকুমা (তালুক বা তহশিলও বলা হত), জেলা, প্রাদেশিক ও অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি। অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে থাকবেন বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি রূপে ৩৫০ জন সদস্য। এই কমিটি আবার নির্বাচন করবেন ১৫ জন সদস্যযুক্ত একটি ওয়ার্কিং কমিটি, যা হবে সারা দেশের পক্ষে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক সমিতি। তাছাড়া, প্রদেশভিত্তিকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা হল। যেমন, মাদ্রাজ প্রদেশকে দু'ভাগে ভাগ করা হল—ভেলেণ্ড তাষাভাষী অঞ্চল এবং তামিল তাষাভাষী তামিলনাড়ু। কংগ্রেসের নতুন সংবিধানের ভিত্তি হল গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় প্রকৃতির। এই নতুন সংবিধান গ্রহণ করা ছাড়াও নাগপুর কংগ্রেস পরবর্তী বংসরের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা স্থির করে।

স্বরাজ লাভের জন্য কংগ্রেস কোন পথ অমূল্য করবে সেবিষয়েও সংবিধানে একটি নতুন পরিবর্তন সূচিত হল। এ পর্যন্ত কংগ্রেস শুধুমাত্র 'নিয়মতান্ত্রিক উপায়' গ্রহণ করার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, কিন্তু অতঃপর ভবিষ্যতে কংগ্রেস 'সকল শান্তিপূর্ণ ও বৈধ' উপায় গ্রহণ করবে স্থির হল। এই পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল কেননা অসহযোগ আন্দোলন ছিল অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। লক্ষ্য ও লক্ষ্য সাধনের উপায় এই উভয় দিকের বিচারেই নাগপুর কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী পণ্ডিত মালব্য ও জিন্নার মতামত ও বহুল সংখ্যায় সমবেত তারুণ্যধর্মী বামপন্থীদের মতামতের ভিত্তি একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করেছিল। বামপন্থীরা যে কোন উপায়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভকেই কংগ্রেসে লক্ষ্য রূপে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু গান্ধী তাঁর বিশাল প্রভাব ও জনপ্রিয়তার বলে বামপন্থীদের দমিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। নাগপুরে কংগ্রেসের 'যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল এবং আজও যা কার্যকরী আছে তা বস্তুত: পক্ষে গান্ধীরই রচনা।'।

নাগপুর কংগ্রেসের সময় স্ভাষচন্দ্র ছিলেন ইংলণ্ডে। আসন্ন পরীক্ষার পড়ার চাপের ভিতরেও দেশের সংবাদ তিনি পুছাপুছ ভাবে রাখতেন। নাগপুরে গৃহীত নতুন সংবিধান ও কংগ্রেসের নবনির্গীত লক্ষ্য 'স্বরাজ' সম্পর্কে তিনি কী ভেবেছিলেন? আজ তা জানার কোনো উপায় নেই। কেননা তাঁর তৎকালীন মতামত কোথাও তিনি লিপিবদ্ধ করেননি। তবে স্পষ্টই বুঝতে পারি গান্ধীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তখনো বিদ্যমান কমেনি, দেশবন্ধুর প্রতি তো নয়ই। বরং কংগ্রেসের নতুন লক্ষ্য ও কর্মসূচির ভিত্তি তিনি সে সময় বহু আশা দেখতে পেরেছিলেন মনে হয়, কেননা গান্ধী ও দেশবন্ধুর নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেসের কাছে যোগ দিতে তিনি প্রবল উৎসাহ বোধ করেছেন। পরে ঐ গান্ধীনেতৃত্ব ও গান্ধীবাদী রণকৌশলের বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেসের লক্ষ্যের সীমাবদ্ধতারও বিরুদ্ধে তাঁকে যে একদিন লড়াইয়ের ভার নিতে হবে একথা সেদিন তিনি কল্পনা করেছিলেন কিনা তাও আজ জানার উপায় নেই। কিন্তু আপোষকারী মনোভাবের ছায়াপাত যে নাগপুর অধিবেশনের প্রস্তাবাদিতে তিনি দেখতে পেরেছিলেন তা ধরে নেওয়া যায়—কেননা নাগপুরে বামপন্থীরা যে জয়লাভ করেনি সেটুকু বোঝা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিলনা। কিন্তু তখন দূর বিদেশে বসে জাতীয় সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাই তিনি মুখ্যত চিন্তা করেছিলেন—মতবাদে বিরোধিতার দিককে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি। আর কার্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রবেশ না করে সেই কার্যক্ষেত্রের সমস্তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়, এই বোধটুকুও তাঁর ছিল। ফলে নাগপুর অধিবেশনের কার্যবিবরণী সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ তিনি করেননি বলেই মনে হয়।

(ক্রমশঃ)

নকশাবাড়ির লাল নক্সা

সমর গুহ

ভূমিহীন কৃষকের ভূমি বুড়ুকাই নকশাবাড়ির সমস্যাভাবের কারণ,—অকোশল প্রচারের ফলে একথাটি প্রায় একটি বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হয়েছিল। নকশাবাড়ির ঘটনা নিয়ে পার্লামেন্টে যে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে তাতে প্রায় সবাই বলেছেন যে ভূমি-সমস্যাই নকশাবাড়ি কৃষক বিক্ষোভের মূল কারণ। কিন্তু সমাজবাদী নেতৃবৃন্দ এস, এম, যোশী ও অরেন দিবেদীর সঙ্গে নকশাবাড়ি এলাকায় গিয়ে এবং সরজমিনে তথ্য ও ঘটনা পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্ত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যে মূলত ভূমিহীন কৃষকের ভূমি-সমস্যার সমাধানের জন্য নকশাবাড়ির লাল অভিযান সূত্র হয়নি। ভূমিহীন কৃষকের ভূমি বুড়ুকাই নয়, মাউ-সেতুঙ্গীয় রাজনৈতিক মহড়ার উদ্দেশ্যেই পাক-চীন-নেপাল সংলগ্ন নকশাবাড়ি অঞ্চলে চীনপন্থী মার্ক্সিস্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি সংঘবদ্ধ সম্মেলন সূত্র করেছে। বস্তুত, ভূমি বণ্টনের স্বনি নিষ্পত্তি ছিল ও অসম্ভব। ভূমি দেওয়ার নাম করে আদিবাসী কৃষক সংগ্রহের স্বযোগও হয়েছে বটে। কিন্তু বাংলা দেশের অসামান্য এলাকার তুলনায় নকশাবাড়ি এলাকায় ভূমি-সমস্যার তীব্রতা বহুপরিমাণে কম। তবুও এই এলাকাটিই চীনপন্থী মার্ক্সিস্ট কম্যুনিষ্টরা বেছে নিয়েছে মূলত একটি রাষ্ট্রদ্রোহাঙ্গক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য।

নকশাবাড়ির উদ্ভূত ভূমি ও ভূমিহীন কৃষক
যে অঞ্চলে লাল অরাজকতা চলছে সেটি নকশাবাড়ি;

খড়িবাড়ি ও ফাঁসীদাওয়া,—এই তিনটি থানা অঞ্চল নিয়ে গঠিত। শিলিগুড়ি সহর এলাকা বাদ দিয়ে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ১০৫,৩৭৯; এই অঞ্চলে কৃষিযোগ্য জমি আছে ৬০,০০০ একর। জমিদারী বিলোপ আইন প্রবর্তনের আগে ৬১০৪ জন আধিয়ার ও ৮৬০ জন জোতদার এই জমি চাষ করতো।

জমিদারী উচ্ছেদের ফলে এই তিনটি থানা এলাকায় ১৯,০০০ একর উদ্ভূত জমি সরকারের হাতে আসে। এই জমির মধ্যে ১০,০০০ একর কৃষিযোগ্য। আর ১,০০০ একর রাখা হয়েছে ভারতীয় ফৌজের জন্য, ৭৫০০ একর ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বিলি করা হয়েছে এবং এখন সরকারের হাতে উদ্ভূত আছে ২৫০০ একর জমি।

পশ্চিম বাংলার সরকারী অহুসদ্ধান অহুসয়ারী দেখা যায় যে এই এলাকার চা বাগানের মালিকদের হাতেও উদ্ভূত জমি নেই। এই এলাকার ১২টি চা বাগানের মধ্যে ৬টি চা বাগান জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আগেই জমি ছোট বর্গদারদের কাছে চাষের জন্য দিয়ে দিয়েছে। এই ছোট বর্গদার বা আধিয়ারেরা এখন চা বাগানের মালিকদের নয়,—খালনা দেয় সরকারকে। কারণ, এই ছোট চাষীরাই এখন এই জমির মালিক। অন্য চারটি চা বাগানে কোন কৃষি জমি নেই, ৮৪ একর বন এদের একতিয়ারে রয়েছে। এই বনজমি শিলিগুড়ি বনবিভাগ দাবী করেছে। বাকী দুটি চা বাগানের ২৭০ একর বন-জমি চা-চাষ বৃদ্ধির প্রয়োজনে নিজেরা রাখতে চেয়েছে কিন্তু বনবিভাগ এই

জমিও দাবী করছে। চা বাগানের হাতে উৎসৃষ্ট জমি রয়েছে বলে যে কথা বলা হয় তা ঠিক নয়।

জোতদার অর্থাৎ যে জমির মালিক জমিদারী উচ্ছেদ আইন অনুযায়ী ২৫ একর জমি রাখতে পারে সেক্ষেপ জোতদারের সঙ্গে বর্গাদার বা আধিদারদের সম্পর্ক খুব তিক্ত নয়। ১৯৬১ সাল থেকে এই অঞ্চলের জোতদাররা আধিদার বা বর্গাদারদের বিরুদ্ধে ১৬০টি উচ্ছেদের মামলা রুজু করে। তারমধ্যে এযাবৎ ১১টি আধিদারকে উচ্ছেদ করা হয়। ৯টি মামলা বর্গাদারদের পক্ষে যায়। গত তিন বছরে বর্গাদাররা জোতদারদের বিরুদ্ধে ২টি মামলা করে এবং এই দুটি মামলাতেই তারা জয়লাভ করে। গত একবছরে জোতদার-বর্গাদার মামলা হয়েছে মাত্র দুটি,—তার রায়ও বর্গাদারদের পক্ষে গিয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে কোন ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল বা কিষাণ সভা জমি থেকে জোর-জুলুম করে বে আইনী চাষী উচ্ছেদের একটিও অভিযোগ উত্থাপন করেনি। এক্ষেপ ঘটনা ও বাস্তব ভূমি-বিস্তারের তথ্য থেকে একথা বলা যায় যে গত কয়েক বছরে এই অঞ্চলে জোতদার বনাম বর্গাদার বা ভূমিহীন চাষীর মধ্যে কোন তীব্র সংঘর্ষ বা তিক্ততা ছিল না।

পশ্চিম বাংলার অন্তান্ত জেলার তুলনায় এই অঞ্চলের বেনামী জমিও খুব কম। তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত রাজবংশী সম্প্রদায় এই অঞ্চলের প্রধান জোতদার ও বর্গাদার গোষ্ঠী। প্রকৃতিতে এরা সরল, এই অঞ্চলের ২৪৪ বর্গ মাইল এলাকার মধ্যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পরে এরা সরকারের হাতে ১৭,০০০ একর জমি দিয়েছে, পঞ্চাশের ২৪ পরগণা জেলার ৫,০০০ বর্গ মাইল এলাকায় উৎসৃষ্ট জমি পাওয়া গেছে মাত্র ২৫,০০০ একর এবং প্রায় সম-আয়তনের মেদিনীপুর জেলার উৎসৃষ্ট জমির পরিমাণ হলো ৫৭,০০০ একর। তাই পশ্চিম বাংলার অন্তান্ত জেলার তুলনায় এই নকশালবাড়ি এলাকার বেনামী জমির পরিমাণও কম।

পশ্চিম বাংলার অন্তান্ত জেলার তুলনায় নকশালবাড়ি অঞ্চলে বেকারের সংখ্যাও কম। সাঁওতাল, ওঁরাও ও অন্তান্ত সম্প্রদায়ের ভূমিহীন চাষীরা এখানে চা বাগানে শ্রমিকের কাজ করে। প্রয়োজনে চাষীর পক্ষে শ্রমিক হওয়ার অযোগ্য শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি এবং আংশিকভাবে কুচবিহার জেলা ছাড়া পশ্চিম বাংলার আর কোন জেলায় নেই।

পশ্চিম বাংলার অন্তান্ত জেলার তুলনায় এই নকশালবাড়ি অঞ্চলে জোতদাররা সংচেয়ে বেশি উৎসৃষ্ট জমি দিয়েছে, এখানে বেনামী জমির পরিমাণ সবচেয়ে কম, এখানকার ভূমিহীন কিষাণরা চা বাগানে বিকল্প কাজের অযোগ্য গায় এবং তার ফলে গত তিন বছরে কোন তীব্র কিষাণ সমস্যা দেখা দেয়নি। বস্তুত, ভূমিহীন কিষাণ ও ভূমি বণ্টনের সমস্যা, পশ্চিম বাংলার অন্তান্ত জেলার তুলনায়, এই অঞ্চলগুলিতে সবচেয়ে কম, তথাপি এই অঞ্চলেই চীনপন্থী মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি কিষাণ আন্দোলনের নামে সম্মানস্বাপী অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। যে সব জমি এই ‘লালপার্টির’ লোকেরা গত তিন মাসে দখল করেছে তার মধ্যে ৫০টি ক্ষেত্রে হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে এর মধ্যে ৪৯টি ক্ষেত্রে বেনামী জমি বা উৎসৃষ্ট সরকারী জমি দখল করা হয়নি,—দখল করা হয়েছে আইন সঙ্গত অধিকারীর এবং প্রধানত ছোট কিষাণের জমি।

উপরের পরিসংখ্যানগুলি স্পষ্টভাবে সংকেত করে যে ভূমিহীন কিষাণ বা বেনামী জমি বা আধিদার-জোতদার সংঘাতের জন্ত নকশালবাড়ীর সমস্যা সৃষ্টি হয়নি—এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক কারণে ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে।

“লাল-পার্টির” শক্তি ও সংগঠন

নকশালবাড়ি এলাকায় মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি ‘লালপার্টি’

নামে পরিচিত। এই লালপাটি নকশাবাড়ির তিনটি ধানায় বৃহত্তম দল নয়। এই দলের প্রভাব ১৯৬২ সালের নির্বাচনের চেয়ে ৬৭ সালে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬২ সালে ও ৬৭ সালে একই প্রার্থীজয় নির্বাচনে লড়াই করে। যথা :

১৯৬২	১৯৬৭
ওয়ার্দি (কং) ১৪,১২৫	ওয়ার্দি (কং) - ১৬,০০০
জংগল সাঁওতাল (কম্যু)	জংগল সাঁওতাল (কম্যু)
১৩,০০০	—১০,০০০
ঈশ্বর তিকি (বং)	ঈশ্বর তিকি (বাং কং)—
৬,৭০০	—৯,৫০০

কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস উভয় দলেরই সমর্থক সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু জংগল সাঁওতাল তথা মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টির শক্তি হ্রাস পেয়েছে। জাতীয়তাবাদী শক্তির তুলনায় এই দলের সমর্থক সংখ্যা এক তৃতীয়াংশের সামান্য বেশি।

নকশাবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসীদাওয়া ধান তিনটির মধ্যে এই লাল পার্টির প্রধান শক্তিকেন্দ্র হলো নকশাবাড়ির হাতিঘিঙ্গা এবং বড় ও ছোট মণিরাম অঞ্চল এবং খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ এবং এই ধানায় ফুলবাড়ি, বাতাগী, কামজোর ও খড়িবাড়ি চা বাগান অঞ্চল। ফাঁসীদাওয়া অঞ্চলে এদের প্রভাব অল্প।

জংগল সাঁওতাল ছুঁবার কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রার্থীরাপে নির্বাচনে দাঁড়াবার ফলে সাঁওতাল, মুন্ডা ও ওরাও সম্প্রদায়ের উপরে এদের প্রভাব বেশি। কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থকদের মধ্যে মোটামুটি ৬০ শতাংশ সাঁওতাল, ৩০ শতাংশ রাজবংশী ও ১০ শতাংশ মুসলীম ও অস্পৃহ। নকশাবাড়ির সংঘর্ষকে কেউ কেউ সাঁওতাল বনাম তফশীলী রাজবংশীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে যে বলেছেন তা ঠিক নয়।

এই অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষাণদের মধ্যে এক দশমাংশের বেশি কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে প্রথম অবস্থায় ছিল না। এদের সংখ্যা হবে প্রায় ৫০০ ভূমিহীন পরিবার। এই ভূমিহীন

সাঁওতাল ও ওরাও ছাড়াও, এই দলের প্রধান ও উগ্রকর্মী হলো ফুলবাড়ি, বাতাগী, ও খড়িবাড়ি চা বাগানের সংগঠিত সাঁওতাল শ্রমিকেরা। বস্তুত, নকশাবাড়ি এলাকায় যে ঘটনা ঘটেছে তাতে ভূমিহীন কৃষাণের অপেক্ষা চা বাগানের সাঁওতাল শ্রমিকরাই বেশি মারমুখী অংশ গ্রহণ কবেছে।

সম্মানের সংকেত ও সূত্রপাত

যুক্তফ্রন্ট সরকার গণ-আন্দোলন দমনে কংগ্রেসী আমলের স্ত্রায় পুলিশ ব্যবহার করবে না,—এই অঞ্চলের কম্যুনিষ্টরা এই ঘোষণাকে জমি দখলের লড়াই শুরু করার সূযোগ ও সংকেত বলে গ্রহণ করে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি রাজস্ব-মন্ত্রী আগেই কয়েকলক্ষ ইস্তাহার নিলি করে কৃষকর স্বার্থরক্ষার লড়াইয়ের আহ্বান জানান। এই ইস্তাহারের হাজার হাজার কপি যায় এই এলাকায়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী কম্যুনিষ্টদের কৃষাণ সভারও সাধারণ সম্পাদক। তিনি কৃষাণ সভার সভা করার জন্য ব্যাপক সংখ্যায় রসিদ পাঠান এই এলাকায়। মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দলের এই কৃষাণ নেতার সঙ্গে স্থানীয় মার্ক্সবাদী নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগও ঘটে।

জমি দখলের 'কারবাই' শুরু হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের কিছুকাল পরেই। প্রথম অবস্থায় কম্যুনিষ্ট নেতারা একটি দুটি ছোট ছোট জমি দখল করে পুলিশের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে। এদিকে সর্বত্র রাজনৈতিক আওয়াজ তুলে দেওয়া হয় যে নকশাবাড়িতে 'ভূমিহীন কৃষাণদের ভূমি বন্টনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছে।' পুলিশ তাই প্রথম পর্য্যায়ে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। জমি দখলের ঘটনার ডায়েরির পর ডায়েরি জমতে থাকে নকশাবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসীদাওয়া ধানায়। পুলিশ কার্বত চূপচাপ বসে থাকে। ফলে জবর দখল জমির লড়াই জামিতিক হারে বাড়তে থাকে। আইন শৃঙ্খলা অচল, পুলিশ পঙ্ক, জনসাধারণ

দিশেহারী,—মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে নকসালবাড়ী এলাকার তিনটি থানার ছিল এই চিত্র।

একুপ পরিস্থিতিতে ১৭ই মে ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার থান নকসালবাড়ি। নকসালবাড়ি ক্লাবে আইন শৃঙ্খলা বিপর্যয়ে জনতার অভিযোগের উত্তরে লাল মন্ত্রী সাফ জবাব দিয়ে বলেন “বেনামী জমি ও ভেটেড (vested) জমি জবরদখল করে না নিলে কৃষকদের পক্ষে জমি পেতে দেরী হবে, জোতদারেরা ছ বছর ঝুগিয়ে রাখবে,—জমি বন্টন হবে না, তাড়াতাড়ি জমি দখল করতে হলে জবর দখল করতেই হবে।” স্থানীয় লোকেরা জিজ্ঞেস করে, “ছোট জোতের জমি দখল করা হচ্ছে কেন?” উত্তরে মন্ত্রী বলেন, “বড় কাজে মাত্রা ঠিক রাখা যায় না। আমি কামু ও জংগলকে বলে দেব এসব অস্ত্রায় যেন না হয়।”

‘কমরেড’ হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার চলে যাওয়ার পরে জমি জবর দখলের অভিযান চতুর্ভুগ জোরদার হয়ে ওঠে। একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে আদিপর্বে মার্কসিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্বুদ্ধতম নেতাদের সংকেতে, সংযোগে এবং আশ্বাসের ফলেই জমি জবর দখলের জোর ছুঁলুম ও সম্ভাব্যবাদ শুরু হয়।

“লাল অভিযান” : প্রথম পর্ব : জমি দখল

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর থেকেই এই অঞ্চলে জমি দখলের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম অবস্থায় একটি দুটি ঘটনা ঘটতে থাকে। শুরুতে তীর-ধমুক, বজ্রম, ভোজালী, দা ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ২৫—৫০ করে লোক গিয়ে জমি জবর দখল আরম্ভ করে। জমিতে গিয়ে শস্ত্র কম্যুনিষ্টরা প্রথমে লাল নিশান পুতে ঘোষণা করে যে ‘এই জমি এখন কম্যুনিষ্ট পার্টির’। জমির মালিকরা গিয়ে পুলিশকে বুঝাই এসব ঘটনা জানাতে থাকে। পুলিশের প্রায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার ফলে লাল পার্টির লোকদের উৎসাহ এবং সঙ্গে সঙ্গে জমি জবর দখলের অভিযানের মাত্রা বাড়তে আরম্ভ

করে এবং শস্ত্র জবর দখলকারী মোর্চার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১৭ই মে রাজস্ব মন্ত্রী নকসালবাড়ি যান। তার পরে জমি দখলের অভিযান তীব্রভাবে বেড়ে যায়। মে মাস পর্যন্ত নির্বিচারে জমি জবর দখলের আন্দোলন চলে। মে মাস পর্যন্ত মোটামুটি ১০০টি জমি জবর দখলের ঘটনা ঘটে। শেষের দিকে জমি জবর দখলকারী মোর্চার আয়তন কোন কোন ক্ষেত্রে ৩০০ জনতায় গিয়ে দাঁড়ায়।

২৪শে মে সাঁওতাল কম্যুনিষ্ট মোর্চার একতরফা আক্রমণে নকসালবাড়ি এলাকায় পুলিশ ইন্সপেক্টর এস, ওয়াং দি বিধাস্ত্র তীর বিদ্ধ হয়ে মারা যায় এবং আরেকজন পুলিশ কর্মচারী গুরুতর আহত হয়। এই ঘটনায়ও পুলিশ গুলি চালায়নি। এই ঘটনা পরিচালনা করে খোকন মজুমদার। এটি এই লাল কমরেডের ছদ্মনাম আসল নাম ইয়াকুব। এর আরও তিনটি নাম আছে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা দেখে ২৫শে মে তারিখে প্রসাদজোত গ্রামে মোর্চার চলার প্রধান রাস্তার উপরে ১০০—১৫০ জন লোক পশ্চিম দিক থেকে এবং প্রায় ৪০০ জন পোছন দিক থেকে একটি পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণ করে, প্রসাদজোতের আক্রমণকারীদের সামনে ছিল প্রধানত মেয়েরা। ফলে পুলিশের গুলিতে ৭ জন মহিলা, ১ জন শিশু ও ২ জন পুরুষ,—মোট ১০ জন মারা যায়। একুপ ঘটনার পরেও পুলিশ জবর দখল বন্ধ করার বা সম্ভাব্যবাদীদের গ্রেপ্তার করার কোন ব্যাপক চেষ্টা করেনি।

দ্বিতীয় পর্ব—লাল সরকার

মে-জুন মাসে পুলিশ উপজুগত এলাকায় ৪-৫টি শিবির স্থাপন করে কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের নির্দেশে পুলিশ উপদ্রব-কারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে। ফলে, ‘লালপার্টি’ এই অঞ্চলে প্রায় একছত্র একতিয়ার লাভ করে। তিনটি থানাকে তারা কয়েকটি এলাকায় ও ‘শাসন-ক্ষেত্রে’ ভাগ

করে নেয়। তিনটি প্রধান কেন্দ্রে থেকে সম্মানবাদী অভিযান পরিচালিত হয়। জংগল সাঁওতাল ও খোকন মজুমদারের নেতৃত্বে হাতিঘিসা (এটাই আদি কেন্দ্র) কাছ সান্তাল ও কদম মল্লিকের নেতৃত্বে বুড়াগঞ্জ এবং মুজিবুর রহমান, ওলি মহম্মদ ও কামাখ্যা বানার্জীর নেতৃত্বে মনিরাম অঞ্চল থেকে সম্মানবাদী অভিযান চালান হয়। ফাঁসীদাওয়া এলাকার কাহুভিটা ও দামভিটার দুটি ছোট কেন্দ্রও স্থাপিত হয়। কিন্তু সংযুক্ত-সমাজবাদী—নেতা সম্পদ রায়ের প্রতিরোধের ফলে এই অঞ্চলে জবরদখল ও চড়াওয়ার অভিযান প্রসার লাভ করেনি।

যে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে জমি দখল আন্দোলনের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, ধান, টাকা ও অস্ত্রাস্ত্র জিনিসপত্র লুটের কার্যক্রম শুরু হয় এবং জুন মাসে এই কার্যক্রমই প্রাধান্য লাভ করে। এই লুটতরাজের অভিযানে খুনের ঘটনা ও খুনের হুমকি বাড়তে থাকে। এই সময়ে কয়েকটি খুন হওয়ার ফলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ৫০০ পরিবার নকশাবাদির থানার কাছে এসে আশ্রয় নেয়।

জুন মাসে টাকা, পয়সা ও ধান এবং অস্ত্রাস্ত্র জিনিসপত্রের রাহাজানি, ডাকাতি ও লুটের কার্যক্রম জমি জবরদখলের স্থান গ্রহণ করে। নির্বিচার ও বাধাহীন লুটের স্বযোগ লাভ করার ফলে লুণ্ঠনকারী মোর্চার সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৪০০-৫০০ জনতার পরিণত হতে দেখা যায়।

জুন মাসে সম্মানবাদীরা আওয়াজ তোলে : “বন্দুক চাই, জোতদারের রক্ত চাই, প্রসাদজোতে পুলিশ গুলির বদলা চাই।” এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় দলবদ্ধ ডাকাতি করে ‘লাল পার্টি’ দশটি বন্দুক দখল করে এবং আরও প্রায় ১০টি দেশী বন্দুক সংগ্রহ করে।

পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার ফলে ঘাড়ে ঘাপে বেড়ে

গিয়ে সম্মানবাদীদের জোর জুলুম ‘লাল সরকার’ গঠনের আন্দোলনে পরিণত হয়। হাতিঘিসা, বুড়াগঞ্জ ও মনিরাম অঞ্চল,—এই তিনটি এলাকায় সম্মানবাদীদের একছত্র অধিকার কায়েম হয়। এই তিনটি এলাকায় করমান জারী করা হয় যে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও কিষাণ-সভার সভ্য না হলে কাউকেই এই তিনটি অঞ্চলে থাকতে দেওয়া হবে না। ফলে এই অঞ্চল তিনটির অধিকাংশ লোক কিষাণ সভার স-্য হয় এবং বাকিরা ঘরবাড়ী ছেড়ে গ্রামান্তরে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

নিজেদের প্রতি-সরকার কায়েম করার জন্য এবং তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জুন মাসে গ্রামে গ্রামে লাল পার্টি মিছিল বের করবার প্রোগ্রাম নেয়। মিছিলের জনতার সঙ্গে তীর ধুক ও অস্ত্রাস্ত্র ছাড়াও বন্দুক ব্যবহৃত হয় এবং সমস্ত গ্রামবাসীকে একরূপ মিছিলে বোগদানে বাধ্য করার ফলে কোন কোন মিছিলে জনতার সংখ্যা ১,০০০-২,০০০ পর্যন্ত হতে দেখা যায়। হাতিঘিসা অঞ্চল পঞ্চায়েতে কম্যুনিষ্টদের সংখ্যাধিক্য। নিজদের ‘প্রতি-সরকারের’ একতিয়ার কায়েম করার জন্য জংগল সাঁওতাল এই পঞ্চায়েতের চৌকিদার বিশ্বকর্ষা দাসকে জবাব দিয়ে দেয় এবং পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ করে দেয়। খড়িবাড়ি থানার রায়মতি জোতে ভৈরব সিংহের পরিত্যক্ত বাড়িতে এই লাল শাসকরা, একটি জেলখানা তৈরী করে এবং দফাদার ভূষণ সিং ও শচীন ভারতী নামে দুই ব্যক্তিকে জোর করে ধরে এনে কয়েদ করে রাখে। সংঘর্ষ ও রক্তপাত এড়ানোর কথা ঘোষণা করে পুলিশ এই সময়ে প্রায় সম্পূর্ণ নীরব থাকার ফলে অন্তত তিনটি অঞ্চলে সম্মানবাদীদের সাময়িক হুকুমত কায়েম হয়।

অতঃশূর্ত সংগ্রামের ময়ূনা

কম্যুনিষ্টদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে নকশাবাদির

সংগ্রাম ভূমিহীন কিসাণদের স্বতঃস্ফূর্ত লড়াই। এই লড়াই ভূমিহীন কিসাণের লড়াই কি না প্রাপ্ত তথ্যই সেকথার জবাব দেবে। অল্পতে প্রায় ২৫ হাজার ছোট কিসাণ এবং ১০ হাজার ভূমিহীন কিসাণ পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩০০-৪০০ সাঁওতাল, রাজবংশী ও মুসলিম পরিবার এই জমি দখলের জবরদস্তি শুরু করে। এরূপ জমি দখলের কার্যক্রম প্রথমে হাতিঘিশা ও বুড়াগঞ্জ এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। পুলিশের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার ফলে এই জমি জবরদস্তির জবরদস্তি, প্রসার লাভ করে। দুই শ্রেণীর লোক পরবর্তী পর্যায়ে এই লড়াইয়ে যোগ দেয়। ‘লালপাটি’ বুড়াগঞ্জ, হাতিঘিশা ও মণিরাম অঞ্চলে ফতোয়া জারী কবে যে যারা লালপাটি ও কিসাণগণের সভ্য না হবে জমি দখলে লড়াইয়ে ও মিছিলে যোগ না দেবে তাদের গ্রামে থাকতে দেওয়া হবে না। এমন কি অনেকের উপরে দৈনিক উৎপীড়নও শুরু হয়। তাই একশ্রেণীর লোক আত্মরক্ষার তাগিদে ভয়ে লালপাটির সভ্য হয়ে তাদের জমি দখলের লড়াই ও মিছিলে যোগ দেয়। জমির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য এক শ্রেণীর ক্ষোভদারও জমি দখলের আন্দোলনে যোগ দেয় এবং নিজেদের বন্দুক নিয়ে জংল সাঁওতালের দলকে সাহায্য করে। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা যোগ দেয় লুটতরাজ, রাজাজানি ও ডাকাতির পর্ব শুরু হওয়ার পরে। এই দ্বিতীয় পর্বে মিছিল করে হামলা-কারীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। কোন মিছিলে এক হাজার জনতাকেও যোগ দিতে দেখা যায়। এই জনতার অধিকাংশ ছিল কম্যুনিষ্ট অধিকৃত চারটি চা বাগানের শ্রমিক। লুট ও অর্থ অপহরণই ছিল এদের প্রধান লক্ষ্য।

একশ্রেণীর সাঁওতাল মেয়েরা জংল সাঁওতালের অমুগানী বটে কিন্তু অনেক মেয়েদের লাল নেতারা জোর করে ভয় দেখিয়ে মিছিলে ও পুলিশের বিরুদ্ধে হামলায় যোগ দিতে বাধ্য করেছে এবং পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিটি হামলায়

মেয়েদের আগে বাড়িয়ে দিয়ে নেতারা ও পুরুষেরা পিছনে থেকে তীর ধনুক বা বন্দুক চালিয়েছে।

প্রসাদজোতের ধীরেন রায়, তার স্ত্রী ও আড়াই মাসের কন্যার পুলিশের গুলিতে নিহত হবার নির্ধন কাহিনী সমাজবাদী প্রতিনিধিদের জানায়। উদাস্ত ধীরেন রায় স্থানীয় রেলের একজন সামান্য গ্যাংগম্যান। ২৫শে সকালে স্থানীয় কম্যুনিষ্ট নেতারা তার বাড়ি গিয়ে তার স্ত্রী ও তাকে সেদিনের মিছিলে যোগ দিতে বলে। ধীরেন রায় অস্বীকার করে পালিয়ে কাঁজে চলে যায়। লাল নেতারা তখন ধীরেন রায়ের স্ত্রী নয়ন রায়কে মিছিলে যোগ দিতে বলে, নয়ন রায়ও অস্বীকার করলে ‘লাল নেতা’রা ধীরেন রায়ের আড়াই মাসের কন্যার গলা টিপে ধরে। কন্যার আত্মদান উদজাস্ত হয়ে শিশু কন্যাকে পিঠে বেঁধে নয়ন রায় মিছিলে যোগ দেয়। এই মিছিলে নয়ন রায়কে ‘অন্তান্ত’ মেয়ে-দের সঙ্গে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে নেতারা পেছন থেকে পুলিশের উপরে তীর ধনুক চালায়। ফলে পুলিশের গুলিতে নয়ন রায় ও তার শিশু কন্যা প্রাণ হারায়।

প্রসাদ জোতের স্ত্রীমতী রাধিকা মল্লিক উরুতে গুলিবদ্ধ হয় ২৫ মে তারিখের পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে। স্ত্রীমতী রাধিকা সমাজবাদী প্রতিনিধিদের বলে :

‘প্রায় দেড়শ’ মেয়েকে প্রসাদজোত অঞ্চলের বাড়ি বাড়ি থেকে, ভয় দেখিয়ে ডেকে এনে রাস্তার মোড়ে জড় করা হয়। তখন একটি পুলিশ বাহিনী রাস্তা দিয়ে যাক্ছিল। বং ও বোরল সর্দার আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে হুকুম দিতে থাকে—‘এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও’। পুলিশ ফাঁকা গুলি করে ভয় দেখায়। বং ও বোরল তবুও পিছন থেকে মেয়েদের সামনের দিকে ঠেলে দিতে থাকে। এই সময়ে

[শেষাংশ ১৯৯ পৃষ্ঠায়]

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

গুপ্তধন

খাটের তলার বাক্সে আমার মনের কথা আছে .

দিদি, তোর গুটিপোকা তুলোর রেশম থেকে

কবে রেশমি প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল...

খুকুসপি, তোমার পুতুলজোড়া ঐখানে এত বেশি ঘুমোয় এখন...

বৌদি, তোমার সমস্ত চিঠি পড়া হয়ে গেলেও কিছুই বুঝিনাকো ।

আজ কেউ বাক্স খুললে ঝলমলিয়ে উঠবে বেনারসী

মুর্শিদাবাদের ধোয়া সিঁদু

খাট নড়ে উঠলে কেউ ঘুমঘোরে এপাশওপাশ করে গেলে .

খাটের তলার সেই জগতের মনপ্রাণ শুক হয়ে যায়...

ওরই নীচে বসে বসে গোপনে জীবন কার প্রস্তুত হয়েছে

মেঝে থেকে চোরা ছিন্তে জন্তুজানোয়ার .

পিঁপড়াদের সারি দেখা গেছে সারাদিন...

বাইরে বেরোবার আগে সযত্নসজ্জিত

গুপ্তধন আজো দিতে পারি ।

কোন কোন কথায়

কোন কোন কথায় আমি চমকে উঠি...

কোন কোন শব্দের আচ্ছন্নতায় আমার ভয় হয়...

কাক যখন চোখ পাশ্টিয়ে পাশ্টিয়ে তাকায়

বেড়ালটা নিঃশব্দে চলাফেরা করে মাঝরুয়ার দিয়ে

তখন নিজেকে এক বিন্দু ভেবে প্লেটে ঝাঁক কষতে সাধ যায় ।

আমার প্রেম, হৃৎক, দাহ, পাপ কিছুই থাকবে না কোনখানে

আমিও না...

গাছ থেকে পাড়া ফল বিক্রির সময় পর্বন্ত অপেক্ষমান

গাছের টুসটুসে রাঙা ফল

সবুজ টিয়ার ঠোঁট এড়িয়ে এড়িয়ে

সবুজ পাতার কঁাকে মিশে

ঝুড়িতে এহাত ওহাত ওয়াগনে স্বদৃশ্য দোকানে

তারপর ডেসার্ট টেবিলে মুছে যায়...

আমরা ওরকম হতে চাই অথচ পারি না...

অসম্পূর্ণতার মাঝখানে

কথা ফুরোবার আগেই কখন

নিঃশব্দ কথায় আমরা চমকে উঠি...

বাইরে প্রতীক্ষারত কে বিদেশী কখন হঠাৎ ডেকে নিয়ে যাবে ।

ডেকে নিয়ে যাবে ।

শিল্প আলোছায়া

ঝুলছে লণ্ঠন একটা গল্পের গাড়ির নীচে হেলেন্ধলে
কাঁপছে কার বুকের গুঁকগুঁকি
ওগো কে আছো কোথায় শুনে যাও
আমার বুকের এত সংবাদ কোথায় রাখবো বলে দাও
আমরা সব যে যার ভীষণ কোন অসহায় হাঁকে
মাঝে মাঝে চার হাত প্রমাণ উঠে যাই
আমরা আকাশদীপ তুলতে যাই কাটিকের রাতে
লণ্ঠন তারও ত কত উধ্ব'চারী হতে সাধ যায়
তাকে আকাশ দাও হে দেখো সেও আপনিই পাখি হয়ে যাবে
তাকে সমুদ্র দেখাও দেখো সেও অভিজ্ঞ নাবিক
হয়ে যাবে ধীরে ধীরে হয়ে যাবে একটি জাহাজ
শিল্প কিংবা রাজহংসদের মত খুব নির্বিকার
এখন লণ্ঠন সামনে রেখে এই মাঠ হব পার
লণ্ঠনের পায়ে পায়ে আলোছায়া
অনেক অনেক পথচলা শুধু অঙ্গীকার...
কালকেউটে মাথা খোঁড়ে লণ্ঠনের ঐ অন্ধকারে
আমরা হেঁটে যাই
শিল্প ঐ আলোছায়া আমাদের পা-তোলা পা-ফেলা।

অহঙ্কার ভাঙে

বুকে কারুর মুখ রেখেছি বুকের অহঙ্কার
দেখবো বলে যখন দূর পাক্ষি চলে যায়....
উধ্ব'স্বাস পাহারাদার বরকন্দাজদল
গভীর হতে গিয়েও ধুলো খেলার সামগ্রীই
রইলো বনে পলাশবনে নিচুতলায় দুরে
সেই যেখানে কাপাগড়ালে প্রলাপতির মেলা
দিনরাত্রি গল্প বলে মহেশ্বরের চেলা
পাখির ভাষা বুকের ভাষা আবেশ ভরে ডাকে...
এত স্বপ্নের মধ্যে আমার স্বপ্নের কথা কাকে
বলবো আমি এই বিজনে ভেবেছিলাম কবে,
বুকের নদী স্বপ্নের নদী ঘর ভাঙলো যদি
রেখার বুকে মুখ রেখেছি ভাঙছে অহঙ্কার।

কলিকাতার বাসস্থান সমস্যা

নিরঞ্জন হালদার

কলিকাতা শহরে বাসস্থান সমস্যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করছে। পৌর এলাকার সীমানার বাইরে-নিকটে ও দূরে জমি শস্তা পেয়ে বা খালি জমি জবরদখল করে যারা বাড়ি তৈরি করেছিলেন, নাগরিক জীবনের কোন সুখ সুবিধাও তাদের ভাগ্যে জোটে না। তা ছাড়া শহরগুলি থেকে প্রতিদিন কলিকাতা যাতায়াতের জন্ত ট্রেনে, বাসে বা ট্রামে যে অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তাতে কলিকাতা শহরের মধ্যে যে-কোন অবস্থায় বাস করা অনেকের পক্ষেই লাভজনক বলে মনে হতে পারে। বৃহত্তর কলিকাতায় ১৯৬১ সনে জনবসতি প্রতি একরে গড়ে ২২ জন ছিল। পৃথিবীর আর কোন শহরে মানুষ এত গাদাগাদি হয়ে বাস করে না। অবশ্য কলিকাতা ও হাওড়া শহরে প্রতি একরে ৮০ জন লোক বাস করে। বসতি এলাকার গড় নিলে দেখা যাবে বৃহত্তর কলিকাতার প্রতি একরে গড়ে ১৪২ জন এবং কলিকাতা পৌর এলাকায় গড়ে ৩০০ জন লোক বাস করে।

প্রতি একর জমিতে জনবসতির চাপ দিয়ে কিন্তু কলিকাতার অবস্থান সমস্যার ভয়াবহতা বোঝা যাবে না। কলিকাতার ত্রিশলক্ষ লোকের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ বসতিতেই বাস করে। প্রায় সাত লক্ষ লোক পৌরসভা স্বীকৃত বসতিতে বাস করে থাকে। কলিকাতা পৌর এলাকায় দশ কাঠার কম জমিতে খোলা বা টালির ঘর তৈরি করলে তা বসতি হিসাবে গণ্য হয় না। শহরে এজন্ত মাত্র তিন হাজার স্বীকৃত বসতি আছে। দশ কাঠার মত জমিতে বস্তির সংখ্যাও নিত্যকাল কম নয়। শহরের কিনারায় বা সীমানার ঠিক

বাইরে এই ধরনের ছোটখাট বস্তির সংখ্যাই বেশী। শহরের মধ্যে বস্তুি অঞ্চলের ১৬০০ একর জমি শহরের মোট এলাকার বারো ভাগের এক ভাগ হলেও এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসী এই সব বসতিতেই বাস করে থাকে। কাজেই কোন কোন বস্তুি এলাকায় প্রতি একরে গড়ে ২৪০০ লোক বাস করলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

যে-কোন বড় শহরেই আশেপাশের এলাকার লোক এসে ভিড় করে থাকে। কলিকাতা এখনও পর্যন্ত ভারতের সর্ব প্রধান শিল্পক্ষেত্র, বানিজ্য কেন্দ্র এবং সর্ব প্রধান বন্দরও। মার্কিন গম খালাসের হিসাব ধরলে অবশ্য বোঝাই বন্দরের স্থান প্রথম হয়। আসাম, ত্রিপুরা মণিপুর উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশের পূর্ব অংশের আমদানি-রপ্তানি কলিকাতা বন্দর থেকেই হয়। বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল ও মধ্যপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল থেকে অদক্ষ শ্রমিকেরা বৃহত্তর কলিকাতার কল কারখানায় ভিড় করে থাকে। পড়াশুনা ও কাজের সন্ধানে পরিবারের অচ্ছান্ত লোক ও আত্মীয় স্বজনও ভিন্ন রাজ্য থেকে এখানে এসে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকেও এই একই ধরনের কলিকাতামুখী অভিবাসন দেখা দেয়। পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি চারটি রাজ্যের মধ্যে জনপ্রতি আয়ের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গই সবচেয়ে সমৃদ্ধ। ১৯৬১-৬২ সনে পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রতি বার্ষিক আয় যেখানে ৩২৭ টাকা, সেখানে আসামের জনপ্রতি আয় ৩১৯ টাকা, উড়িষ্যার ২৫৯ এবং বিহারে ১৯৪ টাকা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন জনপ্রতি আয়ের দিক

থেকে বিহার ও উড়িষ্যার স্থান সবচেয়ে নীচে। পশ্চিমবঙ্গের এই সমৃদ্ধিও বৃহত্তর কলকাতা ও বর্ধমান জেলাতেই সীমাবদ্ধ। এ জন্ত প্রতিবেশী গরিব রাজ্য দুটির অধিবাসীদের কৃজির সম্মানে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প এলাকাতেই এসে জমা হতে হয়।

কলকাতার জনসংখ্যাবৃদ্ধি কিন্তু এক দিনে হয় নি। ১৯২১ সালে এই শহরের লোকসংখ্যা ছিল দশ লক্ষ পাঁচ হাজার। ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় বারো লক্ষ কুড়ি হাজার অর্থাৎ দশ বৎসরে শহরের জনসংখ্যা শতকরা ১৬.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী দশ বৎসরে জনসংখ্যা শতকরা ৭৭.৯ ভাগ বেড়ে একুশ লক্ষ সত্তর হাজারে দাঁড়ায়। দশ বৎসরে এই ধরনের জনসংখ্যাবৃদ্ধি সাম্প্রতিককালে মায়েশিরার রাজধানী কুয়ালালামপুরেও দেখা যায়। ১৯৫১ সালে কলকাতার জনসংখ্যা ২৭ লক্ষ এবং ১৯৬১ সালে উনত্রিশ লক্ষ তিরিশ হাজার হয়। অর্থাৎ চল্লিশের দশকে জনসংখ্যা শতকরা ২৪.৪ ভাগ বাড়লেও গত দশকে মাত্র শতকরা ৮.৫ ভাগ বাড়ে। গত দশকে কলকাতার লোকসংখ্যা বেশী না বাড়লেও বৃহত্তর কলকাতার উত্তর দমদম পৌর-এলাকায় শতকরা ২১.৩ ভাগ, দক্ষিণ দমদমে শতকরা ৮.১ ভাগ, কামাব-হাটিতে শতকরা ৬.২ ভাগ, পানিহাটিতে শতকরা ৮.৯ ভাগ, বারাসতে শতকরা ৮.২ ভাগ, দক্ষিণ জ্বরবন অর্থাৎ বেহালায় শতকরা ৭.৮ ভাগ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হবে না যে, কলকাতা পৌর-এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভেদন সুযোগ নেই বলেই বৃহত্তর কলকাতার অন্তর্ভুক্ত যেখানে কিছুটা ফাঁকা জমি মিলেছে, সেখানেই নতুন জনবসতি গড়ে উঠেছে। গত দশকে শহরের লোকসংখ্যা বাড়ে অভ্যন্তরীণ জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও সাতলক্ষ চুরাশি হাজার বহিরাগতের জন্ত। এই বহিরাগতদের মধ্যে শতকরা ২৯ ভাগ হচ্ছে পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তু, শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী আসে ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত যে চল্লিশ লক্ষ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পেয়েছে, তার মধ্যে প্রায় দশলক্ষ বৃহত্তর কলকাতাতেই বসবাস করছে।

কলকাতার বাসস্থান সমস্যা পর্যালোচনার জন্ত ভারতের পূর্বাঞ্চলের শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও আলোচনা করা দরকার। ১৯৬১ সনে ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা উনিশ ভাগ শহরে বাস করলেও ঐ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকরা চব্বিশ ভাগ শহরবাসী ছিল। ১৯৬১ সনের সেন-নাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ ও প্রতিবেশী আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার মোট এগারো কোটি দশ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র এক কোটি চুরাশ্লিশ লক্ষ লোক অর্থাৎ মোট অধিবাসীর শতকরা ১৩.১ ভাগ শহরে বাস করত। আর এই শহরে অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৪২ জন বৃহত্তর কলকাতাতেই বাস করত। বৃহত্তর কলকাতা বাদ দিলে রাজ্যের অন্যান্য শহরে অধিবাসীর হার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯.২ ভাগ। ভারতের শহরে জনসংখ্যার শতকরা হার অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় খুবই কম। কিন্তু সামগ্রিক হিসাবে শহরে জনসংখ্যার পরিমাণ কম হলে কী হবে? শহরে জনসংখ্যা প্রধানতঃ বড় বড় শহর ও তাদের শহরতলিতেই বেশী ভিড় করছে। এটা অবশ্য একমাত্র ভারতের বৈশিষ্ট্য নয়, উন্নতিশীল দেশগুলিও সর্বত্রই এই ধরনের ব্যাপার ঘটছে। ব্যাঙ্কক, কুয়ালালামপুর, কলম্বো, পেনমপেন, সাইগন, জাকার্তা—সর্বত্রই শহরে অধিবাসীর বেশীর ভাগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। উন্নতিশীল দেশগুলির এই বৈশিষ্ট্যকে সমাজ-বিজ্ঞানী বার্ট হোললিটস ‘ওভার-আরবানাইজেশন’ অর্থাৎ অতিরিক্ত শহরীকরণ আখ্যা দিয়েছেন।

সি-এম-পি-ও কর্তৃক সংকলিত একটি রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৩১ ও ১৯৬১ সনের মধ্যে কলকাতা পৌর এলাকার জনসংখ্যা শতকরা ১৪০ ভাগ এবং বৃহত্তর কলকাতার শতকরা ১৬৫ ভাগ বেড়েছে। অথচ ঐ একই সময়ে বৃহত্তর

বোম্বাইয়ের জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২১৮ ভাগ, মাদ্রাজের ১৬৭ ভাগ, বাঙ্গালোরের শতকরা ২৮৮ ভাগ, আমেদাবাদের শতকরা ২৮৪ ভাগ এবং দিল্লির শতকরা ৪২৪ ভাগ। গত ছয় বছরেও কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আগের হারের চেয়ে বেড়েছে মনে করার কোন কারণ নেই। কাজেই গত ছত্রিশ বছরে কলকাতা পৌর এলাকা ও বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ ভারতের অন্যান্য বড় শহরের চেয়ে সবচেয়ে কম। কাজেই কলকাতার অতিরিক্ত জনসংখ্যার জঘন্য বাসস্থান সমস্যা ক্রমেই জটিল হচ্ছে এবং পৌর ব্যবস্থার অবনতি ঘটছে, এই ধরণের কথা অস্বহ্যাত মাত্র।

ভারতের অন্যান্য বড় শহরের সঙ্গে কলকাতার অবস্থা কিছুটা পার্থক্য আছে। মাদ্রাজের জনসংখ্যার প্রায় পুরোটাই তামিলভাষী, আচার ব্যবহারও মোটামুটি এক। বোম্বাই মহানগরের মধ্যে হলেও গুজরাটি ও পার্শ্বদেশের প্রভাব কোন কোন ক্ষেত্রে মহাদ্বীপীয়দের চেয়েও বেশী। শহরের সমৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, বাসগৃহের সংখ্যাবৃদ্ধি, শহরের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অ-মহাদ্বীপীয়দের অবদান অনেক বেশী। দিল্লিতে বহিরাগতদের মধ্যে একক হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। দিল্লি রাজধানী হওয়ার সারা ভারতের অধিবাসীরা দিল্লিতে এসে ভিড় করেছে এবং এই শিক্ষিত শ্রেণী স্থায়ীভাবেই দিল্লিতে বাস করেছে। নতুন দিল্লির পরিচ্ছন্ন এলাকায় বহিরাগতদের পক্ষে কলকাতার মত রাস্তায় সংসার পাতানো সম্ভব নয়। বৃহত্তর দিল্লির শিল্প-এলাকা ও পুরাতন দিল্লিতেই দিল্লির পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে লোক এসে ভিড় করেছে। কলকাতা শহরের মোট অধিবাসীর শতকরা ৫৫ জনই প্রামাণ্য ও ভিন্ন রাজ্যের। এদের বেশীরভাগই আবার অদক্ষ শ্রমিক। শহরের জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এককভাবে বা দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে।

এই সব বহিরাগতেরা নাগরিক জীবনে আদৌ অভ্যস্ত নয়। শহরের রাস্তাঘাট ও বাড়ি পরিকার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে এদের কোন ধারণাই নেই। ফলে ওরা কখনও দল বেঁধে একই ঘরে বাস করে কখনও বা ফুটপাথে শুয়ে রাত কাটায় এবং মাসের শেষে দেশে টাকা পাঠায়। শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে উন্নতমানের জীবন যাপন করা এদের ধারণার বাইরে।

কলকাতা শহরের বাসগৃহ সমস্যার সমাধান করতে হলে তাই একসঙ্গে অনেকগুলি প্রচেষ্টায় হাত দেওয়া দরকার। একদিকে পৌর এলাকা বা বৃহত্তর কলকাতার বাসিন্দাদের জঘন্য বাসগৃহের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অপর দিকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যে নূতন নূতন শিল্প-এলাকা গড়ে তুলে এই এলাকায় বহিরাগতদের শ্রোত বন্ধ করতে হবে। দুর্গাপুর, আসানসোল, বিহারে ডি ভি সি, এলাকা, রাঁচী, উড়িষ্যার রাউরকেলা ইতিমধ্যেই কলকাতার বিকল্প কেন্দ্র অর্থাৎ কাউন্টার ম্যাগনেট হিসাবে গড়ে উঠেছে। হলদিয়াকেও এই ধরনের একটি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে ও বিহারে এই ধরণের আরও অনেক কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার। কলকাতার বাসগৃহ, আবর্জনা অপসারণ, পানীয় জলের সরবরাহ প্রভৃতি পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্ত ব্যাপক হারে বহিরাগতদের আগমন বন্ধ করতেই হবে। কলকাতার স্বার্থেই যে পাশের রাজ্যগুলিতে শিল্পোন্নয়নের হার দ্রুত করা দরকার পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্রগুলি প্রাদেশিকতার গোঁড়ামীতে তা ভুলে যান।

সি-এম-পি-ও'র হিসাবে ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে বৃহত্তর কলকাতায় সাড়ে নয় লক্ষ থেকে প্রায় সাড়ে এগাবো লক্ষ নূতন বাড়ি তৈরি করা দরকার। বর্তমান অভাব মিটানো, জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও নূতন পরিবারের চাহিদা পূরণ এবং পুরাতন বাড়িগুলির বদলে নূতন বাড়ি তৈরিও এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে। এই হিসাবের মধ্যে কলকাতা

পৌর-এলাকার হিসাব ধরা হয় নি। কারণ শহরের বাইরের সোনারপুর, লবণ হ্রদ প্রভৃতি পরিকল্পিত এলাকায় নতুন বাড়ি তৈরি বা তৈরির সুযোগ পেলে অনেকেই পৌর এলাকা থেকে ঐ সব এলাকায় যেতে পারেন। কলকাতায় নতুন বাড়ি তৈরির ব্যাপারে যে-সব অসুবিধার কথা বলা হয়, তা হচ্ছে, শহরের মধ্যে নতুন বাড়ি করার মত ফাঁকা জায়গার অভাব, বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের অসুবিধার জটিল বস্তি-অপসারণ অসম্ভব, কলকাতা বস্তি-এলাকার বিশেষ ভূমি আইন, টাকার অভাব এবং কলকাতায় আর নতুন কিছু করা সম্ভব নয়।

কলকাতায় ফাঁকা জায়গার কেবল অভাবই নয়, কোন কোন ওয়ার্ডে একটিও পার্ক নেই। কাশীপুরের নাম এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে। ফাঁকা জায়গা না থাকায় শহরের মধ্যে সবুজ গাছপালাও তেমন নেই। শহরের অভ্যন্তরে গাছপালা থাকলে তা যেমন একদিকে গংমের দিনে বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা রাখে এবং বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে, তেমনই অপর দিকে শহরের মধ্যে কল-কারখানার ধোঁয়া পরিশোধন করে শহরের আবহাওয়া ধোঁয়ামুক্ত রাখতে সাহায্য করে। সিঙ্গাপুর ও কুয়ালালামপুরে বস্তি ছিল, জবর দখল এলাকায় বে-আইনী বাড়ি ছিল। সেই সব বে-আইনী বাড়ি ও বস্তি অপসারণ করে সেখানে এখন নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে নতুন উপনগরী তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে কুয়ালালামপুরের চেয়ে সিঙ্গাপুরের কৃতিত্ব অনেক বেশী। বস্তি অপসারণ করে সিঙ্গাপুরের এক একটি এলাকায় অনেকগুলি দশতলা উঁচু বাড়ি তৈরি করা হয়েছে, একসঙ্গে এক জায়গায় অনেকগুলি বাড়ি হওয়ায়, স্কুল, বাজার, খেলার মাঠ, থিয়েটার হল, নতুন নতুন রাস্তা তৈরির পরেও অনেক ফাঁকা জায়গা বেঁচেছে। সেই সব এলাকায় বৃক্ষ রোপনের পরেও ভবিষ্যতে আর বাড়ি তৈরি ও কল-কারখানা স্থাপনের জায়গা রাখা হয়েছে। বাড়িগুলি এক, দুই ও তিন

কামরা বিশিষ্ট। পারিবারিক প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে ভাড়াটেরা এক একটি ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। লটারি করেই এই ফ্ল্যাট দেওয়া হয়। ভাড়াও খুব শস্তা—এক কামরা ফ্ল্যাট মাসে কুড়ি ডলার, দুই কামরা ৪০ ডলার তিন কামরা মাসে ষাট ডলার। সিঙ্গাপুরের ন্যূনতম মজুরি ১৫০ ডলার হওয়ায়, প্রতিটি পরিবারের আয় কমপক্ষে তিনশো ডলার। সিঙ্গাপুরে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসও খুব শস্তা কাজেই তাদের পক্ষে মাসে কুড়ি বা চল্লিশ ডলার দেওয়া আদৌ অসুবিধাজনক নয়। কলকাতায় স্বীকৃত-বস্তিই ১৬০০ একর জমি জুড়ে আছে, ছোট বস্তি এক তলা বা দোতলা বাড়ি তো কলকাতার সর্বত্রই। কলকাতায় বস্তি ও জবরদখল করা কলোনীগুলি অপসারণ করে বহলতলা বিশিষ্ট বাড়ি তৈরী করা যেতে পারে। কিন্তু কলকাতায় বস্তি অপসারণের সমস্ত বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন দিতে হয় বলেই নাকি ঐ সব এলাকায় নতুন বাড়ি তৈরি করা যাচ্ছেনা। সি-এম-পি-ও'র এক আমেরিকান বিশেষজ্ঞ তো ফতোয়া দিয়েই দিয়েছেন যে, বস্তিবাসীদের উন্নতমানের বাসগৃহের ব্যবস্থা করতে হলে বস্তি অপসারণের দরকার নেই (No slum clearance should be undertaken when the only purpose is to replace slum housing with standard housing. P. 62. A Proposal for a Low-Cost Temporary Urban Settlements Programme—CMPO, Government of West Bengal) কলকাতায় বস্তিবাসীদের জটিল যে বিবর্তন সংস্থান করা হয়, আগের ভাড়ার তুলনায় তা অনেক বেশী। তা ছাড়া পুরাতন এলাকার নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে বিবর্তন বাসগৃহের ব্যবস্থা করতে হবে। কলকাতায় অনেক পাড়া আছে, যেখানকার পুরো এলাকাটিই বস্তি, অবশিষ্ট দুই-একটি বাড়ির অবস্থাও অনেকটা বস্তিরই মতো। এই সব এলাকায় সিঙ্গাপুরের ধরণে বাড়িও তৈরি করা দরকার। বহলতলা

বিশিষ্ট বাড়ি তৈরি হলে সেখানে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের জন্মও বাড়ি তৈরির জায়গা পাওয়া যাবে। যে শহরে জমির দাম পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী, সেই শহরে জমির এই ধরনের অপব্যবহার সত্যিই পীড়াদায়ক। দিল্লীপুরের কুইনস টাউন উপনগরীতে প্রায় একলক্ষ প্রাক্তন বস্তিবাসী ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক বাস করে। দক্ষিণ কলকাতার উদ্যন্ত কলোনির বদলে সেখানেও কলকাতার কুইনস টাউন তৈরী হতে পারে। সক্ষীর্ণ পরিগর রাখায় তিন কাঠা-পাঁচ কাঠা জমিতে বাড়ি তৈরি করলে তা বস্তিই থেকে যাবে, ওখানে বাসগৃহ সম্প্রসারণেরও কোন অযোগ্য নেই। পানীয় জল, আবর্জনা অপসারণ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা চাণু করাও কঠিন। নাগরিক জীবনে জমির মালিকানার বদলে ক্র্যাটের মালিকানা পাওয়ার অভ্যাস তৈরি করা দরকার এবং তা সম্ভব হলেও বিকল্প বাসগৃহ সম্পর্কে সরকারী প্রতিশ্রুতিকে জনসাধারণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য মনে হলে এই ধরনের পরিকল্পনা চাণু করা খুব বেশী কঠিন হবে না। কলকাতা শহরে জমির কেমন অপচয় হয়, চোরঙ্গীর উপরেই ভাঙা বাড়ি বা কয়েকটি দোতলা, তিন তলা বাড়িই তার প্রমাণ। দামী জমির উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে বাধ্য করার কোন ব্যবস্থাও এই শহরে আজও হয় নি। পুরনো কলকাতা শহরের কথা না হয় বাদ দেওয়াই গেল। লবণ হ্রদ এলাকায় নূতন উপনগরী গড়ে তোলা হচ্ছে, কিছু জমিও বিলি হয়েছে। কিন্তু সেখানেও পাঁচ দশ কাঠার হিসাবে। বহুতলা বিশিষ্ট বাড়ি করতে টাকা দরকার ঠিকই, কিন্তু বাসগৃহ নির্মাণের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়। সে টাকারও ষাণ্মধ্য ব্যবহারের দিকে নজর দেওয়া দরকার।

অনিষ্ট ক্রান্তে

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩.৫০ টাকা

“...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিষ্কার করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।”
... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১.২৫

“...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবগমন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া ‘নাস্ত পন্থা’ বিচ্ছতে অয়নায়।” (ভূমিকা)

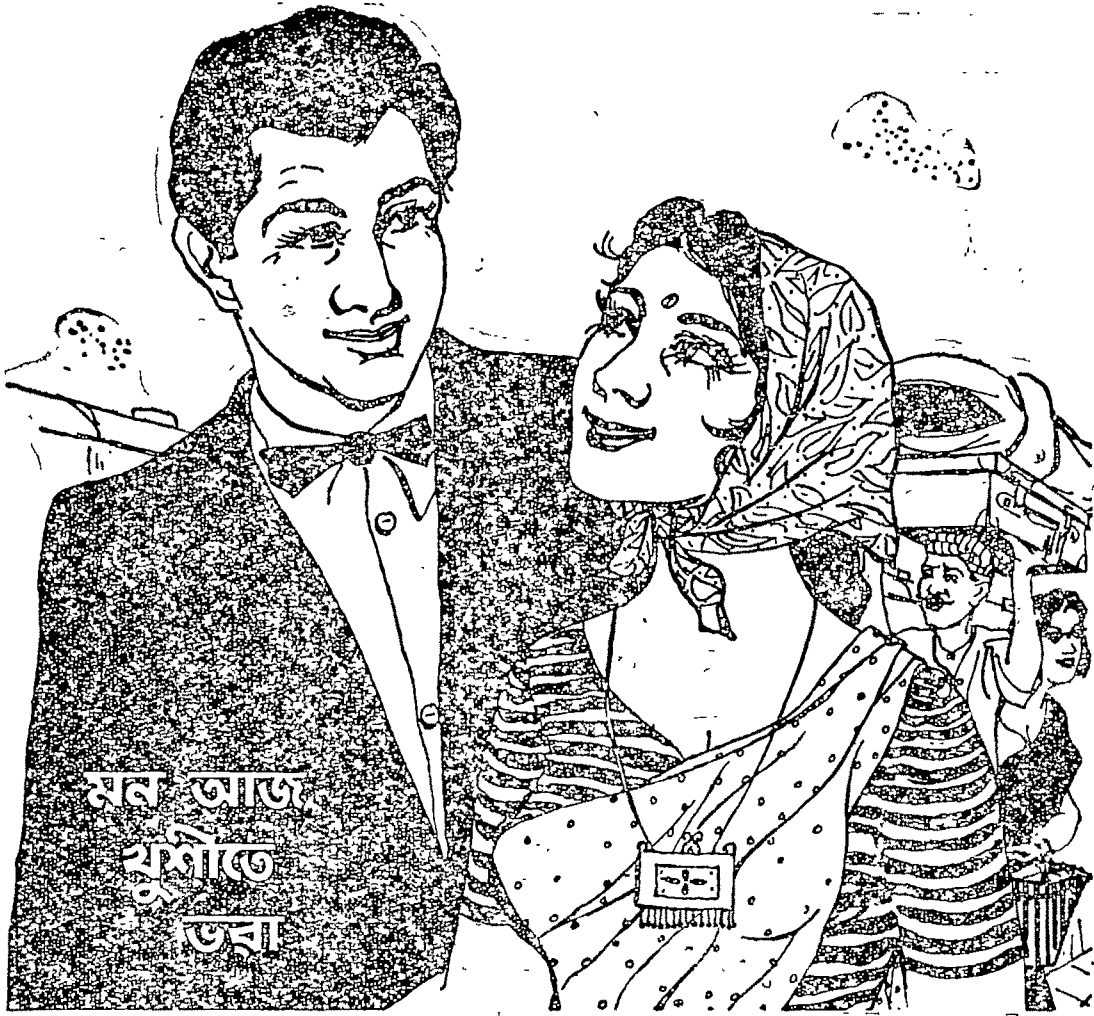
নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে
এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়ন্তী—৩১২, গান্ধী বাগান, কলি-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-২



মন আড
খুসীতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্ত
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্ত।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্ত সাধনার
অব্যর্থ মহোদধ প্রতিদিন আহারের পর
দুইবার করে হুঁচামচ অ্যান্টাসিড (৬ বৎসরের
চার চামচ মহাজাফারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) পাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আবুর্দেবশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন),
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রে বৃত্তপূর্ণ
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি, বি-এস, আবুর্দেবশাস্ত্রী।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

: উপভাস :

কঠি ভরা লিখ

মি হির মুখো পাধ্যায়

সাতাশ

সতেরো মাস পরের কথা। বর্ধমান শহবে প্রবল উদ্বেগ। নবাব আলিবর্দি খান এসে ছাউনি ফেলেছেন রাণী দীঘির পারে। গত বছর উড়িষ্যা অভিযান করে ফুপবাড়ির যুদ্ধে রক্তমল্লকে হারিয়ে কটক অধিকার করেছিলেন আলিবর্দি খান। পাঁচমাস পরে রক্তমল্লদের জামাই বাকর আলি আবার কটক দখল করে নিলেন। মাস চারেক পর আবার বাকর আলিকে তাড়িয়ে কটক উদ্ধার করলেন আলিবর্দি খান। প্রায় আটমাস কটকে থেকে ময়ূরভঞ্জের বিদ্রোহী রাজাকে শাস্তা করে, উড়িষ্যার শাসন শৃঙ্খলার একটা সুরাহা করে ধীরে হুসে মুর্শিদাবাদের দিকে ফিরে আসছিলেন নবাব। কিন্তু কপালে শাস্তি নেই, বিশ্রাম নেই, আসতে আসতে পথে খবর পেলেন, নাগপুরের ভোঁসলা বংশের মারাঠা সর্দার রঘুজী ভোঁসলা তাঁর ব্রাহ্মণ সেনাপতি ভাস্কররাম কোলহটকরকে হুবে-বাংলা থেকে জোর করে চৌথ আদায় করতে পাঠিয়েছেন। মারাঠা রাজ্যে তখন পাঁচ প্রধান বংশের খুব নাম-ডাক, প্রভাব-প্রতিপত্তি। গোয়ালিয়ারের শিঙ্গিয়া, ইন্দোরের হোলকার, বরোদার গায়কোয়াড়, ধারের পবার বংশ আর এই নাগপুরের ভোঁসলা বংশ। সবার উপর রাষ্ট্র প্রধানরূপে পুণা শহরে আছেন পেশবা বালাজী বাজিরাও। কিন্তু কাজে কর্মে এই পঞ্চপ্রধান প্রায় স্বাধীন। স্বাধীনভাবে আবাড়ি

শাসনকার্য চালায়, যুদ্ধ-বিগ্রহ লুটপাট করে বেড়ান, বিভিন্ন হুবা থেকে জোর করে চৌথ কিছা সরদেশমুখী আদায় করেন। নামমাত্র আহুগত্য শুধু পেশবার কাছে। হায়দ্রাবাদের নিজাম কিছা অযোধ্যার নবাব থেকে শুরু করে দিল্লীর বাদশা পর্যন্ত মারাঠা প্রধানদের ভয়ে তরুণ।

উড়িষ্যা থেকে ফিরে আসছিলেন নবাব আলিবর্দি খান। আসার পথে আচালনুসরাইতে শিবির স্থাপন করেছিলেন। বর্ধমান থেকে তিন ক্রোশ দূরে এই আচালনুসরাই। সেখানে বসেই খবর পেলেন, ভাস্কর পণ্ডিত পঞ্চকোটের গিরিসঙ্কট দিয়ে বাংলা দেশে ঢুকছে। পঞ্চকোট থেকে মুর্শিদাবাদ পূর্বদিকে আটদিনের পথ। বরগীরা খুব দ্রুতগামী। ছোট ছোট টাটুঘোড়ায় চেপে রাতারাতি পঁচিশ তিরিশ ক্রোশ রাস্তা পার হয়ে যার।

তাদের সঙ্গে বড় বড় তাঁবু থাকেনা, ভারী ভারী কামান থাকে না, হাতি থাকে না, পালকি থাকে না, মেয়েমানুষ থাকে না। আটদিনের পথ চারপাঁচদিনে চলে আসা বরগীদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

ওদিকে নবাবের সঙ্গে লোক-লস্কর অনেক। লড়াই করার মত সেপাই বা আছে তার প্রায় আড়াই গুণ আছে ফালতু লোক। খানসানা, বাবুচি, আবদার, চোপদার, হকাবরদার থেকে শুরু করে সারেসিওয়াল, ভিজিওয়াল, তবলুচি, মশালচি। বেগম, বাঁদী, বাইলী। বড় বড় তাঁবু,

ভারী ভারী সিঁদুক, ভারী ভারী কামান। হাতি, বোড়া, উট, খচ্চর পালকি, তাজান। সে এক এলাহি ব্যাপার। নবাব দেখলেন, এত লোক-লস্কর নিয়ে গদাইলস্করী চালে চললে আর মুরশিদাবাদ পৌঁছতে হবে না। যেতে যেতেই সব ফৌজ হয়ে যাবে।

হাজার চারেক অশ্বারোহি, হাজার পাঁচেক বন্দুকধারী বরকন্দাজ আর কয়েকটা কামান নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হলেন নবাব। রসদপত্র, বেশিরভাগ লোকজন পেছনে রইল। তাও আচালনুলরাই থেকে বর্ধমান আসতে তিন ক্রোশ রাস্তা পার হতে একদিন, একরাত কেটে গেল। বতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি কুচ করে বর্ধমান এসে রাণীদীঘির পারে তাঁবু ফেললেন নবাব। বৈশাখের প্রথম। মেঘলা আকাশ। টিপটিপ বৃষ্টি। মাঝে মাঝে ঝোড়ো হওয়া।

পরেরদিন সকালে উঠেই নবাবের চক্ষুস্থির। রাজির অন্ধকারে নিঃশব্দে এসে ঘিরে ফেলেছে বরগীরা। প্রায় পঁচিশ হাজার। বেশি ছাড়া কম নয়। নবাব সৈন্তের প্রায় তিনগুণ। তিনদিকে ঘিরে ধরেছে। শুধু নদীর দিক খোলা। এতগুলি বোড়া আর কামান নিয়ে নদী পার হওয়া অসম্ভব। এই অসময়ে অত নৌকোর ব্যবস্থা করা যাবে না।

শুধু কামানের ভয়ে আক্রমণ করেছে না মারাঠা বরগীরা। নবাবের কামান আছে, ভাল আফগান গোলান্দাজ আছে। মারাঠাদের কামান নেই, কিছু বন্দুক আছে বটে, কিন্তু বেশির ভাগই দীর্ঘ বজ্রম আর তরোয়াল। তাই কামানের পাজার বাইরে দাঁড়িয়ে খুব হস্তি-তস্তি বরছে মারাঠারা। হর হর মহাদেও — বলে ঘনঘন জিগির দিচ্ছে, বন্দুক ছুঁছে, কিন্তু কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না। নবাবের গোলান্দাজরাও মাঝে মাঝে কামান ছুঁড়ে জবাব দিচ্ছে।

নবাবের ছাউনির একদিকে রাণীদীঘি আর একদিকে মস্ত এক জল-কাণা ভরা ধানক্ষেত। বৃষ্টিতে কাদা জমেছে,

কোথাও কোথাও একহাটু জল, বড় বড় ঝাল। ধানক্ষেতের ওপাশেই উচুজমিতে ষাঁটি করেছে মারাঠারা।

কামানের গোলা সেই জলকাদার মধ্যে গড়ে ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে জলকাদা ছিটছে, কিন্তু মারাঠাদের তেমন ক্ষতি হচ্ছে না। ভারী ভারী কামানের গাড়ি সেই জলজমির উপর দিয়ে আরো কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যাবে না।

বিপদে পড়েছেন নবাব আলিবর্দি খান। ঘোরতর বিপদ। গোলাবারুদ সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু রসদ বেশি নেই। এতগুলি লোকের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এতগুলি বোড়া আর খচ্চরের দানাপানি দিতে হবে। পানি না হয় জুটলো, রাণীদীঘির জল আছে প্রচুর। কিন্তু দানা আসবে কোথেকে। বর্ধমান শহরে হলুদুলু। সর্বত্র আতঙ্ক, বিশৃঙ্খলা। দোকান পাঠ বন্ধ। হাট বাজার বসছে না। রাস্তাঘাটেও তেমন লোকজন নেই। কোন লোক হাটা পথে শহরের বাইরে যেতে পারছে না, ভেতরে আসতে পারছে না। এক নদীর পথ খোলা। কিন্তু নিয়মিত থেয়া বন্ধ। কদাচিৎ দু'একখানা নৌকা দেখা যায়। আশপাশের ঘেগব গ্রামগুলি থেকে শহরের বাজারে তর্রি-তরকারি আসতে চাল ভাল আসতে, সে-সব গ্রাম জালিয়ে দিচ্ছে মারাঠারা। রাজির অন্ধকারে মেঘলা আকাশের গায়ে সেই আগুনের আভা।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সেই আগুন দেখছিল ভারতচন্দ্র। সেদিন পালুকিতে করে তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল কালাচাঁদ। তখন রাত প্রায় দুই প্রহরের কাছাকাছি। মস্ত একটা বন্ধ দেউড়ির সামনে এসে পালকি থেমেছিল। দোস্তলা সমান উচু দেয়ালের গায়ে দেড়তলা সমান নিরেট কাঠের কপাট। জোড়ের মুখে লোহার পাত আর আগা-গোড়া লোহার গুল বসানো। দেখলেই গা হুম্‌হুম করে। দেউড়ির দু'পাশে স্তম্ভের গায়ে দুটো মশাল জলছিল। পালুকির সঙ্গে দু'জন মশালটি ছিল। চারটে মশালের আলোয় দেউড়িটা দেখে খুব অবাক হয়েছিল ভারত।

এতো দেওয়ানজীর বাড়ি নয়, রাজবাড়িও নয়। বড় কাঠের কপাটের গায়ে ছোট একটা দরজা খুলে গেল।

মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। প্রায় ছ'ফুটের মত লম্বা। শ্রোত বয়স বলিষ্ঠ বিশাল চেহারা। কাঁচাপাকা গৌফ, গালপাট্টা। শুড় তোলা নাগরা, কুন্তল, বীরবৌলি, মুয়েঠা, মেরজাই।

বর্ধমান রাজ-কারাগারের অধ্যক্ষ রাজপুত দেবীসিঙ্ বুলন্দলা। যুহু হেসে হাততুলে নমস্কার দিয়ে বল্লো—আম্নন রায়মোশা, আপনি ত্রাম্ভন, নোমস্কার নিবেন—

মোলায়েম কথা শুনেও আশ্চর্য হয়নি ভারত। কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—এ কোথায় নিয়ে এলে, এখানে কেন—আমি কি করবো বলুন, আমি তো হুকুমের চাকর, যা হুকুম হয়েছে, তাই তামিল করছি—হাসি হাসি মুখে কালাচাঁদ যেন একটা শুভ সংবাদ দেবার মত নিজের অগ্হাষ কথ্য নিবেদন করছিল।

দেবী সিং বলেছিল—উ কি জানবে বলুন, এই দেখুন আপনার গিরগপত্রি পরোয়ানা—

একখানা ভুলোটে কাগজ ধরেছিল দেবীসিঙ্। মহারাজ কীর্তিচাঁদের মোহর আঁকা ফারসীতে লেখা গ্রেশ্বারী পরোয়ানা। প্রথমে নাম-ধর্মের বিবরণ। নাম—ভারতচন্দ্র রায়। পিতার নাম—নরেন্দ্রনাথ্রায়ণ রায়। সাকিম—পাণ্ডুয়া-বল্লপুত্র, পরগণা—ভুরিশ্রেষ্ঠ। হাল-সাকিম—বর্ধমান। বয়স—ত্রিশ, জাতি—হিন্দু, ধর্ম—ব্রাহ্মণ। পেশা—অমুক পরগণার অমুক ইজারাদারের আম-মোস্তার। চুক্তিভ্রমের অপরাধে তার জামানত লম্ব করা হয়েছে, আম-মোস্তার নামা নাকচ হয়েছে। মহারাজার দরবার থেকে নতুন কোন হুকুমনামা না আসা পর্যন্ত তাকে কয়েদ থাকতে হবে। কিল্লাদার দেবীসিঙ্ বুলন্দলা বরাবরেই এই পরোয়ানা এলেছে। চার-চারটে মশালের হলুদ ধোঁয়াটে আলোয় লেখাগুলি কেমন যেন ঝাপসা মনে হচ্ছিল।

স্বপ্ন পরোয়ানাটা তিন চার বার পড়েছিল ভারত। এরকম বিপদ আসতে পারে যদিও আশঙ্কা করেছিল অনেকদিন আগেই, কিন্তু এত ভাড়াভাড়ি, এমন আকস্মিকভাবে আসবে, অসম্মান করতে পারেনি। বিভাধর ফিরে আসা পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

অস্বস্থ রঘু ওভাবে পড়ে রইল। দেবীসিং বলেছিল—আম্নন রায়মোশা, হামরা সাধ চলুন, কি আর কোরবেন, সব নসীবকা খেল। জয় শিবশঙ্ক—এই স্বন্দর চেহারার যুবকটিকে দেখে পৌট দেবীসিঙের মনে কেমন যেন একটা স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল।

বড় বিচিত্র এই বন্দীশালা। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা এই বন্দী-জীবনের। এখানে আসার মাসখানেকের মধ্যে একদিন হুপুরে নিজের কুঠুরিতে শুয়েছিল ভারত। পাশের কুঠুরির কয়েদী শশিকান্ত সমাদ্দার এসে খবর দিয়েছিল—শুনেছেন রায়মশাই, মহারাজ কীর্তিচাঁদ মারা গেছেন, এবার নতুন মহারাজ হবেন তাঁর ছেলে চিত্র সেন রায়, দেওয়ানজীও শুনলায় অবসর নেবেন, নতুন দেওয়ান হবেন গাণিকচাঁদ, এবার হয়তো আমরা খালাস পেয়ে যাব, কি বলেন—কিন্তু খালাস পাওয়া যায়নি। সেই থেকে এই কয়েদখানায় একটানা প্রায় দেড় বছর। আরো যে খবরটা শশিকান্ত সমাদ্দার বলতে পারেনি, ভারতও কোনদিন জানতে পারেনি, তা'হল কালাচাঁদ তার পাইকের দল নিয়ে নতুন দেওয়ানজীর দেওয়ান বহাল হয়েছে এবং রঘুনাথের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে।

মহারাজা কীর্তিচাঁদের মৃত্যুর মাস তিনেক পর বিভাধর এসেছিলো দেখা করতে। সহজে কেউ দেখা করার অসম্মতি পায়না। অনেক তদ্বির-তদারক করে নতুন মহারাজা চিত্রসেনের কাছ থেকে অসম্মতি আদায় করেছিল বিভাধর। ওই দেউড়ির পাশে একটা ছোট কুঠুরিতে দাঁড়িয়ে কথা বলেছিল ভারত। ভেতরে ছিল ভারত, বাইরে জানালার

ওপাশে দাঁড়িয়েছিল বিজ্ঞান। প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র, খুঁটি-চাদর, গামছা নিয়ে এসেছিল বিজ্ঞান। আর কিছু খবর এনেছিল। রঘুর জন্ম মনে মনে খুব আশ্চর্য ছিল ভারত। প্রথমেই জিজ্ঞেস করছিল—তুমি কবে ফিরেছো বিজ্ঞান, ভাল আছে তো রঘু কেমন আছে—

—আমি ফিরেছি একমাস হয়ে গেল, এসেই তোমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছি, কি করব অসুস্থ পাইনি, হ্যাঁ রঘু ভাল আছে, আশ্চর্য আশ্চর্য ভাল হচ্ছে, আমার কাছেই সাবধানে রেখে দিয়েছি, ভাবনার কিছু নেই—

রঘুর খবর পেয়ে অনেকট নিশ্চিত হয়েছিল ভারত। কিন্তু চিন্তিত থেকেই বা সে কি করতে পেরেছে।

তবু যা হোক বিজ্ঞান এসে পড়ায় ভাবনা মুক্ত হতে পেরেছে। যথেষ্ট করেছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান যুক্তি নিয়েও রঘুকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। প্রকৃত বান্ধবের কাজ করেছে বিজ্ঞান। উৎসবে ব্যসনে চৈব। উৎসবেও বিজ্ঞান সঙ্গে ছিল। মনে আছে, তাজপুর থেকে সারঙ্গা গ্রামে তার বিয়েতে বরষাত্রী গিয়েছিল বিষ্ণুপদ, বিজ্ঞান, নিত্যগোপাল আর ছোট মামা। বিবাহ জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসব। তারপর রূপমঞ্জরীর বাড়িতে গানবাজনার আসরে, সেওতো উৎসবই বটে। আর এই রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনেও সঙ্গে আছে বিজ্ঞান। সাধ্যমত সাহায্য করেছে। বরগীর হাজিরা শুরু হয়েছে। সমস্ত দেশব্যাপী অরাজকতা বিশৃঙ্খলা। সর্বত্র কি হয় কি হয়, আতঙ্ক। এ অবস্থাকে রাষ্ট্রবিপ্লব ছাড়া আর কি বলা যায়। তারপর রাজদ্বারেও সঙ্গে রয়েছে বিজ্ঞান। বর্তমান রাজসভা থেকে কয়েদখানা পর্যন্ত এসেছে সে। আশ্বিন দিয়ে বলেছিল—জুজিচ্চা করোনা ভারত, কপালে যা জুজিচ্চা ছিল, তাই হয়েছে, কি আর করবে, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করছি তোমাকে অন্ততঃ জামিনেও খালাস করা যায় কি না দেখছি—কয়েদখানার সেপাইদের জমাদার ফুলদ খাঁ তাড়া দিয়েছিল ওসব কথা বলা চলবে না, এখন চলুন, আপনি তো বললেন

শুধু জিনিসপত্র পৌঁছে দিয়ে যাবেন, এখন এত কথা কিসের—আহা কিছু নয় খাঁ-সাহেব, এই নিন, আর রাখুন না, পান-তামাক খাবেন—বেনিয়ানের জেব থেকে একটা সিঁকা টাকা বার করে ফুলদ খাঁর হাতে স্তম্ভ দিয়েছিল বিজ্ঞান, তারপর আবার ভারতকে লক্ষ্য করে একটু যেন লম্বিতভাবে বলেছিল—একটা স্বপ্নবাদ আছে তাই ভারত, মূর্খদাবাদ খাবার আগে জেনে গিয়েছিলুম আমার জী অন্তঃসত্ত্বা আজ মাসখানেক হ'ল একটি ছেলে হয়েছে—

—বাঃ বাঃ, বেশ বেশ, তোমার ছেলে দীর্ঘায়ু হোক, বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক, আমি এবান থেকেই আশীর্বাদ করছি, কিন্তু মিটি খাওয়া যে পাওনা হ'ল, বিজ্ঞান—ভারতের কথা শুনে জবাব দিয়েছিল বিজ্ঞান—মিটি কিছু এনেছি, এই রাখো ঘরে তৈরী কিছু সন্দেশ, আর একটা কথা, আমার ইচ্ছে, আমার জীও ইচ্ছে, আমাদের ছেলের নামকরণ তুমি করে দাও, ছমাস বয়সে মুখেভাত হবে, তখন আনুষ্ঠানিক ভাবে নামকরণ হবে, তুমি নামটা আজ বলে দাও, কারণ তোমার সঙ্গে এর মধ্যে আর দেখা করার সুযোগ পাব কিনা—একটু ভেবে বলেছিল ভারত—তোমার ছেলের নাম দিও চন্দ্রধর, চন্দ্রধর কে ছিলেন জানোত, সেই চাঁদদাগর, তোমার ছেলেও তেমনি সপ্তভিষা মণ্ডকর সাজিয়ে দূর দূর দেশে বাণিজ্যে যাবে, শ্রেষ্ঠ সপ্তদাগর হবে—

একটু আপত্তি করেছিল বিজ্ঞান—কিন্তু তাই চাঁদবেগের ভাগ্য বড় মন্দ ছিল—

—কে বলে তার ভাগ্য মন্দ, সেইতো সার্থক পুরুষ পুরুষকার দিয়ে, স্বাস্থ্যশক্তির বলে দৈবশক্তির সঙ্গে লড়াই করেছেন, শেষ পর্যন্ত দেবতা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছেন, করতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁর হাতের পুঞ্জো না পেলে মর্ত্যলোকে যে মনসা দেবীর পুঞ্জোর প্রচলন হয় না, মর্ত্যলোকের মধ্যমণি ছিলেন চন্দ্রধর—

একা একা নিজের ঘরে বসে নানা কথা ভাবছিল ভারতচন্দ্র।

বাইরে ভীত, সম্রাট, বিশৃঙ্খল বর্ধমান শহর। এই নিঃসঙ্গ বকীশালায় এক নিয়মে দীর্ঘদীন দীর্ঘতর রাত কাটে। এই ঘরটা সঁাতসঁতে। আলো-হাওয়া ভেমন আসেনা। সব ঘরই একরকম। লম্বা একতলা দালান। মাঝামাঝি সব কুঠুরী। সাগনে টানা বারান্দা। কোন কোন কুঠুরিতে তিন চারজন করেও কয়েদী থাকে; ভারতের ভাগ্য ভাল একা একটা কুঠুরী পেয়েছে। লোহার গুল বসানো নিচু কাঠের দরজা। দরজার মাথায় চার অঙ্গুল মাপের ছোট ফাঁক আছে। ওই ফাঁক দিয়ে পাহারাদার রাজিবেলা নজর রাখে। ঠিক উলটে দিকে দেওয়ালের গায়ে বুক উঁচু হাত দুয়েক লম্বা-চওড়া মোটা মোটা লোহার গরাদ দেয়া জানালা। জানালার বাইরে প্রায় বিশহাত দূরে পোঁতলা সমান উঁচু দেয়াল - সোজাঅজি তাকালে শুধু দেয়াল, কিন্তু জানালার গরাদে মুখ রেখে উপরে কিছা পাশে তাকালে একফালি আকাশ চোখে পড়ে।

এক একদিন সন্ধ্যার আগে ফুলাদ খাঁ এসে দরজা ভালাবন্ধ করে যাবার পর, অনেক রাত পর্যন্ত জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ওই একফালি আকাশ দেখে ভারতচন্দ্র।

একটা দড়ির খাটিয়ায় দু'খানা কবলের ওপর ময়লা চাদর বালিশের বিছানা। ঘরের কোণে মাটির কলসীতে জল থাকে, পেতলের একটা ঘটি, কাণা উঁচু একটা কাঁসার থালা, পেতলের হাঁড়ি, লোহার খুঁটি—কয়েদখানার সম্পত্তি এগুলি। সাধারণ কয়েদীরা মাটির হাঁড়িতে রান্না করে, শালপাতায় করে খিচুড়ি খায়। ভারতের জন্তু আলাদা ব্যবস্থা। একে ব্রাহ্মণ ভায় দেওয়ানজীর আঙ্গীয় বলে একটু আলাদা খাতির পায়। তবে খাদ্যবস্তুর ব্যাপারে খুব একটা ইত্তর বিশেষ নেই। সকলের জন্তই সমান ব্যৱস্থা। মোটা মোটা লাল লাল চালের ভাত। খেগারী, অড়হর কিছা কলায়ের ডাল। কদাচিত্‌ মুগ-মুহুরী। কয়েকটা শুকনো লম্বা, একটু হুন।

এর উপর একদিন অন্তর এক ছটাক তেল, এক ছড়া তেঁতুল একটু হলুদ পাওয়া যায়। সবজি বলতে কোনদিন একফালি লাউ, দুটো বেগুন কিছা কাঁচকলা। এর সঙ্গে ঘুরেফিরে ছ'তিন রকম শাক। কচুশাক, নটেশাক, মটরশাক, কলমি শাক।

বিশেষ কোন পালা-পার্বণ উপলক্ষে মাসের মধ্যে গড়পড়তা দু'একদিন হয়তো দু'এক টুকরো মাছ।

দুধ কিছা মাংসের কোন ব্যবস্থাই নেই। খিয়ের গন্ধ তো ভুলেই গেছে। মাসের মধ্যে অধিক দিনই চাল-ডাল-সবজী সব এক সঙ্গে দিয়ে খিচুড়ির মতো একটা জিনিস করে নেয়। যেদিন বেগুন আসে, সেদিন একটু অম্লরকম খাওয়া হয়। দেবানন্দপুরে সেই মুনসী-মশাইর বাড়িতে থাকার সময় থেকেই বেগুন পোড়া ভারতের প্রিয় খাদ্য।

পঞ্চাশ-ষাট জন কয়েদি, দশ-বারোজন সেপাই, সেপাইদের জমাদার ফুলাদ খাঁ, সবার উপর দেবীসিঙ বৃন্দলা। এদের নিয়ে কয়েদখানার জগৎ। নিম্নশ্রেণীর কয়েকজন কয়েদী ঝাড়ুদারের কাজ করে, মেথরের কাজ করে, সরবের তেলের ঘানি টানে। এদের সংখ্যা দশ বারোজন। কাজের ভাগ করা আছে। এক একটা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অল্পসব কয়েদীরা এক একরকম কাজ করে। এক একজন সেপাই এক একটা দলের কাজকর্ম তদারক করে। কোন দল বাগানে কাজ করে, মাটি কোপায়, জল দেয়, শাক সবজি ফলায়। কোন দল ঢেকিতে ধান ভানে, চিড়ে কোটে। কোন দল পট আর নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি পাকায়, নারকেল-পাতা কেটে কাঁটা বানায়। কোনদল দশবারোটা ধাতা ঘুরিয়ে ডাল ভাঙে, গম ভাঙে, বড় বড় হামান দিষ্টার ছাতু কোটে।

খুব সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কপাট খুলে দেয় ফুলাদ খাঁ। ব্রাহ্মণ সেপাই বিশ্বনাথ ত্রিবেদী সব কুঠুরীর সাগনে এক একটা ধামায় করে মাথাপিছু বরাদ্দ মত চাল

ডাল মুন মশলা রেখে যায়। সামনের ঢাকা বারান্দায় প্রত্যেক কুঠুরির সামনে আলাদা রান্নার ব্যবস্থা। তোলা উমুন কাঠকুটো জালিয়ে রান্না করা হয়। এক একবার কুঠুরির কয়েদীরা দু'তিন জন বা চারজন একসঙ্গে রান্নার ব্যবস্থা করে। ছোয়াছুয়ির বাছবিচারের জন্ত সকলের এক সঙ্গে ঢালাওভাবে রান্নার ব্যবস্থা নেই। একরকম ভালই হয়েছে। ভারত বরাবর যেমন নিজের রান্না নিজে করে নেয়, এখানেও তেমনই হযোগ পেয়ে আশ্রয় হয়েছে। রান্নার উপকরণ যা-ই হোক যত সামান্যই হোক, পাচজনের সঙ্গে যে ছোয়াছুয়ি হয় না—এতেই খুশি ভারত। সামনের কুয়োতলা থেকে রান্নার জল নিজেই নিয়ে আসে, চাল, ডাল ধুয়ে আনে। সকাল বেলাই কুয়োর জলে স্নান করে নেয়, আঁফিক করে। তারপর শিবের মাথায় জল দেয়। কুয়োতলাব পাশেই একটা বেশ বড় বেলগাছ। সেই গাছের নিচে ছোট্ট একটা কাপো পাখবের শিবলিঙ্গ। দেবীসিঙ রোজ জল দেয়, বেলপাতা দেয় ওর মাথায়। এই শিবলিঙট দেবীসিঙই এনে প্রতিষ্ঠা করে বোধহয় বছরদশেক আগে। দেব-দ্বিজে খুব ভক্তি। রায় মশাইকে রোজ জল দিতে দেখে খুব খুশি দেবীসিঙ। প্রথম দিন বলেছিল—রায়মশা খুব ভক্তিমান আছেন, সো হামি বুঝে নিয়েছি। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে।

নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে এভাবে আটকে রাখা অস্বাভাবিক। কিন্তু দেবীসিঙ নিক্রপায়, তাবতো কোন হাত নেই। কয়েদখানায় যতটা সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা সে করে দিতে পারে। আইন-কানুন বজায় রেখে সাধ্যমত করেও দিয়েছে। বিত্বাধর দেবী করে যাবার পর ভারতের অমুরোধে নিজে গিয়ে বিত্বাধরের বাড়ি থেকে পুঁথি-পস্তবের পুঁটলিটা নিয়ে এসেছে। কয়েদীদের কালি-কলম দেবার নিয়ম নেই। লিখতে না পারলেও পড়াশোনা কবেতো সময় কাটবে। পুঁথিগুলি পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিল ভারত। নিজের লেখা সত্যপীরের

পুঁথি স্থানি ছাড়াও পুঁটলির মধ্যে কশীখণ্ডের পুঁথি, চুড়ামণিভঙ্গ, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, রতিমঞ্জরী, বাৎসায়নের কামসূত্র, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, আর বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণের পুঁথিখানা ছিল। সাহিত্য-দর্পণের পুঁথিখানা নন্দলাল চক্রবর্তির কাছ থেকে এনেছিল। পুঁথিখানা আর ফেরত দেয়া গেল না। যদি কখনো হযোগ পায়, দিয়ে আসবে।

আটাশ

ভারতের পাশের কুঠুরিতে থাকে তিনজন কয়েদী। তিনজনই এক ভায়গার লোক, এক মামলার আসামী। তহবিল তছরপের মামলা। আজমপুর পরগণার নায়ের জনার্দন দত্ত, খাজাখী শশিকান্ত শব্দাদার আর তসিলদার তিনকড়ি বিশ্বাসের সঙ্গে যোগসাজসে তহবিল তছরপ করে হিসেবের গৌজামিল দিয়েছে। কিন্তু দেওয়ান রাজবল্লভের চোখে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। হিসেবের কারচুপি ধরে ফেলেছেন তিনি। তিনজনকেই ধরে কয়েদ করেছেন। মহারাণার হুকুমে পাঁচবছরের মেয়াদ হয়েছে। সকালবেলাই এক প্রস্থ রান্না খাওয়ার পাট চুকিয়ে ডাল-ভাঙার কাঁচ করতে বসে তিনজন। বারান্দায় বসে ছোটো খাতা ঘুরিয়ে ডাল ভাঙে। ঘর ঘর করে খাতা ঘোরে আর সেই সঙ্গে ওদের মুখ চলে।

তিনজনই এত বকতে পারে। আর যত রাজ্যের পরচর্চা পরনিন্দা, ইতর রসিকতা। মাঝে মাঝে ঝগড়াও হয় নিজেদের মধ্যে। তখন এক একদিন অম্লীল গালাগালির চুড়ান্ত। বড় ঘেমা লাগে ভারতের, কিন্তু চোখ কান বুজে সহ্য করা ছাড়া উপায় কি। তার জন্ত কোন নির্দিষ্ট কাজের বরাদ্দ হয়নি। ভাগ্য ভাল যে সশ্রম কাবাদণ্ডের হুকুম হয়নি। তবে একটা কাজের ভার সে নিজেই নিয়েছে। সময় কাটাতে হবে তো। নিরক্ষর সেপাই আর কয়েদীদের যত

আরজি-দরখাস্তের মুসাবিদা করে দেয় ভারতচন্দ্র। বিপুল করাণীতে লেখে। দেখে-শুনে তাক লেগে গেছে দেবী সিঙের, ফুলাদ খাঁর। ফুলাদ খাঁ লোকটা স্বভাবতই নিষ্ঠুর। কয়েকদৈব কষ্ট দিলে, নানা ছুতোয় নির্ধাতন করে পৈশাচিক আনন্দ পায়। সামান্য ভুলের জন্ত হয়তো হাত-পা বেঁধে রোদুহরে ফেলে রাখে, কান ধরে পাঁচশোবার ওঠবোস করায় কিছা সপাসপ্ বেত চালায়। এ হেন ফুলাদ খাঁও রায়-মশাইর পড়াশোনার এলেক দেখে তাজ্জব বনে গেছে। প্রথম প্রথম অল্প কয়েকদৈবের সঙ্গে যেমন করে, তেমনি মেজাজ দেখাবার চেষ্টা করত।

আন্তে আন্তে নরম হয়েছে ফুলাদ খাঁ। এখনতো একজন সমস্তদার লোক।

প্রথম প্রথম কালি-কলম রাখতে পারত না ভারত। দরখাস্ত মুসাবিদা করার সময় কয়েকখানার দপ্তর থেকে কোন সেপাই হয়তো কালি-কলম নিয়ে আসত আবার লেখার পর নিয়ে যেত। কোন কোন দিন ফুলাদ খাঁ কিছা দেবীসিঙ্ এসে সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। আন্তে আন্তে সহজ হল অবস্থা।

আইন-কামুনও একটু একটু করে শিখিল হ'ল। শেষে কিছুদিন পর দেবীসিঙ্কে বলে কয়েক কালি-কলমের ব্যবস্থা করল ভারত। ততদিনে ফুলাদ খাঁও নরম হয়েছে। কোন অসুবিধে হ'ল না। কিন্তু এক একদিন অসুবিধের চূড়ান্ত হয় পাশের ঘরের কয়েকদৈবের জালায়। ছুপুরবেলা নিরিবিলি হয়তো সাহিত্যদর্পণের পুঁথিখানি খুলে বসেছে, একটু একটু করে নকল করছে।

জনার্দন দত্ত এসে বলল—কি করছেন রায়মশাই?

—এই একটু লেখা-পড়া

—অঃ নকল করছেন বুদ্ধি, ওখানি কিসের পুঁথি?

—আজ্ঞে একখানা সাহিত্য-দর্পণ, অলঙ্কার শাস্ত্রের পুঁথি— ভারতের জবাব শুনে জনার্দন দত্ত মাথা ছুঁয়ে বল্লো,—তা, বেশ বেশ, লেখাপড়া ডেমন শিখিনি বটে, এই ছ'বছর তো

ডাল ভেঙে ভেঙে হাতে কড়া পড়ে গেল, তবে আপনাদের আশীর্বাদে সোনারুপোর ছ'চার খানা অলঙ্কার আমার পরিবারেরও আছে, ও জিনিষ একটু আধটু আশিও বুদ্ধি—

—আজ্ঞে এ অলঙ্কার সোনারুপোর নয়—একটু হাসল ভারত—এ হ'ল কাব্যের অলঙ্কার, যেমন 'বাচ্য' হল কাব্যের দেহ, 'রীতি' যেন অবয়ব সংস্থান আর অলঙ্কার হ'ল কটককুণ্ডলাদির মতো কাব্যের আভরণ, এই দেখুন বিশ্বনাথ কবিরাজ মশাই লিখেছেন, অলঙ্কারা : কটককুণ্ডলাদিবৎ—

—আহা, থামুন থামুন—চৈচিয়ে উঠলো জনার্দন দত্ত—ওই সব কটকটি শুনলে মাথা ঝিম্ঝিম্ করে, তার চেয়ে বরং কবিকঙ্কনের পুঁথিখানি একটু পড়ুন, আহা আহা, কি জিনিষই লিখে গেছেন—

অগত্যা কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের পুঁথিখানি ধুলে বসতে হয়। কিন্তু অরসিকের কাছে রস নিবেদনের মতো বিড়ম্বনা আর নেই। পড়ার মধ্যে না বুঝে "আহা-আহা" তো করবেই, তারপর আবার নিজের কথা জের টেনে বলবে—আহা, আহা ওই যে লিখেছে না, উইচারি খাই পশু নামেতে ভালুক, নেউগি চৌরুরী নছি, না করি ভালুক, ঠিক আমার মত অবস্থা, আমি মশাই কারো সাথে পাঁচে ছিলুম না, এতকাল নায়েবী করেও কোন ভালুক-মলুক করতে পারলুম না, শেষে কিনা আমার কপালেই চুরির অপবাদ, আসলে তহবিল ভেঙেছে ওই শশেটা, ওটা কি কম বজ্রাভ—

—আহা থামুন, দত্তমশাই, আবার ঝগড়াঝাঁটি হবে— ভারতের কথা শেষ হবার আগেই এক একদিন হয়তো বারান্দা কিছা পাশের ঘর থেকে শশিকান্ত সমাধার মার-মার করে ভেঙে আসে—ভাল হবে না দত্তমশাই, আমি টাকা ভেঙেছি আর আপনি ধোয়া তুলসী পাতা—

জনার্দন দত্ত ধর্ম বৈষ্ণব, গলায় তুলসীকাঠের মালা, ছ'বেলা হরিনাম জপ করে, তাই তুলসী পাতার নাম করে খোঁচা দিলে 'বড়' আসে লাগে, ভেলে-বেঙনে জলে ওঠে—ভাখ শশে,

বয়সের সম্মান রেখে কথা বলবি আমি তোর উপর ওয়ালা ছিলম—

—ওঃ ভারী আমার উপর ওয়ালা, কয়েদখানার সব সম্মান— তারপর ধুন্ধুমার কাণ্ড। কথার পিঠে কথা বাড়ে। গালাগালি বকাবকির চূড়ান্ত। সমস্ত ছুপুটাই মাটি।

সেদিনও ছুপুরে পুঁথিপত্র নিয়ে বসেছিল ভারত। সাহিত্য-দর্পণ খানার নকল প্রায় শেষ। আর সামান্য বাকি। বাইরে মেঘলা আকাশ। কদিন ধরে রোজ বিকেলে মেঘ করে বড় জল হচ্ছে। রোজ সকালের দিকে আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে, তারপর ছুপুর হতে না হতেই মেঘ জমে। আজও জমেছে। ঘরের ভেতর আবছা আলো। মেঝেতে কবুলের আসন পেতে সামনে ঝুঁকে লিখছিল ভারত। নিশ্চয় ঘরে ঢুকল দেবী সিঙ। খোলা দরজাটা টেনে দিল। প্রথমে খেয়াল করেনি ভারত। দরজায় ক্যাচ করে শব্দ হতে মুখ তুলে তাকাল ঘরটা যেন আরো অন্ধকার হয়ে গেল। শুধু ছোট্ট জানালা দিয়ে মেঘলা ছুপুরের স্নান আলো আসছিল।

—রায়মোশা, একঠো বাত শুনবেন—সামনে উবু বসে ফিস্-ফিস্ করে বললো দেবী সিঙ।

খুব অবাক হ'ল ভারত—কি ব্যাপার বলুন তো?

—আওয়াজ দাবিয়ে বাত করুন—একবার পেছন ফিরে আধখানা খোলা দরজার দিকে দেখল দেবী সিঙ, তারপর বললো—বাহারমে খুব গোলমাল আছে, এই মওকা, আপনাকে হামি খালাস কোরে দিব—

বলছে কি লোকটা, খালাস করে দেবে কি? নিজের কানেও কি ভুল শুনেছে ভারত। চমকে উঠে সোজা শব্দ হয়ে বসল। চুপিচুপি মতলবটা খুলে বললো দেবী সিঙ। বিজ্ঞানর ঠাকুর সব ব্যবস্থা করেছে। দু'হাজার টাকা দেবে। একহাজার পাবে কয়েদখানার অধ্যক্ষ দেবী সিঙ, বুদ্ধেলা, আর এক হাজার পাবে সেপাইদের জমাদার ফুলদ খাঁ।

আরো পাঁচশো পাওয়া যাবে দশ-বারোজন সেপাইদের মধ্যে ভাগ করে দেবার জন্তে। দু'শোটাকা আগাম দিয়েছে। আগামীকাল মধ্যরাতে ভারতকে খালাস করে পুরো টাকাটা হাতে হাতে পাবে দেবী সিঙ।

সমস্ত শহরে গোলমাল, বিশৃঙ্খলা। শহরের বাইরে মারাঠা বর্গীদের সঙ্গে লড়াই করছে নবাবের কোজ। এমন স্বযোগ আর আসবে না। সকলেই নিতের ধনপ্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। মহারাজা চিত্রসেন নাকি ধনদৌলত, আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে শহরের বাইরে কোন নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

দেওয়ান রাজবল্লভ অবসর নিয়েছেন অনেকদিন। নতুন দেওয়ান মানিকচাঁদও পালাবার মতলবে আছেন।

শহরের সর্বত্র নানারকম গুলব আর আতঙ্ক। প্রহরে প্রহরে গুলবের নমুনা পাল্টায়, সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের চেহারা বদলায় কখনো বাড়ে, কখনো কমে। কখনো শোনা যায় নবাব জিতে যাবেন। আরো ফৌজ আরো কামান এল বলে। মুশিদাবাদ থেকে নবাবের বড়ভাই হাজী আহম্মদ রওনা হয়েছেন।

আবার একপ্রহর বাদেই হয়তো শোনা গেল, ওলব বাজে খবর। নবাবের শিবিরে রসদপত্র বেশি নেই, গোলাবারুদও ফুরিয়ে এসেছে। বর্গীরা সংখ্যায় পকাশ-বাট হাজার। নানাদলে ভাগ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একদল যাচ্ছে মুশিদাবাদের দিকে, একদল মেদিনীপুরের দিকে, আরেকদল হয়তো চলেছে হুগলী কিম্বা কলকাতার পথে। ভাস্কর পণ্ডিত নিজে চৌদ্দজন সর্দার নিয়ে নবাবকে ঘিরে রয়েছেন আর দশজন সর্দারকে পাঠিয়েছেন দশদিকের গ্রাম লুণ্ঠ করতে।

এই গোলমাল আর বিশৃঙ্খলার স্বযোগ নিতে হবে। উজ্জেনার উঠে দাঁড়াল ভারত।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুল্লো দেবীসিঙ- খামোশ থাকবেন, কাল রাত ছ'পহরমে হাসি আসবো—

উদ্ভাস্তের মতো খানিকক্ষণ পায়চারী করলো ভারতচন্দ্র। যেমনভাবে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল দেবীসিঙ। অবশ্য তার খাওয়া-আসাটা অনেকেই দেখতে পেল। তেমন কোন ঘটনা নয়।

দিনের মধ্যে ছ'তিনবার দেবীসিঙ, কিম্বা ফুলাদ খাঁ কয়েকদৈর কুঠুরীতে ঢুকে তদারক করে যায়। কোনরকম এস্তেলা না দিয়েই হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়।

বারান্দার এসে দাঁড়াল ভারত। তিনগ্রহর বেলা। মেঘলা আকাশ। লম্বা বারান্দায় অনেক কয়েদী অলসভাবে শুয়ে বসে আছে। নিজের মধ্যে গল্প শুজব করছে। এ সময় কারো কোন কাজ থাকে না। শুধু বাগানের কাজ বারী করে, সেই দশবারোজন এই সময় কুরোতলায় বসে স্নান করে, কাপড় কাচে।

পাশের কুঠুরীর দরজার সামনে বসে শশিকান্ত কানে একটা পালক শুঁজে নাকমুখ কুঁচকে জড়ুত আনন্দবোধ করছিল। জনার্দন বোধহয় ভেতরে ঘুমোচ্ছে। তিনকড়ি রাওর খাওয়ার কত শালপাতা শুঁছিয়ে রাখছিল।

আর কিছু সময় পরে রাজিরের খাওয়া-দাওয়ার পালা শুরু হবে। রান্না হয় একবেলা। সেই সকালের ঠাণ্ডা ভাত বা খিচুড়ি এবেলা সূর্যাস্তের আগেই খেয়ে নিতে হয়। সূর্যাস্তের পরই দরজায় দরজায় তালাবদ্ধ হয়ে যায়।

নাম ধরে ডেকে ডেকে খাতায় গিলিয়ে দরজা বন্ধ করে ফুলাদ খাঁ।

বেলগাছের ডালে একটা কাক ডাকছে। সেই শালিক ছুটো বাগানের পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো একটু এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছে। রোজ এই সময় আসে শালিক ছুটো। রোজ যখন বেলগাছের মাথায় বিকেলের রোদ হলুদ হয়ে যায়, ঠিক তখন কুরোতলার পাশের নালটীর মাঝে অল্প অল্প

জমা জলের মধ্যে পাখা ঝাপটে স্নান করে। তারপর বেল গাছের সবচেয়ে নিচু ডালটায় একটু সময় বসে পাখা ঝাড়ে। সারা গায়ের পালক ফুলিয়ে মুখ নিচু করে ডাকে ছ'একবার। তারপর কোথায় যেন উড়ে যায়।

আবার ঘরের ভেতর এল ভারত। ছোট ঘরটির এদিক থেকে ওদিক, দরজা থেকে জানালা পর্যন্ত পায়চারী করতে লাগল। অনেকবার শুণে দেখেও সে সাধারণভাবে আট-নয়বার পা ফেলা যায়। নিজের হাতে যেনে দেখেছে সাড়ে আট হাত লম্বা, পাশে সাড়ে চারহাত। এই সতেরোমাস ভাগ্যের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে এই ছোট ঘরটায় শুয়ে বসে দিন কাটিয়ে যেন হাসিয়ে উঠেছিল। কিন্তু কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। দরবারে ছ'তিনখানা দরখাস্ত পাঠিয়েও কোন কাজ হয়নি। হঠাৎ মুক্তির কথা শুনে কেমন অস্থির, কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবার সেই সঙ্গে গোপন অশ্রু। শেষ পর্যন্ত ঘুম দিয়ে পালাতে হবে। পালিয়ে বাঁচতে হবে নিজের কাছে, নিজের বিবেকের কাছে যেন জবাবদিহি করার মত কোন যুক্তি নেই। কিন্তু এই পথ ছাড়া উপায় কি। রাজনীতির খেলায় বিবেক নেই, ধর্ম নেই, বিশ্বাস নেই। এমন যে দেবীসিঙ, দেব-দ্বিজে এত ভক্তিমান, রোজ শিবের মাথায় জল ঢালে, সে ও হাতে হাতে ঘুম না পেলে ছেড়ে দেবে না। টাকা দিলে সব হয়, সব আইন কানুন কিনে নেয়া যায়। বিজ্ঞান বুঝেছে, শঠে শাঠ্য সমাচরণ। সোজা আঙ্গুলে ধি উঠবে না। আইন মাকিক দরখাস্ত করে তদ্বির তদারক করে কোন কাজ হবে না। তাই এই বাঁকা পথ ধরেছে বিজ্ঞান। খানিকক্ষণ পায়চারি করে একটু শান্ত হ'ল ভারত। তারপর আবার লিখতে বসল।

সাহিত্য র্পণের সামান্য অংশ বাকি আছে। আগ রাজির মধ্যেই নকল করে রাখব। আধাখানা ঘোমবাতি রয়েছে, ওতেই কাজ চলে যাবে হয়তো।

(ক্রমশঃ)



ম হী তো ব বি ঞা জ

[১৯]

পরপর কদিনের ঘন বর্ষণে মাটিটা একটু নরম হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। চাষের কাজে ভাটা পড়েছিল। দিন দুয়েকের কড়া রোদ খেতেই মাটিটা আবার জুড়-সই হ'য়ে উঠল। কার্টুখালির চাষী-মাসুখদের ক্ষিধে-তেষ্ঠার ফুরসৎ রইল না। খালি কাজ আর কাজ।

ঘরের মেয়ে মাসুখদের-ও এ-সময় বড়ো তরিতক্কি থাকতে হয়। হাল-ঠেলা মাসুখগুলো কলুজে-জল। রোদের তাপে তেতে-পুড়ে কললা হ'য়ে ঘরে আসে। চোখে চোখ রেখে তাকানো যায় না। তখন ঘরের মেয়েমাসুখদের সাবধানে থাকতে হয়। ঘর-দুয়োরের কাজ তরিবৎ করে রাখতে হয়। কোথাও কিছু যেন বেসামাল, অগোছালো না থাকে। ঘটি-ভাতি ঠাণ্ডা জল এনে হাতের কাছে দিতে হবে। গরু গুলোর খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর মাসুখটা শান্ত হুস্থ হয়ে তেল মেখে যাবে স্নান করতে। স্নান ক'রে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে ভাতের থালাটি নামিয়ে দিতে হবে। বোশেখ মাসের হেলো, আর গনুগনে আগুনের চাঙ-ড়া—দুই-ই সমান। বড়ো সাবধানে থাকতে হয় ওদের সামনে। সেই যে এক হেলোর গল্প আছে। খেটেখুটে তো বাড়ী এসেছে। আর এদিকে বউ হতভাগী তো ঘুমিয়ে

পড়েছে। কাজকর্ম কিছু গুছিয়ে রাখেনি। তেল-জলের জোগাড় রাখেনি। কাঁধ থেকে জোয়াল নামিয়ে হেলো জল চাইল। কিন্তু কোথায় জল? ওদিকে হেলোর প্রাণ তো তখন জল-তেষ্ঠায় আই-চাই করছে। রাগের মাথায় হেলো করলো কি! না, তার সেই লাঙল-ঠেলা কড়া-পড়া হাত দিয়ে মারলো বউয়ের গালে এক ধাপপড়। সেই যে বউটা পড়লো! আর উঠলো না! হয়ত গল্প কথা এটা। কিন্তু বউ মাসুখ গুলো দূর থেকে যখন দেখে—লাঙল কাঁধে হেলো রোদদুর ঠেল বাড়ী আসছে, তখনই ওদের গল্পটা মনে প'ড়ে যায়। ভয়ে বৃকের মধ্যে শিটিয়ে আসে। পড়ি-কি-মরি ক'রে কাজকর্ম গুলো গুছায়। তেলজলের জোগাড় করে।

ধারালো বটিতে কুচো কুচো ক'রে কাটা খড়গুলোর সঙ্গে খইল, কুড়ো আর জল মিশিয়ে বড়ো একটা মাটির চাড়িতে জাবনা মাখছিল পদ্ম। বাপ আর ভাই গেছে মাঠে লাঙল দিতে। বেলা একটু গড়িয়ে পড়তেই বাড়ী ফিরে আসবে। ওদের খাবার-দাবারের জোগাড় করে রেখেছে। বলদ দুটোরও এ-সময়ে বড়ো খাটনী। বোশেখের রোদেপোড়া ক্ষেতের হালটানা চারটিখানি কথা নয় বলদগুলোরও এ-সময় ভালমতন তত্ব-তোয়াক নিতে হয়। পেট ভরে খেতে না পারলে খাটবে কি করে? বাপ-ভায়ের রান্নাবান্না শেষ

করে পদ্ম তাই বলদ দুটোর জন্ত জাব্বনা মাখছিল। নীলমণি বাবার পর থেকে সেই যে পদ্ম ওখান থেকে চলে এসেছে, আর যায়নি। নীলমণির দেওয়া পাঁচবিধে জমি অবশ্য এখনো পদ্মের নামেই আছে। পদ্মর বাপ-ভাই তার— চাষবাষ করে। বাপ-ভায়ের সংসারই এখন পদ্মর সংসার। পদ্মর মা বরাবরই একটু দুর্বল মানুষ। এটা-ওটা অস্থখ বিস্থখ লেগেই থাকে। এই ক-বছরে যেন আরও দুর্বল হয়েছে। চৈত্র-সংক্রান্তির আগের থেকেই বিছানা নিম্নেছে। ঘরের কাজকর্ম তাই পদ্মকেই সামলাতে হয় এখন। মাধাইয়ের বয়স এবারে এই আঠারোয় পড়ল। ওর বিয়ের কথাবার্তা চলছে। একটা ডাগর-ডোগর বউ আনলে যদি ঘরের কাজকর্মের একটু শাস্ত হয়।

দুপুর গড়াতেই ভজহরি আর মাধাই ক্ষেত থেকে ফিরে এলো। লাঙল অবশ্য এক খানাই। তবু বাপবাটা দুজনেই ক্ষেতে যায়। একজনে একনাগাড়ে কতোক্ষন আর কাজ করতে পারে। তাই মাঝে মাঝে হাত বদলা দিতে হয়। তামুক খাবার জিরেন দিতে হয়। ভজহরি আজকাল আর রোদ্ধুরের মধ্যে সমান তালে খাটতে পারেনা। কিন্তু মাধাই এই-বয়সেই একেবারে চম্বনে হয়ে উঠেছে। ক্ষেতে নেমে লাঙলের কুটি ধরতেই দেয় না বাপকে। বলদ দুটোকে দাবড়ে দাবড়ে সারা ক্ষেতে একাই চকর দিয়ে ফেরে। মনটা যেমন গোঁয়ার হয়েছে, তেমনি গায়ে হয়েছে অস্থরের মতন জোর। বেশ লায়ক-লায়ক ভাব। তার উপরে আবার বিয়ের কথা বার্তা চলছে। মেলাজটা সবসময়ে যেন টং-য়ে বাঁধা আছে।

ওরা বাড়ী আসতেই পদ্ম তাড়াতাড়ি এক ঘটি ঠাণ্ডা জল আর একটা গেলস এনে দিল ওদের কাছে। ভজহরি ছায়ায় বসে হাত-মুখ ধুে। জল খেলো। মাধাই গোয়ালে গিয়ে জাব্বনার চাড়ির পাশে বগদ দুটোকে বাধল। চাড়ির জাব্বনাটা ভালো করে উন্টে পাণ্টে মধ্যে দিল। তারপর

বাইরে এসে টেঁচিয়ে পদ্মকে ডাকল—“এই দিদি—” পদ্ম রান্নাঘরে ঢুকেছিল। মাধাইয়ের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এল।

পদ্মকে দেখেই মাধাই গরম হয়ে বলল,—“তোরে কদ্দিন কইছি না যে জাব্বনার সাথে কুড়ো এটু বেনী করে দিবি। কথা শুনি না—না কি?”

পদ্ম গলা নামিয়ে বলল—“রোজ তো দি’। আজকে আর কুড়ো নেই। সুরোয়ে গেছে।”

মাধাই তেমনি গলা চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে—“ক্যান, আজকে ধান ভানিস্‌নি?”

পদ্ম বলল—“না।”

মাধাই গজ গজ করে চলে—“তা ভান্‌বি ক্যানো? সোমারডা ক’নে তোর? দিনরাত তো খালি পাড়ায় পাড়ায় টংল দিয়ে ব্যাড়াবি। বোশেখ মাসের গরু হলো খাতি পারুক আর না পারুক, নিজিরগে প্যাটটা ঠিকমতন ভরালিই হলো।”

অপমানে লজ্জায় মুখটা কালো হয়ে যায় পদ্মর।

ভজহরি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার কথা বলল—“কি আরস্ত করলিডা মাধাই? এটু চুপ কর দেখি।”

ভজহরি আগের সে-চোট-পাট এখন আর নেই। শরীর মন অনেকটাই ঝিমিয়ে এসেছে। আর ছেলের কাছে চোট-পাট করারও তো উপায় নেই। মাধাই কোনো সময়ে ভোয়াক্কা রেখে কথা বলে না। যেমনটি বলবে—তেমনটি শুনিয়ে দেবে। ভজহরি তাই আজকাল সাধারণতঃ সংসারের সব ব্যাপারে চুপচুপই থাকে। চোখবুজে সব সহ করে। কিন্তু মেয়েটার কথা ভাবলে মাঝে মাঝে মনটা যেন কেমন হয়ে ওঠে। পদ্মর সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্ত নিজেকেই বড়ো দায়ী বলে মনে হয়। বাপ-ভায়ের সংসারে এসে ও সংসারটার সমস্ত কাজকর্ম নিজের দুটো হাতে ঠেলে তুলছে। কিন্তু ছেলের মতিগতি কিছু বুঝতে পারেনা ভজহরি।

কিছুদিন থেকে পদ্মকে যেন ছ'চোখে দেখতে পারে না মাধাই। এটা-ওটা নিয়ে খিটিখিটি করতেই থাকে।

বাপের কথা শুনে মাধাই বলে—“আমি চুপ করবো না তো কেউ চুপ করবে! আমি তো চুপ ক'রেই আছি। তা আমি যেটা কই—সেইডেই যানো বড়ো মন্দ হ'য়ে যায়।”

বাপ-ভাইয়ের খাওয়ার পরে পদ্মর খাওয়া শেষ হতে বিকেল গড়িয়ে এলো। পড়ো-পড়ো বেলায় একগাদা বাসন-কোসন নিয়ে গুতে এলো পুকুরঘাটে। ছাই-বালি দিয়ে থালাবাসনগুলো মেজে মেজে গুলো। তারপর নিজে মুখ-হাত গুয়ে উপরে উঠে এলো। থালাবাসন গুলো জাম গাছটার গোড়ায় নামিয়ে রেখে একটুখানি বসল। বেলা পড়ে এলেও এখনো রোদের ঝাঁক কমেনি। চারদিক ঝিমঝিম করছে। রোদের তাপে গাছপালা গুলো যেন ঝিমোচ্ছে। পুকুরের জল কমে এসেছে। রোশেখের রোদ্দুরে জল গরম হয়ে উঠেছে। পুকুরের মাঝখান দিয়ে ছোটো ছোটো এক ঝাঁক পোনা-মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সমস্ত শরীরের মধ্যে পদ্ম কেমন যেন একটা অবসাদ আর ক্লান্তি অনুভব করল। গাছের গোড়াটার হেলান দিয়ে তাকিয়ে রইল অনেক দূরে। পুকুরের ও-পাড়ের গাছ পালা-গুলোর ফাঁক দিয়ে ঝাঁ ঝাঁ করা বিরট মাঠটা দেখা যাচ্ছে। মাঠের ও-পাশের গ্রামগুলো রোদ্দুরের মধ্যে কেমন আবছা দেখাচ্ছে। কেমন একটা শান্ত নিরুশ ভাব চারিদিকে। আকাশের অনেক উপরে কতকগুলো শকুন উড়ছে। আন্তে আন্তে চক্কর দিয়ে দিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেই ঝিমঝিম-করা বিরট শূন্য আকাশটার দিকে তাকিয়ে পদ্মর চোখ ছটো ছাপিয়ে হঠাৎ জল নেমে এলো। বুকের চাপা কান্নাটা যেন ডুক্রে ডুক্রে বেরিয়ে আসতে চাইল। পুরানো দিনের কথা-গুলো ছবির মতন মনের উপর ভেসে উঠতে লাগল। কোথা দিয়ে যে কিভাবে দিনগুলো

কেটে গেল। বলরামের সঙ্গে বিয়ে-হওয়ার স্বপ্ন দেখা, সে-স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়া, নীলমনির সঙ্গে বিয়ে-হওয়ার সেখানকার দিনগুলো—সব যেন স্পষ্ট ভাসছে চোখের সামনে। সব কুল হারিয়ে আবার ফিরে আসতে হয়েছে বাপ-ভাইয়ের সংসারে। সমস্ত শক্তি দিয়ে এই শেষ অবলম্বনটুকুকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছে। সংসারে কারো কাছে কিছু চাইবার অধিকার তার আর নেই। শুধু ছুটি পেটের ভাত। আর পরণের একটু কাপড়। আর তারই জন্ম উদযান্ত খেটে চলা। কিন্তু তবু তো কারো মন পায় না। আজকাল সামান্য ছুতো-নাভায় মাধাইয়ের খোঁচা দেওয়া-দেওয়া কথা শুনেতে হয়। এর পরে মাধাইয়ের বিয়ে হবে। তার সংসার হবে। ভাইয়ের সে সংসারে পদ্ম হবে ছাই ফেলতে ভালো কুলো। এখনো তবু তো গায়ে শক্তি আছে। দুইহাত দিয়ে সমানে খাটিতে পারে। কিন্তু এর পরে যখন বড়ো হবে খাটবার ক্ষমতা থাকবে না, তখনকে দেখবে তাকে? একটা ছেলেও যদি থাকত তার কোলে! তার রক্ত-মাংসে গড়া, তার মেহে-বন্ধে মানুষ হয়ে ওঠা ছেলেটা অন্ততঃ তাকে ফেলতে পারত না। হারানো দিন গুলোর মতন তার জীবনের না-দেখা ভবিষ্যতের ছবিটুকু যেন স্পষ্ট হ'য়ে ভেসে উঠল পদ্মর চোখের সামনে। আর এ ঘটনা তো নতুন নয়। কাঁঠালির বিলের সব গায়েই তার মতন কতো বিধবা মেয়ে রয়েছে। আগেও ছিল। এখনো আছে। এমনি ভাবেই দুঃখে-কষ্টে, চোখের জলে আর শকলের হেলা-হেনস্থার মধ্যে দিয়ে তারা জীবনটাকে শেষ করেছে। এখনো করছে। পদ্ম তো আজ তাদেরই একজন।

সমস্ত জীবনটাকে বিশ্বাস বিবর্গ মনে হ'লো পদ্মর। কি হবে এ জীবন দিয়ে।

খানিকক্ষণ বাদে পদ্ম আঁচল দিয়ে ঘ'সে ঘ'সে চোখের জল মুছল। তারপর বাসন-কোসন গুলো নিয়ে ঘরে ফিরল। ব'সে ব'সে কেঁদে সময় নষ্ট করলে চলবে না।

ধানভানি আছে। রাতের রান্নাবান্না আছে। সংসারের আরো কতো কাজ কর্ম পড়ে রয়েছে।

রাতের রান্না-খাওয়ার কাজ শেষ হলে পদ্ম বড় এক ধান ধান নিয়ে চুকলো ঢেঁকিঘরের চালার। শোয়ার ঘরের লাগোয়া একটা চালার নীচে পাটখড়ির বেড়া দিয়ে ঘেরা ঢেঁকিঘর। অনেক রাত পর্যন্ত ধান ভেনে চলল পদ্ম। বাড়ীর সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠানের ও-পাশে বড়ো একটা নিমগাছ। ফুলে ভরে গেছে গাছটা। নিমফুলের উগ্র গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

আস্তে আস্তে রাত বাড়ছে। পদ্ম চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসতে চায়। কুপির ধোঁয়াটে শিখা আবছা হয়ে নাচতে থাকে চোখের সামনে। চোখ দুটো কচলে নেয় পদ্ম। ভাড়াভাড়ি করে আবার ঢেঁকিতে পাড় দেয়।

একসময় পদ্মর ধান ভানার কাজ শেষ হল। আলাদা আলাদা পাত্রে চাল আর তুঁস-কুঁড়োগুলো তুলে রাখল। তারপর বাইরে এসে দাঁড়ায়। গোয়ালঘরের পাশে হাঁসের ঘরটার দিকে নজর পড়তেই হঠাৎ চমকে উঠল পদ্ম। ছায়ার মতন কী একটা যেত সরে গেল ওদিকে। এক মুহূর্ত ধমকে দাঁড়িয়ে ভাবল পদ্ম। মানুষ নাকি— হাজার সন্ধ্যাসের দিনটার কথা মনে পড়ল পদ্মর। তবে কি বলরাম—

কুপিটা নামিয়ে রেখে অন্ধকারে পদ্ম আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল হাঁসের ঘরের দিকে। বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে। একটুখানি গলা-খাকারি দিল। মানুষের সাড়া পেয়েই ও-পাশ থেকে বড়ো একটা শেয়াল ছুটে পালাল। হাঁস ঘরার লোভে এসে ঘাপটি ঘেরে বসে ছিল।

শেয়ালটা যেদিকে ছুটে পালল; সেদিকে তাকিয়ে রইল পদ্ম খানিকক্ষণ। গরম বাতাসটা কেটে গিয়ে এখন বেশ শীতল বাতাস বইছে। নিম-ফুলের গন্ধটা যেন আরো উগ্র হয়ে উঠেছে।

পদ্ম আস্তে আস্তে ফিরে এলো। ঘরে গিয়ে কুপি নিভিয়ে ছেঁড়া মাদুরটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

কয়েকদিন পরের কথা। বিকেলবেলা। পদ্মর মা আজকে একটু ভালো আছে। উঠানের ছায়ার বঁশে বাটি দিয়ে নারকেল-পাতা চেঁছে কাঠি বার করছিল। কাঁটা বানাতে হবে। বোনা-চষার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভজহরি, মাধাই আজ আর কেউ ক্ষেতে যায়নি। ভজহরি ঘুমিয়ে ছিল। ঘুম থেকে উঠে বারান্দার এক কোণে বসে পাটাকুর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাট থেকে দড়ি বানাচ্ছে। কাজকর্ম না থাকলে মাধাইকে বাড়ী পাওয়া যায় না। খেয়ে দেয়ে সেই যে পাড়ায় বেরিয়েছে, কখন ফিরবে তার হদিশ নেই।

আজ পদ্মর কাজের চাপটা একটু কম। হেলো-কিষণের কামেলা নেই। ঘীরে রুসে সব করলেই চলবে। গরমের দুপুর। শানিকটে ঘুমিয়ে নিয়েছে পদ্ম। দুপুর বেলায় ঘুমোলে পদ্মর শরীরটা কেমন যেন আনচান করতে থাকে। সারা শরীরের মধ্যে ঘুমের রেশ জড়িয়ে থাকে। চোখে মুখে ভালো ক'রে জল ছিটিয়ে এসে বসল মার পাশে। লম্বা কাঠি দেখে দেখে নারকেল পাতাগুলো সাজিয়ে রাখতে লাগল। কিন্তু ভালো লাগল না পদ্মর। কিছুই যেন ভালো লাগছে না। মনটা বড়ো উতলা লাগছে। একটু পরেই উঠে দাঁড়ালো।

পদ্মর মা ষাড়ু উঁচু করে কাতরাতে কাতরাতে বলল— “পাতাগুলো এটু বাঁছে দিচ্ছিলি,—তা আবার খুলি ক্যানো?”

পদ্ম একটা আড়মোড়া ভেঙে বলল— “বেজার মাধা ধরিয়ে মা। তুমি যে কয়ডা পারো বানাইও। তারপরে আমি এক সোমায় আর শলাগুলোটাঁছে দেবো।”

বলতে-বলতে পদ্ম এগিয়ে চলল। পদ্মর মা গোঁঙাত

গোড়াতে বলল—“সে না হয় দিলি। কিন্তুক তুই যাচ্ছিস কনে?”

হঠাৎ পদ্মর কেমন যেন রাগ হল। ধমকে দাঁড়িয়ে মুখ খামুটা দিয়ে বলল—“যাবো আর কোন চুলোয়? আমার তো মরার আর জা'গা নেই কোনো চুলোয়?”

পদ্মর অহেতুক রাগ দেখে পদ্মর মার-ও রাগ হলো। মিনমিনে গলাটা চড়িয়ে বলল—“পোড়াকপালীর কথা শুনলি গা মাথা জলতি নাগে। বাতা নিচ্ছি কনে যাচ্ছিস, তা কথার ছিঁরি ছাছো।”

পদ্ম এগোতে এগোতে বলল—“যাবো আর কনে। হুবাশী যাতি কইলো। তাই ওগের বাড়ী এষ্ট ব্যাড়াতি যাচ্ছি।”

হুবাশীদের বাড়ী যাবে এ কথা আগে ভাবেনি পদ্ম। মার কথার উত্তরে কথাটা যেন কেমন মুখে থেকে বেরিয়ে গেল।

পদ্মর মা ট্যাক্ ট্যাক্ করে চলল—“অবোর ব্যালায় মাইয়ে চলল পাড়া ব্যাড়াতি। সোংসারের কাজকন্মে তো আর মন বসে না। খালি উড়ো উড়ো ভাব।”

পদ্মর আজ যেন কি হয়েছে। মার কথাগুলো যেন গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল। ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—“আমি পারবো না তোমাগের সোংসারে দাসী বান্দীর মতন খাটুতি। গতর খাটাতি পারলি ভাতের অভাব নাকি? এমনি কেউ ছুড়ো খাতি ছাও?”

পদ্মর মা গোড়াতে গোড়াতে বলল—“পোড়ার-মুহীর কথার ধার যদি কোমলো। মরার জা'গা তো জোটে না দেহি কোনো জাগার।”

পদ্ম আর দাঁড়ালো না। চোখের সামনে যতোকণ থাকবে ততোকণ মার ট্যাক্-ট্যাকানি শুনতে হবে।

পুকুর পাড়ে এসে খানিক পূপচাপ দাঁড়িয়ে রইল পদ্ম। সারা দেহ জুড়ে যেন কিসের একটা দাহ। খেয়ে, ঘুমিয়ে

কোনো কিছুতেই যেন এ দাহের শান্তি নেই। মাঝে মাঝে ছ'একদিন একেবারে অসহ্য হ'য়ে ওঠে। পুকুর ঘাটে যখন লোকজন থাকে না, তখন একা একা এসে জলে নামে। রোদরের তাপে পুকুরের জল কমে এসেছে। কয়েক হাত জলের নীচেই যন তলতলে পাক। একটা ডুব দিয়ে জলটুকু পার হয়ে যায়। সেই শীতল পাকের মধ্যে ছুখানা হাত গুঁজে দেয়। তারপর টান-টান হ'য়ে শুয়ে পড়ে জলের নীচে সেই পাকের উপরে। সমস্ত শরীরটা মিশিয়ে অড়িয়ে ধরে পড়ে থাকে রাশিকৃত তাল-তাল কাঁদার তলতলে নরম শীতল শরীরটাকে। দম ফুরিয়ে গেলে জলের উপর ভেসে ওঠে। বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে আবার জলের নীচে ডুব দেয়। আস্তে আস্তে শরীরটা একসময়ে নেতিয়ে আসে। তখন স্নান সেরে পদ্ম ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু শরীরের দাহ কমে কই! জল আর পাকের স্নিগ্ধ শীতলতা যেন শরীরের দাহকে আরো দ্বিগুণ চতুর্গুণ বাড়িয়ে তোলে।

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল পদ্ম। তারপর কি মনে করে হাঁটতে শুরু করল। পুকুর পাড়টা পার হয়ে চষা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে কোনাকুনি গিয়ে উঠল বলরামদের বাড়ী। কেউ কোথাও নেই দেখে একটু অবাক হল। হুবাশীর নাম ধরে ডাকল কয়েকবার। কিন্তু কারো কোনো সাড়া-শব্দ পেলো না। পদ্ম আরো কয়েকবার নারাগের নাম ধরে জোরে জোরে ডাকল।

বলরামের পিসী বারান্দার এক কোণে শুয়ে ছিল। পদ্মর ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘাড়টা একটু উঁচু করে উঠোনের দিকে তাকিয়ে বলল—“কেভা লো তুই,—মরে ফুটে ডাকতিচিস?”

পদ্ম তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। বুড়ীর বিছানার পাশে গিয়ে বসে বলল—“আমি পেসী, আমি পদ্ম।”

বুড়ীর চোখে ছানি পড়েছে। ভালো করে মানুষ চিনতে

গারে না। ঘুম-ঘুম চোখে ঠাহর করে পদ্মকে চিনবার চেষ্টা করল।

পদ্ম বুড়ীর গায়ের উপর একখানা হাত রাখল। বুড়ী বোধহয় এতোক্ষণে পদ্মকে চিনতে পেরেছে। পদ্মর হাতখানা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—“আমারে কেউ এটু ভাছে নারে মা! আমি আর বাঁচবো না।”

পদ্মও জানে বুড়ী আর ভালো হবে না। এ-ভাবে বিচ্ছেদ-ধরা হয়ে পড়ে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। তবু পদ্ম বুড়ীকে সাব্বনা দেয়—“কান্দো ক্যানো পেসী! রোগ-ব্যারাম হইছে, আবার ভালো হয়ে যাবেনে। কান্দে কাটে করবা কি?”

বুড়ী চুপ করে থাকে। পদ্ম জিজ্ঞাসা করে—“স্ববাসীয়ে দেহি না যে, বাড়ী নেই নাকি?”

বুড়ী বিরস গলায় বলে—“সে ঠেয়ারীর মাইয়ে ঠেয়ারীর কতা আর কোমনে। নারাগেরে নিয়ে গেছে মার বাড়ী ব্যাড়াতি। আমার ধারে এক ডোণ্ডো এটু বসতি পারে না।”

বুড়ীর স্বভাব জানে পদ্ম। যতো কিছুই করো, বুড়ীর ধারণা কেউ ওর জন্ত কিছু করে না।

পদ্ম তাই একটু হেসে বলল—“ও-কথা কইয়ে না পেসী। স্ববাসী তোমারে শাউড়ীর মতন ভাছে না। নিজির মা’র চাইতেও তোমারে টানে বেশী।”

বুড়ীর মনটা যেন হঠাৎ একটু নরম হ’ল। আন্তে আন্তে বলে—“তা তুই যা কইছিল মা! বউ আমারে মার মতনই ভাছে। আমারই মুকান ভালো না। রাগ হালি বউরে আমি কতো গালোই। তা বউ কিন্তুক এটু রাগে না। এয়ালা মানুষ। কতো আর খাটবে ক! তউ আমারে ভাখ পেরায় তাবুং করে তুলিছে। আমি দেহিস আর মরবো না। আবার ভালো হয়ে যাবো।”

বুড়ীর সঙ্গে আরো অনেকক্ষণ এটা-ওটা কথা বলল পদ্ম।

যদি এর মধ্যে স্ববাসী এসে যার। একবার ভাবল বলরামের কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু বুড়ী আবার কি মনে করে বসে ভেবে পদ্ম সঙ্কেচ বোধ করল।

আর একটু বাদে পদ্ম উঠল। বুড়ীকে বলল—“আমি তালি এবার যাই পেসী।”

বুড়ী বলল—“বা, আমাগের বো’-র সাথে যদি দ্যাহা হয় তো ভাড়াভাড়া বাড়ী আসতি কো’স।”

বারান্দা থেকে উঠানে নামল পদ্ম। বেলা প্রায় ডুবে এসেছে। ভাড়াভাড়া বাড়ী যাওয়া দরকার। বাড়ী গিয়ে রান্নার জোগাড় করতে হবে।

ঘরের পিছন দিয়ে ছোটো একটা স্বড়ি পথ নেমে গেছে ও-পাশে। সামনের দিক দিয়ে না নেমে ঐ পথটা ধরল পদ্ম। বাতাসীদের বাড়ীটা একবার ঘুরে যাবে। স্ববাসীর সঙ্গে যদি দেখা হয়।

ঘরের পিছনে অনেকখানি জায়গা। বড়ো বড়ো আম জাম আর পেয়ারা গাছ জায়গাটাকে ঢেকে রেখেছে। বেলা ডুবতেই জায়গাটা যেন অন্ধকার হয়ে উঠেছে। পাখ-পাখালির কিচরমিচিরে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছে। ও-পাশের বড়ো আমগাছটার গা ঘেষে দুই-তিন-মাহুষ সমান উঁচু উলুখড়ের গাদা। ঘরের ছাঁউনি দেবার জন্ত বলরাম বাহুন্দের মাঠ থেকে ওগুলো কিনে এনে গাদা দিয়ে রেখেছে। আমগাছের চার পাশ দিয়ে খড়গুলো ভারী হুন্দের করে সাজানো। হঠাৎ দেখলে একটা ঘরের মতন মনে হয়।

ঘনায়মান সন্ধ্যায় গাছপাণার আবছা অন্ধকারে নির্জন জায়গাটায় দাঁড়িয়ে পদ্ম কেমন যেন একটু ভয় পেলো। জায়গাটুকু পার হবার জন্ত ভাড়াভাড়া পা বাড়াল। খড়ের গাদাটা পার হতে গিয়েই হঠাৎ দেখল—ওপাশে খানিকটে দূরে একটা মাহুষ দাঁড়িয়ে। ওকে দেখেই মাহুষটা এদিকে আসতে লাগল। আসতে আসতে বলল—“নারাগের মা নাকি দাঁড়ায়ে? কিছু কছো নাকি আমারে?”

বলরাম! মুহূর্তে ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পদ্ম। তার পরেই ছুটে পালাবার জন্ত ভাড়াভাড়ি পা বাড়াল। কিন্তু একি! পা ছুটো যেন পদ্মর অসাড় হ'য়ে গেছে। একটা অজানা ভয়ে শরীরটা কেঁপে উঠল। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পদ্ম। বলরাম কাছে আসতেই কোনো-মতে বলল—“স্ববাসী বাড়ী নেই।—আমি পদ্ম।”

বলরামও কম অবাক হল না। হঠাৎ এখানে এ-ভাবে পদ্মর সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই পারেনি। পদ্মর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—“স্ববাসী বাড়ী নেই। তা তুমি যাচ্ছে ক'নে?”

পদ্ম মাথা নীচু করে বলে—“স্ববাসীর কাছে আইলাম। স্ববাসীয়ে পালাম না। তাই বাড়ী যাচ্ছি।”

বলরাম তাকিয়ে থাকে পদ্মর মুখের দিকে। পদ্ম তেমনি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ক্ষুধার্ত অজগর যেন স্থির ছুটো চোখ মেলে বলরামের শরীরের মধ্যে দিয়ে অপলকে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। পদ্ম নড়তে পারছে না সে লোলুপ দৃষ্টির সামনে থেকে। একবার এদিক ওদিক তাকালো বলরাম। উষ্ণ নিশ্বাসের দমকে বুকটা ফুলে-ফুলে উঠছে।

বলরামের শরীরের মধ্যে অজগরটা এবার পাক দিয়ে উঠল। আন্তে আন্তে এগিয়ে এলো বলরাম। পদ্মর ছুটো কাঁধ চেপে ধরল শক্ত হাতে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল—“চলো।”

এক ঝটকায় পদ্ম মাথাটা উচু করে বলল—“ক'নে?”

তেমনি হিস্‌হিস্‌ চাপা গলায় বলরাম বলে—“আমি য়ানে যাতি কবো।”

ভয় গেলো পদ্ম। বলরামের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্ত প্রাণপণে ওর ছুটো হাত ঠেলে দিতে চাইল। কিন্তু এ-মুহূর্তের পুরুষ দুর্জয় শক্তিশালী। একে বিমুখ করা সহজ নয়। এ-পুরুষকে পদ্ম দেখেনি কোনোদিন।

বলরাম পদ্মর কাঁধ ছেড়ে দিল। ছ'হাতে ওকে উচু করে তুলে নিল বৃকের উপর। তারপর এগিয়ে যেতে লাগল উলুখড়ের গাদার মতন আন্তরণের মধ্যে।

পদ্ম অক্ষুটে চীৎকার করে উঠল—“না, না—আমি যাবো না—। আমারে তুমি ছাড়ান ছাও।”

বলরাম আরো নিবিড় শক্তিতে পদ্মকে বৃকে জড়িয়ে ধরল।

খানিকক্ষণ বাদে দু'জনে উলুখড়ের আন্তরণ থেকে উঠে এলো। চারিদিক এখন আরো অন্ধকার হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেও পদ্মর ক্লান্ত চোখ দুটো ঝক-ঝক করছে।

বলরাম পদ্মকে কাছে টেনে নিয়ে বলল—“এ্যালা বাড়ী যাতি পারবানে তো? না, আমি আগোয়ে দেবো?”

এলোমেলো চুলগুলো টেনে পদ্ম একটা খোঁপা বাঁধল। তারপর সেই ঝকঝকে চোখে ঝিলিক তুলে বলল—“কি আমার সাহসের পুরুষেরে! এতোক্ষণ তো বড়ো সাহসের কাজ করলে!—আবার ক'য় আগোয়ে দেবো!”

মিটমিট করে হাসে বলরাম।

একটু বাদে বলরাম বলে—“কি, কথা ক'ছো না যে?”

পদ্ম চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর আন্তে আন্তে বলে—

“বড়ো স্বখ দিলে বোনাই!—কিন্তু এ তুমি কি ক'লে—কি ক'লে তুমি বোনাই—”

বলতে বলতে আকুল কান্নায় পদ্ম ভেঙে পড়ে বলরামের বৃকের উপর।

বলরাম কি একটা বলাত গেল। পদ্ম জড়িয়ে ধরল বলরামকে। পাগলের মতন বারকয়েক মুখ ঘষাটালো তার বৃকে। আর তার প্রম-মুহূর্তেই এক ঝটকা ঘেরে সরিয়ে দিল বলরামকে। তারপর ঝড়ের বেগে অন্ধকার ভেদ করে ছুটে পালাল।

(ক্রমশঃ)

একটি চিত্র

রাজর্ষি

ভারতের জনসাধারণ এই বিশ্বাসই এতদিন পোষণ করে এসেছে যে ভারতবিভাগের জন্ত দায়ী মুসলীম লীগ এবং তার অবিসম্বাদী নেতা মিঃ জিন্না। গান্ধিজী, জওহরলাল ইত্যাদি ভারত-বিভাগে সম্মত হন সাম্প্রদায়িক রক্তপাত বন্ধ করার জন্ত। বিশেষভাবে ভারতের হিন্দুরা এই বিশ্বাসই করে এসেছেন এতদিন। সম্প্রতি সে ইতিহাসকে পুনর্বিচার করা হচ্ছে এবং যারা কবুছেন তাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দু—এবং এই পুনর্বিচারের রায়, ভারতবিভাগের প্রাথমিক দায়িত্ব গান্ধিজী ও জওহরলালের—অন্ততঃ পক্ষে মিঃ জিন্নার অপেক্ষা অধিক দায়িত্ব না হউক সম-দায়িত্ব তো বটেই। সাম্প্রতিক ইতিহাসকে নিতুল ভাবে জানবার বোঝবার মনোভাবই আমরা গঠন করতে চাই, মনোহারী বিশ্বাস নয় ভাবানুভাবীন বিশ্লেষণ দিয়ে। তা না হলে জাতি আবার ভুল করবে আবার ভাবানুভাব কুশাশ্রয় অপরিচ্ছন্ন পথে পা বাড়াবে। সে ভুল রোধ করতে জয়ন্তী সাধ্যানুযায়ী সচেষ্ট থাকতে বদ্ধপরিকর। জঃসঃ

মনোরম সাক্ষ্য পরিবেশের শান্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে সশব্দে পড়ে গেল ছুরি আর কাঁটা দেওয়ান চমনলালের হাত থেকে। এমনি চমকে উঠেছিলেন চমনলাল, আধীনতা যুদ্ধের দুর্ভিক্ষ যোদ্ধা পাঞ্জাবের দেওয়ান চমনলাল। নৈশ ভোজনে বসেছিলেন সজীকে দেওয়ান সাহেব, অতিথি পরম স্বন্দ মহম্মদ আলী জিন্না, সঙ্গে তাঁর স্থানীয় ছদ্মবেশের বন্ধু সোহোদরা ফতেমা জিন্না। আপনাকে সামলে নিয়ে চমনলাল বলেন,—কি বলছ জিন্না সাহেব, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না; স্পষ্ট করে বল, মেহেরবান।

উত্তর দিলেন জিন্না,—স্পষ্ট করেই তো বলেছি, এর মধ্যে না বোঝার তো কিছুই নেই।

তাহলে আবার বল, আমার কানকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি আবার বল, কি তোমার দাবী।

আবার ৭

ধীর স্থির স্থম্পষ্ট ভাবে জিন্না তখন বলেন—আবার শোন আমার দাবী। আমার প্রধান এবং প্রথম দাবী হচ্ছে আমি চাই হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত নির্বাচন। দ্বিতীয়ত, আমি চাই কেন্দ্রীয় লোকসভায় শতকরা ৩৩ ভাগ প্রতিনিধিত্ব এবং বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে উপযুক্ত সংরক্ষণ।

চমকে উঠবারই তো কথা। ১৯৩৭ খৃঃ অব্দে জিন্না দাবী করছেন যুক্ত নির্বাচনের। শাস্ত্রবরে জিন্না বলেন,—এই আমার দাবী, এর বেশি আমি চাই না যদি পার গান্ধীকে এটা গ্রহণ করতে রাজী করাও। গান্ধী রাজী হলেই সব গোলযোগের সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর রাজী হওয়া চাই। গান্ধী ভিন্ন অন্য কারোও কথায় হবে না। এই আমার দাবী। এই দাবী গ্রহণ করতে হবে গান্ধীকে, অন্য কাউকে নয়।

বিনিময় কেটে গেল রাত। জিন্নার কথা অতি স্পষ্ট, কোনও ঘোরপ্যাচ নেই। যেমন ঋক্ষ মেরুদণ্ড তাঁর, তেমনি ঋক্ষই তাঁর চরিত্র। সোজা, সরল, কিন্তু তীক্ষ্ণ। তবু একি বিশ্বাসযোগ্য? ১৯৩৭ খৃঃ অব্দে জিন্না কিনা চাইছেন যুক্ত নিৰ্বাচন? একথা নিজেই বা বিশ্বাস করেন কি করে, আর লোকের কাছে বলবেনই বা কি করে? লোকে যে তাঁকে স্বেচ্ছা গাধা বলবে, আর, নইলে দয়া করে বলবে যে, জেল খেটে-খেটে লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে। এমনি করেই মিনিট গুণেগুণে রাত কেটে গেল। চমন্লাল যেন একটু হৃদয় পেলে, সেই সাত সন্ধ্যায় ছুটলেন সারা পাঞ্জাবের প্রদেশে ‘মহাস্বা’ নামে উত্তর ভারতে পরিচিত রাইজাদা হংসরাজের কাছে। বজ্রেন তাঁকে সব কথা। মহাস্বা হংসরাজ গভীর চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কাটালেন অনেকক্ষণ। ধীরে ধীরে চিন্তার বলিরেখা মিলিয়ে গেল, প্রশ্ন হল মুখাবয়ব; বজ্রেন,—আমি নিজে জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করবো।

আলোচনা হল জিন্নার সঙ্গে। জিন্না আপন বাক্যে অচল-নিষ্ঠ। আশ্বস্ত হলেন রাইজাদা। বজ্রেন চমন্লালকে, অবিলম্বে গান্ধীর কাছে লিখিত ভাবে প্রস্তাব উত্থাপন করতে। কথা দিলেন তিনি নিজেও সেই পত্রে আপন স্বাক্ষর দেবেন। দেবেন বইকি, ভারতের ভবিষ্যত রচনা হ’তে যাচ্ছে, আর তার অংশীদার হওয়াতো পরম ভাগ্যের কথা, স্বাক্ষর দেবেন না তিনি?

গান্ধীর কাছে বিস্তারিত পত্র গেল, রাইজাদা ও চমন্লালের যুক্ত স্বাক্ষর বহন করে। ভারতের ভবিষ্যত আশায় বেদনায় উদ্ভূত হয়ে উঠল। উৎকর্ষায় ও ঔৎসুক্যে কাটতে লাগল দিন। ক্রমশঃ উৎকর্ষা বেড়ে চলল, কোনও উত্তর আসছে না গান্ধীর কাছে থেকে। একি হল, এমন সুযোগ কি হেলায় হারাবার? এমন সময় এল সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত উত্তর তাৎপরিহিত সংক্ষিপ্ত বার্তা—তোমার চিঠি। নির্দেশের লক্ষ্য অপেক্ষা করো। (Your letter. Await

further instructions.) হচ্চকিয়ে গেলেন চমন্লাল। নিরুপায় হয়ে লিখলেন জওহরলালকে গান্ধীর উত্তরাধিকারী উদ্ধত, গণিত, জওহরলাল তাঁর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ভাল রেখেই পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলেন তিনি। তবু হাল ছাড়লেন না চমন্লাল। আবার লিখলেন গান্ধীজীকে, আর আশা-নিরাশার পাকে দিন গুণতে লাগলেন, গান্ধীর নির্দেশের প্রত্যাশায়। জবাব শেষপর্যন্ত এল বটে, জবাবের মতো জবাব, গান্ধীর উপযুক্ত জবাব। গান্ধী লিখলেন, “he was not even a four-anna member of the Congress : And that he did not see the light : that we must wait for a better opportunity.” হায় ভগবান, হায় ভারত ভাগ্যবিধাতা! চার-আনার মেসার। আলো দেখতে পাচ্ছেন না!! আরোও প্রকৃষ্ট সুযোগ!!! একি সত্য না মতিভ্রম? একি সত্যদর্শী মহাস্বা না মাকিয়াভেলি? না মাকিয়াভেলি এবং কোটিল্যের নিকশিত নির্ভর্যাস?

এমনি করেই “ended a dialogue which might have changed the course of recent events” এমনি করেই নিষ্ফল হ’লেন “the apostle of Indian Unity.” জিন্নার মহৎ প্রয়াস। ভারত ভাগ্য-বিধাতা সেদিন অলঙ্ঘ্য নিশ্চয়ই হেসেছিলেন।

সুযোগ বারবার আসে না। কিন্তু আবারও সুযোগ এসেছিল। এবং সেই সুযোগও দিয়েছিলেন অধুনা কুখ্যাত সেই মহম্মদ আলি জিন্না। এবারও তিনি শরণাপন্ন হয়েছিলেন লক্ষ জেল ফেরৎ বন্ধু চমন্লালের। জিন্না ফিরছিলেন কাশ্মীর থেকে। পথে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন চমন্লালের। ভারতের ভাগ্য তখন নিয়ন্ত্রিত হতে যাচ্ছে। আবার তিনি প্রস্তাব করলেন ভারতের অবিভাজ্যতা রক্ষা করলে। গান্ধীজী তখনও পুণা জেলে, সেখানে উপবাসকাশী অবস্থায় তিনি রাজাগোপালাচারীর পরিকল্পনাতে সম্মতি দিয়েছেন।

জিন্না চমনলালকে অস্বীকার করলেন তাঁর বর্তমান প্রস্তাবটি পৌঁছে দিতে। সেটি হল যে, “If the principle of Pakistan was accepted, he would not ask for a division of the country.” জিন্নার অন্তরতম সঙ্গী হয়তো কোনদিনই ভারত বিভাগ চায়নি। এমনকি তিনি “Two-nation theory”-তেও আদৌ বিশ্বাস করতেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ১৯৪৭ খৃঃ ১৭ই আগষ্ট পাকিস্তান Constituent Assembly কে সম্বোধন করে তিনি যে বক্তৃতা দেন সেটি এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। সেখানে পাকিস্তানের সমস্ত নাগরিককে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, “You are free, you are free to go to your temples, you are free to go your mosques, or to any other place of worship in the State of Pakistan. You may belong to any religion, or caste or creed, that has nothing to do with the fundamental principle that we are all citizens of one State. I think that we should keep that in front of us as our ideal, and you will find that in course of time, Hindus will cease to be Hindus, and Muslims, will cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the State—“এখানে কোথায় হিন্দু-মুসলমান, কোথায় two nations theory? * রাজনৈতিক ষাট-প্রতিষেধে তিনি বাধ্য হয়েছেন তাঁর বিবেক বহির্ভূত পথে চলতে। তাই বারোবারেই তাঁর ফিরে আসার এই মর্মস্বন্দ প্রয়াস। জিন্না অনুন্নয়ন করে বললেন চমনলালকে, লেখ গান্ধীজীকে। এই প্রায় অন্তিম ক্ষণেও চেষ্টা করলেন একবার, যদি বা রক্ষা

করা যায় ভারতভূমির অখণ্ডতা। লেখা হল চিঠি। ঠিক হল চিঠি নিয়ে পুণা যাবেন ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব, পরে কংগ্রেস আয়লে যিনি পাঞ্জাবের মন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু সেই চিঠি পৌঁছাল না গান্ধীব হাতে। হারিয়ে গেল কালের ঋত্রে একটি মহাক্ষণ। জুর হালি হেসেছিলেন নিশ্চয় সেদিন ভারত ভাগ্য বিধাতা।

হারিয়ে গেলেও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। বায়ুয়ের আশা সীমাহীন। সীমাহীনই ছিল বোধহয় জিন্নার অন্তরের নিগূঢ় কামনা। তাই বৃষ্টি পাকিস্তানের শপথবদ্ধ জিন্না মুসলীম লীগের কাউন্সিলকে নির্দেশ দিলেন Cabinet Mission Plan গ্রহণ করতে; এবং তাই গ্রহণ করল লীগ কাউন্সিল। কিন্তু নিয়তি? আবার হাসলেন নিয়তি জিন্নার মৃত্যুর। রক্তমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন জহরলাল নেহেরু। ব্যাটার দলের সেনাপতির মতোই টিনের তলোয়ার ঘুরিয়ে হৃদয় ছাড়লেন গান্ধীর মানসপুত্র। সেই টিনের তলোয়ারই ইম্পাতের জুলফিকর হয়ে ভারতমাতার অঙ্গে আঘাত করল। কলা-কল? বা হবার তাই হ’ল। ১৯৪৬ খৃঃ বসেতে A. I. C. C. র অধিবেশন বসেছে, সভাপতি জহরলাল নেহেরু। একমাত্র আলোচ্য বিষয় Cabinet Mission এর প্রস্তাব। লীগ কাউন্সিল আগেই তা গ্রহণ করেছে, এখন A.I.C.C.র সম্মতি পেলেই এই প্রস্তাব সর্বভারতের পক্ষ থেকে গৃহীত হবে এবং ইংলণ্ডীয় সরকার এটি রূপায়িত করতে বাধ্য হবে। ভারতের ওপর থেকে কৃষ্ণ-ধ্বনিকা যেন দীর্ঘ শতাব্দীর পরে উত্তোলিত হতে যাচ্ছে। সম্মুখে আশার আলোর উদ্ভাসিত পথ। জওহরলাল কি ভবিষ্যৎ বাদশাহীর স্বপ্ন দেখলেন? বাদশাহীর খোয়াবে বিচার বুদ্ধি কি হারিয়ে ফেললেন তিনি। হৃদয় দিলেন জওহরলাল আমরা এখন Cabinet Mission এর প্রস্তাব গ্রহণ করছি বটে, পরে কি হবে না হবে তা আমরাই (কংগ্রেস) দেখব।” ব্যস, হাতের টিল হাত থেকে বেরিয়ে গেল, আর ফেরবার পথ রইল না। বিষয়ে হতবাক্

জিন্দা। এতো একান্ত বিশ্বাসভঙ্গের কথা। সন্ধ্যাবেলাে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে ষিকার দিলেন জিন্দা। সন্ধ্যাবেলাে চোখে একবার নিজের অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, তারপর শেষবারের মতো মুখে ফেললেন আপন হৃদয় থেকে অখণ্ড ভারত প্রতিমা। মুসলিম লীগ Cabinet Mission প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল, এবং ব্যর্থহীন ভাষায় পাকিস্তানের দাবী জানাল। Apostle of Indian Unity! নিয়তি এবার বিজয়ের হাসি হাসলেন।

বারবার তিনবার চেষ্টা করলেন জিন্দা, ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখতে তিনবারই তিনি ব্যর্থ হলেন। এই ব্যর্থতার মূলে কিন্তু ছিলেন গান্ধী এবং তাঁর উত্তরাধিকারী জওহরলাল। এটা বুঝতে হলে গান্ধী চরিত্রে একটু প্রবেশ করা দরকার। তাঁর কাছে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন কোন কালেই মুখ্য প্রশ্ন ছিল না, ভারতের অখণ্ডতাও তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যদিও তিনি মাঝে মাঝে ঘোষণা করেছেন, "I consider vivisection of India to be a sin—(Harijan, May, 24, 1942), এবং "if Pakistan is an article of faith with him (Jinnah) indivisible India is equally an article of faith with me—(Harijan, July 26, 1942). "India will be divided over my dead body"—ইত্যাদি। তবুও বছর না ঘুরতেই তিনি তাঁর বৈবাহিক রাজাগোপালাচারীর ভারতবিভাগ কর্মমূলায় সম্মতি দিলেন। "Mr Rajagopalachari declared in a statement that the formula had the approval of Gandhiji and that he had discussed it with him in March 1943." জেল

থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে গান্ধিজি বলেন যে, "Rajaji's offer has seen the light of the day only now, but I had subscribed to it when I was fasting in prison camp. "(Quoted by P. K. Niyogi in Statesman, 22. 8. 66) স্বতরাং ভারতের স্বাধীনতা কিংবা ভারতের অখণ্ডতা গান্ধিজির কাছে নেহাৎই গৌণ প্রশ্ন ছিল।

গান্ধিজি চাইলেন গৌতমবুদ্ধের নবতম সংস্করণ রূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন বেঁচে থাকতে, আর তাঁর এই বিরটনাটকে জওহরলালকে বেছে নিলেন তিনি সম্রাট অশোকের ভূমিকায়। এখানে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী স্থান থাকতে পারে না। ভারতে তাঁর পদার্পণের মুহূর্ত থেকেই গান্ধী বুঝেছিলেন যে সারা ভারতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এই একটি লোক, মহম্মদ আগী জিন্দা যাকে মহামতি গোখলে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সেইদিনই চিনেছিলেন "apostle of Indian Unity" রূপে। স্বতরাং সেই প্রথম মুহূর্ত থেকে গান্ধিজি আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছেন জিন্দাকে ভারতের রক্তমঞ্চ থেকে সরিয়ে ফেলতে অন্তত তাঁর গুরুত্ব হ্রাস করতে, তাঁকে অস্বীকার করতে।

সেই প্রয়াসেরই বলি হলেন ভারতশাতা।*

* এই প্রবন্ধে উল্লিখিত Dewan Ohamanlal এর সঙ্গে জিন্দার আলোচনার তথ্যিক ভিত্তি ২৩/৮/৬৬ তে Statesman পত্রিকায় দেওয়ান চমন্লালের letter to the Editor কলামে লিখিত একটি চিঠি।

পুস্তক পরিচয়

ভারতে জাতীয় আন্দোলন। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ, ২২১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬ কতৃক প্রকাশিত। মূল্য ১১.০০। তৃতীয় সংস্করণ।

অপরিস্ফুট এই গ্রন্থখানি স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃরমেশচন্দ্র মজুমদার কতৃক উচ্চ প্রশংসিত—আমাদের পক্ষে দীর্ঘ প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ তাই অনাবশ্যক। এই গ্রন্থের লেখক তথ্যানিষ্ঠ, কিন্তু তাঁর একদেশদশী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সতর্ক থেকেই পাঠককে পাঠে অগ্রসর হতে হয়। গ্রন্থপাঠের ফলশ্রুতিতে অভূতপূর্ব দেখা দেওয়া তাই অসম্ভব নয়।

লেখক বলেছেন (পৃষ্ঠা ৩-৫) এদেশের জনমনে হিন্দুধর্ম সঘনাই একটা ধারণা থাকলেও কোনো দেশবোধ ছিলনা,—“পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে উনবিংশ শতকের আরম্ভ ভাগে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের মধ্যে এই ঐক্যভাবনার উদয় হয় যে, ভারত একটি অখণ্ড দেশ ও ইহার একটি বিশিষ্ট আত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূর্তি আছে।” এবিধ ধারণা বহুল প্রচলিত বলেই হৃদকর্ষে এর প্রতিবাদ করা প্রয়োজন—কেননা এই সিদ্ধান্তটি সর্বৈব ভ্রান্ত। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় থাকলেও একথা অনার্যাসে বোঝা যায় যে সেই ইতিহাসের অন্তঃশায়ী মূল প্রেরণা ও প্রয়াসই হল বহু বিচিত্র জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ও চিন্তাভাবনার সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ একটি অখণ্ড ণ্ডাগঠন; সেই কাজ আজও সমাপ্ত হয়নি, বরং একটা নতুন অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে, বলা যায়। ঐতিহাসিক কালে অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তার, যোগেশ্বরের সাম্রাজ্যবিস্তার ও ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তার, ভারতের ঐক্যসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ মাত্র—ভারত বহু পূর্ব

হতে, পৌরাণিক কাল হতেই এই ঐক্যপ্রচেষ্টা চলে এসেছে ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন ও রাজনৈতিক খাতে। রামায়ণের কাহিনী রামচন্দ্রের অখণ্ড বিশাল ভারত প্রতিষ্ঠার কাহিনী—ঋষির মন্ত্রভাবনা ও রাজার অজবল দুই-ই সেকালে নিয়োজিত হয়েছে দেখতে পাই। এই ঐক্যসাধনের প্রয়াস ছিল মূলত আর্ষশক্তি ও আর্ষসংস্কৃতির প্রসারকে ভিত্তি করে—পরবর্তী কালে আর্ষ-অনার্য সমস্যাটির বহুলাংশে সমাধান হলে আরও ব্যাপকভাবে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে কৃষ্ণ দুটি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের মাঠে ভারতের ক্ষুদ্রবৃহৎ সকল রাজস্বর্গকে সমবেত করে সকলকেই বিনষ্ট করেছিলেন,—এইভাবে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের পথে সকল অন্তরায়কে নিমূল করে তৎপর রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ ও রাজস্বয় যজ্ঞাবলম্বনে সমগ্র ভারতে একজন রাজাধিরাজ তথা একটিমাত্র মূল শক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তার নিকট সকল রাজবংশকে স্বধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন;—মহাভারতের সংগ্রাম তাই ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড বিশাল ভারত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও বটে, এবং সেই নবীন রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধ ভারত যুদ্ধের ধ্বংসের পরে কীভাবে গড়ে উঠল তার ইঙ্গিত আছে শান্তিপর্বে। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বহু শতাব্দী যাবৎ অক্ষুণ্ণ ছিল, পরে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বয়ংপ্রধান রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে ও তাদের পারস্পরিক বিরোধে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য টলায়মান হয়। তখন আসেন বুদ্ধদেব, তাঁর পদতলে সমবেত হয়েছিল বিবদমান রাজ্যের নৃপতিবৃন্দ। শান্তি ও অহিংসার পথে, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের বিপরীত পথে তিনি নতুন করে ভারতের

ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেই ঐক্যকে খুল বাস্তব রাষ্ট্রনৈতিক আকৃতি দিতে আসেন অশোক—দেবতাদের প্রিয় বলে অশোক সম্ভবত নিকেকে এই কারণেই মনে করতেন যে ভারতের অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক দাবীও অনিবার্য ঐক্যমুখী গতিকে তিনি তৎকালে সম্ভাব্য পূর্ণতা দিতে পেরেছিলেন।

কেন আবার তবে ভাঙল সেই ভারতীয় ঐক্য? তার কারণ ঐক্যসাধনা যেমন ভারতের ইতিহাসের একটা মৌলিক দাবী ও লক্ষ্য, তেমনি খুব ব্যাপক—বিশ্বের ব্যাপকতম—একটা ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ অঞ্চল একটি জাতি গঠন করে তোলাও সেই ইতিহাসেরই অত্যন্ত মৌল প্রেরণা। রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও বিশাল জাতিগঠন—দুটিই ভারত করতে চায় একপেশে, এককাটা একরোধা হয়ে নয়,—বহু বিচিত্রের সমন্বয়ে, বহু অভাবনীয়ের সমবায়ে। সেই তত্বই তার কাজটি কঠিন ও বেদনাবহ; রক্তক্ষয়, অবশাদ, ক্লান্তিজাত দীর্ঘকালীন স্রুষ্টি, গাঢ় তামসার অতলে নিমজ্জন আবার নতুন গতি ও শক্তিসহ পূর্ণোন্মেষে ছুটে চলা—এই ঘূর্ণাবর্ত পথে তাকে এগোতে হয় ধৈর্যের সঙ্গে, শতশত শতাব্দী ধরে চলে তার যাত্রার প্রস্তুতি; এবং যখন নিজের ভিতর রক্তাক্ততাদোষ ঘটে বা নবশক্তি সঞ্চারের প্রয়োজন বোধ হয় তখনই বাহির হতে হয় সে আমন্ত্রণ করেছে কোনো বড় রকমের আঘাত (যেমন আলেকজান্ডারের ভারতবিক্ষয়) অথবা শক্তিশালী বিদেশী জাতির স্থায়ী আগমন ও বসবাস ইংরেজের আগমন ও দৃশ্যে বছরের ইতিহাস এই ধারারই একটা পর্যায় মাত্র—কোনো বিচ্ছিন্ন, স্বয়চ্ছ ঘটনা নয়। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে ইংরেজ রাজত্বকালেও ভারতের কাম্য রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধিত হয়নি এবং জাতিগঠনের কাজও অসমাপ্ত রয়ে গেছে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ গেল, কিন্তু দেশের রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতির অভ্যুদয়—এ দুইই অসম্পাদিত রয়ে গেল। ভারতের নতুন যুগের ইতিহাস গড়ে উঠবে এই দুটি কর্মকে শিরোধার্য করে, নতুন

অঞ্চল ও সুবিশাল ভারত প্রতিষ্ঠা ও ঐক্যবদ্ধ একটি ভারতীয় জাতি গঠনই হবে কৃষ্ণ বা বুদ্ধের মতো নতুন ভারতপুরুষের কর্মত্রত। লেখক পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল রূপে ভারতের ঐক্যভাবনাকে চিহ্নিত করেছেন কেন জানিনা; ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে এই অবধান ও অন্তর্দৃষ্টির একান্ত অভাব পীড়িত করে। যদি দেশবোধ আমাদের নাই থেকে থাকে তবে লেখক দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা শোনাবেন কি? (১) শঙ্করাচার্য সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে, ভারতের চারটি প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করে এবং ভারতের যাবতীয় সন্ন্যাসীদের দশনাসী সম্প্রদায়ের আওতায় ঐক্যবদ্ধ করে একটা সর্বজাতীয় ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় আদর্শবাদীদের সংঘ গঠন করে সারা ভারতকে ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিগত ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন কোন প্রেরণায়? মায়াবাদী সন্ন্যাসীর এই দেশভাবনা কেন? (২) চৈতন্যদেব সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন, পূর্ব ও উত্তরভারতকে দাক্ষিণাত্যের ভক্তিদর্শনের ভাবধারায় দীক্ষিত করে এক ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় ভাবনার প্রবর্তন করেছিলেনই বা কোন প্রেরণায়? যিনি কৃষ্ণপ্রেমে বাহুজ্ঞানশূন্য বৎ ছিলেন তাঁরই বা এই দেশভাবনা কেন? আমাদের জাতীয়তাবাদ বিদেশী শিক্ষার দান—একথা বলায় ভারতের ইতিহাস ও ধর্মসাধনা উভয়কেই বিকৃত ব্যাখ্যার অধীন করে ফেলা হয়। এমনকি সমাজতত্ত্বের জ্ঞানও এতে সূচিত হয় না।

১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য তথ্যসম্মত নয় এবং ঐ ঘটনার তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি অমুখাবনে লেখকের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বিপত্তিকর। তিনি লিখেছেন: “অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিদ্রোহ আন্দোলনকে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সর্ব শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ যতই গভীর থাকুক না কেন, অসন্তোষ প্রকাশের মধ্যে তাহার ব্যাপকতা দেখা যায় নাই। আসলে তথাকথিত প্রায় নিরক্ষর মুষ্টিমেয় ‘সিপাহী’ ইহার উদ্বোধক ও প্ররোচক। ইহাদের সঙ্গে

যোগদান ক'রে একশ্রেণীর স্বভাব-স্ববৃত্ত জনতা। হুতরাং অতীতে তাহারা বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল বলিয়াই তাহাদিগকে মহিমাষিত করিয়া দেখিবার কারণ ঘটে না; অতীত বলিয়াই মুন্ধনেত্রে দেখা ঐতিহাসিকের ধর্ম হইতে পারে না। প্রমাণটি 'মুন্ধনেত্রে দেখা'র নয়, সিপাহী বিদ্রোহের তাৎপর্য ও পরবর্তী কালের ইতিহাসে তার প্রভাব বিচারের। সিপাহী বিদ্রোহ আপাত ব্যর্থ হলেও, ভারতে আত্মশক্তির সে একটা বিশাল জাগরণ রূপে এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতীক রূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ভিতর গুণামির দৃষ্টান্ত চিরকালই স্থলভ—কিন্তু ঐতিহাসিকের সামগ্রিক দৃষ্টিতে যখন বিপ্লবের ভূমিকা বা তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয় তখন গুণামির ঘটনাগুলি গৌন হয়ে পড়ে বা বিচারের মধ্যে স্থানই পায় না। লেখকের দৃষ্টি যে সত্যের প্রসাদ হতে বঞ্চিত তাঁর সঙ্কীর্ণ বিচারধারাই তার প্রমাণ।

সিপাহী-বিদ্রোহ সম্পর্কে লেখক খুবই ভিত্ত মস্তব্য করেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যাপী, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ইংরেজ যে নির্ভুর অত্যাচার সারা দেশে চালায় সেকথার সামান্যতম উল্লেখ করেই লেখক ইংরেজের নৃশংসতার কাহিনীর ওপর আবরণ টেনে দিয়েছেন এই বলে : “কিন্তু অতীতের এই বর্বরতার কাহিনী বিস্মৃতি সাগর হইতে মন্থন করিলে জাতিবৈরী উদ্ভিস্ক হইবে—তাহার দ্বারা মৈত্রী ভাবনা প্রসাধিত হইবে না।” (পৃ: ৩০) ইতিহাসবিচারে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ অচল ও অবাস্তব, কেননা তথ্য আনন্দ বা বেদনাদায়ক যাই হোক না কোন, ঐতিহাসিক তাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। ব্রিটিশ জাতির সঙ্গে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে মৈত্রী রক্ষার স্বার্থে ঐতিহাসিক তথ্যকে অবলীলাক্রমে চাপা দেওয়ার এই প্রয়াস উদ্দেশ্যপরায়ণ বা অভিসন্ধিমূলক ইতিহাস-রচনার পক্ষে অমুকুল হতে পারে, কিন্তু সত্যনিষ্ঠ তথ্যনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণসম্মত ইতিহাস রচনাকে ব্যাহত করে।

বস্তুতঃ লেখক শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দোপাধ্যায় ইতিহাস-বিচারের পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রিক বা স্বচ্ছ দৃষ্টি লাভ করেননি, তিনি একটা বিশেষ মতবাদ ও একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সমর্থিত বক্তব্য প্রচার করতে এত বেশি আগ্রহী যে ঐ মতবাদ বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে সব তথ্য সহায়ক নয় তিনি সেগুলিকে বিকৃত ভাবে উপস্থাপিত করতেও ইতস্ততঃ করেননি। ভারতবর্ষের নবজাগরণ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনার বিকাশ এবং সগা জনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্ম ও আন্দোলনের অভ্যুদয়ে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের অবদান ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তিনি বহু পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসও লিখেছেন সবিস্তারে, কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আন্দোলন সম্পর্কে অতিশয় অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে ৬ লাইনের মধ্যে তাঁর সমস্ত বক্তব্য পেশ করেছেন। এই বক্তব্যটিও অতিশয় আপত্তিকর, কেননা তা তথ্য ও যুক্তিসম্মত নয় তিনি লিখেছেন ; “বিবেকানন্দ ব্রাহ্মসমাজের ও খ্রীষ্টান মিশনারীদের আদর্শ গ্রহণ করিয়া ‘রামকৃষ্ণমিশন’ স্থাপন করিলেন। এখানে শাস্ত্রের অথোরিটি, গুরুর বাণী প্রভৃতি ভক্তদের পথের সম্বল হইল; যুক্তি নহে, তর্ক নহে, সাংবিধানিক ডিমক্রেসি নহে—বেদ, কোরান, বাইবেল, গ্রন্থসাহেবের স্তায় ‘কথামৃতের’ ও স্বামীজির রচনার অথোরিটি মানিয়া সজ্ঞানির্দেশে কার্য করায় তাহারা সার্বক-জীবন লাভ করে।” (পৃ: ৬৩) এই ‘তাহারা’ কারা? লেখক তা উল্লেখ করেন। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে বিবেকানন্দের ভূমিকা ও অবদান বিচারের এ কোন নমুনা লেখক স্থাপন করলেন? এই ইতিহাসের বিচার-পদ্ধতি কি আমাদের যেনে নিতে হবে? এই কয়টি ছত্রে ব্রাহ্ম লেখকের যে গাঢ়দাহ, পরশ্রীকান্তরতা ও সঙ্কীর্ণচিত্ততা অত্যুগ্র রূপে প্রকট হয়ে পড়েছে—বস্তুতঃ সমগ্র গ্রন্থখানিই তদ্বারা পীড়িত। দৃষ্টান্ত বাড়ান দরকার দেখিনা। কেবল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী অধিনায়ক নেতাজী স্বভাষচন্দ্রের

ভূমিকা ও কর্ণের যে মূল্যায়ন লেখক করেছেন আমরা সেটুকু উদ্ধৃত করব এবং লেখকের দাসহুলভ মনোধর্মের যে পরিচয় তাতে উদ্ঘাটিত হয়েছে তাকে ধিক্কার আনিয়ে এই আলোচনা শেষ করব। তিনি লিখেছেন: “হিটলার যেভাবে সমস্ত পোর্টফোলিওগুলি নিজের হাতে রাখিয়া সর্বনিয়ন্ত্রণের কাজ করিতেছিলেন, স্বভাষও সেই নীতি অবলম্বন করিয়া “নেতাজী পদ প্রাপ্ত হইলেন।” (পৃ: ৩০১) এবং “স্বভাষচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে তিনি জাপানীদের সহায়তায় ভারত উদ্ধার করিবেন।... স্বভাষচন্দ্র ইতিহাসের ছাত্র এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি-অভিজ্ঞ, তিনি কী করিয়া ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, যে-জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া গত পাঁচ বৎসর চীনের উপর পাশাবিক দৌরাণ্য্য করিতেছে, জাপানের সেই লুপ্ত রণকানী দল... ব্রিটিশদের হাত হইতে ভারত উদ্ধার করিয়া স্বভাষচন্দ্রের হাতে উহা সমর্পণ করিয়া দেশত্যাগ করিবে!... সাম্রাজ্য লোলুপ রাজনীতিজ্ঞরা এমন বৈদান্তিক নহেন যে, যে-দেশ রক্ত দিয়া অর্থ দিয়া জয় করিবে—তাহা অপরকে ভোগের জন্ত ছাড়িয়া দিয়া আসিবে।” (পৃ: ৩০২-৩০৩) ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান ও ভূমিকার এমন অপূর্ব বিচার ও মূল্যায়ন কোনো ইংরেজের লেখা গ্রন্থেও দেখিনি। শ্রীপ্রভাত কুমারের এই পংক্তিগুলি রচনার পিছনে উদ্দেশ্য কী ছিল? জহরলাল নেহরুকে খুশি করা? কেননা এর পরেই তিনি লিখেছেন যে বন্দী আজাদ হিন্দ সৈনিকরা জহরলালের ব্যারিষ্টারি-নিপুণতার ফলেই মুক্তিলাভ করেছিল। ১৯৪৬ সালে সারা দেশে আই এন এর সমর্থনে যে উত্তাল গণ-আন্দোলন হয়েছিল সেকথা বা আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের কৃতিত্বের কথা লেখক বেমানাম চোখে গেছেন। এই সকল তথ্য গোপন, বিকৃত তথ্য পরিবেশন ও অভিসন্ধিমূলক পক্ষপাতিত্বের কারণে বইখানি ইতিহাসগ্রন্থ রূপে স্বীকৃতি লাভের অধিকার হারিয়েছে।—

পবিত্রকুমার বোষ

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্ত

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ৯৫০। ষাণ্মাসিক ৪৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্ত

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিকার হরকে ফুলফ্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।
৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ-যোগিতার জন্ত আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান

কলিকাতা-৪৭

[১৬৬ পৃষ্ঠার পর]

পূর্ব পাশে পুলিশের পেছন দিক থেকে ৩০০।৪০০ লোকের একটি মিছিল আসে। বং, বোরল ও লাল পাটির অন্ত্যন্ত নেতারা পেছন থেকে তীর ধুক চালাতে আরম্ভ করে। ফলে পুলিশের গুলিতে ৭ জন মহিলা ও একটি শিশু মারা যায় ও আহত হয় সাংঘর্ষের মেয়েরা।

পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের হিসাব নিলে দেখা যায় যে অবিকাংশ ক্ষেত্রে ‘লাল নেতারা’ মেয়েদের এগিয়ে দিয়ে নিজেরা পিছনে রয়েছে। মেয়েরা মিহত হলে রাজ-নৈতিক প্রচারের সুবিধা হবে—এই উদ্দেশ্যেই লাল নেতারা এই কাজ করেছে।

মার পিট ও কয়েকটি হত্যা এবং বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা তো অনেক ঘটেছে—এমন কি মেয়েদের উপরে পাশবিক অত্যাচারের ঘটনাও হয়েছে বলে রিপোর্ট পাওয়া যায়। নেপালী গণেশ বাহাদুরের স্ত্রী মাইলি লোহারণী অশ্রুবিগলিত চোখে আর্তকণ্ঠে সমাজবাদী নেতাদের কাছে বিব্রল কণ্ঠে নাম করে বলে কারা তার ‘ইজ্জত নষ্ট’ করেছে। শুধু পাশবিক অত্যাচার করেই এই পত্তরা দ্রাস্ত হয়নি। স্রীমতী মাইলির উপরে যে বর্বর অত্যাচার করেছে তা লেখা বা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন।

ভূমিহীন কৃষক না জোতদারের লড়াই

মন্ত্রীসভার নির্দেশে শিলিগুড়ির সরকারী কর্তৃপক্ষ তথাকথিত ভূমিহীন কৃষাগ নেতাদের জমির মালিকানার একটি তথ্যিক হিসাব নেন। যারা জমি জবর দখলের কার্যক্রমে সর্বাংগে বেলি অগ্রণী এবং লাল পাটির বিশ্বস্ত নেতা তাদের ৬৯ জনের হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে এই ৬৯ জন লাল নেতার মধ্যে ২৯ জন ১২ থেকে ৪২ বিঘা জমির মালিক, ১৯ জনের জমির পরিমাণ ১০ বিঘা, ১৪ জন চা’ বাগানের শ্রমিক এবং মাত্র ৭ জন ভূমিহীন কৃষাগ।

আবাড় ৮

এই হিসাব সরকারী কর্মচারীরা মন্ত্রীসভার কাছে পেশ করেছে বলে শোনা যায়।

উপরের ৬৯ জন ছাড়া এই জমি দখলের আন্দোলনে যারা প্রথম শ্রেণীর নেতা এরূপ ৩১ জন নেতার জমির পরিমাণ উর্ধ্বে ৮৫ বিঘা এবং নিচে ৩৫ বিঘা। তিন জনের জমি ২৯ থেকে ৩৪ বিঘা। প্রথম শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে কদম মঞ্জিকের জমির পরিমাণ ৭৫ বিঘা, বিজু গুঁরাওয়ার ৬০ বিঘা, মণিলাল সিংহের ৮৫ বিঘা বলে সেখানকার গ্রামবাসীরা জানায়।

জোতদারদের জমি দখল করা হয়েছে দেখা ঠিক নয়। কৃষাগ সম্ভার ও কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য হলে বড় বড় জোতদাররাও রেছাই পেয়েছে, অত্যাধায় ভূমিহীন কৃষাগও রেছাই পায়নি, বহু ভূমিহীন কৃষাগ ও ছোট কৃষাগের বাড়ি লুট হয়েছে এবং তাদের বুড়াগঞ্জ, হাতিবিশা ও মনিরামপুর অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। খড়িবাড়ির ৭০ বিঘা জমির মালিক জোতদার পল্লব কুঞ্জর বাড়ি দুইবার আক্রমণ করে লুট করে জালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বাড়িটির খুব কাছেই রয়েছে বড় জোতদার হুরং সিংহের অক্ষত বাড়ি। হুরং সিংহের বাড়িতে হাত দেওয়া হয়নি কারণ এই জোতদার হালে লাল পার্টির সমর্থক হয়েছে। বস্তুত, পুলিশের নিক্রিয়তা এবং হামলাকারীদের একচ্ছত্র স্বাধীনতা দেখে অনেক জোতদার জমি দখলের আন্দোলনে যোগ দেয় একদিকে নিজেদের জোত রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং অছদিকে জবর দখল করে জমি বুদ্ধির উদ্দেশ্যে, তাদের মধ্যে অনেকে নিজেদের বন্দুক নিয়ে মিছিলেও হামলার সময় যোগ দেয়। স্থানীয় জনসাধারণ সমাজবাদী প্রতিনিধিদের কাছে এদের নাম ও পরিচয় জানাতে দ্বিধা বোধ করেনি। অগণিত ভূমিহীন কৃষাগ ও ছোট কৃষাগ, যাদের বাড়িঘর ও জিনিষপত্র লুট হয়েছে, যারা গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং যাদের ধান কেড়ে নেওয়া

ও জমি দখল করা হয়েছে তারা দলে দলে এসে সমাজবাদী প্রতিনিধিদের কাছে এই অভিযোগ জানিয়েছে। চা' বাগানের শ্রমিকরা যখন লুটতরাজ শুরু করে তখন দলে দলে ভূমিহীন, ছোট চাষী ও জোতদাররা কিষাণ সভার সভ্য হয়ে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করে।

এই জমি দখলের হামলায় যারা নেতৃত্ব করে তাদের কয়েকজন সামাজিক পরিচয়ে অপাংতেন। একজন লাল নেতার অত্যন্ত অসামাজিক বৃত্তি ছাড়াও, সে প্রজাসোত্তালিষ্ট পার্টি বর্জক বিভাড়িত এমন এক ব্যক্তি যে চা শ্রমিক ইউনিয়নের অর্থ আত্মসাৎয়ের দায়ে তিন বছর জেল খেটেছে।

জনতার বিরোধ ও প্রতিরোধ

জমি জবরদখলের হামলা শুরুতে হাতিঘিলা ও বুড়াগঞ্জে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার ফলে এই হামলা বিস্তৃতি লাভ করে এবং গোভে ও ভয়ে আরও অনেক লোক এই আন্দোলনে যোগ দেয়। কিছু সংখ্যক ভূমিহীন কিষাণ ভূমি পাওয়ার আশায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেও এই আন্দোলনে যোগ দেয়। কিন্তু ভূমিহীন কিষাণ, ছোট কিষাণ ইত্যাদির বাড়িঘর লুটপাট, জমি দখল, হত্যা, ডাকাতি এসব শুরু হলে জনমত এই তথাকথিত কিষাণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে চলে যায়। বস্তুত, নকশালবাড়ির আন্দোলনের পেছনে সেখানকার জনসাধারণের সামান্য সমর্থনও নেই। সাঁওতাল ছাড়া এই অঞ্চলের জনসাধারণ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ প্রকৃতির। প্রথম পর্যায়ে এরা ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু কান্দীদাওয়া অঞ্চলে প্রতিরোধ শুরু হওয়ার পরে এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। জনতা সাহস সঞ্চয় করে সংঘবদ্ধ হতে থাকে এবং জনতার প্রতিরোধের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই এই অঞ্চলে আশ্চর্যভাবে জমিদখল ও লুটতরাজের হামলা অনেক কমে যায়। পুলিশ যেখানে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল, অস্ত্র ধারণ ও যথেষ্টারারের একচ্ছত্র

একতিয়ার যেখানে ছিল একমাত্র লুটেরা ও হামলাকারীদের হাতে সেখানে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া জনসাধারণের পক্ষে এই সংঘবদ্ধ অরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার উপায় কি ছিল?

জনতার প্রতিরোধ আন্দোলনকে 'কিষাণ বনাম জোতদারের লড়াই' বলে প্রচার করার চেষ্টা করেছে সমভাবে দুই কমুনিষ্ট পার্টির লোকেরা। সম্পদ রায়কে তাই জোতদার বলে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। সম্পদ রায়দের দুই ভাইয়ের জমির পরিমাণ ৩৫ বিঘা। কমুনিষ্ট নেতাদের অনেকেরই জমির পরিমাণ এর চেয়ে অনেক বেশি।

জনতার কাছ থেকে এই লুটতরাজ ও জমি দখলের কমুনিষ্ট আন্দোলন যে কত বিচ্ছিন্ন এবং একগুপ কার্যক্রমের পেছনে যে জনসমর্থন নেই, এই অঞ্চলে সামান্য পর্যবেক্ষণেও তা বোঝা যায়। সমাজবাদী নেতাদের সম্বন্ধে বহু হাজার লোকের বিরাট মিছিলটা তার দৃষ্টান্ত বহন করে। কান্দীদাওয়া অঞ্চলে দলে দলে কিষাণরা এসে সমাজবাদী নেতাদের কাছে জানায় যে 'প্রাণরক্ষা ও জমি রক্ষার জন্য তারা ভয়ে লাল পার্টিতে নাম লিখিয়েছিল। এখন তারা সম্পদ রায়ের দলে যোগ দিয়েছে। কারণ সম্পদ রায়ই তাদের রক্ষা করতে পারে।'

নকশালবাড়ির কমুনিষ্ট লড়াই যে জন-সংযোগহীন একটি অত্যন্ত শিশু হৃদয় 'ইনফ্যান্টাইল অ্যাডভেঞ্চারিজম' মাত্র—একথা এখন অতি দ্রুত প্রমাণিত হচ্ছে। পুলিশ কিছুটা কার্যক্রম শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই কার্ডবোর্ডের কেজার যত 'লালদুর্গ' কবলে পড়ছে এবং মনোবল হারিয়ে দলে দলে এরা লাল পার্টি ছেড়ে যাচ্ছে।

নকশালবাড়ির উদ্দেশ্য রাজনৈতিক

নকশালবাড়ি এলাকার ভূমি-সমস্যা, তথাকথিত কিষাণ আন্দোলনের প্রকৃতি ও নেতৃত্বের চরিত্র বিশ্লেষণে এবং ওই

আন্দোলন থেকে বৃহত্তর জনতার বিচ্ছেদের তথ্য ও ঘটনাবলী বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে মূলত মুক্ত ফ্রন্ট সরকারের পুলিশনীতির স্বযোগ নিয়ে রাজনৈতিক উদ্বেগ সাধনের জন্মই এই নকশালবাড়ি অঞ্চলটি বেছে নিয়ে এই 'লাল লড়াই' শুরু করা হয়েছে। ভূমি-সমস্যা সমাধান করা যে কম্যুনিষ্ট পার্টির লক্ষ্য নয় সে কথার প্রমাণ পাওয়া যায় ভূমিবর্টন কমিটির সঙ্গে এই দলের অসহযোগিতায়। মুক্ত ফ্রন্ট সরকার ভূমিহীন কৃষাগণদের মধ্যে দ্রুত ভূমিবর্টনের জন্ম যে কমিটি গঠন করেছে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিরা সেই কমিটি কার্যত বয়কট করেছে।

ভূমিহীন কৃষাগণের সমস্যা সমাধান করা যদি মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির আশু লক্ষ্য হতো তা হলে সারা বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানের জন্য কোন ব্যাপক ভূমিবর্টন ও ভূমি-সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয় নি কেন? ২৫ একর জমি রাখার অধিকার নিয়ে যদি উদ্ভূত জমি বেশি পাওয়া না যায় তাহলে ২০ বা ১৫ একর জমি সিলিং করার আইন করতে বাধা কোথায়? বেনামী জমি উদ্ধারের জন্য আইন করা হচ্ছে না কেন? ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, হুগলী ইত্যাদি জেলায় ভূমিহীন কৃষাগণের সমস্যা নকশালবাড়ির কৃষাগণের চেয়ে শতগুণ বেশি, কিন্তু সেখানে আন্দোলন শুরু না হয়ে নকশালবাড়ি অঞ্চলে এই 'লাল লড়াই' শুরু হলো কেন? নকশালবাড়ির ভূমিহীন কৃষাগণরা চা বাগানে কাজ করার স্বযোগ পায়,—তবুও এরূপ কৃষাগণের সমস্যা মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টরা অগ্রাধিকার দিল কেন?

নিঃসংশয়ে একথা বলা যায় যে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের সংকেত ও সহযোগিতায় আদিপর্বে নকশালবাড়ির 'লাল লড়াই' শুরু হয়। কিন্তু নকশালবাড়ির

লুটতরাজ ও বর্বরতার ফলে এবং প্রবল নকশালবাড়ি বিরোধী জনমত গড়ে উঠায় নকশালবাড়ির দায়িত্ব মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি অস্বীকার করেছে বটে কিন্তু নকশালবাড়ির লুটেরা অ্যাডভেঞ্চারের নিন্দা করা হয়নি এবং এই লাল লড়াইয়ের নেতাদের দল থেকে বিতাড়িতও করা হয়নি। একদিকে মন্ত্রীস্বের সঙ্গে সহযোগিতা এবং অল্পদিকে জনমতের মোকাবিলা করার জন্য মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি নকশালবাড়ি সম্বন্ধে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানির নীতি গ্রহণ করেছে।

নকশালবাড়ির লাল নেতারা মাউ-গে-তুং ও লাল চীন সম্বন্ধে জনতাকে সচেতন করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করে চলেছে। লাল চীন ও মাউ-গে-তুং জিন্দাবাদ মেওয়া হচ্ছে এতিটি লাল আড্ডায়। লাল পতাকাও তাদের সদা-সঙ্গী। নেপালের কম্যুনিষ্ট পার্টির মাধ্যমে নকশালবাড়ির লাল নেতারা চীনের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন করেছে। নকশালবাড়ির গা ঘেঁষেই নেপাল। পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে যে কেউ সেখানে যেতে পারে। ঝাপা নামক স্থানে রয়েছে নেপাল কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি কর্মকেন্দ্র, যে ত্রিভুবন পথ তৈরী হচ্ছে তাও এই অঞ্চলের খুব কাছে। নেপালে বা পাকিস্তানে নকশালবাড়ির লাল নেতাদের চলে যাওয়া মোটেই অসাধ্য নয়। চীনের সঙ্গে পরোক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়েছে নকশালবাড়ির, প্রধানত নেপালের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত পাকিস্তানের পথে।

কেন নকশালবাড়ির এই কেন্দ্রটি বেছে

নেওয়া হয়েছে

নকশালবাড়ি, কাঁসীদাওয়া ও খড়িবাড়ি, এই তিনটি থানা নিয়ে সংকীর্ণ ফালির আকারে যে ষ্ট্র্যাটেজিক ভূমিটি রয়েছে এই ফালির প্রস্থ ৪ মাইল থেকে ১৫ মাইল মাত্র; এক পাশে নেপাল এবং অপর পাশে পাকিস্তান। এই ফালিটি দার্জিলিঙ,

সুলেখা
ঐতিহ্য

দেশে ও বিদেশে সমান প্রিয়...।

সুলেখা

ফাউন্টেন পেন-এর কালি

এই সব রঙে পাবেন :

ব্লু ব্ল্যাক • রয়্যাল ব্লু • ব্ল্যাক
রেড • গ্রীন • ভায়োলেট

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

PROGAMING SW-32 B

বিশ্বাবর্ত

গ্রাসবোরোর শীর্ষ বৈঠক

পশ্চিম এশীয় যুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘে কোসিগিন ইসরাইলের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করে আরবদের মধ্যে সোভিয়েট-বিরোধী মনোভাব কিছুটা শান্ত করবার চেষ্টা করে গত ২৩ জুন প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে গ্রাসবোরোর নিকটে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকের পূর্বেও কোসিগিনকে এই শীর্ষ বৈঠক বিরোধী মনোভাব দেখাতে হয়েছে। কারণ, তাঁর ভয় ছিল জনসনের সঙ্গে মিলিত হবার অভ্যুত্থানের সুযোগ নিয়ে চীন আরব-রাষ্ট্রগুলিকে সোভিয়েট-বিরোধী করে তুলবার সুযোগ না পায়, আরব ইসরাইলের দ্বন্দ্ব কোসিগিন জনসনের সঙ্গে আরব-বিরোধী রক্ষা করতে উন্মুখ এই প্রচার করে। বস্তুতপক্ষে কোসিগিনকে জনসনের সঙ্গে বৈঠকের আপাতবিরোধী এই পারতারা কষতে হয়েছে এই কারণেই; যাতে চীন আরব-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারের নূতন ভূমিকার সন্ধান না পায়। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে আরবদের অস্ত্রশস্ত্রে সাহায্য করে এবং সাময়িক সহায়তার আশ্বাস দেবার পর সোভিয়েতের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ও আরবরাষ্ট্র জোটের পরাজয়, আরবদের মধ্যে ভয়ঙ্কর সোভিয়েট-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে, তার সুযোগ নিয়ে চীনের আরও সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারের পথ বন্ধ করবার জন্তই কোসিগিন রাষ্ট্রসংঘে ছুটে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও গ্রাসবোরোর বৈঠক সম্বন্ধে আরবদের সংশয় ছিল, দুই প্রধানের শীর্ষ বৈঠকে আরব-ইসরায়েল দ্বন্দ্বের কোনো আরব-স্বার্থবিরোধী মীমাংসার ক্ষেত্র না এরা স্থির করে বলেন।

কিন্তু জনসন কিম্বা কোসিগিন দুজনের পক্ষেই এ-ধরণের ক্ষত্র বার করবার পক্ষে প্রবল অন্তরায় ছিল। জনসনের পক্ষে ইসরায়েলকে যুদ্ধে বিজিত এলাকা থেকে সরে যেতে বলাও যেমন বিপজ্জনক, সোভিয়েতের পক্ষেও আরবদের অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্য বন্ধ করা কিম্বা হ্রাস করে দেওয়াও তেমনি বিপজ্জনক। আরব-ইসরায়েল দ্বন্দ্বের কোনো স্থায়ী সমাধান-নিরপেক্ষ মার্কিনী প্রস্তাবে আমেরিকার শক্তিশালী ইচ্ছা-গোষ্ঠির ভোট জনসনের বিরুদ্ধে অনিবার্যভাবে সংহত হবে। সোভিয়েত রুশের পক্ষেও আরবদের অস্ত্র-সাহায্য হ্রাসের প্রস্তাব অসমীচীন।

কিন্তু এই জটিলতা সত্ত্বেও গ্রাসবোরোর বৈঠকে আরব-ইসরায়েল দ্বন্দ্ব, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আনবিক অস্ত্রের বিস্তৃতি বিরোধী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সোভিয়েট রুশ, ইসরায়েলের অস্তিত্ব স্বীকার করেও ভিয়েতনাম যুদ্ধের মীমাংসার উপর মার্কিন-রুশ সম্পর্কের উন্নতি এবং পৃথিবীর শান্তি নির্ভর করছে বলে মনে করে।' উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বিরতি সোভিয়েতের নিকট রুশ-মার্কিন সম্পর্কের উন্নয়নের নিম্নতম পূর্বসর্ত-দ্ব্যর্থহীনভাবে কোসিগিন এ-কথা জনসনকে জানিয়ে দিয়েছেন। গ্রাসবোরোর বৈঠকের বাস্তব পরিণতি, ওয়াশিংটন সাংবাদিক বৈঠকে কোসিগিনের উত্তরেও পরিষ্কার হয়ে গেছে। জনসন সোভিয়েতে গাঁদর স্বাগত পাবেন কি না একজন মার্কিনী সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে কোসিগিন বলেন "If aggression were ended and a truly peaceful policy pursued, the President would receive a very warm welcome indeed."

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের নীমাংসায় ভিয়েতনাম যুদ্ধের তাৎপর্য সম্পর্কে করাসী পরবর্তী সচিব কুতুভ মারভিলও ২২শে জুন রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ পরিষদে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের আলোচনা উপলক্ষ্যে সে কথাই বলেছেন : *We stress the world context is vital. So long as the war continues in Vietnam, peaceful prospects will not appear in the Middle East.* গ্রাসবোরোর শীর্ষ বৈঠকে এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

গ্রাসবোরোর আর একটি তাৎপর্য প্রেসিডেন্ট জনসনের মুখে শোনা গেছে, যখন ওয়াশিংটনে ২৬শে জুন তিনি বলেন এই আলোচনার পর পৃথিবীর বিপদ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে : *"a little less dangerous."* অর্থাৎ, বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে সাময়িক সংঘাতের উপস্থিতি বিশ্বসংঘাতে পরিণতি পাবে না—এ সম্বন্ধে দুইটি বৃহৎ শক্তিতে ঐক্যগত হয়েছে। সোভিয়েত রুশ ইসরায়েলকে তীব্রভাবে নিন্দা করেছে, ইসরায়েলের নিকট আরব এলাকা থেকে নিঃসর্ত সৈন্য অপসারণ দাবী করেছে আবার সেই সঙ্গে ইসরায়েলের অস্তিত্ব স্বীকার করেছে এবং আরব অঞ্চলে অস্ত্র সরবরাহের এবং অয়েজ ও আকাবা উপসাগর দিয়ে অবাধ যাতায়াতের প্রশ্ন ইসরায়েলী সেনাপসারণের পর বিবেচনা করতে প্রস্তুত আছে—গ্রাসবোরোতে এই সর্তের পুনরাবৃত্তি আরব-ইসরায়েল সমস্যাতে সংঘাতের ভূমি থেকে আলোচনার পরিসরে সীমিত করে এনেছে। এই সমস্যার সঙ্গে অবশ্য ভিয়েতনাম সঙ্কট যুক্ত হয়ে পশ্চিম এশিয়া ও ভিয়েতনাম সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু যে অভিন্ন, গ্রাসবোরো বৈঠক সে-সত্যকে সদরে টেনে আনলেও, গ্রাসবোরো পৃথিবীকে *'little less dangerous'* করেছে। অল্পসময়ের জন্ম হলেও, কোসিগিন-জনসন বৈঠকের তাৎপর্য এইখানে, একথা মানতেই হবে।

আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ বিরতি চুক্তির অবসরে অয়েজ

শীমাতে আবার প্রচণ্ড সংঘাত দেখা দিয়েছিল। কয়েকদিন যুদ্ধের পর অয়েজ এলাকায় গত ১৫ই জুলাই আবার যুদ্ধ-বিরতি দেখা দিয়েছে এবং রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষকদল অয়েজের উভয় তীরে ঘাঁটি স্থাপনের জন্ম আরব ও ইসরায়েলের সম্মতি পেয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষকদের শান্তি প্রচেষ্টা দীর্ঘস্থায়ী হবে কিনা সে-সম্পর্কে এখনই চূড়ান্তভাবে কিছু বলা যায় না। কারণ যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি অমুখ্যায়ী অয়েজ দিয়ে ইসরায়েল ও আরব উভয়পক্ষের জাহাজ চলাচলের ইসরায়েলী দাবীর উত্তরে আরব রাষ্ট্রজোটের পক্ষ থেকে গত ১৭ই জুলাই ঘোষণা করা হয়েছে যে অয়েজ দিয়ে ইসরায়েলী জাহাজের চলাচল যুদ্ধ-বিরতি চুক্তিকে লঙ্ঘন করবে। অতরাং কোনো ইসরায়েলী জাহাজ অয়েজ দিয়ে চলাচলের চেষ্টা করলে মিশরের গোলন্দাজরা তাদের উপর গুলি চালাবে।

১০ই জুলাই থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত শিখর, সিরিয়া, ইরাক ও আলজিরিয়া এই রাষ্ট্র চতুষ্টয়ের ইসরায়েলী যুদ্ধ সম্পর্কিত শীর্ষ বৈঠকের পর উপরোক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ইসরায়েলের দখল থেকে আরব এলাকা পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম স্থির করবার জন্মই এই বৈঠক বসেছিল। এই বৈঠকে এ সম্পর্কে কার্যক্রমের চূড়ান্ত রূপদান করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

অয়েজ এলাকায় সংঘাতের স্বত্রপাতে সোভিয়েত নৌবহর পোর্ট সৈয়দ ও আলেকজান্দ্রিয়া টহল দিয়ে নেড়িয়েছে। পোর্ট সৈয়দের এই যুদ্ধ এলাকায় সোভিয়েত নৌবহরের জাহাজগুলি কেন ঘোরাফেরা করছে এই প্রশ্নের উত্তরে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতবাসের পক্ষ থেকে বলা হয় : *"We are not quite on a pionió."* এদিকে গত যুদ্ধে মিশর প্রায় ৩০০ সোভিয়েত ফাইটার বিমান ও ৫০০ সোভিয়েত ট্যাঙ্ক খুইয়েছিল কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য পেয়ে এই ক্ষতিপূরণ করে নিয়েছে। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েতের

অকাতর সামরিক সাহায্য প্রেরণের জন্য শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২ই জুলাই বুদাপেটে সমাপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রুম্যানিয়া ব্যতীত পূর্ব ইউরোপের অপর ছয়টি রাষ্ট্রের দুই দিন ব্যাপী গোপন বৈঠকে আরব রাষ্ট্রগুলিকে সামরিক সাহায্য অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গত মাসে অনুষ্ঠিত মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট সংক্রান্ত মস্কো বৈঠকে রুম্যানিয়া ইসরায়েলকে আক্রমণকারী আখ্যাত করে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকার করেছে, কারণ রাষ্ট্রসংঘ ইসরায়েলকে আক্রমণকারীরূপে চিহ্নিত করে নাই।

এদিকে, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে গত ৪ঠা জুলাই ইসরায়েল সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। দুই-তৃতীয়াংশ ভোট না পাবার দরুণ কোনো প্রস্তাবই রাষ্ট্রসংঘে গৃহীত হয় নাই। এখানে সব চাইতে বিপর্যস্ত হয়েছে স্বয়ং কোসিগিন উপস্থাপিত ইসরায়েল সেনাবাহিনীর নিঃসর্ত্ত অপসারণ, তাকে আক্রমণকারীরূপে চিহ্নিত করা এবং আরবদের যুদ্ধের ক্ষমক্ষতিপূরণ করা সম্পর্কিত প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের প্রতি প্যারার উপর ভোট গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইসরায়েল-এর সৈন্য অপসারণ প্রস্তাব সম্পর্কিত প্যারার উপর প্রস্তাবের পক্ষে ৩৬ বিপক্ষে ৪৮ রাষ্ট্র ভোট দেয় এবং ২২টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। যুগোস্লাভিয়া এবং অন্য ১৬টি নন-এলাইনড রাষ্ট্রগোষ্ঠী ইসরায়েলকে আক্রমণকারীরূপে চিহ্নিত না করে শুধুমাত্র নিঃসর্ত্ত সৈন্য অপসারণের যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিল তার পক্ষে ৫৩, বিপক্ষে ৪৬ ভোট পড়ে এবং বিশটি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে।

সোভিয়েত রুশ এবং ফ্রান্স এই প্রস্তাবের পক্ষে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। কুড়িটি ল্যাটিন-আমেরিকান রাষ্ট্রগোষ্ঠীর প্রস্তাবও রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ পরিষদে বাতিল হয়ে যায়। এই প্রস্তাব ইসরায়েলী অপসারণ ও আরব-ইসরায়েল বৈরিতার মীমাংসা একই সঙ্গে

আলোচনার দাবী করে। এই প্রস্তাবের পক্ষে ৫৭; বিপক্ষে ৪৩টি রাষ্ট্র ভোট দেয় এবং কুড়িটি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাব সমর্থন করে।

কিন্তু জেরুজালেমের পুরাণো শহর অর্থাৎ জর্ডনীয় অংশ দখল করে ইসরায়েল জেরুজালেম শহরকে একীকরণ করে পার্লামেন্টে যে আইন পাশ করেছে সেই একীকরণ অসিদ্ধ ঘোষণা করে পাকিস্তানের সংশোধিত প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ৯৯-০ ভোটে গৃহীত হয়েছে। কুড়িটি রাষ্ট্র ভোট দানে বিরত থাকে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের মধ্যে অন্যতম। ইসরায়েল জেরুজালেম সংক্রান্ত রাষ্ট্র সংঘ পরিষদের প্রস্তাব স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, একথা তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। এই কারণে, রাষ্ট্রসংঘের পরিষদ ইতিমধ্যে ইসরায়েলকে সতর্ক করে দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স ও ইসরায়েলের জেরুজালেম একীকরণের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রসংঘ পরিষদে এই প্রস্তাবের উপর আয়েরিকার ভোটদানে বিরতি থেকেই বোঝা গেছে, ইসরায়েল এ সম্পর্কে অনমনীয় থাকবে।

রাষ্ট্র সংঘ পরিষদে ইসরায়েলী অপসারণের বিভিন্ন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার পর ইসরায়েলের দখল থেকে আরব এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্য অন্য পন্থা উদ্ভাবনের উদ্যোগের ক্রমবৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে উঠবে। মস্কোর বৈঠক, বুদাপেটের বৈঠক, গত ১১ই জুলাই জ্যাকব মালিকের 'জরুরী আলোচনার জন্য কায়রো এবং অন্যান্য আরব রাষ্ট্র সফর, গত ১০ই জুলাই দুইটি ক্ষেপণাস্রবাহক ও সাবমেরিনগহ ছয়টি সোভিয়েট নৌ জাহাজের আলেকজান্দ্রিয়া ও পোর্ট সৈয়দে উপস্থিতি, ইরাকের জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইসরায়েলী আক্রমণের গ্লানি অপসারণের জন্য সকল প্রকার সাহায্যের জন্য রুশ রাষ্ট্রপতি পদগরশির প্রতিশ্রুতি, কায়রোতে আরবপ্রধানদেব পৃথকভাবে এবং শীর্ষবৈঠকে মিলন এবং খার্তুমে আগামী শীর্ষ বৈঠক-এই ঘটনা-পরম্পরা নূতন

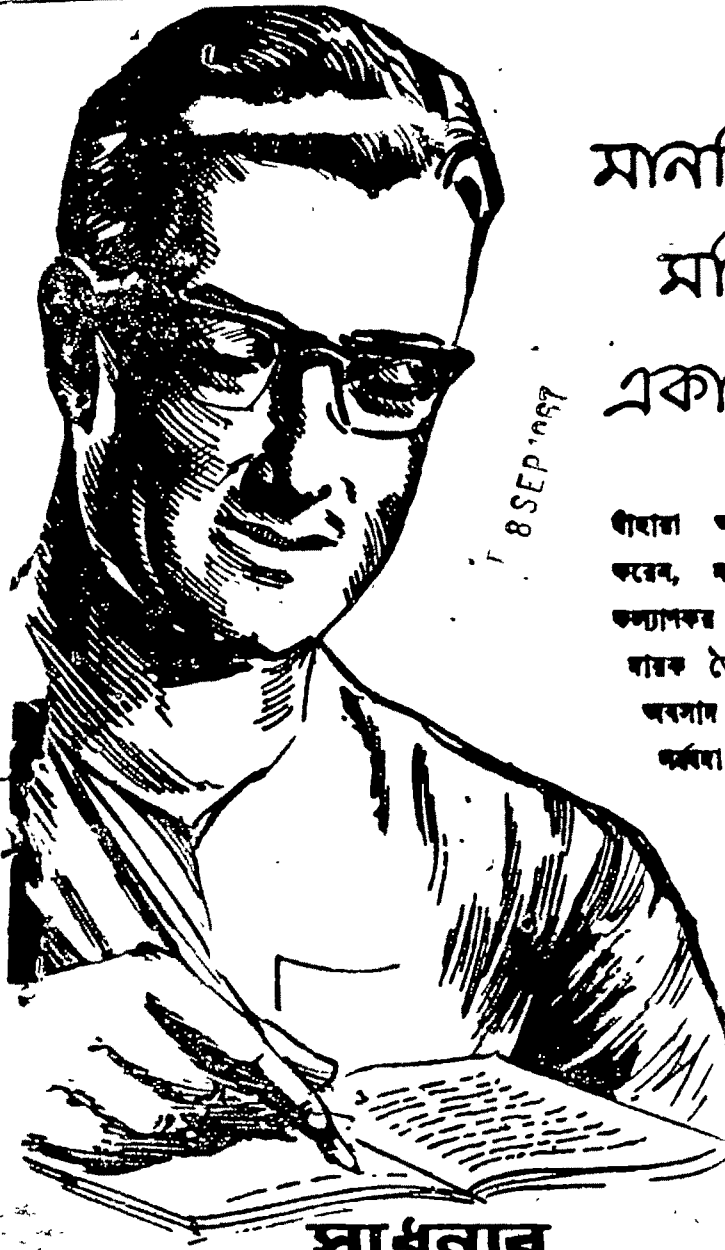
সংঘাতের জন্ত সোভিয়েতের সাহায্য নিয়ে আরব-প্রস্তুতির ইচ্ছিত বহন করছে। অপর পক্ষে ইসরায়েলও মধ্য এশিয়া সঙ্কটের সামগ্রিক সমাধান ব্যতীত কোনো প্রস্তাবেই সন্তুষ্ট হবে না। আরব এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তার প্রশ্ন একত্রে সমাধান হোলো ইসরায়েলের দাবী। ইসরায়েল অবশিষ্ট বিনাস্তে আরবগোষ্ঠির সঙ্গে আলোচনার পক্ষপাতী। গত ৩রা জুলাই ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী লেভি এস্কল "U. S. News & World Report" নামক পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কথাই বলেছেন: "Our objective should be to achieve a settlement." সেই সঙ্গে তিরায় প্রণালীর মধ্যদিয়ে সকল রাষ্ট্রের জাহাজের অবাধ চলাচলের দাবীও পুনরুত্থাপন করে এস্কল বলেন মিথ্যা আশ্বাসের পরিবর্তে দার্য এল লেখ থেকে সরে আসবার ইচ্ছা নেই: "no intention of withdrawing (from sha: m-el-sheik) return for empty promises." কোনো বৃহৎ-শক্তির হস্তক্ষেপের বাইরে ইসরায়েল আরব গোষ্ঠির সহিত মীমাংসার ক্ষমতা খুঁজে বার করতে প্রস্তুত থাকলেও আরবগোষ্ঠির সে প্রস্তাবে ঐ-পর্বন্ত সম্পৃষ্ট সম্মতি পাওয়া যায় নাই। আরব ইসরায়েল দ্বন্দ্বের মাক্কাধানে রুশ ও মার্কিন দ্বন্দ্বের জট ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছে। আরবগোষ্ঠির যেমন আক্রোশ ও আশঙ্কার লক্ষ্যস্থল আমেরিকা, তেমনি ইসরায়েলের আশঙ্কার লক্ষ্যস্থল সোভিয়েত রুশ। এই আশঙ্কাই প্রকাশ পেয়েছে গত ২২শে জুন তেল-আভিভ-এ ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল ডায়ানের বক্তব্যে। ডায়ান বলেছেন: বর্তমানে আমরা কেবলমাত্র মিশরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেই, পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তির অজ্ঞাতম, সোভিয়েট রুশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। ইসরায়েল শান্তি চায়; আরব এবং ইসরায়েল পরস্পর একটা সমঝোতার আসতে পারতো। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন তার অন্তরায়: --If it was left to us and the

Arabs, I believe we could work things out, but there is the Soviet Union."

লিউ সাও চি পদচ্যুত

গত ১লা জুলাই চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির ৪৬ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক বিপ্লববিরোধী মাও সে তুং-এর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এবং চীনের রাষ্ট্রপতি লিউ সাও চির উৎসাদনের সংবাদ ঘোষিত হয়েছে। চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা রেড ফ্লাগের সম্পাদকীয় ঘোষণায় সংবাদটি পরিবেশন করে বলা হয়েছে: We have got rid of a handful of Party people in authority taking the capitalist road.' পূর্জিবাদের পথচারীদের মধ্যে লিউ সাও চি ছাড়াও পার্টির সাধারণ সম্পাদক তেং সি আও পিং এবং প্রাক্তন প্রচার-প্রধান তাস চু-ও রয়েছেন। এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বহুদিন পর লিন পি আওকে মাও-এর স্থলবর্তীরূপে চিহ্নিত করে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। লিন পি আও-এর উচ্চস্তরের উন্নয়নের পাশাপাশি লিউ-এর অপরাধের তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে। লিউ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ; লিউ ১) কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সমগ্র জনসাধারণের পার্টিতে (Party of the entire people) পরিণত করতে চেয়েছে (২) অজ্ঞাত রাষ্ট্রনৈতিক দলের অভিঘের পক্ষপাতী। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল এই শারাস্কর শাস্তিগুলির মূলোচ্ছেদ। এ ছাড়া লিউ দিনমজুর খাটিয়ে শোষণের এবং বিপ্লবশীলী কৃষকদের পার্টির সদস্যপদে বহাল রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন।

মাও সে তুং এর সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘরের শত্রুকে পরাভূত করে পাশ্চবর্তী রাষ্ট্রসমূহে কি হারে বিস্তার লাভ করছে, সম্প্রতি বর্মায় ও নেপালে মাও সে তুং-এর প্রতিকৃতি সহ ব্যঙ্গ পরিধান করে এই দুই রাষ্ট্রের এক জেণীর যুবক দেশদ্রোহিতার পরিচয় দিয়ে তা সপ্রমাণ করেছে। ২৬/৭/৬৭



8 SEP 1957

মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন!

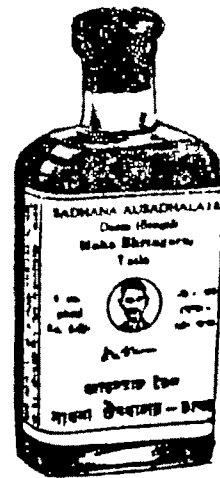
বীহার অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম
করে, মহাভুজরাজ তাঁহাদের পরম
কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-
দায়ক তৈল সর্বপ্রকার ক্লান্তি ও
অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে
পরিষ্কার প্রসন্ন ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনার মহা ভুজরাজ তৈল



সাহিত্য ঐশ্বর্যলাভ-ভাণ্ডার

সাহিত্য ঐশ্বর্যলাভ হোটে কলিকাতা-৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বোষ,

এম. বি. বি. এম. (কল্যাণ) বায়ুপেঁচাও

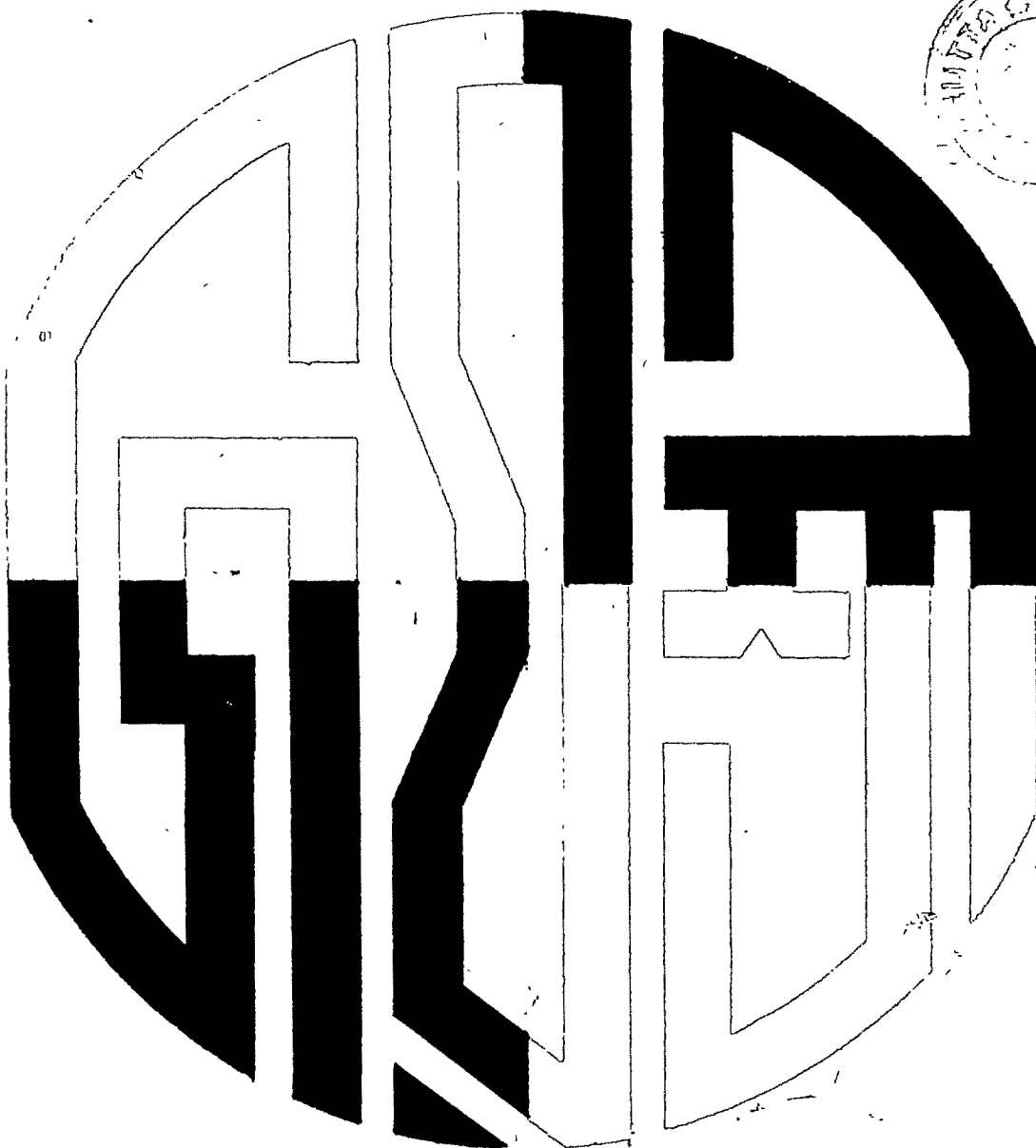
অধ্যক্ষ প্রিবোপেনচন্দ্র বোষ, এম. এ.

বায়ুপেঁচাও, এম. সি. এম. (পুস্তক) এম. সি. এম. (আনুষঙ্গিক)

কলকাতা কেন্দ্রের সন্ধান পাঠের দৃষ্টান্ত অধ্যাপক

Central Registration No 2870/57 Per Copy R.75P With Postage R.78P.

HAND OFFICE JAVASREE 300 Ganeshi Bagan, Naktala, Calcutta 47



সম্পাদিকা : নীলা রায়

[প্রাচীন-ভাষা] ১০৭৬
বিশ্বশ্রী-সংস্করণ



মন আজ
খুশিতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্ত
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্ত।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্ত সাধনার
অব্যর্থ মহোষধ প্রতিদিন আহারের পর -
দুইবার করে দু'চামচ ব্রুডসজ্জীবনীর সঙ্গে
চার চামচ মহাজোক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লন্ডন),
এম,সি,এস, (আমেরিকা), কালনাগুর
কলেজের বসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

বিদেশে আমাদের
বড়ো দশজন খরিদদার

যুক্তরাজ্য কানাডা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

পশ্চিম জার্মানী

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বেলজিয়াম
অষ্টেলিয়া

সুইডেন

ইল্যান্ড এবং

অন্যান্য দেশ

১৯৬৬ সালে

ভারতীয়-বাটার কাছ থেকে মোট

৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকার ডুতো

কিনেছেন **Bata**

শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২০৭
স্বভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক রচনা)	পবিত্রকুমার ঘোষ	২১৪
হায় II (প্রবন্ধ)	অনিল রায়	২২৩
ভারতে সংহতি-সাধনা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা		
(প্রবন্ধ) ত্রিপুরাশঙ্কর সেন		২৩১
পনেরই আগষ্ট ১৯৬৭ (কবিতা)	শান্তশীল দাস	২৩৭
এই দেশে আমি আসবো আবার		
(কবিতা) মনোরমা সিংহরায়		২৩৭
কলিকাতার বাসগৃহ (২)		
(প্রবন্ধ) নিরঞ্জন হালদার		২৩৯
দাঙ্গিলিং মাক্-ডোগ বৌদ্ধ মন্দির		
(কাহিনী) গোবিন্দ সেনগুপ্ত		২৪৭
স্বপ্নরবনে উইলিয়ম কেরি		
(ভ্রমণ কাহিনী) অর্ধদেব		২৫১
কণ্ঠ ভরা বিষ (ধারাবাহিক		
উপভ্রাস) মিহির মুখোপাধ্যায়		২৫৫
জল মাটি মন (ধারাবাহিক		
উপভ্রাস) মহীতোষ বিশ্বাস		২৬৩
পুণ্ডক পরিচয়	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭৩
বিশ্বাবর্ত		২৭৬

জন্মত্রী | শান্তদীপ্তা ১৩৭৪

কবিতা গুচ্ছ

মনীশ ঘটক, গোপাল ভৌমিক, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, রাম বসু, গো বি ন্দ মুখোপাধ্যায়, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, মানস রায়চৌধুরী, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, বাসুদেব দেব, হুর্গাদাস সরকার, শান্তশীল দাস, মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শান্তি লাহিড়ী শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ গুহ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সুশান্ত বসু ও আরো অনেকে।

*

মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হবে

*

কলিকাতার সব স্টলে পাওয়া যাবে

*

দাম : ২.৫০

সডাক : ৩.২৫

প্রচার সম্পাদক। জন্মত্রী

৩০৯ পাঙ্গুলিবাগান, কলিকাতা-৪৭।

দীপ্তি

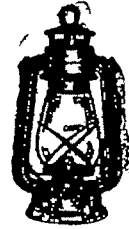
আপনার
নিত্য
প্রয়োজনে

দীপ্তি লণ্ডন—এর পরিচয় নিম্নরোজন,
এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে
আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর
কম কেরোসিন খরচ।

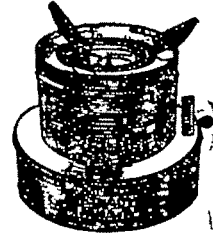
খাস জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য
প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ।
এই কেরোসিন ষ্টোভ ব্যবহারে কোন
ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে
সুন্দর, খরচে লাভান্বিত। অল্প সময়ে যে
কোন রান্না করা যায়।

‘দীপ্তি’ মার্কা এম্বায়েলেন্স বাসন—
অল্প বিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর
ভরের দ্বারা সমৃদ্ধ হচ্ছে।

দ্বি ওরিয়েন্টাল মোটাল
ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
৩৭ ও ১৭ বিপিন বিহারী পাড়ুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২



দীপ্তি লণ্ডন



খাস জনতা



এম্বায়েলেন্স বাসন

Reliance Industries

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.

THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.

NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.

THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS

BHARAT SUGAR MILLS Ltd.

GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

* * *

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

* * *

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,

159, Churchgate Reclamation,

BOMBAY — 1

জয় শ্রী

শান্তিনিকেতন : ১৩৭৪

সুভাষচন্দ্র

কোনও নাটক, কোনো কথাসাহিত্যিক বা রাজনৈতিক নেতার স্বকপোলকল্পিত কথার মালা নয়। একটি গভীর বিচিত্র জীবন অসুভবের সাধনা। লেখক সেই সাধনার সমাহিত। বাংলা তথা ভারতের মর্মবাণী কোন্ কণ্ঠে পুনরুজ্জীবিত হবে তার সন্ধান এই গ্রন্থে রয়েছে। ভারতের বিশেষভাবে বাঙ্গালীর পুনর্জাগরণে পবিত্র কুমার ঘোষ প্রণীত 'সুভাষচন্দ্র' অভূতপূর্ব ভূমিকা গ্রহণ করবে।

সাদা কালোয় দ্বন্দ্ব

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা (১) যে দেশ কথায় কথায় বিশ্ববাসীকে শোনায়, সেই অতি উন্নত ও সত্য (১) দেশেও সাদার কালোয় ঘৃণা, বর্ণের দ্বন্দ্ব হাস্তকর মনে হয়। আমেরিকা ও ব্রিটেন যদি অবিলম্বে তাদের অহমিকা ত্যাগ করে এই সমস্তার মূল উৎপাতন না করে, তাহলে আগামী দিনে তার কি ফল হবে উক্ত প্রবন্ধে তার হৃদিশ পাওয়া যাবে।

মার্কসবাদের বিবর্তন ও ভবিষ্যৎ

মার্কস' থেকে মাও পর্যন্ত সাম্যবাদের বিবর্তন এবং তার পরিণতি সম্পর্কে লিখছেন :
রাখাল দত্ত।

এছাড়া অর্থনীতি, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে ষাঁরা লিখবেন অমরদাশঙ্কর রায়, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন, রথীন্দ্রনাথ রায়, সচিন্তোষ ঘোষ, সুরভেন্দ্র ঘোষ, বেলা দত্ত গুপ্ত, অরিন্দম সেনগুপ্ত, নিরঞ্জন হালদার ও রাজর্ষি।

পত্র

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাশুভা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, শচীন্দ্রনাথ বসু, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, মিহির মুখোপাধ্যায় বিজনকুমার ঘোষ ও আরো অনেকে। দাম : দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা (সডাক ৩২৫)

প্রাপ্তিস্থান : প্রচার সম্পাদক। জয়শ্রী। ৩০৯, গাজুলি বাগান, কলিকাতা-৪৭

ডায়েরী



৩২ বর্ষ • চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা • গ্রীষ্ম-ভাদ্র ১৩৭৪

সম্পাদকীয়

আগষ্ট বিপ্লব

দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়, আগষ্ট বিপ্লবের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জাতীয়তার আবেগ ও আবেদন দেশের মানুষকে আর একবার আলোড়িত করে দিয়ে গেলো। প্রজাসোস্যালিস্ট পার্টি, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি এবং লোক সেবক সংস্থার যুক্ত উত্তোগে প্রবল-জল-ঝড়-কাদার মধ্যে কণকাতার ময়দানে অস্থিতিত বিপুল জনসমাবেশ আগষ্ট বিপ্লবের দুর্জয় আবেগের স্বাক্ষর রেখে গেছে। হিমু কালানী, মাতঙ্গিনী হাজরা প্রভৃতি শত শহীদদের আত্মদান ও লাঞ্ছনাবরণ স্মরণ করে সেদিন জাতি ধ্বস্ত হোলো।

আগষ্ট বিপ্লবের বেগবান জোয়ার স্বতঃস্ফূর্ত মহিমায় সমগ্র জাতির সংগ্রামী মানসকে সংহতরূপে অভিব্যক্ত করলেও, দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সর্বশেষ অধ্যায়ের মন্বন শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালে বিশ্ব যুদ্ধারম্ভের ছয় মাস পূর্বে, যেদিন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের শেষ হাশিয়ারী দিয়ে সর্বাঙ্গিক সংগ্রামের আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছিলেন নেতাজী স্বভাষচন্দ্র বসু। জাতীয় নেতৃত্ব সেদিন সে আহ্বান উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী সেনাবাহিনীর হাতে ইংরেজের দ্রুত ভাগ্যবিপর্যয় অবস্থার

পরিবর্তন এনে দিল। ইংরেজের বিপক্ষে জাতীয় স্বাধীনতার ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধিকারের দাবী নিয়ে সংগ্রাম শুরু করলে, ইংরেজ আরও বিপন্ন হবে, ক্যান্ডিষ্ট শক্তির জয়ের সম্ভাবনা স্বরাশিত হবে, এই যুক্তি দিয়ে জাতীয় নেতৃত্ব চূড়ান্ত সংগ্রামের দিনগুলি পিছিয়ে দিয়ে দেশের জনমানসে একদিকে যেমন পরাজিতের মানসিকতা সৃষ্টিতে সহায়তা করছিলেন, আর একদিকে নেতাজী স্বভাষচন্দ্র বসুর ঐতিহাসিক অন্তর্ধান, বিশেষ থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর সর্বাঙ্গিক সংগ্রামের আহ্বান, ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক চেতনাকে সংগ্রামমুখর করে তুলছিল। ১৯৪২-এর এপ্রিলে বর্গার পতনে, ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় নেতৃত্বের সামনে সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এবং জহরলাল প্রমুখ নেতাদের বিধাচিত্ততা সত্ত্বেও গান্ধীজী ১৯৪২-এর ৮ই আগষ্ট চূড়ান্ত সংগ্রামের আহ্বান দিলেন। অবশেষে দেশের অভ্যন্তরে নেতাজী স্বভাষচন্দ্র বসুর সংগ্রাম পরিকল্পনা স্বীকার করে নিয়ে জাতীয় নেতৃত্ব স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে বাঁপ দিলেন।

দুরন্ত অত্যাচার ও নিপোষণের সম্মুখে নেতৃত্বহীন সংগ্রাম হিংসা-অহিংসার সীমারেখা মুছে ফেলে উদ্বেল হয়ে উঠলো, শক্তির বশে অহিংসা স্থান করে দিলো বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের

জন্ম। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে সংগ্রামের মর্মমূলে ঐকান্তিক বিপ্লব প্রয়াস প্রতিষ্ঠা পেলেও, এই সংগ্রামে অহিংসার সীমারেখা লঙ্ঘিত হয়েছে, এই কারণে গান্ধীজী এই বৈপ্লবিক সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত হলেন। গান্ধীজীর অস্বীকৃতি সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সংগ্রামী মানসের উদ্বেলিত আকাজক্ষার মূর্ত প্রতীকরূপে জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে আগষ্ট বিপ্লব চিহ্নিত হয়ে আছে।

নেতাজী স্বভাষচন্দ্রের বিপ্লব প্রয়াস দেশের অভ্যন্তরে আগষ্ট বিপ্লবে পরিণতি পেলো এবং দেশের বাইরে আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই বিপ্লব প্রচেষ্টা সার্থকতা পেলো। কিন্তু দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে জাতীয় নেতৃত্ব এই সার্থক বিপ্লবকে ব্যর্থ বিপ্লবে রূপান্তরিত করেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস দেশবিভাগের মানি বহন করে চলেছে, আর তারই পাশাপাশি আগষ্ট বিপ্লবের অগ্নিগর্ভে ঐতিহ্য জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বাধীনতার বিপদের দিনে জাতীয়তাবাদীদের মরণপণ সংগ্রামে হাতছানি দেবে। সমসাময়িক ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে আগষ্ট বিপ্লবের ২৫ বছর পূর্তি বেগবান হয়ে দেখা দিয়েছে।

আগষ্ট বিপ্লব স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম হলেও শেষ বিপ্লব নয়। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র আর্থিক গণতন্ত্রের অবরোধ মোচনে সহায়ক হওয়া দূরে ব কথা, বিচলিত ভারতে আর্থিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি দানা বেঁধে উঠেছে গত বিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে। সুতরাং ভারতবর্ষের অবরুদ্ধ বিপ্লব গ্রহি-মোচনের অপেক্ষায় রয়েছে। আগষ্ট বিপ্লব ও আজাদ হিন্দের বিপ্লব তারই ইশারা বহন করে চলেছে।

শহীদ তর্পণ

ত্রিশ দশকের বিপ্লবীদের অচ্ছতম 'রাইটাস' বিল্ডিং-এর যুদ্ধের অগ্নিহোত্রে বীর বিপ্লবী শহীদ জয় বিনয়-দীনেশ-বাদল

জাতির জীবনে লোকোত্তর স্থান করে নিয়ে অমর হয়ে রয়েছেন। ১৯৩০-এর ৮ই ডিসেম্বরের সেই বৈপ্লবিক আঘাত ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের ভিত টলিয়ে দিয়েছিল। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হিংসা-অহিংসার তত্ত্ব, কংগ্রেসী সরকারের পোষকতায় সংগ্রাম ও আত্মপানের মূল্যায়নে বৈষম্য টেনে দিয়ে বিপ্লব প্রচেষ্টার দুর্জয় ঐতিহ্যকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রক্ষিপ্ত করে রাখতে প্রয়াসী ছিল। সংগ্রামের ইতিহাসের এই বিকৃত মূল্যায়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এবং বিপ্লব প্রচেষ্টা ভারতবর্ষের সংগ্রামের ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান করে নিয়েছে।

কিন্তু না কেন্দ্রে, না প্রদেশে কোনো সরকারী-স্তরে এই গৌরবময় স্বীকৃতি এযাবৎ অভিব্যক্ত হয়নি। পশ্চিম বাংলার অ-কংগ্রেসী সরকারই তার একমাত্র ব্যতিক্রম। গত ৯ই আগষ্ট রাইটাস' বিল্ডিং-এর অগ্নিদে বীর বিপ্লবীজয়-বিনয়-বাদল-দীনেশ-এর প্রতিকৃতি স্থাপনা করে এবং এই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাতর্পণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাতির ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

বাংলাদেশের তারুণ্যশক্তির প্রতীক এই বীর বিপ্লবীজয়ের অক্ষয় স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

খান্ড চাই, খান্ড নাই

পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি জেলার বিভিন্ন এলাকায় খান্ডসঙ্কট গুরুতর আকার ধারণ করেছে। চাল যেখানে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে দর অগ্নিমূল্য। উদ্ধৃত এলাকায়ও চালের দর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্ত্য এলাকায় চড়া দরেও চালের সরবরাহ অনিয়মিত। কোনো কোনো এলাকায় চালের সরবরাহ একেবারে বন্ধ। চালের যোগান যেখানে অনিয়মিত সেই সব অঞ্চলে গমের নিয়মিত সরবরাহ থাকলেও সঙ্কটের স্বরূপ এতো ভয়াবহ হোতো না। গমের সরবরাহও ঘাটতি এলাকা গুলিতে অনিয়মিত, কখনও একেবারে বন্ধ।

আমাদের বক্তব্য

আমাদের প্রিয় সম্পাদিকা কয়েকমাস পূর্বে গুরুতর সেরিব্রেল থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হলেও, তাঁর অসুস্থতার ফল থেকেই জয়ন্তীর পরিচালকবর্গ তাঁর চিকিৎসা ও অন্যান্য আনুশঙ্গিক বিষয়ে ব্যস্ত থাকায় জয়ন্তীর প্রকাশ গত তিন মাস যাবৎ অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে এমন এক ভয়ঙ্কর পৌঁচেছে যে এই সংখ্যাটি জয়ন্তীর প্রাণ-ভার যুক্ত সংখ্যারূপে বাধ্য হয়ে প্রকাশ করতে হল।

জয়ন্তীর গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা এবং অন্যান্য সহযোগীদের আমাদের এই অনন্তোপায় ক্রটি মার্জনা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের কাছে আর একটি নিবেদন করছি। তাঁদের ঠিকানা পরিবর্তন হলে, যথাসময়ে যেন আমাদের জানান। অন্ত্যায় পত্রিকা পুরানো ঠিকানা থেকে প্রায়ই ফেরৎ আসে এবং আমাদের পক্ষে এই সব গ্রাহকদের কাছে পত্রিকা পৌঁছানো সম্ভব হয় না।

পরিচালকবর্গ
জয়ন্তী

গমের সরবরাহ চালু থাকলেও ন্যূনতম সাপ্তাহিক বরাদ্দ ৫০০ গ্রামের—যা এমনিতেই প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য—সরবরাহও নিয়মিত পাওয়া যায় নাই। ফলে মানুষের মনে উদ্বেগ, আশঙ্কা, বঞ্চনার কোথ, ক্ষুধার তাড়না কোথাও কোথাও তাদের মরিয়া করে তুলে, নানা অবাঞ্ছিত খাতে তাদের পরিচালিত করে নিয়ে যাচ্ছে।

কিছু দিন যাবৎ শিয়ালদহ ও হাওড়া ডিভিশনের ট্রেনগুলির চলাচল খাতিয়ারীতে বিক্ষোভকারীদের অবরোধের ফলে হয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, না হয় অনিয়মিত হয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ট্রেনে যাত্রীদের মাশপত্র বিক্ষোভকারীদের পক্ষ

থেকে ভাঙা করা হয়েছে। ফলে যাত্রীসামগ্রিকের দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনার নদীরও রয়ে গেছে। সম্প্রতি খড়্গাপুর ষ্টেশনে উদ্ভিষ্টাবাসী যাত্রীদের উপর এই ধরনের বিক্ষোভকারীদের অত্যাচারের প্রতিবাদে কটকের ছাত্ররা সেখানকার ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে আন্তঃপ্রাদেশিক সংস্রবের পরিবেশ রচিত হতে চলেছিল। বঙ্গবজ্রের পেট্রল ডিপো থেকে কলকাতায় পেট্রল আসা-যাওয়ার পথে খাতিয়ার-বিক্ষোভকারীদের অবরোধ কলকাতায় পেট্রলের প্রায়-অভাব সৃষ্টি করেছিল। দমদমের বিমান ষাটিতে বিমানের জল তৈল সরবরাহ বন্ধেরও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ফলে বিমান চলাচল ব্যাহত হবার আশঙ্কা ছিল।

আরও মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। বিক্ষোভকারীদের রুদ্ধ আক্রোশ রেলের লাইন উৎপাটনে নিমুক্ত হয়েছে। ধান্য আক্রান্ত হয়েছে, দোকানপাট লুট হয়েছে, বাড়ীঘর পুড়েছে, ষ্টেশন আক্রান্ত হয়েছে, ষ্টেশনের ক্যাবিন কম পুড়েছে, পেট্রল পাম্প থেকে পেট্রল লুট হয়েছে এবং সেই পেট্রল দিয়ে আগুন লাগান হয়েছে। সম্প্রতি নবদ্বীপে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটেছে। সেখানে পুলিশ গুলি করেছে, গুলিতে লোক মরেছে, আহত হয়েছে, পুলিশের লোকও আহত হয়েছে। কারফিউ জারী করে বাইরে থেকে পুলিশ আমদানী করে অবস্থা কন্ট্রোল করতে হয়েছে। এই ধরনের ঘটনার পৌনঃপুনিক প্রকাশ আইন-শৃঙ্খলার দুর্বল সমস্তা সৃষ্টি করেছে। কেরালার ঘটনাও তাই।

পশ্চিম বাংলার জনসামগ্রিকের মূর্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক যুক্ত ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন থাকা সত্ত্বেও খাতিয়ার-গুরুতর আইন-শৃঙ্খলার সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। শাসন-ক্ষমতা গ্রহণের সময়ই এবার খাতিয়ার-গুরুতর সম্ভাবনা সম্পর্কে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার অবহিত ছিলেন। দীর্ঘ সময় নিয়ে যে নীতি তারা রচনা করলেন সে-নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হল, কারণ সংগ্রহের লক্ষ্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগও পূরণ

হোলো না। তাই পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যনীতি অভঃপর কেন্দ্র-নির্ভর খাদ্যনীতি হয়ে পড়লো। কেন্দ্রের সঙ্গে খাদ্য সরবরাহের টানাপোড়েনে যে পরিমাণ খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব কেন্দ্রে গ্রহণ করেছিল, সে দায়িত্ব তারা পালন করতে পারলো না। কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল প্রতি মাসে ৭৫০০০ টন-গম ও ১৫,০০০ টন চাল তারা দিয়ে যাবেন। জুলাই পর্বন্ত ৪৩,০০০ টন গম ও ৭০০০ টন চাউল সরবরাহ ঘাটতি রয়ে গেলো। কেন্দ্রের এই বার্থতা রাজ্য সরকারকে বিপন্ন করেছে। কেন্দ্রের কৈফিয়ৎ হচ্ছে খাদ্য বাড়ন্ত; এবার উৎপাদন কম, প্রকিওরমেন্ট কম, বিদেশ থেকে আমদানী কম। তার উপর পরিবহনের অর্ধ ব্যবস্থার অভাবও সাময়িক ঘাটতির সৃষ্টি করেছে।

বর্তমান সঙ্কটের জন্ত কেন্দ্রের অনস্বীকার্য দায়িত্ব রয়েছে। বিশ বছরের শাসন-ব্যবস্থায়ও খাদ্য স্বয়ং-সম্পূর্ণতার বার্থতা, আমদানী-নির্ভরতা এবং আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতির অসাফল্যের জন্ত কংগ্রেসের খাদ্য-নীতি, প্রশাসনিক নীতি ও মূল্যনীতি দায়ী। সেদিক থেকে রাজ্যে রাজ্যে যেমন কংগ্রেস অপসারিত হয়েছে কেন্দ্রেও কংগ্রেস শাসন অপসারিত কবে নূতন রাজনৈতিক চেতনায় জনমানসকে উদ্বুদ্ধ করার জন্ত সর্বদা সক্রিয় থাকতে হবে। সেখানে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রাজ্যসরকার কি সঙ্কটের জন্ত কেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে এবং কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রবাহিত করে কর্তব্য সম্পাদন করবেন? কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সঙ্কট বিক্ষোভের বহিঃ প্রকাশের প্রয়োজন রয়েছে। আগষ্ট মাসে কেন্দ্র ৯৫,০০০ টন খাদ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আরও বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরও ১০,০০০ টন গম সরবরাহের অনিবার্যতা জানানো সত্ত্বেও কেন্দ্র এ-বিষয়ে কোনো নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নাই। এর পর পশ্চিম বঙ্গ ক্যাবিনেটের পক্ষ থেকে প্রধান মন্ত্রীর

বাড়ীর সম্মুখে মন্ত্রীরা ধর্না দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই ধর্নার প্রস্তাব হমকি মাত্র না কার্যত প্রয়োগের জন্তই এটা গ্রহীত হয়েছিল সে বিতর্কে না গিয়ে দেখা যাচ্ছে তারপরই প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর অমুরোধে এ-মাসে ৯৫,০০০ টনের চাইতেও বেশী খাদ্যশস্য সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছেন এবং উড়িষ্যা থেকে ১০,০০০ টন ও কলকাতার বন্দরে আহাজ থেকে ৫০০০ টন চাল দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী দিল্লীর কর্তাদের কাছে থেকে এই মাসে ৯৫,০০০ টনের বেশী খাদ্য দেবার প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারেন নাই। অতরাং যারা বিনা হমকিতে নাথ্য কথা মানতে অনিচ্ছুক, তারাই হমকির কাছে নতি স্বীকার করে, হমকির রেওয়াজ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছেন। হমকির ভাষা ছাড়া অল্প ভাষা তাদের মর্মে পৌঁছায় না।

কিন্তু যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের এই পরিস্থিতিতে দায়িত্ব রয়েছে। তাঁদের ভাবতে হবে তাঁরা কি চান সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গুরুতর আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা সৃষ্টি হউক, সেই সমস্যা তাঁদের ভিতর কাঁপিয়ে দেবে। না, তাঁরা চান বিক্ষোভের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জনমানসের আস্থার কেন্দ্রবিন্দুর ভূমিকায় নিজেদের স্থাপিত করবেন। বর্তমান খাদ্যসঙ্কট যুক্তফ্রন্ট সরকারের সামনে সে অযোগ্য এনে দিয়েছিল, যে অযোগ্যের সংহত ঐক্যবদ্ধ এবং দৃঢ়পণ ব্যবহারে তাঁরা পশ্চিম বাংলার জাতীয় মানসের বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ণতম কেন্দ্রবিন্দুতে স্বীকৃতি লাভ করতেন। কিন্তু সে অযোগ্য তাঁরা গ্রহণ করেন নি। যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন মংশ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ, সন্দেহ ও সমালোচনা করে জনমানসের আস্থার বিধাগ্রস্ততা এনেছেন। ঐকান্তিক একাগ্রতা নিয়ে চাল সংগ্রহ, গজুতদার দমন, খাদ্য চলাচলের পথ বিঘ্নকারীদের কঠোর হস্তে শাসন এবং বঞ্চনার সমবর্তনের বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে অযোগ্যের মধ্যেও বিফল জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিতে পারতেন।

কিন্তু সরকারের অংশীদারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক কৰ্তব্যসাধনের চাইতে অন্তিম লক্ষ্যসাধনের প্রবণতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ঐকান্তিক নির্ধারণ ও কর্মসাধনার ঐচ্ছল্যকে হানি করে দিয়েছে। পশ্চিম বাঙ্গলার খাণ্ডসফট শোচনীয়, কিন্তু এই ট্রাজেডিও কম নয়। প্রধান মন্ত্রীর দরজায় ধর্গার হুমকি দিয়ে কিছু অতিরিক্ত খাদ্য পাওয়া গেলেও, এই ট্রাজেডির উত্তরণ হবে না। কেননা আরও দুর্বোধ্য ঘনিমে আসবে, যে সময় এই ট্রাজেডির উত্তরণ ব্যতীত সেই দুর্বোধ্যের মোকাবিলা করা যাবে না।

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীসভা খাণ্ডের দাবীতে প্রধানমন্ত্রীর দরজায় ধর্গা দেবার এক অভিনব সিদ্ধান্ত নিয়ে চমক সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন। কেন্দ্রের অযোগ্যতা তো রয়েছেই, নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢাকবার জন্ত তাদের এই বার্থ প্রয়াস। যে মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী ও খাণ্ডমন্ত্রী মাত্র কয়েকদিন পূর্বে দিল্লীতে এসে খাণ্ডের দাবী নিয়ে আলোচনা করে গেছেন, সেই মন্ত্রীসভারই আরো মন্ত্রী এসে প্রয়োজন হলে প্রধান মন্ত্রীর ও খাণ্ডমন্ত্রীর সঙ্গে পুনরায় আলোচনা করে যেতে পারতেন। কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে এই দায়িত্বহীন আচরণ সর্বস্তরে যে দায়িত্বহীনতাকে প্ররোচিত করবে তা থেকে এই মন্ত্রীসভাও ভবিষ্যতে রেহাই পাবে না।

প্রধানমন্ত্রী শেষপর্যন্ত পশ্চিম বাংলার ছয়জন মন্ত্রীকে ধর্গা দেবার দায়িত্বহীনতা থেকে রেহাই দিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মূলতঃ সেই প্রতিশ্রুতিতে মুখ্যমন্ত্রী ও খাণ্ডমন্ত্রীর নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির চাইতে নূতন কিছু নেই। তা সত্ত্বেও ধর্গা অভিযানের ছয়মন্ত্রীকে ধম্মবাদ তারা ধর্গা প্রত্যাহার করে নেন।

কিন্তু তারপরও ২৪শে হরতাল বহাল রেখে যুক্তফ্রন্ট চূড়ান্ত অর্বাচীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ হরতাল কার বিরুদ্ধে? কেন এই হরতাল! মজুতদার ও চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে নাকি এই হরতাল! যে সরকারের হাতে চোরা-

কারবারীদের দমনের সকল রকম হাতিয়ার রয়েছে, সেই সরকারের পৃষ্ঠপোষক দলগুলি মজুতদারদের বিরুদ্ধে হরতাল ডেকে শুধু যে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ক্লেশ বৃদ্ধি করেছেন তা নয়, শুধু যে কোটি কোটি টাকার জাতীয় আয়ের ক্ষতিসাধন করেছেন তা নয়, শত্রু চলাচলে বিঘ্ন ঘটিয়ে মজুতদারদেরই সহায়তা করে খাণ্ডসফট ঘনীভূত করেছেন তা নয়, যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধেই অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। কাণ্ডজ্ঞানহীন ও অর্বাচীনতা আর কাকে বলে! হরতালের দিন প্রেসের গতিবিধি বন্ধ করে যুক্তফ্রন্ট অন্তত একদিনের জন্ত পশ্চিম বাংলাকে একটি ক্যান্সিস দেশে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। যুদ্ধের সময়ও যুদ্ধের সংবাদদাতাদের সংবাদ সংগ্রহের জন্ত রণাঙ্গনে যাবার অবাধ অধিকার থাকে। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের হরতালে প্রেস এই গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হোলো। যুক্তফ্রন্টকে সাধারণ মানুষ সমর্থন করেছে সত্য। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের অর্বাচীনতা ও যথেষ্টাচার জনসাধারণ নিশ্চয়ই বরদাস্ত করবে না। হরতালের সার্থকতায় আল্পপ্রসাদে মসগুল হয়ে যুক্তফ্রন্টের শরিকেরা যেন একথা না ভুলে যান।

চালের হিসাব

কেন্দ্রীয় সরকার চালের হিসাব দিয়ে বলছেন, আগামী ছ মাস ঘাটতি আরও তীব্র হবে। তাছাড়া এবার মাথা পিছু চালের পরিমাণ একেবারে কমে গেছে। কারণ উৎপাদনে, প্রকিওরমেন্টে, আমদানীতে ঘাটতি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ১৯৬৬-৬৭ সালে শস্ত্রের উৎপাদন ৭ কোটি ৬০ লক্ষ, তাদের মধ্যে চাল ৩ কোটি ১০ লক্ষ। ১৯৬৫-৬৬ সালের চাইতে এবারকার উৎপাদন বেশী, সেবার ছিল ৩ কোটি ৬ লক্ষ টন। আর ১৯৬৪-৬৫ সনে রেকর্ড উৎপাদন হয়েছিল ৩ কোটি ১০ লক্ষ টন।

প্রকিউরমেন্টের হিসাব ১৯৬৫-৬৬তে ২১ লক্ষ টন, আর ১৯৬৬-৬৭-এ ২২ লক্ষ টন। আমদানীর হিসাব আরও

করণ। গত বছরের ৭৮৬,০০০ টনের তুলনায় এ-বাৎ এবার ২০০,০০০ টন আমদানী হয়েছে—১৯৮৬-৮৭ উৎপাদনের রেকর্ড সঙ্গেও সেবার ৭৮৩,০০০ টন আমদানী হয়েছিল। ১৯৬৫-৬৬তে উৎপাদন হ্রাস পেলেও পূর্ব বছরের উদ্ভূত, প্রকিওরমেন্টের তীব্রতা এবং আমদানীর পরিমাণ প্রয়োজন মেটাতে পেরেছিল। এবার উদ্ভূত নাই, কৃষকরা প্রকিওরমেন্টে পুরো সায় দেয় নাই, আগামী দিনে খরার ভয়ে তারা সব শস্য হাতছাড়া করে নাই। সারা পৃথিবীতে চালের ঘাটতি হুতরাং আমদানী কম। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বছরে শতকরা ২.৫ ভাগ।

কেন্দ্রীয় সরকারের ১৪ লক্ষ টন চাল দেবার দায়িত্ব রয়েছে। প্রধানত পশ্চিম বাংলা, কেরালা, লক্ষ্মী কাম্বীর এবং সামরিক বাহিনীর জন্য এই চাল বরাদ্দ রয়েছে। এই ১৪ লক্ষ টনের মধ্যে ৯ লক্ষ টন অরু, পাঞ্জাব, হরিয়ানা আর উড়িষ্যা থেকে সংগৃহীত হবে—অর্ধেক ৬ লক্ষ টন, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা ২ লক্ষ টন, উড়িষ্যা এক লক্ষ—অবশিষ্ট ৫ লক্ষ টন আমদানী করা হবে। এর মধ্যে অরু ৫ লক্ষ টনের বেশী সরবরাহে অসামর্থ্য জানিয়েছে এবং আমদানীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ টন। উৎপাদন ও প্রকিওরমেন্টে ঘাটতির কৈফিয়ত রূপে হিসেব দিলেই হবে না। এই দুই দিকে পরিমাণের অঙ্ক বৃদ্ধি করার ব্যর্থতা, কেন্দ্রীয় সরকারেরও রয়েছে। সারা ভারতবর্ষে একটি খাদ্যঞ্চল গঠন খাদ্যসম্পত্তা সমাধানে অবশ্য কর্তব্য। প্রকিওরমেন্টের দায়িত্ব তখন আরও বাস্তব রূপ নেবে। উৎপাদনের ব্যর্থতা দূর করবার সরকারী উদ্যোগের ফাঁক ও ফাঁকিগুলি পূরণ না করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে লোক ভুগানো যাবে না।

মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস সরকারের পতন

মধ্য প্রদেশের কংগ্রেস সরকারের আসন্ন পতন সম্পর্কে অনুমান সত্যে পরিণত হয়েছে। শিক্ষাবিভাগের বাজেট

বরাদ্দের প্রস্তাবে গত ২৯ শে জুলাই মিশ্র মন্ত্রীসভার ১৬৭-১৫৩ ভোটে পরাজয়ের পরই মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। ৩৬ জন কংগ্রেস সদস্যের কংগ্রেস ত্যাগ করে বিরোধীদলে যোগ দেবার ফলেই মিশ্র মন্ত্রী সভার পতন সম্ভব হয়েছে। এই সংখ্যা ৪৪-এ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংযুক্ত বিধায়ক দলের সদস্য সংখ্যা ১৬৬।

যদিও গোয়ালিয়রের রাজমাতার ব্যক্তিত্ব, প্রভাব ও প্রতিপত্তির জন্য মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসভার অপসারণ সম্ভব হয়েছে, কংগ্রেসত্যাগীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ সিংহ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এবং রাজমাতা বিধায়কদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের নূতন মন্ত্রীসভা ৩১ জন মন্ত্রী নিয়ে কাজ আরম্ভ করে কংগ্রেস-বিরোধীদের পক্ষে সন্দেহাঙ্ক স্থাপন করতে পারেন নাই। গোবিন্দনারায়ণ সিংহের ৪৫ জন কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে ১০ জন মন্ত্রী, জনসংখ্যার ৬৫ জনের মধ্যে পাঁচজন মন্ত্রী ও রাজমাতার ক্রান্তিকারী দলের ৩৬ জনের মধ্যে ৪ জন মন্ত্রী মধ্যপ্রদেশ নূতন মন্ত্রীসভার শক্তির পরিচায়ক নয়। এ-ছাড়া সংযুক্ত শোয়ালিষ্ট দলও মন্ত্রীসভায় যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে; পি, এস, পি যোগ দিচ্ছে না। হুতরাং, মন্ত্রীসভার আরও কলেবর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মন্ত্রীসভার সব চাইতে দুর্বলতা হোলো কংগ্রেসত্যাগীদের মন্ত্রীসভায় এতো বেশী আসন নেব দাবী। মন্ত্রীদের ও ক্ষমতার টানাপোড়েনে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়ে নূতন পরিস্থিতিতে সেই টানাপোড়েন দিয়েই যদি যাত্রা স্বরূপ হয়, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসভার মধ্যে সেই লক্ষণ গোড়াতেই ফুটে উঠেছে। রাজমাতার নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব এই টানাপোড়েনে যে পরিমাণে স্তব্ধ করতে পারবে, মন্ত্রীসভার স্থায়িত্ব সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব।
গজেন্দ্রগদকর কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির এবং দুই বছর পর অথবা ব্যয়ের সূচক ১৪০-এ পৌঁছালে বেতন হারের পুনর্বিবেচনার সুপারিশ করেছেন। সরকার কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করেছেন যদিও দু বছর পর বেতন পুনর্বিবেচনার প্রস্তুতিতে তারা কমিশনের সঙ্গে একমত নয়।

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যয়ের সূচকের দশমাব্দী বৃদ্ধির ভিত্তিতে—যা এরই মধ্যে ঘটে গেছে—পাবলিক সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মচারীদের জাত ভাতা বাবদ ১৭৪ কোটি টাকা ব্যয় হবে। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জাত ৬০ কোটি টাকা, রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জাত ৬৪ কোটি টাকা, পাবলিক সেক্টরের কর্মচারীদের জাত ২২ কোটি টাকা, এবং মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীদের জাত ২৮ কোটি টাকা। এই টাকা নগদে দিলে ইনফ্লেশন হবে অতরাং নগদে না দিয়ে ভারত সরকার টাকাটা কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে যুক্ত করে দিতে চান। সরকারের ওই পরিকল্পনা মূল্যবৃদ্ধি রোধ, ডিভিডেণ্ড ও শহরের আয়ের পরিমাণ রোধ প্রভৃতি পরিকল্পনার অংশ বিশেষ।

সরকারের নগদে না দেবার পরিকল্পনা কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং বিরোধীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ইনফ্লেশনের নির্লক্ষ্য বৃদ্ধি দিয়ে উপপ্রধানমন্ত্রী কর্মচারীদের নগদ পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছেন। অথচ গত চার মাসে ২৬৮ কোটি টাকার খাটভি ব্যয় করে ইনফ্লেশন বৃদ্ধি করতে সরকার সহায়তা করেছেন। তাছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ, ডিভিডেণ্ড রোধ প্রভৃতি পরিকল্পনা এতোদিন ছিল কোথায় এবং কেনই বা এগুলি প্রয়োগ করে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার কি জবাব দেবেন। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করে তবেই নৈতিক ভূমি থেকে কর্মচারীদের

মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি নগদে না দেবার প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন, অসম্ভব নয়।

দল ত্যাগ

গত পাঁচ মাসে বিভিন্ন বিধান পরিষদে ব্যাপক দল-ত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, পশ্চিম বেঙ্গল এই ধরনের দলত্যাগের নজীর সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো প্রদেশে এই দলত্যাগের ফলে মন্ত্রীসভার গুরুতর রদবদলও হয়ে গেছে। দলত্যাগীরা কংগ্রেস থেকে বিরোধী দলে যেমন যোগ দিয়েছে, বিরোধী দল থেকে কংগ্রেস দলেও যোগ দিয়েছে, এমন কি একই সমস্মুকে দু'বার দলত্যাগ করতেও দেখা গেছে, কংগ্রেস থেকে বিরোধী দলে এবং পরে বিরোধী দল থেকে আবার কংগ্রেস দলে ফিরে এসেছে।

মাত্র কয়েকমাস পূর্বে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে। সে-সময়ই দলের বাছাই, দলীয় নীতির যাচাই করে সদস্যরা নিজ নিজ দল নির্বাচন করে নিয়েছেন। তাই কোনো নীতির প্রশ্নে, মাত্র এই কয়েকমাসের মধ্যে গুরুতর মতভেদের কোনো অবকাশ ঘটেছে বলে অনুমান করবার কারণ নেই। সাংপ্রতিক দলত্যাগের মধ্যে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত অসন্তোষ, ক্ষমতালিপ্সা, কিম্বা স্বর্গীয় ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের আভাস দেখা গেছে। এই ভাবে নীতিবিকৃত দলত্যাগ অব্যাহত থাকলে গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বার্থসাধনতন্ত্র পরিণত হবে। দলত্যাগ কংগ্রেস দলকে যেমন স্পর্শ করেছে বিরোধী দলগুলিকেও রেহাই দেয় নাই। অতরাং আজ যারা দলীয় স্বার্থে কংগ্রেস ত্যাগ করে বিরোধীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, আগামীকাল তাদের ক্ষমতালিপ্সার অচরিতার্থতা বিরোধী দল থেকে দলান্তরে নিয়ে যেতে পারে। মধ্যপ্রদেশের সাংপ্রতিক দলত্যাগীদের তীব্র মন্ত্রীপদ লোভুপতা এই পরিণামের (শেষাংশ ২৪৪ পৃষ্ঠায়)

সুভাষচন্দ্র

উদ্বোধন পর্ব

পবিত্রকুমার ঘোষ

দেশবন্ধুর নেতৃত্ব

১৯২১ সনের আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন দেশবন্ধু। বম্বে শহরে ৩০শে জুলাই তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায়, সমস্ত প্রদেশ হতে যে সকল ব্যক্তির নাম সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাবিত হয়েছিল সে সকল নামের মধ্যে দেশবন্ধুর নামই অধিকাংশ প্রদেশ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে বিবেচনায়, পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি রূপে তাঁকেই নির্বাচিত করা হয়। দেশবন্ধুর প্রতি সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা সেদিন উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে, এবং মহাত্মাগান্ধীর অবস্থা তখন এমনই যে দেশবন্ধুর সাহায্য ছাড়া তিনি এক পাও চলতে চান না। বোম্বাইয়ে এ. আই. সি. সি.র সভার বিবরণ দিতে যেয়ে সাংবাদিক লিখেছেন : It was noticeable during the deliberations that Messrs. Gandhi and Das worked together in the closest harmony and co-operation, : (অমৃত বাজার পত্রিকা ৪ঠা আগষ্ট ১৯২১) এ. আই. সি. সি.র বোম্বাই অধিবেশনে (২৮, ২৯, ৩০শে জুলাই ১৯২১) যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয় তাতে মোট ১৫ জন সদস্যের ভিতর মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, লাল লালপত রায় প্রভৃতির সঙ্গে দেশবন্ধুও ছিলেন।

এইভাবে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে দেশবন্ধু যখন অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তখন বাংলা দেশে তাঁর নেতৃত্বের অনুসারী সহকর্মী ছিলেন কারা? পুরনো দিনের সংবাদপত্র হতে একটা জনসভার বিজ্ঞপ্তি তুলে দিচ্ছি, তাতেই দেশবন্ধুর নিজস্ব গোষ্ঠীটিকে চেনা যাবে। অমৃত বাজার পত্রিকার ৬ই আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় এই সভার বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছিল : “হরিশ পার্কে সভা। দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্বোধনে রবিবার ৭ই আগষ্ট বিকাল ৫টায় একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সভায় সভাপতিত্ব করবেন, এবং বক্তৃতা করবেন শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, বীরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, শশীকান্তী রায়, শ্রীশ চন্দ্র চ্যাটার্জি, ললিত মোহন ঘোষাল, প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী, মৌলভী আকরাম খাঁ, কাজী আব্দুল করিম ও অন্যান্য।” দেশবন্ধুর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও বিশিষ্ট বক্তার নাম কিন্তু ঐ তালিকায় ছিল না—যেমন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জী, হেমন্ত কুমার সরকার ও হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত। সুভাষ এই গোষ্ঠীর একজন বলে তখনো প্রকাশ্যে পরিচিত হননি—যদিও ইতিপূর্বেই ইংলণ্ড হতে তিনি দেশে ফিরেছেন ও দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর মিলনও ঘটে গেছে। তাঁর সহপাঠী বন্ধু হেমন্ত

সরকার তখনই বাংলার একজন বিশিষ্ট নেতাকল্পে পরিচিতি লাভ করেছেন এবং দেশবন্ধুর সঙ্গে একত্রে বাংলা দেশের বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা করে ফিরেছেন। স্বভাষ হঠাৎ এগে বক্তৃতার মধ্যে উঠে দাঁড়াননি। নেতা কল্পে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করেননি। তাঁর মনের গতির খবর তখনও তাই সংবাদপত্রে প্রতিবিম্বিত হতে আর করেনি।

কিন্তু বাংলা দেশে দেশবন্ধুর নেতৃত্ব তখন অবিসম্বাদীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারতেন তিন জন, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল ও হুসেন ব্যানার্জী। অরবিন্দ রাজনীতি পরিহার করে যোগজীবন বরণ করেছেন, বিপিন পাল হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর জনপ্রিয়তা, বাগ্মিতা, এমনকি তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শ। হুসেননাথ হয়েছেন ‘স্মার’ ও মন্ত্রী—কিন্তু জনমনে তাঁর প্রভাব কত কমে গিয়েছিল তাঁর কয়েকটি দৃষ্টান্ত সে সময়কার সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হতে আহরণ করছি।

১৯২১ সালের আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে মাননীয় স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী স্মার হুসেননাথ বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন। সর্বত্রই তিনি পেয়েছিলেন জনতার তীব্র ধিকার। হুসেননাথ ফিরে যাও “আপনি কি স্বদেশী-যুগের সেই একই হুসেননাথ?” “মন্ত্রীদের লোভে দেশ হারালেন কেন?” এই ধরনের পোষ্টার হাতে যুবকরা তাঁকে বিরূপ অভ্যর্থনা জানাল, যেখানেই তিনি গেলেন সেখানেই। হুসেননাথ বরিশালে একবার এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপমানিত হয়েছিলেন। কিন্তু বরিশালের জনসাধারণ তখন তাঁকে সম্রাটোচিত সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। মন্ত্রী হুসেননাথ এবার যখন বরিশাল গেলেন তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে জনতা এগিয়ে এল না, কোনো নেতাও না;—এগিয়ে এল পুলিশদের সঙ্গে নিয়ে সেই প্রাক্তন ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন সাহেব। আর ছোট ছোট ছেলেরা পিছন থেকে নানা ব্যঙ্গভঙ্গি টিপ্পনী কটতে লাগল। হগলী, বীরভূম, ধুলনা,

প্রাবণ-ভান্ন ২

যশোর সর্বত্রই তাঁর একই অভ্যর্থনা ছুটেছিল। যশোরের লোকরা তাই দ্বন্দ্ব করে বলেছিল যে, স্বদেশী যুগের মুকুট-বিহীন সম্রাট হুসেননাথ যেবার প্রথম যশোরে এলেছিলেন সেবার তাঁর গাড়ি হতে ঘোড়া খুলে দিয়ে সাত হাজার লোক একযোগে গাড়ি টেনেছিল—আর আজ? কোনো বালকও তাঁকে দেখতে যায়নি। চুঁচুড়ার এক ভদ্রলোক লিখেছিলেন যে, চুঁচুড়ায় হুসেননাথ আসবেন জানতে পেরে জনসাধারণ তাঁর বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভ মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত করে; সরকারী অফিসাররা তাই সভয়ে হুসেননাথকে গোপনে নিয়ে গিয়েছেন, তাঁর চুঁচুড়া-পরিদর্শন একান্ত গোপনে সম্পন্ন করেছেন। কয়েক বছর আগে হলে কিন্তু এই চুঁচুড়াতেই হুসেননাথ সম্রাটোচিত অভ্যর্থনা পেতে পারতেন জনসাধারণেরই পক্ষ হতে।

বাংলা দেশে মাননীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী স্মার হুসেননাথ বন্দোপাধ্যায় যখন তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছেন তখন বাঙালীর জন্মাসনে অবচল প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন দেশবন্ধু। নেতৃত্বের সিংহাসন শূন্য পড়ে থাকেনি—অরবিন্দ, বিপিন পাল, হুসেননাথের শূন্যস্থান দেশবন্ধুর দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে। এবং দেশবন্ধুর নেতৃত্বপ্রতিভা যখন বিশ্বাসের পর বিশ্বাস সৃষ্টি করে চলেছে তখন তাঁর পাশে দেখা দিল একটি নতুন মুখ;—চব্বিশ বছর বয়সের এক যুবকের মুখ। দেশবন্ধুকে কেন্দ্র করে যে যুগমণ্ডলী সমবেত হয়েছিলেন এবং বাংলাদেশে দ্বারা নিজেরাই শ্রদ্ধাভাজন নেতা বলে বৃত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ এই নব যুবক বাঙালীর সামনে এসে দাঁড়ালেন নবীন নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। সে কেবে? সঠিক তারিখ আজ হয়তো জানা সম্ভব নয়, কিন্তু ১৯২১ সালের ২১শে আগষ্ট, রবিবার তারিখের ‘অমৃত বাজার পত্রিকায়’ নিম্নলিখিত সংবাদটি বেরিয়েছিল,—একটা জনগণের বিজ্ঞপ্তি রূপে—সেই সংবাদেই দেখতে পাচ্ছি জাতির উদ্দেশে

অভ্যাসচল ভাষণ দিতে দণ্ডায়মান হয়েছেন। বিস্তরগুটি ছিল এই :

জনসভা

আজ (রবিবার) বিকাল ৫টায় কলেজস্কোয়ারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনার্থ একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হবে :

১। প্রিন্স অফ ওয়েলসকে স্বাগত-ভাষণ দেওয়া হবে বলে কর্পোরেশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার নিন্দা করা।

২। যুবরাজকে সম্বর্ধনা জানাবার যে প্রস্তাব করা হয়েছে সে সম্পর্কে কলকাতার নাগরিকদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা।

ক্রিডেডেন্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

বক্তাদের মধ্যে হারা থাকবেন :

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী

” নির্মলচন্দ্র চন্দ্র

মৌলানা মহম্মদ আজাম খাঁ

মৌলানা আহম্মদ আলি

শ্রীযুক্ত পদমরাজ জৈন

মৌলানা জালেদুদ্দীন আল হাসেমি

পণ্ডিত অম্বিকা প্রসাদ বাজপেয়ী

শ্রীযুক্ত শশীক জীবন রায়

শ্রীযুক্ত অভ্যাসচন্দ্র বসু।

জনসাধারণকে সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে।

উপরোক্ত তালিকায় অভ্যাসচন্দ্রের নাম ছিল সবার শেষে, কেননা তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ এবং বক্তা হিসাবেও নতুন। কলকাতার মানুষ এর আগে তাঁর বক্তৃতা বিশেষ শুনেছে বলে মনে হয় না—প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র থাকাকালে যে সব ডিবেটিংএ তিনি যোগ দিতেন জনসাধারণের জন্ত সেগুলি উন্মুক্ত ছিল না।

সভার বক্তাদের বক্তৃতার প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি, শুধু এই কথা উল্লেখিত হয়েছিল যে বিজ্ঞপ্তি

অনুমারী কলেজ স্কোয়ারে ষষ্ঠাংশে সভা হয়েছিল এবং জনসমাগমও হয়েছিল প্রচুর। সভায় গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে একটি ছিল এই যে ২৪শে, আগষ্ট ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটে কলকাতার শেরিফ একটি জনসভা ডেকেছেন যুবরাজকে সম্বর্ধনা জানাবার প্রস্ততি স্বরূপ। সেই সভায় জনসাধারণ সমবেত হয়ে যেন তাঁদের প্রকৃত বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। জনসাধারণকে এ বিষয়ে তাঁদের কর্তব্য পুনরায় বুঝিয়ে বলার উদ্দেশ্যে ২০শে আগষ্ট বীডন স্কোয়ারে বিকাল ৫-৩০ টায় আর একটি জনসভা আহুত হয়—দেশবন্ধু ঐ সভায় সভাপতিত্ব করলেন। ঐ সভায় অভ্যাসচন্দ্রের নাম বক্তাদের মধ্যে ছিল না।

২৪শে আগষ্টের সংবাদপত্রে ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটে বিকাল ৫-৩০ টায় কলকাতার শেরিফ কর্তৃক যোগদানের জন্ত সাধারণের নিকট একটি আবেদন প্রচারিত হয়। আবেদনে বলা হয় ইংরেজ সম্রাট আমাদের দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে বিরাজমান—অতএব তাঁর প্রতিনিধি যুবরাজকে সম্বর্ধনা জানাবার ব্যাপারে কলকাতার loyal and patriotic নাগরিকরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন।

দেশবন্ধু ও তাঁর সঙ্গীরা আর একটি পাল্টা আবেদন প্রচার করেছিলেন। তাঁরাও শেরিফের সভায় জনসাধারণকে দলে দলে আসতে আহ্বান জানান। কেন না যদিও অমূল্য সভাগুলিতে একমাত্র রাজা, মহারাজা ও তৎকালীয় খয়ের খাঁ ধরপের লোকরাই এসে থাকেন তবু এবার যাতে জনসাধারণের নামে যুবরাজ-সম্বর্ধনার প্রস্তাব গৃহীত না হতে পারে তারই ব্যবস্থা করার জন্ত সর্বসাধারণের ঐ সভায় উপস্থিত হওয়া দরকার। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের অনুসারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যুবরাজ বয়স্কটের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে অতরাং উক্ত জনসভায় উপস্থিত হয়ে জনসাধারণ “must express their firm and determined but peaceful protest against the idea of any public

reception being accorded to the Prince of Wales."

উদ্বোধনের এই প্রস্তুতিপর্বের পর ২৪শে আগষ্ট অপরাহ্নে ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটে যা ঘটেছিল তা এক বিরাট ব্যাপার। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ঘটনাটির ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিনের বাংলার রাজনীতিতে এই ঘটনাটির গুরুত্ব ছিল এবং একে একটা ঐতিহাসিক ঘটনাও বলা যায়। স্বাধীনতা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন কি না নির্দিষ্টভাবে তা জানতে পারিনি, কিন্তু উপস্থিত থাকটাই সম্ভব। "অমৃত বাজার পত্রিকা" লিখেছেন (২৫শে আগষ্ট) :

ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটে সভা হবার কথা ছিল ৫-৩০ টায়, কিন্তু ইনষ্টিটিউটের দরজা যখন ১২-৩০ টায় খোলা হল সঙ্গে সঙ্গে হলটি লোকসমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বত সময় অতিবাহিত হতে লাগল ততই লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল এবং দুপুর ৩ টার সময় আর কোথাও তিলধারণের স্থান রইল না। কর্তৃপক্ষ পাখাগুলি খুলতে অসম্মতি দেননি। কিন্তু তবু সেই গরমে বাদামী, মাড়োয়ারি, মুসলমান সর্বশ্রেণীর শ্রোতা শান্তভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসেছিল। তারা হিন্দী ও বাংলায় জাতীয় সঙ্গীত গাইছিল এবং "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" "বন্দে মাতরম" ও "আজাদ-হো-আকবর" ধ্বনি দেয়।

বিকাল ৫ টার সময় কয়েকজন অসহযোগ আন্দোলনের নেতা ইনষ্টিটিউটে এসে উপস্থিত হন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী তাঁদের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেন। নেতাদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধু, মৌলবী মুজিবুর রহমান ও ওয়াহেদ হোসেন, সামসুদ্দিন, মহম্মদ তাহা ও জিজেসুলাল ব্যানার্জী, শশাঙ্ক জীবন রায়, ললিত মোহন ঘোষাল, যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, হেমেন্দ্রনাথ সরকার ইত্যাদি। তাঁরা যথেষ্ট আয়োজন করে উপবিষ্ট হন ও শেরিফ মহোদয়ের আগমনের ভক্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। শেরিফ কিন্তু আর আসেননি। যথাসময়ে সভা শুরু হয়ে গেল।

দেশবন্ধু সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। দেশবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন ভারতবর্ষের একমাত্র জনপ্রতিনিধিদের অধিকারী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, প্রিন্স অফ ওয়েলসকে ভারতবাসীর পক্ষ হতে কোনো সম্বর্ধনা দেওয়া হবে না; কোনো ব্যক্তিগত বিবেচ্য প্রদর্শন কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়, দেশে যে শাসন পদ্ধতি চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোই এর উদ্দেশ্য। বর্তমান সরকার ভারতবাসীদের মানুষ বলে স্বীকার করে না এবং জাতীয় জীবনের ধ্বংসসাধন করাই তার কাজ। যুবরাজ আসছেন সেই সরকারের মদত যোগাতে। সুতরাং কোনো ভারতীয়েরই যুবরাজকে সম্বর্ধনা জানানো উচিত নয়। শশাঙ্ক জীবন রায় তখন প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, কলকাতার শেরিফ কর্তৃক আহূত এই জনসভায় কলকাতার নাগরিকগণ যুবরাজের সম্বর্ধনায় যোগ না দেবার সিদ্ধান্ত করছে। সর্ববাদী সন্মতভাবে প্রস্তাবটি গৃহীত হলে সভা ভঙ্গ হয়, কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দ তারপরই ডালহৌসি কোয়ার্টারে সমবেত হয়ে ঐ একই প্রস্তাব পুনরায় গ্রহণ করে।

ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটের সভার যখন এই পরিণতি ঘটছিল তখন শেরিফ সেখানে যাননি, কিন্তু টাউন হলে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে সন্ধ্যাপনে একটি সভা ঐ একই সময়ে করেন। টাউন হলের চারিদিকে ছিল সশস্ত্র পুলিশ প্রহরা, কোনো অসহযোগী সেখানে প্রবেশ করতে যাতে না পারে সেদিকে ছিল কঠোর দৃষ্টি। কিন্তু খবর পেয়ে টাউন হলের সামনে বহু লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল—যুরোপীয় ও গুর্খা পুলিশ-বাহিনী তাদের ঘিরে রাখে। তখন জিজেসুলাল ব্যানার্জী এসে জনতাকে বুঝিয়ে বলেন যে টাউন হলের বারান্দায় যে সভাটি হচ্ছে তাতে শুটকরক সরকারী অফিসার ও সরকারের অনুগত ব্যক্তি ভিন্ন আর কারও প্রবেশাধিকার নেই, অতএব জনতার সেখানে থাকার প্রয়োজন নেই। সেই কথা শুনে শান্তভাবে লোকেরা চলে যায়। কিন্তু

চলে যাবার আগেই টাউন হলের সভাটি তারা ভেঙ্গে দিয়ে যায়।

ছোটলাট ঠিক সাড়ে পাঁচটার টাউন হলে এসেছিলেন, আর এসেছিলেন আর হুসেননাথ, মিঃ জেমস, ফজলুল হক, চীফ জাস্টিস জাওহার, বার্টন, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের ওয়াটসন স্মিথ, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, মহারাজা বাহাদুর প্রতাপ কুমার ঠাকুর, নদীয়ার মহারাজা ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্যেক বক্তাই বক্তৃতা দিতে ওঠামাত্র রাস্তায় অপেক্ষমান জনতার তীব্র বিক্ষোভনি ও বিভিন্ন স্লোগান উদ্ভিত হয়, ফলে মাত্র ৪০ মিনিটের মধ্যে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করতে হয়েছিল। বক্তৃতা করতে সবচেয়ে বেশি বাধা পেয়েছিলেন আর হুসেননাথ ও ফজলুল হক—ফলে ধ্বংসাত্মক হয়ে তাঁরা চীৎকার করে জনতাকে গালাগালি দিতে শুরু করেন। সুবরাজকে সম্বর্ধনা জানাবার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়—যদিও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাইরে জনতা তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করছিল। সুবরাজ-সম্বর্ধনার আয়োজনাদির জন্য একটি সাধারণ কমিটিও এই সভায় গঠিত হয়েছিল।

এই ঘটনাটি এই কারণে উল্লেখ করছি যে ১৯২১ সালের গণতান্ত্রিক রাজনীতির যে ধারার সঙ্গে অভ্যুত্থান এসে যোগ দিলেন তার একটা স্পষ্ট রূপ এই ঘটনার মধ্যে পাওয়া যায়। জনসাধারণ তাদের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন—অবশ্য এখানে জনসাধারণ বলতে শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীকেই বুঝতে হবে—কেননা স্বয়ং ছোটলাট যখন শাস্ত্র মুরোপীয় ও দিল্লী পুলিশ পরিবৃত হয়েও বহুসংখ্যক মুরোপীয়দের উপস্থিতিতে সভায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন যে সুবরাজ সম্বর্ধনার প্রস্তাবের সপক্ষে শ্রোতারা ভোট দেবেন কি না তখন all the Europeans and all the 'Jo Hookums' obeyed the Governor like good boys. But the people outside the enclosure and some of the Indians standing inside, also

went on waving their hands and crying 'no'. লোকের মনের ভয় তখন কেটে গেছে এবং নিজেদের অধিকার কতখানি তাও তারা জেনেছে। জনসাধারণের এই আত্ম-সচেতন রূপ দেখে হুসেননাথের মতো রাজনৈতিক নেতারা যাবড়ে গেছেন, কেননা জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ দিয়ে লিখেছেন যে সভায় হুসেননাথ এত জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছিলেন যে একবার বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি পিছন দিকে দ্রুত ছুটতে গেলেন, দাঁড়ালেন, পরমুহূর্তে ভয় পরিবর্তন করে বুকের ওপর দুইহাত রেখে দাঁড়ালেন, তৎপরমুহূর্তেই জনতার দিকে এক হাত প্রসারিত করে বুক অসম্ভবরকম চিড়িয়ে দাঁড়ালেন—কিন্তু এসব সত্ত্বেও কোনো বক্তৃতাই তিনি করতে পারলেন না, কেবল অতি রাগত স্বরে চীৎকার করে বললেন একটি কথা : shame on you who are crying shame on us.

আর এই দৃষ্ট ভয়শূন্য দেশপ্রেমিক জনতার মাধ্যমে যি তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন,—তাই তাঁর শক্তির সেদিন বেন কোনো সীমা ছিল না। শেরিফের ডাকা সভা তিনি পাণ্ড করে দিলেন, যে সভার সভাপতি হবার কথা ছিল ছোটলাটের এবং যেসভার প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। দেশবন্ধুর সঙ্গে পুলিশ ছিল না, ছিল না সার্ভেন্ট বাহিনী, ছিল না অর্থসঞ্চালক। কলকাতার শেরিফ তাই টাউন হলের সভায় দ্রুত করে বলেছিলেন যে under exceptional circumstances the venue of the meeting of the people representing the intelligence, wealth, nobility and power of the city had to be changed এবং শুধু তাই নয় তাঁদের ঘোষিত সভাস্থল হতে পলায়নের ফলে নতুন সভাস্থলটিতে অতিথিদেরও বসার কোনো সুবন্দোবস্ত করা যায়নি।

দেশবন্ধুর নেতৃত্বে গণশক্তির এমন উদ্বোধন ঘটেছিল,

সেদিনের বাংলাদেশে যে সেই গণশক্তির স্বাধিকার বোধে অবিচল রূপের সম্মুখীন হয়ে কলকাতার বুদ্ধি, বিত্ত, আভিজাত্য ও ক্ষমতার প্রতিদুরা কোণঠাসা হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং পালিয়ে যেয়েও রেহাই পাননি—একজন যুবক বাঙালী সন্ধ্যা উঠে দাঁড়িয়ে স্বয়ং ছোটলাটকে প্রশ্ন করেছিল, জনসভায় জনতাকে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না কেন? যদি তা না দেন তবে এই জনসভা কোন্ আইনে সিদ্ধ? রাজমুখ ছোটলাটের মুখ আরও লাল হয়ে উঠেছিল সে কথায়, কোনো উত্তর দিতে পারেননি। ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’ তাই প্রধান সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখেছিল: বিনা অস্ত্র-কলকাতার নাগরিকেরা-যুদ্ধ করেছে—ইতিহাসে একমাত্র Battle of Spies ছাড়া এর দ্বিতীয় নজীর নেই। (২৫শে আগস্ট ১৯২১)

এইভাবে বাংলাদেশে বরকট আন্দোলন যখন শক্তিশালী ও ব্যাপক হয়ে উঠল তখন মহাত্মা গান্ধী এলেন কলকাতায়। তিনি গিয়েছিলেন আসাম ভ্রমণে, সেখানে হতে চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি হয়ে তিনি কলকাতায় এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মোলানা মহম্মদ আলি, বেগম মহম্মদ আলি, মোলানা আজাদ হোসেন এবং শেঠ জমুনলাল বাজাজ। বরিশাল হতে ষ্টীমারে তাঁরা খুলনায় আসেন, খুলনা হতে ট্রেনে আসেন কলকাতা। মহাত্মাজীর গমন পথের সর্বত্র অগণিত নরনারী তাঁর দর্শন লাভ ও বাগী শোনিবার জন্ত ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করে। দমদমে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্ত গিয়েছিলেন শ্রীমতী উমিলা দেবী, শ্রীমতীজলাল ব্যানার্জী ও অন্যান্যরা। দমদম হতে সোজা তাঁরা মোটর গাড়িতে রসারোডে অবস্থিত দেশবন্ধুর গৃহে আসেন। এ হচ্ছে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, রবিবার, ১৯২১ সালের ঘটনা। ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মহাত্মা কলকাতায় অবস্থান করবেন স্থির হয় এবং তারপর তিনি যাবেন পাঞ্জাবে। দেশবন্ধুর গৃহে মহাত্মার অবস্থানের সময় অসহযোগ আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই খুব জোরদার

হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে বড়বাজার অঞ্চলে বিলিভী বস্ত্র বরকটের আন্দোলন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৬ই সেপ্টেম্বর সকাল ৬ টায় জোড়াসাঁকোয় চাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর নিম্নতে আলাপ হয়েছিল, সি. এফ. এণ্ড জু ছাড়া আর কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু সেই আলাপনের সময় চাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে প্রায় দুই শত জন গান্ধীভক্ত সমবেত হয়ে বিলিভী বস্ত্র জড়ো করে আশ্রয় খরিয়ে দেয় ও মহাত্মা গান্ধীর নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকে। এই কাপড় পোড়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের প্রবল আপত্তির কথা দেশবাসীর সে সময় জানা ছিল;—কিন্তু তাঁরই গৃহপ্রাঙ্গণকে কাপড় পোড়ার জায়গা হিসেবে বেছে নিতে তারা বিধা করেনি।

মহাত্মা কলুটোলার বস্ত্রব্যবসায়ীদের এক সভায় ও ভবানীপুরে শিখদের এক সভায় ৭ই সেপ্টেম্বর বিলিভী-বস্ত্র বর্জনের আবশ্যিকতা বর্ণনা করেন করে এক ভাষণ দেন। ৮ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় বরকট আন্দোলনের সমর্থনে পাঁচটি বড় বড় জনসভা হয়,—হরিশ পার্ক, হালিডে পার্ক, বিডন পার্ক ও খিদিরপুরে। মহাত্মা সব কয়টি সভায়ই ভাষণ দেন। হরিশ পার্কের সভায় দেশবন্ধু সভাপতিত্ব করেন। মহাত্মা সর্বত্র বলেন যে বিলিভী বস্ত্র বরকট ও স্বদেশী বস্ত্রের ব্যবহারের আন্দোলনে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা পিছিয়ে আছে। কিন্তু দেশবন্ধু যখন শ্রোতৃবৃন্দকে আহ্বান করেন তাদের গায়ের বিলিভী বস্ত্রগুলি পোড়ার জন্ত দিয়ে দিতে তখন অনেকেই নিজের নিজের পোষাক খুলে দেন, সেগুলি আশ্রনে পোড়ানোও হয়। বিডন পার্কের সভায় সভাপতিত্ব করেন জি. এম. সেনগুপ্ত। দেশবন্ধুও সেখানে বক্তৃতা করেন। দেশবন্ধু বলেন যে বক্তৃতাটির আর প্রয়োজন নেই, সময়ও নেই,—নাগপুর কংগ্রেসের আগেই যে যার বলার কথা বলে নিয়েছেন। এখন একটি মাত্রই কাজ আছে সবার জন্ত—তা হচ্ছে স্বদেশী লাভের চেষ্টা। সারা

ভারতে, গ্রামে ও সহরের ঘরে ঘরে স্বরাজের কথা শোনা যাচ্ছে—কিন্তু স্বরাজের প্রকৃত সাধক কে? যারা চায় না আরাম ও ভোগবিলাস, দাসত্ববন্ধনের বেদনায় যাদের হৃদয় পীড়িত ও কাতর তারাই স্বরাজের সাধক। দাসত্বের অপমানভারের কলঙ্কাগ্নিতে নিজের অন্তর দহন হচ্ছে বলে দেশবন্ধু চান বাঙালার প্রতিটি মানুষকে আলিঙ্গন করতে, যাতে নিজ হৃদয়ের অগ্নিতে অস্ত্রের হৃদয়েও আগুন জ্বালাতে পারেন। তিনি উপস্থিত জনসমুদায়কে তাদের পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ খুলে দিতে থাকে—পেঁবে সেগুলিও জড়ো করে পোড়ানো হয়। বড়বাজারের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের এক সভায় মহাত্মা বিদেশী দ্রব্য আমদানী ও বিক্রয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর মহাত্মা ও দেশবন্ধু তাঁদের দলবল সহ মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বাংলা দেশে বয়কট আন্দোলন যখন প্রবল বেগে বিস্তার লাভ করল, দেশবন্ধু সেই আন্দোলনকে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামের পর্যায়ে নিয়ে যেতে লাগলেন; মহাত্মা গান্ধীও কলকাতায় ও বাংলার অন্যান্য স্থানে এসে বক্তৃতা দি দ্বারা সে আন্দোলনকে শক্তি জুগিয়ে গেলেন তখন স্বভাব কী করছিলেন? তিনিও দেশবন্ধুর নেতৃত্বাধীনে সে আন্দোলনে আন্তরিকভাবে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু পুরোভাগের একজন নেতা হিসাবে তখনো তাঁকে দেখা যায়নি। বরং একটা গঠনাত্মক কাজের দায়িত্ব তিনি এই সময়ে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। দেশবন্ধুই এ ভার তাঁকে দিয়েছিলেন।—কলিকাতা বিদ্যাপীঠ নামক একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভারের কথাই বলছি। অমৃতবাজার পত্রিকায় সংবাদটি ছিল এইরকম : Mr. Subhas Chandra Bose.....who recently passed brilliantly the I. C. S. examination but refused to accept Government service has now

taken charge at Kalikata Vidyapitha at 11, Wellington Square. Mr. Bose is also a graduate of Cambridge. (১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২১)

কিন্তু শুধু একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেওয়া নয়, আরও কয়েকটি কাজের দায়িত্ব স্বভাব এই সময়ে নিয়েছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাউন্সিল ৩রা সেপ্টেম্বর এক সভায় নিম্নলিখিত কয়েকটি বোর্ড বা পরিষদ গঠন করেন—শিক্ষা বোর্ড, জ্ঞানশাল সার্ভিস বোর্ড, নারী সংগঠন বোর্ড, নির্বাচনী বিরোধ বোর্ড, নমননীতি সম্পর্কিত পরামর্শ বোর্ড, স্বদেশী বোর্ড, প্রোগ্রামাণ্ডা বোর্ড এবং পাবলিসিটি বোর্ড। এই বোর্ডগুলির মধ্যে স্বভাব সদস্য হিসাবে স্থান পেয়েছিলেন শিক্ষা, জ্ঞানশাল সার্ভিস এবং পাবলিসিটি বোর্ডে। শিক্ষা ও পাবলিসিটি বোর্ডে তাঁকেই প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয়—যদিও তাঁর সহকর্মী রূপে বোর্ড-গুলিতে ছিলেন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমহেন্দ্র চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জীর মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ। এই বোর্ডগুলিতে স্বভাব তাঁর কৈশোর সাথী হেমন্ত সরকারকে সহকর্মীরূপে পেয়েছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কিরণশঙ্কর রায়, বীরেন্দ্র শাসমল, পূর্ণ দাস, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী প্রভৃতিও ঐ বোর্ড-গুলির সদস্য ছিলেন। স্বভাব এইভাবে কংগ্রেসের ভিতর দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করলেন ও তাঁর সংগঠন প্রতিভার বিকাশ ঘটাবার সুযোগও এল সেই সঙ্গে। দেশবন্ধুর আশীষ নিয়ে তিনি নতুন কার্যভারগুলি একে একে গ্রহণ করলেন এবং অবিলম্বে সংগ্রামে। দুর্গাবর্তের মাঝে এগে পড়তে হল তাঁকে।

দেশবন্ধু মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে যখন প্রচার-কার্য চালাচ্ছেন, মহাত্মা গান্ধী মাদ্রাজ পৌঁছে গেছেন—সে সময় কলকাতায় বড়বাজার অঞ্চলে বিদেশী দ্রব্য বয়কট আন্দোলন খুব শক্তিশালী হয়ে উঠল ও প্রতিদিন ঐ স্থানে

পিকেটিং চলতে লাগল। ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে পুলিশ হঠাৎ ৪৬ জন স্বেচ্ছাসেবককে সেখানে গ্রেপ্তার করে বসল—স্বেচ্ছাসেবকরা পুলিশভ্যানে “মহাত্মা গান্ধী-কি জয়” “আল্লাহো আকবর” প্রভৃতি ধ্বনি তুলে ধান। অভিমুখে চলে গেল। সংবাদ পেয়ে চারিদিক হতে দলে দলে আরও বহু-সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ও জনতা জড়ো হতে লাগল। সমস্ত কলকাতা এই প্রথম গ্রেপ্তারের ঘটনায় টলমল করে উঠল।

আলি লাহড়র—অর্থাৎ মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির গ্রেপ্তারও এই সময়ে ঘটে এবং সারা দেশে সেজন্তুও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। আলি লাহড়র ছিলেন বিলাফত আন্দোলনের প্রধান ছজন নেতা এবং সেই সূত্রেই মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ সহচর। মহম্মদ আলিকে গ্রেপ্তারও করা হয় ওয়ালটেরারে, যখন তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে মাত্রাজ যাচ্ছিলেন। গান্ধীজী কলকাতা হতে বেদিনীপুর হয়ে মাত্রাজ যাচ্ছিলেন, এ সেসময়কার ঘটনা। ইংরেজ সরকার চারদিন পর্যন্ত গ্রেপ্তারের কোনো সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেয়নি। সৌকত আলি গ্রেপ্তার হন ১৬ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে বিলাফত কমিটির আফিসে। ডাঃ কিচলু, মোলভী হাসান আমেদ, নিসার আমেদ প্রভৃতি কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও এই সময়ে গ্রেপ্তার হন। সারদাপীঠের জগৎগুরু শঙ্করচর্কে সরকার গ্রেপ্তার করে। এই সকল গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। পল্লী অঞ্চল হতে কলকাতায় ফিরে এসে দেশবন্ধু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাউন্সিলের এক জরুরী অধিবেশন ডেকে (২০শে সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের সর্বত্র পিকেটিং আন্দোলন সংগঠন করার ব্যবস্থা করতে বললেন। কিন্তু সে পক্ষে পরিবেশ তখনো অসুকল নয় এবং বাঙালী জনসমাজে উৎসাহেরও অভাব আছে বলে অনেকে অভিমত দিতে থাকে, তাই ২৪শে সেপ্টেম্বর ১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের একটি সভা হয় বিদেশী দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয়ের

ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পিকেটিং চালানোর উপায় ও কৌশল নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে। ব্যাপারটি অতীব দ্রুত দেখে এ সম্পর্ক যাবতীয় ভার ছেড়ে দেওয়া হয় সত্ত্বগঠিত জাতিশাসন সার্ভিস বোর্ডের ওপর—স্বভাষচন্দ্র বার সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছিলেন মাত্র কয়েকদিন আগে। সংবাদপত্রে এ বিষয়ে লেখা হয় যে পিকেটিং আন্দোলন সফল করতে হলে শক্তিশালী ও খ্যাতিমান নেতাদের নেতৃত্ব দরকার, স্বভাষচন্দ্র বহুর নিকট কেউ সে নেতৃত্ব প্রত্যাশা করে না, কাজেই এ আন্দোলন কীভাবে চলবে সেটাই ভাববার কথা। (অমৃত বাজার পত্রিকা, ২৪শে সেপ্টেম্বর)। কিন্তু ঐ তারিখের সংবাদপত্রেই দেখছি যে স্বভাষচন্দ্র পাবলিসিটি বোর্ডের সেক্রেটারি রূপে তাঁর কাজ শুরু করে দিয়েছেন,—বড়বাজারের সচল সমাপ্ত ও সফল পিকেটিং সম্পর্কে এক দীর্ঘ বিবৃতি তিনি প্রকাশ করেছেন, যার উদ্দেশ্য হল সমস্ত দেশে বড়বাজারের ঘটনাকালীর মারফৎ উৎসাহ সৃষ্টি করা। এই সময়েই কিরণশঙ্কর রায় কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ (২২শে সেপ্টেম্বর) এটাও জানা যায় যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলির তত্ত্বাবধানের জন্ত প্রতি জেলায় একজন করে স্কুল-ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন। জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকেই এই নিয়োগপত্র দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে কলকাতার জন্ত স্কুল-ইন্সপেক্টর রূপে নিযুক্ত হয়েছেন স্বয়ং শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এবং স্বভাষচন্দ্র বহু। অসহযোগ আন্দোলনের অন্ততম আহ্বান ছিল ছাত্রদের সরকারী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করা। ছাত্ররা দলে দলে ইংরেজি স্কুল কলেজ ছেড়ে চলে আসে—তার আন্ততঃ্য মুখার্জি তখন ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে প্রতিষ্ঠিত। তিনি এক ভাষণে জানান যে পঞ্চাশ হাজার ছাত্র ইতিমধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে গেছে, —প্রধানত তাদেরই জন্ত চারদিকে জাতীয় স্কুলগুলি খোলা

হয়েছিল। হুভাষ নতুনভাবে এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলির তত্ত্বাবধান তথা জাতীয় শিক্ষার পুনর্গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার কাজেও তিনি এবার পুরোভাবে এগে দাঁড়ালেন। স্তার হরেন্দ্রনাথ এই সময় বলেছিলেন যে বাংলা দেশে অসহযোগ আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বসেছে (to me it seems that it is a dying cult and every day is adding to its weakness and loss of power and prestige....The cult of the boycott has fallen flat and evokes no response) এর উত্তরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রচার বিভাগ (হুভাষ যার সেক্রেটারি ছিলেন) সঙ্গে সঙ্গে তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে দেখান যে স্তার হরেন্দ্রনাথের কথা সত্য নয়। কিন্তু হুভাষ শুধু প্রচারকলার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন না। কলকাতার রাজপথে বয়কট আন্দোলনের একটা নতুন প্রকাশ ঘটালেন তিনি। ২৫জন বাঙালী যুবক খেচ্চাসেবককে অশ্রদ্ধাভাবে বৌবাজার স্ট্রীটে কাপড় ও টেলরিং দোকানগুলির সামনে পিকেটিং করার জন্তু তিন দাঁড় করিয়ে দিলেন, বড়বাজারেও চতুর বস্ত্রব্যবসায়ীদের দোকানের সামনে পিকেটিং শুরু করলেন।

দেশবন্ধু তখন বাংলার বিভিন্ন জেলায় অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার-প্রচেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তিনি জানতেন যে অসহযোগ আন্দোলন শুধু কলকাতা ও বড়বাজারে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, এটি বাংলার সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়তে হবে। তিনি জানতেন যে অসহযোগ আন্দোলন শুধু কলকাতা ও বড়বাজারে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, এটি বাংলার সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়তে হবে। তিনি জানতেন যে অসহযোগ আন্দোলন শুধু কলকাতা ও বড়বাজারে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, এটি বাংলার সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়তে হবে।

আন্দোলনের ডাক দিয়ে ফিরছেন। বাংলার মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল নিবিড়, বাঙালীরাও তাঁকে চিনেছে ত্যাগের সম্রাট রূপে। দেশবন্ধুর কণ্ঠে ছিল সেই ভাষা বা আপামর সাধারণ বৃষত, আর তাঁর সমস্ত বাক্যের উৎসাহ ছিল তাঁর স্বপ্ন—তাই তাঁর কথা স্পর্শ করত মানুষের স্বপ্নকে, উদ্বোধিত করত তার প্রাণকে। বাংলার পরিব্যাপ্ত ক্ষেত্রে নীল আকাশের নিচে দেশবন্ধুর উদাত্ত আহ্বান নতুন করে নবীন জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে বাংলার তরুণদের দীক্ষিত করল—আর দেশবন্ধুর ডাকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্যে নির্ভীক চিন্তে সেদিন এসে দাঁড়িয়েছিলেন যে উৎসাহী যুবদের দল, তাদের নিয়ে দৃঢ় ও শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি সংগঠন গড়ে তোলার দায়ভার তুলে নিয়েছিলেন সেদিন হুভাষচন্দ্র। সেদিনের হিসাবে হুভাষের চেয়েও অনেক বেশি জনপরিচিতি লাভ করেছিলেন হেমন্ত কুমার সরকার, কেননা দেশবন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ছিলেন বক্তৃতামঞ্চের বক্তা। হুভাষ তাঁর শক্তিকে সেদিকে নিয়োজিত করার বদলে প্রশান্ত ও ধীর চিন্তে বনিয়াদী কাজে হাত দিলেন—শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও আন্দোলনের উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলা। এই কাজে তাঁর সাফল্যই তাঁকে নেতৃত্বের দিকে নিয়ে এল।

(ক্রমশঃ)

হান্না !!

অনিল রায়

[১৯৪৯ সের শেষ হতে ১৯৫০ এর প্রথম ভাগে পূর্ববঙ্গে যে ব্যাপক, নৃশংস ও অপরিমিত হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত । জঃ সঃ]

দেশবিভাগের বিষময় ফল

নেতারা ১৯৪৭ সালে যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপন করেছিলেন, আজ তার ফল ফলেছে। দেশ বিভাগ করে সমস্ত জাতিটাকেই এরা বিধ্বস্ত করেছিলেন। একদিকে হিন্দু, একদিকে মুসলমান। মনে করেছিলেন, ছুরি চালিয়ে সোজা-সুজি সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন। সমাজের অন্তস্তলে যেখানে জটিল কার্যকারণের বিমিশ্র ঘাত-প্রতিঘাতে সমস্যার জন্ম হয়, সেদিকে নেতারা ধাননি। সামাজিক কার্যকাণ্ডকে এড়িয়ে স্বংপিণ্ডের ওপর দিয়ে শাণিত ছুরি চালিয়ে দিলেন। আজ তাই গোটা সমাজের মূঢ়াঘম্মণ দেখা দিয়েছে।

যে সাম্প্রদায়িকতার বিষে মুসলীম লীগ ভারতকে জর্জর করে তুলেছিল, যার সাহায্যে হিন্দু-মুসলীমকে যুদ্ধপর দুই জাতিতে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করার যড়যন্ত্র ইংরেজ ও লীগ করেছিল, সেই বিষ বীজকে স্থায়ীভাবে এদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করলেন নেহেরু-প্যাটেল-চক্র। হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি, এদের একত্রবাস অসম্ভব তাই ধর্মের ভিত্তিতে এদেশকে ভাগ করা প্রয়োজন, এই সর্বনাশা মতকে স্বীকার করে নিয়ে এরা দেশকে বিধ্বস্ত করে ফেললেন। আজ এই নির্মম সত্যকে ঢাকা দেবার চেষ্টা নেহেরু করছেন। নেহেরু বলার চেষ্টা করেছেন, 'কই ধর্মের ভিত্তিতে তো বিভাগ প্রাণ-ভাত্র ৩

হয়নি। শুধু মাটি ভাগ করা হয়েছে।' মিথ্যা কথা দিয়ে জলন্ত সত্যকে চাপা দেয়া যায় না। তাই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত সত্য বেরিয়ে এসেছে। পূর্ববাংলার লক্ষ লক্ষ মৃত ও লাহিতের আত্মকণ্ঠ আজ নেহেরুর মিথ্যা ভাষণকে ধিক্কার দিয়েছে। এ ধিক্কারেও নেহেরু-প্যাটেল-চক্রের চেতনা হয়নি। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে—হিন্দু, মুসলমানের মধ্যে—ভারতবর্ষকে ভাগ করে দিয়ে এরা যে সমস্ত স্রষ্টা করেছেন আজ তা সর্বব্যাপী প্রলয়-রূপ নিয়ে ভারতকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। গিলাসা-হেবের দেওয়া অংকুরকে সহস্র ভারতের মাটিতে এরা রোপণ করেছিলেন, আজকে বীজ পল্লবিত বিষবৃক্ষ হয়ে মারাত্মক ফল প্রসব করছে। দেশবিভাগের যে পাপ, তার প্রায়শ্চিত্ত হবে শুরু হয়েছে।

ভুলের পর ভুল

পাপ সর্বদাই চক্রপথে এগিয়ে চলে, এই তার ধর্ম। এক পাপকে সামলাতে অচ্যুত পাপের প্রয়োজন পড়ে। এইরূপ পাপ আপন গতিতে শিকলের পর শিকল ছুড়ে ছুঁতে চক্র রচনা করে তোলে। ভারতের নেতারাও এই দুঃশ্রেষ্ঠ পাপচক্রে বাঁধা পড়েছেন। এর থেকে বেরিয়ে আসবার প্রবল শক্তি এদের আছে বলে মনে হয় না। নিত্যনুতন

ভাস্কর চেষ্টা ও কশ্মীর দ্বারা পাপ-চক্রের কুণ্ডলীকে এরা আরো জটিল, আরো নিদারুণ করে তুলেছেন। অধোগামী পথের দিকে পা বাড়িয়ে আজ পথের টানেই তাদের স্থানিবার গতিতে নেবে যেতে হচ্ছে। এক সাম্প্রদায়িকতার দানবকে পূজার নৈবেদ্য দান করে রেহাই নাই, পরপর আত্মসমর্পণের দ্বারা তার জের টানতে হচ্ছে।

সম্পত্তি বিভাগে ভুল

তাই সমাজকে আজ লগুতও করে ছাড়লেন। দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে করলেন সরকারি সম্পত্তি ভাগ, টুল-টেবিল থেকে আরম্ভ করে রেলওয়ে পথেরও ভাগ করতে হল। আসাম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আসামের সঙ্গে জীবন ধারার যোগ ব্যাহত হল। জিপুরা বাংলা থেকে, এমনকি আসাম থেকেও যোগসূত্র হারিয়ে বিপদগ্রস্ত হল। পার্বত্যচট্টগ্রাম হাতছাড়া হল।

সিলেট ও আসাম সম্বন্ধে ভুল

আসাম ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত প্রদেশ, তার তিন দিকে পাকিস্তানের দেওয়াল উঠল। রাডক্লিফ বাটোয়ারা চোখ বুজে নেতারা মেনে নিলেন। অগ্রপশ্চাৎ ভাবলেন না। সিলেট সম্বন্ধে referendum এ রাজী হলেন, কিন্তু আসামের কংগ্রেসীদের প্রাদেশিক সংকীর্ণতা ও গভর্ণর মীর্জা ইসমাইলের নিক্রিয় উদাসীনতার নিয়ন্ত্রণ বা শাসন করলেন না। ফলে সিলেটকে হারালেন, ভারতের নিরাপত্তাব্যবস্থার আর একটি ফাটল ধরালেন, পূর্ব সীমান্তকে বিপজ্জনক করে তুললেন। আসামের প্রাদেশিকতা ও বাঙালীবিদ্বেষকে মুসলীম লীগ প্রতিক্রিয়াশীলতার সঙ্গে মিতালী করতে গিলেন, রাধা দিলেন না। ফলে লক্ষ লক্ষ পূর্ববাংলার মুসলমান আসামে অগ্রপ্রবেশ ও infiltrate করে ভবিষ্যতের পাকিস্তানী জিহাদের কেজা রচনা করল। আজকে নেতাদের চক্ষু স্থির। তাই বাধ্য হয়ে আজ আইন করে

মুসলমানদের তাড়াবার ব্যবস্থা করতে হল কিন্তু এতে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সম্মুখে অপরাধী ও অত্যাচারী প্রমাণিত হতে এবং পাকিস্তানী ও ইঙ্গ-আমেরিকার ভারতবিরোধী প্রচারণার স্বর্ণ অযোগ দান করতে বাধ্য হলেন নেতারা। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লীগপন্থী মুসলমান ব্রহ্মপুত্রের দুইতীরে এবং জিপুরা সীমান্তে ইতিমধ্যেই ঘাঁটি স্থাপন করে বসেছে এবং আসামে বিপর্যয়ের ক্ষেত্র তৈয়ার হয়ে গেছে।

কাশ্মীর সমস্যায় ভুল

ভারতের কাশ্মীর নিয়ে শিশুশ্লথ মূৰ্খতা। ইঙ্গ-আমেরিকার ভয়প্রদর্শন, চাফুরী ও প্রলোভন নেহেরুকে উনৌর দরবারে হাজির হতে বাধ্য করল। গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলে যারা চোরকে চুরির পরামর্শ দেয় সেই শত্রুদের কাছেই নেহেরু বিচারপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন। এই নিদারুণ ভুলের ফল আজও ভারতবর্ষ ভোগ করছে। ভারত বিভাগের মূলে যে ইংরাজের ষড়যন্ত্র পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণের মূলেও তারই প্ররোচনা রয়েছে। এই সাদা কথাটি নেহেরু বুঝলেন না। চোরের কাছেই চুরির বিচার চাইতে গেলেন উনৌর এজলাসে। স্কুল পাঠ্য পুঁথির নীতি আর শূন্তগর্ভ কিছু মহৎ বাক্য, এই সম্বল নিয়ে গেলেন আন্তর্জাতিক ধুরন্ধরদের হৃদয় গলাতে। জানলেন না, সেখানে হৃদয় নাই, আছে শাপিত ইম্পাত আর কূট স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র তৈরী বর্বর স্টীল ফ্রেম। সেই হিমালয়ী ভুলের ফলে আজ আমরা কাশ্মীর হারাতে বসেছি।

মুদ্রামূল্যহ্রাসে ভুল

ভারতের এলো মুদ্রামূল্যহ্রাস। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে অবোধের মত ইংলণ্ডের স্বার্থপর স্বর্ধনীতির অঙ্ক অমুসরণ করল ভারত। পাকিস্তান এই অযোগ নিয়ে বিপরীত পথে গেল, ভারতকে করলো আঘাত। মুদ্রামূল্য না কমিয়ে পাকিস্তানে এদেশের জীবনে আর্থিক সংকট সৃষ্টি করলো।

ব্যবসাবাগিন্য মন্দা হয়ে এলো। কলকাতার বিপুল বাগিন্য সংকটের মুখে দাঁড়াল। এল পাট এবং কয়লার সংঘর্ষ, রেলপথে যাত্রীর লাঞ্ছনা। এল জীবন জোড়া সংকট। পূর্ববঙ্গে চাবীর জীবনে হাহাকার। ভারত বিদেয় হল কেনারিত। প্রতিক্রিয়ার হলো অবিধা। পূব ও পশ্চিম বাংলার নাড়ীর বন্ধন ছেঁড়বার ব্যবস্থা হল। এদিকের টাকা ওদিকে অটল। দুই পারেই ঘরে ঘরে উঠলো আতর্জন। জীবনযাত্রা অটল।

অফিসার বিনিময়ে ভুল

ইতিপূর্বে সরকারি কর্মচারীদেরও সাম্প্রদায়িক হিন্দুয়ান ভূতাপ করা হয়েছিল। মতিচ্ছন্ন ভারত সরকার রাজি হলেন কর্মচারি বিনিময়ে, দিলেন স্বধর্মীয় রাষ্ট্রে ফিরে আসবার option বা অধিকার। মুসলমান চাকুরে পশ্চিমবাংলা ছেড়ে গেলেন না, কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে দলে দলে হিন্দু অফিসারেরা চলে এলেন ভারতে। বুদ্ধিলেশের কী সর্বনাশা হুঁচু! দেশ-বিভাগ হল সংখ্যালঘুকে রক্ষা ও পালন করার সর্তে, যেনে নেওয়া হল লোকবিনিময় বা লোকাপসারণ করা হবে না। অথচ কর্মচারি বিনিময়কে স্বীকার করা হল। পূর্ববঙ্গে এক কোটি হিন্দু থাকল কিন্তু হিন্দু অফিসার রাষ্ট্রে থাকলো না। নেহেরু চক্রের নেতারা হিন্দুদের পূর্ববাংলায় থাকতে বাধ্য করলেন, অথচ তাদের নিরাপত্তার সকল সম্ভবনা ও ব্যবস্থাকে নিমূল করে দিলেন। কলমের এক খোঁচায় পূর্ববাংলার হিন্দু হল অসহায় ও অনাথ। এই মারাত্মক ভুলের পরিণাম হলো ফেক্সারি মালের সর্বব্যাপী হিন্দু উচ্ছেদ।

সাম্প্রদায়িকতার স্বীকৃতি

এইভাবে ভুলের পর ভুল উঠলো জমে। সামাজিক ও আন্তর্জাতিক দুই ক্ষেত্রেই এই ভুলের পরিণাম দেখা দিল মারাত্মক রূপে। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ Secular রাষ্ট্র

ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু পাকিস্তানী ইসলামী রাষ্ট্রের পাশে কার্যত: ভারতের “হিন্দু রাষ্ট্রে” পরিণত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানকে নেতারা “ইসলামীরাষ্ট্র” বলে ঘোষণা করেছেন। কলে ভারতে হিন্দুসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের শক্তি বেড়েছে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্রোতে বাঁধা সমাজজীবন। পাকিস্তান ও ভারতের জীবন হাজার বছরের হাজার স্রোতে বাঁধা। যত হিন্দুদলন ও বিভাঙ্কনের পথে পাকিস্তান এগোচ্ছে তত তার প্রতিক্রিয়া বাড়ছে এদেশে। ইসলামী রাষ্ট্রকে শাসন করা করার জন্য দাবি উঠছে হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপনের। একদিকের সংকীর্ণতা অন্যদিকেও তার প্রবল প্রতিক্রিয়া তোলে। ভারতের রাষ্ট্রজীবনও আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষে আচ্ছন্ন। নেহেরুপন্থীরা যতই প্রতিবাদ করুন, যতই চোখ রাঙান না কেন, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খল পম্পাকে এড়ান সম্ভব নয়। তাই নেহেরুর উদারতার বুলি সত্ত্বেও গান্ধী বলি পড়লেন, সাম্প্রদায়িকতার কাছে, তারপর থেকে ধাপের পর ধাপ বেয়ে সাম্প্রদায়িকতা কেবলি উর্ধ্বশীর্ষ হয়ে উঠছে। হুঁতু বেড়ালালে ভারতবর্ষ আটকা পড়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভাদ

কেবল তাই নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিপদ স্বীকৃতির ধারণা করেছে। ভারতবর্ষেও পাকিস্তানের সমাজের ভেতরে যেমন হিন্দু-মুসলমান সরাসরি ঘিণ-বিভিন্ন হয়ে উঠছে, ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরস্পর সংঘর্ষ তেমনি তীব্র হয়ে উঠছে। দেশ বিভাগের আগে যা ছিল সাম্প্রদায়িক মারামারি, আজ তা স্বীকৃত ও বর্ধিত হয়ে রাষ্ট্রসংঘর্ষে পরিণত হয়েছে। এখন শুধু জনতায় জনতায় লাঠি সোঁটার মারামারি নয়, এখন আবির্ভাব হয়েছে দুইটি সামরিক শক্তির, দুইটি প্রবল রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা। এখানেই শেষ নয়। এই সংঘর্ষ আরো সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। যে

সাম্প্রদায়িকতাকে স্বীকার করে নিয়ে নেহেরু-প্যাটেল চক্র দুইটা রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তার স্বদূর প্রসারী শিকড় আজ ভারতেই আবদ্ধ থাকেনি, সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। পাকিস্তানকে স্বজন করেছে ইঙ্গ-আমেরিকা, তাকে রক্ষা ও লালন করার ব্যবস্থাও তারাই করেছে। যে কারণে পাকিস্তানের সৃষ্টি সেই কারণেই একে শক্তিশালী করাও ইঙ্গ-আমেরিকারই স্বার্থ। তাই এদিকেও ভারতের বিপদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুসলীম ব্লক গঠন

মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-আমেরিকা সমস্ত মুসলীম রাষ্ট্রগুলিকে সংঘবদ্ধ করেছে। আগামী বিশ্বযুদ্ধে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবার চেষ্টাই এর উদ্দেশ্য। পাকিস্তানে ইসলামী জিগির তুলে তাকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করে এই মধ্য প্রাচ্যের মুসলীম সংহতির সঙ্গে যুক্ত করে দিলেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তাই ইঙ্গ-আমেরিকার অন্তরঙ্গ মুসলীম-প্রীতি। তাই পাকে প্রকারে মুসলীম রাষ্ট্রগুলিকে তাবেগারিতে রেখে ভারতের বিরুদ্ধে পৃষ্ঠপোষণ দান করা। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ইরানের শাহার পাকিস্তান সফর, ইতিপূর্বেকার করাচী বিশ্ব-ইসলাম সম্মেলন এবং মধ্যপ্রাচ্যে আরব লীগের রাজনীতি, এসবই ইঙ্গ আমেরিকার স্বার্থস্বজ্ঞে বাঁধা। পাকিস্তানকে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যুক্ত করে একটি ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা বিশ্বযুদ্ধের রণনীতির অঙ্গ। তাই পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র, পেট্রল, রাইফেল, এরোগেন দিয়ে ইঙ্গ-আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরে সাহায্য করেছে। তাই পাকিস্তান আজ শক্তিশালী ও সুসুস্থ। নেহেরু সরকার বিশ্বরাজনীতিতে আজ বন্ধুহীন। ইসলামের শ্লোগান দিয়ে ইঙ্গ-আমেরিকা পাকিস্তানের দিকে মোসলেম রাষ্ট্রগুলিকে ভিড়িয়ে দিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানকে সৃষ্টি ও স্বীকার করে নিয়ে নেহেরু-প্যাটেল নেতৃত্ব আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িকতার

বেড়াঙ্গালে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। নিজেদের কর্ণের দ্বারা তাঁরা সাম্প্রদায়িক দানবকে সৃষ্টি করেছেন এখন সেই দানব ভারতরাষ্ট্রকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করছে। স্টেটসম্যান, ম্যাকেষ্টার গার্ডিয়ান প্রভৃতি বিলাতী কাগজে ভারতের বিরুদ্ধে ও দানবের সমর্থন নিয়মিত চলেছে এবং আন্তর্জাতিক শক্তিতে পুষ্ট এই মধ্য-যুগীয় প্রতিক্রিয়া ভারতকে উচ্ছেদ করারাবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ অনিবার্য

পূর্ববাংলার হত্যাকাণ্ডে পাকিস্তানের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। আজ হোক কাল হোক পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য। কারণ পাকিস্তান যুদ্ধ চায়। কেন যুদ্ধ চায় তার মৌলিক কারণ পাকিস্তানের অস্তিত্বের ও উপস্থিতির মধ্যেই বিতর্মান রয়েছে। দুইজাতি তত্ত্ব এবং হিন্দুবিষেধ, এই দুই থেকেই পাকিস্তানের জন্ম। এই দুইকে ফাঁপিয়ে তুলে চিরস্থায়ী করে রাখাই পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায়। কৃত্রিম উপায়ে যার স্বজন কৃত্রিম উপায়েই তাকে রক্ষা করতে হবে। বিষে বা hatred কে ফেনিয়ে তোলা, জিবাংশাবৃত্তিকে ফাঁপিয়ে তোলা ভারত এবং হিন্দুর সঙ্গে পাকিস্তানের ব্যবধান পার্থক্য ও সংঘর্ষকে দুনিবার ও দুর্ভিতক্রম্য করে তোলা, এই হল পাকিস্তানকে বাঁচাবার একমাত্র পথ। তাই ভারতের সঙ্গে ঐক্যের কথা এদের কাছে অসম্ভব, দুই বাংলার মিলন ও সহযোগিতা এদের কাছে বিষবৎ পরিত্যজ্য। তাই যারা ঐক্য ও মৈত্রীর কথা বলেন তারা এদের কাছে public enemy no 1। তাই গোড়া থেকেই যুদ্ধ দেখি মনোভাব সৃষ্টি, যুদ্ধের ideology প্রচার করে সংঘর্ষকে উদ্দাম করে রাখা এই হল পাকিস্তানী রণকৌশলের ভিত্তি। ভারত যেদিকে যাবে তার উন্টোদিকে যাওয়া চাই, ভারত ডিভ্যালুয়েশন করলে পাকমুদ্রার মূল্যহ্রাস কিছুতেই না। ইত্যাদি।

এই হল প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ হলো পাকিস্তানের সীমান্ত সম্প্রসারণ। মিঃ জিন্নার কল্পনার পাকিস্তান তো মিলে নাই। কলকাতা, পুরো বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, পুরো পাঞ্জাব ও পাওয়া যায় নাই। এই ভগ্ন ও খণ্ডিত পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখা দূর ভবিষ্যতে মুক্তি হবে। কেবল হিংসা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে কোন মতে অস্তিত্বটুকু কিছুদিন টিকিয়ে রাখা চলে। কিন্তু দীর্ঘদিন এবং পোখুত ভাবে পাকিস্তানকে শক্ত ভিত্তির ওপরে স্থাপন করতে হলে এর আকার বড় করতে হবে। তাই পশ্চিম বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, কুচবিহার এবং বাকি পাঞ্জাবটুকুকে গ্রাস করতেই হবে। তাই তার প্রস্তুতি চলেছে ছ'বছর যাবৎ। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই এই পরিকল্পনা লীগ নেতাদের ছিল। তাই ভারতবর্ষের বিপরীত পথে—বিরোধ ও সংঘর্ষের দিকে—সুচিন্তিত কর্মপন্থায় পাকিস্তানকে চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে প্রথম থেকেই। তাই স্বাধীনতার প্রথম দিবসেই দারুণ হত্যাকাণ্ডের সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানকে হিন্দুশিখশূদ্ধ করা হল। তারপর রজাকারদের বিদ্রোহ ও নৃশংসতা। তারপরেই বিনা কারণে কাশ্মীর আক্রমণ এবং ইঙ্গ-আমেরিকার চাপ দিয়ে নেহেরুকে উনোতে আনা এবং ভারতকে কৌশলে যুদ্ধের চরম অধ্যায়ে অগ্রসর হতে না দেওয়া, তারপরই পূর্ববাংলার হত্যাকাণ্ড। অবিকল পাঞ্জাবের কার্যপন্থার অনুকরণ। সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত জেলাগুলিতে বলপূর্বক সম্প্রসারণ এবং পরিকল্পনা করে সীমান্তরেখা ধরে মুসলমানদের বসান ও ঘাঁটি স্থাপন। আসাম কুচবিহার, ত্রিপুরা, মুর্শিদাবাদ নদীয়া, প্রভৃতি স্থানে নীরবে অনুপ্রবেশ এবং ভারতে শুণ্ডচর দিয়ে ছেয়ে ফেলা। এই পরিকল্পনা ধাপে ধাপে বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। পাকিস্তানের অস্তিত্বকে বাঁচাতে হলে, বাংলা, পাঞ্জাব, আসাম চাই, তাই যুদ্ধ ও চাই।

অবশ্য ভারতের সঙ্গে মৈত্রীর পথেও পাকিস্তানকে

বাঁচান চলতে পারত। সেই কল্পনাই দেশবিভাগের মূলে ছিল। কংগ্রেসী নেতারা সেই মৈত্রীতে বিশ্বাস রেখেই চলেছেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, দুই রাষ্ট্রই সংখ্যালঘুকে রক্ষা করবে এবং মৈত্রী ও সহযোগিতার মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রগঠনে আত্মনিয়োগ করবে। তাই তারা পাকিস্তানী প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে নিশ্চিত ছিলেন। পাকিস্তান কিন্তু সে পথে যায়নি। কারণ মৈত্রীর পথে গেলে একদিন দুই রাষ্ট্রের ঐক্য ও মিলনের কথাও আসবে। জনসাধারণ সহজেই মিলনের দিকে ঝুঁকবে। অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সেই পথে নিয়ে যাবে। মিলন হলে বর্তমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নেতাদের প্রভুত্ব ও অস্তিত্ব নুপু হবে। কাজেই পাকিস্তানকে সংঘর্ষের পথে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধের সাহায্যে ও ইঙ্গ-আমেরিকার পোষকদের সাহায্যে একে রক্ষা করতে হবে। তাতে বর্তমান নেতৃত্ব তার মধ্যযুগীয় কর্তৃত্ব ও শোষণ ব্যায় রাখতে পারবে। এজন্য ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানকে প্রস্তুত করতে হবে। এপথ ছাড়া পাকিস্তানী নেতৃত্বের অন্য পথ নেই। তাই যুদ্ধ অনিবার্য।

বর্তমান হত্যাকাণ্ড কেন

যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রথমত পাকিস্তানের আর্থিক সংকট ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। মুদ্রামূল্যহ্রাস না করার দরুণ পাটের বাজারে ও চাষীর জীবনে হাহাকার দেখা দিল, কয়লা উৎপাদন, যানবাহন, বাণিজ্য সবদিকেই সংকট এলো। এই অর্থসংকটকে অন্তর্জাত চালানা করে বিলম্ব করা প্রয়োজন হল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পথে চালানা করাই সবদিকে সহজ ও সুকর। দ্বিতীয়তঃ বাংলা ভাষা ধ্বংস করে উর্দু আরবি চাপান দরকার। ভাষা দুই বাংলার ঐক্য ও মিলনকে একদিন ছুঁনিবার করে তুলতে পারে। তাছাড়া পাঞ্জাবী-সিদ্ধি-বেহারীর জুলুম, প্রভুত্ব ও গ্রাসের প্রতি বাঙালী

মুসলমানের বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ একদিন ভাষার পথ বেয়েই ছুই বাংলার মিলনে এসে পৌঁছাতে পারে। পূর্ববঙ্গের মুসলীম জীবনে বাঙালী-অ-বাঙালী বিরোধ ও সংঘর্ষকেও তাই, ভিন্ন খাতে চালনা করা প্রয়োজন, তার প্রশস্ত উপায় হিন্দুবিদ্বেষ ও পাক-ভারত সংঘর্ষকে উত্তাল করে তোলা। তৃতীয়তঃ কাশ্মীরের শেষ অধ্যায় আসন্ন হয়ে এসেছে। উনোর নতুন শীমাংসা এবং হয়ত গণভোট শীগগিরই হয়ে যাবে। তার লক্ষ্য হিন্দুমুসলীম বিদ্বেষকে অপরিণীম ও অকথ্যভাবে হিংস্র করে তুলতে হবে। গুরুতর সংকট সৃষ্টি হলে ইজ-আমেরিকার হস্তক্ষেপের অযোগ্য হবে। চতুর্থতঃ হিন্দুদের সচেতন ও স্বচ্ছল অংশকে উচ্ছিন্ন এবং বিতাড়ন করতে পারলে পাক-ভারত যুদ্ধে এরা পঞ্চম বাহিনীর কাজ করতে পারবেন। পাক-ভারত যুদ্ধ যত আসন্ন হবে ততই হিন্দুদের উৎসাদনের প্রয়োজনও বেশী হবে। পঞ্চমতঃ উৎসাদিত হিন্দুদের বিপুল সম্পত্তি এবং লুণ্ঠের সম্পদ আর্থিক সংকটকে অনেকাংশে নিরসন করবে। তাদের আবাসগৃহ, জমিতে বিহারী, প্রমুখ শরণার্থীদের পুনর্বসতি সহজ হবে। ষষ্ঠতঃ পাকিস্তানীরা ভারতীয় নেতৃত্বের দ্বর্ভলতা জানে। তারা জানে রক্তপাত, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার এতি ভয় ভারতীয় হিন্দু ও বিশেষতঃ কংগ্রেসী নেতাদের অস্থিমজ্জায় ছেয়ে আছে। ১৯৪৬ সনে প্রত্যক্ষসংগ্রাম এবং নোরাখালির ও ১৯৪৭ এ পাকিস্তানের হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতার দ্বারা তারা পাকিস্তান পেয়েছে। রক্তপাত ও বর্বরতার ভয়ে নেতারা দীর্ঘদিনের বীরত্বব্যঞ্জক আত্মত্যাগ করে রাতারাতি দেশ বিভাগে রাজি হয়ে গেলেন। এক চালে পাকিস্তান ভূমিষ্ট হল। আবার আর এক দফা হত্যাকাণ্ড দ্বারা কংগ্রেসী নেতৃত্বকে শায়েস্তা করে কাশ্মীর ত্যাগে, নদীজল দানে, ডিভালুয়েশন বর্জনে এবং ইজ-আমেরিকার হস্তক্ষেপ স্বীকারে বাধ্য করা যাবে। তারা জানে ভারতীয়দের মধ্যে দলাদলি ও অনৈক্যের কথা। যে জাতি

রক্তপাতে ভয়বিহ্বল হয় এবং অহিংসার নামে ক্রীষকের উপাশক হয়, তারা নির্মম শত্রুর কাছে দাঁড়াতে পারে না, আপোষের জন্ত পাগল হয়। যে জাতি হাজার অনৈক্যে জর্জর, স্ব-স্ব প্রধান ও কলহ-মত্ত তারা ধর্মোন্মাদী ঐক্য ও বর্বরতার কাছে হঠতে বাধ্য। পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক ক্যাসীবাদী নেতৃত্ব একথা জানে, তাই তারা এমন অবলীলাক্রমে এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড প্রকাশভাবে করতেও দ্বিধা করে না। তারা জানে নেহেরুর দোহল্যমান দ্বর্ভল চিন্ততার কথা এবং বাক্‌সর্বস্ত্র অকর্ণ্য নেতৃত্বের কথা। তারা জানে ইজ-আমেরিকার চক্রান্তকারীরা তাদের সব বর্বরতার ইচ্ছানদাতা এবং পৃষ্ঠপোষক। তাই বর্বরতা আজ এমন নির্লজ্জ ও উলঙ্গ হয়ে ভারতবর্ষকে, তার মনুষ্যত্বকে, তার মর্যাদাকে এমন আঘাত করল। এ হত্যাকাণ্ড সাধারণ সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ঘৃণার একটা সাময়িক বিস্ফোরণ মাত্র নয়। এ হলো দীর্ঘকালের উপযোগিতা ও দৌর্ভাগ্য অমুসারে অশৃংখলভাবে সম্পাদিত অনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম। এর পেছনে শুধু পাকিস্তানের নয়, ইজ-আমেরিকার অদূর প্রসারি স্বার্থসিদ্ধির হীন প্রচেষ্টা। ভারতবর্ষের নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক নীতিকে ভেঙ্গে ইজ-আমেরিকান গোষ্ঠীতে যোগ দিবার জন্ত চাপ দেওয়া এই ক্যাসীবাদী কার্যসূচীর লক্ষ্য।

প্রতিকারের পথ

কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা এটা বুঝতে পারেননি। একদিকে নেহেরু মাউন্টব্যাটেনী মিষ্টিকথায় ভুলেছেন, অন্যদিকে পাকিস্তানী আত্মাশেও প্রভাবিত হয়েছেন। আপোষে দেশ-বিভাগ হল, আপোষেই ভারত-পাক সম্বন্ধ মধুর থেকে মধুবতর হয়ে উঠবে। এই ছিল ভারতীয় নেতাদের মনের বিশ্বাস। তাই যখন নেহেরু নীতিকথা ও উচ্চ তত্ত্বে মশগুল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন তখন পাকিস্তান ও ইজ-আমেরিকার যড়যন্ত্র কূটপথে জাল বিস্তার করে চলেছে। সকলেই নিশ্চিন্ত

হিলেন যে পাকিস্তান পেয়ে পরিতৃপ্ত মুসলীম লীগ কখনো দাঙ্গা হাঙ্গামা করবে না। আজ সকল বিশ্বাস ও সকল ভুলকে নিমূল করে পাকিস্তানের নির্ঘম মূর্তি বেরিয়ে এসেছে। ফল হয়েছে পূর্ববাংলায় হিন্দুদের সকল ভরসা ও বিশ্বাস লুপ্ত হয়েছে। সর্বব্যাপি হত্যালীলার কিছু বিরাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট হিন্দুসমাজ পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম দিকে রওনা হয়েছে। দুর্বীর বস্তার মতো সব বাধা ভেঙ্গে এই জলপ্রোত ভারতে এসে পৌঁছাবে। পুরাণো আশ্বাসবাণী এবং প্রতিশ্রুতি আজ অকেজো। বস্ত্র জস্তর সঙ্গে মানুষ বাস করতে পারে, কারণ তার রীতি ও প্রকৃতি জানা সম্ভব। কিন্তু উন্নত মানব-পশুর সঙ্গে বসবাস অসম্ভব, তার নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার কোন সীমা নাই, রীতি নাই। যারা আজও পূর্ববাংলায় হিন্দুকে থাকতে বলবেন, ইতিহাসের চোখে তারা পাতকী। এতবড় নিষ্ঠুরতা ভারতের নেতারা করবেন ভাবা যায় না। করলে তাদের প্রায়শ্চিত্ত ও পরিণাম অচিরে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে এগিয়ে আসবে। ইসলামী পূর্ব-বাংলায় হিন্দুর জীবন শেষ হয়েছে। তবে পথ কোনদিকে?

পথ তিনটে আছে। প্রথমঃ লোকোপসরণ অর্থাৎ ১ কোটি হিন্দুকে সরিয়ে ভারতে আনা। কিন্তু এক কোটি নরনারীর জীবনকে উৎপাটন করার মত এত বড় সমাজ-বিপর্যয় ভারতীয় নেতারা সামলাতে পারবেন না। দ্বিতীয়তঃ লোকবিনিময় অর্থাৎ এক কোটি হিন্দু আসবে আর চার কোটি মুসলীম ভারত থেকে যাবে। এতে পাকিস্তান তিন কোটি মুসলমানের উপযুক্ত জমি ও ভূভাগ দাবি করবে। অর্থাৎ পাকিস্তান ও বাংলা চাইবে। এও অসম্ভব। তৃতীয়তঃ পূর্ববাংলায়ই হিন্দুকে নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা দান করা। তার পথ হল পাকিস্তানকে শায়েস্তা করা এবং সৈন্ত পাঠিয়ে 'Police action' করা। সভ্যজগতে বিংশ শতকে চোখের ওপরে একটা গোটা মানবসমাজের বর্বর উৎসাদন হতে দেখলে, মানবতার নামে আক্রমণ ও হস্তক্ষেপ করা প্রত্যেকের

নৈতিক দায়িত্ব। তাছাড়া দেশবিভাগের মূলগত চুক্তি—সংখ্যালঘুর রক্ষা ও শৃংখলা বজায় রাখা—ভঙ্গ করেছে পাকিস্তান। পাক-ভারত আপোধ চুক্তির বলেই ভারতের হস্তক্ষেপের অধিকার রয়েছে। এই হস্তক্ষেপ কেবল আইনগত অধিকার নয়, এটা পবিত্র ও মহান কর্তব্য।

ইসলামী রাষ্ট্রের নামে যতদিন ভারতের পাশাপাশি থাকবে পাকিস্তান, যতদিন এই মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়ার দুর্গ ছুই পাশে বজায় থাকবে, ততদিন শান্তির আশা বুধা। প্রতি পদে উদ্ধত সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া ভারতকে আঘাত করবে। তাছাড়া হিন্দুদের যুদ্ধ বন্দী বা hostage করে রেখে বারবার স্বার্থ ও স্বযোগ মত হত্যালীলা ও লুণ্ঠন চালাবে। এতে শাশ্বত ঠোকাঠুকি ও শেষে যুদ্ধ অনিবার্য। ভারতের সমাজ-জীবনও বারবার সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার ডেউ লেগে বানচাল হবে। সমস্ত প্রগতিধারার চিরতরে সমাধি ঘটবে। এই প্রতিক্রিয়াকে উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত ভারতে প্রগতি আন্দোলন বিফল হবে থাকবে। এছাড়া পাকিস্তানই একদা ভারতকে আক্রমণ করে যুদ্ধে টেনে নামাবে। কিন্তু তখন ভারত প্রস্তুত থাকবে না। সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি ও সামর্থ্যে পাকিস্তান তখন শক্তিশালী থাকবে। সেই অনিবার্য পরিণতির হাত থেকে রেহাই পেতে হলে ভারতকে সক্রিয় হতে হবে। দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে প্রতিক্রিয়ার দুর্গে আঘাত হানতে হবে। সেই আঘাত হানবার সময় এসে অভিক্রান্ত হতে চলছে। ১০ই ফেব্রুয়ারীর পরে ছমাসের বেশী পার হয়ে গেল কিন্তু কোথায় সেই আঘাত করবার প্রচণ্ড শক্তিমত্তা? একমাত্র ও অদ্বিতীয় যে পথ সেদিকে পা বাড়ানোর পৌরুষ যদি না থাকে তবে এ জাতির মৃত্যু অনিবার্য। ভারতবর্ষ কি এই লজ্জাকর মৃত্যুকেই বরণ করবে?

হার ভারতবর্ষ।

কিন্তু ভারতের নেতৃত্ব আজ নেহেরুর হাতে। এই দুর্ভাগ্যই ভারতবর্ষকে মারবে। যখন প্রলয়ংকর সর্বনাশ

ভারতের ইতিহাসে আজ চরম মুহূর্ত আগত। ইতিহাস
আজ ডাক দিয়েছে ভারতের মনুষ্যধর্মকে এ ডাক সর্বস্বপ্ন
করে আগুনে বাঁপ দেবার ডাক। কাপুরুষতার বিরুদ্ধে,
বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ডাক। যেরে যেরে বিদ্রোহীরা কি
তৈরী হবে না? সর্বনাশের সম্মুখে এসেও এদেশের তারণ্য
কি ঘুমিয়ে থাকবে? হায়।

সুলেখা
ঐতিহ্য
দেশে ও বিদেশে সমান প্রিয়...।

সুলেখা
ফাউন্টেন পেন-এর কালি

এই সব রঙে পাবেন :
ব্লু ব্ল্যাক • ব্রয়াল ব্লু • ব্ল্যাক
রেড • গ্রীন • ভায়োলেট
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২



ভারতে সংহতি-সাম্রাজ্য ও ঐক্য-প্রতিষ্ঠা

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ নামে ররীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ আছে। সেই প্রবন্ধে কবি যা বলেছেন, তা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। কবি বলেছেন—আমরা ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পাঠ করি, উহা প্রকৃত ইতিহাস নয়, কেননা উহাতে ভারতের অন্তরঙ্গতার সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা ভারতের ইতিহাসে বিভিন্ন রাজ্য ও রাজার উত্থান-পতনের কাহিনী এবং শক্তিশালী বিদেশী জাতির দখিৎস ও রাজ্য-বিস্তারের বিবরণ পাঠ করি, ফলে, ভারতের যথার্থ মহিমাই আমাদের চোখে ম্লান হয়ে পড়ে। আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে নিজের আত্মাকে এবং নিজের মধ্যে সনাতন ভারতকে আবিষ্কার করতে পারি না। ররীন্দ্রনাথের মতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনাই ভারতের বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই এ দেশের ইতিহাস রচনা করা উচিত।

ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেই যে শুধু ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করেছে, তাই নয়, জাতীয় সংহতি স্থাপনেও ভারতবর্ষ আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে নানা জাতি ও নানা সম্প্রদায়ের দ্বারা অধ্যুষিত ভারত এক বিচিত্র দেশ। তাই সমগ্র ভারতবাসীকে একজাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করার পথে বাধা অনেক। ‘ভারত-কলঙ্ক’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

‘এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্মের প্রভেদে নানা জাতি। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত,

প্রাচীন-ভাষা ৪

জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতামুগ্ধ হইবে? ধর্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই। রাজপুত জাঠ এক ধর্মাবলম্বী হইলেও ভিন্নদেশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি, বাঙ্গালী বেহারী এক বংশীয় হইলেও ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি, মৈথিলী কনৌজী একভাষী হইলেও নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট; যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্বত্র এক যাহাদের এক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই। তারপর তিনি বলেছেন—

‘ইতিহাসকীর্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দুসাম্রাজ্য মধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল।’

এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে শিবজী ও রণজিৎ সিংহের কীর্তির উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রশ্ন হচ্ছে—

সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?

উপসংহারে তিনি বলেছেন—

‘ইংরেজ আমাদের নূতন কথা শিখাইয়াছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিন্তাভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে..... স্বাভাবিকপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য।’

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলেছেন, তিনি ‘নেশন’ অর্থে ‘জাতি’ কথাটির প্রয়োগ করেছেন। তিনি এখানে জাতিপ্রতিষ্ঠার যে আদর্শ গ্রহণ করেছেন, তা হচ্ছে প্রতীচ্য আদর্শ। কিন্তু ভারতের ঋষি ও মনীষিগণের মনে যে এক জাতীয়তার একটি স্বতন্ত্র আদর্শ ছিল, সে কথাটি আজ গভীর ভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

মহর্ষি বাজীকি, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ও মহাকবি কালিদাস অথও ভারতের কবি, আর ভগবান বুদ্ধ, আচার্য্য শঙ্কর ও শ্রীমন্নহাপ্রভু অথও ভারতের ধর্ম-সংস্থাপক। ভারতের মহর্ষিগণ, মহাকবিগণ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রবর্তকগণ নিখিল ভারতকে ঐক্যস্থত্রে গ্রথিত করেছেন। অবশ্য এই ঐক্য হচ্ছে ভাবগত, ধর্ম ও সংস্কৃতিগত। ভারতীয় ঋষির কণ্ঠে ‘সংগচ্ছস্বম্ সংবদন্তম্’ ইত্যাদি মন্ত্রে আমরা সর্বপ্রথমে ঐক্যের বাণী শুনতে পাই। ভারতের ঋষি যে ‘আর্য্যাকরণের’ নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারও উদ্দেশ্য ছিল, আর্য্যেতর জাতিসমূহের মধ্যে কল্যাণ-বুদ্ধি জাগ্রত করে তাদের এক দৈবী সভ্যতার দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করা। সীতা-উদ্ধারের ছলে লোকোত্তর পুরুষ শ্রীমদচন্দ্রও এই মহাত্মতাই উদ্ঘাপন করেছিলেন। সীতা-উদ্ধারের পর কিস্কিন্দায় হুগ্রীব ও লঙ্কায় বিভীষণের রাজত্ব এ দিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। তাই ত্রেতাযুগে শ্রীমদচন্দ্র অথও ভারতের প্রতিষ্ঠাতা।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার জন্তে এবং নিখিল মানবের কল্যাণ-সাধনের জন্তে লক্ষ লোক মহাভারত রচনা করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—
জ্ঞী, শূদ্র ও বিজবদ্ধগণ বেদে অনধিকারী, সেই জন্তে কোন্ কর্মের দ্বারা শ্রেয়োলাভ হবে, সে বিষয়ের বিচারে তাদের বুদ্ধি বিলান্ত হয়, আর সেজন্তেই মুনি ব্যাসদেব রূপাণ্বক ভারতখান রচনা করেছেন। এই মহাগ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্যই সর্ব মানবকে কল্যাণের পথ নির্দেশ করা। (প্রথম স্কন্ধ,

চতুর্থ অধ্যায়।) আবার যিনি এই মহাভারত ধীরভাবে পাঠ করেন, তিনি সকল শাস্ত্রের সারমর্ম অবগত হবেন, কেননা, ‘যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে’। সকল উপনিষদের সার ভগবদ্গীতা (ইহাও একখানি উপনিষৎ) এই মহাভারতের ভীষ্মপর্বেরই একটি সামান্য অংশ-মাত্র।

‘যা’ নাই ভারতে, তা নাই ভারতে,’—এ কথাটি যেন মহাভারতেরই একটি শ্লোকের প্রতিধ্বনি। শ্লোকটি হচ্ছে —
‘ধর্মো চার্ধে চ কামে চ মোক্ষো চ ভরতর্ষভ।

যদিহাস্তি তদন্তত্য় যস্মৈহাস্তি ন কুত্রচিৎ’ ॥

হে ভরতর্ষভ, চতুর্বিধ গম্যক্কে অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সম্পর্কে, এখানে যা আছে, তাই অন্তত আছে, এখানে যা নাই, তা কোথাও নাই।

বাস্তবিক, ভারতীয় সংস্কৃতির এমন কোনো ধারা নাই, যা মহাভারতে এসে মিলিত হয় নি। আমরা মহাভারত পাঠের পূর্বে যে শ্লোকটি উচ্চারণ করি, সেটিও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

‘নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ’ ॥

শ্লোকটির সরলার্থ * হচ্ছে—নারায়ণ অর্থাৎ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, নরোত্তম নর অর্থাৎ অর্জুন; দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করে জয় উচ্চারণ করবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মহাভারতের প্রতিষ্ঠাতা ও নব ভারত-ধর্মের উদ্ভাতা, তিনি মহাসময়ের আচার্য্য ও ভারতাস্থার বাণীমূর্তি, নরোত্তম অর্জুন তাঁরই শিষ্য ও লক্ষ্য, নানা বিরুদ্ধ গুণ তাঁর ভেতর সমন্বিত, তাঁর বুদ্ধি যখন মোহগ্রস্ত, তখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, আবার দেবী সরস্বতী হচ্ছেন পরা ও অপরা বিজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী, আর তাঁরি প্রসাদে ভগবান

* আচার্য্য নীলকণ্ঠের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আমাদের গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

বেদব্যাসের ধ্যানে ভারত-সংস্কৃতির বিচিত্র ধারা মিলিত হয়েছে।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম, তিনি যে পরিশূর্ণ মানবতার আদর্শ, ভীষ্মকৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তবে তার প্রশংসা আছে। আবার তিনি মহাভারত বা অথগু ভারতেরও প্রতিষ্ঠাতা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

‘তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) শারীরিক বৃত্তিসকল সর্বদীপ ফুটিপ্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্য ও অপরিমেয় বলে পরিণত; তাহার মানসিক বৃত্তি সকল সেইরূপ ফুটিপ্রাপ্ত হইয়া সর্বলোকাতীত বিজ্ঞা, শিক্ষা, বীৰ্য্য এবং জ্ঞানে পরিণত এবং প্রীতিবৃত্তির ওদম্বরূপ পরিণতিতে সর্বলোকের সর্বহিতে রত। যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব নিকাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিকাম হইয়া, এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্বজ্ঞানী এবং পরের সাম্রাজ্য স্থাপনের কর্তা হইয়াও, আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণের প্রচার করিয়া, তারপর কেবল দণ্ড প্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন, বেদে ধর্ম্ম নহে,—ধর্ম্ম লোকহিতে—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি’।

যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের শেষের সময়ে ভীষ্মদেব তাঁকে বলেছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষোত্তম, হুতরাং প্রথম অর্ঘ্য তাঁরি প্রাপ্য। অমানব প্রতিভার বলে তিনি একদিকে ভারতের তৎকাল-প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ ও বিচিত্র ধর্ম্মমত সমূহের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করেছিলেন, অপর দিকে ‘খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষকে এক’ ধর্ম্মরাজ্য-পাশে বেঁধে দিয়েছিলেন’। কবি নবীনচন্দ্রের কাব্যভরীতে দুর্ব্বাসা

হচ্ছেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতিনিধি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ব্রত ছিল অর্ঘ্য ও অনাৰ্য্য জাতিকে মিলিত করে মহাভারতের প্রতিষ্ঠা করা। কাব্যভরীতে নবীনচন্দ্র অনেকাংশে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করলেও তাঁর পরিকল্পিত শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের বীজ রয়েছে মূল মহাভারতেই।

মহাভারতে এমন একটি শ্লোক আছে যার তাৎপর্য্য বিশেষ ভাবে প্রশ্রয়দায়ক। শ্লোকটি এই:

‘গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি ত্রিবিধিতে।

চতুর্গকর সংযুক্তে পুনর্জন্মো ন বিভ্রতে’।

গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ এই চারটি ষাঁর স্বপ্নে অবস্থিত, তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না’। গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এই ‘গকার’-চতুষ্টয় সমগ্র ভারতবাসীকে একদিন ঐক্যমুদ্রে আবৃত করেছিল। ষাঁরা নিজেদের বৈদিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন, তাঁরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁদের চিন্তা-ধারার মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে ঐক্য ছিল। তাঁরা সকলেই ‘গীতাকে’ শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী ও সকল উপনিষদের সারভূতা বলে মনে করতেন, গঙ্গাকে তাঁরা পতিতপাবনী ও কলুষনাশিনী বলে বিশ্বাস করতেন, গায়ত্রীমন্ত্রে ত্রিভাতি মাত্রেয়ই (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলেরই) অধিকার ছিল আর গোবিন্দ সকলেরই নিকট ছিলেন স্বয়ং ভগবান্। (মনে রাখতে হবে, রাধা গোবিন্দের সেবা ও ভজনা গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে মানব জীবনের পরম মঙ্গলের হেতু কিন্তু একমাত্র গোবিন্দই সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর উপাস্ত।) তাই বলতে হয়, এই গ-কার—চতুষ্টয়কে যিনি সর্বদা স্বপ্নে ধারণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভারতের আত্মার সন্ধান পেয়েছেন।

বাণীর বরপুত্র কালিদাসও অথগু ভারতের কবি, আর এই অথগু ভারতের ছবি অঙ্কিত হয়েছে রঘুর দ্বিবিজ্ঞয়ে আর মেঘের দীর্ঘ পথ-পরিভ্রমায় যে পথ রামগিরি থেকে অলকা-পুরী পর্য্যন্ত প্রসারিত। ভারতীয় ঋষির আদর্শ, ভারতের

কাজশক্তির আদর্শ, ভারতের গাহস্থ্যার্থ ও দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে কালিদাসের রঘুবংশে, কুমারসম্ভবে, মেঘদূতে ও অভিজ্ঞানশকুন্তলে, তাঁর মধ্যে শুধু নব-নব উন্মেষ শালিনী বুদ্ধিই ছিল না, সমগ্র ভারতবর্ষকেই তিনি কণ্ঠ্যগের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। তাঁর কবি-মানসে পূর্ব সুরিগণের ভাবনা সংহত ও কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

ধর্ম-সাধনার ভেতর দিয়েও আমরা অনুভব করি যে ভারত অখণ্ড ও অবিভাজ্য। আমরা দেবপূজার জন্য সকল সময় তীর্থসলিল সংগ্রহ করতে পারি না। কিন্তু আমরা যখন

‘গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নর্মদে সিদ্ধকাবেরি জলেহস্মিন্ স্নিগ্ধিঃ কুরু’।

এই মন্ত্র উচ্চারণ করি, তখন আমাদের মনে জেগে ওঠে অখণ্ড ভারতেরই ছবি,—শুধু আখ্যাবর্ত নয়, শুধু দাক্ষিণাত্য নয়, সমগ্র ভারতের মহিমাই আমাদের মনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা মনে করতেন, ভারতভূমি শুধু কৰ্মভূমি নয়; পুণ্যভূমিও বটে, মানুষ বহু পুণ্যের ফলেই এই দেশে জন্ম গ্রহণ করে। ভারতের ঋষিগণের দিব্যদৃষ্টিতে পঞ্চ জননীর মহিমা প্রকটিত হয়েছিল। এই পঞ্চ জননী হচ্ছেন—পার্শ্ব জননী, গাভী, জন্মভূমি, ভূতধাত্রী পৃথিবী ও নদী। (কেননা নদীই পৃথিবীকে শস্তশালিনী করে ভূতগণকে সজীবিত রাখে)। আমাদের শাস্ত্রে হোম, তর্পণ ও ঋষিগণের ভেতর দিয়ে দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও ঋষি-ঋণ পরিশোধের নির্দেশ আছে। তা ছাড়া আমাদের জননীর সেবা, স্বদেশের কল্যাণ-সাধন ও লোকহিতের মধ্য দিয়ে মাতৃ-ঋণও পরিশোধ করতে হয়।

আমাদের ঋষিগণ আমাদের জন্মে যে রিক্ত বা সম্পদ রেখে গেছেন, আমরা তার উত্তরাধিকারী এবং সেজন্মে আমাদের গর্ব অনুভব করা উচিত। ভগবান যহু বলেছেন—

‘এতদেবপ্রসূতস্ত সকাশাদগ্রহণ্য নঃ।’

সং সং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ’।

যে ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মসন্ত পুরুষ) এই দেশে (ভারতবর্ষ) জন্ম পরিগ্রহ করেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ তাঁর কাছ থেকে নিজ নিজ চরিত্র বা আচরণ শিখা করবেন।

মহুর বচন শুনে হয়তো এ কালের অনেকে বিক্রম করবেন, কিন্তু ভারতের অন্তরাস্তার ষাঁরা সন্ধান রাখেন তাঁরা জানেন, এদেশের অধ্যাত্ম সম্পদের ভেতরে নিহিত রয়েছে নিখিল মানবের কল্যাণ।

মহাভারতে ও বিবিধ পুরাণে যে তীর্থ-পরিভ্রমণের বিধান দেওয়া হয়েছে, তারও অস্বতম লক্ষ্য—ভারত যে একটি অখণ্ড সত্তা, এই চেতনা তীর্থযাত্রীদের মানসে জাগ্রত করা। তন্ত্রচূড়ামণি ও কালীপুরাণে একাধি এবং দেবী ভাগবতে একশো আঠটি পীঠস্থানের কথা পাওয়া যায়। পীঠস্থান-পরিভ্রমণের ভেতর দিয়ে আমরা একটি গভীর সত্য উপলব্ধি করি। সেটি হচ্ছে—আমাদের ভারতমাতা হচ্ছেন জগন্মাতা সত্যীমহিমা প্রভিচ্ছবি আর সন্তানের কাছে জননীর সকল অঙ্গই সমান পবিত্র। তা’ ছাড়া নানা প্রদেশের মানুষ তীর্থক্ষেত্র সমূহে মিলিত হতেন এবং তাঁদের ভেতরে সহজেই ভাবের আদান-প্রদান হতো।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে জাতীয় সংহতির আদর্শ অত্যন্ত হ্রাসপ্টি। মহিষাসুর-বধের প্রাকালে ক্রুদ্ধ দেবতাগণের দেহ থেকে সজ্জাত তেলোরাশি একত্রীভূত হয়ে একটি রমণীয় নারীরূপ ধারণ করলো এবং দেবগণ তাঁকে নিজ নিজ অলঙ্কার ও অস্ত্রাদি দান করলেন। তখন সেই দেবীর হৃদয়ে—

‘চুক্ষুঃ সকলা লোকা সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।’

চচাল বহুধা ‘চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ’।

সমস্ত লোক আকুলিত হোলো, সমুদ্র সকল কম্পিত হোলো, পৃথিবী বিচলিত হোলো, পর্বত সকল চঞ্চল হোলো।

এ স্থলে আমরা দেখতে পাই, দেবগণের বর্গরাজ্য উদ্ধারের মূলে ছিল তাঁদের জাতীয় সংহতি।

ভগবান বুদ্ধের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার আদর্শ শুধু বিশাল ভারতেই নয়, ভারতের বাইরেও নানা দিগ্দেশে প্রচারিত হয়েছিল। আবার কাণক্কে বৌদ্ধধর্মে যখন নানা গ্রামিণ প্রবেশ করেছিল, তখন আচার্য্য শঙ্কর তাঁর ক্ষুরধার মনীষা ও অপূর্ব সংগঠন-শক্তির প্রভাবে সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তারপর আবার একদিন জন্ম হেম-কল্পতরু: শ্রীমন্মহাপ্রভু যে প্রেমধর্মের প্রাবল্য এনেছিলেন, সে প্রাবল্যে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ভেঙ্গে গিয়েছিল। ভগবান বুদ্ধ, আচার্য্য শঙ্কর ও প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ধর্মসংস্থাপনের মধ্য দিয়েই জাতিকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। আবার বর্ধাঙ্গের ভারতবর্ষে কবীর, নানক, দাদু প্রভৃতি যে সব সাধু-সন্তের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁরা হিন্দু ও মুসলিম এই দুই বিপরীত সাধনার ধারাকে গঙ্গা ও যমুনার ধারার মতো মিলিত করেছিলেন।

ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্যে নিবদ্ধ। আমরা এখানে ব্যাপক অর্থে 'সাহিত্য' কথাটির প্রয়োগ করছি। এই সংস্কৃত ভাষাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে এবং বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি বিচিত্র ধর্ম-সম্প্রদায়কে একত্রে বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে। আজও দেখা যায়, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, দ্রাবিড়ী, কান্দ্রী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে আচার-গত, ব্যবহার-গত ও সংস্কৃতি-গত পার্থক্যের স্ফূর্তি নেই, কিন্তু এঁরা সকলেই একই ভাষায় বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করতেন এবং প্রাচীন ঋষিগণের অমূল্য মূল্য নিজে নিজে জীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন। এই ক্ষেত্রে গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ যখন সর্ব ভারতের বিদ্বজ্জন-সমাজের নিকট নূতন দর্শন ও রসশাস্ত্র এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐতিহ্যকে প্রচার করতে চাইলেন, তখন তাঁরা সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করলেন। সংস্কৃত

সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, কবি কবীন্দ্র, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিভাভূষণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের দান সামান্য নয়। তা ছাড়া, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিঃচিত্রিত প্রসিদ্ধ চরিত্রগ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের' সংস্কৃত টীকা রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীরাধামোহন ঠাকুরও বিভাভূষণের পদাবলীর সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করেছিলেন।

আজ বিশ বছর যাবৎ খণ্ডিত ভারতের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছি। 'সমগ্র ভারত এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য সত্তা'—এ কথাটি বিশেষ অর্থে হিন্দুধর্মের ভারত, পাঠান ও মোগল যুগের ভারত এবং ব্রিটিশ-যুগের ভারত-সম্পর্কে সত্য কিন্তু ভারত—বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ভাগ্য-বিধাতা এই প্রবচনটিকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করলেন। আজ আমাদের সামনে স্তম্ভতম সমস্যা হচ্ছে : কেমন করে এই বিশাল উপমহাদেশে জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। ভারতের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ হচ্ছে : ভারত-ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হওয়ার ফলে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের সনাতন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছি। বর্ধাঙ্গ 'সেকুলার' রাষ্ট্রের আদর্শ অতি মহান, সে রাষ্ট্রে আতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেরই ধর্মচরণের ও স্বাধীন চিন্তার অধিকার থাকবে, প্রত্যেকেই স্বধর্ম আচরণ করবেন, কিন্তু কেউ পরধর্মের ওপর আঘাত করবেন না, প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হতে হবে এবং আইনের চোখে সকলেই সমান বলে বিবেচিত হবেন। সাম্প্রদায়িকতা, উগ্র প্রাদেশিকতা ও অন্তর্ঘাতী ক্ষিয়াকলাপ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। ভারতীয় আদর্শের ভেতর যা শুভ ও ধ্রুব, যা, শান্ত ও কল্যাণকর, আতি-বর্ণ-নির্বিশেষে যা সর্ব মানবের গ্রহণীয়, যার ভেতর বিশ্বশান্তির বীজ নিহিত, যাকে এক কথায় ভারতধর্ম বলা যায়, সেই ভারত ধর্মের ভিত্তির ওপরেই নতুন করে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্বনীতি।

দুর্ব্বলের ওপর পীড়ন, অযোগ্য-পোষণ, শক্তিমানের তোষণ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি অভিশাপ থেকে রাষ্ট্র ও সমাজকে মুক্ত করতে হবে। ভারতবর্ষের স্বার্থ ইতিহাস—যে ইতিহাসের মধ্যে ভারতের সংষ্কৃতি ও ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য পরিষ্কৃত হয়—রচনা করে ভারতের প্রত্যেকটি সন্তানের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। আর যে ভাষা প্রায় প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষার জননী, যে ভাষা শিক্ষা না করলে কোনো আঞ্চলিক ভাষাকেই সম্পন্ন করে তোলা যায় না, যে ভাষার ব্যুৎপন্ন হলে আমরা প্রাক্তন সুরিগণের অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি, সেই সংস্কৃত ভাষাকে অবশ্য পাঠ্য করতে হবে। কারণ একমাত্র এই ভাষাই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভেতর মিলনের সেতু রচনা করতে পারে। আবার বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে এবং সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজিও আমাদের আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু আহা-বিহারে, বেশ-ভুষায় ও চিন্তাধারায় আমাদের হতে হবে খাঁটি ভারতবাসী। তা ছাড়া প্রত্যেককে মাতৃভাষায় পারদর্শী

হতে হবে এবং আমাদের দেশে লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে যে সকল ব্যাঘাত ছিল, সেগুলির পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। একথাও মনে রাখতে হবে যে বর্তমান ভারতের হিন্দীভাষী নেতারা অহিন্দীভাষী জনগণের ওপর তাঁদের ভাষা চাপিয়ে দিতে চাইবেন, ততদিন ভারতের জাতীয় সংহতি বিপর্যয় হবে।

‘প্রজ্ঞাবান লভতে জ্ঞানং’। ভারতের প্রত্যেকটি নরনারী যাতে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি প্রজ্ঞাবান হয়, তারও উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। যারা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ, ভারতের অধ্যাত্ম সম্পদের প্রতি যারা প্রজ্ঞাহীন, ভারতে বাস করেও যারা পরানুকরণকেই দেশের একমাত্র কল্যাণের পন্থা বলে মনে করে, তাদের চোখে ‘জাতীয় সংহতি’ (যে সংহতি ভাবগত বা সংস্কৃতিগত) একটা অন্ধ কুসংস্কার মাত্র। মহাপুরুষদের এই বাণী আজ দেশে দেশে উদ্ভাস কঠে ঘোষণা করার দিন এসেছে যে, ভারতবর্ষের ভিত্তির ওপরেই আমাদের কল্যাণ রাষ্ট্র ও জনীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হবে, নতুবা ভারতের অদৃষ্টে ঘটবে মহতী বিনষ্ট।

অগ্রগামী সংস্কৃতি পরিষদের

প্রকাশিত পুস্তিকা :

নবশাসনাত্মক নতুন নবস

সমর গুহ

মূল্য : পনের পয়সা

প্রাপ্তিস্থান : ৩০২, গান্ধীবাগান, কলিকাতা-৪৭

৬৩/১, রাসবিহারী ঞ্চেতন্য, কলিকাতা-২৬

(দোতলা)

॥ পনেরই আগষ্ট ১৯৬৭ ॥ : শান্তশীল দাশ

জননীর আঁখিজল ঝরে আজো, দেখি অহরহ :
শৃঙ্খলের ভার মুক্ত, তবু তার অজস্র বেদনা ।
কোথায় প্রসন্ন দীপ্তি, হাসি মুখ সন্তানের দল ?
কোলাহল চারিদিকে, অসংযত অসংখ্য জীবন ।

মেলনা বাঁচার ভূমি, হিংসা ঘেঁষে জর্জর স্বপ্ন ;
ধ্বংসের নেশায় মত্ত, শক্তির অনর্থ অপচয় ।
কে শোনে মায়ের কান্না ? ভেসে যায় উন্মত্ত চীৎকারে,
জীবনের স্বপ্ন স্বপ্ন পলাতক নিরস্ত্র গুহার ।

মাতৃমুক্তি পণ করে প্রাণ যারা দিল অকাতরে,
তাদের সে আত্মবলি অসার্থক হল একেবারে ?
তারা যে-আলোর দেখেছিল আগামী দিনের ;
সে-আলো কোথায় ? সেই শুভ্র প্রসন্ন আলোক ?

স্বপ্ন স্বপ্ন জীবনের মাঝে সেই আলোর প্রকাশ :
সে-আলো জ্বলবে কারা ? কোথা সেই প্রদীপ্ত জীবন ?
জননীর চোখে জল কে মোছাবে ? মাতৃগত প্রাণ
সন্তানের আবির্ভাব কবে হবে ? থাকি প্রতীক্ষায় ।

এই দেশে আমি আসবো আবার : মনোরমা সিংহরায়

পাতা ঝরে যায় বিকেল বেলায়
পাতা ঝরে যায় সকাল বেলায় ।
দুপুরের রৌদ্র খেলা করে যায়
আলোর খেলার ছায়ার মায়ায়
মা, আমার মা, জন্মভূমি মা,
এ মন আমার কোথায় হারায় ।

* * *
একদিন আমি চলে যাবো ঠিক
মাঠে ঘাটে পথে এখিক ওখিক
কতো লোক দেখি ভালো না-ভালোতে
কতো রূপ দেখি ছায়াতে আলোতে
সব ভুলে যাবো, তবুও এ মন
ভুলবে না শুধু তোমাকে তখন ॥

* * *
এই দেশে আমি আসবো আবার
বাঙলা আমার, দরিদ্র অপার,
সব চেয়ে বড় তবুও তুমি মা,
সব ভালোবাসা তোমাতেই জমা ।
হেসে হেসে আমি বেড়াবো আবার
তোমার এ পথে, বাঙলা আমার ॥

KESORAM INDUSTRIES & COTTON MILLS LTD.

(Formerly : Kesoram Cotton Mills Ltd.)

LARGEST COTTON MILL IN EASTERN INDIA

Manufacturers & Exporters of

QUALITY FABRICS & HOSIERY GOODS

Managing Agents :

Birla Brothers Private Ltd.

Office :

**15, India Exchange Place,
Calcutta.**

Phone : 22-3411

Gram : "COLORWEAVE"

Mills at :

**42, Garden Reach Road,
Calcutta-24.**

Phone : 45-3281 (4 lines)

Gram : "SPINWEAVE"

কলিকাতার বাসগৃহ (২)

নিরঞ্জন হালদার

বৃহত্তর কলিকাতায় বৎসরে কত বাড়ি তৈরী করা দরকার সি-এম-পি-ও সে-বিষয়ে একটি পরিকল্পনা রচনা করেছেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে কলিকাতার পৌর-এলাকার হিসাব আলাদাভাবে ধরা হয় নি। কারণ বাসগৃহ সমস্তার অর্ধ সমাধানের জন্য কলিকাতার নাগরিকদের পৌর এলাকার বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। সি-এম-পি-ও'র হিসাবে ১৯৬১-৭১ সালের মধ্যে বৃহত্তর কলিকাতায় সাড়ে ৯ লক্ষ থেকে ১১ লক্ষ ৪০ হাজার ইউনিট অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে বৎসরে গড়ে ৯৫ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৩ হাজার ইউনিট নূতন বাসগৃহ নির্মাণ করা দরকার। বর্তমানের বাসগৃহের ঘাটতি পূরণ, পুরানো বাড়ির আয়গায় নূতন বাড়ি তৈরী ও নূতন পরিবার গঠনের সম্ভাব্য হিসাবের উপর ভিত্তি করেই বাসগৃহের মোট প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানের মত ঘাটতি বজায় রাখতে হলেও বৎসরে গড়ে ৩০ থেকে ৪৫ হাজার নূতন বাসগৃহ নির্মাণ করা দরকার। বাসগৃহ নির্মাণের ব্যাপারে দীর্ঘদিন অবহেলা ও পরিকল্পনার অভাবে যেখানে সেখানে বাড়ি তৈরী হতে দেওয়ার জন্য যে-সমস্তার সৃষ্টি হয়েছে, কোন দায়সারা গোছের পরিকল্পনা নিয়ে সেই সমস্তার সমাধান সম্ভব নয়। এতদিন পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে যে সব বাড়ি তৈরী হয়েছে, তাতে বাড়ির নূতন চাহিদার অর্ধেকও মিটাতে পারে নি। বৃহত্তর কলিকাতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা কালে মাত্র ১২ থেকে ১৫ হাজার ইউনিট নূতন বাসগৃহ নির্মাণ করা

হয়েছে। সমস্তা কেবল জটিল নয়, ভয়াবহও। অথচ সমস্তার ভয়াবহতা দেখে, আমরা হাত গুটিয়ে বসে আছি। অপরিকল্পিত ভাবে ও সাহসের সঙ্গে সমস্তার মোকাবিলা করতে উদ্যোগী না হলে বৃহত্তর কলিকাতা ভারতের প্রধান শিল্পক্ষেত্র হিসাবে প্রাধান্য হারাতে পারে, এখানে বসবাস করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা পৌর-এলাকার জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য গত দশকেই কল্যাণীতে একটি উপনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। বাসস্থানব্যবস্থার জন্য এই ধরনের উপনগরী আমেরিকায় অনেক আছে। ইংলণ্ডেও ৬০ থেকে ৮০ হাজার লোকের বসবাসের উপযোগী 'গারডেন-সিটি' এখনও জনপ্রিয়। কিন্তু ঐ সব দেশের উপনগরীর অধিবাসীদের বেশীর ভাগ নিজস্ব গাড়িতেই যাতায়াত করে থাকেন। প্রধান শহরের মধ্যে জমির দাম ও বাড়ি ভাড়া বেশী এবং পরিবেশ অপেক্ষাকৃত ঘিঞ্জি বলে ঐ সব উপনগরীতে বসবাস করা অনেকে কাম্য মনে করেন। কিন্তু এদেশে অবস্থাপন ও গাড়ি ব্যবহারকারীর সংখ্যা যদি অনেক বেশী থাকতো, তা হলেও কিন্তু কল্যাণী থেকে কলিকাতায় যাতায়াতের উপযুক্ত রাস্তার অভাবেই কল্যাণীতে কোন উপনগরী গড়ে উঠতে পারত না। বড় শহরের নিকটে উপনগরী এশিয়ার অন্যান্য দেশেও দেখতে পাওয়া যাবে। কুয়ালালামপুরের অদূরে পেটালিং জায়গা উপনগরী গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেখানেও স্থানীয় লোকের কর্মসংস্থানের

জন্ম ছোট খাট অনেক কারখানা স্থাপন করতে হয়েছে। কল্যাণীতে প্রথমেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে, হয়তো এতদিনে ঘনবসতি গড়ে উঠতো।

শহর-পরিকল্পনার নূতন টেকনিক অনুসারে বাসগৃহ সম্ভার সমাধানের জন্ম এক দিকে যেমন পুরাতন শহরের সংস্কারের (আরবান রিনিউয়াল) এর দিকে নজর দেওয়া হয়, অপর দিকে তেমনই যে-সব এলাকায় লোকসংখ্যা বাড়ছে, সেই সব এলাকায় পরিকল্পনা অনুসারে কৃত বাসগৃহ নির্মাণ ও অল্পাল্প নাগরিক সুযোগসুবিধানের ব্যবস্থা করতে হয়। সি-এম-পি-ও অবস্থা এই দিকে কিছুটা দৃষ্টি দিয়েছে। কলিকাতার দক্ষিণে কলিকাতার একটি উপনগরী স্থাপনের ব্যাপারে ৪৫ হাজার ইউনিট বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। হাওড়া শহরের অনুরে ৬৯৯ একর নিয়ে কোনাতেও ১৬ হাজার বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। লবণ-হ্রদ এলাকাতেও ৫৮ হাজার ইউনিট বাসগৃহ নির্মাণ করা হবে। কল্যাণী পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য ক্রটি প্রস্তাবিত উপনগরীগুলিতে দূর করার চেষ্টা হয়েছে। এই সব জায়গায় কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে। কিন্তু বাসগৃহ সম্ভার সমাধানের পরিকল্পনায় যাতায়াত ব্যবস্থার উপরেও গুরুত্ব দেওয়া দরকার। হুংথের বিষয়, কোনা ও লবণ হ্রদ এলাকায় প্রস্তাবিত উপনগরীর ক্ষেত্রে যাতায়াতের দিকটা একেবারেই অবহেলিত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এশিয়ার সিঙ্গাপুর, ক্রনেই মালয়েশিয়ার কোন তুলনাই চলে না। সিঙ্গাপুরে বাণিজ্যিক পরিবহনের গাড়ির চেয়ে ব্যক্তিগত পরিবহনের গাড়ি পাঁচগুণ বেশী, ক্রনেই তে সাড়ে তিনগুণ এবং মালয়েশিয়ায় তিনগুণেরও বেশী। পেটালিং জায়া থেকে কুয়ালালামপুরে দৈনিক আফিসযাত্রীদের বেশীরভাগ নিজস্ব গাড়িতে চলাফেরা করেন। প্রস্তাবিত কোনা ও লবণ-হ্রদের অধিবাসীদের তা সম্ভব হবে না এবং সেজন্ম দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা চালু করার কথা ভাবতে হবে।

আমতা লাইনের ছোট রেলপথ হাওড়া ময়দান থেকে আরম্ভ হয়েছে। এই রেল পথটি জাতীয়করণের পর ব্রডগেজের রেলপথ চালু করে হাওড়া স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে কোনার অধিবাসীদের কলিকাতার ও হাওড়ার যাতায়াত করা অনেক সহজ হবে। লবণ-হ্রদ এলাকায় আড়াই লক্ষ অধিবাসীর বসবাসের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু এই উপনগরীর অধিবাসীরা প্রতিদিন কলিকাতা শহরে আসবেন কী করে? বাসে করে এই বিপুল সংখ্যক যাত্রীকে শহরের মধ্যে নিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। লোকসভায় এন্টিমেট কমিটি রেলপথে লবণ-হ্রদকে শিয়ালদহের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এখনও পর্যন্ত যেমন উদ্যোগী দেখা যাচ্ছে না।

বৃহত্তর কলিকাতার বাসগৃহের প্রয়োজনের হিসাব করবার সময় কোন শ্রেণীর অধিবাসীর জন্ম কত বাড়ি দরকার, তারও হিসাব করা দরকার। কিন্তু সি-এম-পিও কৃত হিসাবের মধ্যেও কিছু ক্রটি আছে। শহরের বস্তি-এলাকায় এক পরিবার একটি ঘরে ছয় জন লোকও বাস করে। আবার কোঁন কোঁন ঘরে এক জন বা দুই জনও বাস করে। সি-এম-পি-ওর হিসাবে প্রতিটি পরিবারের জন্ম কমপক্ষে দুটি ঘরের ইউনিট ধরা হয়েছে, এক ঘর ইউনিটের কথা একেবারেই ধরা হয়নি। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু দুটি ঘরকেই ইউনিট হিসাবে বিবেচনার কথা বলেছিলেন। কিন্তু বস্তির লোকেরা বা মধ্যবিত্ত পরিবারের অধিবাসীরা দুটি ঘরের ফ্ল্যাট পেলে তা কী ব্যবহার করবে? অনেকেই অপর ঘরটি ভাড়া দেবে এবং বস্তির মতই একটি ঘরেই থাকা খাওয়া, রান্না, শোওয়া—সব কাজ করবে। এদের উন্নতমানে জীবনযাপনে অভ্যস্ত করার জন্ম চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে নূতন বাড়িও বস্তিতে পরিণত হবে। কলিকাতা শহরে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট কিছু এক কামরার ফ্ল্যাট তৈরী

করেছেন, সিঙ্গাপুরেও বস্তির অধিবাসী ও নিম্নবিত্ত পরিবারের লোকজনদের জন্য প্রচুর এক কামরায়ুক্ত ফ্ল্যাট তৈরী করা হয়েছে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা বা ইউরোপের উন্নত জীবন-যাত্রা ব্যবস্থায় বাসগৃহের নিম্নতম মান এদেশে চালু করার চেষ্টা না করে দেশের প্রয়োজন ও ফ্ল্যাটের অর্ধেক ভাড়া দেওয়ার সম্ভাব্যতার কথা বিবেচনা করে এক কামরার ফ্ল্যাট তৈরী করলে সরকার কম খরচে অনেক বেশী লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবেন। বাড়ির প্রয়োজন হিসাব করার সময় ফুটপাথের অধিবাসীদের কথাও বিবেচনা করা দরকার। কলিকাতা শহরে আনুমানিক ৩০ হাজার ফুটপাথের অধিবাসী আছে। বিভিন্ন মরসুমে এই অধিবাসীর সংখ্যা বাড়়ে বা কমে। ফুটপাথে বা করপোরেশনের পাইপের মধ্যে বাস করে এরা মাঝে মাঝে সংবাদপত্র ও বিদেশী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। তবে ফুটপাথবাসীদের মধ্যে এক দল অবস্থাপন্ন তাঁরা থাকার জন্য বাড়ি ভাড়াও দিতে পারে, কিন্তু ভালভাবে না থেকে, ফুটপাথে রাজি যাপন করে পুরো টাকাটাই দেশে পাঠিয়ে দেয়। যারা একেবারেই গরিব, তারা ভিক্ষা করে বা অন্যভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। ভারতে ফুটপাথের অধিবাসীদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যাপারে মাত্রাজেই পরীক্ষামূলকভাবে কাজ হয়েছে। বাড়ি করে দিলেও এরা সেখানে যেতে চায় না। অথচ শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে ফুটপাথ থেকে এদের উৎখাত করতেই হবে। কাজেই এদের বাসগৃহ ছাড়া কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করে কাজ করে খাওয়ার অভ্যাস রপ্ত করাতে হবে এবং এসব কাজ একমাত্র সমাজসেবীদের মারফতই সম্ভব।

বৃহত্তর কলিকাতার বাসস্থান সমস্যার সমাধানের জন্য নাগরিকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়া রাজ্য সরকারের উন্নয়ন ও গৃহনির্মাণ দপ্তর, বাসগৃহ নির্মাণ করে থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকারও কর্মচারীদের জন্য কিছু বাসগৃহ নির্মাণ

করেন। কলিকাতা শহরে ইমপ্লিমেন্ট ট্রাস্ট ও বর্তমানে ফ্ল্যাট তৈরী করে ভাড়া দিয়ে থাকেন। জীবন বীমা সংস্থা গৃহনির্মাণের জন্য সরকারকে অর্থসাহায্য করা ছাড়া বীমাকারীদেরও ঋণ দিয়ে থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে শ্রমিকদের জন্যও বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এই পরিকল্পনা অনুসারে শ্রমিকেরা কম ভাড়ায় বাড়ি পেয়ে থাকে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পরিকল্পনায় ৯৮৮৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণের টাকা বরাদ্দ করা হয়। ফ্ল্যাট তৈরী হয় ৫২২০ টি। কলিকাতা শহরে নিম্নবিত্তদের জন্য প্রথম পরিকল্পনাকালে ১০৮২ টি ফ্ল্যাট নির্মাণের টাকা বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু একটি ফ্ল্যাটও তৈরী হয় না। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কলিকাতার বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য ২২২৪ টি ফ্ল্যাট তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, ফ্ল্যাট তৈরী হয় মাত্র ৮০০ টি। এই পরিকল্পনাকালেই মুরারিপুকুর মানিকতলা এলাকায় নতুন বাসগৃহ নির্মাণের জন্য দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালেই এই বাড়ি তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হয়। শ্রমিকদের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ৭,৭০০ ফ্ল্যাট তৈরির লক্ষ্য স্থির হয়। বৃহত্তর কলিকাতার শ্রমিকদের প্রয়োজনের তুলনায় এই লক্ষ্য কিছুই নয়। তবে বাসগৃহ নির্মাণের ব্যাপারে শ্রমিকদের সম্মানসহ বাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনাই কিছুটা সফল হয়েছে। বস্তি অপসারণ পরিকল্পনায় ব্যয়িত টাকার শতকরা ২৫ ভাগ রাজ্য সরকারকে দিতে হয়, বাকী ৭৫ শতাংশের অর্ধেক কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য ও অপর অর্ধেক ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকেন। কাজেই বস্তি অপসারণের পরিকল্পনা বৃহৎ আকারে গ্রহণ করলে রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে খুব কম টাকাই ব্যয় করতে হোত। কিন্তু তা সত্ত্বেও চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বস্তি অপসারণের জন্য পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারের যখনই ব্যয় সঙ্কোচ করার প্রয়োজন হয়, তখনই গৃহ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ টাকা কমানো হয়।

১৯৬২ সনে চীনা আক্রমণের পর থেকে এই একই ব্যাপার চলছে। অথচ পুরানো বড় শহরগুলিতে তো বটেই, নতুন শহরগুলিতেও ব্যাপকভাবে নতুন বাসগৃহ নির্মাণ করা দরকার। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্ত প্রথমেই আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার। দুঃখের বিষয়, ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে এই দুটি বিষয়ই অবহেলিত।

*

শহরের লোকসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে নতুন নতুন জমিতে বাড়ি হচ্ছে। কিন্তু এভাবে বাড়ি তৈরি করে কখনও বাসগৃহের সমস্ত সমাধান করা যায় না। বৃহত্তর বোম্বাইতে জমির সদ্যবহার সম্পর্কিত আইন অনেক দিন থেকেই চালু আছে, এখন সে আইন গোটা মহারাষ্ট্রে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জমির সদ্যবহার সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন আইন তৈরী হয় নি। সে আইন তৈরী হওয়ার পর তা কার্যকর করার প্রয়াস উঠবে। বৃহত্তর কলিকাতার কথা আপাতত বাদ দিয়ে কলিকাতা পৌর-এলাকার কথাই ধরা যাক। শহর সংস্কার বা আরবান রিনিউয়ালের কাজ বর্তমানে ইমপ্ৰুভমেন্ট ট্রাস্ট করে থাকে। কিন্তু এই সংস্থার আর্থিক সামর্থ্য খুব বেশী নয় এবং শহরের বাসগৃহ সমস্ত সমাধানের পরিকল্পনা অনুসারেও কাজ করছে না। শহরের উন্নয়ন ও নতুন বাড়ি তৈরীর জন্ত বস্তি অপসারণ দরকার। কিন্তু বস্তি অপসারণ পরিকল্পনাকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; উন্নত এলাকার বস্তি অর্থাৎ যে-সব অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী আছে এবং অসুস্থ এলাকা বা যে-সব অঞ্চলে খোলা ড্রেন রয়েছে। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে আরম্ভ করে ডালডা, বেনেপুকুর, পার্ক সার্কাসের অংশ বিশেষ, ভবানীপুর, কালীঘাট, বালিগঞ্জ রাসবিহারী ও লেক-এলাকা থেকে বস্তি অপসারণের যে-সব সমস্তা রয়েছে, কালীপুর, বেলগাছিয়া, মানিকতলা, ট্যাংরা, টালিগঞ্জ এবং চেতলা ও খিদিরপুরে বস্তি অপসারণের সমস্তা তা থেকে ভিন্ন। শহরের

মধ্যস্থলের বস্তিগুলি আকারে ছোট, লোকসংখ্যাও বেশী এবং জনবসতিও খুব ঘন। কিন্তু সারকুলার থাল ও রেল লাইনের অপর দিকে ও কালিঘাটের আদিগঙ্গা থালের পশ্চিমপারে বস্তিগুলি আকারে বড়, পাশে খালি জমি বা পচাপুকুর। ট্যাংরা ছাড়া এইসব এলাকার জনবসতিও অপেক্ষাকৃত কম। বস্তি অপসারণের পর এইসব এলাকার উন্নয়ন করে নতুন নতুন বাসগৃহ নির্মাণ করা যায়। কিন্তু পৃথিবীতে সম্ভবত কলিকাতা শহরের মত আর কোথাও এ-ব্যাপারে এত বেশী আইনগত, প্রশাসনিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক অন্তর্বিধার-সম্মুখীন হতে হয় না। কলিকাতার যে জটিল ভূমি-আইন আছে, কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা থাকলে সেই জটিলতার জাল ছাড়ানো আদৌ কঠিন হোত না। বস্তি উন্নয়ন আইনে পূর্বতন বস্তির আধ মাইলের মধ্যে বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করার ধারাও বদল করা প্রয়োজন। বস্তি অপসারণের ব্যাপারে আর একটি বড় বাধা হচ্ছে বস্তি-এলাকার কাংধানার অস্তিত্ব এবং এসব কারখানায় যারা কাজ করে, তাঁরা আশেপাশের বস্তিতেই বাস করে থাকেন। জনস্বাস্থ্যের খাতিরেই কারখানাগুলিকে বসতি এলাকার বাইরে অপসারণে বাধ্য করা দরকার। বস্তি অপসারণের পর সেই সব অঞ্চলে নতুন বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাও কিন্তু বর্তমান অবস্থা টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে। এখানে সি-এম-পি-ও রচিত একটি পরিকল্পনার বিবরণ দেওয়া যাক। মধ্য কলিকাতার ৬২০০ বস্তির ঘরে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার লোক বাস করে, এই বস্তিগুলি ২৪০ একর জমিতে অবস্থিত। এখানে প্রতি একরে ৭০০ লোক বাস করে থাকে। এদের নতুন এলাকায় পুনর্বাসন দিতে গেলে ৩৫ হাজার ইউনিট নতুন বাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই বাড়ি তৈরির জন্ত ৩০০ একর জমির দরকার হবে। উন্নত পরিবেশে বাড়ি তৈরি করতে গেলেই কিছু ফাঁকা জমি রাখবার দরকার হবে এবং সেজন্য বস্তির অধিবাসীদের পুনর্বাসনের ক্ষমতা আগের চেয়ে বেশী জমির দরকার হচ্ছে। কিন্তু রাজ্য সরকার বস্তি

অপসারণের পর সিঁদাপুরের মত যদি 'দশতলা' বাড়ি তৈরি করেন, তা হলে অনেক বেশী লোককে অল্প জায়গার মধ্যে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে। আর তালতলা ও বেনেপুকুরের মত বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে একসঙ্গে কাজ আরম্ভ হলে একই জায়গায় বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদেরও পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে। জমির দাম যেখানে বেশী, সেখানে বাড়িগুলি উর্ধ্বমুখী হওয়া দরকার এবং তা করা হলে অনেক ফাঁকা জায়গাও রাখা যাবে, রাস্তাগুলি আরও প্রশস্ত করার মতও জমি পাওয়া যাবে। লবণ-ভূদ্র এলাকাতে সেজন্ত তিন কাঠা, পাঁচ কাঠা বা দশ কাঠা হিসাবে জমি বিলি করা উচিত নয়। যে শহরের জনসংখ্যা ৬০ হাজারের মত রাখা সম্ভব, সেই 'গারডেন সিটিতেই' ছোট ছোট আয়তনের জমিতে বাড়ি তৈরি করা হয়। লবণ-ভূদ্রে বর্তমানে যে ধরনের বাড়ি তৈরি করার অযোগ্য দেওয়া হচ্ছে, তাতে কলিকাতা শহরের, বাসগৃহ সমস্যার সমাধান কোন দিনই হবে না। কলিকাতার পৌর এলাকার মধ্যে ও বাইরের উদ্বাস্ত কলোনীতেও অনেক তলার বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা নিতে হবে। টাকার অভাব ছাড়া নিজস্ব জমিতে বাড়ি তৈরির মানসিক অভ্যাস এই ধরনের পরিকল্পনা কার্যকর করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। গ্রাম্য জীবনে জমির মালিকানার যে ভূমিকা আছে, শহরে তা থাকা উচিত নয়। কাজেই নাগরিকদের বাড়ির মালিকানার বিকল্প হিসাবে স্ট্যাটের মালিকানায় সম্ভূষ্ট হওয়ার মত মানসিক অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। নগরপরিকল্পনাকারীদেরই এই জমমত গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। বস্তির কথা বাদ দিলেও, শহরের সর্বত্রই পুরানো বাড়ি বা এক দুই তলার বাড়ি দেখতে পাওয়া যাবে। 'আরবান রিনিউয়াল' আইন

এই সব বাড়ির ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা দরকার। এবং তা সম্ভব হলে, শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নতুন নতুন বহুতলা বিশিষ্ট বাড়ি তৈরি হবে।

বাসগৃহ নির্মাণের পথে টাকার অভাবই একটা বড় প্রতিবন্ধক। সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধক বলছি না এই জন্ত যে, এ-ব্যাপারে তেমন চেষ্টাই হয়নি। সরকারের অনেক খাতে বরাদ্দ টাকার বেশী খরচ হয়ে থাকে, কিন্তু গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা কখনও ঘটেনি। জীবনবীমা সংস্থার নিকট থেকে আরও বেশী অর্থ গৃহনির্মাণের জন্ত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। ব্যবসায়ী সংস্থাকে ঋণ দেওয়ার চেয়ে গৃহনির্মাণের জন্ত ঋণদান কেন বেশী লাভজনক হবে না, তা আমি বুঝতে পারি না। রাজ্য সরকার বা পৌরসংস্থাও শহরের অনুন্নত বা বস্তি এলাকা উন্নয়নের জন্ত অপেক্ষাকৃত কম অর্থব্যয় করে থাকেন। বোম্বাই পৌরসভা এজন্ড বৎসরে তিন কোটি টাকা খরচ করে থাকেন, কিন্তু কলিকাতার পৌরসভা ও ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট যুক্তভাবে বৎসরে দেড় কোটি টাকা খরচ করেন। শহরের উন্নত বাসগৃহের জন্ত পৌরসভার আয় ও কিন্তু বেশী হয়ে থাকে। বোম্বাইতে মূল্যায়নের শতকরা ৩৭ ভাগ পৌরকর হিসাবে আদায় করা হয়, কিন্তু কলিকাতায় সেক্ষেত্রে শতকরা ১৫ থেকে ২৩ ভাগ পৌরসভা রাজস্ব হিসাবে পেয়ে থাকেন। বৃহত্তর কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত পৌরসভার আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয়। কিন্তু উন্নত পরিবেশে নতুন নতুন বাড়ি তৈরি না হলে পৌরসভা-গুলির রাজস্ব বৃদ্ধিরও তেমন অযোগ্য নেই।

(২১৩ পৃষ্ঠার পর)

সম্মতবনাই অরণ করিয়ে দেবে। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড সাম্প্রতিক একটি প্রস্তাবে কংগ্রেস দলের পরিষদীয় সদস্যপদের জন্য প্রার্থীদের পরিষদীয় দলের সভ্যপদে অন্তর্ভুক্ত করবার চাপাও সম্মতি দিয়ে পরিষদীয় আবহাওয়াকে কলুষিত করেছে।

নীতির দৃষ্টে দলত্যাগ বাহিত ঘটনা, এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু দলত্যাগ নীতির দৃষ্টে ঘটেছে, কোনো দলত্যাগের পশ্চাতে স্বার্থের বালাই নাই, দলত্যাগীদের সেই পরীক্ষা দিতে হবে, তাদের নির্বাচকদের কাছে। কোনো দলের নীতি ও কর্মসূচী নিয়ে নির্বাচকদের সমর্থন পাবার পর, কোনো সদস্য দলত্যাগ করলে, তাই অনিবার্যভাবে পরিবর্তিত নীতির সমর্থনের জন্য তাকে পুনরায় নির্বাচকদের সম্মুখীন হতে হবে। অতরাং, অবাহিত দলত্যাগ বন্ধ করে গণতন্ত্রকে কলুষমুক্ত করতে হলে দলত্যাগীদের পুনরায় নির্বাচনের সম্মুখীন হতে বাধ্য করতে হবে। আইনের এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতালোলুপতা ও টানাপোড়েন থেকে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা রক্ষা করা সম্ভব হবে।

রাজস্ব ভাতা

রাজস্ব ভাতা বা প্রিভি পার্স লোপ করবার জন্য নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে প্রস্তাব পাঠ করা হয়েছে, ভারত সরকার এই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখছেন। দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় প্রাক্তন রাজস্ববর্গদের জন্য প্রতিশ্রুত প্রায় তিনকোটি টাকার ভাতা ও রাজস্বদের অস্বাভাবিক অবিধা লোপের প্রশ্ন নিষে মতভেদও রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন একদিকে যেমন উচ্চকণ্ঠে রাজস্ব ভাতার বিরুদ্ধে তার মত প্রকাশ করেছেন, তেমনি উপপ্রধানমন্ত্রী যোরারজী দেশাই রাজস্ববর্গদের প্রতি প্রগত্ত প্রতিশ্রুতি ভেদের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন, যদিও ব্যক্তিগতভাবেই এ-মত প্রকাশ করেছেন।

রাজস্ববর্গদের মধ্যে—অনেকেই ইতিপূর্বে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। গত নির্বাচনে আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ কংগ্রেসের বিরোধিতাও করেছেন। মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের রাজস্বাতা কংগ্রেসের স্বপক্ষে থেকে এখন বিরোধী হয়েছেন, বরোদার গায়কোয়ার গুজরাতে কংগ্রেসের অন্যতম মন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকারও প্রাক্তন রাজস্ব ভাতাপ্রাপ্ত সিং কংগ্রেসেব ডেপুটি মন্ত্রী। তা সত্ত্বেও রাজস্ব ভাতা ও রাজস্বদের বিশেষ অবিধা লোপের প্রশ্নে সাম্প্রতিক রাজস্ব সমাবেশে দল নির্বিশেষে বহু রাজস্ব যোগ দিয়ে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটি এই, আই, সি, গির নিকট তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানাবেন এবং দেশীয় রাজ্য সংহতির সময় ভারত সরকারের প্রগত্ত প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আবেদন-নিবেদন করবে।

প্রিভি পার্সের পরিমাণ খুব বেশী নয়, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আদর্শের যুগে বিশেষ অবিধাভোগের নিবন্ধিত স্বযোগ রাষ্ট্র কতদিন বহন করবে, সে প্রশ্নই এখনে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবিধা ভোগ যেখানে কোনো নীতি নয়, একটা ব্যবস্থা মাত্র, সময়ের উত্তরণের সঙ্গে মুষ্টিমেয়ের বিশেষ অবিধা স্বাহুর মত অচল রাখতে হবে তার কোনো কারণ নেই। সামাজিক জায়বিচারের দিক থেকেও এই বিশেষ অবিধা ভোগ সমর্থনের অযোগ্য। অতরাং, এ-সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতিরও কোনো অনড়তা নেই। বিশ বছর এই প্রশ্নটির পুনর্বিবেচনার নৈতিক অধিকার ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবশ্যই রয়েছে এবং তাদের প্রতিনিধিধরূপ ভারতসরকারেরও সে দায়িত্ব রয়েছে। সংবিধানের প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন করে, ভাতা ও অবিধা-লোপকে আইনানুগ করা যেতে পারে।

রাইটাস' বিল্ডিংসে কর্মচারীদের সংঘর্ষ

গত জুলাই মাসে রাইটাস' বিল্ডিংসে সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের একটি প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ

করে বাইরে আসার সময় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনে সমবেত কর্মচারীরা তাদের আক্রমণ করে। মুখ্যমন্ত্রী ঘর থেকে বাইরে এসে আক্রান্তদের উদ্ধার করতে চেষ্টা করলে সমবেত কর্মচারীদের একাংশ বিচারক ঘনি দেয়।

ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাত না করবার জন্ত ইতিপূর্বে সরকারী কর্মচারীদের অপর এক সংস্থার—কো-অর্ডিনেশন কমিটি—পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী এই অনুরোধ রক্ষা করতে অসামর্থ্য স্থাপন করেন, কারণ, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কেউ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে মুখ্যমন্ত্রী অস্বীকার করতে পারেন না।

গণতন্ত্রে যারা বিরোধীমতাবলম্বীদের বরদাশ্ত করতে চান না, যারা হিংস্র বলপ্রয়োগের দ্বারা বিরোধীমতাবলম্বীদের দমন করতে চান, তাদের ফ্যাসিস্ত স্থলভ মনোভাব থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী কার সঙ্গে দেখা করবেন কি করবেন না, সে বিচারের অধিকার মুখ্যমন্ত্রীর নিজের। কো-অর্ডিনেশন কমিটি মুখ্যমন্ত্রীকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে অগণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রশ্ন দিয়েছেন এবং ফেডারেশনের কর্মচারীদের উপর আক্রমণের নিন্দা করা দূরে থাকুক, প্রকারান্তরে সার দিয়ে গেছেন। এ-ছাড়া সমবেত কর্মচারীদের মুখ্যমন্ত্রীর সহিত অসন্তাবের জন্ত হুংখ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও কো-অর্ডিনেশন কমিটি বোধ করেন নাই। অতীতের সংগ্রামে কো-অর্ডিনেশন কমিটি পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেছে। কিন্তু এই ঘটনার নিন্দার ভাষা নাই। কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রশ্নে যে ফ্যাসিস্ত আচরণ ও অগণতান্ত্রিক মনোভাব আত্মপ্রকাশ করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি হবে।

চীন-পাকিস্তানের দখলে ভারতীয় এলাকা

চীন-পাকিস্তানের দখলে ভারতীয় এলাকা পুনরুদ্ধারের প্রবন্ধের উত্তরে পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচাগলা সরাসরি বলে

দিয়েছেন, বলপ্রয়োগ করে এই এলাকাগুলি পুনরুদ্ধারের নীতি ভারতের নয়। তবে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এই সমস্তা সীমান্সার জন্ত সরকার সর্বদাই সক্রিয়। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চাগলা সরাসরিই বলে দিলেন, চীন-পাকিস্তান যেচ্ছায় এই এলাকাগুলি না ছেড়ে দিলে তা ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিম্নোক্তভাবে এই ধরনের পরাজিতের নীতি ঘোষণায় চীন-পাকিস্তানকে আরও প্ররোচিত করেছেন। ভারত সরকারের এই ক্রীব, ভীক, আত্মগমপ্ণের নীতির বিরুদ্ধে জাগ্রত হয়ে ভারতবর্ষের বিপন্ন সাংগ্ৰাম্য উদ্ধা করবেন এই ভরসা ভারতসরকারের না থাকলেও ভারতের জাতীয়তাবাদী জনমতের প্রভূত পরিমাণে রয়েছে। জাতীয়তাবাদী জনমতের জয় হবেই।

ভারতবর্ষের কতটা পরিমাণ এলাকা চীন-পাকিস্তানের দখলে আছে, সীমান্তে বিরোধ কোথায়, তারও একটা হিসাব শ্রীচাগলা দিয়েছেন। নেফার থাগলা পাহাড়ে ও লংজুতে, উত্তরপ্রদেশের বরাহোতিতে চীনের সঙ্গে বিরোধ রয়েছে। গুজরাতেও সঙ্গে সীমানা বিরোধ কচ্ছ টাইবুনালের বিচার্যধীন। আসামের লাটিটলা, ডুয়াবাড়ী, বড়পুটনিগাঁও, কারথানা পুটনিগাঁও এবং পুটনিগাঁও নিয়ে বিরোধ রয়েছে। ফেনী নদী সীমানায় ইছাছড়ি-পাতিছড়ি গ্রাম নিয়ে এবং ত্রিপুরা সীমানায় গৌরাল্লায় বিরোধ রয়েছে।

এ-ছাড়া চীন ১৯৬২-এর আক্রমণের পূর্বে লাডাক এলাকায় ১২,০০০ বর্গমাইল দখল করেছিল, আক্রমণের পর দখলী এলাকা দাঁড়িয়েছে ১৪,৫০০ বর্গমাইলে। পাকিস্তানের সঙ্গে তথাকথিত চুক্তি করে পাকিস্তানের অধিকৃত কাশ্মীর এলাকা থেকে ২০০০ বর্গ মাইল দখল করেছে। পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে ১৯৪৭ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বহুমারী, মণুগরি এবং আধার কোটা দখল করে আছে—গ্রাম ২,৫২৮ বর্গ মাইল, আর বেলুবাড়ীর ৩৯৮ বর্গ মাইল।

আসাম সীমান্তে গোয়ালপাড়া-রংপুর সীমানার ডোরিয়া-বাড়ীর ৫০০ বর্গ মাইল ১৯২২ সাল থেকে দখল করে বসে আছে এবং খাসী জয়ন্তী পাহাড়ের লুবাছেড়া চা বাগানের ১৬৬ বর্গ মাইল দখল আছে ১৯৬২ সাল থেকে। ১৯৬২ থেকে কাছাড়—সিলেট এলাকায় অরুণা নদীর উপত্যকার ১৫০০ বর্গ মাইল, নওগা আয়ের ২৫০ বর্গ মাইল এবং ১৯৬১ থেকে পাল্লটোল চা—বাগানের ১৬৬ বর্গমাইল। আগরতলা বিমান ঘাঁটির নিকটবর্তী বাগালপুর গ্রামের ৬ বর্গ মাইল ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের দখলে রয়েছে।

ভারত সরকারের ভূমিদান কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কত দীর্ঘকাল যাবৎ চলে আসছে, তা থেকে একথাই বলতে হয়, ভারতবর্ষে সার্বভৌমত্ব কংগ্রেসের সরকারের হাতে গভীরভাবে ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ভারতীয় এলাকা দখলের এই হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চীন-পাকিস্তান দখল থেকে হৃত এলাকা উদ্ধারের ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনটাই ভারত সরকারের নাই।

২৪. ৮. ৬৭

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
শ্রীগীতা	৬.০০	বাংলার ঋষি	৩.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫.০০	বাংলার মনীষী	১.৩০
ভারত-আত্মার বাণী	৫.০০	বাংলার বিদুষী	২.০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১.৫০	বীরত্বে বাঙালী	১.৫০
কর্মবাণী	১.২৫	ব্যায়ামে বাঙালী	২.০০
Soul of India Speaks	5.00	বিজ্ঞানে বাঙালী	৪.০০
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.		রাজর্ষি রামমোহন	১.৫০
		রবীন্দ্রনাথ	১.২৫
বিজ্ঞানাগর	২.২৫	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১.৫০
মানুষের মত মানুষ	৭৫	আচার্য জগদীশচন্দ্র	২.৫০
শিশু রামায়ণ	৬২	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১.৫০
শিশু মহাভারত	৭৫	॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥	
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :		১৫ কলেজ স্কোয়ার :	
		কলকাতা-১২	

দার্জিলিং মাক্-ডোগ বৌদ্ধ মন্দির

গোবিন্দ সেনগুপ্ত

[Mak-Dhog Monastery, Darjeeling]

দার্জিলিং-এর Mall থেকে Sherpa-Tenzing Road ধরে বরাবর তিন মাইল এগুলাই আলুবাড়ী অঞ্চলে মাক্-ডোগ বৌদ্ধমন্দিরটি চোখে পড়বে। প্রধানতঃ ইহা তিব্বতীদের মন্দির। একদিকে এই মন্দিরের বাইরের কারুকার্য ও অন্তরীক্রে ভেতরের মূর্তিগুলির অপূর্ব সৌন্দর্য শিল্পীর শিল্পজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে। সংগে সংগে যে সব তিব্বতী ও অস্কাছ বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের পরামর্শে এই মূর্তিগুলির বিভিন্ন রূপ ভাষা ও ভাব প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের বৌদ্ধ-ভক্ত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বিশ্বস্তের অবকাশ-মাত্র নেই। মন্দিরটি দ্বিতলবিশিষ্ট—প্রস্তর নির্মিত। মূর্তিগুলি শক্ত মৃত্তিকা নির্মিত ও নিপুণশিল্পীর হস্তে অপূর্ব ভাব ও ব্যঞ্জনাত্মক ষ্ঠে-রক্ত, সবুজ ও কৃষ্ণবর্ণেরঞ্জিত। দার্জিলিং এর অল্পপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেও এই মন্দিরটির ও তার অঙ্গগত করুণাঘন চেরেসি (Chenresi) দেবমূর্তির শিল্প-সৌন্দর্যের প্রশংসা না করে পারা যায় না। নগাবিরাজ হিমালয়ের ভাব-গম্ভীর পুত পবিত্র পরিবেশে রৌপ্য-ধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার মুখোমুখি—“বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি, সংঘ শরণং গচ্ছামি, ধর্ম শরণং গচ্ছামি”—এই মন্ত্রাঙ্কিত পতাকাবাহী যে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে, তার ইতিবৃত্ত নিম্নরূপ :

১ম মহাবুদ্ধের অবসানে, ১৯১৮ সনে তিব্বতী সান্গে-লামা (Sange Lama) দার্জিলিং-এর এই অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি এর নামকরণ করেন মাক (Mak) ডোগ (Dhog) বৌদ্ধমন্দির। মাক অর্থ বুদ্ধ,

প্রাণ-ভান্ড ৬

ডোগ (Dhog) অর্থ সমাপ্ত অর্থাৎ মিলিতভাবে মাক ডোগ অর্থ “বুদ্ধ শেষ হয়েছে”—তারই নিদর্শন স্বরূপ অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠার নিদর্শন স্বরূপ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা (আর বুদ্ধ নয়, শান্তি, তারই অমুরণ এই মন্দির, কেন না বুদ্ধ হচ্ছেন অহিংসার দেবতা, শান্তির মূর্তি বিগ্রহ)। কিন্তু ১৯৩৪ সনে ভূমিকম্পের ফলে মন্দিরটি বিপর্যস্ত হয়। তখন সান্গে লামার পুত্র রায়সাহেব নিমা লামা ঐ মন্দিরটি সংস্কার করে বর্তমানের অবস্থায় মন্দিরটির নির্মাণকার্য অসম্পন্ন করেন। তাঁর আমন্ত্রণে ভূটানের বিশিষ্ট শিল্পী ও ভাস্কর এই মন্দির নির্মাণে অগ্রসর হন, ভাব আহরণ করেন তিব্বতী লামাদের নিকট থেকে। তাই মন্দিরটি ভূটানী শিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্যের এক উজ্জলতম দৃষ্টান্ত।

মন্দিরের প্রধান কক্ষে যে অনিন্দ্যসুন্দর ও অল্পপম সুবাসনাত্মক করুণাঘন দেবমূর্তি দণ্ডায়মান, তিব্বতীশাস্ত্রে তার নাম “চেরেসি” (CHENRESI)। সংস্কৃতশাস্ত্রে ইনি “আভালোকিতেশ্বর” নামে খ্যাত। চেরেসি হচ্ছেন একাধারে দয়া ও ক্রমার দেবতা। তিব্বতী বৌদ্ধশাস্ত্র-মুযারী উর্ধ্ব ও অধঃ ‘লোক’ সহ ষাট ছয়টি লোক (Sphere) আছে। উর্ধ্ব লোক (upper existence) তিন ভাগে বিভক্ত :

১) দেবলোক ২) অমুরলোক ৩) নরলোক।

অধঃ-লোক অপর তিনভাগে বিভক্ত :

১) নরেন্দ্রলোক ২) প্রেতলোক ৩) নরক।

চেরেসি হচ্ছেন প্রধান দেবতা—তিনি সর্বলোকের অধীশ্বর। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পরিব্রাজা, তিনিই নানা অবতারে অবতীর্ণ হয়ে মুক্তি বা নির্বাণের বাণী প্রচার করেন, তিনি ‘শঙ্কর’ নামেও পরিচিত।

এই মূর্তির বৈশিষ্ট্য—ইনি শতাক্ষি ও শতানন। মূর্তিটিতে শুধুমাত্র ১ টি মুখ প্রকাশিত হয়েছে। অর্ধবৃত্তাকারে বামদিকে লম্বভাবে একটির উপর আরেকটি এক্সপে তিনিটি, ডানদিকে ৩টি ও মাঝে সম্মুখভাগে ৫টি কন্দর্পকাস্তি মুখ সজ্জিত আছে। নিম্নভাগে অবস্থিত সম্মুখের প্রধান মুখটির শিল্পচাতুর্য্য প্রশংসনীয়। ইহা ষ্ঠেতবর্ণ বিশিষ্ট, চন্দ্রবর্ণ এক অপূর্ব ভাব-ব্যঞ্জনাভ্যন্তরক—সব মিলিয়ে এক অব্যক্ত রাজকীয় সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অস্ত্রাভাঙলি লাল, সবুজ ও ষ্ঠেত বর্ণে রঞ্জিত। মূর্তিটি মুকুটপরিহিত, পদ্মের উপর দণ্ডায়মান, কর্ণে কুন্তলশোভিত। শতহস্তের প্রধান ৮টির ভঙ্গিমা বিশেষ লক্ষণীয়। দুটি হস্ত নীচের দিকে প্রলম্বিত ১টিতে ধর্মুশের, অস্ত্রটিতে বরাভয়। অভিনন্দনের ভঙ্গিতে করলোড়ে দুটি হস্ত বক্ষগলগয়, দুটি বামে দক্ষিণে সরাসরি প্রসারিত আর দুটি উর্ধ্বদিকে প্রলম্বিত। নানা হাতে নানা আয়ুধ, বরাভয়, অমৃতভাণ্ড ইত্যাদি।

এই মূর্তির বামদিকে যে পদ্মাসীন স্বর্ণবর্ণের মৃৎ মূর্তি আছে, তা হোল “ধর্মকায়” বা ১ম বুদ্ধের (1st Buddha) মূর্তি। তিব্বতী ও নেপালী বৌদ্ধভিক্ষুদের কাছে ইনি ‘সালে ওপাগমে’ বা ‘কুণ্ডুসাংবো’ দেব নামে পরিচিত। মহাবান বৌদ্ধ ধর্মমতানুসারে, ইনি হচ্ছেন সত্যের দেবতা (Divine body of Truth), অখণ্ড ও পূর্ণ। আবার ইনিই সকল “বুদ্ধের” স্রষ্টা। ইনিই গৌতম বুদ্ধ (2nd Buddha), অনিত্যত বুদ্ধ, মহেন্দ্রবুদ্ধ, কাস্তপ বুদ্ধ প্রভৃতির উৎস স্থল।

চেরেসি মূর্তির ডানদিকে আছে পদ্মাসীনা কৃষ্ণকায়ী এক দেবীমূর্তি। তিনি হচ্ছেন পরম পুণ্য নিকাম শুদ্ধ ও পবিত্রতার প্রতীক (Ever pure and virgin). “She is the

virgin mother of all human beings. She can absorb all sins of mankind so that they can be free from all sorts of earthly bondage and ultimately attain emancipation or, salvation. She attained Buddhahood on earth by “UNE” system of fasting.” এই দেবীমূর্তির নাম “জেলোংমা পামো” বা দেবী পামো (Gelongma Palmo)।

পামো সম্পর্কে বৌদ্ধশাস্ত্রে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে :— পামো ছিলেন এক রাজকুমারী—রূপে অপূর্ণা হৃদয়ী। এই বালিকা শৈশব থেকেই ছিলেন দৈব-বিলে ভক্তি ব্রতাবা ও ধর্ম-পরায়ণা। যৌবনে পদার্পণ করলে রাজা কস্তার বিবাহের কথা বজ্রেন। কিন্তু কস্তার শৈলিকে নেই মন। পিতা নিলে হতাশ হলেন। আত্মীয়স্বজনরা কতো বোঝালেন, চাপ দিলেন, কিন্তু মাতৃহীনা মেয়ের দেবপূজায় আনন্দ। এতেই সে সাধা জীবন নিমগ্ন থাকতে চায়, অনেক সাধ্য-সাধনার পর পিতা বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। কালক্রমে পিতার মৃত্যু হলো। আর ওদিকে পামোর হোল নিদারুণ কুষ্ঠ ব্যাধি। পবিত্রব্রতাবা পামোর প্রতি বিধাতার একি অভিশাপ না কোন দুর্নিরীক্ষ আশীর্বাদ? রাজপ্রাসাদের এক প্রান্তে, যেখানে পামো অটল বিশ্বাসে পরম নিষ্ঠায়, নিজের দৈহিক যন্ত্রণা ভুলে, ঈশ্বরোপাসনা করতেন, সেখানেও আর তার ঠাই রইল না। সবাই মুমূর্ষু গলিতদেহ কুষ্ঠরোগিনীকে রাজ্যের বাইরে—এক অরণ্যের মধ্যে ফেলে রেখে গেল। সেই বিজন অরণ্যে সেই রাজ্যে মৃত্যুপথযাত্রী পামো এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নে বহুদিন বাদে সে তার স্নেহশীল পিতাকে দেখতে পেলো। পিতা তাকে বলল, “পামো, মা, তুই উপবাসী থেকে চেরেসিদেবের পূজা কর, তুই ব্যাধিমুক্ত হবি ও ‘বোধি’ (Buddhahood) লাভ করবি—মানব-মুক্তিদাজীরাপে তুই জগতে খ্যাত হবি।”

এই স্বপ্নদেখার পর থেকে শুরু হোল পামোর তপস্যা—
কঠোর উপবাসত্রেতে দেহ হোল ক্ষীণ, প্রতিদিন পূজা নৈবেদ্য
প্রদান আর চেরেসিদ্দেবের কাছে সে কি আকুল আৰ্ত্তি—।
অবশেষে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পামো বোধি লাভ করে দেবী
হলেন। তার দেহ ব্যাধিমুক্ত হোল। তিনি চরমস্তান লাভ
করলেন, আর প্রচার করলেন “ইউনে উপবাস পদ্ধতি” বার
ঘারা তিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধগণ একে পুণ্যময়ী
মাক্-দেবী রূপে পূজা করেন।

এই কক্ষে দেওয়ালগুলি নানারূপ চিত্রাঙ্কিত নানা দেব-
দেবীর মূর্তি বিভিন্ন চিত্রশিল্পীদের হস্তে শিল্পবোধের কথা
স্মরণ করিয়ে দেয়, রং তুলির মাধ্যমে রূপে রংয়ে রেখায়
ও স্বার্থ ভাব প্রকাশে এগুলি অনবস্ত। দেওয়াল-
গায়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কালীমূর্তির মত “মহাতারাদেবীর”
১০৮টি বিভিন্ন মূর্তি অংকিত আছে। এই মহাতারাদেবী
কখনও ভীষণা সংহারিণী ভৈরবী, কখনও শান্তা, শিবানী,
বরপ্রদায়িনী। তাপিতা অভ্যাচারিতা ধরিজীর বৃকে রাজা-
ধিরাজ চেরেসি স্বশক্তিতে এদের সৃষ্টি করে শক্রদলন, লোক
রক্ষা ও ধর্মসংস্থাপনার্থ এদের মহাশক্তি রূপে পাঠিয়েছেন
ধরাধামে এদের শান্তা ও ভীষণা ২১টি রূপ এখানে প্রকটিত।
লামাশাস্ত্রে এরা জেচুন দেবী বা “দেবী ফামাডোমা”
(Zeohun বা Phama Dolma) নামে প্রসিদ্ধ।

এই মূর্তি-গুলির-সামনে অসংখ্য প্রদীপ দোদীপ্যমান, ধূপের
ধোঁয়া, ভিক্ষুদের মন্তোচ্চারণ, পূজার্থীদের ঘৃতাচ্ছতি এক
অপূর্ব ভাবাবেশ সৃষ্টি করে। কক্ষের মধ্যে, প্রান্তে ও বেদীর
সামনে বৌদ্ধ-প্রথা অনুযায়ী নানা মন্ত্র ও প্রার্থনা লিখিত ঘণ্টা
ও দামাশাগুলি সদাই ঘুরছে—দার্জিলিং ও এই অঞ্চলের সর্বত্র
বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হাতে এগুলি সর্বদা দেখা যায়। ছয়লোকের
মঙ্গলের জন্য বৌদ্ধ-উপদেশাবলী এ গুলির উপর লেখা থাকে
—এ ঘণ্টা ঘুরনের তালে তালে, ভিক্ষুরা মন্তোচ্চারণ করে
থাকেন।

এই মন্দিরের উপরে দ্বিতলকক্ষে গৌতমবুদ্ধ ও তাঁর দুই
শিষ্য সারিপুত্ত ও যোগালানার ৩টি অপূর্ব স্থলর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত
আছে।

মন্দিরের প্রশস্ত দ্বিতলকক্ষে “পদ্ম সন্তব” বুদ্ধমূর্তি
প্রতিষ্ঠিত। ইহার একহাতে আয়ুধ, অস্ত্র হাতে মানুষের
মাথার খুলি। কিন্তু এর মুখে স্মিত-শান্ত বরাভয় প্রদায়িনী
হাসি; মানবমুক্তির জন্য গৌতমবুদ্ধের তিরোধানের ষাটশ বর্ষ
পরে গৌতমবুদ্ধ অপেক্ষা পাঁচ শত বৎসর শক্তি বা “বোধি”
নিয়ে বুদ্ধের অবতার (incarnation) রূপে এর আগমন।
পদ্মের উপর জন্ম বলে এর নাম “পদ্মসন্তব”। ‘তেরজি’
(TERZI) ও অন্তান্ত মহাযান বৌদ্ধ-তন্ত্র-শাস্ত্র মতে,
বর্তমান যুগ “পদ্ম সন্তবের”র যুগ। পদ্মসন্তব বুদ্ধের হাতের
মাথার খুলি (skull) কঠোর তন্ত্রসাধনার ইংগিত করে।
পদ্ম-সন্তব বুদ্ধের অপর নাম “গুরু রিনপোচে” (Guru
Rinpoche)। পদ্ম-সন্তব বুদ্ধের আবির্ভাব সম্পর্কে
গৌতমবুদ্ধের এক ভবিষ্যৎ বাণী ছিল :—কুশীনগরে ৮০ বৎসর
বয়সে গৌতমবুদ্ধের মহাপ্রাণ হয়। মৃত্যু-সময়ে তিনি তার
শষ্যার চারিদিকে শিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত্ত আছেন। আনন্দ
প্রভৃতি পঞ্চ-প্রধান শিষ্য বিগলিত অশ্রুধারায় বুদ্ধের পদপ্রান্তে
আকুল আবেগন জানান যে ভগবান বুদ্ধ জগতের কল্যাণকল্পে
আরো কিছুদিন দেহ ধারণ করুন। তখন বুদ্ধ তাঁর প্রিয়শিষ্য
আনন্দকে আশ্বাসযুক্ত স্বীকৃতি দিলেন যে, তিনি ষাটশবর্ষ পরে
পঞ্চশত বৎসর শক্তি নিয়ে জগতের কল্যাণ কল্পে আবার
আবির্ভূত হবেন। তাই গৌতম-বুদ্ধের পুনর্জন্ম (re-birth)
হোল। নব-অবতারে (Re-incarnation) তিনি হলেন
পদ্মসন্তব বুদ্ধ।

পদ্মসন্তব মূর্তির সম্পূর্ণ-বামে চেরেসি দেবের একটি মূর্তি
ও সম্পূর্ণ-দক্ষিণে কৃষ্ণবর্ণের ভীষণাকৃতি “কল্পপানি”র
মূর্তি। তার অপর নাম “মহাকাল” বা “তামেজেন”।
তার পদতলে দৈত্য দলিত ও পিষ্ট। দুইটির দমমে ও

শিষ্টের রক্ষায় এই দেবতা চেরেনদিবেবেরই অপর এক অংশ বিশেষ।

এগুলি ব্যতীত আরো দুটি মাতৃমূর্তি আছে। তাদের একজনের নাম ‘মান্দারবা’ (Mandarawa) ও অপরজনের নাম “খান্দয়েশী” (Khando-Yeshi-Chhorgyol)। এরা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী ও চারণ-শিষ্যা। পদ্মগজবের আদেশে এরা দুজনে প্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থ ও তন্ত্র শাস্ত্র সমূহ খুঁজে বের করেন। হিমালয়ের গুহা ও অরণ্যের অভ্যন্তর থেকে এরা সংস্কৃত, নেপালি ও তিব্বতী ভাষায় লিখিত বহু ধূসর পাণ্ডুলিপি ও কীটদণ্ড-মূল্যবান গ্রন্থরাজি আবিষ্কার করেন। জগতের বৌদ্ধ সমাজ এদের কাছে ঋণী। মোট ৬৩টি গ্রন্থ উদ্ধার করা হয়েছে। এই দুপ্রাপ্য গ্রন্থের কয়েকখানি মাক্-ডোগ-বৌদ্ধ মন্দিরে সংরক্ষিত আছে। এই মন্দিরের সহ-মঠাধ্যক্ষ ৭৪ বৎসর বয়স্ক শ্রীযুক্ত কারসাং নোরবু (Shri Karsang Narbu) তিব্বতী বৌদ্ধশাস্ত্রে অগণিত। এই বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রবরের মতে, বুদ্ধের বাণী বিশ্বস্ত হয়েছি বলেই জগতে এতে হানি হানি। ভাষিকতায় আচ্ছন্ন মানুষ আজ পথভ্রান্ত। সত্য-শিব-সুন্দরের দ্বারা সধিক, তারা মানুষের দ্বারে দ্বারে তাই মানব-মুক্তির বাণী প্রচার কোরছেন, মানব-কল্যাণ কল্পে জগদীশ্বরের কাছে অহরহ আকৃতি জানাচ্ছেন। নেপাল, তিব্বত, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধদের ও বুদ্ধবিশ্বাসীদের মত ইনিও বিশ্বাস করেন যে তিব্বত-জগতের ধর্মগুরু চতুর্দশ দলাই লামা এক সচল সজীব বুদ্ধ। বিশিষ্ট বৌদ্ধলামা Pawoo Rinpoche, (লাসা থেকে দার্জিলিং আগত) Pal Pungontul Rinpoche এবং Vagyoe Tulku, ৭৬ বৎসর বয়স্ক-প্রভৃতি দলাই লামাকে বুদ্ধ বলে স্বীকার করেন এই নেপালী-তিব্বতী-বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণ কর্মফল ও পুনর্জন্মে

বিশ্বাসী। পূর্বজন্মের স্মৃতি ও দৃষ্টি অনুযায়ী উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট জন্ম নিরূপিত হয়। বর্তমান জন্মে জীব তার সংকর্মের দ্বারা পূর্বজন্মের পাপ-কালন করতে পারে। এই সম্পর্কে বৌদ্ধশাস্ত্রাদিতে বুদ্ধবাণী তথা সংচিন্তা, সংবাক্য, সংসংকল্প, প্রভৃতি “অষ্টাঙ্গিক মার্গ” পালনের নির্দেশ আছে। প্রকৃত বৌদ্ধ বা বুদ্ধভক্ত ইহাকে পালন করাই জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। পুনঃপুনঃ জন্মের দ্বারা জীব শোধিত হয় ও শেষে ‘বোধিষ বা নির্বাণ তথা মুক্তি লাভ করে ও আর জন্মপরিগ্রহ করে না। হিন্দুধর্মে পুনর্জন্ম ও কর্মমাদ স্বীকৃত। প্রসঙ্গতঃ তিব্বতীয়দের ধর্মগুরু দলাই লামার উক্তি এখানে উদ্ধৃত করে এ প্রবন্ধ শেষ করা অনুচিত হবে না :—

“We believe with good reason that all beings of various forms (both animal and human) are reborn after death. In each life, the proportion of pain and joy which they experience is determined by their good or, evil deeds in the life before, although they may modify the proportion by their efforts in their present life. This is known as the “Law of Karma”. Beings may move up or, down in these realms, from animal to human life or, back. Finally by virtue and enlightenment, they will achieve Nirvana, when they cease to be reborn Gh. Within Nirvana, there are stages of enlightenment, the highest of all, the perfection of enlightenment is Buddhahood.”

সুন্দরবনে উইলিয়ম কেরি

আর্ষদেব

[আন্তর্জাতিক পর্যটক-বর্ষ উপলক্ষে সুন্দরবন ভ্রমণের ভূমিকা সম্পর্কে লেখকের দ্বিতীয় প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধ ১৩৭৪এর জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত হয়েছিল। জঃ সঃ]

হাসনাবাদ থেকে হিজলগঞ্জ যাওয়ার পথে লঞ্চে বসে অনেক কাল আগের কথা মনে পড়ে যেতে পারে ভ্রমণকারীর। ওপারের দিকে ছলছল চোখে তাকাত্তে হবে এখন, ওদিকটা পাকিস্তান। একের পর এক বর্ডার আউটপোস্ট ওদিকে, বড় বড় অক্ষরে বি. ও পি-র নামের নির্দেশ। দেবহাটার নামও চোখে পড়বে—ওপারেই সেই থানার সীমানা।

কিন্তু উইলিয়ম কেরি যখন কিছুকাল এই অঞ্চলে বাস করেছিলেন তখন মানুষের শত্রু বাঘ যদি বা ছিল, মানুষ কখনোই ছিল না; এখন ওপার-ওপারের দিকে তাকালে মানুষই যে মানুষের শত্রু হয় সে কথাই বুকে বাজে।

তীতীর ছেলে, পেশায় মুচি, ধর্মপ্রচারক কেরি সেই হুদুর ইংলণ্ড থেকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ‘হিন্দু’দের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন জন টমাস যিনি আগেও কবার কলকাতায় এসেছিলেন, এবং মালদহের মদনাবাটিতে পরিচিত নীলকরের আওতার থেকে খৃস্টধর্ম-প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁদের ব্যাপ্টিস্ট মিশন তাঁদের হাতে বার্ষিক মাত্র একশো-দেড়শো পাউণ্ড দিয়ে ঐশ্বরের বাণীপ্রচারের কাজে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কেরির উৎসাহের অস্ত ছিল না। ভীত, জন্তু পিতাকে তিনি যাত্রার প্রাক্কালে (১৭ই জানুয়ারি ১৭৯৩) লিটার থেকে বাঙালী হিন্দুদের সম্পর্কে (যাদের তিনি তখনো ‘দেখেন নি’) লিখেছিলেন : “পূর্বপ্রাচ্যের বাংলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে মিশনারি হিসেবে আমাদের যেতে হচ্ছে। পৃথিবীর মধ্যে তারা সবচেয়ে শাস্ত্রনির্বিশেষ মানুষ,

কিন্তু নিদারুণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং ভীষণ অজ্ঞ। আমার এক সহকর্মীও আমার সঙ্গে যাচ্ছে, সে সেখানে পাঁচ-ছ বছর ছিল এবং ওদের ভাষাও বোঝে”।

আহা! উঠে দ্বিতীয় সপ্তাহেই কেরি বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন—বোধ হয় টমাসই তাঁর শিক্ষক ছিলেন। প্রথমে বালেস্বরে, পরে ১১ই নভেম্বর ১৭৯৩ তারিখে কেরি কলকাতায় পদার্পণ করেন। তখন কোম্পানির রাজস্ব, কেরি কোম্পানির কর্মচারীদের আদবকারদা ঠিক পছন্দ করতেন না, নিরুপায় বলে চুপচাপ থাকতেন। কলকাতায় কেরির ডান-হাত হয়ে দেখা দিলেন রাম বহু। রাম বহুর সঙ্গে টমাসের আগেই আলাপ ছিল। রাম বহু নিজেই একজন সত্যসন্ধানী। তিনিই কেরির বাংলা-শিক্ষক, দো-ভাষী ও মুন্সি হয়ে দাঁড়ালেন।

আগে থেকেই মালদহে বাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও কেরি পাঁচ মাস কলকাতায় আটকে পড়লেন। হাওরে পরগা কমে আসছিল, সেইজন্তে তাঁরা প্রথমে ব্যাঙুলে গিয়ে এক জার্মান হোটেলওয়ালার কাছে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করলেন। সেখান থেকে নৌকায় চড়ে এদিকে সেদিকে কিছুটা ধর্মপ্রচারও করতেন, একবার সংস্কৃত শিক্ষা ও হিন্দু-ধর্মের পীঠস্থান নদীয়ার (সম্ভবত, নবদ্বীপে) যান। সেখানকার অনেক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তাঁদের বসবাস করতেও বলেন। কিন্তু তাঁরা নিজেরা চাষ করবেন মনস্থ করেছিলেন অথচ চাষোপযোগী জমি সেখানে পেলেন না। কলকাতায় পণ্ডিত জমি বিলি হচ্ছে শুনে ক্রিয়ে এলেন। কিন্তু বাস্তবিকই

সেটা একটা গুজব শুনেছিলেন কেরি, সেরকম কোন জমি বিলি হচ্ছিল না কলকাতায়।

এই সময় কোম্পানীর এক বোটানিক উদ্ভানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদ খালি ছিল, প্রার্থী হয়ে সেখানে গিয়ে কেরি শুনলেন লোক নেওয়া হয়ে গেছে। কেরি চোখে অন্ধকার দেখলেন, কিন্তু অনমনীয় তাঁর মনোবল। গৃহহীন, সঙ্গে প্রায়োন্মাদ স্ত্রী, একজন শ্রালিকা এবং চার সন্তানের মধ্যে দুজন আমাশয়-আক্রান্ত এইরকম এক অবস্থায় নীলুদত্ত বলে একজন বাঙালী ‘মহাজন’ মানিকভল্লার তাঁর বাগান-বাড়িতে তাঁদের থাকতে দিলেন।

যেহেতু তাঁর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পাসপোর্ট ছিল না এবং যেহেতু তিনি দিনেমারদের সহায়তায় তাগেরই জাহাজে এদেশে এসেছিলেন, সেকারণে কলকাতায় তিনি কোন সহযোগিতা পাননি কোম্পানির লোকদের কাছ থেকে। কিন্তু তাতেও বিচলিত হন নি কেরি। ঈশ্বরের প্রতি অগাধ ভক্তি আর খুস্টদর্শ প্রচারের নির্ভরতা তাঁর পাথেয় ছিল।

এসময় রাম বহু নিজেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তিনিই কেরি পরিবারের অর্থাভাব দেখে প্রস্তাব করলেন যে ব্রাহ্ম-সঙ্ঘল সন্দরবনে যাওয়া যাক, সেখানে খানিকটা জমি ‘বন্দোবস্ত’ নিয়ে চাষবাস করা যাবে। টমাস শতকরা ১২ ভাগ স্দের অঙ্গীকারে ১৬ পাউণ্ড ধার করলেন এক বাঙালীর কাছ থেকে, তারপর তাঁরা একটা নৌকো ভাড়া করে রওনা দিলেন সন্দরবনের দিকে। চতুর্থ দিনে, আর যখন মাত্র একজনের আহাির অবশিষ্ট ছিল, তখন সেই বিচলিত পরিবারটি একজন ইংরেজের একটা বাড়ি দেখতে পেলেন। বাড়িটার কাছে যেতেই বাড়ির মালিক মিঃ চার্লস শর্ট—যিনি ওখানে কোম্পানির নিমক ফ্যাক্টরির অধিকর্তা ছিলেন—এগিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। ঈশ্বর বিষয়ে এই ভদ্রলোকটি সন্দিহান হলেও, এবং কেরির সঙ্গে এর মত না মিললেও, ইনি কেরির কাজে

উৎসাহ দিয়েছিলেন। ইনি পরে কেরির শ্রালিকার পানিগ্রহণও করেন।

সেটা ছিল আজকের হাসনাবাদ (হাস্তমুখর আবাদ)। কেরি ওখানে কয়েক একর জমি বন্দোবস্ত নেন। বোধ হয়, ইছামতীর ধারেই (on the Jamoona arm of the united Ganges and Brahmapootra) নিজেদের বাসের জন্যে একটা বাঁশের, হয়ত ছিটেবেড়ার (a bamboo house) বাড়ি তৈরি করান।

সাহেবের বন্দুক বাধ ঠেকাবে এই ধারণায় তিন চার হাজার (!) স্থানীয় লোকও তাঁর বাড়ির আশেপাশে বসতি করতে আরম্ভ করে।

কেরি-নামক সেই দূরুচৈতা লোকটি ওখানে তিনমাস বাস করার পরই লেখেন: “বাংলায় খাওয়াপরা, কেনাবেচা ইত্যাদি সম্পর্কিত কথা আমি বলতে পারি এখন। বাংলা শব্দ আমার কানে বেশ পরিচিত হয়ে গেছে। এভাষার গঠন বড় অদ্ভুত, সর্বনাম ছাড়া অন্তর্য বহুবচনের ব্যবহার নেই, অব্যয় পদও নেই—কিন্তু বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের কারকের ব্যবহার অন্তহীন। এতদৃশ্যেও, ভাষাটা বেশ সহজ।”

এই ভাষা জাহাজে যেটুকু শিখেছিলেন তার ওপর শিখতে আর পাঁচ মাস লেগেছিল কেরির। জাহাজে থাকতেই টমাসকে বাইবেলের একাংশ (Genesis) অমুবাদ করতে তিনি সাহায্য করেছিলেন। পরে অমুবাদের প্রথম অধ্যায়টি যখন কলকাতায় পরিমার্জিত করেন, তখন মুনসি রাম বহু সেই বাংলা অমুবাদের প্রশংসা করেন। নদীয়ার এক পণ্ডিতও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে অমুবাদটির প্রশংসা করেন।

যাই হোক, কেরি হাসনাবাদে বাস করতে লাগলেন। দেবহাটা এখন পাকিস্তানে, হাসনাবাদ ভারতে—কেরির জীবনীকার বলেন তিনি হাসনাবাদে বাস করতে আরম্ভ

করেছিলেন, কিন্তু কেরির ডায়েরিতে (১৯শে এপ্রিল ১৭৯৪) লিখিত আছে যে দেহারটার (অর্থাৎ, দেবহাটা) নিমক ফ্যাক্টরি থেকে সেই বছরেই কুড়িজন লোককে বাধে ধরেনিয়ে য়ান, সেখানে কেরি থাকতেন, এবং বাঘের বিপদের জন্তেই তাঁর বাইরে বেরোনো হত না। মনে হয় দেবহাটাতেও একটা নিমক-ফ্যাক্টরি ছিল, যেখানে হয়ত কেরি কিছুকাল তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই রকম পরিবেশে বাস করেও কেরি ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন, এবং গুপ্তধর্মপ্রচারে যে ত্রুত এহণ করেছিলেন সেই ত্রুতের কথা পুনঃপুনঃ স্মরণ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল তাঁর বাংলা ভাষার চর্চা।

হৃন্দরবনে নিবাসের দিন, কিন্তু ফুরিয়ে গেল। একটি নির্দাক্তন দুর্ঘটনার সঙ্গে পরোক্ষভাবে তাঁর চলে-যাওয়া বিজড়িত। ১৭৯৪ সালের প্রথম দিকে কলকাতায় হুগলী নদী পেরোবার সময় একটি নৌকো ডুবে যায় এতে তিনজন ইংরেজ ব্যবসায়ী ও তাদের একজনের স্ত্রী ছিলেন। দুজন সীতরে ওঠেন, কিন্তু মিঃ আর উড্‌নি এবং তাঁর স্ত্রীর সলিল-সমাধি হয়। মালদহের রেসিডেন্সিতে উড্‌নির বৃদ্ধা মা ছিলেন, টমাস তাঁর সঙ্গে আগেই পরিচিত ছিলেন—এবং বৃদ্ধার আর এক পুত্র মিঃ জি উড্‌নি তখনো সেখানে কোম্পানির বাণিজ্যিক রেসিডেন্ট ছিলেন। টমাস তাঁকে একটা শোকবাণী পাঠাতেই তাঁদের পুরনো পরিচয় আবার ঝালিয়ে ওঠে। মিঃ জি উড্‌নি টমাস আর কেরি দুজনকেই তাঁর নতুন নীলের ফ্যাক্টরির সহায়ক হিসেবে পেতে চাইলেন। প্রত্যেককেই বার্ষিক ২৫০ পাউণ্ড করে বেতন দেবেন বললেন উড্‌নি, তাছাড়া উৎপাদনের ওপর কমিশন এবং স্বত্বাধিকারীর অংশ দেবার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। কেরি চাকরিটা নেওয়া ঠিক করলেন এই ভেবে যে এর ফলে তাঁর পক্ষে বাংলায় বাইবেল ছাপানোর খরচ বহন করা সম্ভব হবে।

এর পর হৃন্দরবনের নদী দিয়ে বেরিয়ে এসে গঙ্গার ওপর

দিয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে মদনাবাটি পৌছে যান তাঁরা। হৃন্দরবন থেকে যাওয়ার পথে কেরি সাহেবের ডায়েরির কথামত জানা যায় যে ১৭৯৪ সালের ২৬শে মার্চ-র এক নিম্নাং-দিনে তিনি তাঁর সাপ্তাহিক প্রার্থনার জন্তে নেমে পড়েন চাঁদুরিয়া বলে এক জায়গায়। চব্বিশ পরগণায় এই চাঁদুরিয়া বলে কোন গ্রাম নেই, হতে পারে অপর পারে খুলনায় এই গ্রামখানা ছিল এবং এখনো আছে। সকালবিকেল নিজের পরিবারে গল্পগুজব করে সন্ধ্যাবেলায় পৌত্তলিকদের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করার কাজে (work of publishing the Word of God to the heathen) বেরিয়ে পড়েন। সেই তীক্ষ্ণবী মুন্সী রামরাম বহু তাঁর পাশে পাশেই ছিলেন। তাঁর সম্মুখে অজিত বাংলা ভাষার জ্ঞান, এবং সেই বাংলা ভাষাতেই তিনি প্রথম বক্তৃতা করবেন। চাঁদুরিয়ার লোকজনের মনে নিশ্চয়ই খুব কৌতূহল জেগেছিল—সাহেব বাংলা বলবে।

মুন্সী মাঝে মাঝে সাহেবের বাংলা ঠিক করে দিচ্ছেলেন। সেই রকম অবস্থায় প্রায় দুশো লোকের সামনে ঈশ্বর সম্বন্ধে দুজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে আলোচনা করতে হুকুম করলেন সাহেব।

কিছুক্ষণ আগে একটা মন্দির দেখতে গিয়েছিলেন সাহেব—তাতে ব্যাঙ্গক্লট দক্ষিণায় যিনি বনের দেবতা, তাঁর মূর্তি ছিল; আর ছিল বশন্তরোগের দেবী মুণ্ডহীন শীতলার মূর্তি যিনি—কেরির ভাষায়—একটি মুণ্ডহীন ঘোড়ার পিঠে বসেছিলেন। তাছাড়া বৃহদর্ক পঞ্চাননের মূর্তি ছিল; আর ছিল কালুরায়ের মূর্তি—কেরির ভাষায়, তিনিও ঘোড়ার পিঠে বসেছিলেন। মন্দিরের একটা ঘরে কেরি শিব দেখেছিলেন।

কেরি বাস্তবিকপক্ষে একটি শিবলিঙ্গই দেখেছিলেন। সেটি দেখে তাঁর মনে ইটালীর চুস্কান স্তম্ভের সঙ্গে সাদৃশ্যের কথাই জেগে ওঠে। তিনি সেটিকে একটি মস্তক কাঠের খুঁটি বলে মনে করেছিলেন, যার নীচের দিকে অলঙ্করণও

কার্নিসের মত ছিল (only a smooth post of wood, with two or three mouldings in it, like the base of a Tuscan pillar)।

এই সব মূর্তি দেখে তিনি সেই ব্রাহ্মণতনয় ছটিকে মূর্তির অর্থোস্তিকতা, মূর্তিপূজার অসারত্ব এবং দৈবত্বের মহিমা ও বীজের মাধ্যমেই মুক্তির অবশ্যস্বাবিতা সম্পর্কে অনেক বোঝাতে আরম্ভ করেন। একজন ব্রাহ্মণ এসব শুনে নিরুত্তর, নির্বাক হয়ে গেল। তা দেখে সমবেত লোকেরা চৈচিয়ে উঠলো : জবাব দিচ্ছেন না কেন ? জবাব দিচ্ছেন না কেন, ঠাকুর ?

ব্রাহ্মণটি উত্তর দিলেন : আমার কিছুই বলার নেই। ঠিক এই সময়েই আর একজন স্ত্রী ব্রাহ্মণ আবির্ভূত হলেন। তিনি কেরির কথা কিছুটা মেনে নিয়ে বললেন : মূর্তি-পূজার প্রচলন প্রথম থেকেই ছিল না, অনেক পরে আরম্ভ হয়েছে।

কেরি তাঁকে জিগ্যেস করলেন : আচ্ছা, মুক্তির উপায় কী বলতে পারেন ?

ব্রাহ্মণটি উত্তর দিলেন : বারবার ভগবানের নাম জপ করাই মুক্তির উপায়।

কেরি তাঁকে বললেন : আচ্ছা, আপনার কোন ছেলে যদি আপনাকে দারুণ কষ্ট দেওয়ার পর হাজারবার 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাকে, তাহলে কি আপনি তার নির্দয়তার কথা ভুলে যাবেন ? এতে হয়ত ছেলেরা খুশী আর বোকারা পরিতুষ্ট হয়, কিন্তু ভগবান যথেষ্ট বিচক্ষণ, তিনি কি অত সহজে ভুলবেন ?

ব্রাহ্মণ বললেন : বিশ্বাসই আসল কথা। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।

কেরি তাঁকে জিগ্যেস করলেন : বিশ্বাস কী ?

এ প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না ব্রাহ্মণ, কেবল বললেন : ভগবানকে মেনে চলুন।

কেরি আবার জিগ্যেস করলেন : ভগবানের আদেশ কী ? কী তাঁর অভিলাষ ?

তিনি বললেন : ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ কেউ তাঁকে দেখতে পায় না বলে তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই তিন মূর্তির মাধ্যমে স্বপ্রকাশ—এবং জীবনধারণের কালে এই তিন দেবতার মধ্যে অন্তত একজনকেও উপাসনা করতে হবে।

কেরি তাদের কাছে বাইবেলের বাণী ও খ্রীষ্ট জীবনী শোনালেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল বলে তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে হল কেরিকে।

যেহেতু কেরি সেখানে আর কখনো পদার্পণ করেন নি তাই তাঁর কথামত তাঁর সেই ভাষণের কী ফল হল তা তিনি নিজেও আর দেখতে পান নি।

আজ হাসনাবাদের কোথাও কেরির সেই বাঁশের বাড়িখানার চিহ্নমাত্র নেই, লোকের স্মৃতিতে ত নেই-ই। অথচ আমি যে এই গল্প লিখছি তার আদি জনক ছিলেন কেরিই ; বাংলা গল্পের আদি জনস্বানের গৌরব অন্তত অংশত হলো হাসনাবাদের প্রাপ্য। এখানেও এই ভাষায় কেরির শিক্ষানবীশি চলেছিল।

: উপস্থান :

কণ্ঠ ভরা নিম্ন

মি হির মুখো পা ধ্যা য

। উনত্রিশ ।

প্রায় সাতদিন বর্ধমান শহরের বাইরে আটক হয়ে আছে নবাবী কোঁজ। অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন নবাব আলিবর্দী খাঁন। কামানের ভয়ে বর্গীরা খাঁপিয়ে পড়ছে না বটে। কিন্তু জিজেলের গোলা যতদূর যায়, তার বাইরে খাঁটি আগলে রয়েছে। এরকম অবস্থায় আর কতদিন চলতে পারে। চারপাঁচদিন পর থেকেই নবাবের শিবিরে রসদের টানাটানি শুরু হয়েছিল। এখন সাতদিনের মাথায় হাহাকার অবস্থা। পেটভরে খেতে না পেলে কি করে লড়াই করবে সৈন্যরা। এদিকে আচালনগরায়তে যারা ছিল, যাদের পেছনে রেখে নবাব এগিয়ে এসেছিলেন সেই সব ফালতু লোক লঙ্কর, বাদী-বাইজীরাও এসে জুটেছে। মারাঠারা তাদের আসতে দিয়েছে; কিন্তু বেরোতে দিচ্ছে না কাউকে। খাবার মুখ বেড়েছে, কিন্তু রসদের যোগান বাড়েনি। অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে, আরো হবে যদি তাড়াতাড়ি কোন ব্যবস্থা না করা যায়।

বাধ্য হয়েই সন্ধির কথাবার্তা শুরু করলেন নবাব আলিবর্দী খাঁন।

ভাকর পণ্ডিত বলে পাঠালেন—মুঘল সাম্রাজ্যের সমস্ত স্ত্রী থেকে চৌথ পায় মারাঠারা, শুধু স্ত্রী-বাংলাই এককাল চৌথ দেয়নি, এখন নবাব বাহাদুর যদি দশ লক্ষ টাকা দেন, তবে অবরোধ তুলে নিয়ে চলে যাবে মারাঠারা। সেনাপতিদের

প্রাৰণ-ভান্ন ৭

সঙ্গে পরামর্শ করলেন নবাব। নবাব পক্ষের প্রধান ভরসা আফগান গোলন্দাজদের সর্দার মুস্তাফা খাঁ। পরামর্শ দিলেন—বর্গীদের বিশ্বাস নেই, এত সহজে টাকা পেলে ওদের লোভ আরো বেড়ে যাবে, বরং ওই টাকা সেপাই-রবকান্দাজদের মধ্যে ভাগ করে দিলে তারা লড়াই করার আরো উৎসাহ পাবে।

সেই কথাই রইল। মুস্তাফা খাঁর পরামর্শই মেনে নিলেন নবাব আলিবর্দী খাঁন। স্থির হল, পরের দিন খুব ভোরে কাক-পক্ষী ডাকার আগে বাছাবাছা সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করবেন নবাব। বর্গীদের ব্যুহ ভেদ করে পথ কেটে কাটোয়ার দিকে চলে যাবেন। শিবিরে চাকর-পাচক, বেগম-বাদী-বাইজী যারা ছিল, তাদের বলা হল রাণী দীঘির পাড়েই তাঁবুর মধ্যে অপেক্ষা করতে। বর্গীরা যখন হঠে যাবে, তখন তারা যেন পেছন পেছন আসে। কিন্তু কাজের সময় অল্পরকম হল। ফালতু লোকলঙ্কর, বাদী-বাইজীরা কেউ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ছাড়তে চাইল না। বিশেষতঃ মেয়েরা ভীষণ ভয় পেয়েছে। টাকার জন্ত বর্গীরা না পারে এমন কাজ নেই। হাতের গয়নার জন্ত হাতশুদ্ধ কেটে নেবে, নাক কানের গয়নার জন্ত নাক কান কেটে নেবে। সোনার চেয়েও দামী ইজ্জত নষ্ট করবে। মেয়েরা তাই সেপাইদের সঙ্গে ছাড়ল না। যদি যদি এক সঙ্গে মরবে। খুব ভোরবেলা অন্ধকারের মধ্যে নবাব যখন ভারী ভারী কামান নিয়ে,

বন্দুকধারী বরকন্দাজদের নিয়ে, অঝোরোহী সেপাইদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন, তখন পেছন পেছন দাসীবাঁদীরাও চললো। নানা লটবহর, তাঁবু-ভাঙ্গাম নিয়ে কুলি-কামিনের দল। আবদার, চোপদার, হুঁকা-বরদার, তবলচি, মশালচিরাও চললো। চুপিচুপি তাড়াতাড়ি আর আক্রমণ হ'ল না। বরং এত হই চই হট্টগোলে মারাঠারা সজাগ হয়ে উঠল। ওদিকে আকাশও ফর্সা হয়ে গেছে। পরিস্কার দিনের আলো। অর্থাৎ যেটুকু বাকী ছিল তাও হয়ে গেল। মানুষজন, শক্রগিড়ি চিন্তে আর ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। গোলাগুলির নিশানাও আর ভুল হবে না। নবাব তখন না পারেন এগোতে, না পারেন পেছোতে। জলকান্দারা সেই ধানক্ষেতের মধ্যে আটক হয়ে রইলেন। ভারী ভারী কামানের গাড়ির চাকা জল কাদায় বসে যাচ্ছে। বোড়া খচ্চরের পা ডুবে যাচ্ছে। সেপাই বরকন্দাজদের পোষাক-পাগড়ি জলে কাদায় মাখামাখি। ওর মধ্যেই গোলাগুলি চলছে। হাতাহাতি কাটাকাটিও কিছু হচ্ছে। কিন্তু চূড়ান্ত হারজিতের কয়সালো হল না। সারাদিন কেটে গেল।

সন্ধ্যা হয় হয়। কয়েকখানার দরজার দরজায় ভালাবন্ধ হ'ল। পুঁথিপস্তরের পুটুলিটা ভালভাবে শুছিয়ে নিল ভারত। যাবার জন্ত তৈরী হয়ে রইল। শুধু নন্দলাল চক্রবর্তীর কাছ থেকে চেয়ে আনা সাহিত্য দর্পণের পুঁথিখানি পুটুলির বাইরে আলাদা করে রাখল। ফেরত দেবার জন্ত দেবীসিঙের কাছে রেখে যাবে পুঁথিখানা। সারাদিন ধরেই টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। ভালাবন্ধ হবার আগেই রাতের খাওয়া সেরে নেয় কয়েদীরা। বৃষ্টির শব্দে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। একটু সময় পরেই পাশের কুঠুরীর কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল।

সব কুঠুরীতেই তখন অন্ধকার। বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে সগাই। বাতির জন্ত একটা করে মোমবাতি বরাদ্দ এক

সপ্তাহের জন্ত। হুতরাং সন্ধ্যার পর বেশিক্ষণ আর বাতি থাকে না কোন কুঠুরীতে।

ভারতও অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল। খানিকক্ষণ বামে মশার কামড় খেতে খেতে চাদর মুড়ি দিয়ে খাটির উপর শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ পরে কে জানে, হঠাৎ কার হাতের ছোঁয়ার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসল ভারত।

অন্ধকারে দেবীসিঙের চাপা গলা শোনা গেল—চুপসে হামারা সাধ আহুন, রায়মোশা—

চুপিচুপি বেরিয়ে এল দু'জনে। আবার দরজাটা টেনে ভালো লাগাল দেবীসিঙ। টিপটিপ বৃষ্টি, এক এক চমক বিদ্যুৎ। সেই বৃষ্টিতে ভিজ ভিজ লম্বা লম্বা একতলা দালান তিনটে পার হয়ে কয়েকখানার পেছন দিকে এল দু'জনে। আগে আগে দেবীসিঙ, পেছন পুঁথি-পস্তরের পুটুলি হাতে ভারতচন্দ্র। খুব উবেগ-উবেগনার মুহুর্তে বরাবর যেমন শান্ত, স্থির হয়ে যায়, তেমনি আশ্চর্যরকম শান্তভাবে যেন ভাগ্যের পেছন পেছন যাচ্ছে ভারত। দীর্ঘ ঋজু একটা ছায়ামূর্তির মত সামনে যাচ্ছে দেবীসিঙ, এক একবার পেছন ফিরে ভারতকে দেখছে। বোধহয় রায়মোশা ঠিকমত আসতে পারছে কিনা দেখে নিচ্ছে। শুড়ি শুড়ি বৃষ্টির মধ্যে কয়েকখানার পেছন দিকের দেয়াল ঘেঁষে চলতে চলতে ছোট একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে। দরজার পাঞ্জা খোলার ক্যাচ, ক্যাচ শব্দ হল। তারপর মাথা নিচু করে প্রথমে দেবীসিঙ পেছনে ভারতচন্দ্র কয়েক খানার পাঁচিলের বাইরে এসে দাঁড়াল। সামনেই মস্ত একটা তেঁতুল গাছ রোজ সকালে এই গাছটির পেছন থেকে ধীরে ধীরে সূর্য ওঠা দেখত ভারত। এক এক দিন বিকেলে একপাল বক এসে গাছটির মাথায় কিছুক্ষণ বসে যেত। সকাল বিকেল আরো অনেক পাখি এসে জুটতো কোন কোন

দিন প্রবল বাতাসে কিছু শুকনো ছোট ছোট তেঁতুল পাতা উড়ে এসে পড়তো ভারতের কুঁচুরীর সামনে। এই সতেরো-মাস যার সঙ্গে অনেক দূর থেকে শুধুমাত্র চোখের পরিচয় তার অন্ধকার আড়ালে এসে আশ্রয় নিল ভারতচন্দ্র আর দেবীসিঙ, বুদ্ধেলা।

সেই অন্ধকারে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল একটি কাপড়-ঢাকা পালকি আর কয়েকটি ছায়ামূর্তি।

চকমকি ঠোকার শব্দ। পরক্ষণেই একটি মাত্র মশাল জ্বলে উঠল। মশাল হাতে ফুলাদ খাঁ।

পাক্ষির পাশে বিভাধর। এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল ভারতকে। তারপর পাক্ষির ভেতর থেকে ছ'টি থলি এনে দেবীসিঙের হাতে দিল। অতটাকা শুধে নেবার সময় নেই। হাতের তালুতে তুলে একটু ওপর নিচ করে থলি ছ'টির ওজন পরখ করল দেবীসিঙ। থলি ছ'টির মুখ খুলে এক এক মুঠো সিক্কা-টাকা আর কয়েকটি করে মোহর মশালের সামনে ধরে এক একবার দেখে নিল, তারপর চাপাগলায় ভারতকে লক্ষ্য করে, বললো—রায়মোশা, মুন্সুক ছোড়কে ভেগে যান, যেতনা দুই পারেন, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, বারাণসী, উড়িষ্যা, যে ধার ধুশি—

পরক্ষণেই চটপট মশাল নিভিয়ে দেবীসিঙ আর ফুলাদ খাঁ নিঃশব্দে সেই ছোট দরজার পথে কয়েদখানার ভেতরে ঢুকে গেল। ক্যাচক্যাচ শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

অন্ধকারে/বললো বিভাধর—এসো ভারত, ওরে পালকি তোলা—পাক্ষির অন্ধকারে মুখোমুখি চুপচাপ বসল দু'জনে। বেহারারা যতটা সম্ভব নিঃশব্দে যাচ্ছে।

রূপমঞ্জরীর বাড়িতে যাবার সময় যেভাবে বসত দু'জনে, যেমনভাবে যেত ঠিক তেমনভাবে বৃষ্টিভেজা অন্ধকারে ধানিকঙ্কণ ঘুরে ঘুরে একটা ছোট গলি রাস্তার পাশে পাক্ষি ধামল। রাস্তার পাশেই একটা মামুষপ্রমাণ উঁচু দেয়াল। দেয়ালের গায়ে স্তেতর দিকে বেশ বড় একটা কাঁঠাল গাছ।

ওই কাঁঠাল গাছটা দেখে চিনতে পারল ভারত। বিভাধরের বাড়ির পেছন দিকে শিড়কির দরজার সামনে পালকি থেমেছে। মশাল হাতে দাঁড়িয়েছিল রামশরণ পাণ্ডে, পাশে রঘুনাথ, একহাতে কাপড়ের পোটলা আর এক হাতে তীক্ষ্ণধার বজ্রম। ধারালো দীর্ঘ ফলাটা মশালের আলোয়—চকচক করছিল। পাক্ষি থেকে নামল দু'জনে। আর দেরি করো না ভারত, রঘু তোমার সঙ্গে যাচ্ছে, রাতারাতি বর্ধমান থেকে যতদূরে পারো চলে যাও, নৌকো ঠিক করা আছে, নদী পার হয়ে হাটা পথে যাবে—

—তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ হবে না ভাই—ভারতের কথা শুনে আবার বললো বিভাধর—ওসব কথা এখন থাক, অনর্থক দেরি ক'রো না—

—কিন্তু এতগুলি টাকা তুমি খরচ করলে, কি করে যে শোধ দেব, জানি না—

—সব টাকা আমার নয় ভারত, তোমার অত কুষ্ঠিত হবার কিছু নেই, দু'হাজার টাকা তোমার মা পাঠিয়েছিলেন, তোমার মেজদা অর্জুন রায় এসে দিয়ে গেছেন মাসখানেক আগে—

—মা, মা টাকা পাঠিয়েছেন—একমুহূর্ত অতিভূতের মতো ডাকিয়ে রইল ভারত, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললো—

—তা হোক, তবু তোমার ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না, শুধু অর্থের পরিমাণ দিয়ে তো ঋণের পরিমাণ হয় না, তুমি আরেকটা কাজ করবে বিভাধর, আমার অমরোদ্ধ—

কেউ লক্ষ্য করলো না। শিড়কির দরজা আধখানা খোলা ছিল। সেই আধ ভেজানো কপাটের ফাঁক দিয়ে লোচন দানের মূর্ত মুখখানি একবার উঁকি দিল। মশালের আলোয় কয়েক পলক সবাইকে দেখে আবার অদৃশ্য হল। ভারত তখন সাহিত্য দর্পণের পুঁথিখানা বিভাধরের হাতে দিয়ে বসছিল—এই পুঁথিখানা নন্দলাল চক্রবর্তীর, তোমার কাছে

রেখে দাঁও, অযোগ্য মত ফেরত দিও আর তাকে আমার
নমস্কার দিও—

হুজনে আবার পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। কয়েক
মুহূর্ত পরে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল
বিদ্যাসূর। মশালটা নিবিয়ে পাকি বেয়ারাদের সঙ্গে রামশরণ
পাণ্ডে চলে গেল সদর দরজার দিকে। ভারতচন্দ্র আর
রঘুনাথ চললো অন্ধপথে।

ভিরিশ

অন্ধকার পথ, অন্ধকার আকাশ, চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ অন্ধকার।
একহাত দূরের মাহুশও স্পষ্ট দেখা যায় না। এক এক সময়
আঁচমক। বিদ্যাসূর আলোর মুহূর্তে সব উদ্ভাসিত হয়ে
ওঠে, পরক্ষণেই চতুর্ভুজ অন্ধকার চারিদিক থেকে ঝাপিয়ে
পড়ে।

আগে আগে যাচ্ছে রঘুনাথ, পেছন পেছন ভারতচন্দ্র। বড়
রাস্তা এড়িয়ে অলি-গলির আঁকা-বাঁকা পথে যাচ্ছে হুজনে।
লেজন্ত বোধহয় একটু বেশিপথ ঘুরতে হচ্ছে। পথের অবস্থা
ভাল নয়।

জল কাঁদা জমেছে। হুজনেরই খালি পা। পায়ের
গোড়ালি কাদার ডুবে যাচ্ছে।

আকাশের কোন্ প্রান্তে গভীর মেঘের ডাক। এক এক
সময় মনে হচ্ছে কামানের গর্জন।

অগস্ত্যবনয়। সাধারণ নিয়মে রাত্রিবেলা লড়াই বন্ধ থাকে।
কিন্তু বর্ষাদের কোন নিয়ম-কাহুন নেই। দিন হোক, রাত
হোক অযোগ্য পেনেই হামলা করবে। খুন-জখম লুটপাটের
আন্তন-জালাবে। তাই বোধ হয় নবাবের গোলন্দাজরা এক
একবার তোপ দেগে জানিয়ে দিচ্ছে, তারা সজাগ, সতর্ক।
এমনিতেই ঝড়-বৃষ্টির রাতে শহরের সাড়া থাকে না, তার উপর
আবার এই যুদ্ধ। বর্ষমান যেন একটা মৃত নিঃসঙ্গ শহর।
কোথাও একফোঁটা আলো নেই, কোথাও একটু শব্দ নেই।

শুধু ঝিরঝির বৃষ্টির শব্দ। মাঝে মাঝে দিগন্ত সীমায়
বিদ্যাসূর চমক আর গভীর গর্জন, বোধহয় কামানের শব্দ
কিন্তু মেঘের ডাক। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের হাহাকার।
বাতাসের দাপট যেন ক্রমেই বাড়ছে।

নদীর অবস্থা কেমন হয়েছে, কে জানে। বাঁকা দামোদর বড়
ক্ষেপা নদী। যদিও ভরা বর্ষায় কাল নয়, বৈশাখের প্রথম।
কিন্তু দামোদরকে বিশ্বাস নেই। মেঘবৃষ্টি দেখলেই তার
ক্যাপাসিটি বেড়ে যায়।

ঝিরঝির বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে হুজনে।
ভারতের গায়ে একটা গেরুয়া চাদর।

গেরুয়া কাপড়, গেরুয়া কতুয়া। কয়েকখানায় সকলেই মোটা
অতোর গুতি-কতুয়া গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে নিত। তাতে ময়লা
মনে হয় কম। বুকের কাছে পুঁথি-পতরের পুঁটুলি যতটা
সম্ভব ঢেকে ঢেকে নিয়েছে ভারত। দেড় বছরে দাড়ি গৌঁফে
মুখ ঢেকে গেছে। চেনাশোনা কেউ আর সহজে চিনতে
পারবে মনে হয় না। এক রকম ভালই হয়েছে। এক মুখ
দাড়ি, লম্বা চুল, গায়ে গেরুয়া। একবারে সম্রাটের বেশ।
কয়েক ছড়া রুস্তাকের মালা হলে দিব্যি মানিয়ে যেত।

আগে আগে যাচ্ছে রঘুনাথ। বাঁহাতে ছোটবড় দুটো
পুঁটুলি। ছোট পুঁটুলিটায় কিছু চিড়ে শুড়। বড় পুঁটুলিতে
খান দুই কষল, হুজনের মতো গুতি-চাদর গামছা। ডান
হাতে বজ্রম, মাথায় লাল শালুর পাগড়ি। চলতে চলতে এক
একবার পেছন ফিরে কি যেন দেখছে রঘুনাথ। ভারতও
একবার পেছনে তাকাল। তেমন কিছু চোখে পড়ল না।
আবার কিছুদূর গিয়ে পেছন ফিরে দেখল। হঠাৎ বিদ্যাসূর
আলোয় আবছামতন যেন মনে হ'ল হুশো কি আড়াইশো
হাত পেছনে দুটো ছায়ামূর্তি। কখন থেকে পিছু নিয়েছে
কে জানে। বিদ্যাসূরের বাড়ির কাছাকাছি থেকেই হবে
বোধহয়। কয়েকখানায় পেছন থেকেও হতে পারে।
অনেকটা পথ ঘুরে ঘুরে একসময় নদীর কিনারায় এসে দাঁড়াল

দু'জনে। প্রবল প্রোত। মেঘবৃষ্টি বাতাসের নেশায় দামোদর মাঙাল হয়ে উঠেছে।

খেয়াঘাটের পাশে বিশাল একটা বটগাছ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ডাল-পালা। তবে গাছটির আয়ু আর বেশিদিন নেই। বেশিদিন আর খাড়া থাকবে বলে মনে হয় না। দামোদরের ভাঙনে গোড়ার মাটি অনেকটা ক্ষয়ে গেছে। মোটা মোটা শেকড় নেমেছে জলে। অজস্র শেকড়ের জটিলতার মধ্যে নদীর ঘোলা জল পাক খেয়ে কলকল শব্দ করে ছুটেছে। জায়গাটা অচেনা নয় ভারতের। তিনবছর বর্ধমান প্রবাসের জীবনে অনেকবার এই খেয়াঘাটের কাছে বেড়াতে এসেছে। এই বটগাছের নিচেও এসে দাঁড়িয়েছে অনেকবার। দিনের বেলায় গভীর বিস্তৃত ছায়া দেয় যে ডালপালাগুলি তারাই এখন স্নেহের আড়াল ছড়িয়ে ঝড়বৃষ্টির দাপট থেকে বাঁচালো।

রঘুনাথ ডাক দিল—ঈশ্বর, ঈশ্বর—

রোগামত একজন লোক জলের কিনারা থেকে উঠে এল—
এই যে আমি—

—এই পোটলা দুইটা ধর—লোকটির হাতে কাপড়ের পুটুলি দুটি দিয়ে ভারতকে লক্ষ্য করে বললো রঘুনাথ—সাবধানে নৌকায় উঠেন কর্তা—

আর কোন কথা না বলে সেই লোকটির হাত ধরে পা টিপে টিপে জলের কিনারায় নেমে নৌকায় উঠল ভারত। বটগাছের একটা শেকড়ের সঙ্গে বাঁধা মাঝারি আকারের একটি খোলা নৌকা।

এক চমক বিস্ময়ের আলোয় দেখতে পেল, নৌকার মাঝিটি রোগা বটে, কিন্তু দ্বর্ধন নয়। কালো রঙ-পাতলা পাকানো শরীর, মধ্য বয়সী মানুষ। চোখ মুখের চেহারা স্পষ্ট দেখা না গেলেও মনে হল, লোকটি সহজ, সরল, বিশ্বাসী।

রঘুও পেছন পেছন নামতে বাবে এমন সময় কে যেন হাঁক দিল—কারা ওখানে দাঁড়াও।

রাত দুপুরের পর খেয়াঘাটের কাছে পাহারা থাকে। প্রহরে প্রহরে কোতোয়ালীর চৌকিদার হাঁক দিয়ে যায়। কিন্তু এই ঝড়বৃষ্টির জন্তু সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার কথা।

হাঁক শুনে ভয় পেল মাঝি, বললো—তাড়াহাড়ি নামুন কর্তা—

রঘু কিন্তু নামল না। খুব চেনা গলার আওয়াজ শুনে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। মুহূর্তে তার মাথার বেন আগুন জলে উঠল। বজ্রমটা তুলে এগিয়ে গেল কয়েক পা। বটগাছের ডালপালার অন্ধকার ছেড়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। আবার বিস্ময়। সামনের মানুষটাকে এবার স্পষ্ট দেখা দেখা গেল। ছুটেতে ছুটেতে আসছে লোকটা। কিছু পেছনে আরেকজন। সামনে এসে আবার হুঙ্কার দিল লোকটি—কিরে শালা, কোথায় পালাচ্ছিস—বলেই মস্ত লাঠি তুলে মারল দুহাতে। মাথা বাঁচাবার ঈচ্ছা একটু নিচু হয়ে লাঠি খেলার কায়দায় পাশ কাটাতে চেষ্টা করল রঘু। পারল না। জল কান্নার পা পিছলে মাটিতে বসে পড়ল। ফলে আঘাতটা তেমন জোর হ'ল না বটে, কিন্তু মাথার মধ্যে এক পলক স্মিরস্মির করে উঠল। পাগড়িটাও কাঁধের উপর এলিয়ে পড়ল। পাগড়ির জন্তাই বাঁচল মাথাটা। চোখে মুখে বৃষ্টির হাঁট লাগছে ঠিক তীরের মত। আবার এক ঝলক বিস্ময়ের আলো। পেছনের ছায়ামূর্তিটা হাত পঞ্চাশেক দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সামনের লোকটা আরো এক পা এগিয়ে এসে আবার লাঠি তুলল। মহিষাহরের মতো হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসেই দাঁতে দাঁত চেপে দু'হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে লোকটার বুকের মধ্যে বজ্রমের চণ্ডা ফলাটা ঢুকিয়ে দিল রঘুনাথ। মুহূর্তে এফোড় ওফোড় হয়ে গেল। তীব্রভাবে আকাশ চিরে বিস্ময় ঝলসে উঠল। তত্ত্ব রক্তের ধারা ছুটে এসে লাগল রঘুর হাতে মুখে।

—বাপ্‌রে-এ-এ—একটা টানা চীৎকার করে জলকান্নার মধ্যে দুটিয়ে পড়ল মানুষটা।

দ্বন্দ্ব মেষগর্জনের মধ্যে আর্ভনাদের রেশটা চাপা পড়ে গেল। জল কাদা রক্ত মেখে মাতালের মত টলুতে টলুতে ছুটতে ছুটতে এসে নৌকোর উঠল রঘু।

পরক্ষণেই বাঁধন খুলে দিল মাঝি। একটা পাক খেয়ে তীব্র শ্রোতের মুখে তীরের মতো ছুটল নৌকোটা। কোন রকমে হাল ধরে থাকল মাঝি। একটু একটু করে মুখ ঘুরিয়ে কোণাকুণি নদী পার হবার চেষ্টা করতে লাগল।

ভারত জিহ্মেস করল—কি রে কি হুঁল, কে চাঁচাল?

দম নিতে নিতে জবাব দিল রঘুনাথ—শেষ কইরে দেলাম।

—সে কি, কাকে শেষ করলি?

—সেই শালা কালাচাঁদকে—

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসে থেকে শুধু বলতে পারল ভারত—
ছিঃ ছিঃ তুই মানুষ খুন করলি—

—কি করতাম ক'ন আপনি, আমায়েই শেষ করতি চাইছিল বলতে বলতে দুইহাতের আঙ্গলার নদীর জল তুলে মাথায় মুখে দিল রঘুনাথ। হাতের রক্ত ধুয়ে কেনে একখানি বৈঠা তুলে নিল। আর কোন কথা বললো না ভারত, বলতে পারলো না।

শ্রোতের সঙ্গে ভেসে ভেসে কোনাকুণিভাবে নদী পার হতে সময় লাগল প্রায় তিন দণ্ড।

রাত তখন তিন প্রহর। এলোমেলো হাওয়ার ভাবটা থাকলেও বৃষ্টি ধরে এল।

অনেক কস-ভের পর একটা বাদাম গাছের নিচে নৌকো ভেড়ান গেল।

ভারত বললো—সাবাস, মাঝি ভাই, অনেক করলে তুমি কি নাম তোমার—

হাত জোড় করে জবাব দিল মাঝি—আজ্ঞে আমার নাম ঈশ্বর, খেয়াঘাটের পাটনী মাঝিগো আমি—চাঁদর কড়ুয়ার ভেতর থেকে উপবীত বের করে আশীর্বাদের মতো—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক, তোমার নাম সার্থক হোক, আমি নিঃশ-

ব্রাহ্মণ, তোমাকে দেবার মতো কিছু নেই আমার, অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করছি, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক তোমার—ঈশ্বর মাঝি মাথা নিচু করে নমস্কার দিয়ে বললো—আমি তো কষ্ট করেই গেলাম গো বাবাঠাকুর এখন আশীর্বাদ করুক আমার ছেলেপুলেরা যেন দুখেভাতে থাকে—

সহজ সরল এক পাটনী মাঝির অন্তরের এই সাধারণ প্রার্থনার কথা শুনে আনন্দে বিশ্বাসে নির্বাক হয়ে রইল ভারত। ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য, খ্যাতি, ক্ষমতা—কোন কিছুর জন্ত কোন কামনা নেই, কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। নিজের জন্ত কোন প্রার্থনা নয়। শুধু আপন সন্তানগণ যেন দুখেভাতে থাকতে পারে। যেন অথৈ থাকার অযোগ্য পায়। যেন সামান্ততম স্বচ্ছন্দে থাকার অধিকার লাভ করে।

দেশব্যাপী অনাচার, অত্যাচার, অবিচার আর অরাজকতার মধ্যে অসহায় সাধারণ মানুষের একান্ত প্রার্থনার কথা যেন ঈশ্বর মাঝির মুখে শুনতে পেল ভারত।

এতকাল শহরে বন্দরে, তুরন্তটে, বর্ধমানে, রাজসভায়, লেরেস্তায়, কয়েদখানায় শুধু অজ্ঞার লোভ আর অন্ধ স্বার্থ বুদ্ধির কুটিল চেহারা দেখেছে সে। পরনিন্দা, পরচর্চা, গোপন হিংসা আর বিবেকের কথা শুনেছে। কিন্তু সাধারণ কোন দরিদ্র মানুষের এমন আশ্চর্য আন্তরিক প্রার্থনার কথা সে কোন দিন শোনেনি, শোনার অযোগ্য পায়নি।

ততক্ষণে চক্‌মকি হুঁকে হুঁকে ছোট্ট একটা মোমবাতি জালিয়েছে রঘুনাথ।

একটা ভাঙা ডালের উপর মোমবাতিটা বসিয়ে ভেজা চাঁদর নিঙড়ে গা-মাথা মুছে নিয়েছে।

তারপর কোমরের গাঁজে থেকে কয়েকটা রূপোর সিক্কা টাকা বের করে মাঝির হাতে দিল।

আরেকবার নমস্কার করে নৌকায় উঠল ঈশ্বর পাটনী। সাবধানে কিনারা ঘেষে উজান বেয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বুটি ধেনে গেছে অনেকক্ষণ। মেঘের কঁাকে একখানি ভাঙা
চাঁদ রাত শেষ হবার আর বেশি দেয় নেই। দু'জনেই ভেজা
চাপর-খুতি-ফতুয়া নিঙড়ে গা-মাথা মুছে যতটা সম্ভব শুকনো
হয়ে নিল।

রঘু জিজ্ঞেস করল—এবারে কোন্ দিকি যা'তি চান, কর্তা—
একটু ভেবে জবাব দিল ভারত—যাব শ্রীক্ষেত্র, পুরীধামে,
সমুদ্রে স্নান করে জগন্নাথ দেবের পাদপদ্মে তোর পাপ, আমার
পাপ সব সমর্পণ করে আসব—একটু ধেমো আবার বললো—
—আসবো আর বলি কি করে, বাংলাদেশে আর ফিরতে
পারবো কিনা, কে জানে, তোকে বলছি রঘু, তুই ভুলেগুট ফিরে
যা, আমার জন্ত যথেষ্ট করেছিস তুই, এবার তোকে মুক্তি
দিলাম—খানিকক্ষণ ছোট কর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেক
স্বপ্নর করে কেঁদে কেঁদে রঘুনাথ।

—আরে ধাম্ ধাম্ কঁাদছিস কেন, কঁাদিস নি, আচ্ছা চল
আমার সঙ্গে, যা থাকে কপালে—
ছোটকর্তার কথা শুনে চোখ মুছতে মুছতে আবার
পোটুগাপুটলি গুছিয়ে নিল।

এবার আগে ভারতচন্দ্র, পেছন পেছন রঘুনাথ।

যেতে যেতে বললো ভারত—চগ যে পথে মহাপ্রভু
গিয়েছিলেন আর বিরে আসেন নি, খুঁজে খুঁজে দেখি সে
পথের হদিশ পাই কি না—

তখন অন্ধকার আবছা হয়ে আসছিল। পূর্ব আকাশে মেঘমান
দিগন্ত রেখা একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছিল।

(ক্রমশঃ)

অনিমল নান্দেন

সমরোপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩.৫০ টাকা।

“...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য
পরিষ্কার করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বগ্রাসী। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স
যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ
করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।”
... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১.২৫

“...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ
করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ
নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে,
ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে
অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের
সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া ‘নান্দ পন্থা বিজ্ঞতে
অয়নায়।’ (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে
এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী—৩০৯, গাজুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

* * *

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

* * *

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY — 1



ম হী তো য বি খা স

২০

চৈত্রে খর খর। বৈশাখে ঝড় পাধর। জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে। তবে জানবে বর্ষা বটে। লক্ষণগুলো যেন বড়ো মিলে যেতে লাগল এবার। সারা বোশেখ মাসটা ঝড়-পাধরেই কাটল। বিষ্টি-বাদলও কম হল না। বোশেখ মাস শেষ হতেই কাঠুখালির বিলের আউশ আমন ছোটোরই চষা বোনা হয়ে গেল। জ্যৈষ্ঠ মাস পড়ার সাথে সাথেই আকাশটা যেন শুকিয়ে গেল। উপরি জলের অভাবে ধানের পাতাগুলো লালচে হয়ে উঠতে লাগল। তবে মাটিতে ‘জো’ বেশ ছিল। তাতেই পাট আর ধানচারাগুলো বেড়ে উঠতে লাগল। আউশ ধান প্রায়ই নীচের দিকে। নীচের দিকে সব জলা জমি। আষাঢ় মাসেই আউশ ধানফলে পেকে উঠবে। তাই আউশ ধানের জন্ম সব সময়ে জলা জমিগুলোই ভালো।

কাঠুখালির বিলে এখন নিড়ান বাছাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। গাভায় গাভায় সকলে বসে গেছে এক এক ক্ষেতে। এবার এখনো বিষ্টি-বাদলা কম। জলকাদাও তাই কম ভাঙতে হচ্ছে।

বলরামদের পাড়ার সকলে মিলে গাভা বেঁধেছে। দলটা বেশ বড়ো হয়েছে। আজ কাজ ছিল কেঁচদের ক্ষেতে।

প্রাণ-ভান্ডা

সকালের দিকে। একটু একটু ঘেঘ হয়েছে আকাশে। জোর কদমে কাজ এগিয়ে চলেছে। বংশী কাজ করছে আর সেই সঙ্গে গলা চড়িয়ে বারমাসে গান ধরেছে।

নিদীর পারে তাঁটির বাক

কোণা-ঘেঘার চর,

বন্ধুরে, সেখান ক্যানো বাঁধলি দোশর ঘর।’

গাইতে গাইতে বংশী হঠাৎ গান থামাল। দেখে খানিকটে দূরে কেঁচ আর মাধাই কাজ করছে। আর গুজ্জ ক’রে কথা বলছে। ভজহরি এখন আর কাজে আসে না। মাধাই একাই গাভায় চুকেছে।

গান থামিয়ে বংশী বললো—“ওরে ও মাধাই, ব্যাপারখান কি ক’ দেখি। শালা-বোনাই মিলে কি এতো ফুফুর-ফুফুর করিসু?”

মাধাই লজ্জা পায়। আমতা আমতা করে বলে—“কি যে ভুমি কও বোশেখা, ক’নে কি তার ঠিক নেই—”

বংশী ধমক দেয়—“নে, নে, থাম। ভাজা মাছটা উণ্টোয়ে খাতি জানিসনে! তা আমাগের কোঁসু না কোঁসু নেমন্তনডা ব্যানো বাদ না পড়ে।”

কথাটা অবশ্য নতুন নয়। বেশ কিছুদিন থেকেই আলোচনা চলছে। কেঁচর বোনটিকে মাধাইয়ের বড়ো

পছন্দ। ছুপক্ষের সকলেরই মত আছে। শুধু কেউ নাকি একটু গাঁই-গুঁই করছে। মাথাইও সব সময়েই কেউ মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করে।

বংশী এবার কেউ তার দিকে তাকিয়ে বলে—“তা তোরই বোধ ভাঙিডা ক্যামোন বুঝি না কেউ। ছ্যামড়া বিয়ে বিয়ে বলে পাগল হইছে, আর তুই কি না এ না তা—সাত-বায়না কা ছুড়ে দিছিল। নাগায় দে এটা কাজকম্মো। দুই দিন এটু ফুজি-টুজি-মারি।”

খানিকদূরে দেখা গেল লাঠি ভর দিয়ে নকুল বুড়ো যাচ্ছে। হাজরা, পূজোর দিন পড়ে গিয়ে নকুলের পা ভেঙে গিয়েছিল। জগা কবিরাজের জাব মেখে মেখে প্রায় সেরে গেছে। কাজ-কর্ম কিছু না করলেও চলে নকুলের। তিন-তিনটে জোয়ান ছেলে। সংসারের ভার এখন তাদেরই পারে।

নকুলকে দেখে বলরাম ডাক দিল—“ও বলাই কাকা, আসবা না এদিগি?”

বলরামের ডাক শুনে টুকটুক করে নকুল এগিয়ে এলো। ওদের পাশে এসে নিড়ানো দিকটায় বসল। বলরাম কাজ করতে করতে জিজ্ঞাসা করল—

—“ন’ড়ে চ’ড়ে ব্যাড়াতি পারতিছো এটু—”

নকুল কেমন বেন ঝিমিয়ে পড়েছে। ধর্মভীরু মানুষটা বুড়ো বা খেয়েছে ঐ দিনটার। ঝিমোনো গলায় জবাব দিল—“হাঁটে-হটে ব্যাড়াছি কোনো গতিকি এটু-আধটু—। ব’লে থাকতি থাকতি য্যানো আরো ঠ্যাং না’গে আসে।”

ও পাশ থেকে কেউ কথা বলে—“তা খুড়ো এবার বিষ্টির গতিকডা কি কও দেহি। জুটি মাসে এই র’ম খুরুণ হ’লি তো, ধানের দশা গয়া।”

নকুল আন্তে আন্তে মাথা নাড়ে। বলে—“কি জানি বাপু, আমিও তো ঠিক বুঝে উঠতি পারতিচি না। এ-সোমাড়ায় এমন হ’লি সোমোছোর দুঃখির আর পার থাকবে

না। বাবা বুড়ো শিব নলাটে এবার কি নেইহে দেছে কেডা জানে।”

নকুল আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠল। সকালবেলায় একটুখানি মেঘ দেখা দিয়েছিল আকাশে। বেলা একটু বাড়তেই তা কোথায় হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেছে। আন্তে আন্তে মাটি বাতাস তেতে উঠছে। নকুল হাঁটতে হাঁটতে বল্লো—“তা তোমরা মনে জাঁট-উঁট নিয়ে কাজ ক’রে যাও। দেয়া না দেয়া তেনার হাত। তোমাগের কাজের ঘাটতি হবে ক্যানো?”—একটু দম নিয়ে বললো—“আমি যাই তা’লি এবার। রোদ্দুর ডা বেজায় নাগতিছে মাথায়।”

লাঠিটা টুকটুক করে নকুল গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চললো।

নকুল চলে যেতেই আবার আগের আলোচনাটা ফিরে এলো। কিন্তু আর তেমন জমল না। গুমোট গরমে চারিদিকের বাতাস আন্তে আন্তে ভারী হয়ে উঠছে। সকলেরই মাথায় একটা করে টোকা। টোকার নীচে মুখ কপাল যেমে দরদর ক’রে ঘাম নামছে। বা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘামের ধারা গুলো মুছতে মুছতে সকলে আকাশের দিকে তাকায় আর ভাবে—এটু বিষ্টি হওয়া দরকার।

দেখতে দেখতে জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হয়ে এলো। জ্যৈষ্ঠের শেষের দিকে বেশ কয়েক পশলা বিষ্টি হলো। কিন্তু আষাঢ় মাস পড়তেই আবার শুকো শুরু হল। মাকে মধ্যে আকাশের কোণ কালো ক’রে এক আশখানা মেঘ ওঠে। সকলে হা-পিত্যে তাকিয়ে থাকে। এই বুঝি নামলো। ধারায় ধারায় এইবার বেধহয় শুকনো ধানগাছগুলো সতেজ হ’য়ে উঠবে। কিন্তু কোথায় কি। এককোটা বিষ্টির নাম-গন্ধ নেই। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি এসে থেকে থেকে দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু করল। কাঠখালির বিলের মাঝমগুলো এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। মুখ শুকিয়ে গেছে সকলেরই। ভরা আষাঢ়ে দক্ষিণা বাতাস সর্বনাশ ডেকে

আনে। এই যে শুকো শুকো আকাশ আর দক্ষিণে বাতাস,
—মা বহুমতীর বুকে এরা যে ভরাডুবির পূর্ব লক্ষণ।

খাল-কান্দার জলা-জমি গুলোতে প্রায় সবই আউশ ধান।
এ-জমিগুলো নীচের দিকে। তাই এখানকার মাটিতে কম-
বেশী সবসময়েই জো-জুং থাকে। তার উপর জ্যৈষ্ঠের
শেষের দিকে বা একটু-আধটু বর্ষণ হ'ল, তাতেই এখানকার
আউশ ধানগুলো ডাগর হয়ে উঠল। আষাঢ় মাসের
মাঝামাঝি থেকেই আউশ ধানে খোড় দেখা দিল।
কাঠুখালির বিলের অনেকের ঘরেই খাবার ধান ফুরিয়ে
এসেছে। আর বলতে গেলে ধানের উপরেই তো প্রায় সব।
পাট-বেচা পয়সা গুলো গরম গরমই খরচ হয়ে যায়।
তারপর বাজার-বাট, নউতো-কুটুখিতে—প্রায় সব খরচই
উঠাতে হয় ধানের উপর দিয়ে। মাংসা ছুটো পয়সা কোনো
দিক দিয়ে আসার উপায় নেই। কতোদিন আর চল।
আউশ ধানে খোড় দেখা দিতেই তাই লকলের মনে যেন একটু
ভরসা এলো। ভালোভাবে আউশ ধানটা ঘরে তুলতে
পারলে কিছুদিনের মতন অন্ততঃ ঠ্যাকান দেওয়া যাবে।

আষাঢ় মাসের শেষাংশে আসতেই আকাশটা কালো
হ'য়ে উঠল। দলা-পাকানো এঁঠেল মাটির মতন মেঘ জমল
আকাশে। নামি-নামি ক'রেও বর্ষাটা যেন এতোদিন নামতে
পারছিল না। লাজুক ছেউটির মতন মুখখানা ঢেকে ছিল।
এতোদিনে যেন লজ্জা ভাঙল। কালো মেঘের এলোচুল
ছড়িয়ে দিয়ে সারা আকাশটাকে মাতিয়ে তুলল। বিষ্টির
ছোঁয়া পেয়ে নেতিয়ে পড়া পাটের ডগাগুলো লকলক ক'রে
উঠল। আমন ধানের তেজালো পাতায় লম্বা ডানা মেলে
কর—র ক'রে উড়ে যেতে লাগল সবুজ রঙের ফড়িংগুলো।
আর খাল কান্দার গভিরা আউশ ধানের গাছগুলো বিষ্টির
জল ধেয়ে আরো কোমর ফোলাতে লাগল।

দুপুর বেলায় বিষ্টিটা একটু ধরল। কিন্তু বিকেল হতেই
আবার পড়া শুরু করল। পদ্ম এক ধামা ধান নিয়ে ঢুকল

ঢেকিঘরে। ধান যা আছে, তাতে আর কয়েকদিনের খরচ
চলবে। আউশ ধান উঠতে দেয়ী হ'লে কিছু কর্তপাতি
ক'রতে হবে।

ধান ভানতে ভানতে পদ্মর শরীরটা কেমন শিরশির ক'রে
উঠল। পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠে খানিকটে নোনতা জল
উঠে এলো মুখে। ছুটে গিয়ে ঢেকিঘরের বেড়ার ও-পাশটায়
ব'লে পড়ল। তারপরেই হড়াং হড়াং ক'রে বমি করল
খানিকটে। বমি করে শরীরটা একটু স্বস্থ বোধ হল। কিন্তু
হাত পা গুলো যেন অবশ হয়ে আসছে। বুকের মধ্যে ধড়ফড়
করছে। ধানের ধামাটা ঢেকে রেখে পদ্ম ঘরে গিয়ে শুয়ে
পড়ল। পদ্মর মা বারান্দায় বসেছিল। পদ্মকে ঘরে গিয়ে
শুয়ে পড়তে দেখে অবাক হল। গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা
করল—“কি হ'লো তোর? টানা-ভরা দিয়ে শুলি ক্যান
বাইয়ে আবার?”

পদ্ম কোনো জবাব দিলনা। চোখ বুজে পড়ে রইল।
পদ্মর মা উঠে গিয়ে মেয়ের পাশে বসল। আন্তে আন্তে হাত
রাখল মাথার উপরে। একটুখানি নাড়া দিয়ে বলল—
“পদ্ম, ও পদ্ম, কি হ'লো তোর?”

পদ্ম চোখ খুলল। সমস্ত শরীর অবসন্ন লাগছে। ক্লান্ত
চোখে—মার মুখের দিকে ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে থাকল।
চোখের কোণ দিয়ে দু'ফোটা জল পড়িয়ে পড়ল। ছোট্ট
একটা মেয়ের মতন পদ্ম তাড়াতাড়ি মুখ লুকালো মার
কোলের মধ্যে।

পদ্মর মা চুপচাপ বসে থাকল মেয়ের মাথাটা কোলে
নিয়ে। হতভাগিনী মেয়েটার লজ্জা মনটা হুখে ভরে উঠল।
এতো ঠালাগতো করে বিয়ে হল। বিয়ের স্বপ্ন তো বড়ো
ছুটল মেয়ের কপালে। কপাল পুড়িয়ে স্বপ্নবাত্তী থেকে
ফিরে আসবার পর থেকেই এ-সংসারে সব কাজ যাড়ে
চেপেছে। খাও-না-খাও সংসারের ঘানি টানতেই হবে।
মাথাইয়ের সাথে নিত্য ষিটিমিটি বাধে। আজকে সকালেও

মাধাই বা না-তাই বলেছে খানিকটে। রোগে ভুগে-ভুগে তার নিজেরও মন-মেজাজটা তিরিক্ত হয়ে গেছে। সময়ে সময়ে নিজেরও কি কম বকাঝকা করে মেয়েটাকে।

ভাবতে ভাবতে পদ্মর মার চোখ-জুটো ঝাপসা হয়ে এলো। হঠাৎ বইরে থেকে মাধাইয়ের গলা শোনা গেল—“দিদি,—ও দিদি, গেলি কনে তোরা সব—”

খড়মড় করে উঠে বসল পদ্ম। তাড়াতাড়ি ছুটে বাইরে এলো।

মাধাই মাধার থেকে ভালপাতার জোড়ড়াটা ঘরের কোণায় নামিয়ে রাখল। এখন আর বিষ্টি পড়ছে না। মাধাইয়ের হাতে একটা মাটির হাঁড়ি। হাঁড়িটা পদ্মর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—“মাছগুলো জিয়ে রাখ, দিদি। কেষ্টদাংগে বাড়ী গিলাম। আসার পথে ওদের কুঁয়োর পাড়ে তাগায়ে দেহি, বিষ্টির ধারানি দিয়ে কবিরাজ মশাররা কানে হাঁটে চলিছেন। তাড়াতাড়ি এটা হাঁড়ি চাইয়ে আঁনে সব কয়ডারে ধরে ফেলিছি।”

পদ্ম হাঁড়িটা নিলো মাধাইয়ের হাত থেকে। দেখে, লতাই অনেকগুলো বড়ো বড়ো কইমাছ হাঁড়ির মধ্যে মড়ছে। পদ্ম বুঝল, মাধাই কেষ্টদের বাড়ী গিয়েছিল। আজকাল প্রায় সময়ে তো ওখানেই পড়ে থাকে। আজকে বোধহয় কিছু একটা ঘটেছে। মেজাজটাও তাই ভালো আছে একটু। মুখের কথাবার্তাগুলো একটু মোলায়েম লাগছে।

পদ্ম মাছগুলো জিইয়ে রাখতে রাখতে বলল—“কেষ্টদের কুঁয়োর এতোগুলো মাছ ধরে আনলি, তা ওদের কয়ডা দিয়ে আলি না ক্যান?”

মাধাই একটুখানি হেসে বলল—“দিত্তি তো গিলাম। তা কেষ্টদাংগে নিতি চাইলো না যে! কলো যে, এই কয়ডা মাছ, এর আর দেবা কি? তুমি ধরিসো, তুমি নিয়ে যাও।”

মাধাইকে হাসতে দেখে পদ্মও একটু হাসে। বলে—

“তা কেষ্টর কাছে দিত্তি গেলি ক্যানো? পারুল বাড়ী ছেলো না? পারুলির কাছে দিয়ে আলি তো পারতিস্।”

পারুল কেষ্টর বোন। পারুলকে বিয়ে করার জন্তেই মাধাইয়ের মনটা উচাটন হয়েছে। পারুলের নাম করতে মাধাই তাই যেন একটু লজ্জা পেলো।

একটু পরে পদ্ম জিজ্ঞাসা করল—“কেষ্টদের বাড়ী যাস্তো এ্যাতো। তা কেষ্ট আর কিছু কয় টয়?”

মাধাই চারিদিক একটু দেখে দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—“বাবা বাড়ী আছে নাকি?”

পদ্ম বলে—“না, ক্যান?”

মাধাই চাটাই টেনে নিয়ে ভালো করে বসে। তারপর গলাটা একটু নীচু করে বলে—“কেষ্টদাংগ বাবা তো রাজী হয়ে আছে। কেষ্টদাংগে যে রাজী হতি চায় না। তা আজকে ছাখলাম মনটা এটু নরম হইছে। বাবা যদি আরেটু কওয়া-বোলা করতো তালি বোধায় ওগের সগোলের মত হয়ে যাতো।”

পদ্ম বলে—“তা বাবা বাড়ী আসক আজকে। বাবারে আমি কবানি সব।”

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মাধাই বলে—“কেষ্টদাংগ কি জানিস দিদি? কয় যে, তোমাংগের জমি-বাতি কম, এতোগুলো মাছ তোমরা, চালাবা কি ভাবে?” তা আমি কলাম, “ক্যানো,—কি এতো অচল সোংসার দেখলে আমাংগের? আমাংগেরই তো কয় বিঘে জমি রইছে। তার উপরে দিদির নামে পাঁচ বিঘে জমি রইছে। দিদির জমি তো আমারই জমি। কমডা দেখলে কিসি তুমি আমাংগের?” এ সব শুনে টুনে ছাখলাম এটু য্যানো মত হইছে। আসার সোমায় ক’রে দেলো, বাবারে একবার পাঠিয়ে দিত্তি। পারুল বাবাও তাই ক’রে দেলো।

পদ্ম কথাগুলো শুনলো চুপ করে। মাধাইয়ের প্রশ্ন মেজাজ আর মোলায়েম কথাবার্তার কারণটা এবারে বুঝতে

পারল। দিদির যে পাঁচ বিঘে জমি আছে, আর সে জমিটুকুর মূল্য যে অনেক, একথা এতোদিনে যেন বুঝতে পেরেছে মাধাই। দরকারে প'ড়ে ভাবী-কুটুমের বাড়ী তা ফলাও ক'রে বলেও এসেছে। মনের মধ্যে খানিকটে রাগ আর ঘেন্না বেন দলা পাকিয়ে উঠতে লাগল পদ্মর। মাধাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি বাধিয়ে খানিকটে ভুলকালাম-করতে ইচ্ছে করল। কিন্তু কিছুই করল না পদ্ম। শান্তমুখে হেসে জবাব দিল—“তা ভালো কথাই কইরে আইছিল। মান্বির কাছে ছোটো হত্তি বাবি ক্যান? আর আমার নামের ঐ ফোঁটাখানেক জমি—সে আমার নামেও যা, তোর নামেও তাই। আগি আর কয়ডা দিন ক'। ভোগের 'টু হুখ-আহ্লাদ দেখলি আমার মনডাও ভালো লাগবে। যে কয়ডা দিন বাচি দুইবেলা দুই মুঠ দিল আমারে। তাতেই আমার চলে যাবে।”

বল'তে বল'তে পদ্মর গলাটা ধ'রে এলো।

২১

আবশ্য মাসের গোড়াতে কয়েকটা দিন বেশ ঝকঝকে গেল আকাশটা। একদিন বিষ্টিতে ভিজে ভিজে জগৎ-সংসারটা কেমন যেন এলিয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিল। কড়া রোদুর পেয়ে চিক্‌চিক্‌ করে উঠল আবার চারিদিক। পাটের জমিতে লম্বা লম্বা পাটের ডগাগুলো মাথা ছাড়িয়ে গেছে। সাঁই সাঁই করে বেড়ে উঠছে আমন ধানের গাছ। একেবারে নীচের দিকের ক্ষেতে আউশ ধান পেকে উঠেছে। জলের মধ্যে আধ-ডোবা শরীর ভাসিয়ে ধানের গাছ গুলো দাঁড়িয়ে আছে। বাইলের ভারে কোথাও বা একটু ঝুঁকে গেছে শরীরটা। কঁাকে-কঁাকে বাবুই পাণী পাকা ধানের লোভে এক ক্ষেত থেকে আর এক ক্ষেতে উড়ে পড়ছে। আর আর কয়েক দিনের মধ্যেই পুরোপুরি ভাবে আউশ ধান কাটার কাজ শুরু হয়ে যাবে। কারো কারো ঘরে খাবার

ধান ফুরিয়ে গেছে। তারা এর-মধ্যেই দু'এক ঝাঁটি ক'রে কাটিতে শুরু ক'রে দিয়েছে। একটু উপরের দিকের ক্ষেতেও আউশ ধান পাকো-পাকো হ'য়ে উঠেছে।

এর মধ্যে হঠাৎ নামল বিষ্টিটা। প্রথমে চাপ চাপ মেঘ জমল আকাশে। মেঘের পরে মেঘ। এতোবড়ো আকাশটা ছাপিয়ে যেন উপচে পড়তে লাগল। মেঘ জ'মে জ'মে মনে হ'তে লাগল আকাশটা যেন অনেকখানি নীচে নেমে এসেছে। একটা গোটা রাত আর দিন থাকল এইভাবে। মাঝে মাঝে শৌ শৌ ক'রে দমকা হাওয়া। সেই ভিজে-ভিজে দমকা হাওয়ার যেন শরীর মনে কাঁপন ধরিয়ে দিল। খানিক রাত্তিরে হাওয়া প'ড়ে এলো। আর শুরু হ'ল অঝোরে বর্ষণ। বড়ো বড়ো বিষ্টির ফোঁটাগুলো নিঃসাড় নেমে আগতে লাগল মাটির বুকে। তরল মেহের সঙ্গে দেহ মিলিয়ে উজিয়ে চলল মাটির উপর দিয়ে। আর থেকে থেকে আকাশে ডম্-ডম্ ডম্-ডম্ ক'রে আওয়াজ।

সারা রাত এইভাবে কাটল। তারপরের দিনটাও শেষ হয়ে এলো। ডোবো-ডোবো বেলায় একটুখানি ধরল বিষ্টিটা। কিন্তু সন্ধ্যা গড়াতেই ঝিরঝির ক'রে আবার নামলো। রাতও বাড়ি। বিষ্টির বেগও যেন বাড়তে থাকে। অবিশ্রান্ত অবিরল ধারায়। আন্তে আন্তে রাত পোহালো। সকালে আকাশটা একেবারে হালকা হ'য়ে গেল। পূব-আকাশের ধোরা-মোছা উঠোন দিয়ে সূর্য উঠল। কদিনের লম্বা একটা ডুব দিয়ে উঠে সূর্যটা আজ বড়ো কড়া রোদুর ছাড়াল।

কান-মুখ-হেঁড়া বিষ্টির মধ্যে কাঠখালির মামুষগুলো এ-দিন কোনোমতে ঘরের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে প'ড়ে ছিল। বিষ্টিটা থামতেই সব পিল পিল ক'রে বেরিয়ে পড়ল। ছুটে গেল ক্ষেতের দিকে। কিন্তু কোথায় ক্ষেত। সব একাকার নীচের দিকের সব আউশ ধানের ক্ষেতগুলো ডুবে গেছে। পাকা আধ-পাকা ধান-গাছ গুলো এখন একমামুষ-সমান

জলের নীচে। ঝিরঝিরে বাতাসে থই থই করছে বিষ্টিজমা খলবলে রাঙ্গুলী হল। সেই রাশিকৃত জলের দিকে তাকিয়ে বুক শুকিয়ে গেল সকলের। হাঁটু ভেঙে ঝলকাদার উপরে লুটিয়ে পড়ল কাঠুখালির চাষীমামুষগুলো আর ওদিকে কোক ছেড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল কাঠুখালির বিলের ঘরে ঘরে চাষী বউ আর মেয়েগুলো।—ভগমান, মুখের গেরাস তুমি এমনি ভাবেই ছিনিয়ে নিলে।

বলরাম নিশ্চুপ হ'য়ে ব'সে থাকল না। যা হবার তা তো হ'য়ে গেছে। এখন যতটুকু পারা যায় বাঁচাতে হবে। গোটা বর্ষাকালটার খরচ নির্ভর করছে এই ধানগুলোর উপরে। উপরের দিকের ক্ষেতেও কিছু আউশ ধান আছে। কিন্তু সে তো ছিঁটে-ফাঁটা। ক'দিনই বা তাতে চলবে। একটু বেলা বাড়তেই বলরাম কান্ডে আর বড়ো একটা কলসী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ডোঙা বেয়ে চলে এলো একেবারে নীচের বড়ো ক্ষেতখানায়। লগি পুতে ডোঙাটা দাঁড় করাল। তারপর কলসী আর কান্ডেটা নিয়ে ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। পায়ের তলায় খচ্-খচ্ করে উঠল রা'তল ধানের লম্বা-লম্বা শীষ। বৃকের মধ্যে যেন উৎসে উঠল বলরামের। আর কটা দিন। কটা দিন গেলেই বলরাম ছ'হাতে পাঁজা পাঁজা করে বৃকে জড়িয়ে এদের ঘরে তুলে নিতে পারত।

কলসীটাকে ভাঁগিয়ে দিয়ে বলরাম কান্ডে হাতে ডুব দিল। গোড়া ঘেষে যতগুলো পারল বাইলেরা ডগা কাটল। নিখাস ফুরিয়ে যেতেই কলসীটা ধরে ভেসে উঠল। কাটা বাইলগুলো গাদা করে রাখল ডোঙার উপরে। এমনি করে একবার ডোবা। একবার ভাসা। বেশী পরিশ্রম হ'য়ে গেলে কলসী ধরে একটুখানি বিশ্রাম।

আস্তে আস্তে দেখা গেল এদিকে ওদিকে সব ক্ষেতেই এক একটা কলসী নিয়ে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ডুবুরীর মতন ডুব দিয়ে যে যা পারছে তুলে আনছে। ছই পহর

বেলা পর্যন্ত কাজ চলল। জলের নীচে ডুবে ডুবে কতোক্ষণই বা এ ভাবে কাজ করা যায়। কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না। খেয়ে দেয়ে দুপুর গড়াতেই আবার চলে আসতে হবে। ছই মুঠো বা তোলা যায়, অভাবের মুখে তাই-ই এখন লাভ।

ফেরার পথে বলরামের দেখা হল কেঁটার বাবা উমাচরণের সঙ্গে। বুড়ো মামুষ। কিন্তু এখন আর বুড়ো গুঁড়োর ভেদ নেই। ছেলের সাথে উমাচরণ নিজেও জলে নেমেছিল কান্ডে হাতে। কিন্তু বেশীক্ষণ পারল না। একটুতেই ভিজে একেবারে কাণিয়ে উঠেছে। জল থেকে উঠে পড়েছে। আল পথ ধরে উমাচরণ একটু আগে আগে যাচ্ছিল। বলরাম পিছন থেকে ডাক দিল—“জামাই যাচ্ছে। নাকি? দাঁড়াও এটু। আম্মো আস্তিছি।”

গ্রাম-স্ববাদে কেঁটার বাবা হল বলরামের পিসে। পিসে ডাকার চল নেই। পিসেকে ডাকতে হয় জামাই বলে। বলরামের ডাক শুনে উমাচরণ দাঁড়াল। শীতে উমাচরণের দাঁত ঠক্ঠক্ করছিল। বলরাম কাছে আসতে বলল—“এটু জোরায়ে চলো। বেলায় জাড় নাগুতিচো।”

বলরাম হাঁটতে হাঁটতে বলল—“তুমি চলে আলে, কেঁট আলো না।”

উমাচরণ জবাব দিল—“উহক, ও আর আসতি চালো না। আবারে ক'লো ভাত পাঠায়ো দিতি। ডোঙায় বসে থাকবেন। ধানের অবস্থাভা তো দেখলেই। কয়ডাই বা তোলা যাবেন। রাতারাতি পচে ওঠবেন সব।”—বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল উমাচরণের।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে বাড়ীর কাছে এসে গেল। উমাচরণ বলল—“যাও তুমি এবার বাড়ীর দিগি। তা আবার যাচ্ছে তো?”

বলরাম একটু ম্লান হেসে বলে—“না যাইয়ে উপায় আছে, কি কও জামাই।”

উমাচরণ মাথা হুলিয়ে বলে—“হয়, তা ঠিক কইছো।
না যাইরে উপায় আছে কি! প্যাটের পোড়া, বড়ো শক্ত
পোড়া।”

বলরাম বাড়ী আসতেই বাতাসী তাড়াতাড়ি খাওয়ার
ব্যবস্থা করল। মুখখানা ধম-ধম করছে। বলরামকে খেতে
দিয়ে চুপ করে একপাশে বসল। বলরামের খাওয়া প্রায়
শেষ হয়ে এলো। শুকনো মুখে সুবাসী জিজ্ঞাসা করল—
“হুই চার মুঠ কি তোলা যাবেন? না, সব গেছে?”

খালার বাকী তাওগুলো এলোমেলো ভাবে নাড়তে
নাড়তে বলরাম বলল—“কয়ডাই বা আর তুলতি পারবানি।
খালকান্দার ভুইখান নিয়ে বেশী বল ছেলো। তা সেই-
খানই বেশী ডুবিছে।”

বলরামের হতাশ মুখখানার দিকে তাকিয়ে একটা
দীর্ঘশ্বাস পড়ল সুবাসীর। এ-স্বপ্নের কথায় কি বলেই বা
সাহসনা দেবে সুবাসী। চোখে আঁচল চেপে তাড়াতাড়ি
করে সরে গেল বলরামের সামনে থেকে।

খেয়ে উঠে বলরাম কঙ্কর আগুন-তামাক দিয়ে টানতে
লাগল। বেশীক্ষণ বসে থাকলে চলবে না। তাড়াতাড়ি
আবার ক্ষেতে যেতে হবে। হকো টানতে-টানতেই বলরাম
তামাকের ডিবে আর আগুনের মালুসাটা সঙ্গে নেবার জঙ্ক
গোছাতে লাগল।

রান্নাঘরের কাজ শেষে সুবাসী কাছে এসে দাঁড়াল।
আন্তে আন্তে বলল “মাধাইগের বাড়ী গিলে নাকি?”

হকো থেকে মুখ না তুলেই বলরাম জিজ্ঞাসা করল—
“ক্যানো মাধাইগের বাড়ী যাতি হবে ক্যানো?”

সুবাসী একটু অবাক হয়ে বলল—“তুমি শোনোনি
কিছু?” সুবাসীর কথা বলার ধরণে বলরামও অবাক হল।
মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল—“না তো! হইছে কি?”

জড়ানো গলায় সুবাসী উত্তর দিল—“কাল রাত্তিরি
পদ্মদি গলায় দড়ি দেছে।”

—“কি ক’লে? - কি ক’লে কথাডা?”—প্রচণ্ড একটা
বিস্ময়ের ঝঙ্কার বলরাম সোজা হ’য়ে বসল।

সুবাসী আন্তে আন্তে বলল—“হয়, কালকে রাত্তিরি
পদ্মদি গলায় দড়ি দিয়ে মরিলে। সারারাত্তি বিষ্টি গেছে।
ব্যান-রাত্তিরি বিষ্টিডা এটু কমিল। সেই সোমায়ই মনে
কয় কাজডা করিলে। আমি আর দেখতি যাইনি।
শোনলাম ওগের ঘরের পাছে যে হিজেল গাছ, তারির ডালে
নাকি ঝুলোনি পাওয়া গেছে। কতো ব্যালা পজ্জন্ত সগোলে
তলাশ করিলে। ভাবিলে যে আছে কোনো জায়গায়।
খানিক ব্যালায় মাধাই আর ওর বাবা খ্যাতে যাচ্ছিলো।
মাধার মা কি ভাবে ঘরের পাছে দেখতি গিলে। আর
যাইয়েই তো যা জাখলো তা-তো জাখলো। মাধার মা
হাউমাউ করে উঠতিই তাড়াতাড়ি সগোলে দোড়োয়ে
আসলো। তা আ’লে আর করবে কি? শোনলাম, গরুর
দড়ি নাকি গলায় কা’টে ক’লে গেছে।”

বলতে বলতে সুবাসীর শরীরটা যেন শিউরে উঠলো।

ধম্‌মেরে শুনলো বলরাম সব কথাগুলো। তারপর
কলে-চালানো একটা স্বপ্নের মতন উঠে দাঁড়ালো। হকো
আর আগুনের মালুসাটাকে ঠেলে সরিয়ে রেখে বলল—
“ওগের বাড়ী ঝগড়-ঝাটি কিছু হইল নাকি জানো?”

সুবাসী বলল—“ঝগড়াঝাটির কথা তো তেমন
শোনলাম না কিছু। তা, মনে কয় মাধাই কিছু কইছে।
পদ্মদির সাথে তো মোটে বন্ডি চা’তো না। খ্যাটা-ম্যাটার
তালেই ছেলো।”

বলরাম আর কিছু বলল না। বাড়ীর থেকে বেরিয়ে
হন্-হন্ করে এগিয়ে চলল। পদ্মদের বাড়ী কাছে আসতেই
পদ্মর মার কান্না শুনতে পেল। পদ্মর নাম ধরে ডুকরে
ডুকরে কাঁদছে। বলরাম আন্তে আন্তে ওদের উঠানের এক
কোণে গিয়ে দাঁড়ালো। বারান্দার এক পাশে মাধাই আর
ওর বাবা বাড়ি ভেঁজে বসে আছে। পাড়ার কয়েকজন বুড়ো

মাতব্বর বসে বসে কথাবার্তা বলছে। সকলেরই মুখে দুশ্চিন্তা। আত্মহত্যার মৃত্যু। জানাজানি হ'লে খানা-পুলিশের কামেলা হতে পারে। তার চেয়ে সকলে মিলে যা হয় একটা কিছু ঠিক করে ফেলাই ভালো।

বলরাম ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। এদিক ওদিক তাকাতেই হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। ঢেঁকিঘরের চালটাটার ওপাশে পদ্মর মরা দেহটা পড়ে রয়েছে। মুখখানা এদিকে ফেরানো। একটা কাপড় দিয়ে শরীরটা ঢাকা। মাথার পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। একগাদা জলকাদা-মাখা চুল এলোমেলো ছড়ানো।

চোখদুটো বুজে এলো বলরামের। বুকের মধ্যে থেকে কি একটা যেন ঠেলে উপরের দিকে উঠে আসতে চাইছে। অসহ্য একটা অমুভূতিতে সারা শরীর থর-থর করে কেঁপে উঠল।

আর দাঁড়াতে পারল না বলরাম। পা দুটোকে কোনোমতে টানতে টানতে বেরিয়ে এলো ওখান থেকে। বাড়ী এসে চালের বাতা থেকে কাস্তেখানা নামাল। তারপর সোজা ক্ষেতে চলে এলো। ডোঙাটা বাইতে বাইতে নেমে এলো নীচের দিকে। ডুবের পরে ডুব দিয়ে খানের বাইল-গুলো কেটে ভুগতে লাগল। কিন্তু হাত পা যেন ক্রমেই অবশ হয়ে আসছে বলরামের। একটা ডুব দেয় আর মনে হয়, কোনোদিনই বোধহয় আর জলের উপর ভেসে উঠতে পা বে না; তলিয়ে যাচ্ছে যেন বলরাম অতল জলের তলায়।

শিথিল শরীরটা নিয়ে বলরাম উঠে পড়ল ডোঙার উপরে। লগি বেয়ে এলোমেলো এদিক ওদিক ঘুরল খানিকক্ষণ। কিন্তু গলা থেকে সেই আটকে-যাওয়া বস্ত্রগার তালটা যেন কিছুতেই নামছে না। চুপ করে বলরাম বসে থাকল ডোঙার মর্যে।

এক সময় ডোঙাটা বেয়ে উপরে উঠে এলো বলরাম। ঘুরে বেড়ালো খানিকক্ষণ। সামনেই একটা পাটক্ষেত। মাথা ছাড়িয়ে গেছে পাটের ডগাগুলো। জল-কাঁদার থেকে

উঠে উচু আলটার উপরে বসল বলরাম। জোরে টান দিতেই উপড়ে উঠে এলো কয়েকটা পাট গাছ। সবুজ পাতাগুলো চক্চক্ করছে। ভিতরেব পাটকাঠি থেকে ছাগগুলো ছাড়িয়ে নিল বলরাম। ছাগগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে লম্বা একটা দড়ি বানাল। সাপের মতন ভেগতেলে লম্বা দড়িটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল বলরাম। তারপর দড়িটা নিয়ে হাঁটুর নীচে শক্ত হাতে পাকৈ পাকৈ জড়িয়ে একটা বাঁধন দিল। একটু বাদেই রিম্‌রিম্ করে উঠল পাঁটা। তাড়াতাড়ি ক'রে বলরাম কাস্তের ফলা বাধিয়ে দড়িটা কেটে দিল। স্বাভাবিক রক্ত-চলাচলে আবার সাড় ফিরে এলো পায়ের। হাতটা তুলতেই একটু চমকালো বলরাম। হাতের তেলোয় খানিকটে রক্ত। পদ্মর গলায় নাকি দড়ির দাগটা কেটে বসেছিল। পদ্মর গলা থেকেও কি রক্ত পড়েছিল? দড়ি-বাধা জায়গাটার হাত বুলোলো বলরাম। না, বলরামের পা কেটে রক্ত বেরোয়নি। বাঁধনটার নীচে একটুখানি রক্ত লেগে রয়েছে। কখন হয়ত একটা জোঁক লেগেছিল। রক্ত ধেয়ে ধেয়ে জোঁকটা আপনা আপনিই বারে পড়ে গেছে। জোঁকে ফুটো করে দেওয়া জায়গাটা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে একটু রক্ত বেরিয়ে জমা হয়ে আছে। সেই রক্তটুকুই হাতে লেগেছে বলরামের।

ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে রাতে বিছানায় এলিয়ে পড়ে ছিল বলরাম। বাপের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে নারায়ণ-ও আজ আর কথা বলেনি। ভয়ে ভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরের কাজকর্ম সেরে এসে স্ববাসী স্ত্রী পড়ল নারায়ণকে কোলে নিয়ে। একটু পরে নিজের মনেই যেন বলতে লাগল— “পোড়াকপালীর কপালভাই মন্দ। সারা জীবনভা জলে জলেই গ্যালো। মরলও কপাল পোড়ায়ো।”

বলরাম বুঝতে পারল, পদ্মর কথা বলছে স্ববাসী। আশ্চর্যে বলরাম এ-পাশ ফিরে তুলে।

স্বাসী বলে চলল,—কি যে ছল-মাইয়ে হাউড়ে হেলো মানুষটা! কারো এটা ছল-মাইয়ে পালি কোলে না নিয়ে ছাড়তো না। নারায়ণের কি ভালোডাই না বাসতো! নিজির কোলে তো ভগোমান কচি-কাঁচা কিছু দি'নি। পরের তা নিয়েই টানাটানি কস্তো। তা ভগোমানের কি এমনিই বিচের! অমন ছলমাইয়ে-টানা মানুষটার ঝামে ঐ জালাতেই মরতি হ'লো।”

বলরামের মনের মধ্যে খট করে উঠল। দুই হাতের পরে ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করে বলল—“কি কলে কথাডা? কি হইলো ক'লে পদ্মর?”

স্বাসী বলল—“আগে তো কিছু শুনিনি। সগোলে ভাবিছে মাধার সাথে বুঝি ঝগড়াঝাটি বাধায় গলায় দড়ি দেছে। সন্সের সোমায় পাড়লির মা আইলো। ওর কাছে শোনলাম সব কথা। পদ্মদি পোয়াতি হইলো। এই নাকি পেরায় তিন মাস।”

একটু থেমে স্বাসী আবার বলল—“পোড়াকপালী কন্ডে যে কপালভা পোড়ালো।”—

স্বাসীর একটা কথাও যেন আর বলরামের কানে গেল না। বুকের মধ্যে দখটা যেন আটকে আসছে। মনের মধ্যে ভেসে উঠল কয়েক মাস আগের কথা। সেই উলুখড়ের গাধা! সন্সার আবছা অন্ধকার! আর কয়েকটি নিবিড় যুহুত!

সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা ঘটনা ঘুরপাক খেয়ে ভেসে উঠল বলরামের মনে। ঘটনাটা মাত্র কয়েক দিন আগের। দক্ষিণ-পাটায় কৈলাসদের বাড়ী সত্যনারাণের সিন্ধি ছিল। বলরামও গিয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত গানবাজনা চলল। সিন্ধি শেষ হলে বলরাম একা একা বাড়ী ফিরে আসছিল। পদ্মদের বাড়ীর কাছে এসেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রাস্তার থেকেই দেখা যাচ্ছিল, পদ্মদের চোঁকিঘরে একটা আলো জ্বলছে। বলরাম বুঝতে পেরেছিল, পদ্ম এখনো ঘুমোয়নি।

প্রাৰণ-ভাদ্র ২

চোঁকিঘরে কাজ করছে। চোরের মতন চুপিসাড়ে এসে বলরাম দাঁড়িয়েছিল চোঁকিঘরের বেড়ার পাশে। ঠক্ ঠক্ করে একটু শব্দ করতেই পদ্ম মুখ বের করছিল। বলরামকে দেখে ফু দিয়ে কুপিটা নিভিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। দু'হাতে বলরাম পদ্মকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে এসেছিল গোয়ালঘরটার আড়ালে। শুকনো বাঁশ-পাতার মতন পদ্ম ধরধর করে কাঁপছিল বলরামের বুকের মধ্যে। দু'হাত দিয়ে বলরাম পদ্মর মুখখানা তুলে ধরেছিল। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল—“কথা কচ্ছো না যে? রাগ করিছো নাকি?”

পদ্ম কোনো কথা বলেনি। শুধু বলরামের বুকের মধ্যে আরো এলিয়ে দিয়েছিল নিজেকে। পদ্মর মাধায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলরাম বলেছিল—“এটা কথা তো কবা। কথা যদি না কবা তো আলাম ক্যানো তোমার কাছে?”

পদ্ম আশ্বে আশ্বে বলরামের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল—“আর তুমি আসে না বোনাই। আসে না তুমি আর আমার কাছে।”

কলতে বলতে পদ্মর চাপা গলাটা বুজে এসেছিল।

বলরাম হাত বাড়িয়ে আবার কাছে টেনে নিয়েছিল পদ্মকে। বলেছিল—

—“ক্যানো? কি হইছে কি? ক্যানো তুমি আমারে বারণ দেছো তোমার কাছে আস্তি?”

পদ্ম বলেছিল—“না, হইনি কিছু।”

—“তয়? তয় ক্যানো তুমি বারণ দেছো আমারে আস্তি?”—আঁকুল গলায় বলেছিল বলরাম।

চুপ করে পদ্ম কি যেন ভেবেছিল। তারপরে বলেছিল—“না বোনাই, আমার কাছে আর তুমি আসে না। এতে তোমার বড় পাপ হয়।”

আরো জোরে পদ্মকে জড়িয়ে ধরেছিল বলরাম।

বলেছিল—“পাপ হয় হবে। আমার পাপ হবে। তোমার কি?”

একটু মলিন হেসে পদ্ম বলেছিল—“ভালো কথাই কইছে। তুমি বোনাই! তোমার পাপ হবে, তাতে আমার কি! কিন্তুকি বোনাই, তোমার পাপের আশুনি আমি যে দিনরাত জলে পুড়ে মরতিছি। আর কতো জগতি কও আমারে?”

বলরাম জিজ্ঞাসা করেছিল—“ক্যানো, কেউ কিছু কইছে নাকি তোমারে? পদ্ম বলেছিল “সেইটেই বুঝি বাদ আছে! তা কারো আর কিছু ক’তি হবে না। কওয়ার আগেই সগোলের মুখ আমি বুজিয়ে দেবো।

“তোমার কথাতো আমি বুঝি পারতিছি না। কি কইছে কবা তো?”

—অবাক হয়ে বলরাম জিজ্ঞাসা করেছিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল পদ্মর। বলরামের হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বলেছিল—“বুঝি আর কারো কিছু হবে না। বোঝাপড়ার সব ভার আমার পরে ছাড়ে ছাও।”

তারপর আশ্বে আশ্বে সেখান থেকে সরে গিয়েছিল পদ্ম।

কথা বলতে বলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে স্ববাণী। বিছানাটা বলরামের গায়ের নীচে আশুনের মতন মনে হলো। নিঃশব্দে উঠে এলো উঠোনে। আকাশের দিকে তাকালো। অন্ধুত অন্ধকারে আকাশে রাশি রাশি তারা আশুনের ফুলকির মতন গন-গন করছে। সন্দেশের তীক্ষ্ণ চোখ মেলে ওরা যেন বলরামের শরীরটাকে বিঁধে দেবার ঝুজ তাকিয়ে আছে।

জ্বত পায়ে বলরাম ঘরে ঢুকে দয়জায় হড়কোটা টেনে দিল।

ক্রমশঃ

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জ্ঞতা

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ৯.৫০। বার্ষিক ৪.৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অভিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জ্ঞতা

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিকার হরকে ফুলফ্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।
৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্ত আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান

কলিকাতা-৪৭

পুস্তক পরিচয়

Sri Aurobindo And The New Thought in Indian Politics. Edited with an introduction by Sri Haridas Mukherjee and Sri Uma Mukherjee, with a foreward by Dr. Radha Kumud Mukherjee. Firma K. L. Mukhopadhyaya Price Rs. 12/-

মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ এবং *Bande Mataram* দৈনিকের সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ কি এক ব্যক্তি? বহু শিষ্য ও অনুরাগী ভক্তদের দ্বারা পূজিত শ্রীঅরবিন্দ আর সারা বিশ্বের মুমুক্ষু সমাজে যোগাচারী পুরুষোত্তম বলে অদ্বার্ষী স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তাঁর যোগসাধনা ও অধ্যাপনায় মূলত 'ইদম্' ও 'অদম্'-এর অদ্বয়সাধনার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ফলশ্রুতি—এ কথা নব্যযোগদর্শনে আসক্ত অনুরাগীর দল অবগত আছেন। ভারতীয় যোগসাধনার আর একটি বিচিত্র পন্থাকে যিনি তৈল ভণ্ড-ইন্ধনের যুগে এবং প্রায়শ্চাত্যিক সমাজে গ্রহীতব্য করেছেন তাঁকে আলোকপন্থার যাত্রীরা আলোকতীর্থের তীর্থদেবতা বলেই যুগে যুগে শ্রদ্ধা করবেন। অধুনা স্বাবর চৈতন্তের মর্মস্থলে যিনি "বাতাব অপ্রাপনীয়্য" পরাবিছাকে প্রপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে, বিশেষতঃ আত্মবিচার ক্ষেত্রে তাঁকে আলোকদিশারী বলে অনাগত কালের আলোকার্থীরা ভক্তিরাগরঞ্জিত বিবরণে পূজার্চনা করবেন। কিন্তু বক্ষ্যমান সঙ্কলনটিতে মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের যে-রূপ ফুটেছে তাকে বিশুদ্ধ কর্মযোগী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। রক্তাক্ত রাজনীতির বক্র-ভূর্ণম পথে যে অরবিন্দ ভীষণের অভিশাপে যাত্রা করেছিলেন, যে পথে

তিনি দেশের যুবশক্তিকে আহ্বান করেছিলেন, সে-পথ প্রতিদিনের দুঃখহর্ষের মানিময় পথ। বিশ শতকের গোড়ার দিকে সাময়িকপক্ষে রক্তক্ষরা অগ্নিবাহিী ছড়িয়ে অরবিন্দ সংগ্রামী যৌবনশক্তিকে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তার জন্ত হোমহত্যাশনে ছিন্ন স্বপিণ্ড সমর্পণেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর সেই অধ্যু্য অপব্যয়েই সৈন্যপত্য স্বদেশী-আন্দোলনের ইতিহাসে আজও অম্লান হয়ে আছে।

তাঁর নেতৃত্বে প্রকাশিত *Bande Mataram* দৈনিকে তাঁর যে সমস্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হত একদা বিপ্লবীসমাজ তাই পড়ে অগ্নিকুণ্ডে কাঁপ দিয়েছিল। তিনি বঙ্গভঙ্গযুগে সক্রিয় এবং প্রথমী রাজনীতির ক্রান্তিচূড়ায় দাঁড়িয়ে দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনের জন্ত আত্মত্যাগে অকুতোভয় বীরবিপ্লবীদের আহ্বান করলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন বিপিনচন্দ্র পাল। ১৯০৬ সালের আগস্ট থেকে ১৯০৮ সালের অক্টোবর—মোট দু' বছর *Bande Mataram* চরমপন্থী দৈনিক রূপে সমগ্র দেশে বঙ্গভঙ্গের বিষজ্বালকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এই দু' বছরের সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে অরবিন্দের একশ নটি প্রবন্ধ এই সংকলনে গৃহীত হয়েছে। সম্পাদকদ্বয় বহুপরিশ্রম করে অধুনা-দুঃপ্রাপ্য *Bande Mataram*-এর পুরাতন ফাইল সংগ্রহ করে এই নিবন্ধগুলিকে কালানুক্রমিক ভাবে সাজিয়েছেন এবং গ্রন্থারম্ভে একটি তথ্যবহু সূচীকৃত ভূমিকা সংযোজিত করেছেন। আজ বেশ ক' বছর ধরে মুখোপাধ্যায়দম্পতী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বাধেশিকতার স্বরূপ নিয়ে নানা সন্ধান-অনুসন্ধান ও গবেষণাকার্যে অনন্তব্রতী হয়ে আছেন। ইতিপূর্বে

তাদের কয়েকখানি মূল্যবান পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের *Bande Mataram and Indian Nationalism* এবং *Sri Aurobindo's Political Thought* সম্বন্ধে স্বারা অবহিত আছেন, তাঁরাই এঁদের এ বিষয়ে বিশেষ অধিকারের কথা স্বীকার করবেন। বঙ্গভঙ্গ এবং তার প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংলা দেশে যে 'militant Nationalism' (ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের এই শীর্ষক গ্রন্থটি এই প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য) উগ্রমুর্তি ধারণ করে, তা যে শুধু নৈরাজ্যবাদী ধ্বংসের মতো রোমান্টিক ভাবাকাশে প্রচুর অগ্নি-ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে নিঃশেষে মিলিয়ে যায় নি, বরং ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনকে বঙ্গবিভূত্রে ভরে দিয়েছিল, তা এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যাবে। আর সেই ইতিহাসের উপাণন হল মুখোপাধ্যায়-দম্পতী সম্পাদিত এই গ্রন্থটি। অরবিন্দ বাংলা ওখা ভারতীয় রাজনীতির মুহূর্তে রোজসেবী মডারেটদের ভীকৃত্যার শিরে বজ্রাঘাত করে দেশের যুগশক্তিকে যে রক্তভিলকে চিহ্নিত করে মাতৃসেবকরূপে ঝড়ের রাতে পথে বার করলেন, তার দার্শনিক প্রত্যয়, কর্মপদ্ধতি, প্রস্তুতি ও পরিণামের বর্ধার্য পরিচয় *Bande Mataram* থেকে সংকলিত এই শতাধিক প্রবন্ধে অতি চমৎকার ফুটেছে। এগুলি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। যোগী ক্রীতরবিন্দকে নিয়ে আমরা ভাবোন্মত্ত হয়ে আছি কিন্তু কর্মযোগী অরবিন্দের সংগ্রামী সত্তাকে বুঝে নিতে গেলে এই সংকলনটির সহায়তা ভিন্ন অন্য কোন স্থলভত্তর উপায় নেই। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' কীভাবে মাতৃবন্দনার ঋক্মন্ত্র থেকে 'war ory'-তে পর্ববসিত হল, কীভাবে এই মহামন্ত্রের তলে সমগ্র ভারত পরবর্তী কালে মিলিত হল, তার স্মরণপর্বের ইতিহাস এই গ্রন্থগুলিতে রয়ে গেছে।

১৯০৫ সালের অরবিন্দ রাজনৈতিক চেতনায় একাধারে ভাববাদী, কল্পবাদী, অধ্যাত্মবাদী এবং বাস্তববাদীও বটে।

বিদেশী শাসনের মহাপাপ থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্য তিনি গুপ্ত গুহার রক্তাক্ত পথ বেছে নিলেও আসলে তিনি আত্মত্যাগমূলক ধর্মসাধনার পথই মেনে নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' হয়েছিল তাঁর পথের দিশারী। প্রথম দিকে তিনি অহিংস অসহযোগের পথই বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু ক্রমেক্রমে তাঁকে সংঘর্ষের পথে নামতে হল। বিপ্লব, শশজ বিপ্লব, গুপ্ত বিপ্লব—এ ছাড়া আর কোন পথই রইল না। জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম—এ সমস্ত ব্যাপার তাঁর কাছে নিছক আন্দোলন মাত্র ছিল না, তিনি বলেছেন "Nationalism is a religion that has come from God." তার জন্ম প্রয়োজন হল অসহযোগ প্রতিরোধ, প্রয়োজন হল গুপ্তবিপ্লব। সম্পাদকদ্বয় ভূমিকাতে পরবর্তীকালের রাজনীতিতে অরবিন্দের প্রভাব সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন : His spirit of passive resistance found a veritable incarnation in Mahatma Gandhi, while that of revolution a living embodiment in Netaji Subhas Chandra Bose." দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালের রাজনৈতিক নেতারা সে কথাটা প্রায়ই ভুলে গেছেন।

আলোচ্য সংকলনে 'The New Thought' নামে অরবিন্দের যে সাতটি রচনা স্থান পেয়েছে, তা থেকে তাঁর জীবন দর্শন, রাজনীতি ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করা যায়। যখন কংগ্রেসী কর্তব্যাক্তি ও স্বযোগসন্ধানী মডারেটরা সদাশয় ইংরেজ সরকারের ছত্রছায়াতলে বসে শনৈঃ শনৈঃ স্বদেশের কল্যাণ কামনা করছিলেন সেই যুগে অরবিন্দ পূর্ণধরাজের দাবি ঘোষণা করেন। ঘোষণা করেন, "A band of men is needed who can give up everything for their country, whose sole thought and occupation shall be the stimulation of the movement by whatever means the

moment suggests or opportunity allows.”
 ষাটমুস্তির জন্ত তিনি শ্রেষ্ঠ ত্যাগস্বীকারের আহ্বান জানান, প্রাণসমর্পণের জন্ত নতুন যজ্ঞের পরিকল্পনা করেন, তাঁর “ভবানীমন্দিরে” দেশমাতৃকাকে শক্তিস্বরূপিণী বলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সংকলনের প্রবন্ধগুলির মধ্যে শুধু যে একটি প্রবল আবেগমূলক এবং হিন্দুমনোভাবের অমুকূল উচ্ছ্বাসই আছে, তাই নয়। এর মধ্য দিয়ে বিপ্লবী অরবিন্দের ঘাতপ্রবণ সংঘর্ষচিন্তা, অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা বিদেশী শাসককে হতবল ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার চেষ্টা, এবং চূড়ান্ত কর্মপন্থারূপে প্রচণ্ড বিপ্লবী মনোভাবকে গ্রহণ—এ সমস্ত রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতিই প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকদ্বয় তাঁর রাজনৈতিক চেতনা সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন :

“As super-idealist as he was, he was a *Real Politiker* also at the same time.” তবে বঙ্গভঙ্গ যুগের রাজনীতি ভাববাদী এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে রোমান্টিক ইউটোপিয়ান হলেও, তার সঙ্গে নীতি, ধর্ম ও শুদ্ধ চারিত্রবুদ্ধির যথোপযুক্ত সংনির্মাণ ঘটেছিল, তখনও রাজনীতি স্বার্থপূরণের ব্যবসায়ের পরিণত হয়নি, রাজনীতি তখনও ‘বদমায়েসদের শেষ আশ্রয়স্থলেও’ পর্যবসিত হয়নি। সে যুগে রাজনীতি ও জীবননীতি পৃথক হয়ে যায়নি। সে রাজনীতির দেবতা হলেন দেশমাতৃকা, স্বাক্ষমন্ত্র হল বন্দেমাतरম্, বলিচক্র হল আত্মত্যাগ। অরবিন্দ মাতৃসমের উদ্গাতা হয়ে নতুন যজ্ঞে পূজারীদের আহ্বান করলেন,

অধর্ষ্যদের ভালে রক্ততিলক এঁকে দিলেন। তাঁর সেই প্রবল আদর্শবাদ এবং প্রবলতর আত্মত্যাগের বাসনা আর তারই সঙ্গে স্থিতিধী প্রবীণত্বের অস্থির কর্মপন্থা এই ইংরেজী নিবন্ধগুলিতে ঐতিহাসিক দলিলরূপে রয়ে গেছে। শ্রীযুত হরিশাঁস মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় সেই রচনাস্তলিকে বিবর্ণ সাময়িকপত্রের গলিতাবশেষ থেকে রক্ষা করে ভারত-ইতিহাস সংরক্ষণের পক্ষে একটি পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করলেন। এই সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি থেকে অরবিন্দের রাজনৈতিক কর্মপন্থা ও আদর্শ সম্বন্ধে যৌলিক তত্ত্ব আসা সম্ভব, তেমনি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালীর রাজনৈতিক চিন্তা ধারা কোন পথে চলেছিল, সমগ্রভারতীয় রাজনৈতিক ভাঙারে বাঙালীর দানই-বা কি, সে সম্বন্ধে এই সংকলনটি একটি অতিপ্রয়োজনীয় তথ্যগ্রন্থ হয়ে রইল। “অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার” বলে রবীন্দ্রনাথ যে-অরবিন্দকে নমস্কার নিবেদন করেছিলেন, যিনি শুধু মহাযোগী নন মহা কর্মযোগীও বটে, তাঁর মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ এক নতুন রূপ ধরতে সাজ্জিল, তাঁর এক বিচিত্র পরিচয় *Sri Aurobindo And The New Thought in Indian Politics*-সংকলনে ফুটে উঠেছে। এ জন্ত মুখোপাধ্যায়-সম্পাদী দেশবাসীর অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করবেন।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বাবর্ত

চীনে গৃহযুদ্ধের গতিবেগ

গত বছর ১৮ই আগষ্ট মাও সেতুং সমগ্র চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তাণ্ডব হরু করে বিরোধীদলনে উত্তোঙ্গী হয়েছিলেন। পিকিং-এর মেয়র পেং সেনু—যিনি মাও-এর এককালীন সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী ছিলেন—থেকে হরু করে চীক অফ জেনারেল ষ্টাফ লো জুই চিং, চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও অন্ত্যস্ত বহু বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মকর্তা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কবলিত হয়ে চীনের জনজীবন থেকে নির্বাসিত হয়েছেন, কেউ বা এই পৃথিবী থেকেই চির বিদায় নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মাও-এর প্রবলতম অস্ত্রায়, ‘শোধনবাদের শেষ দুর্গ’, চীনের রাষ্ট্রপতি লিউ সাও চির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনা করে মাও সেতুং মিস্কটক হবার জন্ত সর্বস্বপণ করেন। লিউসাও চিং উৎসাদনের সঙ্গে মাওবাদের সর্বময় প্রতিষ্ঠার জীবন-মরণ প্রশ্নটি জড়িয়ে গিয়ে লিউসাও চিং সমর্থকদের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাহনেরা উত্তাল অত্যাচারে জর্জরিত করে তোলে। ফলে চীনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, পশ্চিমে, উত্তর-পূর্বে এবং পূর্বে নানা সংঘাতের সংবাদ বহিঃপৃথিবীতেও এসে পৌছায়। এর মধ্যে মাও-পন্থী ও মাও-বিরোধীদের সংঘাত তিস্ত ও সিনকিয়াং অঞ্চলে গুরুতর আকার ধারণ করেছিল বলে সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রায় বছর খানেক সমগ্র চীনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে লক্ষ লক্ষ রেড গার্ড মাওবাদে সম্মোহিত হয়ে এবং মাও-এর বাণী সম্বলিত লাল বই হাতে যে হিংস্র তাণ্ডব প্লাবন বইয়ে গিয়েছিল কম্যুনিষ্ট পার্টির পোষকতায় এবং সরকারী সমর্থনে তার পরিণতিতে লিউ-পন্থীদের নির্বাসন ও

উৎসাদন অবশস্তাবী ছিল। গত ১লা জুলাই তারিখে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা ‘রেড ক্ল্যাগ’ সে-সংবাদই প্রচারিত করে বলেছিল “the top party person in authority taking the capitalist road has been overthrown”. এ সংবাদে মনে হয়েছিল লি সাও চি শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন। কিন্তু সরকারীভাবে সে-খবর ঘোষিত হোলো না। গত ২২শে জুলাই চীনা বিমানবাহিনীর মুখপত্র ‘Red Shock Troops’-এর ঘোষণায় বিপরীত সংবাদে চীনের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের গতিবেগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অনুমান করা চলে। এই পত্রিকায় অস্পষ্টভাবে একথা ঘোষিত হয়েছে যে ‘revisionists’দের সঙ্গে সংঘাতের অবসান তো দূরের কথা ‘চীনের ‘ক্লসেড’ অর্থনীতি, লিও সাও চি—কম্যুনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে শক্তিশালী গোষ্ঠি রচনা করে তাকে মাও সেতুং-এর নেতৃত্বের সমকক্ষ নেতৃত্বের অধিকারী করে তুলেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যচীনের শিল্পপ্রধান উ-হান অঞ্চলে সেনাবাহিনীর একাংশের সাম্প্রতিক মাও-বিরোধিতা মাও-পন্থী সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘাতে আত্মপ্রকাশ করে। সেনাবাহিনীর মধ্যে মাও-বিরোধিতার সংবাদ বিভিন্ন স্তরে পাওয়া গেছে। হপে প্রতিজিয়াল রেডিও, পিকিং রেডিওর সংবাদেও তা জানা গেছে। ১০ই আগষ্ট হংকং-এর সংবাদে প্রকাশ হপে প্রতিজিয়াল রেডিওতে বলা হয়েছে “capitalist enemies both within the party and the army were inviting and leading mass organisations to violent fighting against the

proletarian democracy of communist party Chairman Mao Tse-tung."

উ-হানের চাক্ষুণ্যকর ঘটনার স্মরণে মাও সেতুং-এর উ-হানে প্রেরিত দুই প্রতিনিধি ডেপুটি প্রিমিয়ার এবং মিনিষ্টার অফ পাবলিক সিকিউরিটি সিয়ে ফু চি (Hsieh Fu-chi) এবং ওয়াং লিকে (Wang li) মাও-বিরোধীরা প্রহার করে এবং উহান সেনানায়ক চেন সাই-তো (Chen-Tsai tao) গ্রেপ্তার করে। এদের মুক্তির জন্ত স্বয়ং চৌ এন লাইকে উহান যেতে হয় এবং সেখানে চৌ এন লাই-এর অপদ্রুত হবার সম্ভাবনা থাকায় শেষ মুহুর্তে তাঁর অবতরণের বিমান ষাঁট পরিবর্তন করতে হয়। এ-ছাড়া পিপলস লিবারেশন আর্মির ছত্রীবাহিনী উহান বিশ্ববিদ্যালয়ে অবতরণ করে এবং উত্তর ও দক্ষিণ চীনের সংযোগকারী একটি সেতু দখল করে। এ ছাড়া ইয়াং সি নদী দিয়ে সাংহাই থেকে ছয়টি নৌবহর উহানে পৌঁছে ছত্রী-বাহিনীর সেতু, বিমানঘাঁটি দখলের কাজে সহায়তা করার জন্ত পাঠানো হয়। ১লা আগস্টের হংকং ষ্টারের সংবাদে প্রকাশ জেনারেল চেন-সাই তাও এর নেতৃত্বে মাও-বিরোধী সেনাবাহিনীর নিকট ছত্রীবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়েছে এবং নৌবহর ফিরে গেছে। উহান থেকে দলে দলে গৃহ-যুদ্ধের ভয়ে ক্যান্টনে লোক আশ্রয় নিচ্ছে। ৩১শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত কম্পার্টমেন্টের পত্রিকা ইজভেস্টিগাও প্রকাশিত হয়েছে: "Part of China's army was becoming increasingly opposed to Chairman Mao Tse-tung and his cultural revolution and that this section included the best representatives of the army."

উহানে বর্ধিত মাও-বিরোধিতার সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংযোগে সেনানায়কদের উদ্বেষ্টের কারণ হয়েছে। হংকং-এর 'Star' পত্রিকার খবর চীনের তেরটি সামরিক জেলার

অধিনায়কেরা সফট এড়াবার জন্ত কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁরা চান মাও সেতুং প্রকৃত ক্ষমতা ত্যাগ করে একটি আনুষ্ঠানিক পদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, লিও সাও চি ও তাঁর সমর্থকরা পদত্যাগ করুন, লিন পাও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব এবং মাও-এর উত্তরাধিকার ত্যাগ করুন, পার্টির নবম কংগ্রেস অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হয়ে পার্টি, সেনাবাহিনী এবং বেসামরিক প্রশাসনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হউক এবং চৌ এন লাই চীনে নতুন নেতাক্রমে গৃহীত হউন। সেনাধিনায়কদের এই প্রস্তাবের পেছনে স্ত্রাশনাল পিপলস কংগ্রেসের ষ্টাণ্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান চু তে, হো লুং এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন ঈ'র সমর্থন আছে। এই সর্বশুলি গৃহীত না হলে সেনাধিনায়কেরা পিকিং-এর বিরোধিতা করবেন বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। পিকিং-এর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ মনোভাবের আর একটি নজীরও পাওয়া গেছে। গত ১লা আগস্ট চীনা সেনাবাহিনীর ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে তেরটি সামরিক জেলার অধিনায়কদের মধ্যে নয়টি জেলার অধিনায়করাই পিকিং-এ এই উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই, যদিও এই অনুষ্ঠানে যোগদান সেনাধিনায়করা একটি অবশ্য কর্তব্যরূপে মনে করেন। নয়জন সেনাধিনায়কের অনুপস্থিতি মাও সেং তুং-এর উৎসাদন নীতি ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রতি অনাস্থাসূচক বলে অনুমান করা যেতে পারে।

ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে মাও-বিরোধী ও মাও-পন্থী শক্তির প্রচণ্ড পরীক্ষা চলছে। সেনাবাহিনী এই ঘন্থে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে পড়ছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি অন্তর্ঘর্ষে বিভক্ত এবং মাও সেতুং কম্যুনিষ্ট পার্টির শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকা সত্ত্বেও চীনে মাও-এর ক্ষমতার ভারকেন্দ্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকট থেকে রিভলিউসনারী কমিটিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। মাও-সেতুং এখন আর কম্যুনিষ্ট পার্টির নামে কাজ করছেন না, কারণ কম্যুনিষ্ট পার্টির নামে কাজ করা সম্ভব নয়।

তাই রিভলিউসনারী কমিটির নামে কাজ করতে হচ্ছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সর্বস্তরে মাও-পন্থীদের এই রিভলিউসনারী কমিটির আওতায় সংহত করতে হচ্ছে, তাদের মধ্যে মাওপন্থী সেনাবাহিনী গঠন রয়েছে। উহানের ঘটনার পর সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে সাংহাই, কিয়াং সু, সানটুং, ক্যান্টন, চুং কিং, কোয়াং টুং, ও ফু-কিং, মাঞ্চুরিয়া, এককথায় উত্তর-পূর্ব প্রান্তের প্রদেশগুলি থেকে শুরু করে দক্ষিণে য়ুনান এবং কোয়াং সি, পশ্চিমে কান্সু ও নিংসিয়া অটোনোমাস অঞ্চল পর্যন্ত এই সংগ্রাম বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। জাপানী পত্রিকা সাংকাই শিম্বুম ("Sankai Shimbun") ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টার ও পাবলিক লিকিউরিটি মিনিষ্টার সিয়ে ফু চিন (Hsieh Fu-Chin) স্বীকার করেছেন যে মধ্য চীনের হুপে, হনান এবং কিয়াংসি প্রদেশে মাও-বিরোধীশক্তির প্রতিরোধ অভ্যস্ত প্রবল। সিয়ে ফু চিনের কথায় জানা যায় বিদ্রোহীদের প্ররোচনায় কৃষকেরা ব্যাপক সংখ্যায় সহরে অভিযান করে সেগুলিকে ধ্বংস করে রাখে। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেঁাও-এর বৈপ্লবিক কৌশল মাও সেতুং-এরই শেখান। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আর একজন নেতা ওয়াং লি র কথা একই সময়ে 'সাংকাই শিম্বুম' উদ্ধৃতি করে বলেছে নানকিং এবং ফুচাও-এর সামরিক অধিনায়কেরা কেন্দ্রীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির মিলিটারী কমিটির নির্দেশ অমান্য করছে। সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মস্কো রেডিও অগাষ্টের প্রথম সপ্তাহে মন্তব্য করে যে চীনের অবস্থা ততো সঙ্গীন আর কখনও ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই : "Never before has the situation in China been as serious as now. The situation which has developed in the country is fraught with the danger of further aggravation similar to the events in Wuhan." হংকং সীমান্তে পুনঃ পুনঃ চীনা সংঘাতে হংকং দখলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেস ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত হবার কথা। এই এগার বছরের মধ্যে আর কোনো কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় নাই, যদিও পার্টি সংবিধানে পাঁচ বছর পর পর কংগ্রেস আহ্বানের বিধান রয়েছে। এ-যাবৎ এই কংগ্রেস সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য শোনা যায় নাই। মাও সেতুং, কংগ্রেস ডাকবার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নাই। আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে পিকিং-এর দেওয়াল পত্রে জানা গেছে, 'বিক্ষম পার্টি সংগঠনকে' (badly mauled party organisation) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার (restoration) এবং সর্বস্তরে আগামী বছর জাতীয় গণ কংগ্রেসের অনুষ্ঠানের জন্য মাও নির্দেশ দিয়েছেন। জাতীয় গণ কংগ্রেসের আহ্বানের যুক্তিসঙ্গত বলা হয়েছে সব চাইতে বদলোকগুলি পার্টি থেকে বিতাড়িত হয়েছে : most bad elements and all the freaks and monsters have been weeded out."

শেষ পর্যন্ত মাও সে তুং নবম কংগ্রেস ডাকতে সম্মত হলেন কেন, এর কোনো সম্ভব পায়না। যদিও তার কারণরূপে 'most bad elements' দের উৎসাদনের কথা প্রচার পত্রে বলা হয়েছে। আসলে দেশের ভেতরে এবং বাইরে অসংখ্য আবহাওয়া তৈরীর জন্য কংগ্রেস ডাকবার প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। কম্যুনিষ্ট পার্টি তার স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে যেতে চাইছে, কংগ্রেস বসবার প্রস্তাবে সেই আশ্বাস দিয়েছে। এই মনোভাব অস্তির উদ্দেশ্য থাকতে পারে কংগ্রেস ডাকবার প্রস্তাবের পেছনে এবং আসলে এই কংগ্রেসের আড়ালে বিরোধীদের সঙ্গে একটা সমঝোতা আসা যায় কি না সে-ধরণের উদ্দেশ্যও মাও সে তুং-এর থাকতে পারে। চীনের অবস্থা কতদূর সঙ্কটাপন্ন জুলাই-এর শেষে কয়েকটি বৈদেশিক সাংবাদিকদের জাক্জিক করে, তাদের প্রেরিত সংবাদ আটকে দিয়ে চীনা রেড গার্ডরা তা সপ্রমাণ করেছে। সম্ভ্রান্তি সোভিয়েত ক্রমের একটি

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় মাওপহী নেতারা হুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রেখেছেন এবং পিকিং-এ একটি জেট-বিমান সব সময় তৈরী রয়েছে, যাতে প্রয়োজন হলেই নেতারা দেশত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে পারেন। গত ১৩ই আগষ্ট পিকিং থেকে বিতাড়িত নরওয়েবাসী সাংবাদিক হারাল্ড মুখে কাস (Harald Munthe Kaas) ওগুলো পৌঁছে আনিয়েছেন পিকিং-এ একটা ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব বিরাজ করছে এবং চীনা সরকারের শাসন পিকিং থেকে খুব দূর পর্যন্ত প্রসারিত নেই—‘does not go far beyond Peking.’ কাস বলেছেন—‘the atmosphere in Peking appears to be very nervous, because the domestic political situation is chaotic and very serious.’

হুতরাং মাও সে তুং এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে। সেই কারণে নবম কংগ্রেস আহ্বানের সমিচ্ছা দেখিয়ে মুখরক্ষার তাগিদ মাও সে তুং-এর পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠবে। মাওপহীরা সাম্প্রতিক বিপ্লবের নামে চীনের সুবকনের প্ররোচিত করে যে ব্যাপকহারে এদের হিংস্র করে তুলেছে, এদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে, মা সেতুংকে, বিপর্যস্ত হলেও বিজয়ীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত থাকতেই হবে। দেশের ভেতরে জোড়াভালি দিয়ে চীনের পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে সামরিক সংঘাতে লিপ্ত হয়ে মাও সে তুং উভয় সঙ্কটের মাঝে পথ করে নিতে পারেন। সম্প্রতি রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী মরের জুলাই মাসের গোড়ায় মাও সে তুং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রুশ-চীন বিরোধের অবসানের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ভিয়েতনাম এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও আলোচনার সুযোগ হোতো। কিন্তু মাও সেতুং মরের-এর সঙ্গে দেখাই করলেন না। রুশ-চীন তীব্র বিরোধের আর একটি ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে চীনা বন্দর ডায়রেনে। ডায়রেনে আগত সোভিয়েৎ জাহাজ আক্রমণ

করে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে মারপিট করে লাল রক্তীরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এবং জাহাজেরও সমূহ ক্ষতি করে। শেষ পর্যন্ত কোসিজিনকে প্রচণ্ড হুমকি দিয়ে ক্যাপ্টেনকে মুক্ত করতে হয়েছে। রুশ সীমান্তে চীন-রুশ সংঘাতের এবং ভারত সীমান্তে চীন-ভারত সংঘাতের সম্ভাবনা দেশের অভ্যন্তরে মাও-এর সাময়িক মুখ রক্ষার খেয়াড়ত ঘোগাবে কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা মুশ্কিল হলেও গত ৩১শে জুলাই তারিখে মাও সে তুং বন্দুক দিকে পৃথিবী সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের বৈশ্বিক সংগ্রামে চীনা মুক্তি যোজ্ঞার সহায়তার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সঙ্কট-ভর্য পৃথিবীর পক্ষে তা যথেষ্ট বিপদসঙ্কেত। “The world could only be reformed by Gun barrels”—মাও-এর এই সতর্কবাণী তার দেশের বাইরের শত্রুদের লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। চীনের অভ্যন্তরে কি ঘটবে তার উপর নির্ভর করবে মাও-এর উপরোক্ত হুমকির ফলশ্রুতি। কিন্তু মাও সে তুং-এর আপাত মুখরক্ষা, তার শেষ রক্ষা করবে কিনা সে-সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ থেকে যায়। ১৯১১ সালে উহানেই চীনা সাম্রাজ্যের ভিত্তি কেঁপে পববর্তীকালে সান ইয়াং সেনের বিপ্লবের জন্ম পথ করে দিয়েছিল। ১৯৬৭র উহানে মাও সে তুং-এর সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপলো কিনা ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

স্ত গালের অভিজ্ঞতা

কানাডায় কনফেডারেশনের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা-মূলক সফরে কানাডা পরিভ্রমণকালে সম্প্রতি ফরাসী প্রেসিডেন্ট স্ত গাল তুয়ুল কাও করে বসেছেন। কানাডা সরকারের মাননীয় অতিথি হয়েও এই অশ্রীতিপর বৃদ্ধ রাষ্ট্রনেতা, ফরাসী-প্রধান কুইবেক রাজ্যে প্রবেশ করে তাদের ফরাসী গোঁড়াবাদের সৌরভে মোহিত হয়ে Vive Le Québec Libre-বাদী কুইবেক দীর্ঘজীবী হোক—পথে পথে

কুইবেকের সমবেত ফরাসী জনতাকে অভিনন্দন জানাতে সক্ষম করেন। কুইবেক ফরাসী প্রধান অঞ্চল এবং কানাডা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সহজ প্রবণতা দীর্ঘকাল যাবৎ কুইবেক-বাসী ফরাসীরা পোষণ করে এসেছেন। সেই স্বাভাবিকভাবে উন্মাদনার আবেদন জাগিয়ে কার্যত কানাডার সার্বভৌমত্ব খর্ব করতে ছ গল অগ্রসর হলেন। ছ গলের পক্ষে কানাডা সরকারের আতিথেয় প্রতি এই অশোভনীয় হঠকারিতা বিশ্বাসঘাতককারই তুল্য। সেই কারণে কানাডা সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছ গলকে প্রকাশ্যভাবে তীব্র ভৎসনা করে কানাডা থেকে গত ২৬ শে জুলাই বিদায় দিতে বাধ্য হল। শুধু তাই নয় ছ গলের নিজস্ব ক্যাবিনেটও তার এই আচরণের ক্ষমতা তীব্র তিরস্কার করেছেন। ছ গলের আমেরিকা বিরোধ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। একদিকে ছ গলের উগ্র ফরাসী জাতীয়তাবোধ অপরদিকে উত্তর আটলান্টিক এলাকায় আমেরিকাকে আঘাত করবার উদ্দেশ্য হয়তো বা ছ গলের বুদ্ধিবংশের কারণ হয়ে থাকবে। কানাডার সঙ্গে আমেরিকার বিশেষ সম্পর্কের স্বয়ং যদি ছিন্ন হয়, কানাডার আমেরিকা-নিরপেক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সঙ্গে আমেরিকার শক্তির উত্তর আটলান্টিকে কিছুটা খর্ব হবে - ছ গলের আমেরিকা-বিষয়ে এই যুক্তির রক্ত পথে কাজ করে কুইবেকই এই যুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্ররূপে বেছে নিতে পারে। ছ গলের আচরণ ফরাসী সরকারের এবং ফরাসী অধিবাসীদের মাথা হেঁট করেছে। স্বথের কথা ছ গলের ক্যাবিনেট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার আচরণের নিন্দা করবার সাহস দেখিয়েছে।

ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা নীতির পরিবর্তন

গত ২৭ শে জুলাই ২৯৭-২৩০ ভোট ব্রিটেনের সর্বশেষ প্রতিরক্ষানীতি পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে। স্বয়ং-এর পূর্বাঞ্চল থেকে ব্রিটিশ সামরিক প্রতিষ্ঠান গুলিকে গুলিয়ে আনবার কথা গত কয়েক বছর যাবৎই আলোচিত হয়ে

এসেছে। শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসীন হবার পর এই সমস্যাটি বাস্তব রূপ নিয়েছিলো। এবার সে প্রস্তাব পরিণতি পেলো।

স্থির হয়েছে আট বছরের মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সকল সামরিক ঘাঁটি থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অপসারিত হবে। সমস্ত দশকের গোড়ার দিকে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার বাহিনী শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পাবে এবং সকল সেনাবাহিনীর এক-পঞ্চমাংশ হ্রাস করা হবে। ব্রিটেন দীর্ঘকাল স্বয়ং-এর পূর্বে খবরদারী করে দ্বিতীয় যুদ্ধের পর হতবল হয়েও সাম্রাজ্যের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। তা ছাড়া, দেশেও পর পর ব্রিটিশ সরকারের প্রবল রাজনৈতিক চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছে; শ্রমিক দলের অহত্বরে এই মুতন নীতিও সর্বজনগ্রাহ্য হয় নাই। যারা গাঁড়া বামপন্থী তারা আরও হ্রাসের পক্ষপাতী ছিল। এই কারণে ভোটের সময় অনেক সদস্য হাজিরও থাকেন নাই। ব্রিটেনের পক্ষে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই স্বয়ং-এর পূর্বে সামরিক ঠাঁট বজায় রাখা দুর্বল হয়ে উঠেছিল এবং ক্ষমতার মোহমুক্ত হয়ে পুরাতন ঐশ্বর্যের ঘাঁটিগুলি পরিত্যাগে মানসিক প্রতিবন্ধকতাও ছিল। উইলসন সরকার মোহমুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জাতির তরুণদের এবং ভবিষ্যৎবংশধরদের ধন্যবাদার্থী হয়েছেন। তবুও আরও দ্রুত গুলিয়ে আনবার ক্ষমতা প্রস্তুত, বাস্তব দিক থেকে সিদ্ধান্তের ঐকান্তিকতা প্রমাণ করতে পারতেন। এই ক্ষণ দিয়ে উইলসনের বিরোধী রক্ষণশীলরা প্রশ্ন তুলেছিলেন যদি সমস্ত দশকের মধ্য পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত থাকে তাহলে শ্রমিক সরকার কি করবেন। এই প্রশ্নের জবাবে উইলসন খোলা-খুলিই বলেছেন অভিজ্ঞতার দেখা গেছে বিলম্বেই জটিলতার জট বৃদ্ধি পায় : We intend to withdraw by the middle of 1970's and I would have thought that long experience has shown that to delay

a withdrawal too long is the very way of provoking instability in an area."

কিন্তু বুটেন যেখানে এখনই বন্ধন মুক্ত হতে পারে সেখানে জটিলতা জিইয়ে রেখে জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে কেন? এডেন-ইয়েমেনের পরিস্থিতি সম্পর্কে এ-কথা বলা যায়। সদিচ্ছা প্রকাশ করেই উইলসন সরকারের কর্তব্য সমাধা হয় নাই। সদিচ্ছার পরীক্ষা হবে আন্ত প্রয়োগের কঠি পাথরে।

ভিয়েৎনাম-এর আর এক পর্যায়

গত ৩০ শে জুলাই নর্থ ক্যারোলিনার গ্রীনবোরাতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ওয়ার্ল্ড ফ্রেণ্ডশিপ কনফারেন্সে প্রথম ভাষণে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাট সরাসরি ঘোষণা করেছেন ভিয়েৎনামের যুদ্ধ কম্যুনিষ্টদের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ নয়। সকল প্রকার বৈদেশিক শক্তি, বিশেষভাবে মার্কিনী শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ। যতদিন পর্যন্ত না আমেরিকা ও তার মিত্রপক্ষ এই সত্য স্বীকার করবে, ততদিন এই যুদ্ধ থামবে না। এই যুদ্ধকে আমেরিকা স্বাধীন দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে কম্যুনিষ্ট কবলিত করবার জন্য উত্তর ভিয়েৎনাম এবং ভিয়েৎকং বা জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সমবেত যুদ্ধ বলে এ. বা. বং চিহ্নিত করে এসেছে। উ থাট ভিয়েৎনাম যুদ্ধের প্রকৃতি নির্ণয় করে যে ঘোষণা করেছেন। তা আমেরিকার ভিয়েৎনাম যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে গোড়ায় আঘাত করেছে। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের প্রকৃতি নির্ণয়ে মতভেদ রয়েছে। গোড়ায়, অর্থাৎ ১৯৫৫-এর জেনেভা চুক্তির পূর্বে করাসী প্রভুত্বের অবসান ঘটাবার জন্য ভিয়েৎনামের জাতীয়তাবাদী সকলেই একত্র সংগ্রাম করেছে। কিন্তু জেনেভা বৈঠকে পরস্পরের সম্মতিক্রমে ভিয়েৎনাম বিভক্ত হবার পর উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পৃথক রাষ্ট্র সত্তা স্বীকৃত হলে পরিস্থিতির প্রকৃতি পরিবর্তন হয়। তা যদি না হতো উত্তর ভিয়েৎনাম

থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে গোপন অমুপ্রবেশের কিম্বা দক্ষিণে উত্তর ভিয়েৎনামের সমর্থক ভিয়েৎকং-এর উদ্ভব হতো না।

আমেরিকার নির্বাচন বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে বিশ্বের জনমতের দাবীর নিকট আমেরিকা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে ৩৫ দিন বোমাবর্ষণে বিরতি দিয়েছিল। সে সময় স্থানীয় যদি চীন-নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে সাহসে পড়ত তবে এগিয়ে আসতো, আর একটি জেনেভা বৈঠকের মধ্য দিয়ে ভিয়েৎনামবাসীরা তাদের সঙ্কটের মীমাংসা করে নিতে পারতো এবং আমেরিকাকেও তল্লিতল্লা গুটিয়ে ভিয়েৎনাম ছেড়ে যেতে হতো। কিন্তু চীন উত্তর ভিয়েৎনামকে সে সুযোগ দেয় নাই। পরবর্তীকালে রুমানিয়াতে মার্কিন-চীন বৈঠক হয়েছে, পদার অস্তরালে গোভিয়ের্ট রুশ মীমাংসার চেষ্টা করেছে, কিন্তু চীনের অসম্মতির ফলে স্থানীয়-এর পক্ষে কোনো মীমাংসার আলোচনায় এগিয়ে আসা সম্ভব হয় নাই। গত ২রা আগষ্ট দমদম বিমান ঝাঁটিতে মালয়েই-এর রাষ্ট্রপতি ডঃ হেট্টিংস বান্দাও বলেছেন ভিয়েৎনাম বিভাগে হো চি মিন সম্মতি দিয়ে পরে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে গোপন অমুপ্রবেশকারী পাঠাচ্ছেন কেন?

গত ৩০ শে জুলাই আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব ডীন রাঙ্কের কথায় জানা যায় গ্রানবোরাতে কোসিজিন-জনসনের সাম্প্রতিক বৈঠকে কোসিজিন বলেছিলেন আমেরিকা বোমাবর্ষণ বন্ধ করলে কি ফল হতে পারে সেজন্য অপেক্ষা না করে আমেরিকার কর্তব্য ছিল কোসিজিনের কথার উপর নির্ভর করে অবিলম্বে বোমাবর্ষণ বন্ধ করা। আমেরিকা উত্তরোত্তর বোমাবর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে, খালি স্থানীয়ের সামরিক লক্ষ্যগুলিকে বোমাবর্ষণে বিরুদ্ধ করেছে, চীন-উত্তর ভিয়েৎনামের রেলপথ সংযোগকারী সেতু ধ্বংস করেছে, চীনের সীমান্তবর্তী এলাকাতে বোমা বর্ষণ করেছে কিন্তু চীনকে না আলোচনা বৈঠকে বসাতে পেরেছে, না যুদ্ধে টেনে আনতে পেরেছে। এদিকে আমেরিকা ভিয়েৎনামে পাঁচ

লক্ষের উপর মার্কিনী সৈন্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রচুর অর্থ ব্যয়ের ঝুঁকি নিয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে ভিয়েতনামে যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমেরিকার সমস্ত নীতিই ব্যর্থ হয়েছে। এ-যুদ্ধের সাময়িক সিদ্ধান্তের দিকে আরও অগ্রসর হলে আমেরিকা অনিবার্যভাবে বিশ্বযুদ্ধ থেকে আনবে। সুত্তরাং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দিকে আমেরিকাকে যেতেই হবে—স্থানবের নীরবতা সত্ত্বেও। তাই আমেরিকার সামনে কোসিজিনের কথা মেনে নিয়ে বোমাবর্ষণে বিরতি দান, আমেরিকার নৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করে বিফল হলে আমেরিকা নৈতিক সমর্থন লাভের সুবিধা রচনা করবে। অস্ত্রাধা নয়। সোভিয়েট ক্রমের পক্ষেও জেনেতা বৈঠক আহ্বানের দায়িত্ব রয়ে গেছে। সে-পক্ষেও চীন অস্ত্রায়। কারণ চীন নিজেও সম্মত নয়, এবং উত্তর ভিয়েতনামকে সম্মতি দেবার স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বহুমুখী জটিলতাকে উপেক্ষা করে উৎখাট-এর সরলীকরণ, সমস্তা সমাধানে সহায়ক হবে না।

১৫-৮-৬৭

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly
Founded in 1981

Advertisement Rate Schedule

Current from April, 1986

Ordinary

Full Page :	Rs 100.00
Half Page :	Rs 55.00
Quarter Page :	Rs 30.00

Cover Page

Second Cover :	Rs 175.00
Third Cover :	Rs 200.00
Fourth Cover :	Rs 350.00

For Special Position contact Advt. Manager
Jayasree.

Advertising Space 20.50m x 15.24Cm

(8" x 6")

Contact

Manager, Jayasree

809, Ganguli Bagan,

Calcutta—47

Phone : 46-4116

"The first lesson that we must learn is of self-help and self-reliance. If we assimilate this lesson, we shall at once free ourselves from the disastrous dependence upon the foreign countries and ultimate bankruptcy. This is not said in arrogance, but as a matter of fact."

M.K. GANDHI

Indian consultants have the expertise you need.

IPL/16/67

রবীন্দ্রপরিচয় প্রকৃষ্টমাল্য

আমাদের গুরুদেব ॥ শ্রীস্বধীরঞ্জন দাস

রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্দ্র শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে সঙ্গম আলোচনা। ৩৫০

আমাদের শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীস্বধীরঞ্জন দাস

সরল স্বচ্ছ সপ্রসঙ্গ এবং মাঝে মাঝে মৃদু কৌতুকের ছোপ দেওয়া শান্তিনিকেতনের কাহিনী। ৫০০

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীরানী চন্দ

জীবনের শেষ সাত বৎসর আলাপ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে সব কথাবার্তা-আলোচনাদি করেছেন তার আংশিক সংকলন। ৩৫০

গুরুদেব ॥ শ্রীরানী চন্দ

রবীন্দ্রজীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী। ৫০০

নির্বাণ ॥ শ্রীপ্রতিমা দেবী

কবিজীবনের সর্বশেষ অধ্যায়টি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ৩০০

নৃত্য ॥ শ্রীপ্রতিমা দেবী

নৃত্যরস, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য, চিত্রাঙ্গনা ও চণ্ডালিকা সম্বন্ধে অধ্যয়ন আলোচনা। ৩০০

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীঅমিয়কুমার সেন

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের ষাটটি রূপটি ব্যক্ত হয়েছে এই গ্রন্থে। ৫০০

মহিলাদের স্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীঅমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাচীন মহিলাদের বিচিত্র স্থিতিকথা। ৬৫০

রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বভারতীর প্রকাজলি ॥ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন-সম্পাদিত

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপক ও কর্মীদের রচিত রচনার সংগ্রহ। ১২০০

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীপ্রমথনাথ বিনী

স্মরণ গড়ে এবং পরিচ্ছন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের উপভোগ্য বিবরণ। ৫০০

রবীন্দ্রসংগীত ॥ শ্রীশান্তিদেব বৌধ

নুতন পরিবর্ধিত সংস্করণ। ৭০০

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম ॥ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

চলিত কথায় থাকে গান-ভাড়া বলা হয় দুইসুতসহ তার আলোচনা। ১০০

রবীন্দ্রস্থিতি ॥ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

সংগীত কাব্য নাট্য ও পারিবারিক স্থিতির কাহিনী। ৩৫০

শান্তিনিকেতন-স্থিতি ॥ উইলিয়াম পিয়রসন

শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ের আদিযুগের বিদেশী শিক্ষাত্রতীর বিচিত্র স্থিতি-কথা। শ্রীঅমিয়কুমার সেন-অনূদিত ও শ্রীমুকুলচন্দ্র দে-অঙ্কিত চিত্রভূষিত। ২৫০

(বিশ্বভারতী)

খান কয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি.এ

মূললেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম এ

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)

৬.০০

ব্যামামে বাঙালী

২.০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম

৫.০০

বীরছে বাঙালী

১.৫০

ভারত-আত্মার বাণী

৫.০০

বিস্তানে বাঙালী

৪.০০

Soul of India Speaks

5.00

বাংলার স্বর্ষ

৬.০০

মর্মবাণী

১.২৫

বাংলার বিদ্রুঘী

২.০০

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা

১.৫০

বাংলার মনীষী

২.০০

শ্রীশ্রীচণ্ডী

২.০০

রাজর্ষি রামমোহন

১.৫০

মুগাচার্য বিবেকানন্দ

১.৫০

আচার্য জগদীশচন্দ্র

১.৫০

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

২.৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ; বি. টি.

রবীন্দ্রনাথ

১.২৫

বিজ্ঞানাগর

২.২৫

জীবন গড়া

১.৭৫

চুপচুপ করমানাথ বিশ্বাসের

২.৫০

ব্যবহারিক শব্দকোষ

১০.০০

ভরুণ তুর্কী

৩.২৫

(প্রয়োগমূলক অস্তিনব বাংলা অভিধান ৬৪ হাজার

ভরুণের আত্মিকতা ১ম, ২য় খণ্ড

১.৭৫

শব্দ সম্বলিত বহুল পরিবর্তিত সংস্করণ)

বেদুইনের দেশে.

১.৭৫

Students' Own Dictionary

(প্রয়োগমূলক ইংবেঙ্গী-বাংলা আধুনিক অভিধান) ১.৫০

নিবেদিতা

৫.৫০

শ্রীশ্রীমোকনাথ ব্রহ্মচারী

৩.৫০

বিজ্ঞানাগর

৭.০০

সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী

৩.৫০

লিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস

৫.০০

জেলে ত্রিণ বছর ও ভারতের বিপ্লব-সংগ্রাম

শিবরামের কিশোর নাটিকা

২.০০

শ্রীজৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ)

৫.০০

আমরনগ্যান নীরম সরকারের

যোগিক নিরম ও ব্যায়ামে রোগ

৩.০০

শরীর ও শক্তি

১.২৫

নিবারণ

৩.০০

সরল যোগ-ব্যায়াম

১.২৫

যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য

১.৪০

নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন

১.২৫

ও সৌন্দর্য

১.৪০

আলনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট

১.৫০

ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন

১.৫০

আলনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট

১.৫০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ কয়ার, কলিকাতা-১২ ও গড়িয়াহাট মার্কেট, বালিগঞ্জ।

9 JUN 1967



মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন!

বাহ্যিক অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম
করেন, মহাভূক্ষরাজ তাঁহাদের পরম
কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-
দায়ক তৈল সর্বপ্রকার স্নান ও
অবসান করে, দেহ ও মনকে
সর্বদা প্রফুল্ল ও কর্মক্ষম রাখে

সাধনার
মহা ভূক্ষরাজ
তৈল



সাম্রাজ্য ঔষধালয়-ভাঙ্গা
সাধনা ঔষধালয় মোড় কলিকাতা-৪৮



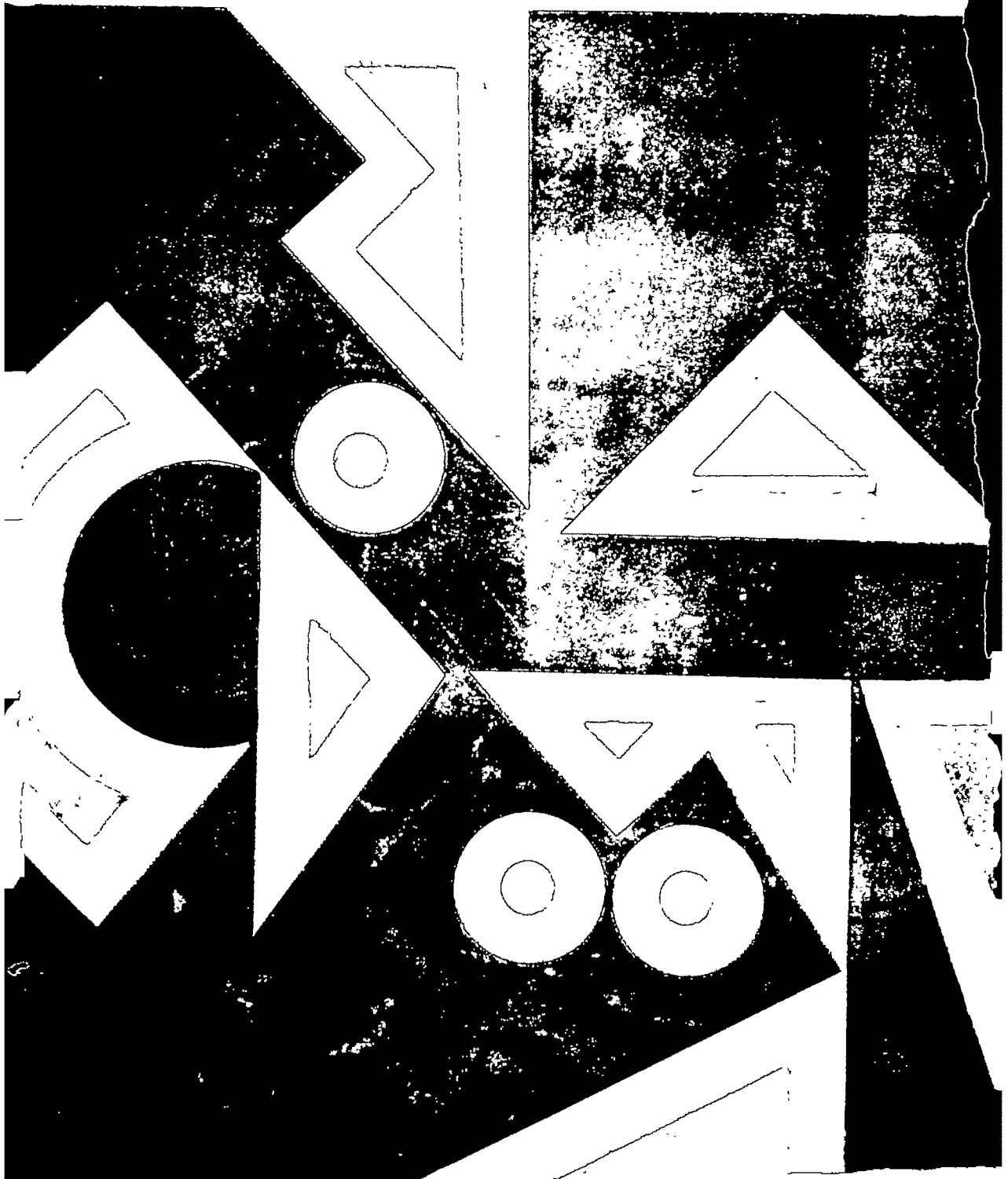
কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) সার্জেন্ট

অধ্যক্ষ প্রিয়োগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
সার্জেন্ট, এম. বি. এস. (লন্ডন) এম. বি. এস. (আমেডিক)
ভারতীয় কলেজের চিকিৎসা শাস্ত্রের স্নাতক

Central Registration No 2870/57 Per Copy R 1'00 With Postage R.1'5P
HADEOFFICE JAYASREE 312 Ganguli Bagan, Naktala Calcutta-47

নিবেদিতা শতবর্ষ সংখ্যা
কাঙ্ক্ষিক ১৩৭৪

সম্প্রাদিত : লীলা বাথ



UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

* * *

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

* * *

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,

159, Churchgate Reclamation,

BOMBAY — 1

দীপ্তি

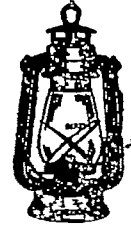
আপনার নিত্য প্রয়োজন

দীপ্তি লম্বন—এর পরিচয় নিশ্চয়মোজন,
এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে
আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর
কম কেরোসিন খরচ।

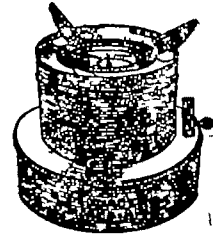
খাস জনতা কেরোসিন কুকার—নিভা
প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ।
এই কেরোসিন ঠোঙ ব্যবহারে কোন
ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে
সুন্দর, খরচে সাশ্রয়। অল্প সময়ে যে
কোন রান্না করা যায়।

‘দীপ্তি’ মার্কা এম্বালেন্সের বাসন—
অল্প বিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর
গুণের ব্যাপ্তি সমাদৃত হচ্ছে।

দি ওরিয়েণ্টাল মোটাল
ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
৩১ ও ৩২ বিপিন বিহারী গান্ধী স্ট্রিট,
কলিকাতা-১২



দীপ্তি লম্বন



খাস জনতা



এম্বালেন্সের বাসন

Kaipens am...

সূচীপত্র

জয়ন্তী : কার্তিক ১৩৭৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৪৫৯
স্বভাষচন্দ্র	পবিত্রকুমার ঘোষ	৪৬৩
নিবেদিতা-স্মরণে (কবিতা)	বনমূল	৪৭১
নিবেদিতা-স্মরণ (কবিতা)	শৌমিকেশ্বর দাশগুপ্ত	৪৭১
নিবেদিতা (কবিতা)	মনীশ ঘটক	৪৭২
নিবেদিতা, স্বপ্ন এবং বাস্তবতা		
(কবিতা) অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত		৪৭০
হে জননী, লোকমাতা		
(কবিতা) নচিকেতা ভরদ্বাজ		৪৭৩
নিবেদিতা লোকমাতা		
(প্রবন্ধ) শঙ্করীপ্রসাদ বসু		৪৭৫
নিবেদিতা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম		
(প্রবন্ধ) প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়		৪৯১
নিবেদিতার সমাজদর্শন		
(প্রবন্ধ) বিমানবিহারী মজুমদার		৪৯৫
নিবেদিতার ভারত চেতনা		
(প্রবন্ধ) দেবদাস জোয়ারদার		৫০১
নিবেদিতা (কবিতা) চিত্রভাস্কর		৫১৫
নিবেদিতা : একটি বেদনার স্মৃতি		
বিজয়কুমার দত্ত		৫১৫
নিবেদিতা (কবিতা) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		৫১৬
ভগিনী নিবেদিতা স্মরণে		
(কবিতা) কালীপদ চক্রবর্তী		৫১৬
নিবেদিতা : স্মরণে		
(কবিতা) শঙ্করানন্দ চট্টোপাধ্যায়		৫১৬
আমেরিকার নিগ্রো আন্দোলনের		
ইতিহাস ও তাৎপর্য		
(প্রবন্ধ : আশ্বিনের পর) অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্ত		৫১৭

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly
Founded in 1981

Advertisement Rate Schedule

Current from April, 1986

Ordinary

Full Page :	Rs 100.00
Half Page :	Rs 55.00
Quarter Page :	Rs 30.00

Cover Page

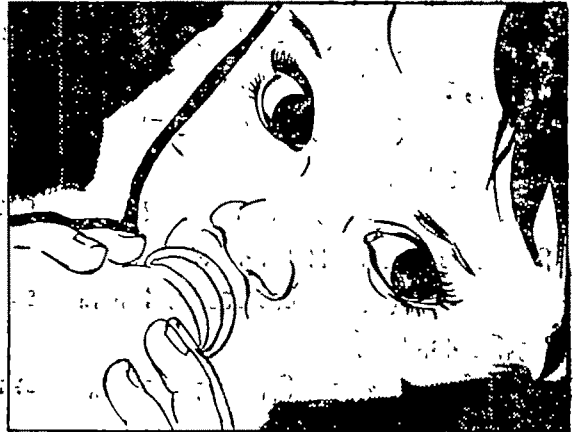
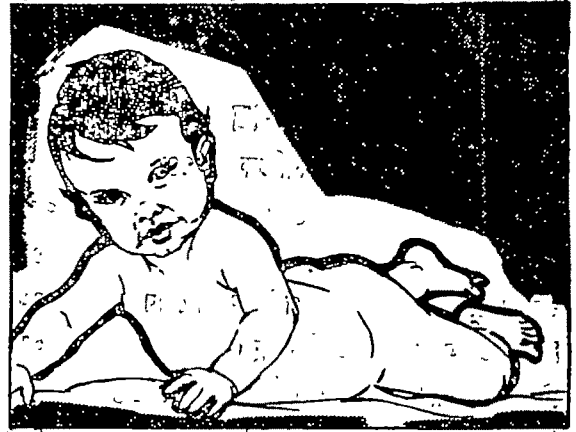
Second Cover :	Rs 175.00
Third Cover :	Rs 200.00
Fourth Cover :	Rs 350.00

For Special Position contact *Advt. Manager*
Jayasree.

Advertising Space 20.5Cm × 15.24Cm
(8" × 6")

Contact

Manager, Jayasree
309, Ganguli Bagan,
Calcutta—47
Phone : 46-4116



শিশুদের আদর্শ পানীয় ও পথ্য
লিলি বার্লি

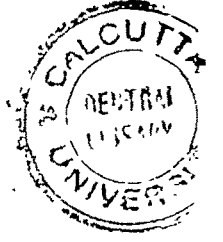
বিজ্ঞান সম্মত
 প্রণালীতে
 প্রস্তুত



সুস্থ, অসুস্থ
 সব অবস্থাতেই
 সমান
 উপকারী

লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

সংস্করণ ১৬৭৪
২৪ সেপ্টেম্বর
নং ২৭/৭/৬৮



ডায়েরী

৩২ বর্ষ • সপ্তম সংখ্যা • কার্তিক ১৩৭৪

সম্পাদকীয়

নিবেদিতা

কোটি কোটি গড়ালিকার মধ্যে এক একটা মানুষ জন্মায় যাকে শতাব্দী শতাব্দী ধরে নুতন করে আবিষ্কার করেও যেন সে চিরবিস্ময় হয়ে থাকে। এমনি একটা মানুষ নিবেদিতা। যার জীবনী আলোচনা করে নিজেদের ভবিষ্যতে প্রত্যয়হীন মানুষ যুগে যুগে ভাববে—এই কি পূর্ণ মানুষের রূপ? তরুণ বয়সে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে কোন পার্শ্বিক কাম্যের অমূলস্বাদে নয়, পূর্ণতার আনন্দ লাভের আশায় ভারতবর্ষে এসে তাঁর শত অসম্পূর্ণতা, অ-সম্ভাব্য সত্ত্বাও এদেশকে ভালবেসেছিল এমন এক ভালবাসায় যেমন করে একমাত্র মা ভালবাসতে পারেন সন্তানকে, এবং সেই ভালবাসার আলোয় হাজারো বাহ্যিক অপূর্ণতার আবরণে আবৃত শাখত সত্যকে দেখবার বুঝবার, এক বিস্ময়কর দৃষ্টি পেয়েছিলেন। শুরু বিবেকানন্দ বলেছিলেন যদি “ভারতবর্ষকে সেবা করতে চাও তবে সে যেমন আছে সেই ভাবে তাকে ভালবাসতে হবে নিজের মনগড়া ভারতবর্ষকে নয়”। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিপুল ভৌগোলিক ব্যবধান, সামাজিক ও মানবীয় মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের প্রচুর বিভিন্নতা সত্ত্বেও শুরুর সে নির্দেশ আশ্চর্য ভাবে সম্ভব ও সফল করেছিলেন নিবেদিতা নিজের জীবনে। ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন এমন চোখ দিয়ে যে আমাদের মনে হয়, তাঁর চোখে অপূর্ণতাগুলি বড় বেশী তুচ্ছ হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু একথা দৃঢ় ভাবে বলা যায় ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত সত্যটিকে তিনি নিতুর্ল ভাবে ধরেছিলেন, যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি জড় অদৃষ্টবাদ ভিত্তিক নয়—কিন্তু স্বীয় কর্মের ফলাফলের দ্বারা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় অতএব বলিষ্ঠ ও নিকাম কর্মবাদ ও পূর্ণ আধ্যাত্ম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত এই প্রশান্ত আত্মবিশ্বাস ও বলিষ্ঠ আত্মনিবেদন তাঁর সত্যসন্ধানী চোখে নিতুর্ল ভাবে ধরা দিয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতার এই প্রশান্ত সংযম ও শক্তি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ তাঁর মধ্যে আমরা একটি পূর্ণ মানুষের পরিচয় পাই, মানুষের বিভিন্ন চাহিদাকে, যিনি তাঁর শুরুর মতই স্বীকার করেছেন। যার নিকট আধ্যাত্ম অমূলস্বাদ ও মানব সেবার সঙ্গে বিপ্লববাদ ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরস্পর-বিরোধী নয়।

রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর প্রতি কর্তব্য করেনি এবং সঙ্গী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে এ সিদ্ধান্তে আসতে আমরা আনন্দ অমুভব করি না। আমাদের বক্তব্য সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গৃহীত আদর্শ, লক্ষ্যপথ বিভিন্ন হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং এদের কাউকে ছোট করার কোনো প্রয়োজন নেই অপরকে বড় করার জন্য।

এই সংখ্যার বিভিন্ন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও কবিরা এই সত্যকে বিভিন্ন দিক দিয়ে মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করেছেন যা থেকে পাঠকেরা আনন্দ পাবেন ও উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। বর্তমান ভারতবর্ষে মাতৃভূমির অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধা, তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যয়হীনতা, ভারতীয় সভ্যতার অবদান সম্বন্ধে অস্বস্ততা, অবিশ্বাস ও উপেক্ষা—বিকৃত প্রগতির নামান্তর—অল্প দেশের অল্প অনুকরণে মশগুল বর্তমান ভারতের তরুণ সমাজ আজ যে পথে চলেছে তা থেকে তাদের প্রত্যাবর্তন অবশ্যসম্ভাবী, কিন্তু নিজেদের প্রচুর ক্ষতি সাধনের পর। আমরা আমাদের পথ চলবার প্রচুর প্রেরণা পাই নিবেদিতার জীবন ও ভারতবর্ষের উপর তাঁর বিশ্বাস থেকে।

এই মহীয়সী নারীকে জানাই আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

লোহিয়ার লোকান্তর

ভারতবর্ষের সমাজবাদী আন্দোলনের অত্যন্ত নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া ৫৭ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। প্রবাসে ছাড়াবস্থায় জেনেভায় ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে একটি মহারাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখে ডঃ লোহিয়ার মনের প্রতিক্রিয়া যেদিন একটি মাত্র নির্দাম্যুচক ‘হিন্দু হিন্দু’ শব্দকে অবলম্বন করে মুখর হয়ে ওঠার ফলে তাঁকে সেই বিশ্বসভার দর্শক গ্যালারী থেকে নিষ্কাশিত হতে হয়েছিল, সেদিন থেকেই সারা জীবন অস্ত্রায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বিতা আবেগ নিয়ে সংগ্রামের পথ ডঃ লোহিয়ার জন্ত চিহ্নিত হয়েছিল। প্রতিকূলতার নির্মম, সমালোচনায় তীক্ষ্ণ শ্লেষ-কটকিত, প্রতিবাদে অনমনীয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিন্তু অন্তরঙ্গ মহলে ডঃ লোহিয়া ছিলেন অমূল্য আবেগের মাধুর্যে সিক্ত। তাই ডঃ লোহিয়ার চারপাশে সহকর্মী ও বন্ধুদের একটি অমূল্য চক্র, লোহিয়া-চরিত্রের প্রবল স্ববিরোধিতাও তাঁর প্রতি যাদের আকর্ষণ অমূল্য রেখেছিল। এই স্ববিরোধিতার মধ্যে গণতন্ত্রে উদ্যত প্রাণ হয়েও গণতান্ত্রিক সমালোচনার সম্মুখে লোহিয়া ছিলেন পরম অসহিষ্ণু।

মৌলিক চিন্তার ক্ষেত্রে লোহিয়ার অনস্বীকার্য অবদান রয়েছে। বস্তুতপক্ষে লোহিয়ার রাজনৈতিক চিন্তা দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে সোভিয়েত রুশ এবং ইল-মার্কিন নিরপেক্ষ

একটি তৃতীয় শিবিরের অবস্থান ও তার আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে সচেতনতা প্রথম সৃষ্টি করেছিল ভারতবর্ষে। বলতে গেলে এই তৃতীয় শিবিরের ধারণাই নেহেরুর নন-এলাইনমেন্ট নীতির জনক, যদিও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই নন-এলাইনমেন্ট নীতি বহুদলীয়ভাবে পরিণত হয়েছে।

নেহেরুর আওতায় বর্ধিত হয়েও নেহেরুর দ্বন্দ্বিতা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে বিরোধিতা ডঃ লোহিয়ার অত্যন্ত রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল। ডঃ লোহিয়ার-নেহেরু-বিরোধ কখনও কখনও নেহেরু-বিষয়ের আবিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেও, নেহেরুর স্ততিময় ভারতবর্ষে নেহেরুর পৌষকতায় বর্ধিত হয়েও, দুর্জয়-সাহসে জাতির স্বার্থ-বিরোধী নেহেরু-নীতির উদ্ঘাটনে, ডঃ লোহিয়া জাতির প্রতি প্রবল কর্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর ‘Guilty Men of India Partition’ নামক পুস্তকটি এই কর্তব্যনিষ্ঠার অমান স্বাক্ষর বহন করেছে। দেশ-বিভাগের সময় তার প্রবল বিরোধিতা না করে এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অত্যাধিকার বহু মতামতের তাৎপর্য সময়মত উপলব্ধি না করে যে গুরুতর ভুল করেছেন সে-সম্পর্কে এই পুস্তকে অকপট স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে ডঃ লোহিয়া প্রকৃত সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। লোহিয়া-চরিত্রের এ-ও এক অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য।

সাম্প্রতিক কালে ডঃ লোহিয়ার কম্যুনিষ্ট-সহযোগী রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের গুরুতর মতভেদ থাকলেও,

জাতির এক সঙ্কটপূর্ণ সময়ে ডঃ লোহিয়ার মত নির্ভীক জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী নেতার লোকান্তর জাতির পক্ষে একটি গভীর শোকাবহ ঘটনা। ডঃ লোহিয়ার মত বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক নেতার লোকান্তর যে শূন্যতা রেখে গেল তা অপূরণীয়ই থেকে যাবে। ডঃ লোহিয়ার স্মৃতির প্রতি আমরা অন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং আশা করছি ভারতবর্ষের সমাজবাদী শক্তিসমূহ পরস্পরের সহযোগে জাতির সঙ্কট উত্তরণের জন্য অগ্রণী হয়ে লোকান্তরিত নেতার প্রতি তাদের বর্ধাশ্রদ্ধাভরণ করবেন।

পশ্চিম বঙ্গের সঙ্কট

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার জন্মলগ্ন থেকে যে অন্তর্ঘর্ষের ভূমিকা রচিত হয়েছিল, গত ২রা অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত পদত্যাগে তা পরিণতি পেতে চলেছিল। চৌদ্দ পাটির মন্বনে যে আঠার লক্ষ কর্মসূচি উৎসারিত হয়ে যুক্তফ্রন্টের নিয়ামক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার রূপায়ন নিয়ম না হয়ে ক্রমে ক্রমে ব্যতিক্রমে দাঁড়িয়ে যায় এবং মুখ্যমন্ত্রীর হৃদতার অভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে অচলাবস্থা দেখা দেয়। শিল্পে অশান্তি কলকারখানা বন্ধ করতে সহায়তা করেছে, নুতন লব্ধিতে ছেদ টেনেছে, পশ্চিম বঙ্গ থেকে কয়েক শ' কোটি টাকার মূলধনও অস্বাভাবিক রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে, বেকারের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, দ্রব্যমূল্য ক্রমশ উর্ধ্বগামী, প্রকিওরমেন্ট ব্যর্থ এবং পরিণামে রেশন হ্রাস, মডিফায়েড এলাকায় রেশনের অন্তর্ধান এবং চালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, রাজ্যের আর হ্রাস, বাজেটের ঘাটতিবৃদ্ধি এবং সর্বোপরি আইন-শৃঙ্খলার সঙ্কটময় অবনতি যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ঘর্ষে ইন্ধন জুগিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দুর্বলতা এই অন্তর্ঘর্ষ বৃদ্ধিতে নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী নিজের প্রশাসনিক দুর্বলতা ঢাকবার জন্য আর এক রাজনৈতিক দুর্বলতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শের পর তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত এবং

কংগ্রেসের সমর্থনে সংখ্যালঘু মন্ত্রীসভা গঠনের গোপন পরিকল্পনা, গণতন্ত্রের বিচারে একটি গহিত পদক্ষেপ। পদত্যাগের উদ্যোগ প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর অকপট স্বীকৃতি থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে বাম কম্যুনিষ্টদের অসংযত কার্যকলাপের পরিণতিতেই মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করেছিলেন এবং অ-গণতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতিতে তা কাজে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণ ক্রমশ অযোগ্য এবং তাঁর প্রতি জাতীয়তাবাদীদের আস্থাও বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে।

কম্যুনিষ্টদের কর্মকৌশল এবং প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে কোনো বর্ধাশ্রয় জাতীয়তাবাদীরই ভুল ধারণার অবকাশ নাই। জাতীয় মানসে অস্থিরতা, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনিশ্চিতি ও বিপর্যয় সৃষ্টিই তাদের মুখ্য কলাকৌশল। যেখানে অপরদেশের একটি কম্যুনিষ্ট সামরিক বাহিনী দেশের সীমান্তে আঘাতের জন্য উদ্ভত হয়ে আছে, সেখানকার কম্যুনিষ্টরা তাদের বাস্তব সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে ক্রমশঃ দখলে উঠোগী হবে না; এমন মূর্খ কম্যুনিষ্টরা নয়। কিন্তু বাংলা দেশের জাতীয়তাবাদীরা কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা পোষণ করে রাজনৈতিক অদুরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। অজয়বাবু তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সরকারী আওতার আশ্রয়ে বাম কম্যুনিষ্টরা তাদের প্রভাব বিস্তারে হিংসা-অহিংসা এবং গণতান্ত্রিক ও ক্যাশিষ্ট পন্থা নির্বিশেষে রাজনীতির সংগ্রামভূমি রচনা করবে তাতে বিশ্বাসের কি আছে? মুখ্যমন্ত্রী বিলম্বে হলেও যদি বুঝে থাকেন বাম কম্যুনিষ্টরা যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালনার পথে প্রধান অন্তরায়, তার একমাত্র কর্তব্য ছিল জনসমক্ষে সকল বিষয় উপস্থাপিত করে, যুক্তফ্রন্ট পরিচালনার তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করা এবং কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী না হয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করা। মুখ্যমন্ত্রী সে পথে না গিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি যেমন আশ্রয় হেনেছেন তেমনি তিনি যে অকুণ্ঠ জনসমর্থন পেয়েছিলেন

তাকেও ধূলুষ্ঠিত করেছেন। এ-ছাড়া, যাদের প্রতি তাঁর অভিযোগ, ২রা অক্টোবরের নাটকীয় অভিযানে সেই গণতন্ত্র-বিরোধী শক্তিকেই যুক্তফ্রন্টের আড়ালে আরও সংহত হবার সুযোগ দিয়েছেন। হয় কঠোর হস্তে আইনশৃঙ্খলা প্রয়োগে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টিকারীদের দমন করা উচিত, নয়তো জনসাধারণের দরবারে সঙ্কটের স্বরূপ উন্মোচন করে কর্তব্য স্থির করতে হবে। মাঝামাঝি কোন পথ নেই। মুখ্যমন্ত্রী এ-কাজে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে জনস্বার্থের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছেন। জাতীয়তাবাদীদের নিঃশর্ত সংহতি এই সঙ্কট-মোচনের এক মাত্র পন্থা।

অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভার টানা পোড়েন

উত্তর-প্রদেশের অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা এক গভীর সঙ্কট থেকে আপাতত নিষ্কৃতি পেয়েছে। গত ১৫ই অক্টোবর সংযুক্ত-সোশালিষ্ট-দলের সাত জন ও কম্যুনিষ্ট পার্টির এক জন মন্ত্রী ভূমিরাজস্ব সংস্কারের দাবীতে পদত্যাগ করে। গত জুলাই মাসে মুখ্যমন্ত্রী আগামী রবি শস্য থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমিরাজস্ব মকুবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সংযুক্ত সোশালিষ্ট দলের পক্ষ থেকে আগামী খরিফ শস্য থেকেই এই মকুবের দাবী করা হয়। তাদের দাবী ছিল ২ টাকা অবধি কিম্বা এক একর জমির ওপর যারা ভূমি রাজস্ব দেয়, তাদের এই খাজনা মকুব করে দিতে হবে। প্রশাসনিক কারণে মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিং এ-প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং পদত্যাগী মন্ত্রীদের বর্জনেও দৃঢ় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে ২ টাকা দেয় রাজস্ব যাদের, রবি শস্য থেকে তাদের রাজস্ব মকুব করা হবে এবং এইখাতে খরিফের সময়কার আদায়ী রাজস্ব এবং সোয়া ছয় একর জমির রাজস্বের অর্ধেক পরিমাণ অর্থ দিয়ে একটি কৃষি ঋণ তহবিল গঠিত হবে অল্পজোড়ের মালিকদের সাহায্যের জন্য। অতঃপর পদত্যাগী মন্ত্রীরা তাদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেছেন। অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলি নীতির বৈপরীত্যের টানা পোড়েনে

পশ্চিম বাংলায় ও কেরলায় জর্জরিত। ভূমি-রাজস্ব মকুবের প্রক্ষেপ এক মত হয়েও উত্তর প্রদেশ মন্ত্রীসভা প্রয়োগের প্রক্ষেপে ভাঙনের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু নীতি এবং প্রয়োগ ছাড়াও ব্যক্তিগত নেতৃত্বের প্রক্ষেপ অকংগ্রেসী সরকারের বিপদ দেখা দিয়েছে হরিমানায়। পাক্সাবের এই বিপদ প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে, নীতির স্বাভাব্য ব্যতিরেকে নিছক কংগ্রেস বিরোধিতা কোনো সরকারকে যে স্থায়িত্ব দিতে পারে না অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলির পৌনঃপুনিক সঙ্কট সেই ইঙ্গিতই বহন করছে।

কংগ্রেসের এড্ হক

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের কার্যকলাপ পরিদর্শন করতে এসে শ্রীমঙ্গলজিলাল নন্দ, সেক্টেবরের শেষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শক্রমে অকস্মাৎ ৬২ জনের এড্ হক কমিটি ঘোষণা করে, পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলির প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিয়ে গেলেন এবং শ্রীকামরাজ সেই সুপারিশ গ্রহণে গড়িমসি করার পর নন্দ-প্রস্তাব কার্যত বাতিল করে মাত্র সাত জনের এড্ হক কমিটি ঘোষণা করে কংগ্রেসের উচ্চ পর্যায়ে দলাদলির প্রকৃতি ও গভীরতা আর একবার উন্মোচন করেছেন। পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার গতন বছরবার জন্তে যে এড্ হকের উৎপত্তি হয়েছিল, তা মনে করবার সম্ভব কারণ আছে। কিন্তু কার্যত ২রা অক্টোবরের পূর্বে, এড্ হক কমিটি ঘোষণার কামরাজের অক্ষমতা এমনিতেই এড্ হকের গুরুত্ব খর্ব করে দেয়, তার ওপর এড্ হকের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, এই কমিটিকে প্রহসনে পরিণত করে। নূতন রক্ত সঞ্চালনের আপাত-উদ্দেশ্য নিয়ে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের যারা এড্ হক গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তাদের ছলনা যেমন ধরা পড়ে গেছে, এড্ হক বিরোধীদের গোষ্ঠি-আধিপত্যের রাজনীতিও তেমনি আর একবার অনাবৃত হয়েছে এই এড্ হক রাজনীতির মধ্য দিয়ে

(শেষাংশ ৫১০ পৃষ্ঠায়)

সার্বিক রচনা

দ্বিতীয় অধ্যায় : পঞ্চম কিস্তি

বাংলায় সত্যগ্রহ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে একটা পরিবর্তনের হাওয়া এসেছিল এবং ইংলণ্ডের পক্ষে সেটা হয়ে উঠেছিল চিন্তার কারণ। ইংরেজকে তার নিজের দেশেও বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে তার বিবাদ তখনো চলছে। যুদ্ধক্ষেত্রে ছয়লক্ষ আটশ হাজার সমর্থ নাগরিককে বলিদান দিতে হয়েছে এবং তার ফলে যদিও ১৯২১ সাল নাগাদ সেই লোকসংখ্যা নিবারণ হয়ে তার জনসংখ্যা ৪২,৭৬৭,৫৩০ জনে পৌঁছেছে তবু বুদ্ধ ও নারীর সংখ্যাগত অসুপাত অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ইংলণ্ডের শ্রমক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে অশান্তি ও একটি নতুন বিপদ। ইংলণ্ডে যে ট্রেড ইউনিয়নবাদ প্রচলিত ছিল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ধনী ও মালিকশ্রেণীর ইংরেজরা বিশ্ববিস্তৃত সাম্রাজ্য শোষণ করে যে সম্পদ দেশে আনত তার একটা মোটা ভাগ আদায় করা, হোক—ট্রেড ইউনিয়ন অর্থাৎ কালেক্টিভ বার্গেনিং এর মাধ্যমে। কিন্তু এখন ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার করার অর্থাৎ বিপ্লবমুখী করে তোলার একটা প্রচেষ্টা—সে প্রচেষ্টা যত কঠিন ও দুর্বলই হোক—দেখা গিল; অর্থাৎ বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন তার দুয়েকটি আঙ্গুল ইংলণ্ডের শিল্প ও শ্রমক্ষেত্রে প্রসারিত করে দিল। ১৯২১ সালে রাশিয়ার বিপ্লব পৃথিবীর কাঁচিক ২

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার বোম

নানা অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে—এবং ঐ বছরেই প্রকারান্তরে ভারতের, চীনের, ফ্রান্সের ও গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিন তখনো বেঁচে, ট্রটস্কিও ক্ষমতার অসীন। এবং জার্মানি ও যুরোপের আর দুয়েকটি দেশে বিপ্লব ঘটে যাবার একটা সম্ভাবনা তখন নিয়ত বর্তমান। চীনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী এবং জাপান অপরায়েয় হয়েই আছে। ইংলণ্ডের পক্ষে এর কোনোটাই শুভবাহ সংবাদ নয়। চীনের সমস্তা মেটাবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ চীনের ওপর নিজেদের দখল স্থায়ী করতে ওয়াশিংটনে এই সময়ে একটা প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলন হয়েছিল,—আমেরিকা ও ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ড ছিল তার অচ্যুত উদ্যোক্তা। এই সময় চীনের যে সমস্তাটি মুখ্যভাবে দেখা দেয় তাহল চীনকে ঐক্যবদ্ধ ও কেন্দ্রশাসিত করার সমস্তা এবং কিছুটা আধুনিকীকরণের সমস্তা। চীনের উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি অঞ্চলে স্ব স্ব প্রধান প্রেসিডেন্ট দেখা দিতে থাকে, ভাড়াটে সৈন্যদলের সহায়তায় ভূম্যধিকারীদের শাসন প্রবর্তিত হতে থাকে—এবং মধ্যযুগীয় যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাই বহাল থাকে। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থেও এইসব ব্যাপারে পরিবর্তন আনা দরকার হয়ে পড়ে।

চীনে ঐক্যসাধনের প্রক্ষে ইংরেজদের যে মনোভাবই থাকুক, ভারতবর্ষে কিন্তু তারা একটা বিচ্ছেদের পরিকল্পনা

গ্রহণ করে। ভারত ও ব্রহ্মদেশ তখন একত্রিত ছিল— সেই এক্য ভেঙ্গে দিয়ে দুটি স্বতন্ত্র দেশ সৃষ্টি করার কথা ইংরেজ সে সময়ে ভাবছিল। পরবর্তীকালে সেই ভাবনা বাস্তবে রূপ পরিগ্রহও করেছিল। এই একই বিভেদের নীতি তারা অনুসরণ করেছিল আয়ারল্যান্ডের ক্ষেত্রেও। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জকে ডি ভ্যালেরা এক পত্রে লিখেছিলেন : “the British Government and Parliament claim to rule and legislate for Ireland, even to the point of partitioning Irish territory against the will of the Irish people, and killing or casting into prison every Irish citizen refusing allegiance.” (4th Sept, 1921)

দেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশবিভাগ করা— কোনো দেশের অধিকার হারাবার আগে সেই দেশ সম্পর্কে এই নীতি ইংরেজরা বরাবর অনুসরণ করে আসছে। ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রাম যত তীব্র হয়েছে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভারতের ওপরও ঐ একই নীতির প্রয়োগের কথা উত্তরোত্তর ততই চিন্তা করেছে। ১৯৩০ সালের পর তারা ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি ভিন্ন দেশ এক ভারতকে ভেঙে প্রতিষ্ঠা করার কথা যেমন তারা ভেবেছিল ১৯২০ সালের পর তেমনি ভারত ও ব্রহ্মদেশকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন করে দেবার কথাও চিন্তা করেছিল। আর ডি ভ্যালেরার আর একটি কথা— যে আইরিশ নাগরিকই ইংরেজের প্রতি আনুগত্য জানাতে অস্বীকার করে তাকেই হত্যা করা বা জেলে পোরাই ইংরেজ শাসকের নীতি—ভারতের ক্ষেত্রেও সেই একই নীতি তারা প্রয়োগ করেছিল। ১৯২১ সালের ভারত, বিশেষত বাংলা দেশ ইংরেজ শাসকের দমন নীতির পরিচয় নতুন করে পাবার মুখে এসে দাঁড়ায়।

সারা দেশ জুড়ে গ্রেপ্তার পর্ব শুরু হয়ে গেল। বড়-বাজার অঞ্চলে সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া হতে যারা বঙ্গ

বয়কট আন্দোলন চালাচ্ছিল সেই স্বেচ্ছাসেবকরা ক্রমে ক্রমে গ্রেপ্তার হতে লাগল। সর্বভারতীয় নেতারাও বাদ গেলেন না। কলকাতা হতে মাদ্রাজ যাবার পথে মৌলানা মহম্মদ আলি ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ওয়ালটেয়ারে গ্রেপ্তার হলেন। মহাত্মা গান্ধীও মৌলানার সঙ্গে একত্রে ট্রেনে ছিলেন, কিন্তু তাঁকে তখন গ্রেপ্তার করা হয়নি। মহাত্মা এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে জাতির নিকট আবেদন জানিয়ে বললেন : “হৃৎথের কোনো কারণ নেই, বরং আজ আনন্দিত হবার দিন। হরতালের প্রয়োজন নেই। সম্পূর্ণ শান্তি ও স্বৈর বজায় রাখতে হবে। এই গ্রেপ্তার আমাদের স্বরাজ্যলাভের পূর্ব ভূমিকা যাত্র। আমরা যদি অহিংস থাকি, হিন্দু-মুসলমান এক্য বজায় রাখি ও স্বদেশী কর্মসূচী পালন করি তাহলে আমরা স্বরাজ লাভ করব, খিলাফতের প্রতিকার হবে এবং পাঞ্জাবে অসুষ্ঠিত অজ্ঞায়ের (জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের) সুবিচার পাব।” প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময়েই মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ চলছিল। মোপলারা মুসলমান। খিলাফৎ আন্দোলনের প্রচারের ফলে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এত বেড়ে যায় যে তারা একটি মুসলিম রাজ্য স্থাপন কল্পে শস্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও স্থানীয় হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের নরনারী নিবিশেষে হত্যা ও অমার্যমিক অত্যাচার করে। সরকার কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহকে দমন করে। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের মূলে যেমন গান্ধীজীর কথঞ্চিৎ দায়িত্ব ছিল, মোপলা বিদ্রোহের মূলে সবটা দায়িত্ব তাঁর ও আলি ভাভুদয়ের। খিলাফৎ আন্দোলনটি ছিল যেমন অর্থোক্তিক, তেমনি সর্বাংশে সাম্প্রদায়িক। গান্ধীজী সাময়িক রাজনৈতিক লাভের আশায় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে ভারতের বৃহৎ বস্তার জলের মতো স্ফীত করে তুলেছিলেন এবং তারই অনিবার্য পরিণাম মালাবারের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। গান্ধীজী অবশ্য স্বরাজ্যলাভের উদ্দেশ্যের ওপরই সর্বদা জোর দিতেন, কিন্তু আলি ভাভুদয়

বিপন্ন ইসলামের রক্ষার জন্তই আলামদী বক্তৃতা দিতেন। মহম্মদ আলি গ্রেণ্ডার হলে তাঁর জীবী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেয়ে বলেন : “তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি আমাদের কথা ভেবে বিচলিত হয়ো না। আমরা ধর্মের জন্ত লড়াই করছি, হুতরাং আমরা সাফল্য লাভ করবই। খোদাতাজা আমাদের দেখবেন” সৌকত আলি গ্রেণ্ডার হয়েছিলেন ১৬ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির অফিসে।

গান্ধী ও আলি লাভুদয় যখন ভারতের জাতীয় মুক্তির আন্দোলনকে বিপদ-চালিত করে সাম্প্রদায়িক খিলাফৎ আন্দোলনে রূপান্তরিত করে দিচ্ছিলেন তখন আর্যার্য্যণ্ডের নেতা আইরিশ স্বাধীনতা সগ্রামকে আপসহীন পূর্ণ মুক্তিসাধনের লক্ষ্যমুখে কীভাবে পরিচালন করছিলেন সেদিনের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তার একটা তুলনামূলক চিত্র পাশাপাশি জল জল করে উঠত প্রতিদিন। গান্ধীজী বারবার স্বরাজ্যলাভের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে পাঞ্জাবের অত্যাচার (Punjab wrongs) প্রতিবিধান এবং খিলাফতের প্রতিকার (redress of Khilafat) লাভের কথা বলতেন। বস্তুতঃ পাঞ্জাব ও খিলাফতের ব্যাপার দুটি ভারতের স্বরাজ্যলাভের সমকক্ষ বা তার চেয়েও বড় ব্যাপার রূপে প্রতিষ্ঠাত হত তাঁর কথা হতে—নেতৃত্বের দূরদৃষ্টি-হীনতা, লক্ষ্যবস্তুতে নিষ্ঠাহীনতা ও স্বচ্ছ চিন্তার অভাবেরই এটা পরিচায়ক। মৌলানা মহম্মদ আলি যেদিন গ্রেণ্ডার হন ঠিক সেইদিনই ইয়ামন ডি ভ্যাগেরা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জকে একখানি পত্র লেখেন। তাতে তিনি জানান : “Our nation has formally declared its independence and recognised itself as a sovereign State. It is only as representatives of that State, and as its chosen guardians, that we have authority or powers to act on behalf of our people.” সহজ এবং সুস্পষ্ট কথা—কিন্তু ইংরেজ

সাম্রাজ্যের পক্ষে এর প্রতিটি অক্ষর জলন্ত অগ্নিবৎ। আর ওয়ালটেয়ার স্টেশনে মৌলানা মহম্মদ আলিকে পুলিশ গ্রেণ্ডার করার অব্যবহিত পরেই ঐ স্টেশনের বাইরে সমবেত বিশাল জনসংখ্যার নিকট ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে মহাত্মা বললেন : “এ গ্রেণ্ডারে আপনারা দ্বন্দ্ব করবেন না। আপনারা হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বজায় রাখুন আর অহিংসায় আত্মা রাখুন। প্রতিদিন অবসর সময়ে চরখায় হুতা কাটুন।” বস্তুতঃ ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন সেইদিনই পথপ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল এবং দেশবিভাগের ভিত্তিও স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। ওয়ালটেয়ার থেকে সাম্রাজ্যে যেয়ে এক বিশাল জনসভায় মহাত্মা গান্ধী পুনরায় বলেন : ঘরে ঘরে চরখা চালু হলে বর্তমান বৎসরের (১৯২১ সাল) ভিতরই স্বরাজ আসতে বাধ্য।

যাই হোক ২০শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক সভায় বড়বাঙ্গার হতে বয়স্কট আন্দোলন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার কারণ নাড়োয়ারিরা প্রকাশে বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করে এবং সত্যগ্রহীদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে তারা বিদেশী বস্ত্র আমদানী ও বিক্রয় করবে না। নাড়োয়ারিদের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিল নিম্নরূপ : “আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ এতদ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ তারিখ পর্যন্ত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আমরা কোন বিদেশী বস্ত্র বা হুতা কিনিবনা।” ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় বড়বাঙ্গার সংক্রান্ত প্রস্তাব জাড়াও আর একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ :

“বিদেশী বস্ত্র ও হুতা বিক্রয় বন্ধ এবং স্বদেশী বস্ত্রের ব্যবহার সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র ও বিক্ষেত্র উভয়কেই অহিংসাপদ্ধতিতে বিশেষভাবে অনুরোধের মাধ্যমে অবিলম্বে পিকেটিং শুরু করা হবে। এই প্রস্তাব কার্যকরী

করার জন্ত সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে আশনাল সার্ভিস বোর্ডের উপর।” আমরা পূর্বেই বলেছি এই সার্ভিস বোর্ডটির দায়িত্ব স্বভাষচন্দ্রের উপরই জ্ঞত ছিল। প্রচার বিভাগেরও সচিব ছিলেন স্বভাষচন্দ্র। প্রচারসচিবরূপে ২২শে সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়ে তিনি জানান যে মাদোয়ারিদের সঙ্গে কংগ্রেসের যে চুক্তি হয়েছে তাতে মাদোয়ারিরা যদিও ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিদেশী বস্ত্র আমদানী না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তবু এই সময়সীমার কথাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেন না “If our organisation and propaganda be as strong in February 1922 as they are just now the time limit will easily be postponed for an indefinite period” (Indian Daily News, 24th Sept 1921)

বিদেশী বস্ত্র বয়কট আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী এই সময় একটা নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। প্রশ্ন উঠেছিল এই যে ভারতের গরীব লোকদের পক্ষে তাদের যেটুকু জামাকাপড় আছে তা পুড়িয়ে ফেল মতন করে স্বদেশী বস্ত্র কেনা সম্ভব নয় বিশেষত স্বদেশী বস্ত্রের দামও বিদেশী বস্ত্রের চেয়ে বেশি। গান্ধী এই প্রশ্নের উত্তরে লিখলেন : স্বদেশী বস্ত্রের দাম বেশি এ সমস্যা নিয়ে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। উৎপাদন বৃদ্ধির দ্রুততম উপায় হচ্ছে ধ্বংস করা। সমস্ত শক্তিতে অতি দ্রুত যদি আমরা ধ্বংস করতে পারি তাহলে ভারত তার তামসিক অবস্থা ও অলস হতে জেগে উঠবে।.....দেহের পক্ষে যেমন ব্যাধি, ভারতের পক্ষে বিদেশী বস্ত্র তেমনই ক্ষতিকারক। শরীরের স্বস্থতার জন্ত ব্যাধি যেমন নাশ করা উচিত, ভারতের কল্যাণের জন্ত বিদেশী বস্ত্রও তেমন ধ্বংস করা উচিত। যদি স্বদেশীর আশু প্রয়োজন স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে ধ্বংসের পথ ছাড়া চলা যাবে না।” (অ্যাণ্ড্রুজকে লেখা গান্ধীজীর পত্র, Hindoo Patriot, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২১) মাদুরা থেকে

গান্ধীজী ২২শে সেপ্টেম্বর এক বাণীতে ঘোষণা করেন যে ভারতের গরীব জনসাধারণ যদি বিদেশী বস্ত্র পরিত্যাগ করে যথেষ্ট পরিমাণ ধন্যর কিনতে না পারে তাহলে লেংটি কাপড় (loin cloth) পরে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দেশবাসীর সম্মুখে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই অতঃপর নেংটি পরা শুরু করবেন এবং শীত বাঁচাবার জন্ত প্রয়োজন হলে গায়ে একটা চাদর পরবেন। এ পর্যন্ত গান্ধীজী মাথাম টুপি এবং পরণে পোশাক ব্যবহার করে আসছিলেন : এই ঘোষণা মারফৎ সে সমস্তই শেষ হল।

মহাত্মার আন্দোলন সম্পর্কে মতবিরোধের যত অবকাশই থাকুক সমগ্র ভারতবর্ষ যে এই আন্দোলনের ফলে তীব্রভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। সিমলায় কেন্দ্রীয় আইন সভায় দাঁড়িয়ে তাই ভার্গব বলেছিলেন : অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে যত যুক্তিই দেওয়া যাক না কেন এই সত্য অনস্বীকার্য যে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ এই আন্দোলনের ফলে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন ইংরেজ সরকারের উচিত শীঘ্র শীঘ্র ভারতকে স্বরাজ দান করা। (২৩শে সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে বিবরণী) আইন সভায় প্রবল করতালিধ্বনির মধ্যে রায় বাহাদুর যত্ননাথ মজুমদার তো একটা প্রস্তাবই উত্থাপন করে বসলেন যে সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল বিলাতে ভারতসচিবকে লিখুন যেন সৈন্যবাহিনী, বৈদেশিক দপ্তর ও রাজনৈতিক দপ্তর ব্যতীত দেশশাসনের আর সমস্ত বিভাগ ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়, অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রেখে ভারতকে যেন ডোমিনিয়ন স্টেটাস দান করা হয়। “আমি আমার ইংরেজ বন্ধুদের বলব”—মজুমদারমশাই হৃদয়ান্বিত মধ্য-ঘোষণা করেছিলেন, “যে আমরা স্বরাজ পাওয়ার বিষয়ে মনস্তির করেছি। যেচ্ছায় স্বরাজ দান করলে ইংরেজজাতির গৌরব বৃদ্ধি পাবে। আমাদের লক্ষ্যের পথে তাঁরা যেন অন্তরায় না হন।” শেষাঙ্গি আয়ার ও ঈশ্বর শরণ

তঁার প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেছিলেন। “ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ” সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে গান্ধীর প্রভাব কথাবার জন্ত ইংরেজ সরকার নিজেই ভারতীয় সদস্যদের মারফৎ এই স্বরাজের দাবী তুলেছে শুধু এইটুকু বোঝাবার জন্ত যে গান্ধী শত চেষ্টা করেও যা পারবেন না আইন সভা মারফৎ সেটা অতি সহজেই অসম্পন্ন হতে পারে, অর্থাৎ আইন-সভাই স্বরাজ এনে দিতে পারে। (২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ সংখ্যা)

শ্রী অরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু একবারেই বলেছিলেন যে অসহযোগ আন্দোলন ক্রমেই থেমে আসবে, দেশ এ আন্দোলনে সাড়া দেবে না। তাঁর মতে প্রতিদিন এই আন্দোলনের দুর্বলতা ধরা পড়ছে এবং মর্যাদাও বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকছে না। গান্ধী বিদেশী বস্ত্র বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন, ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালেও এই বয়কটের আহ্বানই জানানো হয়েছিল। কিন্তু “There is no comparison between the wave of feeling which then swept over the province and the feeble sentiment, if indeed there is any sentiment, which inspires the movement now. The cult of the boycott has fallen flat and evokes no response.” (Hindoo Patriot, 1st October, 1921) শ্রী অরেন্দ্রনাথের এই বক্তব্য বাংলা দেশের ক্ষেত্রে তখন পর্যন্ত অনেকাংশে সত্যই ছিল। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অভাব যে কতখানি তা বোঝা গেল যেদিন তিনি উপরোক্ত বিবৃতিটি দেন (২৮শে সেপ্টেম্বর) তার পরদিনই হাওড়ায় কংগ্রেসের উদ্বোধনে বিদেশী বস্ত্র বয়কটের জন্ত পিকেটিং শুরু হয়ে গেল। হাওড়ায় কাপড়ের ব্যবসা সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে গেল। পিকেটাররা ছিল সেখানে হুজুর্গ, ভল্ল, বিনীত কিন্তু অতিশয় দৃঢ়। তাদের সংঘত আচরণের দরুণ কোথাও কোন গোলযোগ বাধল না। বাংলার রাজনীতিতে যে নতুন শক্তি আত্মপ্রকাশ

করার জন্ত তখন উদ্বুদ্ধ সে সম্পর্কে অরেন্দ্রনাথের মতো ভূয়োদর্শীদেরও ধারণার অভাব ঘটেছিল, তাতে বিম্বিত হবার কিছু নেই। ইতিহাসের সন্ধিক্ষেপে প্রাচীন নেতারা আগামী যুগ সম্পর্কে এরকম ভুল করেই থাকেন। এই সাধারণ সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে একথা মনে না হয়েই পারেনা যে ১৯২০-২১ সালে সারা ভারতের মতো বাংলার রাজনীতিও নতুন পথে মোড় নিতে শুরু করেছে। সেই স্বদেশী যুগের বাংলার রাজনীতির যে ধারা প্রবহমান হয়েছিল ১৯২১ সালের বাংলায় তাতে নতুন আর এক ধারা সংযোজিত হয়েছে। পুরনো নেতারা এই নতুন ধারাকে বুঝতে অসমর্থ হয়েছিলেন। তাই যে অরেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বদেশী যুগের বাংলার অবিসম্বাদিত রাষ্ট্রনেতা, ১৯২১ সালে তাঁর বিচারদৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল; বঙ্গভঙ্গ যুগের চরমপন্থী নেতা বিপিন পাল নতুন গণ-আন্দোলনের বিরোধিতার ভূমিকার অবতীর্ণ হলেন; বোম্বার্ড নেতারাও আন্দামান হতে ফিরে আসার পর দেশকে আর কোনোরকম নেতৃত্ব দিতে পারলেন না। ১৯০৫ সালের আন্দোলনে দেশবন্ধু একটা বিরাট অবদান ছিল, কিন্তু আন্দোলনের প্রকাজ্ঞ নেতৃত্বভার তিনি তখন কোনোমতেই গ্রহণ করেননি। ১৯২১ সালে বাংলার রাজনীতিকে নতুন রূপ দেবার এবং নতুন পথে প্রবাহিত করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই অবশিষ্ট ছিল এবং সে সময়ে তাঁর সেই পরিণত বয়সে, তিনিই বাংলার অদ্বিতীয় নেতৃত্বদে বৃত্ত হয়েছিলেন। অরেন্দ্রনাথ উদ্বাবশত তাঁর ছাত্রসম, শিষ্যসম দেশবন্ধুকে বুঝতে পারেননি, বুঝতে চানওনি তাঁর কর্মধারা ও বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যকে। আর বড়বাকারে, বোম্বার্ডকলেজ স্ট্রীটে, হাওড়ায় এবং বাংলার জেলায় জেলায় বয়কট আন্দোলন সংগঠনের মাধ্যমে আরও নবীন যে নেতৃত্বের উদয় বাংলার রাজনৈতিক আকাশে সেদিন সূচিত হচ্ছিল তিনি যে তাকে বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবেন সে বিষয়েই বা সন্দেহ কি?

৩ বা অক্টোবর তারিখে (১৯২১) সকল সংবাদপত্রে স্বভাষচন্দ্র বসুর একটি বিবৃতি প্রচারিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রচার বোর্ডের সচিব রূপে (সেক্রেটারি) তাঁর এই বিবৃতি দান। বিবৃতি তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার সম্পর্কিত। তিনি লিখেছিলেন যে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলা দেশে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে যত টাকা জমা পড়েছে তার হিসাব অডিট করা হয়ে গেছে এবং পূজার পর ঐ হিসাব প্রকাশ করা হবে। তবে জনসাধারণের অবগতির জন্য একথা জানানো যায় যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ঐ ভাণ্ডার হতে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে যে আসাম-বঙ্গ রেল কর্মচারীদের ধর্মঘট দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল সেই বাবতে একলক্ষ টাকার মতো ব্যয় করেছেন। জনসাধারণকে আর একটি বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করেছেন স্বভাষচন্দ্র। তিনি উল্লেখ করেছেন যে কলকাতায় “জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক” নামে একটি সংগঠন আছে এবং তারা লোকের নিকট হতে টাকা ও দান সংগ্রহও করছে। কিন্তু ঐ সংগঠনের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো প্রকার যোগাযোগ নেই। ঐ সংগঠনের কোনো কর্মের জন্য কংগ্রেস তাই দায়ী থাকবে না। উল্লেখের ধরণ দেখে মনে হয় উপরোক্ত সংগঠনটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংগঠিত ছিল না। বিবৃতিতে আরও একটি বিষয়ের কথা আছে। গৌড়ীয় সর্ববিভাগতন বা বোর্ড অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন—স্বভাষচন্দ্র যার অধ্যক্ষ ও প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন—সারা বাংলা দেশে মোট ১২৯টি জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনা করছিলেন। মফঃস্বল অঞ্চলে নানা প্রান্তে এই বিদ্যালয়গুলি ছিল—বিবৃতি দেবার সময় ঐ বিদ্যালয়গুলির ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩, ৯৬৫ জন। এ ছাড়া জাতীয় শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ছিল চারটি জাতীয় কলেজ—ঢাকা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কলেজ, কলিকাতা বিদ্যাপীঠ, দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট (১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার) এবং বৈজ্ঞানিক পীঠ (আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য)। এ ছাড়াও ৭৮-১

আগহার্স্ট স্ট্রীটে ছিল একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন ইনস্টিটিউট যার অধীভূত ছিল একটি কমার্শিয়াল কলেজ। ঢাকা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কলেজকে কালক্রমে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার পবিত্রকল্পনা ছিল এবং সেই অমুগারে ঐ কলেজের বেশ কয়েকটি শাখাও পূর্ববঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল। স্বভাষচন্দ্র জানাচ্ছেন যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে আরও বিশদ তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে, শীঘ্রই সমস্ত তথ্য একত্রিত করে একখানি বুলেটিন প্রকাশ করা হবে।

এই বিবৃতিতে উল্লিখিত আসাম-বঙ্গ রেলকর্মীদের ধর্মঘট সম্পর্কে আমরা এখন পর্যন্ত কোনো আলোচনা করিনি, কিন্তু সে সময়কার বাংলা দেশে সে ছিল একটা বিরাট ঘটনা। এই ধর্মঘটে কংগ্রেসের সমর্থন ছিল এবং দেশবন্ধু নিজেও ঐ ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ ধর্মঘটে মূল নেতা ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন—তাঁর ত্যাগ ও দক্ষতা সেদিন যুগপৎ বিশ্বাসের কারণ হয়েছিল। সে সময়ই তিনি বাংলার একজন নেতারূপে স্বীকৃত হয়ে গেছেন, বিশেষত পূর্ববঙ্গে তাঁর সমকক্ষ নেতা আর কেউ ছিল না। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর নেতৃত্ব আরও গুরুত্ব অর্জন করেছিল, কিন্তু সে কথা আমরা পরে আলোচনা করব। আসাম-বঙ্গ রেল ধর্মঘট প্রসঙ্গও আর একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

কিন্তু স্বভাষচন্দ্রের জীবন ও কর্মধারার বৈশিষ্ট্যকে বুঝবার পক্ষে তাঁর পূর্বোক্ত বিবৃতির শেষ অংশটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার। সরকার-বিরোধী গণ আন্দোলন গড়ে তোলাতে তাঁর উৎসাহ যেমন অপরিণীয় ছিল, গঠনাত্মক কার্যেও তাঁর উদ্যমের অভাব ছিল না। আজকাল এমন একটা কথা প্রায়শই উচ্চারিত হচ্ছে—জানিনা কোনো স্বাধীন সংগঠিত পক্ষের প্রচারের ফলে কিনা—যে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে স্বভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব ফলপ্রসূ হয়েছিল বাটে, কিন্তু স্বাধীন ভারতে রচনাত্মক কাজে তাঁর নেতৃত্ব ব্যর্থ হতে পারত।

জহরলালের জীবনে যে পরীক্ষা ঘটে গেছে সে পরীক্ষার সুযোগ কাল স্বভাষচন্দ্রকে দেয়নি। জহরলালের ব্যর্থতা যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা দিবেও থাকে তবু নতুন ভারত গঠনে তাঁর অমের অবদানও রয়েছে—তিনি দিয়েছেন ভারতকে গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, জাতীয় সংহতি এবং সেকুলার রাষ্ট্রকল্পনা। স্বাধীনতার সংগ্রামে এবং স্বাধীনতা-উত্তর নবীন ভারত গঠনে জহরলাল সমান দক্ষতার সঙ্গেই নেতৃত্ব দিতে পেরেছেন—কিন্তু স্বভাষ বহু কি তা পারতেন ?

নবীন স্বাধীন শক্তিশালী সমৃদ্ধ ভারত গঠনে স্বভাষ-চন্দ্রের কি ভূমিকা হত, তাঁর অবদান কতখানি গুরুত্ব অর্জন করতে পারত সেই অনুমানসাপেক্ষ বিচারে যাওয়া এখনই অনাবশ্যক। কিন্তু ১৯২১ সালে স্বভাষ যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন এবং জনজীবনে তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে সংবাদ সংবাদ পত্রগুলিতে প্রতিবেশিত হতে আরম্ভ করেছে তিনি সেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাপাত অথবা

রাজনৈতিক সংগ্রামের উদ্ভেজনার দিক নিয়ে সমৃদ্ধ থাকেন নি। বয়কট আন্দোলনের পাশাপাশি তিনি যুগপৎ জাতীয় আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্বও স্বীকার করে নিয়েছেন এবং শুধু কলকাতায় নয় পূর্ববঙ্গেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভেবেছেন। শুধু চিন্তা নয় বাস্তব কর্মের মধ্যে সে চিন্তাকে রূপায়িত করতেও তিনি আরম্ভ করেছেন। বস্তুতঃ স্বভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব প্রতিভার এইটি ছিল অল্পতম বৈশিষ্ট্য—সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আত্মগঠন তথা স্বদেশগঠনের কাজও তিনি সমোৎসাহে করার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই কারণেই তাঁর সংগ্রাম নেতিবাচক ছিলনা, ইংরেজশাসিত ভারতরাত্ত্রের অভ্যন্তরেও প্রকৃত জাতীয়তাবাদী নবীন ভারত রাষ্ট্র গঠনের কাজ তিনি শুরু করতে চেয়েছিলেন—আর সেই ছিল তাঁর State within state-এর প্রস্তাব, যা গান্ধী-নেহরুর নেতৃত্ব অগ্রাহ করেছিল এবং রবীন্দ্রনাথ থাকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন।

(ক্রমশঃ)

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
শ্রীগীতা	৬.০০	বাংলার ঋষি	৩.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫.০০	বাংলার মনোবী	১.৩০
ভারত-আত্মার বাণী	৫.০০	বাংলার বিদ্রোহী	২.০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১.৫০	বীরত্বে বাঙালী	১.৫০
কর্মবাণী	১.২৫	ব্যারামে বাঙালী	২.০০
Soul of India Speaks	5.00	বিজ্ঞানে বাঙালী	৪.০০
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.		রাজর্ষি রামমোহন	১.৫০
		রবীন্দ্রনাথ	১.২৫
বিদ্যাসাগর	২.২৫	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১.৫০
মানুষের মত মানুষ	৭৫	আচার্য জগদীশচন্দ্র	২.৫০
শিশু রামায়ণ	৩২	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১.৫০
শিশু মহাভারত	৭৫	॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥	
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :		১৫ কলেজ স্কোয়ার :	
		কলকাতা-১২	

উনি এত বিরক্ত কেন ?



কারণ ঠর টেলিগ্রামটি সময় মত পৌছায়নি। হয়তো ডাক ও তার বিভাগের দোষেই তার বার্তাটি সময় মতো যায়নি। অথবা হয়তো ঠিকানাটি ঠিক দেওয়া হয়নি।

❶ কোন জরুরী খবরের জন্তই টেলিগ্রাম করা হয় এবং সেই খবরটি নির্দিষ্ট স্থানে তাড়াতাড়ি পৌছানো দরকার, তা না হলে টেলিগ্রাম করার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

❷ তারবার্তা তাড়াতাড়ি যথাস্থানে পাঠানোর জন্ত ডাক ও তার বিভাগ যথেষ্ট যত্ন নেন। কিন্তু টেলিগ্রাম বা চিঠি তাড়াতাড়ি বিলি করতে হলে সঠিক এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা অত্যন্ত দরকার।

❸ সব সময়ে পুরো ঠিকানা দিন - তাছাড়া সঠিক এলাকাটি যাতে তাড়াতাড়ি জানা যায় সেজন্ত অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে দিন - টেলিগ্রামে অঞ্চল সংখ্যা দিলে তার জন্ত অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়না।



আপনাদের আরও সেবা
করার জন্য
আমাদের সাহায্য করুন

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

নিবেদিতা-স্মরণে : বনফুল

আমাদের আকাশে যে এত আলো আছে
আমাদের কাননে যে এত ফুল-ফল
অর্ণাক্ষরে ইতিহাস যাহা লিখিয়াছে
কত প্রাণস্পর্শী তাহা, কি অনুর, কত সমুজ্জ্বল
কি মহিমা উদ্ভাসিত ভারতের ভালে
তুমিই कहিলে তাহা—তুমিই দেখালে।

তুমিই कहিলে ডাকি, মহিয়সী নারী,
অমহৎ সভ্যতার তোমরা যে উত্তরাধিকারী
বিদেশীর পদতলে পড়ে' আছে কেন জড়বৎ
উত্তীর্ণত জাগ্রত,—পার হও সাগর-পর্বত
স্বাধীন সবল হস্তে অর্জুন করহ পুনর্ব্বার
যা তোমার উত্তরাধিকার।

বিদেশিনী ওগো দেবি, আজ তুমি বিদেশিনী নহ
অন্তর-মন্দির ভরি' জননী-বন্দনা-গান ধ্বনিতৈছে
আজি অহরহ।

পর নহ, পর নহ আজ তুমি নিতান্ত আপন :
তোমার স্মৃতির সৌধে প্রহ্লাভরে করিমু স্থাপন
প্রণাম—প্রদীপটিরে
আলো তার ধম্ম হোক, তোমার চরণ ছু'টি ধীরে।

নিবেদিতা-স্মরণ : সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য ;
হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে।

স্বামী বিবেকানন্দ : নিবেদিতাকে লেখা চিঠি

৭ই জুন, ১৮৯৬

পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারে অনিশেষ এ-কী তমস্বিনী !
বেদনার তীব্র দাহে জলে শুধু প্রাণের অঙ্গার—
শিখাময়ী ! হায় যদি, তুলেছিলে প্রদীপ বংকার—
সে-আগুন চিরতরে নির্বাপিত, হে লোকজননী !

তোমার অমল প্রাণ, ধ্যানদীপ্ত নিত্য জাগরণ
অস্তিত্বের মানচিত্রে ভেঙেছিল দেশ-কাল-সীমা
চকিতে প্রদীপ ক'রে চিরন্তন মানব-মহিমা
শৃঙ্খলিত লক্ষ্যবৃক্কে এনেছিল স্পন্দন।
যেন কোটি অগ্নিশিখা অগ্নোপ্তিত অন্ধকার শেষে
ত্যাগের অন্তরবীর্বে দেখেছিল চির-আলোকিতা
শুদ্ধ শিল্প-; মুক্তিমন্ত্রে সমর্পিতা শুভ্র-নিবেদিতা—
দৈবরের স্বপ্ন বৃত্তি-পুনর্ভব হবে দিব্য-দেশে।

পাপপঙ্কে অন্ধকারে কাঁদে একা আকুল জননী
অথ বার্থ বলিদান দেবে কোন দীপ্ত তপস্বিনী ?

নিবেদিতা : মনীশ ঘটক

অবন ঠাকুর বললেন

নিবেদিতা যেন সৌন্দর্যের পরাকারী ।

গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগ্‌রা,

গলায় ছোট্ট ছোট্ট রক্তাক্তের একছড়া মালা-

যেন সাদা পাথরে গড়া

একটি মূর্তিমতী তপস্বিনী ।

তিনি আরো বলেছিলেন

মামকরা হুন্দরীকুলের মধ্যে

নিবেদিতার আবির্ভাব

যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে পূর্ণ-চন্দ্রোদয়,

যেন কাদম্বরীর মহাশ্বেতা

চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া ।

এ শুধু বাইরের রূপ

অস্তরের রূপমাধুরীও তাঁর সর্বান্তে বিকশিত,

তাই তিনি দেখেছিলেন

তপস্বিনী কেও

সেই সম্যাসিনী কে,

বে সম্যাসিনী একদিন

ভারতের নারীশক্তিকে উদ্ধৃত্ত করবার জেতে

পরমত্যাগের মস্তে দীক্ষিতা হয়ে—

বিভূষী আইরিশ কস্তা হয়েও

ভারতে এসেছিলেন

নিজেকে ভারতের নারী পরিচয় দিয়ে ।

আত্মশক্তি বীৰ্যবতী দেবীরূপিণী

মহীয়সী এই নারী

উদ্ধৃত্ত করেছিলেন সত্যার্থেবী জগদীশ বসুকে

তাঁর বিজ্ঞান ত্রুটে ।

আল্‌হান করে এনেছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে

নেটিভ ষ্টেটের কৰ্ম থেকে দেশোদ্ধারের রত্নক্ষেত্রে,

সহ-সংলাপিনী হয়েছিলেন

তিলক গোখলে রমেশ দত্তের

রবীন্দ্রনাথ যত্ননাথ সরকারের

সরলা দেবীর,

কার্জনের মিথ্যা কট্টভাষণের প্রতিবাদে

গর্জে উঠেছিলেন তিনি,

কার্জনেরই লিখিত উক্তি উদ্ধৃত করে

উদ্ধৃত ব্রিটিশ শাসককে হতমান করেছিলেন ।

আইরিশ বিদ্রোহের তপ্তরক্তধারা তাঁর ধমনীতে

অনায়াসে ধর্মসংস্থা রামকৃষ্ণ মিশনের

সংস্রব ত্যাগ করে

ভারতের মুক্তি যন্ত্রে কাঁপিয়ে পড়েছিলেন ।

বীরকেশরী বিবেকানন্দের

উত্তরসাহিকা মানসকস্তা তিনি

প্রচার করে গিয়েছেন

‘ভারতের ভাগ্য ভারতবাসীর হাতে—

স্বস্থ, সবল, নির্ভীক, ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর’ ।

পিতার মহামন্ত্র

‘উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাণ্যবরান নিবোধত—

সেই মস্তে নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন নিবেদিতা ।

জীবন শেষে যখন তিনি

অমৃতপথ বাজিগী

তখন কী গভীর আশ্বাসে বলে উঠেছিলেন,

ডুবুক এই দেহতরী,

প্রাণ আমার আবার জাগতে চলো

নব অরুণোদয়ের জগতে ।

নিবেদিতা : স্বপ্ন এবং বাস্তবতা ॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

যে-কোনো অভিনেত্রীর মুখ দেখে তোমার নামে কবিতা লেখার মতো পাপ
করতে পারলে বেঁচে যেতাম ; পারলাম না । কিন্তু, মনস্বিনী খেতগোলাপ,
তুমি কি জানো না কোনো বিষয়নিষ্ঠ স্তবক লেখা অবাস্তব অধুনা ?
গোলাপ কিংবা করবী, লা পাসিয়ানারো অথবা অরুণা
কেউ কিছু আর প্রসঙ্গ নয় । রঙ্গালয়ের উর্ধ্বে তারার মতো
একাধারে স্বপ্ন এবং বাস্তবতা নিবেদিতা, আমি তবু উগ্র প্রথাপিত
ভালোবাসায় তোমার কাছে দীক্ষা নিয়ে দ্বিগুণ কিংবা আশুন-অরুণাভ
গোরার অবুঝ অভিমানে ভোরের আলোয় ভারতবর্ষে যাবো ॥

হে জননী, লোকমাতা : নটিকেশ্বর ভরদ্বাজ

ধেমসের উত্তাল ধারা অপরূপ গেরুয়া গঙ্গায়
সম্মিলিত : একটি মানবী এত নদী হতে পারে বহতায়,
এত উজ্জল আকাশ, এত শুদ্ধ হৃৎ হৃদয়ের হাওয়ায়
অপাবুতি, এক জন্মে এত নব জন্মের উদ্ধার
কে জানত !—আমরা তা বুঝতে পারিনি
আমরা তোমার কাছে আলো এত দায়ভাগে ঋণী !

উত্তর আলোর পাখী ! তুমি এলে আমাদের এই শান্তি বটের প্রাঙ্গনে
ভোরের তৈরবী মঞ্চে খুলে দিয়ে চলে গেলে

দূরের আলোর অভ্যর্থনা,

শুরু হল চারিদিকে নীল দিন, প্রাণের অর্চনা

আকাজিক-রক্তপদ্ম জীবনে জীবনে

ভারপর উন্মীলিত—সংহত সূর্যের প্রস্তাবনা ।

সমুদ্র-সংবাদ ভূমি আমাদের এ প্রাচীন বন্ধ জলাশয়ে,
 স্তিমিত রক্তের স্রোতে জোয়ারের আবেগী সংলাপ।
 এক মুখে এত আলো উচ্চকিত জীবনের জয়ে,
 সন্ধ্যান্ত প্রতিমা যেন প্রাণ পীঠে—নন্দিত উত্তাপ,
 আনন্দ অশ্রু ব্যথা ভয় স্নান অঙ্গীকার আশীর্বাদ নিয়ে
 বিদ্যুৎ বজ্রের জ্বালা। বৈশাখের বিদীর্ণ বিন্মরে
 জীবণ সংকল্পে যেন নেমে এলে বিপন্ন হুসরে
 দিগন্ত প্রাবিত করে। এক বৃকে এত স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে
 এত রুদ্ধ অভিমান, অতলাস্ত দুঃখের মহিমা—
 জননীর ভূমিকায় তুমি যে এখনো ঘরে ঘরে—
 লোকমাতা। নিবেদিত নিঃশব্দ নিষ্ঠায়
 ভারত আত্মার কাছে সমর্পিত, রাজির নীরস্ত নীলিমা
 মুছে ফেলে আলোর অপরাধিতা।

—তুমি নিবেদিতা

নবজন্মে দুর্জয় অগার ;
 ভারত জননী হল—কোটি তার শিশুদের নিয়ে
 সোনার ভারতবর্ষে আর এক মিলিত সংসার।

তবু আমরা গিয়েছি হারিয়ে।
 তোমার দুর্জয় স্বপ্ন শতবর্ষে সম্পন্ন হয়নি এখনো।
 আমাদের দুষ্ক ভালে, হে জননী, পরাইলে রাজরক্তটিকা,
 ব্যর্থ হল, ভিক্ষা-অন্ন আছো ঘুচিলনা।
 আমাদের নীল রক্তে এবার কি লেহি লেহি শুদ্ধ অগ্নিশিখা,
 ভ্রুকুটি-ভয়াল করে জ্বালাতে পার না।
 প্রতিশ্রুত সব দেব। আর আমরা পিছু তাকাব না—
 হে জননী, লোকমাতা। লোক লজ্জা দূর কর
 দূর কর এ লোক বক্ষণা ॥

নিবেদিতা লোকমাতা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[ভগিনী নিবেদিতা এসঙ্গে লেখক বৃহদাকারে দুই খণ্ড আঁকর গ্রন্থ প্রস্তুত করছেন। তারই কিছু অংশ আমরা পত্রস্থ করলাম। “দেবমাতার স্মৃতি” অংশে অনেক অপ্রকাশিত তথ্য রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস নিবেদিতাহুঁরাগীরা এটি পড়ে আনন্দ পাবেন। জ. স.]

দেবমাতার স্মৃতি

সিস্টার দেবমাতা জাতিতে আমেরিকান। স্বামীজীকে দর্শন কবেছিলেন। ভারতেও ছিলেন অনেকদিন। ভারতে অবস্থানকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্নেহপুষ্ট বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী পরমানন্দের আনন্দ আশ্রমেই ইনি দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন।

সিস্টার দেবমাতা উল্লেখযোগ্য লেখিকা। কাব্যলীমণিত রচনা, অথচ নাটকীয় গতি তাতে আছে। তাঁর লেখার প্রধান গুণ গভীর রহস্যময়তা, যা সাধারণ কথাকেও ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। বহু গ্রন্থের এবং পুস্তিকার তিনি রচয়িতা, তার মধ্যে Days in an Indian Monastery এবং Sri Ramakrishna and St. Francois বিশেষ পরিচিত। প্রথম বইটি দেবমাতা তাঁর ভারতবাসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচনা করেছিলেন। এই বইটির বিষয়ে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৯২৮) লেখা হয়েছিল—‘বইটি ভারতের মূল প্রাণধর্মকে প্রকাশ করেছে। লেখিকা তাঁর বর্ণনাসমূহের মধ্যে ভারতের পরিবেশ, রঙ ও রস বজায় রাখতে পেরেছেন—যা সাধারণ একজন লমণকারীর পক্ষে করা সম্ভব নয়। ইনি পেরেছেন, কারণ এদেশকে ইনি ভালবেসেছেন, স্বদেশরূপে বরণ করেছেন।’

জিন হারবার্টের সহযোগিতায় লিজেল রেম যখন নিবেদিতা-জীবনী রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হলেন, তখন তাঁরা নিবেদিতাকে জানতেন এমন সম্ভাব্য সকল ব্যক্তিকেই তথ্যদানে অনুরোধ করেন। এঁদের মধ্যে দেবমাতাও ছিলেন, কারণ Days in an Indian Monastery গ্রন্থে নিবেদিতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কথা আছে। ‘ভারতীয় সম্রাস-জীবন সম্বন্ধে আপনি যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আপনার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠবে,—জিন হারবার্ট লিখেছিলেন ২১শে এপ্রিল, ১৯৩৮-এ।

দেবমাতা আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়েছিলেন, যদিও তাঁর ‘স্বাস্থ্যশক্তি সীমাবদ্ধ এবং কাজের দায়িত্ব প্রচুর।’

জিন হারবার্ট ও লিজেল রেম বিশেষভাবে প্রশ্ন করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন থেকে নিবেদিতার সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে, কারণ এ বিষয়ে ‘মিশনের সম্রাসীগণ খোলাখুলি আলোচনা করতে চান না।’ পদত্যাগের পরেও নিবেদিতার কাতিক ৩

সঙ্গে সন্ন্যাসীদের সম্পর্ক কি ধরনের ছিল সে বিষয়েও এঁরা জিজ্ঞাসা করেন। ‘মঠের সন্ন্যাসীরা কি তাঁর বাড়িতে আসতেন, এবং তিনি কি প্রায়ই মঠে যেতেন? তিনি কি বিদ্যালয় ত্যাগ করেছিলেন? ডাঃ বহুর সেক্রেটারী হওয়ার কাজ তিনি কখন নেন, পদত্যাগের আগে না পরে?’—এ ধরনের বহু প্রশ্ন এঁরা করেন।

দেবমাতা যথাসাধ্য উত্তর দেন। ‘কিভাবে জানি না’ ছোটো চিঠি থেকে গিয়েছিল, ‘স্বভিকথাসহ তাদের নকলও পাঠিয়ে দেন, যার একটি নিবেদিতা কর্তৃক তাঁকেই লেখা, অন্যটি মাস্টার মহাশয়ের লেখা, যেটিকে দেবমাতা ‘অত্যন্ত মূল্যবান’ বলেছেন। দেবমাতাকে লেখা চিঠিটি আমরা রেম-সংগ্রহে পেয়েছি, অতীব দুঃখের বিষয়, মাস্টার মহাশয়ের (শ্রীম) চিঠিটি পাইনি। দেবমাতাকে লেখা চিঠিতে কতকগুলি সাধারণ সংবাদ আছে, গুরুত্বপূর্ণ নয়, স্মরণীয় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করারও দরকার নেই।

দেবমাতা এইসঙ্গে মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন, কারণ ‘তিনিই অল্প যে-কোনো মানুষের তুলনায় বেশিভাবে নিবেদিতার জীবনধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন।’

প্রথমে আমরা Days in an Indian Monastery থেকে নিবেদিতা-প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করছি :

“বিদ্যালয়ের আসল অধ্যক্ষা ছিলেন সিস্টার ক্রিস্টিন। নিজের লেখার কাজে সিস্টার নিবেদিতা এমনই ব্যাপৃত থাকতেন যে, শিক্ষাকাজে বেশী সময় ব্যয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেইসঙ্গে তিনি বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডাঃ জে. সি. বহুর ‘plant life’ সম্বন্ধে নূতন একটি গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করছিলেন। ডাঃ বহু প্রতিদিন স্কুলে কয়েক ঘণ্টা করে কাটাতেন, এবং কখনো কখনো ছুপুরের আহারাদিও করতেন; স্মরণীয় তাঁকে জানবার আনন্দজনক স্মরণ আমার হয়েছিল। তাঁর বাড়িতেও মনোরম সময় কাটিয়েছি কখনো কখনো—মিসেস বহুর সাহচর্যে এবং ডাঃ বহুর গবেষণাগার দেখে।

নিবেদিতা প্রদীপ্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। অসাধারণ গুণশালী বক্তা ও লেখিকা তিনি। তাঁর চারদিকে ছ্যুতি-বিকীর্ণ একটা পরিবেশ বিরাজ করত, সে ছ্যুতি বিচ্ছুরিত হত তাঁর কথাতোও, তার ফলে তিনি যা-কিছু বলতেন, লিখতেন বা করতেন—সব কিছুতেই প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার অমুভব করা যেত। কিছু বছর ধরে তিনি ভারতীয়দের মনের উপরে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, এবং ভারতীয় চিন্তা-জাগরণে বৃহৎ ভূমিকা নিয়েছিলেন। রাজনীতি তাঁকে গ্রাস করে রেখেছিল এবং রাজনীতিতে আমার উৎসাহের অভাবকে তিনি কখনই ক্ষমা করেননি। তবে তা ছিল শ্রীতিপূর্ণ সংঘর্ষ।”

রেম-হারবার্টকে প্রেরিত দেবমাতার স্মৃতি

বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা গার্লস স্কুল বাইরে এবং ভিতরে উঠান নিয়ে তৈরী প্রশস্ত একটি বাড়িতে অবস্থিত। বাইরের উঠানের একপাশে, গাড়ি ঢুকবার উঁচু দেউড়ির পাশ দিয়ে খাড়াই সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার একটি স্ল

লম্বা খিলানযুক্ত ঘরের মধ্যে—সেইটেই সিস্টার নিবেদিতার পড়ার ঘর। উঠানের দিকে এবং সন্নৈশ গলির উপরে ছড়িয়ে-থাকা বারান্দার দিকে—এই দুই দিকে জানালা আছে। স্বপ্নালোকিত এই ঘরটিতে আমরা দুজনে এক রবিবার গোটা বিকেল বসেছিলাম—তিনি বলে গিয়েছিলেন মিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদের কাহিনী। ভারতকে স্বাধীন করার জন্য রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং সাময়িক মিশনকে সেবা করার জন্য আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা—এই উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ দাঙ্গা সংঘাতের ইতিহাস যখন বলছিলেন, তখন তাঁর কণ্ঠে গ্রীক ট্রাজেডীর নিয়তি-নিঃশ্বাস! স্বামীজী তাঁকে সতর্ক করে বলেছিলেন, কোনো একটিকে বেছে নিতে হবে। মিশনকে কোনোভাবে রাজনীতিতে জড়ানো চলবে না। তারপরে মানসিক সংগ্রাম—কতদিনের—অবশেষে ‘বেছে নিলেন’—ভারতের স্বাধীনতা চাই, চাই-ই। স্বামীজী নেই। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মিশনের সভাপতি। তিনি বললেন, এক্ষেত্রে নিবেদিতা সংবাদপত্রে আনিয়ে দিন—অন্তঃপর তাঁর কথা বা কাজের জন্য মিশন দায়ী নয়। বলতে বলতে নিবেদিতা ধামলেন, তারপরে নীচু স্বরে বললেন—‘ছাপার অক্ষরে যখন কথাগুলি দেখলাম, মনে হল, এর আগে মরলাম না কেন!’

ঘরের আলো আরও কমেছে। আমরা দাঁড়িয়ে উঠলাম, মুখোমুখি। আমার দুই কাঁধে নিবেদিতা হাত রাখলেন। বললেন—‘ভূমি উত্তম শ্রোতা। তোমার সঙ্গে কথা বলে অর্থ পেয়েছি।’

নিবেদিতা কথোপকথনের মামুষ অপেক্ষা শোনার মামুষ চাইতেন। সচল সমাপ্ত লেখা তৎক্ষণাত্ কাউকে চোঁচিয়ে পড়ে শোনাতে তিনি অদম্য আগ্রহী। সিস্টার ক্রিস্টিন আমাকে বলেছেন, তাঁকে স্বামী শ্রোতার ভূমিকা নিতে হয়েছিল। কোনো নতুন প্যারাগ্রাফ বা অধ্যায় লেখা হওয়া মাত্র তাঁর ডাক পড়া অবধারিত। কখনো কখনো স্কুলের ক্লাস ধামিয়েও—যেয়েরা চুপ করে অপেক্ষা করছে—ক্রিস্টিনকে শুনতে হয়েছে নিবেদিতার তখন সমাপ্ত কোনো লেখা।

সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে আমার পরিচয়ের গোড়ার দিকটিতে দেখতাম, তিনি লেখার কাজেই ব্যাপৃত, স্কুলের ব্যাপারে খুবই কম সময় দেন। স্বধীর সাহায্যে সিস্টার ক্রিস্টিন প্রায় একাই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ক্রিস্টিন শার্জিলিঙে গেলে নিবেদিতা আবার ভার ভুলে নিলেন। কাজে ডুবে পেলেন সেই একই উৎসাহে যা তাঁর সব কাজেই দেখা যেত। ইংরেজী পড়ানোর ভার দিলেন আমার উপর, এবং কতকগুলি নতুন পাঠের পঙ্কন করলেন, খেঙলি পাশ্চাত্যে তাঁর মাথায় জেগেছিল।

আমাকে তিনি যতদিন পারেন কলকাতায় ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁকে আড়াল করার কাজ আমি করেছিলাম। আমি স্কুলে আসার কিছুদিন পরে তিনি ইউরোপ থেকে ফেরেন। অবাক হয়ে দেখেছিলাম—ইউরোপের শেষতম ক্যাশানে সজ্জিতা তিনি, পরণে বহু বস্ত্রে প্রস্তুত মহা পরিপাটি গাউন, মাথায় পালক-গোঁজা মস্ত সাদা টুপি। আমি বললাম, ‘কী ব্যাপার নিবেদিতা, আমি ভেবেছিলাম ভূমি সম্মানিনীর পোষাক পরো!’ তিনি বললেন, ‘এটা আমার ছদ্মবেশ। আমাকে ভারতে না ফিরতে বলা হয়েছিল, কারণ যে-মুহুর্তে আমি ভারতে পদার্পণ করব, সেই মুহুর্তেই পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করবার হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু আমি আসবই। আমি জানতাম, এই পোষাকে আমি কে, তারা সন্দেহ করতে পারবে না।’ পুলিশের ব্যাপারে তাঁর ধারণা সত্য কারণ যখন আমি বাগবাজারের সন্নৈশ গলিতে হাঁটতাম, প্রায়ই আমাকে ধামিয়ে জিজ্ঞাসা করা হত—‘আপনি কি সিস্টার নিবেদিতা?’

আমি যখন 'না' বলতাম, তারা ভেবে নিত, তাহলে স্কুলে সিস্টার ক্রিস্টিন ছাড়া যে দ্বিতীয় সিস্টার এসেছেন বলে শোনা গেছে, তিনিই আমি। আর স্কুলে যিনি আছেন, তিনি সিস্টার ক্রিস্টিন। যেহেতু আমার কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধির কথা জানা ছিল না, তারা স্কুলের ব্যাপারে মনোযোগ কমিয়ে দিল, এবং নিবেদিতাও উৎপাত থেকে বাঁচলেন। * ১

একদিন, যখন দক্ষিণেশ্বরে গেছি মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ইংরেজী রূপান্তর আমি সম্পাদনা করে দিতে পারি কি না! বাড়ি ফিরে ব্যাপারটা নিবেদিতাকে বললাম। দ্রুত তিনি বললেন, 'না, তুমি রাজি হরো না; আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ও কাজটা আমি করি—আরম্ভ করতেও প্রায় প্রস্তুত।' হুতরাং মাস্টার মহাশয়ের অস্বস্তি আমি রাখলাম না, কিন্তু নিবেদিতাও কাজটা করলেন না। আমি জানি না কেন। তিনি যে করবার পরিকল্পনা করেছিলেন, তা তাঁকে লেখা মাস্টার মহাশয়ের নিজের পত্র থেকে বোকা যায়। নিবেদিতা চিঠিটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এতে আমার উল্লেখ করেছিলেন বলে। [চিঠিটি আমি পাইনি]

একদিন যখন 'The Master as I saw Him' সম্বন্ধে আমরা কথা বলছিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, 'স্বামীজী সম্বন্ধে যে-কাজ আমি করেছি, রামকৃষ্ণানন্দ সম্বন্ধে সেই কাজ তুমি অবশ্যই করবে। (শ্রীরামকৃষ্ণের) সব শিষ্যগণের বিষয়েই লেখা চাই। তাঁরা হারিয়ে না যান, দেখতেই হবে।'

নিবেদিতা রাজনৈতিক ও সামাজিক অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা ছিল প্রচুর।

স্কুল বন্ধ হওয়া মাত্র নিবেদিতা ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করতেন। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে আবিষ্কারাদি নিয়ে ডাঃ বসু নতুন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, নিবেদিতা তাকে সাহিত্যিক রূপ দেবার ব্যাপারে সাহায্য করছিলেন। এই কাজে নিবেদিতার এমনই উৎসাহ যে, নিজের লেখার কাজ তিনি একেবারে ভুলে গেলেন। ডাঃ বসু ৯টার সময়ে আসতেন, সাড়ে বারটা পর্যন্ত কাজ করতেন, তারপরে আমরা একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করতাম। পরমানন্দের ভোজন। উদ্ভিদ জীবন, প্রকৃতির পরমাশ্চর্য রূপ সম্বন্ধেই আমাদের সমস্ত কথাবার্তা কেন্দ্রীভূত থাকত।

ডাঃ বসু এবং লেডী বসু তাঁর ঘনিষ্ঠতম ভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে পড়েন। নিবেদিতা একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। লণ্ডনে থাকাকালে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে তাঁরা এক চুলের জন্তু বেঁচে যান। পরে ডাঃ বসু যখন বললেন, 'আমরা একেবারে মারা যাচ্ছিলাম', নিবেদিতা উত্তর দিয়েছিলেন, 'ভাতে কি, আমরা সবাই তো একসঙ্গে যেতাম!'

প্রাতরাশের কালেই নিবেদিতার সঙ্গে আমার এবার হবার আসল সময়, কিন্তু বেশীক্ষণ একসঙ্গে থাকতাম না। নিবেদিতা ডাঃ বসুর আগমনের জন্ত প্রস্তুত হতে ব্যস্ত হতেন, আমিও একই ভাবে ব্যস্ত হতাম মাতাঠাকুরানীর কাছে

* ১ ছদ্মবেশ ধারণ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে আমরা 'শিখামরী' অধ্যায়ে পুনশ্চ আলোচনা করব। নিবেদিতার পত্রাবলীতে এ ব্যাপারে অনেক তথ্য আছে।

যাবার লক্ষ্য। শ্রীমার কাছেই আমার সারাদিন কাটত। দুপুরে শুধু খাওয়া ও অল্প বিশ্রামের লক্ষ্য আসতাম। বিকালে শ্রীমায়ের কাছে যখন যেতাম, নিবেদিতা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে আসতেন। নিবেদিতার প্রতি শ্রীমার বিশেষ রকমের ভালবাসা ছিল। নিবেদিতাকে দেখতে পেলেই বড় আদরের সঙ্গে তার নামটি বেশ কয়েকবার বলতেন, আর তাঁর কাছে সরে ঘেঁষে বসতেন। নিবেদিতার বাংলা শুনে খুব হাসতেন; বলতেন, ও বাংলা বেদের সময়ের। নিবেদিতা সাধু বাংলা বলতেন, অত্যন্ত ধেমে ধেমে, স্বত্ব করে করে। সিস্টার ফ্রিষ্টিন অনেক ক্রত বলতে পারতেন, চলতি ভঙ্গিতে। তবে শ্রীমা সকলের কথা বুঝতে পেরেই খুশী। * ২

আমেরিকা থেকে যাত্রা করে মাদ্রাজে যখন দেবমাতা এসে উপস্থিত হলেন, তখন শ্রীমায়ের একটি চিঠি পৌঁছল, তাঁকে স্নেহের আহ্বান জানিয়ে। নিবেদিতা প্রকৃতি বিদেশীদের কিভাবে সমস্ত সংস্কার কাটিয়ে শ্রীমা কোলে তুলে নিয়েছিলেন, তার বিবরণ ইতিপূর্বে দিয়েছি। এখানে আর একটি দৃষ্টান্ত। শ্রীমার চিঠি—“আমার ভালবাসার দেবমাতা, আমাদের ঠাকুরের উপর তোমার গভীর ভক্তির কথা শুনে বড় ভাল লাগল। তুমি আমার মেয়ে। তোমার হৃদয়ে অকুরন্ত ভক্তি উঠুক—এই আমার আশীর্বাদ। ঠাকুরের কাছে সেই প্রার্থনাই করি। বৈচে থাক মা! আমার অল্প সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে তুমিও অনন্ত দীর্ঘরানন্দে থাক।”

ভারতবাসের সূচনায় নিবেদিতা শ্রীমার সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করেছিলেন। শ্রীমাকে খুবই আদরে যত্নে রাখতে চাইতেন তিনি। শ্রীমার পা (বাতে) পঙ্কু হওয়ার লক্ষ্য নিবেদিতা প্রায়ই তাঁকে কোলে করে উপরতলায় তুলতেন। আমাকে বলেছিলেন, ‘মাকে তুলতে কিছুই তার বোধ করতাম না, এত আনন্দ পেতাম।’

ভারতীয় যে কোনো জিনিসের প্রতি নিবেদিতার ভালবাসা মূল-প্রবৃত্তি। এক অপরাহ্নে সুনলাম, সমস্ত বাড়ি গভীর কঠোর স্তোত্রোচ্চারণে গম্গম্ করছে। ‘কী ব্যাপার?’ জিজ্ঞাসা করলাম। নিবেদিতা বলেন, ‘আমার দুই ভৃত্য এবং তাদের ভাইয়েরা বেদপাঠ করছে। প্রতি বিকালে এরা এই কাজ করে। ভৃত্য হিসাবে অপদার্থ, কিন্তু ভক্ত, আর জানে কি করে স্তোত্রপাঠ করতে হয়। শুধু এই লক্ষ্যই এদের তাড়াইনি।’

নিবেদিতা আমাকে বলেছিলেন, কখন তিনি মায়াবতীতে (আগলে আলমোড়ায়) স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন, তখন প্রায়ই তাঁকে কান্ডে হয়েছে। স্বামীজী তাঁর ভিতরকার একটা জিনিসকে চূর্ণ করতে চেয়েছিলেন—যা যাচ্ছিল না।

* ২ দেবমাতার প্রতি শ্রীমার যথেষ্ট স্নেহ ছিল। ৮. ৯. ১৯০৯ তারিখে দেবমাতাকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে পাই, ‘মাতাঠাকুরাণী তোমার কথা প্রায়ই বলেন। (তুমি চলে যাওয়ার পরে) প্রথম রাতে তোমার শূন্য স্থানটির দিকে তিনি শোখেন, বড় বেদনার সঙ্গে।’ Days in an Indian Monastery বইতে দেবমাতা শ্রীমায়ের অনেকগুলি চিঠি দিয়েছেন। স্নেহস্বাক্ষর চিঠিগুলি। শ্রীমা এক চিঠিতে লিখেছেন, ‘যে জায়গাটিতে তুমি বসতে, ধ্যান করতে, যখন সেই জায়গাটিতে চোপ পড়ে, আমি তোমার প্রেমময় চেহারাখানি মনে পড়ে যায়। বাড়ির সবাই তোমার কথা বলে।’ আর এক চিঠিতে—‘সারদানন্দ, যোগীন-মা গোলাপ-মা, সত্যকাম, কুহুমদেবী, গণেন, নিবেদিতা, স্বধীরা, সবাই ভাল আছে। তারা সবাই প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে।’

নিবেদিতা আরও বলেছিলেন, সিন্টার ক্রিস্টিন স্কুলে আসার পরে তিনি বেলুড মঠে খুব কমই যেতেন। ক্রিস্টিন প্রায় প্রতিদিন যেতেন, স্বামীজী যেন তাঁকেই শিক্ষা দিতে মনস্থ করেছেন—মনে হয়েছিল। নিবেদিতা অল্পভব করেছিলেন, তিনি বিশ্বস্ত হয়েছেন। সুতরাং তিনি স্কুলেই থাকতেন, নিঃসঙ্গে, আঘাতে, ষাটনায়। এক রবিবার স্বামীজী তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সমস্ত দিন তাঁরই জন্ত ব্যয় করলেন। ভারতবাসীর সূচনার দিনগুলির একটি যেন ফিরে এসেছে। ছুপুরে ষাওয়ার সময়ে তিনি জল নিয়ে নিবেদিতাকে বললেন, তার হাত ধুয়ে দেবেন। নিবেদিতা বললেন, ‘স্বামীজী, একাঙ্গ আপনি করবেন, সহবে না; আমারই আপনাকে সেবা করবার কথা।’ স্বামীজীর উত্তর, ‘খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন।’ *৩ এর পরে নিবেদিতা তাঁকে যখন দেখলে—তিনি আর নেই—দেহখানি পড়ে আছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটি নিতান্ত বাহ্যিক ব্যাপার—তাঁর বক্তৃতা বা কথার রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে মিশনকে অব্যাহতি দেবার জন্ত যা করা হয়েছিল। বেলুড মঠের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। তিনি পূর্ববং মঠে যাতায়াত করতেন, সন্ন্যাসীরাও প্রায়ই যেতেন তাঁর স্কুলে। তাঁদের একজন (সদানন্দ) তাঁর বক্তৃতা সফরের সময়ে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত, এবং ভ্রমণের ব্যয়টি বইবার জন্ত। *৪

একবার ভ্রমণকালে যে বিরল অভিজ্ঞতার আশ্বাদ তিনি পেয়েছিলেন, তার কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। প্রাচীন এক মন্দির দেখবার জন্ত সঙ্গীসহ তিনি গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। রাত্রি হয়ে ষাওয়ার মন্দির প্রাঙ্গণে রাত্রিষাপনে তাঁরা বাধ্য হন। রাত্রে মন্দির-উচ্চানে বস্তু জীবদের জীবনের রূপ তিনি সতৃষ্ণ কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করেন। উষার উদয়ে মন্দির সরোবরে স্নান করে আসেন, হৃদয় অতীতে পূজার্তীরা যেমন করতেন। দীপ্ত চোখে তিনি

*৩ সময়ের ব্যাপারে এখানে অঙ্গকিছু গুণগোল হয়েছে পাঠকেরা যদি ইতিপূর্বে নিবেদিতার স্বামীজী সম্বন্ধীয় চিঠিগুলি পড়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে পেরেছেন। নিবেদিতা সত্যই রবিবার গিয়েছিলেন, এবং স্বামীজীর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটানও, তাঁর সত্যই মনে হয়েছিল, পুরনো দিন যেন ফিরে পেয়েছেন, কিন্তু মধ্যাহ্নভোজন ও হাত ধোয়ানোর ঘটনাটি ঘটেছিল আরও দু’দিন পরে বুধবারে—সেই শেষ সাক্ষাৎ।

*৪ রামকৃষ্ণ মিশনেব সন্ন্যাসীরা সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে আলোচনায় অনিচ্ছুক কেন, সেই কারণ ব্যাখ্যায় দেবমাতা পত্রে লিখেছিলেন, ‘আমার মনে হয়, তার কারণ, নিবেদিতা জনপ্রিয় জাতীয় চরিত্ররূপে গৃহীত হয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রতি মিশনের কোনো সংঘর্ষের সম্পর্ক জনগণ ভাল চোখে নাও দেখতে পারত। আমি যখন ভারতে ছিলাম, তখন সরকারের সঙ্গে তীব্র রাজনৈতিক মনকষাকষি এবং নিবেদিতা যেভাবে খোলাখুলি কথা বলতেন, তাতে মিশন বেআইনী ঘোষিত হতে পারত। সেইজন্ত সন্ন্যাসীরা সরকারীভাবে জানিয়ে দিলেন, তাঁদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু ভিতরে সম্পর্ক অব্যাহত ছিলই।’

বর্ণনা করেছিলেন—কিভাবে উদীয়মান সূর্যের কিরণ উড়ানের ঘন বুদ্ধলতা ভেদ করে অপূর্ব মহিমার আলোকে ভরিয়ে তুলেছিল মন্দিরটিকে। রাত্রির নানা অস্ববিধা, আরণ্যক হিংস্র জীবদের থেকে সম্ভাব্য বিপদ—এসব কিছুই নয় তাঁর কাছে। তাঁর সমস্ত কথা বা কাজের মধ্যে বীররস-প্রবাহ তরলিত হত। যেভাবে এবং ভঙ্গিতে তিনি নগ' সাগার ত্রানহিন্দুড়ার কথা মনে করিয়ে দিতেন। সেই একই বেপরোয়াভাব, একই সাহসের ছন্দ, একই কল্পনার বিশালতা।

দেবমাতা এখানে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আংশিক সত্য। মিশন সম্পষ্ট নীতি অমুযায়ী সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, বেআইনী হবার ভয়েই নয়। সে ভয় নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তা সবেও বোমার মামলার আশামীর। যখন পূর্ব মত ত্যাগ করে মিশনে যোগদান করেছিলেন, তখন তাঁদের নিতে মিশন পেছাপাও হয়নি, যদিও তার ফলে বিপদ যথেষ্টই বেড়েছিল। বিষয়টিই 'শিখাময়ী' অধ্যায়ে ব্যাপকভাবে পর্যালোচিত হবে।

নিবেদিতা, বিভালয়ের সঙ্গে যোগ কখনই ছিন্ন করেন নি। বিভালয়ের অংশীদার তিনি। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা বা লেখা, এবং ডাঃ বহুর সঙ্গে তাঁর কাজ—এ সবার জন্ত পড়ানোর কাজে তিনি সব সময়ে নিযুক্ত থাকতে পারতেন না। তিনি কখনই ডাঃ বহুর চাকুরিয়া-সেক্রেটারী ছিলেন না—তিনি তাঁকে বদ্ধভাবে সাহায্য করতেন। ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মে আমি যখন তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম, তার আগে থেকেই তিনি ডাঃ বহুর সঙ্গে কাজ করছিলেন। তারপর থেকে দেখলাম, বহুর সঙ্গে তাঁর কাজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত সময় ও মনোযোগ গ্রাস করে ফেলতে লাগল, এবং অল্প কাজ করতে লাগল।

লেডী বহুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ত তাঁর দার্জিলিং যাত্রাই শেষ যাত্রা। দারুণ আমাশয় ধরল সেখানে, দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে গেলেন। জীবনের শেষ রাত্রে চারটির সময়ে ধারা তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলেন, তাঁদের বললেন, 'ভরী ডুবছে, কিন্তু সূর্যোদয় দেখবই।' সে সূর্যোদয় তিনি দেখলেন, প্রয়াণ করলেন উর্ধ্বতর লোকে। ডাঃ বহু ও দার্জিলিংয়ের প্রধান হিন্দু নাগরিকেরা তাঁর দেহকে বহন করে নিয়ে গেলেন সৎকার স্থানে। বহু সংখ্যক বন্ধুও অমুরাগীরা সার দিয়ে অনুগমন করলেন। তাঁর সৎকার সর্বসাধারণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। * ৫

তিনি কলকাতায় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে আমাকে বলেছিলেন তিনি ষ্টিক আরো এগারো বছর বাঁচবেন। মোটামুটি তাই, ঘটেছিল।

* ৫ দেবমাতা জানিয়েছেন নিবেদিতার মৃত্যু ও সৎকারের বিবরণ তিনি সিস্টার ক্রিস্টিনের কাছ থেকে পেয়েছেন। এ বিষয়ে আরও তথ্য পরে দেওয়া হবে।

নিবেদিতা ও রামকৃষ্ণ মিশন

ধর্মসংঘ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিবেদিতা জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন—শুধু এই কারণের জন্য নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব অনেকের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে। কিছু আগে ‘ব্রহ্মানন্দ-নিবেদিতা’ প্রসঙ্গে বিষয়টির উত্থাপন করে কিছু বক্তব্য আমরা বলেছি। এখানে বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করে নেওয়া যায়।

বহু মহল থেকে ইদানীং অভিযোগ উঠেছে, নিবেদিতার প্রতি রামকৃষ্ণ মিশন তার দায়িত্ব পালন করেনি। অভিযোগের বহর থেকে দুটি সিদ্ধান্ত আমরা করতে পারি :

রামকৃষ্ণ মিশন সত্যই দায়িত্ব পালন করেনি।

জনসাধারণ সত্যই দায়িত্ব পালন করেছে।

যাচাই করে দেখা যেতে পারে এই দুটি সিদ্ধান্তের কোনটি কী পরিমাণে সত্য।

প্রথম সিদ্ধান্ত—রামকৃষ্ণ মিশন দায়িত্ব পালন করেনি,—ধরা যাক কথটা সত্য। নিবেদিতার যে-মহাজীবন এবং বিরাট কীর্তি এই এত্বে আমরা উপস্থিত করছি, তার আলোকে দেখা যাবে, এমন একটি চরিত্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করা সত্যই কঠিন, কার্যতঃ অসম্ভব। সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেনি মিশন। তবে যদি কথটা এই দিক থেকে বলা হয় যে, নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপকে মিশন তার সংঘসঙ্গে আশ্রয় না দিয়ে দায়িত্ব পালন করেনি, তার উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে—মিশন তার মূলচরিত্র বদল করার আগে তা করতে পারত না,—করলে রামকৃষ্ণ

মিশন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শাখাবিশেষ হয়ে উঠত।*

তাছাড়া মিশন আব কোন্ দায়িত্ব পালন করেনি, সে বিষয়ে লেখক ও বক্তাগণ স্পষ্ট নন। একজন যাত্র এই অভিযোগ এনেছেন—দার্জিলিংয়ে নিবেদিতার দাহক্ষেত্রে কোনো স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা মিশন করেনি। সে কাজ করেছে কে—নিবেদিতার সংকার ক্ষেত্রটুকু বাঁধিয়ে দেবার ব্যবস্থা? —কংগ্রেসের রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কর্তৃপক্ষ, যাঁরা বৃহত্তর রামকৃষ্ণ সংঘেরই অন্তর্ভুক্ত।

নিবেদিতার রাজনৈতিক ভূমিকাকে সম্মানিত না করে যদি রামকৃষ্ণ মিশন অন্ডায় করে থাকে, তাহলে সেই অন্ডায় মিশন আরও অনেকের সম্বন্ধে করেছে, যেমন ধরা যাক, সত্যচন্দ্র বসু সম্পর্কে (কিংবা জহরলাল সম্পর্কে, কিংবা গান্ধীজী

* রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণার কথা নিবেদিতা স্বয়ং এইভাবে লিখেছেন—

“Our Master (Vivekananda) at any rate, regarded the Order to which he belonged, as one whose lot was cast for all time with the cause of Woman and People……He ignored all the proposals that reached him which would have pledged him to one party or another as its leader. Only let Woman and the People receive education! All further questions of their fate, they would themselves be competent to settle.”

সম্পর্কে) যিনি রাজনৈতিক ছিলেন অর্থাৎ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ভরসা করা যায়, সুভাষচন্দ্রের স্বতিরক্ষার ব্যবস্থা রামকৃষ্ণ মিশন কেন করেনি, এই অভিযোগ উত্থাপন করবেন না কেউ।

এমনও কোথাও কোথাও শোনা গেছে, নিবেদিতার পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার ব্যাপারে মিশন দীর্ঘদিন অবহেলা দেখিয়েছে। কথাটা সত্য। এই অবহেলা মিশন সংঘলননী সারদাদেবী, প্রথম সভাপতি, এবং প্রথম সম্পাদক—ঈদের রামকৃষ্ণ মিশনের মূলসংগঠক বলা যায়—সেই ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দ সঙ্কেও দেখিয়েছে। সারদাদেবী, ব্রহ্মানন্দ বা সারদানন্দ সঙ্কে যে অস্ত্রায় করতে পারে, নিবেদিতা সঙ্কে তা করা অসম্ভব নয়, কারণ মিশনের কাছে নিশ্চয় সারদাদেবী, ব্রহ্মানন্দ বা সারদানন্দের চেয়ে তিনি বড় আসনে অধিষ্ঠিতা নন।

স্বাধীনতার আগে মিশনকে জীবনী প্রভৃতি রচনা অপেক্ষা লোকসেবা মূলক কাজে বেশী মনোযোগী হতে হয়েছিল।

কিন্তু এই কালে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকেও নিবেদিতার পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনায় কেউ এগিয়ে আসেনি। এসেছিলেন বিদেশিনী এক মহিলা লিজেল রেম, দীর্ঘ কয়েক বৎসর নিবেদিতার উপরে গবেষণায় ব্যয় করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরেই নিবেদিতার উপরে গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ এদেশে জেগেছে।* এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনও, বিলম্বে হলেও, তার দায়িত্ব যোগ্য ভাবে পালন করেছে। প্রত্নাজিকা আত্মপ্রাণ ও প্রত্নাজিকা মুক্তিপ্রাণ আরও গবেষণা চালিয়ে দুটি তথ্যপূর্ণ জীবনী রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকেই প্রকাশ

* এই বইটির বাংলায় অপূর্ব অনুবাদ করেছেন স্রীনারায়ণী দেবী। তাঁর কাছে শকলেই কৃতজ্ঞ।

এবং—নিবেদিতার সমগ্র রচনাবলী একত্রে প্রকাশে তৃতী রামকৃষ্ণ মিশনই।

করেছেন। সেই জীবনীগুলি অতীব প্রশংসনীয়; কেবল বৃহৎ সমালোচনা করে এটুকু বলা চলে, নিবেদিতার বিপ্লবাত্মক রাজনীতি সঙ্কে লেখার ক্ষেত্রে তাঁরা মানসিক অস্বস্তি বোধ করেছেন, এবং বিপ্লবের সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগ ঠাণ্ডা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এঁদের সমালোচনা কিছু বেশী উগ্রাপূর্ণ হয়েছে।

এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়—দীর্ঘদিন ধরে নিবেদিতার বিষয়ে ক্ষুদ্র উৎকৃষ্ট যে পুস্তকখানি প্রচলিত ছিল (সরলাবালা সরকার লিখিত), সেটির প্রকাশক রামকৃষ্ণ মিশনই।

এর বিপরীত প্রশ্ন—জনসাধারণ নিবেদিতার জন্ম কি করেছে—যে জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্ম তিনি মিশন ত্যাগ করেছিলেন এবং তার জন্ম দীর্ঘ অন্তর্ঘাতনা বহন করেছেন? জনসাধারণের কিছু অংশে রামকৃষ্ণ মিশনের বিরোধী সমালোচনা দেখে মনে হয়—নিবেদিতা ইতোমধ্যেই স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্ততম স্থপতিক্রমে স্বীকৃতা হয়েছেন, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সরকারী ভবনসমূহে তাঁর প্রতিকৃতি লম্বিত রয়েছে সরকারী প্রচারসম্মেলি তাঁর নিত্য নাম গানে বিভোর। হায় কত অলীক সেই স্বপ্ন! আর বে-সরকারী প্রচেষ্টা? কোনো স্পষ্ট কাজ অপেক্ষা তা ‘অপরে কি করেনি,’ তারি হিলাব গ্রহণের উদ্ভেজনা কতখানি নিঃশেষিত।

একটি নিষ্ঠুর সত্য বলা যাক; ভারতবর্ষের সভ্যতার মহিমাখ্যাপনের সময়ে নিবেদিতা সভ্যতাই সামগ্রিক হারিয়ে ছিলেন। তিনি বড় বেশী ‘ভারতবর্ষীয় কৃতজ্ঞতা’র গুণগান করেছেন। নিবেদিতার অপকল্প রচনার উদ্ভিষ্ট সেই ভারতবর্ষীয় কৃতজ্ঞতার বাস্পমাত্র বর্তমান ভারতবর্ষে নেই। যদি থাকত, তাহলে নিবেদিতা গ্রন্থাবলী স্থলভে দেবার জন্ম অর্থ সাহায্যের আবেদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুষ্টিভিত্তিক এবং ভারত সরকারের সরাসরি প্রত্যাখ্যান—একমাত্র উত্তর

হত না !* স্বতন্ত্রতার অস্ত্র ব্যবস্থা ? সে সব দাবি নিবেদিতার জন্ম না করাই ভাল, কারণ তিনি নিজের অপেক্ষা ভারত-বর্ষকেই বড় করেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক ছিলেন না, দেশপ্রেমিক ছিলেন, এবং রাজনৈতিকদের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর অপেক্ষা তাঁর গুরুতর অন্তর্দৃষ্টিই স্বচ্ছতর ছিল।

তথাপি গত্য নির্ধারণের জন্ম যদি নিখিল কোনো বিচারালয় থাকে, সেখানে ভারত সরকার বা ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক সরকার সমূহকে একটি জবাবদিহি করতে হবে তাঁরা তাঁদের বর্তমান স্বাধীনতার সৌভাগ্যের জন্ম ষাঁদের কাছে ঋণী—তাঁদের প্রতি দায়িত্ব কেন পালন করেন নি। যদি না করেছেন—তাহলে মিথ্যা কথা কেন বলেন—কেন বলেন যে, আমরা আমাদের জাতীয় শৌধের স্বপতিদের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ নিবেদিতার কাছে ঋণস্বীকারের দায়িত্ব আরও বেশী। কেননা তিনি বিদেশিনী। ভারতবাসী ভারতবর্ষের মুক্তির জন্ম প্রাণ দেবে, তাই স্বাভাবিক। যদি বিদেশী কেউ তা করে এবং তিনি যদি নিবেদিতার মত বিরাট চরিত্রের মানুষ হন—তাঁর প্রতি হৃদয় উজাড়-করা কৃতজ্ঞতাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, যে দেশ নাকি প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলনের মহান ভূমিকা গ্রহণে বদ্ধপরিকর।

সরকার চিরদিনই স্বল্প—জনসাধারণের ইচ্ছার বেগ তাকে সচল করে। জিস্তাসা করা যায়, নিবেদিতা শতবার্ষিকী উপলক্ষে অয়োজিত সভাসমূহে নিবেদিতার স্বতন্ত্রতায় সরকারী ঔদাসীন্ধ্য কী পরিমাণে সমালোচিত হয়েছে? রামকৃষ্ণ মিশনের সমালোচনা বাঁরা নাটকীয় ভাবে সভাসমিতিতে করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ সংবাদ পত্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁদের পত্রিকাগুলি বহু ব্যাপারে ক্রুদ্ধ আক্রোশে সরকারের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় স্তম্ভ

বিদীর্ণ হা-হা স্বনি করে—এক্ষেত্রে নীরব কেন? এর একটি মাত্রই উত্তর সম্ভব, অতি তিস্ত উত্তর, আমরা কিছু গড়তে পারি না, কিন্তু যদি কিছু গড়ে ওঠে, তাকে ভাঙ্গবার চেষ্টা করতে পারি। নিজেরা কিছু না করে রামকৃষ্ণ মিশন কি করেনি, তারই উত্তর সন্ধান ব্যস্ত হতে পারি।

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার তথাকথিত সম্পর্ক-চ্ছেদ যে কত বহিরঙ্গ, দীর্ঘস্থান ধরে তার প্রমাণ আমরা দিয়েছি—বিচ্ছেদের পরেও রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয়ে প্রভূত তথ্য দেওয়া হয়েছে। আরও দু'একটি তথ্য এখানে জানানো যায়। স্বাধীনতার জন্ম তথ্যসংগ্রহ, তাঁর গ্রন্থগুলি সম্পাদনায় বহু দায়িত্ব নিবেদিতা-গ্রহণ করেছিলেন মঠ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে। এ বিষয়ে লিঙ্কে রেম'র গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা যাক :

“ইংলণ্ডে বসে লেখা ‘রাজযোগ’ ছাড়া স্বাধীনতা এলো-মেলো একগাদা খসড়া আর নানা ধরনের টুকরো লেখা রেখে গিয়েছিলেন। শুভউইন শর্টহাণ্ডে একরাশ ভাষণ ধরে রেখেছিলেন, সেগুলোও খুব সাবধানে সম্পাদনা করা সরকার। এ কাজে যে-সাধুবা নেমেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতাও হাত মেলান। ...‘কর্মযোগে’র কাজ করে নিবেদিতা ‘জ্ঞানযোগে’ আর একবার তুলি বুলোলেন।...নিবেদিতা তাঁর যা-কিছু সব তুলে দিলেন- মিশনের সাধুদের হাতে। তাঁরা যে বিরাট বইখানার মালমসলা যোগাড় করেছিলেন, তার জন্ম আমেরিকায় পাওয়া অটোগ্রাফ চিঠিগুলো নিবেদিতা তাঁদের দিয়ে দিলেন। বইখানার নাম হবে ‘দি লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ, বাই হিজ ইমর্টার এণ্ড ওয়েস্টার্ন ডিগ্রাইপল্‌স্‌।’”

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পক্ষ থেকেই যে নিবেদিতা স্বাধীনতার রচনাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন, তার পক্ষে একটি স্পষ্ট প্রমাণ আমরা সম্মতি সংগ্রহ করতে পেরেছি। স্বামী নির্লেপানন্দের কাছে নিবেদিতার একটি চিঠি আছে,

* নিবেদিতা গলস স্কুল এই উত্তরই পেয়েছে।

৪৭৬ নিবেদিতা লোকমাতা

যাতে নিবেদিতা মঠ-কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে গুড্‌উইনের ভগ্নীকে স্বামীজীর রচনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে চিঠি লিখেছেন। চিঠিটি মূলে উদ্ধৃত করছি :

To Mrs. Margaretta Edmunds

9, Englis Road, Southern Sportsmouth.

3 Oak...

Burling-in-Wharfdale

Feb 12, 1909

Dear Mrs. Edmunds,

A letter which you wrote to the Swami Vivekananda, in 1898, on your mother's behalf regarding the death of your brother Mr. Goodwin has fortunately turned up. This gives me a little hope of reaching you, which otherwise I had failed to do, by writing to Bristol.

We have been trying to find you for some time, to ask if, amongst your brother's papers there might be any notes of talks or lectures by the Swami Vivekananda still unused. If so, would you feel that you could part with them? Would you mind writing to me on this point?

You probably know that the Swami himself died on July 4th 1902. You will understand therefore how high a value his letters and notes would have for us. I may say that I write with the authority of the monastery and his Brethren.

I am an English woman and the last of

our little group who saw dear Mr. Goodwin. He met me at Madras and spent the whole day with me about the 21st of Jan. 1898.

Believe me dear Mrs. Edmunds,

Very sincerely yours,

Margaret F. Noble.

নিবেদিতার দেহত্যাগে রামকৃষ্ণ মিশনের ইংরেজী ও বাংলা দুই মুখপত্র প্রবুদ্ধ ভারত ও উদ্বোধনে কি জাতীয় শোকপ্রবন্ধ বেরিয়েছিল, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সেগুলি আমরা পত্র-পত্রিকার শোকপ্রবন্ধের সঙ্গে উদ্ধৃত করব, এবং পরবর্তী-কালে ক্রমান্বয়ে নিবেদিতার রচনাদি কি ভাবে প্রবুদ্ধ ভারত প্রকাশ করে আসছে, তাও স্মরণ করিয়ে দেব, সেই সঙ্গে দেখিয়ে দিতে ইচ্ছা করব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কে নিবেদিতা কতখানি মর্যাদা দিতেন, এবং অল্প পক্ষও তাই। লিজেস রেম'র রচনা থেকে পুনশ্চ উদ্ধৃত করছি। নিবেদিতার জীবনের একেবারে শেষকণের কথা—যখন দার্জিলিঙে মৃত্যুশয্যায় তিনি শায়িত—

“শেষ একটি আনন্দ বুঝি তোলা ছিল তাঁর অন্ত। গগন মহারাজের সঙ্গে জয়পুরে আচার্য বহুর আলাপ হয়, তিনি ঠিক সময়ে এসে হাজির হলেন। মঠের বাগান থেকে এক ঝড়ি ফল এনেছেন। সাধুরা পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে, নিবেদিতা অসুস্থ, এবং পাওয়ার আগে এমনি-কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় আছেন। এ ফল যে নিবেদিতায় কাছে যাবার বেলায় গুরুর প্রসাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, ছুটি হলে আম দেবেন। সেই কথা নিবেদিতার মনে পড়ে যায়। সামর্থ্য থাকতে থাকতে বন্ধুদের সবাইকে নিয়ে আরেকবার নিবেদিতা আনন্দ করে ফল খেয়ে নিতে চাইলেন।

দেহত্যাগের ৬ দিন আগে, ৭ই অক্টোবর, নিবেদিতা উইল করেছিলেন। তা এই—

“বর্টন শহর নিবাসী উকীল মিঃ ই. জি. থর্প আমাকে অথবা আমার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ককে যাহা কিছু দিবেন, বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আমার নামে যে তিন শত পাউণ্ড আমানত জমা আছে, এবং আমার বাবতীয় পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ আয় ও উহাদিগের মধ্যে যেগুলির গ্রন্থস্বত্ব আমার আছে—সেই সকল আমি বেলেডের বিবেকানন্দ স্বামীজীর মঠের ঐক্যগণকে দিতেছি। তাঁহারা ঐ অর্থ চিরস্থায়ী ফাণ্ডরূপে জমা রাখিবেন এবং ভারতীয় নারীগণের মধ্যে জাতীয় প্রণালীতে জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের জন্ত তাঁহারা মিস ক্রিষ্টিন গ্রীনস্টাইডেলের পরামর্শগত উহার আয় মাত্র ঐ উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবেন।” (মুক্তিপ্রাণী)

যে রামকৃষ্ণ মিশনকে নিবেদিতা যথাসর্বস্ব দিয়ে গিয়েছিলেন (রামকৃষ্ণ মিশনকেই দিয়েছিলেন।) বিদ্যালয় পরিচালনার জন্ত—সেই মিশন কত সঙ্কটের মধ্য দিয়ে সেই দায়িত্ব পালন করেছিল, তার কিছু তথ্য অল্প পরেই উদ্ধৃত স্বামী গন্তীরানন্দের রচনাংশ থেকে পাঠক দেখবেন। এখানে শেষ কথা জানাই—স্বামীজীর সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী যখন বেরুল, যে রচনাগুলি রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে গীতাতুল্য, সেই গ্রন্থাবলীর ভূমিকা লেখার ভার দেওয়া হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে দল ত্যাগিনী নিবেদিতার উপরই !!

নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্ক বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক সমালোচনার বিষয় হওয়াতে স্বামী গন্তীরানন্দ তাঁর History of the Ramakrishna Math and Mission-এর মধ্যে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। তথ্যপূর্ণ, উদ্ভাসীন, সামাজিকসুস্কৃত এই রচনাটি উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করি—

“নিবেদিতা নিজের মনপ্রাণ মিশিয়ে দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষেই। ভারতে ব্রিটিশ শাসন তাঁর বিবেকবুদ্ধিতে আঘাত করত। জন্মে আইরিশ তিনি ব্রিটিশ পীড়নের মধ্যে বুদ্ধিপ্রাপ্ত, স্বদেশে হোম রুল আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন অবসানের জন্ত একই পদ্ধতি প্রয়োগে স্বতঃই তিনি প্রণোদিত ছিলেন। কিন্তু আমরা পৌঁড়ামির সঙ্গে একথা বলতে পারি না, তিনি বিপ্লবাত্মক রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। কারণ, আমাদের মতে, কোনো মতের প্রতি সহানুভূতি, তা প্রকাশ বা গোপন যাই হোক, এক জিনিস, আর কাজে সক্রিয়ভাবে নেমে পড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। আমরা জানি, কোনো কোনো আধুনিক লেখক বলেন, তিনি স্বার্থেই বিপ্লবাত্মক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন এমনকি তার স্তম্ভ নেত্রীও ছিলেন। এইসব বিভ্রান্তমূলক বিষয়ে আমরা ইচ্ছাপূর্বক নীরব থাকতে চাই। আমরা যা সর্বাধিক জানি তা হল, স্বামীজীর মহাসমাধির অব্যবহিত পরেই তিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো অংশ ভ্রমণ করেন, এবং সেইসব স্থানে ভারতের রাজনৈতিক দাপটকে কঠোর দৃষ্টিতে দেখেন। আমরা স্বীকার করি, এটি মহাবীরের ভূমিকা এবং জাতীয় দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ প্রশংসার অধিকারী। আমরা আরও জানি যে নিবেদিতার প্রতিভা বহুমুখী,—মনে দাগ কাটবার মত লেখিকা, নাড়া দেবার মত বক্তা তিনি; কথাবার্তার সময়ে মোহিত করে রাখবার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল। এবং একথাও সম্ভবতঃ বলা যায়, মূলে ধর্মপ্রবণ হলেও তিনি ‘আত্মপ্রকাশ’ চাইতেন; তাঁর গতিময় ব্যক্তিত্ব এবং আত্মোৎসর্গ একটি বালিকা বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারে না, এমনকি অসুস্থরূপে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মধ্যেও নয়। সর্বত্রই তাঁর বন্ধু-বান্ধব ছিল—শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, দেশপ্রেমিক, এক কথায় সেকালের ভারতবর্ষে যাঁরা অস্বাভাবিক ও অগ্রগামী প্রগতিশীল—সকলের

মধ্যেই তাঁর সঞ্চরণ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য পেয়েছেন, তাঁর দ্বারা অমুপ্রাণিত হয়েছেন। ভারতবর্ষের পক্ষে সে একটা বিরাট লাভ, এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে নিবেদিতার নাম অম্লান অক্ষরে লিখিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন এই, মিশন কি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে পারে, কিংবা যিনি ব্রহ্মচারিণীর বেশ ধারণ করেও সমকালীন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে উচ্চ কঠে কথা বলেছেন—তাঁকে আশ্রয় দিতে পারে? সে বিষয়ে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের স্পষ্ট দৃঢ় নির্দেশ—এই সংঘ রাজনীতি এবং উগ্র সমাজসংস্কার চেষ্টা থেকে দূরে থাকবে।

রামকৃষ্ণ আন্দোলনের নেতৃগণের নিকট কর্তব্য ছিল স্পষ্ট, যদিও বেদনাদায়ক; কারণ নিবেদিতা কি বিবেকানন্দের গুরুভাইদের পরম স্নেহ-পাত্রী ছিলেন না, এবং সংঘ কি স্বামীজীর এই গুণশালিনী অধ্যাত্মকল্পার নিকট অনেক কিছু আশা করত না? স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভগিনীকে ডেকে রাজনীতি ত্যাগ করতে বলেছিলেন। ভগিনীর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। স্মরণ্য মঠ ও মিশন থেকে নিজেই বিযুক্ত করা ছাড়া তাঁর পক্ষে অন্য উপায় ছিল না। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জুলাইয়ের এক চিঠিতে তিনি সেই কাজ করলেন। এখনকার রাজনৈতিক বুদ্ধি সম্পন্ন কিছু বাঙালী লেখক এই বেদনাদায়ক ঘটনাটি নিয়ে অনেক ঝগড়া করেছেন। খুবই নাটকীয়ভাবে বলা হয়েছে, এ-হল মিশনের সঙ্কীর্ণ গুণ্ডা থেকে নিবেদিতার বিতাড়ন এবং ভারতের জাতীয় জীবনে তাঁর উত্তরণ। কোনো কথাই সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। একদিক দিয়ে বলতে গেলে বিতাড়ন বলতে যা বোঝায় মিশন কখনই তা করেনি, বাইরের ব্যাপারে সম্পর্কচ্ছেদ মাত্র হয়েছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল হয়নি,। সে সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। স্বামী সারদানন্দ নিবেদিতার বিদ্যালয়কে আর্থিক ও অস্বাস্থ্য ব্যাপারে সাহায্য করে গেছেন। মঠের প্রবীণ সাধুদের কাছে, এবং শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে তিনি রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দের চরণে নিবেদিতা সেই চিরদিনের প্রিয় কন্যা 'নিবেদিতা'ই ছিলেন; আর তিনিও জীবনের শেষ পর্যন্ত সেই পরিচয়ই দিয়ে গেছেন। ১৯০৬ সালে স্বামী স্বরূপানন্দের দেহত্যাগের পরে নিবেদিতাই ১৯১১ সালে নিজ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রবুদ্ধ ভারতে (সেইকালে মিশন পরিচালিত একমাত্র ইংরাজী মাসিক পত্রিকা) মাসের পর মাস Ocasional Notes-এর অধিকাংশ লিখেছেন। এইকালে তিনি একাধিকবার মিসেস শেভিয়ারের অতিথি হিসাবে নারীবতীর অদ্বৈত আশ্রমে কাটিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রবুদ্ধ ভারত তার নভেম্বর সংখ্যাকে 'সিস্টার নিবেদিতা স্মৃতি সংখ্যা' রূপে প্রকাশ করে। তারপরে মিশনের পক্ষে যতখানি করা সম্ভব নিবেদিতার স্মৃতি রক্ষায় ততখানিই সে করেছে। এর পক্ষে প্রমাণরূপে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের অংশগুরুত্ব সংখ্যা থেকে নিম্নের অংশটি উদ্ধৃত করছি:

“গোড়ায় বিদ্যালয়টির নির্দিষ্ট কোনো নাম ছিল না। স্থানীয় লোকজন বলত ‘নিবেদিতার স্কুল।’ নিবেদিতাকৃত নামকরণ—“The Ramakrishna School for Girls.” কোনো কোনো পাশ্চাত্যবাসী বলেছেন” Vivekananda School’। ভগিনী নিবেদিতার লোকান্তরের পরে ১৯১৮সালে বিদ্যালয়টি যখন রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হল তখন বর্তমান নামকরণ করা হয়—“The Ramakrishna Mission Sister Nivedita Girls’ School.”

আরও জানানো যায়, ‘উদ্বোধন অফিস’ থেকে নিবেদিতার কয়েকটি বই প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়, যার বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিবেদিতা বিদ্যালয় লাভ করবে। বাকি বইগুলি একই উদ্দেশ্যে নিবেদিতা মেসার্স লন্ডন গ্রীন এণ্ড কোম্পানীকে দিয়ে গিয়েছিলেন। উক্ত কোম্পানী যখন বই গুলি আন লাভজনক নয় বলে দীর্ঘদিন ধরে সেগুলির পুনর্মুদ্রণে

বিরত ছিল, তখন মায়াবতী অর্ধেত আশ্রম নিবেদিতা বিভাগের পক্ষে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করে। পুনশ্চ, ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে বিভাগের অর্থ জয়ন্তী উপলক্ষে নিবেদিতার স্মৃতিতে ভারত এবং লন্ডনে সভা আয়োজিত হয়েছিল, এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে পাঁচ হাজার টাকা অর্পণ করা হয় স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্ত। শেষতঃ উদ্বোধন অফিস প্রথমাবধি নিবেদিতার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত চালু রেখেছে এবং নিবেদিতার ছবিও। মঠ ও মিশনের সর্বত্র তাঁর চিত্র সম্মানের সঙ্গে টাঙানো থাকে।

অপরপক্ষে কেউ যদি একথা বলেন, এদেশে নিবেদিতা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছেন—সে ব্যাপারটা এখনো প্রমাণসাপেক্ষ। আমরা মিশনের প্রথম সাধারণ কার্যবিবরণী (১৯১৩) কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

‘[ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে] তাঁর বিভাগের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে, কারণ ভগিনী নিবেদিতা তাঁর উইলের দ্বারা তাঁর গ্রন্থাদির যে স্বত্ব দান করে গিয়েছিলেন, তা বিভাগের প্রয়োজন নির্বাহের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট ছিল না। ভগিনী নিবেদিতার স্মরণার্থে কলিকাতা টাউন হল ১৯১২ সালের মার্চ মাসে যে স্মৃতিসভা হয়, তাতে ভগিনীর বিভাগের জন্ত অর্থসংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিছু স্মৃতি-ভাণ্ডারে এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু সংগৃহীত হয়নি। ভগিনী নিবেদিতার পরম পবিত্র স্মৃতি স্মরণার্থে জন্ত স্মৃতি সমিতি এ পর্যন্ত ২,৫২২ টাকা ৭ আনা ৯ পাই সংগ্রহ করছে।...তার মধ্য থেকে ২,০৮৪ টাকা ৭ আনা ৯ পাই রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির হাতে দেওয়া হয়েছে বিভাগের জন্ত।’

তাই বলে আমরা একথা বলতে চাইছি না, দেশ ভগিনীর কাছে ঋণ স্বীকার করেনি। যা বলতে চাই তা হল,

এক্ষেত্রে উচ্চ উচ্চ উজ্জ্বল ব্যাপারে সংযত হওয়াই ভাল। এই সঙ্গে অবিলম্বে আমরা যোগ করে দিচ্ছি—স্মার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ অনেকে ভগিনীর প্রতি ব্যক্তিগত প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অনেক কিছু করেছেন। যে সঙ্গ গলিতে ভগিনীর বিভাগ স্থাপিত সেটিও তাঁর নামাঙ্কিত।’

গম্ভীরানন্দের এই সংযত রচনাটি প্রচণ্ড সন্দেহ নেই। ভগিনীর প্রতি সমূহ কৃতজ্ঞতায় অল্পত বাঙালী অতঃপর ভগিনীর স্মৃতিতে বথার্থ কিছু করার পরেই রামকৃষ্ণ মিশনের তথাকথিত ঔদ্যোগিক সমালোচনা করবেন, এই আশা করা যায়। জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর বিজ্ঞানাগারের প্রবেশপথে নিবেদিতার মূর্তি বসিয়েছিলেন, এবং নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার জন্ত নিজ উইলে এক লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছিলেন—তিনি কিন্তু সমালোচকদের দলবৃদ্ধি করেননি।

গম্ভীরানন্দের রচনার শেষাংশে নিবেদিতা স্মৃতি সমিতির শোচনীয় কর্ম-শৈথিল্যের যে উল্লেখ আছে, যা আমাদের জাতীয় ঔদ্যোগিকতার আরক, সে বিষয়ে সমকালীন সংবাদপত্র থেকে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি। সেগুলি উদ্ধৃত করেই বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব। ২ই জুন, ১৯১৩, অমৃতবাজার পত্রিকায় নিয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়—

It was shortly after the death of the late lamented Sister Nivedita in October, 1911, that a condolence meeting was held at the Town Hall. In that meeting it was resolved, amongst other things, to commemorate the hallowed memory of the Sister by providing funds for the maintenance and development of the Girls' School at Baghbazar which she had started and which she was rearing up with

her heart's blood. The resolutions of course were moved with fervid eloquence, of which there is never any dearth in our country, and surely no worthier way of perpetuating her memory than the one resolved upon could have been hit upon. But unfortunately, as is usually the case, as soon as the effervescence of the Town Hall speeches subsided, the practical aspect of the thing was relegated to oblivion. To-day, after 20 months have rolled by we are told, by the authoritative report of that school published by Swami Saradananda of the Ramakrishna Vivekanand Mission, that the only subscriptions so far collected towards this noble object amount to Rs. 932-7-9 collected before and after that meeting. Of this the report says, Rs. 784-7-9 are in hand. The balance having been spent in meeting the expenses of the meeting. Among the donations promised at the meeting and not yet realised may be mentioned : Rs. 1000 from Dr. Rash Behari Ghose, Rs. 500 from Mrs. J. C. Bose, Rs. 250 from Babu Bhupendra Nath Bose, Rs. 100 from Mr. C. C. Ghose and others. In the meantime, as we are told, the present conductors of the School are finding it rather uphill work to keep up the institution to the requisite level of efficiency. We hope the donors and the office-bearers of the Memorial Committee will kindly see that such a noble and useful institution does not languish for that support which it has a right to expect of them. Apart from the sacred duty of commemorating the late Sister's memory to which they and others have pledged themselves this school has an additional title

to the warmest support from the Hindu section of the public atleast. For, it is decidedly one of the very few institutions, if not the only institution of its kind, that has real access to Hindu middle-class ladies behind the Purdah and that imparts education on thoroughly oriental lines.

চাঞ্চল্যকর মন্তব্য। আপত্তিকর' ও বটে; কেননা দেশের নামকরা কয়েকজনের বিরুদ্ধে নাম করে অভিযোগ করা হয়, তাঁরা নাকি টাকা দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন, তাও সামান্য কয়েকটি টাকা। নিশ্চয় কানাকানি, আলোচনা হইবে এবং অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট ব্যক্তিরা কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন—হয়ত আইনের শাসনিও। অমৃতবাজার ভ্রম পেয়েছিল, যে-রকম ভ্রম পেতে সে অভ্যস্ত, এবং অকুণ্ঠে ক্ষমা চেয়েছিল, যে-রকম ক্ষমা চাইতেও সে অভ্যস্ত। মধ্যবর্তীকালে অমৃতবাজারের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটির কৈফিয়ত দিয়ে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে আর একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য বেরুল ১৩ই জুন সংখ্যায়। ঐ লেখাটির মধ্য থেকে মনোযোগী পাঠক অনেক কিছু ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে পারবেন এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, ঐ সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যে, প্রতিশ্রুত টাকা দেননি, (যাদের কেউ কেউ লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছেন), তার মূলে ছিল—টাকাটা অনভিপ্রেত সংগঠনের হাতে যাবে—এই অস্বস্তি। নচেৎ 'বিভাগীয় পরিচালনার উপযুক্ত দায়িত্বশীল কমিটি গঠিত হয়নি বলেই' তাঁরা টাকা দিতে পারেননি, এই অজুহাত উঠত না। নিবেদিতার স্বত্বস্বাক্ষর ক্ষেত্রে এঁরা পছন্দসই প্রতিষ্ঠান চেয়েছিলেন—স্বামী সারদানন্দ্রের পরিচালিত সংগঠন সে পছন্দের অংশ পায়নি। অথচ নিবেদিতা তাঁর উইলের সব টাকাই রায়ব্রহ্ম মিশনের ট্রাস্টিদের হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন, যারা সিন্ডিকার ক্রিস্টিানের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বিভাগীয়

পরিচালনা করবেন। অমৃতবাজার পত্রিকা এঁদেরই দ্বারা পরিচালিত বিভাগের উচ্চ প্রশংসা করেছেন, আগেই দেখেছি।

অমৃতবাজারের বিত্তীয় যত্নব্য এই :

We very much regret our recent paragraph on the late sister Nivedita's School has caused some misapprehension in some quarters. When we mentioned some prominent names from whom subscriptions to the Nivedita Memorial Fund were promised but "not yet realised" nothing was further from our intention than to apportion any blame to any quarter for the non-realisation. Indeed, the charity and patriotism of the persons referred to are too well-known to us—as to all the country—to lead us to insinuate, even remotely, that they were indifferent to the fulfilment of their respective promises. On the other hand, we are really glad to learn on enquiry that Mrs. J. C. Bose has, since the publication of the report we reviewed, paid down her quota of Rs. 500/- as regards Dr. R. B. Ghosh and

Mr. C. C. Ghosh the matter stands thus, as our representative, who enquired into the matter, has gathered :

"Both Dr. Ghosh and Mr. C. C. Ghosh were ever ready to pay the promised subscription as soon as a responsible committee had been formed to manage the school. No such committee has yet been formed, and Dr. Nilratan Sircar could not accept their subscriptions in absence of such a committee. It is understood that steps are being taken to form such a committee and then not only these two gentlemen but others also will pay their promised subscriptions."

We need hardly say that it gives us the greatest pleasure to be able to announce this. In fact, one of our objects in mentioning the names was to remind the public that the institution counted amongst its supporters and patrons,—actual or prospective—such worthy and distinguished personages.

নিবেদিতা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্বাধীনতা বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিবার পর যে বিদেশিনী ভারতের আত্মিক সম্পদের পরিচয় লাভ করিয়া সেই সম্পদের অংশী হইবার মানসে স্বাধীনতার নির্দেশ অনুসরণ করিয়া জীবন ধারার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটাইয়া ভাবত আত্মার সহিত একীভূত হইয়া সম্পূর্ণ ভারতীয় বনিয়োগিয়া ভারতবর্ষের সর্বজনীন কল্যাণের জন্ত নিজের সর্বস্ব নিবেদন করিয়া গুরু দত্ত নাম "নিবেদিতা"কে সার্থকতা দিয়াছিলেন সেই মহিয়সী নারী ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন আইরিশ বংশোদ্ভূতা এক মহিলা। ঊনবিংশ শতকে গ্রেটব্রিটেনের নাগ-পাশ ছিন্ন করিয়া আয়রিশগণের স্বাধীনতা অর্জন তথাকার প্রাচীন গেলিক জীবনধারার পুণর্জাগরণের যে আকাঙ্ক্ষা উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া "সিনফিন" রূপে ইতিহাসে পরিচিত বিপ্লবী আন্দোলনে মূর্ত হইয়া উঠে নিবেদিতার পরিবার সেই আন্দোলনের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার প্রকৃত নাম মিস মারগারেট নোবল। শৈশবকাল হইতেই বিপ্লবী আবহাওয়ার মধ্যেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয় এবং উহার সংস্পর্শেই নিবেদিতার চরিত্র গড়িয়া উঠে এবং কৈশোরকালেই তিনি সক্রিয়ভাবে আইরিশ স্বাধীনতাযোদ্ধার মুক্তি-আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হইবার মানসে "সিনফিন" দলের একজন উৎসাহী সদস্য হন। বিপ্লবকে সফল করিবার জন্ত যে কলাকৌশল ও প্রযুক্তির উপায় আশুতোষ আনা প্রয়োজন তাহা উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট হইতে অর্জনের মানসে বিখ্যাত রুশ বিপ্লবী নায়ক প্রিন্স পিটার ক্রপটকিনের শত্রু প্রাণ করেন।

তদবধি তাঁহার মানসে যে বিপ্লববাদ শিকড় বাঁধে তাহা বিবেকানন্দের দ্বারা ধর্ম জীবনে চলিবার বাসনাও স্থগিত করিতে পাবে নাই। ইহার অবশ্য একটা কারণ বর্তমান আছে, যাহা সচরাচর লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। বিবেকানন্দ ছিলেন মূলতঃ ভারতপ্রেমী, ভারতের দরিদ্র, অবহেলিত, নিপীড়িত সর্বসাধারণের সর্বজনীন কল্যাণের জন্ত তাঁহার প্রাণ কাদিত এবং ইহাদের অন্ধকারে রাখিয়া নিজের আত্মিক মুক্তি তাঁহার প্রার্থনীয় ছিল না। ভারত যতদিন পরাধীনতার অভিশাপ-ক্রিষ্ট থাকিবে ততদিন ভারতের মুক্ত জনগণের উত্থান সম্ভবপন নহে বলিয়া তাঁহার জীবনের ধ্যানধারণা হইয়াছিল এদেশে বেশকিছুসংখ্যক এমন কর্মী গড়িয়া তোলা যাহাবা এদেশবাসীকে মনুষ্যত্ব দীপ্য দিবে এবং তাহাদের সর্বপ্রকারের কল্যাণের জন্ত নিজেদের উৎসর্গ করিবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশন গঠন করিয়া একদল সন্ন্যাসী স্রষ্টা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন যাহাদের প্রধান কাজ হইবে নরনারায়ণের সেবা। এই সেবা সার্থক করিতে হইলে বৈদান্তিক হইতে পারিলে সর্বাধিক সফলপ্রসূ হইতে পারে এই প্রত্যয় হইতেই তিনি তাঁহার সম্প্রদায়কে বেদান্তমুসারী করিলেও তাহা গোপন, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষণ চণ্ডাল পর্যন্ত সকলকে মানুষ করিয়া তোলা। ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি সেবিকা করিয়াব জন্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন প্রাধান্যতঃ এদেশের নারীজাতিতে প্রবুদ্ধ করিবার জন্ত, কিন্তু কেবল নারীজাতির সেবায় তাঁহার মত অশেষ ক্ষমতার অধিকারিণী সকল শক্তি

আবদ্ধ থাকুক, ইহা তিনি চাহেন নাই। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও জীবনায়নের নানাবিধ ক্ষেত্রে কাজ করিবার ভগিনী নিবেদিতার যে সহজাত শক্তি আছে তাহা স্বাগিজীর অস্ত্রাত ছিল না কেন না মানুষ চিনবার অপূর্ব শক্তির অধিকারী তিনি ছিলেন। তাই তিনি তাঁহার সহচর ও শিষ্যদিগের সম্মুখেই ভগিনীনিবেদিতাকে তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে চলিবার অধিকার দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে আধারে নিবেদিতার জীবনগঠিত তাহাতে কোনও অপকর্ষ্য সম্ভব নহে বরং স্বাভাবিকভাবে ক্ষুর্ভ হইবার পথ খোলা থাকিলে তাহা আরও স্নন্দরতর রূপে ফুটিয়া উঠিবে। সেজন্য কোনও নিয়ম নিগড়ে নিবেদিতাকে তিনি বাঁধেন নাই। বারবার বলিয়াছেন যে তোমার যদি ইচ্ছা হয় তাহা হইলে আমার পথে চল, আর যদি তাহাতে কখনও তোমার রুচি না থাকে, তবে তোমার অভিপ্রায় অনুসারে চলিও। তবে ভিন্ন পথ যদি তুমি বাছিয়া লও তাহা হইলেও তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও সজাগ দৃষ্টি থাকিবে। কাজে কাজেই শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সাধনা বিপ্লবের পথ হইতে তিনি কোনও দিনই বিচ্যুত হন নাই। নিবেদিতার প্রতি স্বাগিজীর আস্থা ছিল বলিয়া তিনি তাঁহাকে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার স্বযোগ দিয়াছিলেন এবং কখনো তাঁহার কোনও কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। নিজ অভিক্রটি অনুসারেই নিবেদিতা নারীকল্যাণকর কাজ, শিক্ষাদান প্রণালী সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তাধারা প্রভৃতিকে বজায় রাখিয়া সেজন্য চলিতে পারিয়াছিলেন। স্বাগিজীর যৌবনের প্রেরণা ও সেবা ধর্ম প্রবৃত্তি যে ব্রাহ্ম সমাজের নিকট পাইয়াছিলেন সেই প্রতিষ্ঠান হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও উহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি চিরকালই অটুট ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণান্তর তিনি যখন এদেশে আসিয়া গুরুরামকৃষ্ণের নিকট প্রাপ্ত পথ প্রচারের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করিলেন, তখন মাত্রাজের কতিপয় ভক্ত ও ক্ষেত্রের মহারাষ্ট্র প্রভৃতি

উত্তর ভারতের জনকয়েক ভক্ত ভিন্ন উহার প্রতি জনসাধারণের তেমন আকর্ষণ দেখা দেয় নাই, সেজন্য সংঘ অর্থাভাবে টিকিয়া রাখাই কঠিন হইয়া পড়ে। সেই পরিস্থিতিতে স্বাগিজীর মনে প্রায় সমধর্মী ব্রাহ্মসমাজ, ও আর্য্য সমাজের দ্বায় প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে কাজ করিয়া পতনোন্মুখ এইদেশকে বাঁচাইয়া পুনরায় বীর্ষাশাগী করিয়া তুলিবার বিষয় মনে উদয় হইত এবং তৎক্ষণাৎ তিনি ভগিনী নিবেদিতা সহ আদি ব্রাহ্ম সমাজের কর্তৃবর্গের সহিত আলাপ আলোচনায় রত হন। এই সহযোগিতা খুব ফলপ্রসূ হইবে মনে করিয়া তাহা ঘটাইবার জন্য আদি ব্রাহ্ম সমাজের বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সরলাদেবী ঘোষাল খুবই উৎসাহিত হইয়া উঠেন, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের অকাল মৃত্যুতে তাহা ঘটয়া উঠে না। কিন্তু এই আলাপ আলোচনারকালে নিবেদিতার সহিত সুরেন্দ্রনাথ ও সরলার প্রগাঢ় সখ্যতা জন্মে।

উহার ফলে দেখাশুনা চলার সময় ঠাকুর বাড়ীতে সে সময় যে বিদজ্ঞান সমাগম হইত তাঁহাদের সহিত নিবেদিতার পরিচয় হয়। ভারতের সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক সেই সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রাবল্যে জাপানী শিল্পী শিল্পরসিক ও এশিয়ার পুনরুজ্জীবনের—স্বপ্নে বিভোর শ্রীমৎ ওকাকুরা কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুর বাড়ীর এই সাংস্কৃতিক আশ্রয়কে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সহায়ক হইবে মনে করিয়া উহা সহিত সংযোগ স্থাপন করতঃ প্রাচীন ভারতের শিল্পদর্শন পুণর্জাগরণের জন্য অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে সে সময় উদ্বোধিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। সে সময়ে সমাগত স্রষ্টাজনকে এই বলিয়া গল্পনা দেন যে ক্ষুদ্র জাপান যেখানে পাশ্চাত্য জগতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম সেখানে প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়াও ভারত পরাধীন কেন? এই অধীনতাশূন্য হইতে মুক্ত না হইয়া স্থখে বসবাস করা কি মনুষ্যোচিত? শ্রীমৎ ওকাকুরার এই গল্পনা

বিশেষভাবে তরুণ ব্যারিষ্টার শ্রীপ্রমথনাথ গিত্তের প্রাণে বিদ্রুত হয় এবং তিনি সক্রিয় হইয়া উঠিয়া মুক্তি সংগ্রামের সৈনিক সংগ্রহে ব্রতী হইবার মানসে চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলাদেবী ঘোষাল প্রভৃতির সহযোগিতায় নব্য বাঙ্গলার প্রথম সক্রিয় বিপ্লবী সমিতি 'অমূলীলন সমিতি' র পত্তন করেন। এই কাজে নিবেদিতার যৌবনের সাধনা বিশ্ববাদকে আবার তাঁহার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিবার বাসনায় ভগিনী নিবেদিতা এই সমিতির সহিত অন্তরের সহিত যোগদান করেন। ঠিক সেই সময়েই কার্যব্যাপদেশে নিবেদিতাকে বরোদায় যাইতে হয়। সেখানে তিনি জানিতে পারেন বোম্বাইএর বিপ্লবী সমিতি চাপেকাব সংঘের একটি শাখাঠাকুর সাহেবের নেতৃত্বে গুজবাটে গঠিত সমিতির সহিত অরবিন্দ ঘোষের সক্রিয় সহযোগিতা বর্তমান, এই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া ভগিনী নিবেদিতা শ্রী অরবিন্দকে এই সংবাদ প্রদান করেন যে বাঙ্গলাদেশেও একই উদ্দেশ্যে অমূলীলন সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্ত তিনি অমুরোধ করেন। অমূলীলন সমিতির সম্পর্কে সবিশেষ তথ্য জানিয়া তাহার সহিত যুক্ত হইয়া বাঙ্গলাদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে গভীরতর ও ব্যাপকতর করার সম্ভাবনা সম্পর্কে সঠিক পরিস্থিতি জানিবার জন্ত তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্র ও বাঙ্গলাদেশে বিপ্লবানুষ্ঠান সার্থক করিবার জন্ত সাময়িক শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন বোধে তাহা শিখিবার জন্ত হিন্দুস্থানীর ছদ্মবেশে উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করিয়া যে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরোদার সৈন্য বিভাগে প্রবিষ্ট ছিলেন সেই যতীন্দ্রনাথকে বাঙ্গলাদেশে প্রেরণ করেন। যতীন্দ্রনাথ অমূলীলন সমিতির সহিত যুক্ত হইয়া বাঙ্গলা দেশেই রহিয়াগেলেন ও বারীন্দ্র এখানকার বৈপ্লবিক সমিতির সংবাদ বহন করিয়া অরবিন্দের গোচরে তাহা দিবার উদ্দেশ্যে বরোদায় ফিরিয়া গেলেন। যতীন্দ্রনাথকে কর্ম্মরূপে পাইয়া প্রমথনাথ তাঁহার সহায়তায়

আপার সাকুলার রোডে প্রায় হুজিয়া স্ট্রিটের সংযোগ স্থলের নিকটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে মুক্তি পিয়াসী তরুণ সদস্যদের অশ্রারোহন, অগ্নি ও বন্দুক চালনা ও সাময়িক কুচকাওয়াজ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। যতবাদ প্রচার এতদিন অমূলীলন সমিতির প্রধান কার্যক্রম ছিল, এইভাবে যে সক্রিয় কর্ম্মের প্রথম আরম্ভ হয় উহার মূলে নিবেদিতার অবদান বর্তমান। তাহার পর যখন অরবিন্দ ১৯০৬ সালে বরোদার কর্ম্মে ইচ্ছাফা দিয়া বাঙ্গলাদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বদেশী আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষাপরিষদ, জাতীয়তাবাদি পত্রিকা পরিচালন প্রভৃতি প্রকাশ্য কার্যকলাপের আবরণে গোপনে বিপ্লবীদের সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাদের যানিকতলার মুরারি পুতুর অঞ্চলে বিপ্লবসম্মে দীক্ষিত তরুণদের এক আন্তানা স্থাপন করিয়া বারীন্দ্র ও তাহার স্বহৃদগণের সহায়তায় বৈপ্লবিক ক্রিয়াপদ্ধতি শিক্ষাদান ও বিপ্লবার্থে অস্ত্রাদি সংগ্রহে ব্যবস্থা করিলেন তখন এই তরুণদলকে রাষ্ট্রনীতি শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার বিপ্লব সার্থক করিবার প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে যে জ্ঞান তিনি প্রিন্সক্রপোটকিনের নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন তাহা শিখাইতে উৎসাহেব সহিত ব্রতী হইলেন। এই কাজের জন্ত ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ এই সমিতিতে দান করেন তাঁহার পূর্ব্বেকার স্বহৃদ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও অর্থনীতি, রাজনীতি, দেশপ্রীতি প্রভৃতির শিক্ষার শিক্ষার্থীব্রতী হইলেন।

ইহার কিছুকাল পরে যখন ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দাগণ মুরারিপুতুরের আন্তানা আবিষ্কার করিয়া আগিপুনের বোমার গামলা দায়ের করে, তখন নিবেদিতার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সাময়িক ভাবে স্থিমিত হয়। এ সময়ে তিনি প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কার্যে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন এবং মডার্ন রিভিউ পত্রিকার শিক্ষানীতি, শিল্পের মূলমন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ব্যতীত রামানন্দ

বাবুর নির্ভীক বলিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পাদনাগুলি লিখিতেও যথেষ্ট সহায়তা করেন। এ সময়ে নিবেদিতার প্রযত্নে মিসহেরিংহাম, শ্রীনন্দলাল বসু, গণেশনাথ ব্রাহ্মচারী প্রমুখ শিল্পীগণ আজান্ডাওয়াবলীর নষ্টোন্মুখ চিত্রগুলির প্রতিলিপি আঁকিয়া তাহাকে স্থায়ী দান করেন। ইহার কিছু দিন পরে আলিপুর বোনার মাগলা হইতে বেকহর খালাস পাইয়া শ্রীশ্রবিন্দ যখন কর্মোযোগিন নামে পত্রিকা বাহিব করেন তখন তাঁহার প্রধান সহায়ক হয়েন ভগিনী নিবেদিতা। এসময়ে তিনি ঘটনাচক্রে জানিতে পারেন যে ব্রিটিশ সরকার শ্রীশ্রবিন্দকে বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের দায়ে গ্রেপ্তারের পাওরোনা বাহির করিবাব জন্ত স্থির করিয়াছেন, ভগিনী নিবেদিতাই সেই সংবাদ শ্রীশ্রবিন্দকে প্রদান করেন এবং গোপনে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ফারসী অধিকৃত চন্দননগরে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের জন্ত তথার যাইবার যে বন্দোবস্ত হয় তাহার সহায়তা করেন।

বিপ্লবী আন্দোলনের সহিত তাঁহার এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্পর্কে কিছু তথ্য বারীন্দ্র ঘোষ লিখিয়া গিয়াছেন বটে এবং পবে গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী তাঁহার নিবেদিতা বিষয়ক সংঘেও আরও কিছু তথ্য দিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার এ সম্পর্কে কার্যের অনেক বিষয় অকথিত আছে এবং লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহার জন্ত রামকৃষ্ণ সংঘই প্রধানতঃ দায়ী, কেননা এই সংঘ উহা প্রকাশে অত্যন্ত অনিচ্ছুক, এমনকি তাঁহার বিপ্লবীদের সহিত সহযোগিতার কথা অস্বীকার করেন। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে ভগিনী নিবেদিতার স্তায় একজন বিদেশিনী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় বনিয়া গিয়াছিলেন তাহার জন্ত রামকৃষ্ণ সংঘ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহার পূর্বে জনসমর্থন না থাকায় বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন গোপন পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। এবং উহার ঐকান্তিক অর্থাত্তাব মোচনের জন্ত নিবেদিতার সংগৃহীত অর্থই প্রথম দিকে উহাকে রক্ষা করে, সেই নিবেদিতাকে রাজনৈতিক

সংস্পর্শ ত্যাগে সম্মত না করিতে পারাতে সংঘের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতাকে রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবেন, এই তথ্য লোকে জানিলে মিশনের প্রতি লোকমনে অশ্রদ্ধাদি জন্মিতে পারে এই ভয়ে উহা গোপন করিতে উৎসুক। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতাব একান্ত আগের রামকৃষ্ণ মিশন হইতে সংস্পর্শ ত্যাগ করিতে ভগিনীর জগয় ভাঙ্গিয়া গেলেও ব্রহ্মানন্দের অরুরোধে তিনি মিশন ছেড়ায় ত্যাগ করিতেছেন এই মর্মে একখানি পত্র “Statesman” পত্রিকায় তাঁহার স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়। কিন্তু নিবেদিতা নিজেকে তাহার পরও রামকৃষ্ণ মিশনেরই একজন বলিতেন এবং তাঁহার বক্ষে একটি ফলকে লেখা ঝুলিত, Nivedita of R. K. L. V অর্থাৎ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দেরই নিবেদিতা। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে তিনি ছেড়ায় মিশনের সংস্পর্শ ত্যাগ করেন নাই, মিশনের কল্যাণ হইবে মনে করিয়া তাহাকে মিশন ত্যাগে বাধ্য করা হইয়াছিল। এই সমস্ত ঘটনাই কেন না অপ্রিয় হউক, গোপন করিলে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতির অবমাননা করা হয়। সেজন্ত ইহা প্রকাশ করিয়া ভারতে রাজনীতি ক্ষেত্রে নিবেদিতার দান সম্পর্কে আগার লেখা শেষ করিলাম এই আশায় যে নিবেদিতার রামকৃষ্ণ মিশন হইতে বিদায়েব কাহিনী যতই কেননা মিশনের পক্ষে প্রকাশে বাধা থাকুক, “জয়শ্রী” স্বভাষবাদী পত্রিকা বসিয়া তাহা প্রকাশে কুষ্ঠিত হইবেন না কেননা স্বভাষচন্দ্রের নিজেরই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পথ হইতে অনেক সরিয়া আসিয়াছে এবং স্বভাষচন্দ্রের বাসনা ছিল যে হয় মিশনের সংস্কার সাধন করিয়া তাহা বিবেকানন্দের ইঙ্গিত ধারায় চালিত করা, নতুবা অসম্ভব হইলে এই আদর্শে নূতন এক সংস্থাস্থাপন করা। একথা তিনি পত্রিকার ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। মিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিত হওয়ার পর নিবেদিতা আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের গৃহে স্থান লাভ করেন ও আচার্য্যের পুস্তকের ভাষাসৌকার্য্যার্থে সহায়তা করেন। এ সময়ও তিনি বিপ্লবীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত বিপ্লবীদের পরিচয় ঘটে এবং কথিত আছে তাঁহারা একথা জানিয়াও তাঁহাদের পরীক্ষা ল্যাবরেটরিতে বিপ্লবীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতে দিতেন।—

নিবেদিতার সমাজ-দর্শন

বিমান বিহারী মজুমদার

ভগিনী নিবেদিতা সমাজ-বিজ্ঞানের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতকে মহা-ভারতে পরিণত করিবার ত্রুত গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মূলতঃ কৰ্মী। লোকসমাজ হইতে দূরে থাকিয়া দার্শনিক মতবাদ স্থাপিত করা তাঁহার কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁহার অবিচ্ছিন্ন কৰ্ম্মব্যবহার পিছনে একটি অসংবদ্ধ সমাজ-দর্শনের প্রভাব বর্তমান ছিল। তাঁহার সহৃদয় জীবনের বিচিত্র প্রবাহের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে সেই সমাজ দর্শনের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

নিবেদিতা বিভিন্ন প্রকৃতির তিনজন সমাজদর্শনের প্রষ্ঠান ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম হইতেছেন রাশিয়ার অভিজাত বাংশ-সম্ভূত বিপ্লবী চিন্তা-নায়ক প্রিন্স ফ্রোপটকিন (১৮৪২—১৯২১)। তাঁহার বয়স ষখন চব্বিশ বৎসর তখন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথমে এই মনীষীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ফ্রোপটকিন ডারউইনের মতন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইলে কোন জীব জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারে এই নীতিতে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার মতে জীবনের মূলসূত্র হইতেছে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা—প্রতিযোগিতা নহে। তিনি সাইবেরিয়ায় নির্জনে জীবন যাপনের সময় লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে যে সমস্ত পশুপক্ষী কীট পতঙ্গের মধ্যে পরস্পরের সহায়তা করিবার প্রবৃত্তি বলবান তাহারাই বাঁচিয়া থাকে; আত্মকেন্দ্রিক জীবেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তিনি তাঁহার বিপ্লবীর জীবন-স্মৃতি নামক গ্রন্থে লেখেন যে সরকারী শাসনযন্ত্রের সাহায্যে মানুষের কোন স্বাধী উপকার সংসাধন করা অসম্ভব। তাই তিনি রাষ্ট্র ও

সরকারের প্রতি আস্থা না রাখিয়া নিজেদের মধ্যে সমবায় গঠন ও সহযোগিতা স্থাপনের উপর জোর দিয়াছিলেন। নিবেদিতা যে এই মত সৰ্ব্বাংশে মানিয়া লইয়াছিলেন তাহা তাঁহার জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থের A Note On Historical Research * নামক প্রবন্ধ হইতে জানা যায় তিনি উহাতে ঘোষণা করেন যে মানবগণ্যতার যে নবযুগ আসিতেছে তাহার মূলনীতি হইবে পাবস্পরিক সহযোগিতা। তিনি ঐ প্রবন্ধে ফ্রোপটকিনকে আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদগণের রাজা আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যবর্তিতাতেই ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত প্যারিসে ফ্রোপটকিনের সাক্ষাৎকার ঘটে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখে নিবেদিতা গোপালকৃষ্ণ গোল্ডলেকে এক পত্র লিখিয়া জানান যে তিনি যেন ইউরোপের দ্বিতীয় মহান ব্যক্তি ফ্রোপটকিনের সহিত অবস্থা দেখা করেন। তাঁহার মতে টলষ্টয় ছিলেন ইউরোপের মহত্তম ব্যক্তি। ফ্রোপটকিনের কয়েকটি মতের উল্লেখ দেখা যায় নিবেদিতার নাগরিক আদর্শ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে। স্বামীজীর সহিত দেখা হইবার পূর্বেই নিবেদিতা সরকারের উপর আস্থা হারাইয়াছিলেন ও আত্ম-নির্ভরতাকে জীবনের মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের নিকট শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণের ফলে

* Hints on National Education in India, উদ্বোধন সংস্করণ, পৃঃ ১১০—১১১।

নিবেদিতার জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইলেও আত্মনির্ভরতা ও পাবস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা ভারতের উদ্বোধন সাধন কবাইবার সংকল্প দৃঢ়তর হয়। ভারতবর্ষের পুনর্গঠন করিবার জন্য সমাজ-বিজ্ঞানের এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন শক্তিতেই সর্বপ্রথমে আক্রমণ; জগতের সকল ব্যাধি এই শক্তির দ্বারা দূর করা যাইতে পারে। শক্তির সাহায্যেই দরিদ্রেরা ধনীর ও অজ্ঞেরা বিদ্বানদের অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে পারে। এই শক্তি অধ্যাত্ম-চেতনার উদ্বোধন দ্বারা লভ্য। এই মন্ত্রের সাহায্যে নিবেদিতার পূর্ববর্ত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়।

নিবেদিতা সুপ্রসিদ্ধ সমাজ-বিজ্ঞানী Patriok Goddes-য়েব নিকট হইতেও ভারতে কর্মপদ্ধতি বিষয়ে অনুপ্রেরণা পান। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্কে তাঁহার সহিত নিবেদিতার সাক্ষাৎকার ঘটে এবং ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তিনি ঐ বৎসর প্যারিসের আন্তর্জাতিক সংঘের পরিচালনায় সমাজ বিজ্ঞানীদের যে নিদাঘ বিদ্যালয় বসিয়া ছিল তাহাতে যোগ দেন। তিনি ঐ সময়ে বক্তৃতা শুনিয়া যে আরকলিপি তৈয়ারি করিয়াছিলেন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সচিবদানন্দ সিংহ-সম্পাদিত হিন্দুস্থান রিভ্যু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উহা হইতে তাঁহার সেই সময়ের মনো-ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লেখেন যে জাতি যত বেশি দরিদ্র সেই জাতির মধ্যে লোকসংখ্যা তত বেশি বৃদ্ধি পায়। ভারতের জন সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি দেখিয়া তিনি শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে পশু পালন-কারীরা যেমন পশু সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে উদ্যোগী হন, বিদেশী শাসকেরাও তেমনি প্রজাদের সংখ্যা বাড়াইয়া নিজেদের সুবিধা খোঁজেন। সাম্রাজ্যবাদের শোষণনীতির ফলেই ভারত দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। শাসকশ্রেণীর সুবিধার জন্যই সাম্রাজ্য স্থাপন করা হয়। যদি প্রকৃত

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া প্রজার হিতার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয় তাহা হইলেই জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কিন্তু ভারতের সাম্রাজ্য-পরিচালনায় না আছে জন-কল্যাণের প্রেমা, না আছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। তাই তিনি ঐ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ তারিখে নিবেদিতা যখন স্বাধীনতার নিকট ব্রহ্মচারিণীরূপে দীক্ষা লইলেন সেইদিন তাঁহার নবজন্ম হইল। তিনি সেইদিন হইতে মনেপ্রাণে ভারতীয় হইবার সাধনায় ব্রতী হইলেন। তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন “তুমি যদি ভারতবর্ষকে ভালবাসিতে চাও তাহা হইলে তাহাকে নিজের মনগড়া আদর্শে গড়িবার চেষ্টা না করিয়া সে যেমনটি আছে তেমনটিই তোমাকে ভালবাসিতে হইবে।” নিবেদিতাও তাঁহার সমাজ-বিজ্ঞানের মন্ত্রের আলোকে বুঝিয়াছিলেন যে পাঁচ হাজার বছরের ক্রমবিবর্তনের ফলে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটয়াছে তাহাকে ইউরোপ-আমেরিকার অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে ঢালিয়া সাজিবার চেষ্টা করা বাতুলতার নাস্তুর মাত্র। তিনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের নিদর্শনস্বরূপ গোষ্ঠীতির সহিত ভারতীয়গণের প্রীতি ও স্নেহের সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। গরু কেবল-মাত্র দুধ জোগাইবার যন্ত্র মাত্র নহে; তাহার সহিত ভারতীয় গৃহস্থের মা ও ছেলের সম্বন্ধ। গরুও তাহার স্নিগ্ধ আশ্রিত চোখ দুইটি দিয়া পরিবারস্থ সকলকে আপনায় জন বলিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। গোবুলি বেলাকে যে আমরা এত পবিত্র মনে করি তাহার মধ্যে নিবেদিতা ভারতীয়গণের বিশ্বাসবোধের পরিচয় পাইয়াছেন।

বিবাহের সময়ে হিন্দু মেয়েরা গোত্রান্তরিত হন; তাহার বিবাহের পরদিন হইতে ধর্মত: ও আইনত: স্বশ্রুতকুলের লোক হইয়া যান। স্বাধীনতার নিকট দীক্ষা লইবার পর

হইতে তেমনি নিবেদিতা নিজেকে ভারতীয় ছাড়া আর কিছু মনে করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় ও রচনায় সব সময়ে ভাৰতবর্ষকে 'আমার দেশ' বলিয়াছেন ও সর্বত্র ভারতবাসীর কথা উল্লেখ করার সময়ে 'আমরা' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অল্প কোন বিদেশীয় এমন করিয়া মনে প্রাণে ভারতীয় হইয়াছেন বলিয়া আমার জ্ঞান নাই। রাশিয়ার সাম্রাজ্যী ক্যাথরিন্ দি গ্রেট (১৭২৯-৯৬) জার্মান দেশে জনগ্রহণ করিয়াও রাশিয়ার অনেক উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার স্বামী তৃতীয় পিটারকে হত্যা করাইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ পূর্বক ৩৪ বৎসর কাল রাজত্ব করেন ও অসংখ্য প্রণয়ী গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার সহিত নিবেদিতার নাম এক নিশ্বাসে দহিতেও ঘৃণা হয়। নিবেদিতা ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী সর্বপ্রথম ভারতে পদার্পণ করেন এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জীবন-লীলার অবসান হয়। এই সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি যেমন করিয়া ভারতকে ভালবাসিয়াছেন, জানিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন তেমন করিয়া আর কেহ কখনও পারেন নাই। অধ্যাপক সাধনাব ও সমাজ-বিজ্ঞান আলোচনার ফলে তাঁহার যেন তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হইয়াছিল। তাই তিনি ভারতের সমাজ ব্যবস্থার অনন্তসামারণ মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

নিবেদিতা যে সময়ে কলিকাতার বাগবাজারের গলিতে বাস করতেন সে সময়ে মেয়েদের পথে ঘাটে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার স্বাধীনতা ছিল না; তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ছিল স্বসামান্য; আটদশ বছরের মেয়েদের বিবাহ দেওয়াই ছিল সামাজিক রীতি; বিধবাবিবাহ আইন সিদ্ধ হইলেও খুব কম বিধবাই পুনরায় পতি গ্রহণে সম্মত হইতেন। নিবেদিতার চোখে এর কোনটাই বিসদৃশ ঠেকে নাই। তিনি যেন নয়নে ভালবাসার অঙ্কন লাগাইয়া সব কিছুই মধ্যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দেখিতে

পাইলেন। বাংলায় ও উত্তর প্রদেশে অবরোধ প্রথার জন্ত তিনি দায়ী করিয়াছেন মুসলমান আক্রমণ ও শাসনকে; মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজ প্রদেশে বহুকাল ধরিয়া মুসলমান আক্রমণ ও শাসন প্রবেশ করিতে পারেন নাই বলিয়া ঐ সব অঞ্চলে মেয়েরা অস্ত্রপূরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। নিবেদিতা শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত আক্ষরিক জ্ঞানকে অভিন্ন মনে করিতেন না। তিনি বাঙ্গালী সমাজের অনেক নিরক্ষর মহিলাদের মধ্যে উচ্চ দার্শনিক ও অধ্যাপক জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, যে স্বামী বিবেকানন্দ বিধবাবিবাহ পছন্দ করিতেন না। বিধবার শুভ্র বেশ ছিল তাঁহার কাছে পবিত্রতার প্রতীক। হিন্দু সমাজের আচার ও প্রথার যাহারা সংস্কার করিতে চাহিতেন তাঁহারা বলিতেন যে হিন্দুনারীর, বিশেষ করিয়া হিন্দু বিধবার জীবন দাসীর চেয়েও অধম। ইহার উত্তরে নিবেদিতা বাইবেলের বাণী উদ্ধার করিয়া Studies from an Eastern Home গ্রন্থে (পৃঃ ২১) লিখিয়াছেন—“He that will be chief among you, let him be your servant। তিনি বিধবাদের সেবা ও আত্মোৎসর্গের আদর্শের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—“We shall never understand until we realise that passionate self-abnegation is the root of most things.” তিনি স্বামীজীর বাণীর পুনরাবৃত্তি করিয়া বারংবার বলিয়াছেন যে সমাজের সংস্কার চাওয়া যেন কোন রকমে জোড়াভালি দিয়া ঘেরামত করা; হিন্দু সমাজকে যাহারা প্রকৃত ভালবাসেন তাঁহারা চাহেন উহার পুনর্গঠন। এই গঠনের কাজে হাত দিতে পারিতেন তাঁহারাই যাহারা কল্পনা ও ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শে নিজের জীবন গড়িতে পারিয়াছেন। দেশের সকল অস্তিত্ব ও অক্ষমতাকে যাহারা অসীম কৃপা ও সহিষ্ণুতার সহিত দেখিতে পারিবেন এবং নিজের সকল প্রকার স্বার্থবিধা বিসর্জন দিয়া জীবনপী শিবের সেবায় নিযুক্ত

হইবেন তাঁহারই ভবিষ্যতের মহা-ভারত গঠনের উপযুক্ত পাত্র।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের লেখকেরা কেবলমাত্র তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করেন। নিবেদিতা সে কাজ তো করিয়াছেনই, তাহার উপরে আরও কিছু করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যাতা মাত্র নহেন; উহার উদ্বোধক ও সংগঠকও। জাতীয়তাবাদকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই মহীয়সী মহিলা এক সর্বব্যাপী কার্যসূচী অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি একদিকে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে জনপ্রিয় করিয়া দেষ্টা করিয়াছিলেন, অন্যদিকে নূতন নূতন সাহিত্যিক প্রচেষ্টার দ্বারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্যকে সম্মিলিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অমুরাগকে কেন্দ্র করিয়া তিনি নূতন স্বাভাব্যবোধকে জাগ্রত করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই জন্য ভারতীয় স্বাধীনতা, ভাষা ও চিত্রকলায় পুনরুজ্জীবনের প্রতিও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রবীন্দ্রনাথের মতন মহাকবি, অবনীন্দ্রনাথের ছায় চিত্রকলার প্রতিভাবান শিল্পী : জগদীশচন্দ্র বসুর ছায় কুশলী বৈজ্ঞানিক যজ্ঞনাথ সরকারের ছায় নিপুণ ঐতিহাসিক এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতন প্রবীণ সম্পাদক যে নিবেদিতার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা হইতেই তাঁহার জাতীয়তাবাদের রূপায়ণে বহুমুখী প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

নিবেদিতা একই কালে নিয়ম-তান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় গোপালকৃষ্ণ গোস্বলের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, আবার অরবিন্দের মতন বিপ্লব-বাদের হোতাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত ছিলেন। যে দিক দিয়া যতটুকু বা যতখানি সাহায্য পাওয়া যায় তাহার সুবিধা গ্রহণের ওত তিনি সর্বদা উন্মুখ ছিলেন। তবে এ কথাও ঠিক যে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লববাদের সমর্থক

ছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসী আন্দোলনের ফলে জাতির যতটুকু সংহতি সাধিত হয় তাহার সুযোগ লইতেও পরাশ্রয় ছিলেন না। সম্প্রতি কেহ কেহ প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন যে নিবেদিতা হিংসাত্মক বিপ্লব সমর্থন করিতেন না। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে শ্রীঅরবিন্দ সম্পৃষ্টভাবে বলিয়াছেন যে তাঁহারই সাক্ষাতে নিবেদিতা বরোদার গায়কোয়াড় তৃতীয় শিখাজী রাওকে বিপ্লবী দলে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন * লাল লালপংরায়াও তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে নিবেদিতা ম্যাট্রিনির অবলম্বিত কর্মসূচায় চলিতে চাহিতেন। ম্যাট্রিনি যে অহিংস আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা সর্বজন বিদিত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতন বিজ্ঞ ও সত্যনিষ্ঠ সমালোচকও লিখিয়াছেন যে নিবেদিতা রূদ্রপন্থা পছন্দ করিতেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতা Aggressive Hinduism গ্রন্থে বলেন যে, দশাবতারের মর্মার্থ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ক্রমবিকাশের ফলে সংস্কৃত হইতে কুর্খ, কুর্খ হইতে বরাহ, বরাহ হইতে নৃসিংহের আবির্ভাবে ভগবানের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বামনের পর রাম ও বলরাম-কৃষ্ণ ক্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব শান্তিবাণ প্রচার করেন বটে, কিন্তু তার পবেও কঙ্কির আবির্ভাবের প্রয়োজন বটে। এই ব্যাখ্যা হইতেও হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতি নিবেদিতার মনোভাব বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—“Aggression is to be the dominant characteristic of the India that is today in school and class-room, aggression, and the thought and ideals of aggression.”

* Sri Aurobindo on himself and on the Mother, পৃ: ৯৭।

instead of passivity, activity; for the standard of weakness, the standard of strength; in place of a steadily yielding defence, the ringing cheer of the invading host" (পৃ: ৫) ব্রিটিশ শাসনের বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া ইহার চেয়ে স্পষ্ট করিয়া বলা সম্ভব ছিল না। তাঁহাকে কেবলমাত্র মরনী উপসিকা রূপে দেখিলে তাঁহার বার্থা মহিমা বুঝা যাইবে না। তিনি সাহসের সঙ্গে বোষণা করিয়াছিলেন যে মুক্তির ইচ্ছা হইতে মুক্তিলাভকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার সমাজ-দর্শনের পূর্ণতর পরিচয় পাইতে হইলে তাঁহার লেখা Civic and National Ideals এবং The Web of Indian Life শীর্ষক গ্রন্থদ্বয় ভাল করিয়া পড়া প্রয়োজন।

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্ম

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মডাক ৯.৫০। ষাণ্মাসিক ৪.৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্ম স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্ম

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সহযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলফ্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।
৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্ম আমরা আন্তরিক আশঙ্কণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

৩০৯, গাজুলি বাগান

কলিকাতা-৪৭



মন আজ
খুঁজিতে
তবু

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার
অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর
দুইবার করে দু'চামচ মুভসজীবনী সঙ্গে
চার চামচ মহাজাকারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা



অধ্যক্ষ ডাঃ বোমেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আধুনিকশাস্ত্রী, এক্স.সি.এস. (লন্ডন),
এম.সি.এস. (আমেবিকা), ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি, বি-এস, আধুনিকশাস্ত্রী।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

নিবেদিতার ভারতচেননা

দেবদাস জোয়ারদার

নিবেদিতা যেভাবে ভারতীয় জীবনাদর্শের ব্যাখ্যা করেছেন, তা শুধু তিনি তাঁর মনীষা ও ব্যাপক অধ্যয়নের ফলে করেননি। একাঙ্গ তিনি করেছেন তাঁর অনুভূতিলব্ধ দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে। নিবেদিতার ভারতচেননাকে বলা যায় তাঁর বোধির ফল।

ভারতীয় জীবনাদর্শের মূল সত্যটি নিবেদিতার কাছে এভাবে ধরা পড়েছে—“ঋব সত্য হচ্ছে এই যে আগে হোক বা পরে হোক, কারণকে অনুসরণ করছে ফল, নিশ্চিতভাবে ফলের আগে রয়েছে কারণ। এই নিশ্চয়তাবোধে ভারতীয় স্বভাব পেয়েছে এক প্রশান্ত আত্মনিবেদনের ভাব। সাধারণতঃ যাকে নিষ্ক্রিয় অদৃষ্টবাদ বলে মনে করা হয়, তার সঙ্গে এই আত্মনিবেদনের ভাবটির মিল নেই।” ১ এই প্রশান্ত আত্মনিবেদনের ভাবটিকেই নিবেদিতা-ব্যাখ্যাতে এদেশের জীবনাদর্শের মূল সত্যরূপে গ্রহণ করা যায়। ভাগ্যের কাছে অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ নয়, ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা নয়, বরং ভাগ্যের পরিবর্তনে আত্মকর্তৃত্বে অবিচলিত আত্মাই আমাদের সাহিত্যে ও দর্শনে বারবার কীর্তিত হয়েছে। ভাগ্যের পরিবর্তন যদি সম্ভব নাও হয়, সেখানে ব্যর্থতাবোধের বেদনা যেন আমাদের আচ্ছন্ন না করে। আত্মাকে যেন অবসন্ন না করি। আত্মাকে দিয়েই আত্মাকে উদ্ধার করতে হবে ‘উদ্ধারদাত্তানাত্তনং নাত্তানমবসদায়েৎ’। যুগযুগান্তরের অবসন্ন মানবাত্মার উদ্ধেগে গীতার এই উপদেশ ঋব তারকার মতো সত্যপথের নির্দেশ দিচ্ছে।

এই উপদেশ পালনের জন্তু চাই নিরাসক্তির ধ্যান। নিবেদিতার দৃষ্টিতে মহাভারতের ভীষ্মচরিত্র এই নিরাসক্তিরই চিত্র। ভীষ্ম জ্ঞানেন, কৌরবপক্ষেরই অস্ত্রাঘ ও তাঁদের পরাজয়ও নিশ্চিত। তবু তিনি তাঁদের হয়েই যুদ্ধ করেছেন পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে। সব জেনেও তিনি যুদ্ধে একটি আঘাতও কম বা বেশি হানেন নি। তাঁকে অবিচলিত চিত্তে অনন্যতা কৌরবপক্ষের প্রতি অমুগত্য রক্ষা করতে হচ্ছে। নিরাসক্তভাবে কর্ম করলে অবিহিত কর্মের ফলভাগিও যে নষ্ট হয় অর্থাৎ সেই অবিহিত কর্মও যে দুর্গতিজনক হয় না, গীতার এই শিক্ষা যদি মহাভারতের কোনো চরিত্রে রূপলাভ করে থাকে, তাহলে সে চরিত্র ভীষ্মের। এজন্যই গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে এমন কথা বলতে হয়েছিল—

কর্মণো হপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।

অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ৪।১৭

কর্মের এই গহনা গতিকে, যিনি অসাধারণভাবে বুঝেছিলেন, তাঁর নাম ভীষ্ম। এজন্যই বোধহয় নিবেদিতা রামায়ণ মহাভারতের আলোচনায় ভীষ্ম চরিত্রের এমন বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। আর গীতা সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্যটি ছোটো হলেও মুক্তার মতো উজ্জ্বল—‘গীতা বুঝতে পারার অর্থ ভারতবর্ষ ও এ দেশের মানুষকে বোঝা।’ ২

গীতা মহাভারতেরই একটি অংশ বিশেষ। গীতার নিরাসক্ত-কর্মের আদর্শের অরুণ মহাভারতের উপসংহারে মহাকাব্যের কবি রিস্ময়জনক সংযমের সঙ্গে বাজিয়েছেন। যুদ্ধশেষে পাণ্ডবপক্ষের জয়ের উল্লাস বনিতে মহাভারতের

উপসংহার মুখর হয়ে উঠেনি। জয় লাভের পরে ফল ভোগে নয়, বরং ফলভোগে মহাপ্রস্থানের পথে পাণ্ডবদের যাত্রায় উপসংহারটি নীরব হয়ে আছে। এই নীরব 'না-বলাবাণীর ঘনযামিনীর' মধ্যে তারার মতো বিরাজ করছে গীতার ফলাকাজ্জ্বলীন নিরাসক্ত কর্মের উপদেশ। তাই সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিককে শেষ পর্যন্ত বলতে হয় 'আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয়, সমগ্র মহাভারতের স্রেরের সঙ্গে গীতার স্রেরের সামঞ্জস্য আছে।' ৩

মহাভারতের সবস্রের যেমন গীতায় বেজেছে, ঠিক তেমনি বলা যায় যে এ অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী মহাকাব্যের উপসংহারে মহাপ্রস্থানের পথে ও স্বর্গারোহণে পাণ্ডবদের যাত্রায় যে শান্তরসের দুঃখোত্তীর্ণ পরিণামী আবেদনটি অমৃতব করি, রবীন্দ্রনাথ 'কর্ণকৃত্তী সংবাদ' এর সংক্ষিপ্ততম পরিসরে সেই আবেদনটি আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে পাঠকচক্ষে সঞ্চারিত কবেছেন। 'রজনীর তিমির ফলকে' 'নক্ষত্র আলোকে' 'খোর মুদ্রফল' পরাজয় প্রত্যক্ষ করার পরেও রবীন্দ্রনাথের কর্ণ বলছেন 'আগি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে'। অষ্টাদশ পর্বের মহাভারতের পরিণামী আবেদনটিকে যিনি করেটি-নাত্ত পূর্ণায় ধরে রেখেছেন, সে কবির নাম রবীন্দ্রনাথ, আর সেই অমর স্রষ্টির নাম 'কর্ণকৃত্তী-সংবাদ'। যদিও কর্ণ হতাশের দলে থেকে যাচ্ছেন, তবু তিনি একটি মুহূর্তের জন্তুও হতাশায় মুগ্ধমান হয়ে পড়ছেন না। নিবেদিতা তাকে বলেছিলেন ভারতীয় জীবনের আদর্শরূপ প্রশান্ত আত্মনিবেদনের ভাব, সে ভাবটিই মূর্তিলাভ করেছে কর্ণচরিত্রে। এই পৌরুষধন্য কর্ণ 'বেণী-সংহার' এর কবি ভট্টনারায়ণের ভাষায় বা বলেছিলেন, তা অদৃষ্টবাদের পক্ষে আকর্ষণীয় নিম্নলিখিত আজকের এই অধঃপতিত ভারতে বারবার উদ্ধৃত হলেও জীবনচর্যায় লাক্ষিত ও দিকৃত। তবু তাঁর সেই অমর কথাগুলি স্ররণ করি—

স্রতো বা স্রতপুত্রো বা

যো বা কোবা ভবাম্যহম্।

দৈবায়ন্তং কুলে জন্ম

সদায়ন্তং হি পৌরুষম্ ॥

ভীষ্ম বা কর্ণচরিত্রের ধ্যানে বিভোর হলেই অমৃতব করা যায় যে কেন নিবেদিতা বলেছিলেন প্রশান্ত আত্মনিবেদনের ভাব আর নিষ্ক্রিয় অদৃষ্টবাদ এক নয়।

নিবেদিতা-ব্যাপ্যাত ভারতীয় জীবনান্বর্শের অমৃত একটি সত্যের আলোচনায় এবারে আসা যেতে পারে। এই সত্যটির একাধিক দিক কর্মফলে বিশ্বাস, আত্মার অমরতা ও জন্মান্তর-বাদ। কর্মফলে বিশ্বাস যে আনন্দেব আধুনিক জীবনচিন্তার উপর নির্মম আঘাত হানে, তার কাবণ এ সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণার জন্তুই মনে হয় যে এ বিশ্বাসের সঙ্গে অদৃষ্টবাদেব অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে। আসলে অদৃষ্টবাদের সঙ্গে কর্মফলে বিশ্বাসের বিমুগ্ধা যোগ নেই। জীবনের প্রতিটি কর্ম এক একটি বীজের মতো। প্রতিটি কর্ম ভবিষ্যৎ-ফলের কারণ বিশেষ। প্রতিটি ভুলভাস্তিভরা কর্মের জন্তু আমাদের কর্মফল ভোগ করতেই হবে। এই ভুলকর্মের ফল ভোগ থেকে একমাত্র সংকর্মের পথেই মুক্তিলাভ সম্ভব। সংকর্মের চর্চায় উৎসাহ যাতে বাড়ে, এজন্তুই কর্মফলে বিশ্বাস। ভুল কর্মের বিষকে সংকর্মের অমৃত দিয়েই অকেজো করতে হবে। মামুষ যাতে এই স্রযোগ পায়, এজন্তুই তাকে বারবার ফিরে ফিরে আসতে হচ্ছে জন্মান্বর্তনের মধ্য দিয়ে। এখানেই রয়েছে আত্মার অমরতায় ও জন্মান্তরে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিটি। এ বিশ্বাসে নৈরাশ্রবোধের বা অদৃষ্টবাদের স্থান কোথায়? কর্ম যদি হয় বীজ, আর এ বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমের ফলে যদি আমাদের নতুন নতুন বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে হয়, তাহলে কর্মরূপ বীজকে নিরাসক্তির রৌদ্র-তাপে এতো শুষ্ক করে ফেলতে হবে যাতে সে বীজের অঙ্কুরোদগমই সম্ভব হয়ে পড়ে। আর তখন নতুন নতুন বন্ধনে জড়িয়ে পড়ার প্রশ্নই উঠে না। এ ভাবে দেখলে স্পষ্ট হয়ে উঠে পৌরুষধন্য প্রশান্ত আত্ম-নিবেদন, নিরাসক্ত কর্ণ, কর্মফলে বিশ্বাস, আত্মার অমরতা

ও জ্ঞানান্তরবাহ একই চিন্তারই কয়েকটি গ্রন্থিযুক্ত। আর এদের কোনোটিই না-ধর্মী-জীবন চিন্তাকে প্রশ্ন দেয় না। দৈবকে খণ্ডানোর জ্ঞান চাই চেষ্টা। আর যাকে দৈব বলা হয়, তাও পূর্ব কর্মেরই স্বাভাবিক ফল। মহাভারতের শান্তি পর্বে ভীষ্ম বলেছিলেন ‘পুরুষং হি পরম্ মত্বে, দৈবম্ নিশ্চিত্য মুহুত্বে’। যান্ত্রবন্ধ্যস্বত্বিতে এ কথা আরো স্পষ্ট বলা হয়েছে যে রথ যখন একটি মাত্র চাকার ঘুরতে পারে না, পুরুষকার ছাড়া দৈবও মানুষের সাফল্য আনতে পারে না। আমরা যদি রথের দুটি চাকার একটি ছেড়ে শুধু অস্ত্র একটির উপর ভরসা রেখে মনুষ্যত্বের পরাভব স্বীকার করে নিই, তাহলে সে দোষ ভারতীয় দর্শনচার্যগণের? না, আমাদের? এ কথা শান্তিচিন্তে ভাববার সময় এসেছে।

উপরের কয়েকটি অমুচ্ছেদে নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতীয় দর্শনের আলোচনার সার সংকলন করা গেল। এবারে আসা যাক নিবেদিতা-ব্যাখ্যাত ভারতীয় সমাজ জীবনের সত্য সন্ধান। তাঁর দুর্লভ ভারতচেষ্টনার আলোকিত পথ ধরে ভারতীয় জীবনসৌখ্যের ভিত্তিভূমি সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, ভারতীয় মনের সাধারণ ধর্মটি আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধরা পড়েনি, ধরা পড়েনি আকাশচুম্বী কীর্তিতে, ধরা পড়েছে নারীর মাতৃমূর্তির ধ্যানে। শিশু নারীর ভরসা ও গৌরব। জননী জীবনকে দিচ্ছেন মর্যাদা ও নিশ্চয়তা। এইতো আমাদের জীবনচিন্তার মূল ভিত্তি। নারীর এই মাতৃমূর্তির ধ্যানই কখনো কখনো আমাদের দৃষ্টিতে দেশের মাতৃমূর্তির কল্পনায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাই দেশ মনে হয়েছে পবিত্রতার আকর, ত্রায় পরায়ণতার শ্রেষ্ঠ আবাস, সপ্তসিন্ধু বিধৌত ভূখণ্ড। ইসলামধর্মাবলম্বীর দৃষ্টিতে পৃথিবী তাঁর পরমেশ্বরের পদধূলিপুত। ভারতের প্রতিটি মানুষের গার্হস্থ্যজীবনের প্রতি আনুগত্য রয়েছে। এই গার্হস্থ্যজীবনের কেন্দ্রবিন্দু জননী। নিজের গৃহ সকলের কাছেই পবিত্র। তাই মানুষের কল্পনায় মনে হয়, তার গৃহের উন্নতির আঙুনে

এসে বিশেষ যায় স্বর্গের দীপ্তি। গৃহ তার মন্দির। নিবেদিতা অনুভব করেছেন, ভারতীয় জীবনের গভীর তলদেশে বাস্তব-প্রীতির এই বোধ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। তিনি জানেন, বাসস্থানের প্রতি ভালোবাসার চেয়ে কোনো দেশের কোনো মানুষেরই আর কোনো মহত্তর বৃত্তি নেই।

পৃথিবীর যেখানেই মানুষ বসতি স্থাপন করেছে, সে স্থানটি ঘিরে নিজেকে ও অন্ত অনেককে দিয়েছে, এক অনন্ত-মর্যাদা। এমনকি যুরোপে দেবতাদের ছবি আঁকা হয়েছে যেন তাঁরা মাতৃভূমির জন্ত যুদ্ধেরত! তবু ভারতীয় জীবনে মাতৃভূমির প্রতি এই ভালোবাসার নিত্য বহমান অচঞ্চল-ধারাটিকে দেখে জাতিগঠনে এই ভালোবাসাকে যে গভীর-ভাবে কাজে লাগানো যায়, একথা ভেবে নিবেদিতা আশ্চর্য বোধ করেছেন। লঙ্কার দ্বারে প্রহরারতা এক মহিলা যখন হনুমানকে বলছেন ‘আমিই লঙ্কানগরী’, তখন এই উজ্জ্বল নিবেদিতা আধুনিক ভারতের মহত্তম শিক্ষাগ্রহণের কথা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছেন। ব্যক্তিার্থের উপরে যেখানে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেখানেই জাতীয়তা বোধের জন্ম সম্ভব। নিবেদিতার মনে হয়েছে, এ দেশের জীবনে যৌথ অস্তিত্ববোধের অভাব নেই। ভারতের প্রতিটি গ্রামে যেন একটি বৃহত্তর পরিবারের বাস। পরিবারের বা গ্রামের সকলের সেবা যত্নে বিধবার আশ্রয়ত্যাগে, পুরনারীদের বিরাট উৎসবে রান্নাবান্নার মিলিত কাজকর্মে-সর্বত্র তিনি এ জাতির সজীবতার পরিচয় পেয়েছেন। গ্রামের একজনের কাজ আর একজন হাসিমুখে করে দিচ্ছে। ব্রাহ্মণের জমি চাষ করছে গ্রামের অস্ত্র লোক, বিধবার মাটি কাটছে পাড়াপ্রতিবেশী, গুরু ও গুরুপত্নীর ভরণপোষণ চলছে গ্রামের সকলের দানশামগ্রীতে। এই হচ্ছে ভারতের সমাজ। আর এ ভাবেই ইতিহাসের যুগযুগান্তর বাহিত একটি বৃহৎ নাগরিক চেষ্টানায় উজ্জ্বল হয়েছে ভারতের সমাজ। স্বাধীন ভারতে

মুরোপীয় ধাঁচে দেশের উন্নতি করতে গিয়ে পঞ্জীজীবনের এই বৃহৎ নাগরিক চেতনাকে আমরা বোধ হয় কাজে লাগাতে পারিনি। এ কথা বেনারস সজে নিবেদিতার ভারত চেতনার আলোচনার বলতে হচ্ছে। এ দেশে কতো যুগ ধরে নদীর তীরে তীরে স্নানের ঘাট বাঁধা হয়েছে, পথের মোড়ে মোড়ে মন্দির গাঁথা হয়েছে, গ্রামে গ্রামে পুকুর কাটা হয়েছে। এ সবই হয়েছে ঐ বৃহৎ নাগরিক চেতনা থেকেই।

নিবেদিতা বলেছেন, ঋগ্বেদে পৃথিবীকে বার বার বলা হয়েছে যজ্ঞ। এই যজ্ঞরূপা পৃথিবীর চারদিকে জ্যোতির্বলয় রচিত হয়েছে মহাশূভ্র। আগস্টকোণ বলেছেন, পৃথিবী জিহ্বে একটি অসীম প্রতিমা, এই প্রতিমার চারদিকে অসীম আকাশে তাঁর বেদীবিশেষ। কোঁতের এই রূপকটিতে নিবেদিতা বৈদিক ঋষির বর্গবরের প্রতিধ্বনি শুনেছেন। তারপর তিনি বলেছেন, পৃথিবীর চারদিকে যেমন আলো বিরে রয়েছে, ভারতের প্রতিটি গ্রামের ও শহরের চারদিকে তেমন সবস্বতী পূজা থেকে আরম্ভ ক'বে মহরমের শোকযাত্রা পর্যন্ত কতো উৎসবের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ভারতীয় ধারণায় যে কোনো উৎসবের মূল চরিত্রই হচ্ছে সামাজিক। এমন কি ছুটি নরনারীর বিবাহ উৎসবও এদেশে সামাজিক ব্যাপার। বিবাহ শুধু ছুটি নরনারীর চুক্তিমাাত্র নয়, এ পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এতে শুধু সংশ্লিষ্ট দুজনের স্বখই বড়ো কথা নয়, সমাজের কল্যাণই পরম লক্ষ্য। বিবাহ নামক অনুষ্ঠানটিকে ভারতবর্ষ সামাজিক কল্যাণেরও বহু উর্ধ্ব স্থান দিয়েছে। ভারতবাসীর আদর্শ দৃষ্টিতে মনে হয়েছে নরনারীর এই মিলনের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তরের অভীক্ষা সক্রিয় থাকে। এজন্যই অযোধ্যায় নববধূ ইন্দুমতীসহ অজয় প্রত্যাবর্তনের পরে পুরনারীদেব দিয়ে কালিদাস বলিয়েছিলেন, ইন্দুমতীর জন্মান্তর সঙ্গতিস্বয়ম তাঁর আত্ম-প্রতিক্রিয়া নির্বাচনে সমর্থ হয়েছে

রতিস্বরৌ নুনমিমাবভূতাং রাস্তাং সহশ্রেষু তথা হি বালা।
গতেয়গাঙ্গ-প্রতিক্রপসেব মনো হি জন্মান্তর-সঙ্গতিস্বয়ম্ ॥

রঘুবংশ, ৭।১৫

ভারতবর্ষের কবি কালিদাস দেবদম্পতির বিবাহ বর্ণনায় অপরিণীত আনন্দ লাভ করেছেন। জগতের পিতামাতা দেবদম্পতি মহাদেবও পার্বতীর বিবাহও অজয়বীর কুমার কার্তিকের জন্ম কথায় গার্হস্থ্যজীবনের প্রতি ভারতীয় মনের প্রবাহই কালিদাসের লেখনীমুখে উদ্ভিত হয়ে পড়েছে। নিবেদিতা বলেছেন যে বৌদ্ধযুগের শেষদিকে গার্হস্থ্য জীবন-দর্শনের প্রতি প্রবাহের ভাব যেদিন নিপ্রভ হয়ে পড়ে, বিহারাশ্রমী সর্বভাগী জীবনের প্রতি আকর্ষণ যেদিন জ্বল্লম হয়ে উঠে, এবং তারই ফলে নৈতিক ব্যতিচার দেখা যায়, সেদিন স্বভাবতই গার্হস্থ্য জীবনবিবোধী এই চিন্তার প্রতিক্রিয়ায় গার্হস্থ্য জীবনের গুণাগুণ মুখর হয়ে উঠে কালিদাসের কুমার সম্ভবে ও রামায়ণের সর্বশেষ রূপটিতে। এই দুই অমর স্রষ্টিতেই পার্বতী ও শীতার আদর্শ পরীক্ষণের মাঝে ভারতের গৃহাশ্রমধর্মের উজ্জল রূপ দেখি। রবীন্দ্রনাথও অমরূপ কথাই বলেছিলেন, রামায়ণ গৃহাশ্রমের কাব্য। বৌদ্ধ যুগের বিহারাশ্রমী জীবনচিন্তার অন্ধ আকর্ষণের তীব্র প্রতিক্রিয়াতেই রামায়ণ ও কুমারসম্ভব গৃহাশ্রমের কাব্য হয়ে উঠেছে, নিবেদিতার মতো এমন আলোচনা আর কেউ করেছেন কিনা জানিনা। তবে নিঃসন্দেহে বলতে পারি, এ ব্যাখ্যায় তাঁর গভীর ও অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে। এমন অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মহাভারত সম্পর্কেও তাঁর একটি মন্তব্যে পাই। তাঁর মনে হয়েছে, বৈদিক প্রেরণা যখন ভারতের জীবনে নিঃশেষ হতে চলছে, সেই যুগে কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আবার সমাজের আদিম উৎসাহ ফিরিয়ে আনার ইচ্ছিত যেন মহাভারতে আছে।

নিবেদিতা তাঁর ভারতচেতনার আলোকে এ দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনেক সত্য দেখতে

পেয়েছেন। ভাবতে প্রতিটি ধর্মীয় উৎসবেই মাতৃভূমি দৈবী মহিমা লাভ কবে। শুধু উৎসবেই বা কেন? দৈনন্দিন প্রতিটি আচার আচরণের মধ্যে পবিত্রতার ভাব ফুটিয়ে তোলা এ জাতির স্বভাবশিদ্ধ। তার প্রাভাস্তান, ঘরনিকানো, রান্না, খাওয়া সবকিছুর মধ্যে পবিত্রতার ধ্যান রয়েছে। নদী তার কাছে শুধু জলধারা নয়, শব্দক্ষেত্রে জলসেচের উপায় মাত্র নয়। বৃহৎ পৃথিবী তার কাছে শুধু জলরেখাবলয়িতমুৎপাত নয়। নদীমাত্রই তার কাছে পবিত্র। প্রতিটি নদী গঙ্গা না হ'লেও গঙ্গার প্রতিচ্ছবি বহন করে আনে এ দেশের মানুষের মনোপর্ণে। বাংলাদেশের মানুষ শৈশবেই গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করে, তার রচয়িতা একজন মুসলমান কবি। তাঁর নাম দাবাব গাঙ্গী। এ ভাবে এই কবি সাহিত্যে এক নতুন ভাবের জনক হয়ে উঠেছেন। বাগবাঙ্গারের গলিতে নিবেদিতার যে নতুন জীবন সাধনার আরম্ভ, সে গলির অনতিদূরে প্রবাহিতা গঙ্গার ব্যক্তিত্বের প্রভাব দিনের পর দিন তাঁকে অভিভূত করেছে। দার্শনিকের কাছে গঙ্গা অনন্তের উদ্দেশে বহমান সাতব্যক্তি-জীবনের স্রোত বিশেষ। তীর্থযাত্রী পর্যটকের কানে কানে গঙ্গা ভগবান শিব ও নারীর মাতৃস্বের ভাবধরুণ। পার্বতীর অফুরাণ গল্প ব'লে চলেছেন। ইতিহাসের ছায়ে দৃষ্টিতে আর্ষচিন্তার ধারাবাহিকতার একটি জলময় প্রকাশ এই গঙ্গা। এ ভাবে এদেশের মাটি ও জলকে ঘিরে যে বিচিত্র অনুভূতি জাগে, সেই অনুভূতিলোকে তিনি আমাদের নিয়ে চলেছেন সহযাত্রী করে তাঁর রচনায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায়। রাজগিরে ভ্রমণ করতে গিয়ে নিবেদিতার পক্ষে অনুভব করা সম্ভব হয়, যে পথে আজ তিনি হাঁটছেন, সে পথেই বুদ্ধদেব একদিন হেঁটেছেন, এই গৃধ্রকূট পর্বতেই তিনি বর্ষার দিনগুলি কাটিয়েছেন। বাকিপুরের খুদাবজ্জ গ্রামগারে একটি ফাঁসি পুঁথিতে শাজাহানের স্বাক্ষর দেখে তাব উপর হাত বুলিয়ে তিনি গভীর তৃপ্তি পান। ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণের সময় যে সব

স্মৃতিচিহ্ন তিনি সংগ্রহ করেছেন, সেগুলির মধ্য দিয়ে অতীতের সঙ্গে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর যোগ অনুভব করা সম্ভব হয়েছে। ভারতচেননাকে তিনি শুধু পুঁথির পাতা থেকে পাননি, পেয়েছেন এদেশের মন্দিরে মসজিদে, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় ও সর্বোপরি আসমুদ্র হিমালয়ব্যাপী ভারতে ব্যাপক ভ্রমণের মধ্য দিয়ে।

নিবেদিতার দৃষ্টিতে ধর্ম হচ্ছে 'the manness of man, life-ness of life'।^৪ তিনি ধর্মকে কখনোই সাম্প্রায়িক অর্থে গ্রহণ করেননি। এমন বৃহত্তম অর্থে ধর্মের বোধই শুধু ভারতবর্ষকে মহত্ত্ব দিতে পারে। তাঁর মনে হয়েছে Religion ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ হতে পারে না। ধর্মকে বৃহত্তম অর্থে গ্রহণ করলে ধর্মপ্রাণ হয়েও ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব। কেননা ধর্মনিরপেক্ষতা আর ধর্মহীনতা এক কথা নয়। ধর্ম নিরপেক্ষতার ভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে নিবেদিতার কণ্ঠস্বর তাঁর গুরু বিবেকানন্দের মতো উচ্চগ্রামে বেজে উঠেছে—‘আজ ভারতবর্ষে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের শেষচিহ্নটুকু নিঃশেষ করতে হবে। পবিত্র, উজ্জল ও অকুতোভয় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবোধের জয়যাত্রাকে হুমকি করতে হবে। আর এ ভাবেই জাতীয়তাবোধের ক্ষমোন্মেষের সমগ্র ইতিহাসটিকে নতুন তাৎপর্য ও সামঞ্জস্য দান করতে হবে। ৫ জীবনের জীবনত্ব ও মানুষের মনুষ্যত্ব বলতে নিবেদিতা যে ধর্মকে বুঝেছিলেন, সেই ধর্ম পালন করতে হয় শিল্পীকে শিল্পচর্চায়, বিজ্ঞানীকে বিজ্ঞান সাধনায়, সন্ন্যাসীকে ত্রতোদ্রুতপনে, সৈনিককে সার্বভৌম শক্তির প্রতি আনুগত্য রক্ষায়, প্রতিটি ব্যক্তিকে তাঁর বিশ্বাস পালনে। এই ধর্ম প্রসঙ্গেই গীতায় উক্ত শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়ছে ‘স্বধর্মো নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ’ (৩।৩৫)। ভারতে ধর্মের ধারণা যে কতো মহত্তম, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হচ্ছে, ইষ্টদেবতাবরণের স্বাধীনতা এদেশে সকলকে দেওয়া হয়েছে। নিবেদিতা ইষ্টদেবতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে

গিয়ে বলেছেন, নিজ নিজ বিশ্বাস পালনে প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতাই এ ধারণার মূল কথা। অর্থাৎ এ স্বাধীনতা স্বীকার করলে একজনের বিশ্বাস আর একজনের উপর চাপিয়ে দেওয়ার কথাই উঠেনা। এ প্রসঙ্গে পাদটীকায় নিবেদিতার একটি মন্তব্যে প্রতিটি ব্যক্তির এই স্বাধীনতায় তাঁর অবিচলিত আস্থার পরিচয় দেয়। তিনি সেখানে বলেছেন যে তাঁর নিজের গুরু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে হিন্দু ধর্মের ক্রমবিকাশে তিনি যে স্থান দেন, অস্ত্রের উপর তাঁর নিজের সে বিশ্বাস তিনি বিন্দুগাত্র চাপিয়ে দিতে চান না। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের একটি মন্তব্য স্মরণ করতে পারি যে মানুষ যতাবেশি অগ্রসর হবে, ধর্ম ততাবেশি ব্যক্তিগত হয়ে উঠবে। এমন দিনও আসতে পারে পৃথিবীতে যতো মানুষ ততো ধর্মের সংখ্যা! একটি বিশেষ ধর্মীয় মতবাদের রোলার চাপিয়ে ব্যক্তিমনের স্বাধীনতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের মতোই নিবেদিতা আজীবন সতর্ক ছিলেন।

ভারত ইতিহাসের একটি গুঁচ প্রশ্নের উত্তর পাই নিবেদিতার রচনায়। বৌদ্ধধর্ম এই জাতির জীবনকে কতোদূর প্রভাবিত করেছে? এ বিষয়ে এক কথায় তাঁর উত্তর জাতীয়তাবোধগম্য হিন্দু ধর্মই বৌদ্ধধর্ম। হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের কাছে মাথা নুটিয়ে দেওয়ার কখনোই জাতীয়তাবোধ বুদ্ধ-পূর্বযুগে এ জাতির মনের রক্তে রক্তে সঞ্চারিত হতে পারেনি। ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম যার, সেই বুদ্ধদেবের পক্ষে এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সম্ভব হয়েছিল। জাতীয়তাবোধের উন্মেষ একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। ইতিহাসের সব কিছুই মতোই একটি নিঃশব্দ প্রক্রিয়া। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের প্রতিরোধ ভারতবর্ষকে এক নতুন চেতনায় উজ্জ্বল করে তুলেছিল। বুদ্ধদেবের এই ঐতিহাসিক কৃতিত্বকে স্বীকার করেও নিবেদিতার মনে হয়েছে বৌদ্ধধর্ম একটি স্বতন্ত্র ধর্ম নয়, বুদ্ধ-পূর্ব

যুগে যা বলা হচ্ছিল, সেই গভীর সত্যগুলি জনপ্রিয় করে তোলায় চেষ্টাই বৌদ্ধযুগে ভারতে দেখা দিল। শুধু বুদ্ধদেবেরই নয়, রাম ও কৃষ্ণের মতো ভারত-ইতিহাসের দুজন চিরস্মরণীয় মানুষের জন্মও অত্রাঞ্চ কুলে। বৌদ্ধধর্মকে ঘিরে ভারতে সম্ভবশক্তির জন্ম। এই সম্ভবশক্তিই জাতীয়তা বোধের জননী।

বৌদ্ধস্মৃতিপুঞ্জার ধারণা থেকেই পুণ্য সংকলনের যুগে তীর্থ যাত্রা কীর্তিত হয়। বৌদ্ধযুগে বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি স্থাপনের ফলে ভারতে যাতায়াতের সুবিধা দেখা দিল। এ সুবিধাই আধুনিক যুগে রেলপথের সাহায্যে আরো বেড়েছে। স্থান বিশেষের শৌন্দর্যই ভারতীয় মনে সৃষ্ট জীব মানুষের উদ্দেশ্যে স্রষ্টার পরম আস্থানের ভাবটি জাগিয়ে তুলেছে। যেখানেই গভীর অরণ্য, সমুদ্র বা পর্বতের নীরব পরিবেশ রচিত হয়েছে, সেখানেই স্রষ্টার আস্থান শুনেছে ভারতবর্ষ। সেখানেই এদেশের মানুষ তীর্থের কল্পনা করেছে। এই তীর্থ ভ্রমণের সূত্রেই নিজ নিজ সীমার বাইরে বৃহত্তর ভারত-বোধ জাগানোর সুযোগ পেয়েছে এ দেশের মানুষ। তীর্থ গুলিই জ্ঞান ও চিন্তার বিনিময় কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ভারত-ইতিহাসের গৌরবময় যুগে চিরকালই হিমালয় এ দেশের সীমারেখা হয়নি, হয়েছে দূরদূরান্তরের পথমালা। এভাবে তীর্থভ্রমণ ও বাণিজ্যে পথ হয়েছে উন্মুক্ত। তীর্থযাত্রীর পিছনে পিছনে চলেছে সার্ববাহের দল। ভারতবর্ষ থেকে নির্বাণের সংবাদ চীনে পৌঁছেছে, আর চীন থেকে এসেছে ভারতে সে দেশের রেশমী বস্ত্র। কাগিদাসের শকুন্তলায় চীনাংশুকের উল্লেখ চীন ও ভারতের সেই বাণিজ্যিক যোগাযোগের নিভৃতচিত্র বহন করেছে। উত্তরে হিমালয়ে কেদারনাথ, পশ্চিমে দ্বারকা, দক্ষিণে রামেশ্বরম্, পূর্বে পুরী জগন্নাথ এভাবে ভারতবর্ষময় তীর্থযাত্রায় ভারতচেতনা জাগানোর জন্তু আগাদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধ চেষ্টা নিবেদিতার সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ভারতে ইসলাম সম্পর্কেও নিবেদিতার আলোচনা অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। তাঁর মতে ইংরেজি শিক্ষার আলো এসে পৌছানোর পরেই বরং হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বেড়েছে। অতীতে হিন্দু-মুসলমান মিলনের কতো স্থিতিচিহ্নে ভারত ইতিহাসের অদীর্ঘ পথ আকীর্ণ। অক্ষিচিন্তা এমনই একটি স্থিতিচিহ্ন। অক্ষিচিন্তায় প্রেমের পথে ভগবান লভ্য, আর বেদান্তে জ্ঞানের পথে। আজকের দিনেও উত্তরপ্রদেশে নবজাতকের রামবল্লভজাতীয় নামকরণে সংস্কৃত ও আরবির মিলন ঘটছে। উত্তর পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে এ জাতীয় নামের ঐক্য প্রচুর। ত্রিবাল্ময়ের মন্দিরটি পর্যন্ত এক মুসলমান রাজকুমারীর নামে উৎসর্গীকৃত। মুসলমান নবাবদের হিন্দু সেনাপতি নিয়োগ ও অজ্ঞাত দারিদ্র্যপূর্ণপদে অজ্ঞাধর্মাবলম্বীদের কর্তব্য পালনের স্বযোগ বিরল ঘটনা ছিলনা। সমকালীন আরবের পরস্পর বিবাদমান গোষ্ঠিগুলিকে একজাতীয়তার বন্ধনে বাঁধার ঐতিহাসিক কৃতিত্ব হজরৎ মহম্মদের। এমন মহম্মদের প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মে সঙ্গীতের স্থান নেই। ‘আল্লাহ্ সকলেরই আল্লাহ্, কোনো একটি বিশেষ মানব-গোষ্ঠির নয়’ মহম্মদের এই উক্তিভেদে উদারতার পরিচয় পেয়ে নিবেদিতা গভীর আনন্দ পেয়েছেন। মুসলমানদের পরম্ব-বিদ্বেষ সম্পর্কে যুরোপীয়দের ধারণা তাঁর মতে ভিত্তিহীন। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের বিরোধ যেমন ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্টদের বিরোধ, ঠিক তেমনি দিল্লি ও গজনির বিরোধও ‘দিন’ ও ‘ধর্ম’ এর বিরোধ। তাঁর দৃষ্টিতে এমনকি শিখ ও মারাঠাদের অভ্যুদয়ের মধ্যে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর আগরণের আভাস নেই, বরং আছে আঞ্চলিক শক্তিকেন্দ্রের স্থানপরিবর্তনের মতো ভারত-ইতিহাসের একটি অত্যন্ত সাধারণগত্য। অঞ্চল বিশেষের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শক্তির বিরোধকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ হিসেবে দেখা উচিত নয়। হিন্দুরাজ্য বরোদা থেকে যে একটি কারুকার্যশোভিত শাল মদিনায় হজরতের কবরে পাঠানো হতো, এমন অনেক তথ্য

তিনি উদ্ধার করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে মূর্তিপূজানিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটিও ও বাহ্য। কেন না হিন্দু মূর্তিপূজা করলেও এ বিশ্বাস তাঁর মনে দৃঢ়মূল যে নিরাকারের উপাসনার সোপান তার এই সাকার উপাসনা। আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষায় যেমন Concrete এর সাহায্যে Abstract এর ধারণা দেওয়া হয়, হিন্দুর মূর্তিপূজাও Abstract এ পৌছানোর জন্য Concrete এর সোপানমাত্র। গোহত্যা-কেন্দ্রিক বিরোধটির মূলে আছে ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশজাত কৃষিভিত্তিক জীবনাদর্শ ও পশুহত্যার অভ্যস্ত আরবের মরুচর সামরিক মানবগোষ্ঠীর জীবনাদর্শের পার্থক্য। এ পার্থক্যকে বড়ো করে দেখলে অনর্থছাড়া মজলের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই অনর্থের ফলে বিপর্যস্ত আজকের ভারতে নিবেদিতার সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা প’ড়ে বেদনায় মন অভিভূত হয়। মুঘল যুগের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে এই মহীয়সী মহিলা হিন্দু-মুসলমান শিল্পরীতির সমন্বয় দেখে গভীর আনন্দ পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন বিজৈতা মুসলমান ও বিজিত হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য বিশেষ ছিলনা। কেন না এই দুই দলই অভিন্ন এশীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী।

নিবেদিতা হিন্দুসমাজে প্রচলিত বৃত্তিভেদে শ্রেণীভেদের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। বৃত্তিভেদে এই শ্রেণীভেদের ফলে কর্মকার, কুস্তকার ও তন্তুবাঁয় জাতীয় বিভিন্ন-শ্রেণীর মধ্যে তিনি স্বায়ত্তশাসনের ভাব লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে, এই শ্রেণীভেদে প্রথা তাঁদের মধ্যে এক বংশাধিকারিক ট্রেডইউনিয়ন গড়ে তোলার সাহায্য করতো। এ যুগের মতো ট্রেডইউনিয়ন না হলেও এক একটি বিশেষ বৃত্তি নির্ভর শ্রেণী ট্রেডইউনিয়নের কাজগুলিই করতে পারতেন। খোপার কাজ গোয়ালার করার স্বযোগ ছিল না। তাই প্রতিটি জীবিকা একটি বিশেষ গোষ্ঠির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এজন্য তাঁদের প্রতি অস্ত্রের অবিচারের প্রতিশোধ নেওয়া সহজ ছিল। ধরা থাক, কোনো একটি পরিবারের কাজ বন্ধ করার আহ্বান

জানালেন গোয়ালা বা ধোপাসমাজের মোড়ল। তখন সেই আহ্বান অমান্য করার সাধ্য ঐ সমাজের কোনোলোকেরই ছিল না। এযুগে যেমন ধর্মঘটের সময় অস্ত্র শ্রমিকদের দিয়ে মালিক কাজ হাসিল করিয়ে নেন, এমন অযোগ্য সে সমাজে ছিল না। অর্থাৎ Black leg এর চোরাগলিতে কেউ ঢুকতে পারতেন না। এককালে এই শ্রেণীভেদ প্রথার ফলে সমাজ উপরুত হয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর একজন ধনী হয়ে গেলেও কন্ডার বিবাহের জন্য ভাবী দরিদ্র জামাতার লেখাপড়ার ব্যবস্থা তাঁকে করতে হতো। কেন না ঐ বিশেষ সমাজের গভী ছাড়িয়ে অন্তঃসমাজে কন্ডার বিবাহের চেষ্টা করা সম্ভব ছিল না। এভাবে বর্ণভেদ প্রথার বিভিন্ন দিকের আলোচনায় নিবেদিতার একটি বিশেষ মনের পরিচয় পাই। বর্ণভেদ প্রথার বিষয় পরিণামের আলোচনা তাঁর রচনায় চোখে পড়েনি। এ প্রথার উৎপত্তির ঐতিহাসিক কারণ ও বিভিন্ন ভালোদিকের আলোচনায় তিনি গবেষিকা-মনের পরিচয় দিয়েছেন। এসব আলোচনায় তাঁর স্নেহান্বিত মনের পরিচয় পাই। যদিও একথা সত্য, এই স্নেহান্বিত্য তিনি ভারতীয় সমাজের সমালোচনা থেকে অধিকাংশক্ষেত্রেই নিবৃত্ত থাকেননি।

নিবেদিতার ভারতচেতনা তাঁকে এজাতির অধ্যাত্মলোকেই শুধু পৌঁছিয়ে দেয়নি। তিনি শুধু ঋষিদের সৃষ্টিস্বপ্ন, মাতৃপূজা, বুদ্ধের নির্বাণ, উপনিষদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, শঙ্করাচার্যের মায়ার আর মধ্যযুগের ভক্তিসাধনায়ই আলোচনা করেন নি। নব্য-ভারতগঠনে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—‘পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে অস্বীকারই পবিত্র জ্ঞানে গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞানের ধারণাকে শুধু তার নিজের প্রয়োজনে গ্রহণ ও অগ্রসরণ করতে হবে।’ প্রাচীন ভারতের আলোচনায় শেখরের বিজ্ঞানসাধনার পরিচয় তুলে ধরতেও তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই। তিনি স্বরণ করেছেন মানুষের সামগ্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে মানবমনের আলোচনা

করেছিলেন যিনি, সেই খ্রীঃ পূঃ ২য় শতকের মনীষী পতঞ্জলির কথা। এ গবেষণাকে তিনি পুরুষপরম্পরায় অনেকের চিন্তার মিলিত ফল বলে মনে করেছেন। তার সঙ্গে নিবেদিতা এও বোধনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে ভারতের এই বৈজ্ঞানিক মনন জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়নি। এজন্যই এই মননের দীপ্তিতে সারা জাতির মন উজ্জ্বল হতে পারেনি। আধুনিক ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানাত্মক করার তাঁর উৎসাহ ছিল গভীর। Frobel এর মতো শিক্ষাবিজ্ঞানীর সাক্ষাৎ শিক্ষা নিবেদিতার অস্বতন্ত্র শিক্ষক ছিলেন Pestalozziর এক ইংরেজ-ভক্ত। আমাদের প্রাণহীন স্বপ্নের মতো শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি সজাগ ছিলেন। নারী-শিক্ষা ছিল তাঁর মনের অত্যন্ত ধ্যানের বিষয়। কেননা জাতিগঠনের কাজে নারীর ভূমিকা সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ।

বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরে নিবেদিতা তাঁর সম্পর্কে বক্তৃতায় বলেন, বিবেকানন্দ আমাদের মহান জাতীয় নেতা। বিবেকানন্দ তাঁর দৃষ্টিতে ধর্মগুরু নন, বেদান্ত প্রচারক নন, জাতীয়তার উদ্বোধক। তাঁর এই মন্তব্যটিতেই স্বাধীনতার আবাল্য আরাধিকা, আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্টা, বলভঙ্গ যুগের বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎসস্বরূপা, ভারতীয় জাতীয়তার ধ্যানে নিমগ্না, যুগোপযোগী ভারতচেতনায় জ্যোতির্ঘনী নিবেদিতার পরিচয় ধরা পড়েছে। জাতিগঠনের পথে যুগযুগ ধরে ভারতবর্ষ কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তার ঐতিহাসিক চিত্র যিনি এঁকেছেন, সেই নিবেদিতার পক্ষেই এমন উক্তি সম্ভব। অঞ্চলে অঞ্চলে স্বদেশের অবসান ঘটিয়ে ভারতবাসীকে জেগে ওঠার আহ্বান আহ্বিত্য তিনি জানিয়েছেন। ভারতীয় চিত্রশিল্পের নবজাগরণে তাঁর আগ্রহ ঐ জাতীয়তার স্বপ্ন থেকেই উৎসারিত। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, ভারতীয় রাজনীতির পুরোধা আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ, তিলক ও গোখলে, ভারতীয় অর্থনীতি ও

ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা, অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত; কবি রবীন্দ্রনাথ, শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, বাংলাসাহিত্যের ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এমন অজস্র সমকালীন মনীষীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগের কাহিনীতে সন্তোষিত ভারতবর্ষের অন্তরাস্তার স্পন্দন শোনায়ে নিবেদিতার আগ্রহই উজ্জ্বল হয়ে পড়েছিল। যে ফ্রবতার। অনির্বাণ শিখার তাঁকে আহুত পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিল, সে ফ্রবতারার নাম তাঁর অন্তরে উপলব্ধ ভারত-চেতনা। সেই ভারতচেতনার আলোক সমুদ্রে স্নাতা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভারতের 'ভাবৈকরসে' স্থিতমনা পার্বতী স্বরূপা বা অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় অচ্ছাদনসরসীতীরে শিব-মন্দিরের সোপানে উপবিষ্ট। বীণাবাদিকা মহাশ্বেতাধরুণা লোকমাতা নিবেদিতাকে তাঁর শতবাধিকীতে ভক্তিনন্দ প্রণাম জানাই।

- (১) The Wheel of Birth and Death—The Web of Indian Life
- (২) The Gospel of The Blessed One—The Web of Indian Life
- (৩) History of Sanskrit Literature—Dr S. N. Das Gupta & Dr S. K. Dey
- (৪) The Synthesis of Indian Thought—The Web of Indian Life
- (৫) Modern Epoch And The National Ideal—Civic And National Ideas
- (৬) The Immediate Problems of The Oriental Woman—The Web of Indian Life.

অনিম্ন ব্রাহ্মণ

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্জ্জাবাদ : ৩.৫০ টাকা।

“...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্জ্জাবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ। কিন্তু ইহার সহিত মার্জ্জা যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতন্ত্র ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।”
... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১.২৫

“...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবগদ করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সমুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া ‘নাস্ত পহা বিজ্ঞতে অয়নায়।’ (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে
এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জম্মিনী—৩০৯, গাজুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

সম্পাদকীয়—(৪৬২ পাতার পর)

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের কাছে জনসাধারণের আশা করবার কিছু নেই তাই এড হক বোধন কিম্বা বিসর্জনে তাদের কোনোই আবেগ নেই।

নিখিল ভারত কংগ্রেসে দশ দফার আলোচনা

জব্বলপুর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মেলনে কংগ্রেসের দশ দফা সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী ধায়াচাপা পড়েছে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এবং প্রাক্তন রাজস্ববর্গের প্রিভি পাস' লোপের যে দাবীতে কংগ্রেসের বামপন্থীরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এবং যে দাবীগুলির পেছনে প্রধানমন্ত্রী সহ ক্যাবিনেটের চ্যবন—জগজীবনরাম প্রমুখ বিশিষ্ট অজ্ঞাত মন্ত্রীদেব পূর্ণ সমর্থন ছিল, মোরারজী দেশাই-এর তীব্র প্রতিরোধের সামনে তাদের সকলকেই পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে। এমনও শোনা গেছে, মোরারজী দেশাই নাকি বলেছেন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রস্তাব গৃহীত হলে প্রধান মন্ত্রীকে নুতন অর্থমন্ত্রীর সন্ধান করতে হবে।

জব্বলপুরে দশ দফা কর্মসূচীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক সমর্থন জানিয়ে মোরারজী দেশাই-এর যুক্তিরই পুনরুক্তি করেছেন। জাতীয়করণের পরিবর্তে আপাতত কঠোর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে ব্যাঙ্কের সাহায্যে ব্যক্তিগত মালিকানার দুর্গ অদৃঢ় করবার সুযোগগুলি অবরুদ্ধ করে বিভিন্ন খাতে, বিশেষভাবে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের খাতে বিনিয়োগ ও শ্রমদানের ক্ষেত্র প্রশস্ততর করবার কথা বলেছেন। মোরারজী দেশাই-এর বক্তব্য এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যদি ব্যর্থ হয়, জাতীয়করণ অনিবার্য হয়ে উঠবে। এ-ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তদারকী বৃদ্ধি করে আইনের সংশোধন করা হবে।

রাজস্ববর্গের প্রিভি পাস' লোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বটে, কিন্তু তার ক্রম নির্ধারণের জন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চ্যবনকে রাজস্ববর্গের সঙ্গে আলোচনার ভার দেওয়া হয়েছে। রাজস্ব-

বর্গের অতিরিক্ত সুবিধাগুলি অবশিষ্ট প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

জেনারেল ইনস্টিটিউশন-এর জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বেই গৃহীত হলেও, এই সিদ্ধান্ত রূপায়নের কোনো সময়-সীমা নির্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং ভুবনেশ্বর প্রস্তাবের মত এই প্রস্তাবগুলিও যে ধীরে ধীরে খিতিয়ে যাবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? অবশ্য কংগ্রেসের বামপন্থীদের সংহতি ও তৎপরতার উপর এই প্রস্তাবগুলির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কৃষি-সম্পর্কিত প্রস্তাবে ভূমি সংস্কারের প্রসঙ্গটি প্রায় অমুচ্যারিত রয়ে গেছে। ভূমি সংস্কার, উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বগত হওয়া সত্ত্বেও ভূমি-সংস্কারকে অগ্রাধিকার না দিয়ে ১৯৭০-৭১-এর পূর্বে খাদ্যস্বয়ংসম্পূর্ণতার নিশ্চিত সীমানা নির্ধারণে ওয়াকিং কমিটি অগ্রসর হয়েছেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলে ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা দূর করবার লক্ষ্যও অপর্যাপ্ত থেকে যাবে। বেশের আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার জন্ত বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা দূর করবার অনিবার্যতা প্রধান মন্ত্রী এবং উপপ্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছেন।

১৯৭৬ সালের মধ্যে জনসাধারণের নিম্নতম প্রয়োজন মেটাবার লক্ষ্য স্থির করেও এবারকার এ, আই, সি, সি তে কংগ্রেস নেতৃত্ব আর একবার পশ্চাদপসরণ করেছেন। পানীর জলের ব্যবস্থা এবং গৃহেব আশ্রয় এই দুইটি নিম্নতম লক্ষ্যে পৌছাতে পারলেই কংগ্রেস নেতৃত্ব নিজেদের সার্বক মনে করবেন।

এবারকার অধিবেশনে নেতৃত্বের ঐক্য, নীতির ঐক্যের ওপর নিঃসন্দেহে প্রাধান্য পেয়েছে। তার কারণ বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব, বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, নেতৃত্বের অনৈক্যের মুকি নিতে সাহস করেন নাই। কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্কীর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে পাতিল-প্রমুখ দক্ষিণ-

পন্থীদের শক্তি এবং পার্লামেন্টে কংগ্রেস সদস্যদের কোনো কোনো মহলের বিক্ষোভ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বর্তমান আর্থিক সঙ্কট সমাজতান্ত্রিক নীতির প্রয়োগে বিরতি টেনে দিয়েছে। নেতৃত্বের আপাত ঐক্যের নিকট নীতির আত্মসমর্পণ জব্বলপুরের ফলশ্রুতি।

কিন্তু এই ঐক্যেরও অন্তর্নিহিত অনৈক্য কংগ্রেস সভাপতি মনোময়নে জব্বলপুরে প্রকট হয়ে পড়েছে। কামরাজের পুনর্নির্বাচন একরকম ঠিকই ছিল। কিন্তু পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের এড্‌ হক কমিটি নিয়োগকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রীর এড্‌ হক-এ সম্মতি যে ভাবে কামরাজের বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয়ে নন্দ-প্রস্তাবকে বানচাল করে দিয়ে প্রহসনে পরিণত করেছে, তারপর আর প্রধানমন্ত্রী কামরাজের পুনর্নির্বাচনে সম্মত নন। অতুল্য ঘোষ তার নিজের ও এস, কে, পাতিলের সমর্থক কামরাজের প্রতি প্রকাশ্যে প্রচারিত করে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি বিরোধিতা করেছেন। সি, বি গুপ্ত আবার অতুল্য ঘোষ পাতিলের বিরোধিতায় এগিয়েছেন। নীতির প্রয়োগ রোধে নেতৃত্বের যে ঐক্য অনিবার্হ হয়ে উঠেছিল সংগঠনের খাতিরে সেই ঐক্য বজায় রইল না বরং অনায়াসেই তা অনৈক্যে পরিণত হয়ে গেলো। হুতরাং নেতৃত্বের ঐক্যের ব্যুহ নীতির দুর্জয় আঘাতে ভাঙবেই যদি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থীরা প্রত্যয়ে দৃঢ় থাকেন।

ক্রান্তি দল

বিভিন্ন রাজ্যে যারা কংগ্রেসত্যাগী মূলত তাদের নিয়েই ক্রান্তি দল গঠিত হলেও এদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিরোধ ও অনৈক্যের স্বর বেজে উঠেছে। ক্রান্তি দলের উদ্দেশ্য বর্ণনার গান্ধীবাদের আওতায় গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে স্বীকার করে নিয়ে এই দল কংগ্রেসের সঙ্গে আদর্শগত স্বাক্ষাত্যেই ঘোষণা করেছে, যা কিছু প্রভেদ তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে। আদর্শের প্রয়োগ স্বরাষ্ট্র করার বিষয়ে নূতন দলের উৎপত্তি হয়েও পশ্চিম - বাংলার এই দলের

দুই শাখার—বাংলা কংগ্রেস ও ক্রান্তি গোষ্ঠি—মধ্যে স্বরূপেই বিরোধ, এই নূতন দলের সার্থকতা সম্বন্ধেই জনসাধারণকে সন্দেহান করে তুলেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে যেখানে মৌলিক বিরোধ নাই, ব্যক্তি প্রাধান্ত যেখানে বিরোধের মূলে রয়েছে, সেখানে সাময়িক মঞ্চের ভাগিদাই ক্রান্তি দলের উৎস। এর বেশী কিছু ঐতিহাসিক তাৎপর্য এই ধরনের দলের নেই। জাতীয়তাবিরোধীদের প্রতিরোধ করাই যদি ক্রান্তিদলের অচ্যুতম উদ্দেশ্য হয়, সেই উদ্দেশ্যে মঞ্চ প্রস্তুতের উদ্ভোগে মনোযোগী হলে ক্রান্তি দলের সংগঠকরা একটি গুরুতর জাতীয় কর্তব্য পালন করবেন। অল্পধার মঙ্গীর্ণ দলীয় বাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পথে অন্তরায়ই সৃষ্টি করবেন।

মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন

গত ২৫শে অক্টোবর মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। আগামী ছমাসের মধ্যে কোনো দল সংখ্যাগুরু সরকার গঠনে সক্ষম হলে বিধান সভা পুনরায় চালু হবে।

সেপ্টেম্বর মাসে কয়েকজন সদস্য কংগ্রেস দল ত্যাগ করে যুক্তফ্রন্টে যোগদানের ফলে ৩২-আসন বিশিষ্ট বিধান সভায় ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা ১৫তে নেমে যায়। এই কারণে গত ৪ঠা অক্টোবর কোয়রেন্সিং সিং-এর কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। ১৭ জন সদস্য নিয়ে যুক্ত ফ্রন্ট নেতা বাঘাও সিং ১৩ই অক্টোবর মন্ত্রী গঠন করেন। অতঃপর কংগ্রেস দলে একজন সদস্য যোগ দিলে উভয় পক্ষে ১৬ জন সদস্য হয় এবং এই অবস্থায় ডেপুটি স্পীকার ও স্পীকার পদত্যাগ করলে বিধান সভায় সভাপতিত্ব করতে কেউ স্বীকৃত না হবার ফলে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হয়। সভাপতিহীন বিধান সভার দৃষ্টান্ত বোধহয় আর কোথাও ঘটে নাই। বিধান সভার সঙ্কট ভাই মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন এনে দিয়েছে। পুনর্নির্বাচন ছাড়া এই ধরনের অনিশ্চিতির সীমাংসা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি পুনর্নির্বাচনেও

এসব ক্ষেত্রে কোনো দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হয়ে গণতন্ত্রের স্থায়ী সঙ্কট দেখা দিতে পারে।

সোভিয়েটের মহাকাশ সাফল্য

গত ১৯শে অক্টোবর শুক্রগ্রহে ভেনাস-৫ নামক যাত্রায় মহাকাশযানের ধীর অবতরণ সম্ভব করে মহাকাশ যাত্রায় সোভিয়েত রুশ আর একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। ১৯৬৬ সালে আর একটি মহাকাশযান শুক্রগ্রহে পৌঁছে সংঘাতে বিনষ্ট হয়ে যায়। শুক্রগ্রহ থেকে মহাকাশযানটি যে সবাদ পাঠিয়েছে তাতে জানা যায় এখানকার তাপমাত্রা ৪০ থেকে ২৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যে তাপে পৃথিবীর মত প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব। বায়ু চাপ নিম্নমাত্রায় পৃথিবীর সমান এবং উচ্চমাত্রায় এর পনেরওগুণ বেশী।

গত ৩০শে অক্টোবর সোভিয়েট রুশের আর একটি অত্যাশ্চর্য মহাকাশ সাফল্যের কথা জানা গেছে। কসমস ১৮৬ নামক মহাকাশযানকে মহাকাশে অনুসরণ করে কসমস ১৮৮ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিন ঘণ্টা মহাকাশে একত্র বিচরণ করে তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ নিজ কক্ষপথে ফিরে গেছে। পৃথিবী থেকে কম্পিউটারের সাহায্যে এদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল।

আরোহীহীন এই দুই মহাকাশযানের মহাকাশে সংযুক্তি এবং বিযুক্তি চম্বে পাড়ি দেবার জ্ঞান সোভিয়েত উদ্যোগের একটি নিশ্চিত এবং বিশ্বয়কর পদক্ষেপ। মহাকাশে পর পর মঞ্চ তৈরী করে চম্বে অভিমুখে অগ্রসর হবার উদ্দেশ্য এই নূতন অভিযানের মধ্য দিয়ে ঘোষিত হয়েছে। সোভিয়েতের এই বিশ্বয়কর সাফল্য সারা পৃথিবীর সশ্রদ্ধ অভিনন্দন অর্জন করেছে।

শিল্পে অশান্তি

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রী পশ্চিম বঙ্গের শিল্পে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকা সম্বন্ধে যতই

ভারস্বরে এ-বাংলা ঘোষণা করুন না কেন, গত আট মাসে যুক্ত ফ্রন্টের প্রশমনীতির ফলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে যে সঙ্কটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যুক্ত ফ্রন্ট শ্রমিক-মালিক বিরোধে অতঃপর নিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করে এ-বাংলা অনুমত নীতির কার্যত পরিবর্তন ঘোষণা করেছেন। যুক্ত ফ্রন্ট সরকার গঠনের পর এই সরকার কেবল শ্রমিকদেরই পক্ষাবলম্বন করবার মনোভাব দেখিয়ে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কে ছায়-বিচারের ক্ষেত্র কার্যত অস্বীকার করে একদিকে যেমন শ্রমিকদের ছায়-বিচারের সীমানা অতিক্রমে প্ররোচিত করেছেন, তেমনি মালিকদের ছায় সমস্তর প্রতি চরম ঔদাসীন্ডে শিল্পোৎপাদনে আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা ডেকে এনে অর্থনৈতিক মন্দার মুখে গভীর সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন। গত মার্চ মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে তিন হাজারের বেশী শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। ৪৪ হাজার শ্রমিক লে অফ হয়েছে এবং ৬৮টি কারখানা বন্ধ হয়ে ৪ হাজারেরও বেশী শ্রমিক বেকার হয়েছে। বিলম্বে হলেও আগলে শিল্পের অপমৃত্যুর মারাত্মক আশঙ্কা দূর করে পশ্চিম বাংলার স্বার্থে শিল্পে শান্তি ফিরিয়ে এনে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ যুক্ত ফ্রন্টের অনিবার্য কর্তব্য। অন্তর্গত পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক সর্বনাশের ভয় যুক্তফ্রন্ট উত্তরকালের নিকট দায়ী হয়ে থাকবে।

ঐতিহাসিক রুশ বিপ্লব

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের আমন্ত্রিত অতিথিদের সমাবেশে এবারের ৭ই নবেম্বরে মস্কোতে রুশ বিপ্লবের ৫০ শত বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে রুশ বিপ্লব এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। পৃথিবীর রাজনৈতিক বিবর্তনের পথ-চিহ্নগুলি বর্ণনা করতে গিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেন “মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, ইংলণ্ডের কন্সটিটিউশনাল

ডিমোক্র্যাসী, জাৰ্মানীর মার্ক্সীয় দর্শন এবং রাশিয়ার নবোৎপন্ন বিপ্লব এক একটি মৌলিক ঘটনা। রুশ বিপ্লব নিঃসন্দেহে মানব সভ্যতার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ও কার্যক্রমে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

রাজতন্ত্রের অবসানে গণতন্ত্রের আনন্ধান এনেছে ফ্রান্সী বিপ্লব। কিন্তু অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া যে রাজনৈতিক গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ থাকে সে কথা সোচ্চারিত হয়ে উঠেছে সোশ্যালিজম ও কম্যুনিজমের আদর্শবাদে। মার্ক্সবাদের চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিক অনিবার্যতার প্রশ্নে মতানৈক্য আছে নিশ্চয় কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে মার্ক্সের চিন্তাধারা বিশ্বের নিপীড়িত ও লাঞ্চিত মানব সমাজে এক নতুন আশা ও সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। নিপীড়িত ও অবনত মানব সমাজেরও যে সম অধিকার ও মর্যাদায় জীবন যাপনের জায়গা তত্ত্ব আছে তারই তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন কার্ল মার্ক্স। রুশ বিপ্লব সেই তত্ত্বের কার্যকরী রূপায়ন।

রুশ বিপ্লব যে মানব প্রগতির অত্যন্ত পথ-চিহ্ন সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই, কিন্তু রুশ বিপ্লবের মাধ্যমেই মানব প্রগতির সম্ভাবনা স্তব্ধ বা শেষ হয়ে যায় নি। কম্যুনিজম যেখানে এসে থেমে গেছে মানব সভ্যতাকে তার পরবর্তী অগ্রগতির অধ্যায়ে এগিয়ে যেতে হবে। নেতাজী তাই বলেছেন কোন মতবাদ বা 'ইজমই' মানব সভ্যতার নিরন্তর বিবর্তনের 'শেষ কথা' নয়। রাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের অবসানে জনগণের গণতান্ত্রিক ও আত্মিক মুক্তির নামে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে আজ জনগণের সার্বভৌমিকতা ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আদর্শ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে পার্টিতন্ত্র এবং ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের বদলে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের যে রাজনৈতিক কাঠামো কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা জনগণের সার্বিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার মৌলিক লক্ষ্যের পরিপন্থী হয়ে উঠেছে।

মানব প্রগতির এই সকল প্রশ্ন ও সমালোচনা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বন্ধন মুক্তির অত্যন্ত পথ-চিহ্নরূপে রুশ বিপ্লবকে আমরা অভিনন্দন জানাই, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলি যে কম্যুনিজমের যুগ পার হয়ে সর্বাদীন মানব মুক্তির পরবর্তী আদর্শবাদের দিকে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

২১শে অক্টোবর

গত ২১শে অক্টোবর, সোনানে নেতাজী স্মৃতিচক্র বহুর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার ২৪ তম বছর অমুষ্টিত হল এই ঐতিহাসিক দিনটি জাতীয় জীবনে সরকারী স্বীকৃতি না পেলেও, সময়ের অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী অবহেলা ও ঔদাসীন্য সত্ত্বেও জাতীয় মানসে ধীরে ধীরে অখচ স্মৃতিস্তম্ভভাবে মর্যাদার আগনে স্থাপিত হচ্ছে। নেতাজী স্মৃতিচক্রের পূর্বে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ স্বাধীন ভারতের আক্ষরিক সরকার গঠন করলেও তাকে রূপ দিতে পারেন নাই। কিন্তু আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকেই এই সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়ে পূর্ণ মর্যাদায় প্রশাসন-পরিচালনা করেছিল। জাতীয় জীবনের বর্তমান সঙ্কটে এই মহত্তম জাতীয় ঐতিহ্যের জাতীয় মানসে পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে। আগামী বছর আজাদ হিন্দ সরকারের ২৫-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সে-কর্তব্য সম্পূর্ণ করবার দায়িত্ব গ্রহণে জাতীয়তাবাদীদের এগিয়ে আসতে হবে।

মহিলা পর্বত অভিযাত্রী

গত ২৮শে অক্টোবর শনিবার বৈকাল পৌনে দুইটায় মহিলা পর্বত অভিযাত্রী দলের উদ্যোগে পরিচালিত গাড়োয়ালের রোনটি পর্বতশৃঙ্গ অভিযান সফল করেছেন প্রথম বাঙালী মহিলা অভিযাত্রী শ্রীমতী স্বপ্না মিত্র। ১৯, ৮৯০ ফুট

উঁচু এই পর্বত শৃঙ্গটিতে একমাত্র সেরপা পাশাং ফুতার তেনজিংকে নিয়ে পৌঁছে বাঙালী মেয়েদের দুর্গমের পরীক্ষায় গৌরবের আসনে বসিয়েছেন। 'পবিত্রত' আয়োজিত এই অভিযাত্রী দলের নেত্রী ছিলেন শ্রীমতী দীপালি সিংহ এবং অত্যন্ত সদস্যদের মধ্যে সুজয়া গুহ, শীলা ঘোষ, ইন্দিরা বিশ্বাস,

লক্ষ্মী পাল, হৃদীপ্তা সেনগুপ্ত ও স্বপ্না নন্দী। আমরা শ্রীমতী স্বপ্না মিত্র এবং পর্বতশৃঙ্গ-এর অত্যন্ত অভিযাত্রীদের আনন্দ অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি তাদের দৃষ্টান্ত আরও মহিলাদের দুর্গমের অভিযানে উৎসাহ করবে।

৮/১১/৬৭

**সুলেখা
ঐতিহ্য**
দেশে ও বিদেশে সমান প্রিয়...।

সুলেখা
ফাউন্টেন পেন-এর কালি

এই সব রঙে পাবেনঃ

ব্ল্যাক • রয়াল ব্লু • ব্ল্যাক
বেড • গ্রীন • ভায়োলেট

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২



Progressive/SW-22B

নিবেদিতা : চিত্তভানু

তখন শতাব্দী শেষে বলদর্পী বিশ্বের কজ্জাল,
ভোগমত্ত সভ্যতার উৎসবের মূঢ় উত্তরোল
ছাপায়ে উঠিয়াছিল ভারতের উদাস আত্মান
বিবেকানন্দের কণ্ঠে মন্ত্রধ্বনি মহাবেগবান ;
সে-গভীর আবাহনে দলে দলে এলো নরনারী,
আত্মস্বপ্ন গৃহবাস অজনের চিরপ্রিয় ছাড়ি ;
আনিল প্রদীপ্ত প্রাণ অর্থ্য বহি ভারতের দ্বারে,
হোমায়ি বসিল যিরি, হৃদয়ে লইল মৌনতারে ;
শুনিল বিশ্বের বাণী শুক হয়ে আপন অন্তরে
ধ্যানমগ্ন মহাশক্তি বহিল সাধনা অগোচরে ।

সেই সৌম্য-দীক্ষার্থী-মণ্ডলে সূর্য্যবিচ্ছুরিত প্রাণ
এলো এক কোষমুক্ত অনিবার্য্য উজ্জত কুপাণ ;
নিজের সে নিবেদিল কঠিন ব্রতের সাধনায়
তিলে তিলে আপনারে নবজন্মানন্দ নবরচনায় ;
ভারত চিনিল তারে মুষ্টিমতী মানস ছুঁহিতা,
আত্মনিবেদন ধ্বজ ডাকিল তাহারে 'নিবেদিতা' ।

তুমুদেহ তেজোময় সামিক অক্ষরে বিরচিত
মহাঋকমন্ত্র ধ্বন, চারিত্রের প্রার্থ্য্য-দীপিত ;
ত্যাগ শ্রদ্ধা সরলতা ক্ষৌরকচি শুচিবাসে আঁকা,
স্নেহভক্তি করুণায় মুখকান্তি মমতায় মাখা ;
দৃষ্টিতে বিহ্বলবহি স্পষ্ট তবু কিছু পরকাশ,
কণ্ঠে বীণাধ্বনি মাঝে মহাভয় বজ্রের আভাষ ;
চক্ষে স্তান বন্ধে প্রেম শুশ্রূষায় অমৃৎগণ রত,
এক হস্তে বরাভয় অস্ত্রহাতে বজ্র সমুদত ;
ত্যাগে বীৰ্য্যে প্রেমে জ্ঞানে সাধিল যে জীবনের গীতা,
জানি সে যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা ।

নিবেদিতা : একটি বেদনার স্মৃতি : বিজয়কুমার দত্ত

পথচারীদের অজস্র ভীড় শহরে গঞ্জে মেলাতে
মাঝি মাস্তার দাঁড় টেনে যাওয়া অলোচ্ছ্বাসের আধাতে.
আকাপে বাতাসে বেঁচে থাকবার আয়াসে
নীল সিঁদুর ধনিপুঞ্জের শব্দের স্রোত ভাসে :
লৌকিক এই দৃশ্যপটের সবলধা যায় মুছে
শুধু অমূল্যব মাটির গভীরে তৃণশস্ত্রের সবুজে ।

ভারতবর্ষে স্থিতিশীলতার অচ্ছাদ জলবিশ্বের
জন্মমৃত্যুবাহিত স্মৃতির উজ্জল নীল স্তম্ভের
বিভূতির ছবি ফিরে এল কোন বিবেকের অমুশাসনে—
সেই পথরেখা পরিজন্মায় অশনে বসনে ভূষণে
সাগরপারের বন্দিনী নারী তপস্বিনীর শরীরে
শ্বলে জলে আর নভোনীলিমায় স্মৃষ্ণ হৃদয় গভীরে
ছড়ালো আঁধারে স্তান ও কর্ম, ভক্তিব্যাগের আপো—
“কে আছে কোথায় ? অতিলৌকিক আস্তরণের শিখা আলো।”

শুধু অমূল্যব রক্তে মাংসে সাহসী শোণিত শিরাতে
কর্মমুখর নিবেদিতপ্রাণ, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রবণে
অমরত্বের সাধনামন্ত্র, উৎসর্গের বোধনে
বেজেছে তীক্ষ্ণ নবভারতের সৌরকিরণ প্রভাতে ।
স্মৃতির দৈন্তে শুধু অবশেষ কাণাকড়ি সঞ্চয়
শতবাধিকী উৎসবে কোন করানো মালার ক্ষয়
বাতাসে বাতাসে হেসে যেতে চায় দক্ষ ছিন্ন ভারতে ?
পূজারতিসার অর্থপ্রদীপ নিভে যায় মূঢ় অগতে ।

নিবেদিতা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বরের বুকের মধ্যের ভাগবাসী

সে-যে সাপের মাথার মণি

তুই কি পারবি তুলে আনতে বোন ?

কাছে গেলে তোর ভাগবাসী রক্তে মাখামাখি হবে

বুকের মধ্যে ভয়ঙ্কর সাপের ছোঁবল বিষ ঢালবে তোকে

দাঙ্গণ কষ্ট সহ্য করতে হবে ।

তুই কি পারবি সব অপমান ছ'হাতে সরিয়ে দিয়ে

ঈশ্বরের বুকের মধ্যে চ'লে যেতে ?

সত্যাসিনী পৌঁচেছিল সে দুর্গম স্বর্গে, উপবাসী

নগ্ন পরাধীন ভারতবর্ষে কোটি সন্তানের

চোখের জলকে মস্ক ক'রে ।

ভগিনী নিবেদিতা স্মরণে : কালীপদ চক্রবর্তী

জন্ম লভি সিদ্ধি পারে, আইরিশ কুমারী

পরিচিত জন ছাড়াই' আদিলে ভারতে,

তাহাকে বরিয়ানি লে কবি আপনারি

গুরুর আদেশে তব, — বিদিত জগতে

তাহা । নবজন্ম যেন লভিলে ধরায়

প্রেমদীপ্ত তপস্যায় ; গৌরবি' অগরে,

নিঃশেষে নিবেদি' নিজে, সঁপি মনঃকায়

অমরতা ল'য়াছ সেবায় আগরে ।

ধর্মের মাহাত্ম্য বটে পুণিতে জীবন ;

রাষ্ট্রনীতি যুক্ত করি' আত্মায় মুক্তিতে,

উদ্বোধিলে নবমন্ত্রে দেশবাসিগণ,

মূর্ত্ত বিবেকাত্মরূপে বিবেক-বাণীতে ।

প্রণাম জানাই তোমা, অগ্নি শু ৬৬রী,

শতবর্ষ পুণ্যপ্রাতে শুদ্ধচিত্তে অরি ।

নিবেদিতা : স্মরণে : শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

তোমার ছবির দিকে তাকালে এখন

কিছুকাল আগের এদেশ মনে পড়ে

ইরন-বতুতা কেউ চালভালতেলের

বুঝি বা হিসেব রেখেছে সেকালের...

কিন্তু সেই মূল্যবোধ মূল্যমান

মানবিকতার দৃষ্টান্তস্বরূপ

তোমার মুখের ছবি বারবার চেয়ে দেখতে হয়...

কারণ এখন আমরা আত্মহননের কাছাকাছি

কারণ এখন আমরা মূল্যমান ইত্যাদি খুব

বড় বড় শব্দ মনে কবি

কারো ভ্রমণপঞ্জীতে এখন কুলোবে না আমাদের

অজীব-তালিকা—

নিবেদিতা, ভগিনী আমার

তোমার সেবার মূল্য

একশো বছরের নাম মনে করে

একশো কুহুমের অবদানে

কতটুকু শোধ করা যায়

তবুও তোমার কথা মনে করলে

মানবিকতার দৃষ্টান্ত একটাও

অস্তিত্ব-এখনো বোঝা যায় ।

নিবেদিতা সংখ্যার জন্ম লিখিত ছুটি মূল্যবান প্রবন্ধ স্থানাভাবে এই সংখ্যায় দেয়া সম্ভব হোল না । এ জন্ম আমরা হুঃখিত । প্রবন্ধ দুটি : শ্রীরমেন্দ্র নারায়ণ সরকার লিখিত “নিবেদিতা ও জাতীয় সরকার” এবং বহু পরিশ্রম করে লিখিত শ্রীবিজয় দেবের “ভগিনী নিবেদিতা গ্রন্থপঞ্জী ।”

জঃ সঃ

আমেরিকার নিগ্রো আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য

বেলা দত্তগুপ্ত

নিগ্রোদাসদের মিজম্ব প্রচেষ্টা

সরকারী ভাবে এবং রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর মধ্যে দাসত্ব দমনের দীর্ঘায়ত, রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের উপরোক্ত কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রোদের দাসত্বমুক্তির আন্দোলনের কথাটিও উল্লেখযোগ্য।

নিগ্রোদাসেরা নীরবে, নিঃশব্দে তাদের দুর্ভাগ্য মেনে নেয়নি। তারা প্রতিবাদ করেছে, আন্দোলন করেছে এবং বিদ্রোহও করেছে। ১৮৩৯ সালে আমিষ্টাড (Amistad) জাহাজে আফ্রিকার এক দলপতির ছেলে স্ত্রীক (Cinqué) এর নেতৃত্বে মেনদি (Mendi) দাসেরা বিদ্রোহ করে। ক্যারিবিয়ান থেকে জাহাজের গতি পরিবর্তন করে তারা আমেরিকার নিউ হ্যাভেন এ এসে পৌঁছয়। দাসপ্রথা গোপে আগ্রহী Abolitionist গোষ্ঠী আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত 'আমিষ্টাড' জাহাজের দাসদের বিষয়টি টেনে নিয়ে যান। বিচারপতি জন কুইনসী অ্যাডমসের এজলাসে বিচার নিষ্পন্ন হয়। তিনি মেনদি ও স্ত্রীকের স্বপক্ষে রায় দেন এবং তারা মুক্ত হয়ে আফ্রিকার ফিরে যায়।

তুসাই লুভেরটুর (Toussaint Lo'uverture) এমনি এক বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। করাসী দাসপ্রভুদের বিরুদ্ধে তুসাই-র এই বিদ্রোহেই হাইতি প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব। ১৭৪১ সালে এক বিদ্রোহের পরিকল্পনার জন্ম নিউ ইয়র্ক শহরে ৩১ জন নিগ্রোদাসকে হত্যা করা হয়। ১৭৭০ সালে ৫ই মার্চ বস্টোন শহরে ক্রিসপাস আটুকস্ (Crispus

Attucks) নামে এক পলাতক নিগ্রো দাস এক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। আমেরিকার ইতিহাসে এই আন্দোলন বস্টোন ম্যাসাকার (Boston Massacre) নামে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আটুকস্ পুরোহিত্যে ছিলেন। প্রথম স্তম্ভিতে তারই পতন হয়। "From that moment we may date the severance of the British Empire"—মন্তব্য করেছেন ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমেরিকার মুক্তি আন্দোলনে স্বৈরাচারের সাথে সাথে ক্রমশঃ এই আটুকস্-এর অবদান এতই অসামান্য যে বস্টোন শহরের সেরা ময়দানে আটুকস্-এর একটি মর্মর মূর্তি সর্গোরবে স্থাপন করা হয়েছে। আটুকস্-এর বিদ্রোহ পরিচালনা সম্বন্ধে জন অ্যাডামস্ অপূর্ব একটি মন্তব্য করেছেন "Not the Battle of Lexington or Bunker Hill, not the surrender of Burgoyne or Cornwallis were more important events in American history than the Battle of King Street (in Boston) on the 5th of March 1770."

১৮০০ সালে ভার্জিনিয়ায় প্রেক্সিয়েল প্রোসার এর নেতৃত্বে সহস্রাধিক দাস সংগঠিত হয় তাদের স্বৈতপ্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্ম প্রোসার ও তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তাঁদের অনেককেই মৃত্যু বরণ করতে হয় সাজা হিসেবে। ১৮২২ সালে চার্লসটন শহরে তেনমার্ক ভেসে ও তার ৩৬ জন নিগ্রো অনুচরকে বিদ্রোহ করার অভিযোগে ফাঁসিকাঠে

খুলতে হয়। ১৮৩১ সালে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল নিগ্রো ছাউটার্নার ও তার মুক্তিসংঘের আন্দোলনের আশঙ্কায় কঁপে ওঠে। শতাধিক নিগ্রো দাসকে হত্যা করা হয় কারণ তারা মুক্তি পেতে চেয়েছিল।

গোপন ও হিংসাত্মক কাজকর্মের মাধ্যমেই নয়, শান্তিপূর্ণ সংঘবদ্ধতার ভিতর দিয়েও নিগ্রোদের মুক্তির আন্দোলন শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর তিন দশকেই। ১৮৩০ সালে ফিলাডেলফিয়ায় সর্ব প্রথম জাতীয় নিগ্রো সম্মেলনের (National Negro Convention) অধিবেশন বসে। সমসাময়িক কালে অন্যান্য পঞ্চাশটি নিগ্রো সংস্থা মুক্তির দাবীতে গড়ে ওঠে। শান্তিপূর্ণ ভাবে নিগ্রো দাসদের সমস্তার সমাধান এই সব সংস্থার লক্ষ্য হলেও, মাঝে মাঝে তাদের ধৈর্য্যচ্যুতি যে ঘটেনি এমন নয়। ১৮৪২ সালের বাকেলো শহরে অনুষ্ঠিত Convention of Coloured Citizen এ হেনরী হাইল্যান্ড গারনেট এমন এক জালাময়ী, হিংসাত্মক বক্তৃতা দেন যে শ্বেতকায় Abolitionist রাও তাক্তব বনে যায়। গারনেট উক্তি করেন।

Brethren, arise, arise! Strike for your lives and liberty. Now is the day and the hour. Let every slave throughout the land do this and the days of slavery are numbered. No oppressed people have secured their liberty without resistance.”

এই সব নিগ্রো Abolitionist রা উইলিয়ম লণ্ডে গ্যারিসন, জেমস বিরনী, ফ্রাঙ্কলিন জ্যাকসন, জন ব্রাউন, জন ফেয়ারফিল্ড প্রভৃতি অনিগ্রো Abolitionist দের সহায়তা পেয়েছে অত্যন্ত উদার ভাবে। “গোপন রেলপথের” সহায়তায় এরাই প্রচুর নিগ্রোদাসকে কানাডায় পাচার করে দেন। মিসিসিপির গভর্নর মন্তব্য করেন যে ১৮১০-১৮৬০ এই পঞ্চাশ বছরে দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য এক লক্ষ দাস

খোয়া গেছে যার বাজারদাম ৪ কোটি ডলারেরও বেশী। কিন্তু দাস প্রথা বিলোপের আন্দোলনটি সমানেই চলতে থাকে। ১৮৪৭ সালে নিউ ইয়র্কেব ট্রয় শহরে নিগ্রো ছাত্ররা সম্মিলিত হয়ে দাবী জানান তাদের ‘সাদা’ স্কুল কলেজে পড়তে দেওয়া হোক। স্কুল desegregation এর আন্দোলনটি, দেখা যাচ্ছে, বহু আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ১৮৪৯ সালে ওহায়ো রাজ্যে State Convention of Coloured Citizens of this অনুষ্ঠিত হয়। নিগ্রোদাসদের শ্বেতপ্রভুর কবল থেকে পালাতে সাহায্য করা এবং নিগ্রোদের শিক্ষার অধিকার সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, “in common with others, for we pay school taxes in the same proportion,” and “Negroes were entitled to all privileges—moral, mental, political and social—to which other men attain.”

লরকারী, বেসরকারী বহুবিধ প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে অবশেষে ১৮৬৫ সালে নিগ্রোদাস প্রথা বিলুপ্ত হয়—এ কথা আমরা আগেই জেনেছি। দাসপ্রথা বিলুপ্ত হল সত্য কিন্তু নিগ্রোদের সমস্তা কমল না বরং বেড়েই গেল। গৃহ-যুদ্ধের পর ১৮৬৫ র আইনে নিগ্রোদাসদের মুক্তির পর সমস্তা দাঁড়ালো তাদের কি ভাবে সমাজজীবনে একীভূত করে নেওয়া যায়। তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের চেহারা কি হবে—ইত্যাদি অসংখ্য সমস্তা দেখা দিল। দক্ষিণাঞ্চলের দাসপ্রভু-তথা শ্বেতাল জনসাধারণ দাসমুক্তিতে মোটেই সন্তুষ্ট হয়নি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিধিনির্দেশ মানতে অত্যন্ত গররাজী হল। ১৮৬৬ সালে ৮ই জুনের বিখ্যাত চতুর্দশ সংশোধনী (Fourteenth Amendment) দ্বারা নাগরিক অধিকারের বৈষম্যমূলক সমস্ত নীতি নাকচ করে দেওয়া হয়। টেনেসি ছাড়া সমস্ত দক্ষিণরাষ্ট্রগুলি এই সংশোধনী প্রস্তাব একবাক্যে অস্বীকার

করে বসল। দক্ষিণাঞ্চলের এই ধরনের অবাধ্যতার যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেস বাধ্য হল নতুন কিছু ব্যবস্থা নিতে। সংগঠন আইন বা Reconstruction Act ১৮৬৭ সালের ২রা মার্চ চালু করা হয়—“it made readmission of representatives from the Southern States to Congress conditional upon each of these states holding a constitutional convention of delegates elected by all citizens without regard to race or colour, except those disfranchised for participation in rebellion.” তৎসঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি Black Code প্রবর্তন করে নিগ্রো সম্বন্ধে আগের মতই হীন ব্যবহার চালিয়ে যেতে থাকলো। কংগ্রেসকে বাধ্য হতে হল যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাতন্ত্রের পঞ্চদশ সংশোধনী প্রস্তাব চালু করতে। ১৮৬৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে এই পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হয়—এতে বলা হল।

“the right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of race, colour, or previous condition of servitude”

তারপর এল The Civil Rights Act of 1870, 1871, 1875; এদের উদ্দেশ্য ছিল একই

“That all persons within the jurisdiction of the United States shall be entitled to the full and equal enjoyment of the accommodations, advantages, facilities, and privileges of inns, public conveyances on land or water, theatres, and other places of public amusement; subject only to the conditions and limitations established by law and applicable

alike to citizens of every race and colour, regardless of any previous condition of servitude.”

কিন্তু কু ক্লাকস ক্ল্যানদের দৌরাত্ম্য ভূমিদাস (peonage) প্রথার পুনপ্রবর্তন, লিঙ্ক, ইত্যাদি মুক্ত নিগ্রোদের সর্বক্ষণ তটস্থ করে রাখল—নাগরিক অধিকারের নিয়ম ও কানুনগুলি লিপিবদ্ধই থাকল, হুঁহু প্রয়োগের অবকাশ পেলো না। নাগরিক অধিকার ও অস্থায়ী জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই দৃঢ়ত্ব হচ্ছিল নিগ্রোদের মধ্যে। বেসরকারী কর্তৃপক্ষের ও সংঘবদ্ধ গুপ্ত ও হামলাবাজীর বিরুদ্ধে তারা জনমত গঠন করে তোলার প্রয়াস করতে লাগলেন এখন থেকে। ১৮৫৫ প্রথম ক্যালিফোর্নিয়া নিগ্রো সম্মেলনে (The First California Negro Convention) এই দাবী স্বনিষ্ঠ হয় যে আত্মরক্ষা, ভোটের প্রকৃত ব্যবহার, (১) নাগরিক অধিকার এবং পূর্ণ স্বাধীনতা নিগ্রোদের অবশ্য প্রাপ্য।

তারপর Convention of Coloured Men of Texas, ১৮৮৩ সালে, এবং পর পর দেখা দেয় Young Men's Progressive Association of New Orleans, ১৮৭৮, ১৮৮৮ সালের Macon Georgia Consultation Convention, ১৮৯০ সালে শিকাগো শহরে National Afro-American League, ১৮৯৭ সালে ওয়াশিংটনে আমেরিকান নিগ্রো অ্যাকাডেমীর স্থাপনা হয়। যদিও এই অ্যাকাডেমীর উদ্দেশ্য ছিল নিগ্রোদের শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু অগ্রিম

(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের তরফ থেকে নিগ্রোদের ভোটের অধিকার বিধিবদ্ধ করা হলেও, নিগ্রোরা তাদের এই অধিকার ব্যবহারের স্বযোগ পেত কম। ভোটের বুথে আসবার সময় তাদের উপর হামলা করা হত কিংবা বুথে জমায়েত নিগ্রো ভোট দাতাদের তাড়িয়ে দেওয়া হত হামলা করে।

ঘটনাবলীতে "the defense of the Negro against vicious assault" এই দিকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। (২) আমেরিকান নিগ্রো অ্যাকাডেমীর অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উইলিয়ম এডওয়ার্ড বুরগার্ট ডুবোয়া। নিগ্রোদের সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৯০৫ সালে আটলান্টা থেকে তিনি এক ব্যক্তিগত আবেদন পাঠালেন অ্যাকাডেমীর উদ্দেশ্যে

"The time seems more than ripe for organized, determined and aggressive action on the part of men who believe in Negro freedom and growth....I wrote you to propose a conference during the coming summer for the following purposes: 1. To oppose firmly the present methods of strangling honest criticism, manipulating public opinion and centralizing political power by means of the improper and corrupt use of money and influence. 2. To organize thoroughly the intelligent and honest Negroes throughout the United States for the purpose of insisting on manhood rights, industrial opportunity and spiritual freedom.

3. To establish and support power organs of news and public opinion.

ডুবোয়ার প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন অনেকেই।

(২) সমসাময়িক কালে Lynolus যুক্ত কয়েকজন শ্বেতাঙ্গের নাম পত্রিকায় প্রকাশ করে দেবার জন্য মেমফিস শহর থেকে বিশিষ্ট মহিলা নিগ্রো সাংবাদিক Ida B. Wellsকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাঁর পত্রিকা অফিসকে ভেঙ্গে চূড়ে তছনছ করে দেয় বিপক্ষপন।

নায়াগ্রা প্রপাতের কানাডার দিকে (কারণ নায়াগ্রা প্রপাতের আমেরিকান দিকের হোটেলগুলিতে নিগ্রোদের প্রবেশ নিষেধ ছিল) অধিবেশন বসল। ২৯ জন বুদ্ধিজীবী, চাকুরীজীবী, বাজক, শিক্ষক, সাংবাদিক মিলে বৈঠক করলেন এবং রূপদান করলেন Niagra Movementএর। একটি সংগ্রামী সংস্থার জন্ম হল। হার্পার্স ফেরী অভিযান খ্যাত Abolitionist নেতা জন ব্রাউনের উদ্দেশ্যে প্রদ্বাঞ্জলি স্তাপন করে ডুবোয়ার কনু্যকর্ষ উদ্ভাস্ত হয়ে উঠল।

"We want full manhood suffrage and we want it now...we want discrimination in public accommodation to cease. We claim the right of freemen to walk, talk and be with them, that wish to be with us...We want the constitution of the country enforced...We want our children educated...And here on the scene of John Brown's martyrdom we reconsecrate ourselves, our honour, our property to the final emancipation of the race which John Brown died to make free. We are men! We will be treated as men. And we shall win.

নায়াগ্রা আন্দোলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন বসে ১৯০৭ সালে বোস্টন শহরে। নিগ্রো ছাড়া বহু শ্বেতাঙ্গও এই আন্দোলনে শরিক হয়ে উঠছিল। সম্মিলিত প্রতিরোধের এক জয়ায়েত হয় ১৯০৯ সালে নিউইয়র্ক শহরে। ইতিমধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে র্যাডক্লিফ কলেজের ছাত্রী মেরী হোয়াইট ওভিংটন নিউইয়র্ক শহরের নিগ্রোদের উপর চার বৎসর ব্যাপী গবেষণা চালান ১৮০৪-১৮০৮। তাঁর গবেষণা **Half a Man** বই হিসেবে প্রকাশিত হয়; মেরী ওভিংটন দেখালেন নিগ্রো সমস্যা শুধু দক্ষিণাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। খাস নিউইয়র্ক শহরেও তার অসামান্য প্রতাপ। ঐ একই সময়

ইলিনয় রাজ্যের স্প্রিংফিল্ড শহরে নিদারুণ নিগ্রো নিধন চলল। জনৈক উইলিয়ম হংলিশ ওয়ালিং লিখিত এই দাঙ্গার রিপোর্ট হাতে সেরী ওভিংটন উইলিয়ম ওয়ালিংকে লেখেন এই ধরনের নরসিং থেকে মুক্তির কোন পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব কি না। ওভিংটন, ওয়ালিং ও হেনরী মস্কোভিচ এই ত্রয়ী মিলে স্থির করেন এতাহাশ লিঙ্কনের জন্ম শতবার্ষিকীতে (১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৯) দেশের উদ্দেশ্যে একটি আবেদন করা হবে। নিউইয়র্ক পোস্ট কাগজের অসওয়াল্ড গ্যারিসন ভিলার্ড (৩) এই আবেদনটি লেখেন—

"The celebration of the centennial of the birth of Abraham Lincoln, widespread and grateful as it may be, will fail to justify itself if it takes no note of and makes no recognition of the coloured men and women for whom the Great Emancipator laboured to assure freedom....If Mr Lincoln could revisit the country in the flesh, he would be disheartened and discouraged. He would learn that on January 1, 1909, Georgia had rounded out a new confederacy by disfranchising the Negro, after the manner of all the other Southern States. He would learn that the Supreme Court of the United States, supposedly a bulwark of American liberties, had refused every opportunity to pass squarely upon this disfranchisement of millions..... In many States Lincoln would see the black men and women, for whose freedom a hundred

(৩) অসওয়াল্ড গ্যারিসন ভিলার্ড উইলিয়ম লয়েড্‌ গ্যারিসনের পৌত্র।

thousand soldiers gave their lives, set apart in trains, in which they pay first-class fares for third-class service, and segregated in railway stations and in places of entertainment; he would observe that State after State declines to do its elementary duty in preparing the Negro through education for the best exercise of citizenship. Added to this, the spread of lawless attacks upon the Negro, North, South and West—even in the Springfield made famous by Lincoln.....could but shock the author of the sentiment that "Government of the people, by the people, for the people, should not perish from the earth."

Silence under these conditions means tacit approval...Hence we call upon all the believers in democracy to join in National Conference for the discussion of present evils, the voicing of protests and the renewal of the struggle for civil and political liberty."

বিশিষ্ট পদস্থ পুরুষ ও মহিলা এই আবেদনে স্বাক্ষর করেন। আবেদনে সাড়া দিয়ে National Negro Committeeর উদ্ভব হয়। এই National Negro Committeeই ১৯১০ সালের মে মাসে পরিচিত হল N A A C P or National Association for the Advancement of Coloured People নামে। নতুন উচ্চমে NAACP নিগ্রোদের উপর খেতাব দুঃশাসনের কাহিনী নিবিড় ভাবে প্রচার করতে আরম্ভ করল। জন্মের কয়েকমাসের মধ্যে NAACP উইলিয়ম ডুবোয়ার সম্পাদনায়

তার মুখপাত্র **The Crisis** প্রকাশ করে। গোড়া থেকেই NAACP এক আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাব গ্রহণ করে। ১৮৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রীয় অগ্রীম কোর্ট প্লেসী বনাম ফার্ডিনান্দ মামলার রায় দেয় **Separate but Equal** এবং এরই ফলে Jim Crow বা স্বতন্ত্রী করণ ব্যবস্থা কয়েকটি হয়ে ওঠে। ‘নিগ্রোজাতির কর্মবীর’ বুকার টি ওয়াশিংটন নিগ্রোদের স্বপক্ষে লড়েছেন কিন্তু তিনিও **Separate but Equal** নীতিই পরোক্ষভাবে মেনে নিয়েছিলেন। টুসকিজী বিদ্যালয় (Tuskegee Institute) স্থাপন করে ওয়াশিংটন নিগ্রোদের জন্ম বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা (হাতের কাজ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা) অহুমোদন করেন। নিগ্রোদের স্বতন্ত্রীকরণ মেনে নিতেও উৎসাহ দেন। এই আপোষপন্থী মনোভাবের জন্ম ডুবোয়ার সঙ্গে বুকার ওয়াশিংটনের বিরোধ ছিল অনমনীয়। ডুবোয়া “Talented tenth” এ বিশ্বাসী ছিলেন বলেই নিগ্রোদের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বতন্ত্রীকরণ মেনে নিতে পারেন নি।

ডুবোয়া বুকার টি ওয়াশিংটনের “In all things purely social, we can be as separate as the fingers, yet one as the hand in all things essential to mutual progress” এই নীতি মেনে নিতে পারেন নি। ডুবোয়া দেখিয়ে দিলেন যে ওয়াশিংটনের এই accommodative নীতি সত্ত্বেও নিগ্রোদের ভাগ্য বিস্ময়কর পরিবর্তিত হয়নি। কিংবা ষেভাঙ্গদের বিভেদ নীতি একচুল শিথিল হয়নি। The Souls of Black Folks ডুবোয়া বুকার ওয়াশিংটনের “Thrift, Patience, Industrial Training for the masses” নীতির প্রশংসা করছেন সন্দেহ নাই কিন্তু সাথে সাথে ওয়াশিংটনের “Appolozing for injustice North and South,” “rightly value the privilege and duty of voting” অক্ষমতার নিন্দাও করেছেন প্রচুর। NAACPর মাধ্যমে ডুবোয়া নিগ্রোদের সম্বন্ধে সমস্ত রকম বৈষম্যমূলক

ব্যবস্থা অবসান ঘটাতে চেষ্টা করলেন। “Through litigation, legislation and education” নিগ্রোদের ভাগ্য পরিবর্তন করাই ছিল NAACPর মূল লক্ষ্য। ১৯৫৪ সালে NAACP আমেরিকার অগ্রীম কোর্টে ব্রাউন বনাম বোর্ড অব এডুকেশনের মামলাটিতে অংশ গ্রহণ করেন। এই মামলার প্লেসী বনাম ফার্ডিনান্দ মামলার রায়টি একেবারে উল্টে দেওয়া হল। অর্থাৎ প্লেসীর মামলার রায়ের বিভেদ প্রথা কায়েম হচ্ছিল, ব্রাউনের মামলায় সেই বিভেদ প্রথা রদ করা হল। NAACP আরও বিভিন্নভাবে নিগ্রোদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। নিগ্রো ছাত্রদের সাহায্য করা এবং প্রয়োজনে তাদের জন্ম বিচক্ষণ আইনজ্ঞের ব্যবস্থা করা, এসবই NAACPর বর্তমান কার্য তালিকার অন্তর্গত এবং এইভাবে তারা তাদের নাগরিক অধিকারের জন্ম লড়ে যাচ্ছে।

তৎসত্ত্বেও NAACP নিগ্রো জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে পারেনি। নিগ্রো মধ্যবিত্তের একটি সংস্থাই রয়ে গেছে। তাছাড়া, রাজনৈতিক সমস্তা ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে যে অসংখ্য সামাজিক সমস্তা আছে নিগ্রোদের, NAACP সে সম্বন্ধে কোন পথ দেখাতে পারে নি। NAACPর সহযোগী আর একটি সংস্থা তাই অবশ্যস্বাভাবী হিসেবে গড়ে ওঠে। এই সংস্থাটি URBAN LEAGUE.

URBAN LEAGUE নিগ্রোদের অসাধারণ চলিফুতার (mobility) ফলশ্রুতি। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত আমেরিকার নিগ্রো জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ দক্ষিণাঞ্চলে বাস করতো ১৯৪০ সালে দেখা যায় সমগ্র নিগ্রো জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগ বাস করছে উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে। বর্তমানে ফিলাডেলফিয়ার ৫ লক্ষ নিগ্রো আছে। নিউইয়র্ক জনসংখ্যার শতকরা ১৪ ভাগ, শিকাগোর শতকরা ২৩ ভাগ ও ওয়াশিংটনে শতকরা ৫১

ভাগ নিগ্রো অধিবাসী। এই ক্রমবর্ধমান শহরবাসী নিগ্রোদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্তার দিকে দৃষ্টি দিতেই URBAN LEAGUE এর জন্ম। নিগ্রোরা ঘাতে কাজ পায়, বাড়ী করার জমি পায়, খেতান পত্রিতে বাস করার অধিকার থাকে URBAN LEAGUE এর দৃষ্টি সেই দিকে। সাধারণ ভাবে প্রতিবাদভিত্তিক নয় এই লংহা এবং NAACPর মতো নিগ্রোদের হয়ে আদালতে লড়াই চালায়না। তথাপি সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে URBAN LEAGUE অযোগ্য সুমিকাই নিয়েছে। URBAN LEAGUE এর কর্তার ডক্টর হাইটনি ইয়ং তাঁর অযোগ্য সমাজসেবীদের মাধ্যমে নিগ্রোদের "better housing, better jobs, better schools and better family life" পেতে সাহায্য করেন। তাঁর কার্যপ্রণালী নয়, তিনি আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই কাজ করেন। URBAN LEAGUE ও NAACPর কার্যক্রমের একটি ভুলনামূলক মন্তব্য রেখেছেন Kenneth B. Clark—The Urban League's primary emphasis was placed upon the economic, industrial and social service clusters of power, while the NAACP's primary interest was in political and legal power with a major emphasis upon propaganda which sought to reach the conscience of the American people, both white and Negro. The League's appeal was to self-interest, employ Negroes, or you will spawn a large number of dependent people. The NAACP's appeal was to public and judicial conscience, their argument was that America is intended to be a democratic nation with justice for all."

১৯৫৪ সালের ব্রাউন বনাম বোর্ড অব এডুকেশনের

সুপ্রীম কোর্টর রায় বিভেদীকরণের বিপক্ষে হলেও দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলি সমস্ত অমুশাগন লঙ্ঘন করে তাদের Jim Crow নীতি চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৫৫ সালের একটি ঘটনায় আন্দোলনের রূপ বদল হল বিশেষভাবে। ১লা ডিসেম্বর ১৯৫৫ সাল, রোজা পার্কস মন্টগোমারী শহরের মেলার কাজ শেষে বাড়ী ফিরছে। বাস থামিয়ে বাসে উঠলো, বাসে স্বতন্ত্র বসার ব্যবস্থাটি ঠিক ঠিক মেনে এমন সিটে বসলো যার আগের সিটেই শেভালদের জন্ত সংরক্ষিত অর্থাৎ নিগ্রোদের জন্ত যে কয়টি সিট আছে তার প্রথম সিটেই রোজা বসল। এতটুকু ব্যতিক্রম করল না নির্দিষ্ট নিয়মের। কিছুক্ষণের মধ্যে বাস কণ্ডাক্টর হুকুম করলো রোজাকে যে ঐ সিটে বসা চলবে না, একদম শেষের সিটে বসতে হবে কারণ কয়েকজন খেতানবাজী দাঁড়িয়ে আছে। রোজা কণ্ডাক্টরের হুকুম অমান্য করলো কারণ সে নিগ্রোদের জন্ত সংরক্ষিত সিটেই বসেছিল। কিন্তু তৎসঙ্গেও শান্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে রোজা পার্কসকে গ্রেফতার করা হল "uppity Negro" বলে।

রোজা পার্কস এর ব্যাপারে মার্টিন লুথার কিং এর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হল মন্টগোমারীতে। নিগ্রো বাজীদের প্রতি বৈষম্যবিহীন আচরণ ও নিগ্রো বাস কণ্ডাক্টর নিয়োগের দাবীতে মার্টিন লুথার কিং বাস কোম্পানীকে এক আবেদন করলেন। বাস কোম্পানী সে আবেদন অগ্রাহ্য করল। তখন মন্টগোমারীর নিগ্রো অধিবাসীরা স্থির করলেন সর্বোত্তমভাবে Jim Crow বাস বয়কট করা। মাইলের পর মাইল তাঁরা হেঁটেছেন কিন্তু বাসে চড়েন নি। মন্টগোমারীর এই বৈষম্যব্যবস্থা নিয়ে NAACP আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টে মামলা করে। ১৯৫৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর সুপ্রীম কোর্টের রায় প্রকাশিত হয় যে জনসাধারণের জন্ত যানবাহনে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আইন বিরোধী। মন্টগোমারীতে এই 'direct

action' নীতি সফল হওয়ার এই নীতি উত্তরাঞ্চলেও প্রসার লাভ করে। এই অহিংস, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রধান হোতা ছিলেন মার্টিন লুথার কিং। মহাত্মা গান্ধীর দর্শনের সম্পর্কে এসে তাঁর এই অহিংস নীতি সম্বন্ধে আস্থা জন্মে। King বলেন "Non violent direct action seeks to create such a crisis and establish such creative tension that a community that has consistently refused to negotiate is forced to confront the issue. It seeks so to dramatize the issue that it can no longer be ignored,

Martin Luther King এর অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতিতে আরও বিভিন্ন সংস্থা গড়ে ওঠে। ১৯৫৭ সালে, মন্টগোমারীর ঘটনার পর, Southern Christian Leadership Conference (SCLC)র জন্ম। "The basic tenets of the Hibaic-Christian concept of Satyagraha" বা অহিংস সংগ্রামের ভিতর দিয়েই SCLC তার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। হারী বেলকম্পট, মারিয়ান অ্যাণ্ডারসন, মাহালিয়া অ্যাকসন এর মত বিশ্ববিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী SCLCকে অর্থ ও সহায়ত্ব দিতে ঘিরে রেখেছে।

SCLCর মত SNCC (The Students Non violent Coordinating Committee) বা "Snick" (ছাতা) আর একটি প্রতিষ্ঠান যা কিনা অহিংস নীতির মাধ্যমে সমস্ত বিভেদনীতি দূর করতে বদ্ধপরিকর। ছাত্রদের এই সংস্থার জন্ম ১৯৬০ সালে। এবং "Sit-in" (৪) পদ্ধতির মাধ্যমে তারা segregation এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে সফল হয়েছে। ছাত্রদের এই "sit-in" আন্দোলনের জন্ম ১লা ফেব্রুয়ারী,

(৪) "Sit in" এর ব্যাপারটি এই প্রথম নয়। ১৮৭৫ সালে "নিউইয়র্ক সিটি মেট্রোপলিটান অপেরা হাউস"এ এক নিগ্রো একাই সারারাত sit in পালন করে। তবে ছাত্রদের মধ্যে sit in এই প্রথম।

১৯৬০ সালে, কারোলাইনার গ্রীনসবরো শহরে। স্থানীয় একটি দোকানের চায়ের কাউন্টার প্রতিযোগ করতে অধীকার করে চারটি ছাত্র। এদের সমর্থন করে অচিরে জনমতি গড়ে ওঠে। চার্চ ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলি সমর্থন জানায়। উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের ছাত্ররা সহায়ত্ব দিতে "Sit-in" চালিয়ে যায়। ফলে, এক বছরের মধ্যেই একশ শহরে স্বতন্ত্র প্রথা দূর হয়। Sit-in পালন করে হাজার হাজার ছাত্র জেলে গেছে বেক্সার, জামিন নিতে পর্যন্ত অধীকার করেছে তারা। ১৯৬৪ সনে SNICK তার Mississippi Summer Project এর ব্যবস্থা করে। ৫০০ বেক্সাসেবক নিয়ে (তার মধ্যে ১৫০ জন ছিল আইনজীবী ও আইনের ছাত্র) Freedom School চালায় ও নিগ্রো ভোটদাতাদের পঞ্জীভুক্ত করে (Registration Campaign) দক্ষিণ জর্জিয়া, পূর্ব আরকানস এবং অলাবামাতে ধোলা হয়।

CORE বা Congress for Racial Equality অহিংস কর্মপন্থার আরেকটি প্রতিষ্ঠান। CORE এর বিখ্যাত তাদের কর্মপন্থা গান্ধীজির অহিংস কর্মপন্থার মার্কিন ভাষায় (adapted to American race relations)। শিকাগো শহরে ছোট্ট একটি প্রতিষ্ঠান CORE ১৯৪২ সালে এক জাতীয় সংস্থার পরিণত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক। নিগ্রো বৈষম্য দূরীকরণে CORE এর সর্বাঙ্গিক উল্লেখযোগ্য অবদান হল ১৯৬১ সালের FREEDOM RIDES। এই মুক্তিযাত্রার মাধ্যমে CORE পরীক্ষা করতে চেয়েছিল যে সার্বজনীন বিশ্রামাগারে, (waiting room) আন্তঃরাজ্য পরিবহন বাসের রেষারেষি বিভেদনীতি কিভাবে দূর করা যায়। প্রথম Freedom Ride ১৯৬১ সালের ২৮শে এপ্রিল আরম্ভ হয় দক্ষিণের অভিমুখে। ভার্জিনিয়া, কারোলাইনা জর্জিয়া, অলাবামা, মিসিসিপি'র ভিতর দিয়ে নিউ অরলিয়নসে পৌছো এবং সেখানে CORE এর একটি সভা করা এই ছিল নির্ধারিত

স্বাবস্থা (Programme)। সাতজন নিগ্রো ও ছয় জন শ্বেতাঙ্গের এক সম্মিলিত দল Freedom Ride আরম্ভ করে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির কাছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের Protection চাওয়া হয়েছিল আগে থেকেই। অ্যালাবামায় পৌঁছতেই তুমুল কাণ্ড ঘটল। ক্রুদ্ধ জনতা আক্রমণ করে বসল এই দলকে। বাসটা পুড়িয়ে দেওয়া হল। Freedom Ride এর দল কমার্শিয়াল এয়ার লাইনস্ এর মাধ্যমে নিউ অরলিয়ানসে পৌঁছলেন। Freedom Rider দের প্রতি এই বর্বরোচিত আক্রমণের নিন্দায় সমস্ত সংস্থা মুগ্ধ হয়ে উঠল এবং সংঘবদ্ধ হল এই বিভেদ ও স্বতন্ত্রব্যবস্থার এক চরম নিষ্পত্তি করতে। CORE, SNCC, SCLC ও ছাশভিল ছাত্রসংস্থা যুক্ত হয়ে খাড়া করল 'Freedom Riders' Coordinating Committee এক হাজারের ওপর Freedom Ride তারা দক্ষিণাঞ্চলে পাঠিয়ে দিল। অ্যালাবামার ও মিসিসিপিতে প্রচুর সংঘর্ষ হয়। কিন্তু Freedom Rides আন্দোলনের এই সংগ্রামী রূপ দেখে আন্তঃরাজ্য পরিবহন তাদের সব স্বতন্ত্র ও বিভেদ নীতি তুলে নিয়েছে।

এই সব সংস্থা ছাড়াও অ্যালাবানী আন্দোলন (১৯৬১) বার্মিংহাম আন্দোলন, (১৯৬৩) ওয়াশিংটন আন্দোলন (১৯৬৩) নানা ভাবে নিগ্রোদের সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক অবস্থার অবগান করতে চেয়েছে। এর ভিতর ওয়াশিংটন আন্দোলনটিই বর্তমান কালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৬৩ সালের ২৮শে আগষ্ট আড়াই লক্ষের এক জনতা ওয়াশিংটনে লিঙ্কন স্মারক স্তম্ভের কাছে জমায়েত হতে থাকে। এই জনতার শ্বেতাঙ্গ, অশ্বেতাঙ্গ, ইহুদি, প্রোটেষ্ট্যান্ট, রোমানক্যাথলিক সবাই যোগ দিয়েছিল। বেকারী, পুলিশি অত্যাচার, চাকুরী নির্যোগে বৈষম্য প্রভৃতি বিভেদপন্থী নাগরিক অস্ববিধার বিরুদ্ধেই ছিল এই সম্মিলিত প্রতিবাদ। ফেলপ্‌স্ টোকম্ ফাউন্ডেশনের আহুকূলে প্রকাশিত 'দি আমেরিকান নিগ্রো রেকর্ডেঞ্চ

বুক'-এ এরিক লিনকন মন্তব্য করেছেন 'It was also a demonstration in favour of passage of President Kennedy's Civil Rights Bill then before the Congress,

এমনভাবে ধীরে ধীরে নিগ্রো প্রতিবাদের ও অধিকার অর্জনের আন্দোলন গড়ে উঠেছে আদর্শবাহী, অনমনীয় মানুষ্যের প্রচেষ্টায়। এদের মধ্যে কেউ শালা, কেউ কালো। বৈষম্য বিভেদ দূর করাই ছিল এতদিন পর্যন্ত নিগ্রো আন্দোলনের রীতি ও প্রকৃতি। কিন্তু বর্তমানে নতুন একটি ধারার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। 'কালো মুগ্ধমান' নামে এক দল গড়ে উঠেছে, 'আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যারা শ্বেতাঙ্গদের থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ পৃথক করে নিতে চাইছে। এলিজা মুহম্মদ এই আন্দোলনের বর্তমান নায়ক। ১৯৬০ সালে ডেট্রইট শহরে এই আন্দোলনের স্ফূর্তিতে করে মক্কা থেকে আগত জনৈক ওয়ালী ফারাদ। শ্বেতাঙ্গ সঙ্গে সমস্ত রকম সংশ্লব বর্জন করা এদের নীতি। "United front of Black Men" তৈরী করা এলিজা মুহম্মদের মূল লক্ষ্য এখন।

"Right of maximum retaliation against white racists." এই নীতিতে বিশ্বাসী একদা এলিজা মুহম্মদের সহকর্মী ম্যালকম একস্ আর একটি 'কালো' প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে—Organization of Afro-American Unity। ১৯৬৫ তে ম্যালকম নিহত হয় কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি তার 'anti-integrations with the white's' নীতিতে এগিয়ে চলেছে।

নিগ্রো রাজনীতিতে এখন, দেখা যাচ্ছে, অনেক ধারা উপধারার সৃষ্টি হয়েছে। শাসনতন্ত্রগতভাবে নানারকম আইন পাশ হলেও এবং বিভিন্ন দরদী প্রতিষ্ঠান জীবন পদ করে নিগ্রোদের সম্বন্ধে বৈষম্য দূর করবার চেষ্টা করলেও—অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য রয়ে গেছে স্বেচ্ছা পরিমাণে।

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত আরব্যান লীগের একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকার নিগ্রোদের গড় আয় শুধু যে খেতানদের থেকে কম তাই নয়, ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে এই দুই গোষ্ঠীর, গড় আয়ের বৈষম্য আরও বেড়েছে। বর্ণবৈষম্য বিরোধী আইন চালু হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪০ সালের পরবর্তী দুই দশকে আমেরিকার গৃহ সংস্থান ব্যাপারে বৈষম্য কমেনি, বেড়েছে। বেকারীর হার খেতানদের মধ্যে শতকরা ৪.৬, নিগ্রোদের মধ্যে ৯.৮। প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী পিছু ডাক্তারের সংখ্যা খেতানদের মধ্যে ১৫৭ আর নিগ্রোদের মধ্যে ২৭। (৬) হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর জাভান হৈয়ার এর লেখা স্টেটসম্যানে (২রা আগষ্ট ১৯৬৭) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধেও দেখতে পাই "The most recent census, in 1960, showed, virtually no gains, collectively, for black people in income, occupational advancement, or residential and educational desegregation. Negro family income is barely more than half that of whites, just as it was over half a century ago."

এক্ষেত্রে নিগ্রোদের অসহায়তা বোধ, হতাশা, ক্ষোভ যে তাদের স্বসংস্কার পথে নিয়ে যাবে এ-আর বিচিত্র কি! মার্টিন লুথার কিং এর আন্দোলনকে তারা মৃদু (soft) বলবে তাতেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই।

Tired, sick and tired

Tired of being sick and tired.

Lost, Lost in

Wildness of White America-র নিগ্রোদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই তাই চলছে, চলবে। বহু শাখা নদী

উপনদীতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কবে যে সে স্রোত মানুষের যোহনার মিশবে তার জবাব শুধু নিরবধি কালের হাতেই।

(৬) যুক্তরাষ্ট্রে বেকার সমীক্ষা / খেতান কৃষক

বৎসর	কৃষক শতকরা	খেতান শতকরা	কৃষক খেতান অনুপাত
১৯৬৫	৮.০	৪.১	২.০
১৯৬৪	৯.৮	৪.৬	২.১
১৯৬৩	১০.১	৫.১	২.১
১৯৬২	১১.০	৪.৯	২.২
১৯৬১	১২.৬	৬.০	২.১
১৯৬০	১০.২	৫.০	২.০

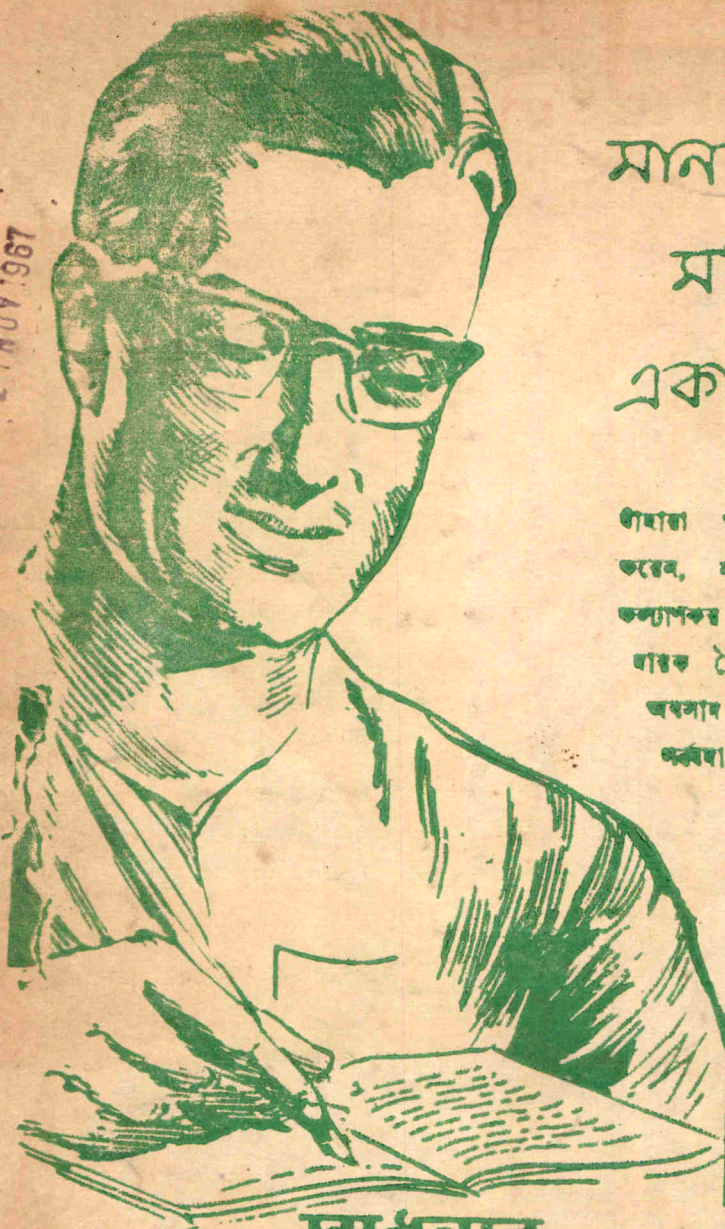
উৎস:—দি মিগ্রোস ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস; দেয়ার ইকোনমিক অ্যান্ড সোসিয়াল সিচুয়েশন

ইউ. এস. ডিপার্টমেন্ট অব লেবার

বুলেটিং নং ১৫১১, জুন ১৯৬৬

এই সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে কৃষকদের মধ্যে বেকারী খেতান থেকে দ্বিগুণ। ১৯৬১ সনে NAAOP র বার্ষিক অধিবেশনে হার্ট হিল Racism within Organised Labour, এই Report পেশ করে দেখান যে নানাভাবে কৃষকদের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ থাকায় তাদের বেকারী ক্ষমবর্দ্ধমান। এবং ১৯৬২ সনের ১৫ই নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট কেনেডি আহ্বত হোয়াইট হাউস এর বিখ্যাত অদীকার "to eliminate discriminations and unfair practices wherever they exist" সত্ত্বেও কৃষকদের চাকুরী সম্বন্ধে নিশ্চয়তা এখনও যথেষ্ট কম।

21 NOV 1967



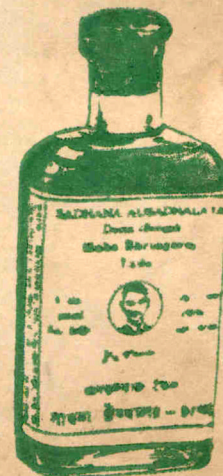
মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

গীহারা আত্যথিক মানসিক পরিশ্রম
করেন, মহাভুজরাজ গীহাদের পরম
তল্যাপকর। এই সিদ্ধকর ও আত্ম-
যাতক তৈল সর্বপ্রকার ক্লান্তি ও
অবসাদ দূর করে, মেহ ও মনকে
পর্যাবা প্রকৃত ও কষ্টকর রাখে

সাধনার মহা ভুজরাজ তৈল



সাহসনা উষ্মালক-ভাঙ্গা
সাহসনা উষ্মালক বোটে তলিকাতা-৪৮



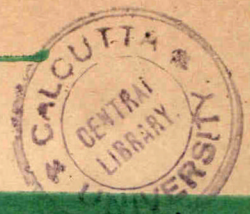
তলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এল. (ওসি.) আত্মজ্ঞানার্থ

অধ্যাপক প্রিয়োৎপলেন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আত্মজ্ঞানার্থী, এফ. সি. এল. (ওসি.) এম. বি. এল. (অধ্যাপক)
আত্মজ্ঞানার্থী, এফ. সি. এল. (ওসি.) এম. বি. এল. (অধ্যাপক)

ଉତ୍କଳସାହିତ୍ୟ

୨୭୭୪

ମହାଦଳ୍ଲି : ଲିଳା ବାୟ



সূচীপত্র

জয়ন্তী অগ্রহায়ণ ১৩৭৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৫২৯
ভগিনী নিবেদিতা (কবিতা)	গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	৫৩৫
মহীয়সী নিবেদিতা (কবিতা)		
	শান্তশীল দাস	৫২৫
স্বভাষচন্দ্র (প্রবন্ধ)	পবিত্রকুমার ঘোষ	৫৩৭
ভাষা-সমস্যা (প্রবন্ধ)	ডাঃ অশোককুমার মল্লমদার	৫৪৩
পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক সংকট		
(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক অরিন্দম সেন	৫৪৮
নিবেদিতা ও জাতীয় শিক্ষা		
(প্রবন্ধ)	রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার	৫৫১
কণ্ঠ ভরা বিষ (ধারাবাহিক উপভাস)		
	মিহির মুখোপাধ্যায়	৫৫৯
জল মাটি মন (ধারাবাহিক উপভাস)		
	মহীতোষ বিশ্বাস	৫৬৭
ভগিনী নিবেদিতা গ্রন্থপঞ্জী		
	বিজয় দেব	৫৭৯
বিধাবর্ত		৫৮৮

জয়ন্তী

পৌষ ১৩৭৪

নেতা জী সংখ্যা

প্রতিবারের মত এবারেও জয়ন্তীর এই সংখ্যা
তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবে।
'নেতাজীর অন্তর্ধান প্রসঙ্গে' একটি
অপ্রকাশিত দঙ্গিল ও কিছু
অপ্রকাশিত রচনা পাওয়ার
সম্ভাবনা আছে।

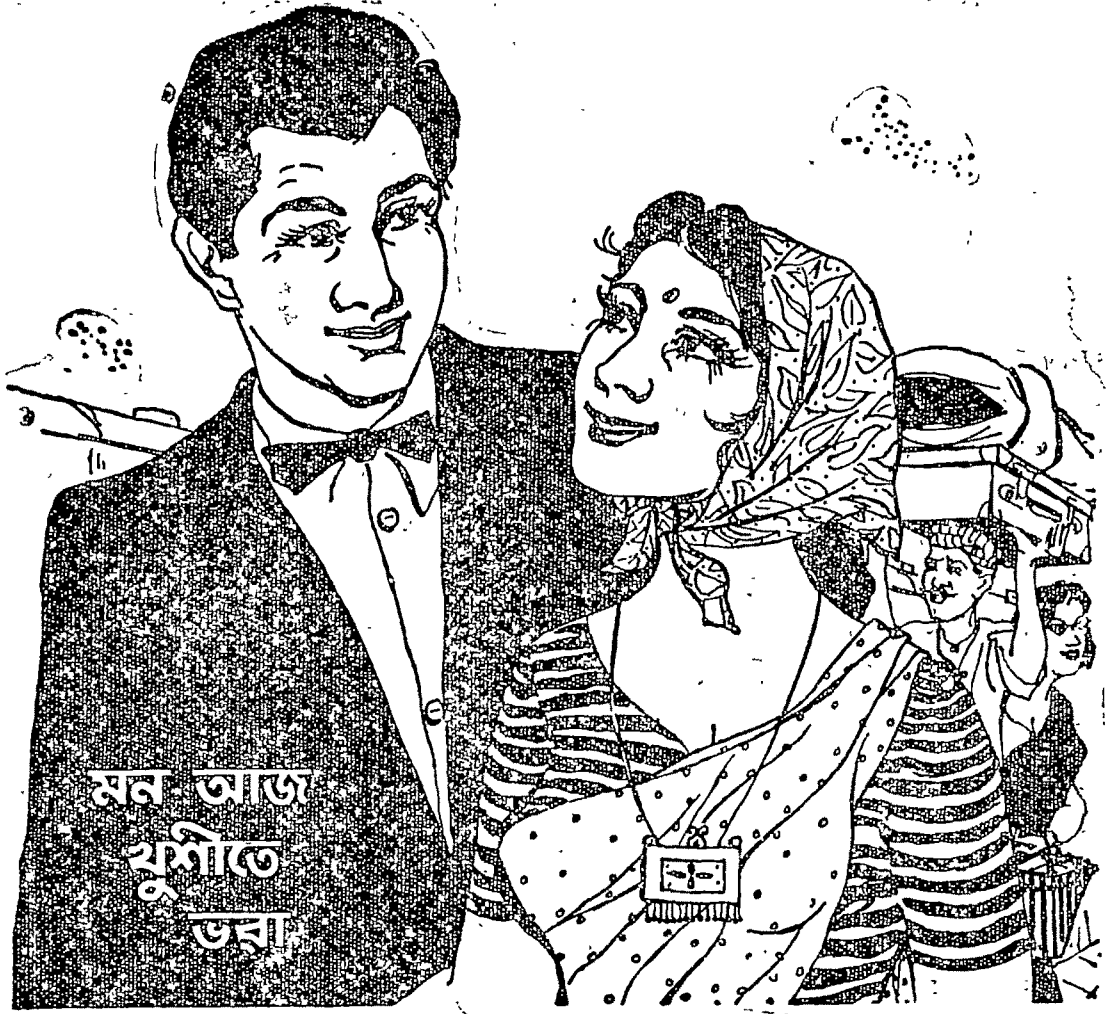
এই সংখ্যায় লিখছেন: কালীচরণ ঘোষ,
সমর শুক, ডাঃ অশোক কুমার মল্লমদার,
শঙ্করী প্রসাদ বসু, পবিত্রকুমার ঘোষ, দেবদাস
জোয়ারদার ও আরো অনেকে।

দাম

প্রতি সংখ্যা ১.০০ মডাক ১.৬৫

প্রাপ্তিস্থান: জয়ন্তী

৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান, কলিকাতা-৪৭



মন আজ
খুসীতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার
অব্যর্থ মহোদয় প্রতিদিন আহারের পর
দুইবার করে দু'চামচ গুস্তাসঞ্জীবনী সঙ্গে
চার চামচ মহাজোকারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আরুর্কেশাস্ত্রী, এক,সি,এস, (লণ্ডন),
এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের কৃতপূর্ব
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি, বি-এস, আরুর্কেশাস্ত্রী।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

ডায়েরী

৩২ বর্ষ • অষ্টম সংখ্যা • অগ্রহায়ণ ১৩৭৪

সম্পাদকীয়

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বিতাড়ন

গত ২১ শে নভেম্বর পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করে দিয়ে কংগ্রেস সমর্থিত ১৭-জন সদস্য-বিশিষ্ট প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলের মন্ত্রীসভার পতন করেছেন। গত ৩রা নভেম্বর ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র বোষের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ এবং আরও যোগজন যুক্তফ্রন্ট সমর্থক বিধানসভার সদস্যদের যুক্তফ্রন্ট থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করার পর যত শীঘ্র সম্ভব বিধান সভায় যুক্তফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারণের জন্ত রাজ্যপালের প্রস্তাবের উত্তরে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ১৮ই ডিসেম্বর বিধান সভা আহ্বান করে শক্তিপরিীকার দিন ধার্য করেছিলেন। এই দিনটি আরও স্থগিত করবার জন্ত রাজ্যপালের প্রস্তাব বার দুই যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে মেনে নিতে অক্ষমতা প্রকাশ করবার পর রাজ্যপাল নিজ বিবেচনায় যুক্তফ্রন্টকে সংখ্যালঘিষ্ঠ ধার্য করে বরখাস্ত করবার একটি মারাত্মক অগণতান্ত্রিক নজীর স্থাপিত করেছেন। কোনো মন্ত্রীসভা বিধান সভায় সংখ্যালঘু কিম্বা সংখ্যাগুরু এই বিচারের তার বিধান সভার বাইরে যদি রাজ্যপালের ক্ষমতার মধ্যেও নিহিত থাকে সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল আইন সভার উর্ধে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে জনসাধারণের

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভাঙা-গড়ার সর্বময় কর্তা হয়ে উঠবেন কিনা পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বিতাড়নের মধ্য দিয়ে এই সংবিধানগত সঙ্কটও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সংবিধানে রাজ্যপালের নিজ বিচার (discretion) প্রয়োগের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু তার পরিধি কতটা বিস্তৃত সেই সমস্যাই আজ দেখা দিয়েছে রাজ্যপালের এই আচরণের মধ্য দিয়ে।

অপরপক্ষে এই সঙ্কটস্থিতিতে যুক্তফ্রন্টের দায়িত্ব কতটা সে-প্রশ্নও বিচার্যপক্ষে। গত ৩রা ডিসেম্বর ১৭ জন সদস্যের যুক্তফ্রন্ট থেকে সমর্থন অপসারণের পরই যুক্তফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে যত শীঘ্র সম্ভব আইন সভা ডেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই করে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করবার গণতান্ত্রিক দায়িত্ব ছিল। কালহরণ করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা সে দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছা দেখিয়ে রাজ্যপালের মারাত্মক অগণতান্ত্রিক আচরণের স্বযোগ দিয়েছেন। পশ্চিম বঙ্গে রাজ্যপালের অগণতান্ত্রিক আচরণের ফলে যে সঙ্কট স্থাপিত হয়েছে যুক্তফ্রন্ট তা থেকে দায়িত্ব মুক্ত নন।

এই ঘটনা পরম্পরায় ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র বোষের রাজনৈতিক

আচরণও তীব্রভাবে নিন্দনীয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের খাঞ্চ-মস্ত্রীক্লেপে ডঃ ঘোষ ক্যাবিনেটের ভেতরে এবং বাইরে যুক্তফ্রন্টের কোনো কোনো শরীকদের অস্ত্রায় ও অশোভন সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার অব্যবহিত পর থেকেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। সেই কারণে ডঃ ঘোষের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের সঙ্গত কারণও ছিল। অনেক আগেই তাঁর পদত্যাগ প্রত্যাশিত ছিল এবং তিনি যদি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় থাকাকালীন তিনি কি ভাবে ঐ সরকারের কোনো কোনো শরীকদের কটু, অরৌজিক ও অশোভন সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিভাবে মন্ত্রীসভার যৌথদায়িত্ব লাভিত হয়ে মন্ত্রীসভার কাজ কোনো কোনো দল খ্রায় অচল করে দিয়েছিলেন—দেশবাসীর নিকট সেই তথ্যপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে পদত্যাগ করতেন তাহোলে কর্তব্যনিষ্ঠার দোরবেল আসন তাঁর জন্ত নিশ্চিত থাকতো। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বেই যে ভাবে তিনি অপর দলের সদস্যদের দলত্যাগে উৎসাহিত করেছেন, যে-ভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে পদত্যাগের পূর্বেই গোপন পরামর্শ করে এবং তাদের সহযোগিতায় মুখ্যমন্ত্রীদের পদে আসীন হবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে হতমান কংগ্রেসকে—যে কংগ্রেস গত বিশ বছর যাবৎ দেশের সর্বনাশ সাধন করেছে—আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনবার বাহনরূপে চিহ্নিত হয়েছেন, তাতে তিনি শুধু রাজনৈতিক অদূরদর্শিতারই পরিচয় দেন নাই, প্রতিক্রিয়াশীলদের পুনরাগমনের সিংহদ্বারই খুলে দেন নাই, দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তাবিরোধীদের বিকল্প শক্তি সঞ্চারের সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে এই দুই শক্তির বৈপরীত্যের সুযোগ করে দিয়েছেন।

সর্বোপরি পুলিশের লাঠি-গুলির নির্বিচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে গণতন্ত্রের বিপদও স্বাধীকৃত করে এনেছেন ডঃ ঘোষ যার ফলশ্রুতি জাতীয়তাবিরোধী ও

প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অবশ্যস্বার্থী শক্তিবৃদ্ধি এবং গণতন্ত্রের দ্রুত পশ্চাদপসরণ।

সাংবিধানিক সংকট

গত ২৯ শে নভেম্বর বিধান সভার স্পীকার অনির্দিষ্টকালের জন্য সভা মূলতবী ঘোষণা করার ফলে এক অভূতপূর্ব সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সভায় প্রবেশ করেই স্পীকার একটি বিবৃতি পাঠ করে বলেন যে যেহেতু ঘোষ-মন্ত্রীসভা অবৈধভাবে গঠিত হয়েছে এবং যেহেতু এই অবৈধ মন্ত্রীসভার পরামর্শে রাজ্যপাল বিধান সভা আহ্বান করেছেন সে-হেতু এই আহ্বান অবৈধ; সুতরাং বিধান সভার কাজ চালানো যেতে পারে না। স্পীকারের এই ঘোষণা আপাত-বিচারের সিদ্ধান্ত; স্থায়ী সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে দেবার ইচ্ছাও স্পীকার সভা মূলতবী করার পূর্বে ঘোষণা করেন।

স্পীকারের স্থায়ী সিদ্ধান্ত দেবার আর অবকাশ হোলোনা কারণ মূলতবী সভাকে রাজ্যপাল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিয়েছেন। বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাইয়ের যে উদ্দেশ্য নিয়ে সভা আহত হয়েছিল স্পীকারের সিদ্ধান্তে তা ব্যর্থ হয়ে গেল। এটা অবশিষ্ট প্রমাণিত হয়ে গেছে যে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবং কংগ্রেস দলের যৌথ শক্তি ১৪৭ এবং তারাই বিধান সভার আপাতত সংখ্যাগরিষ্ঠ।

স্পীকারের এক্সিক্যার নিয়ে সারা দেশ ছুড়ে বিতর্ক উঠেছে। মন্ত্রীসভা গঠনের বৈধতার প্রশ্ন তুলে রাজ্যপাল কর্তৃক আহত সভার কার্যনিচালনা না করে সভা বন্ধ করে দেবার যে নজীর সৃষ্টি হোলো তার ফলে বার বার আহত সভা বার বারই স্পীকার মূলতবী ঘোষণা করতে পারেন। মন্ত্রীসভা বৈধ কি অবৈধ এই প্রশ্নের জবাব ভারত সরকারের পক্ষ থেকে অস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ভারত সরকারের উত্তরেই বিতর্কের শেষ হয় নাই। সর্বোচ সাংবিধানিক বিচারের অন্তিমত না পাওয়া পর্যন্ত এই বিতর্ক চলবে। আইন সভার ভিতরে স্পীকারের সার্বভৌম

অধিকার অনস্বীকার্য হলেও যেখানে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের অভ্যন্তর প্রহরীরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকে আইন সভা সচল রেখে জনপ্রতিনিধিদের অধিকার রক্ষায় স্পীকার অগ্রণী হবেন এবং যেখানে প্রশাসনিক ক্ষমতা আইন সভা এড়িয়ে শাসন কার্য পরিচালনার জন্ত তৎপর, সেক্ষেত্রে স্পীকারের অধিকার প্রয়োগে যদি আইন সভা অচল হয়ে যায়,—প্রশাসনের দিক থেকে আইন সভা অস্থানীয় তাগিদ থাকলেও,—সেখানে ভাবতে হবে গলদ কোথায় এবং তাকে অবিলম্বে দূর করতে হবে।

বিধান সভায় বলপ্রয়োগের প্রবণতা সর্বদা নিষ্পনীয় এবং সাম্প্রতিক বিধান সভায় ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের উপর কায়িক আক্রমণ তো তীব্রভাবে নিষ্পনীয়। মতবিরোধের মীমাংসা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করতে হবে। অস্থায়ী গণতন্ত্রের শাসনভূমির উপর একতন্ত্র কিম্বা সামরিকতন্ত্রের আয়োজন সম্পূর্ণ হবে। পশ্চিম বাংলার এই বিপদ সম্পর্কে অবিলম্বে সতর্ক হবার সময় এসেছে।

দলত্যাগ

সাধারণ নির্বাচনের মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে নির্বাচন দলত্যাগ ভারতে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠদল সরকার গঠন করে রাজনীতির অস্থিরতা দূর করবে এবং প্রশাসনে স্থায়িত্ব দেবে অন্তত পাঁচ বছরের জন্ত, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের এই পূর্বসূর্ত নির্বাচনোত্তর কালে গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে ঘন ঘন দলত্যাগের ফলে। হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, রাজস্থানেও কসবেশী এ-ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনের পর এপর্যন্ত ২১ জন সদস্য দলত্যাগ করেছেন। রাজনীতির নৈতিকতা-বোধ দলত্যাগে বিরত করতে ব্যর্থ হলে আইন বলে দলত্যাগ বন্ধ করার জন্ত দলত্যাগীদের পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী বাধ্যতামূলক করা উচিত। নির্বাচনের মাত্র কয়েকমাসের

মধ্যেই নির্বাচনী নীতির পরিবর্তনের অবকাশ থাকলেও সেই পরিবর্তিত নীতির জন্ত যদি আবার নির্বাচকদের সমর্থনলাভের দায়িত্ব সদস্যদের উপর না আরোপিত হয়, মন্ত্রীত্বের লোভ এবং অস্থায়ী ক্ষুদ্র স্বার্থের তাগিদে দল বদলের অনৈতিকতা নীতির আড়ালে প্রস্তর পাবে। সাম্প্রতিক দলবদলের মধ্যে এই নীতিহীন নীতি প্রভূত পরিমাণে নিহিত রয়েছে নিঃসংশয়ে বলা চলে।

অধীর চন্দ্র ব্যানার্জি

সমাজবাদী নেতা ও বিশিষ্ট সাংবাদিক অধীর চন্দ্র ব্যানার্জি ৬০ বৎসর বয়সে গত ৯ই ডিসেম্বর লোকান্তরিত হয়েছেন। কৈশোর থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থেকে অধীরবাবু প্রথম জীবনে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং ৪২ এর বিপ্লবের পর সমাজবাদী সংগ্রামের নিবল সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিকরূপে ভারতীয় বার্তাজীবী ফেডারেশনের পুরোভাগে থেকে অধীরবাবু সাংবাদিকদের সংহতি সাধনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আদর্শের প্রতি নির্ভর, ব্যবহারের অমায়িকতায় এবং চরিত্রের মাধুর্যে অধীরবাবু তাঁর কর্মক্ষেত্রে ও ঘনিষ্ঠমহলে বিশেষ ছাপ রেখে গেছেন। আমরা তাঁর শ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর শোকসন্তপ পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন গত ১১ই ডিসেম্বর ৭৫ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রিয়রঞ্জনবাবুর অনায়াসদৃশ স্বীকৃতি, তাঁর নিরন্তর প্রকৃতিকে আকর্ষণ করে রেখেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামেও প্রিয়রঞ্জন বাবু যোগ দিয়ে এবং লাঞ্ছনাবরণ করে স্বাদেশিকতার প্রবল স্বাক্ষর রেখে গেছেন! বাংলার এই কৃতী সন্তানের লোকান্তরে আমরা তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা এবং তাঁর শ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

ভাষার ভাণ্ডার

সমগ্র উত্তরভারত জুড়ে হিন্দিভাষীদের ভাণ্ডার হ্রাস হয়ে গেছে—উপলব্ধ সরকারী ভাষা (সংশোধনী) বিল। সরকারী ভাষারূপে হিন্দির একচ্ছত্র প্রয়োগের বিরুদ্ধে অহিন্দিভাষীদের উদ্বেগ, আশঙ্কা, ও বিক্ষোভ হিন্দি-ভাষাকে একমাত্র সরকারীভাষা ঘোষণার পক্ষে প্রবল অন্তরায় দেখা দিলে জহরলাল নেহেরু পার্লামেন্টে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে যতদিন পর্যন্ত না অহিন্দিভাষীরা সরকারী ভাষারূপে হিন্দি-ভাষা গ্রহণে সম্মত হবেন, হিন্দির পাশাপাশি ইংরাজী-ভাষা সহযোগী সরকারী ভাষারূপে আইনত স্বীকৃত হবে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে জহরলাল নেহেরুর এই প্রতিশ্রুতি আইনে রূপায়নের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধ থাকায় এ-বাৎ এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোনো আইন পাশ করানো যায় নাই। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিরোধ ছাড়াও, জনসংঘ ও সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট দলের উন্নত ইংরাজী-বিরোধও এই স্বীকৃতির পথে অন্তরায় ছিল।

হিন্দির জবরদস্তি প্রয়োগ, হিন্দিভাষীদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব এবং হিন্দির একচ্ছত্র ব্যবহারে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে অহিন্দি-ভাষীদের বিপন্ন অস্তিত্ব, সংবিধান পরিবর্তন করে ইংরাজীকে অষ্টম সিডিউলের পঞ্চদশ ভাষারূপে স্বীকৃতিদানের দাবী উত্থাপনে বাধ্য করে। সে দাবীর পরিবর্তেই বর্তমান ভাষা বিল, কারণ সংবিধানে স্থায়ীভাবে ইংরাজীকে স্থান দিতে ভারত সরকার কিম্বা কংগ্রেস সম্মত নন। ইতিমধ্যে সিদ্ধি ভাষা অষ্টম সিডিউলে স্থান পেয়েছে এবং নাগাল্যান্ডের একমাত্র সরকারীভাষা রূপে ইংরাজী ভাষাও সেই সিডিউলে স্থান পাবার দাবী রাখে।

বর্তমান ভাষা সংশোধন বিলের বিরুদ্ধে উত্তর ভারতের ভাণ্ডার অহিন্দিভাষীদের মনে নুতন করে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। মাদ্রাজের ডি, এম, কের পক্ষ থেকে এই বিলের বিরোধিতা করে সংবিধান সংশোধন করে

ইংরাজীকে স্থান দেবার দাবী উত্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষের হিন্দি অফিসিয়াল ভাষা, এ সম্পর্কে কোনো সংশয়ের অবকাশ বিলে রাখা হয় নাই; বিলের উত্থাপকও স্পষ্ট ভাষায় এ-কথা বলেছেন—হিন্দি জোর করে চাপানো হচ্ছে না, এটা ঘোষণাবার জন্য ইংরাজীকে সহযোগী ভাষার স্থান করে দেওয়া হয়েছে সীমাবদ্ধভাবে। তাৎক্ষণিক কেন্দ্রীয় চাকুরীর ক্ষেত্রে শুধু ইংরাজীর পরিবর্তে ইংরাজীর বিকল্প হিন্দিভাষাকে বিলে স্বীকার করে নিয়ে অত্যাশ্চর্য আঞ্চলিক ভাষা-ভাষীদের ভুলনায় হিন্দিভাষীদের প্রভূত আপেক্ষিক অবিধা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া হিন্দিভাষী রাজ্যগুলি হিন্দিতে অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলির সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করতে পারবে—ইংরাজী তর্জমাও সঙ্গে থাকবে; অহিন্দি-ভাষী রাজ্যগুলি ইংরাজীতে হিন্দিভাষীদের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করতে পারবেন এবং কেন্দ্রে হিন্দি চিঠির ইংরাজী অনুবাদ কিম্বা ইংরাজী চিঠির হিন্দি অনুবাদ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাপনার সম্পাদিত হবে। এই বিধানগুলি অত্যাশ্চর্য ভাষাভাষীদের ওপর হিন্দির স্থান নির্ধারণে সহায়তা করে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীদের উন্মাদনায় ইন্ধন যোগাবে। এই উন্মত্ততা রোধের জন্য অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলির হিন্দিভাষী রাজ্য কিম্বা কেন্দ্রের সঙ্গে নিজ নিজ স্থানীয় ভাষায়—ইংরাজী তর্জমা সহ—চিঠিপত্র আদানপ্রদানের অধিকার দিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় চাকুরীতে হিন্দি ভাষার জ্ঞান শুধু নয়, ইংরেজী সমেত অষ্টম সিডিউলের যে কোনো ভাষার জ্ঞানই অপরিহার্য বলে গণ্য করতে হবে। যতদিন হিন্দিভাষীদেরও আর একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হবে, ততদিন অহিন্দি-ভাষীদের উপর হিন্দী চাপানো চলবে না। এই পরিপূরক ব্যবস্থাই হিন্দি-সাম্রাজ্যবাদের মূলোচ্ছেদ করতে পারবে।

কয়না ভূমিকম্প

গত ১১ ডিসেম্বর পশ্চিম ভারতের কয়না বাঁধ সংলগ্ন কয়না শহর ও মহারাষ্ট্রের অত্যাশ্চর্য শহর প্রকাণ্ড ভূমিকম্পের

সম্মুখীন হওয়ার ফলে ১০,০০০ অধিবাসী সম্বলিত কয়না শহর ধূলিসাৎ হয়ে গেছে এবং শতাধিক লোক নিহত ও প্রায় দুই সহস্র লোক আহত হয়েছে। পশ্চিম ভারতে স্বয়ংসিদ্ধকালে কোনো ভূমিকম্প হয় নাই, অথচ কয়না বাঁধের সন্নিকটে ভূমিকম্প উৎসারিত হওয়ায় ভূত্ববিদদের বিশ্ববিমুগ্ধ করে দিয়েছে। ভূমিকম্পের ফলে কয়না বাঁধ অক্ষুণ্ণ রয়েছে, যদিও সাময়িকভাবে কয়না বাঁধ থেকে তৈরী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি অচল হওয়ার বোঝাই এবং পাশ্ববর্তী শহরে কিছু শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাঘাত ঘট হয়েছে। প্রাচীন দাক্ষিণাত্য মালভূমির ভূস্তরের পরিবর্তন ভৌগলিক ও ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অসম্ভব ঘটনা। তবুও কয়না ভূমিকম্পে নূতন করে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া কয়নায় আবদ্ধ জলের প্রকাণ্ড চাপ ভূস্তরের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভূকম্পন সৃষ্টি করলো কিনা সে-সম্পর্কেও অবিলম্বে গবেষণার প্রয়োজন। কেন না এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার উপর শুধু বাঁধগুলির ভবিষ্যৎ নয়, বাঁধের পাশ্ববর্তী জনপদগুলির ভবিষ্যৎ ও নির্ভর করছে।

১৫.১২.৬৭

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জ্ঞাত

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মডাক ৯'৫০। ষাণ্মাসিক ৪'৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জ্ঞাত

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাপ্রথমে দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিকার হরফে স্কলফ্রাণের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধে তাই নিয়ম।
৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়।

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান

কলিকাতা-৪৭

দীপ্তি

আপনার
নিত্য
প্রয়োজন

দীপ্তি লম্বন—এর পরিচয় নিম্নরোজন,
এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে
আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর
কম কেরোসিন খরচ।

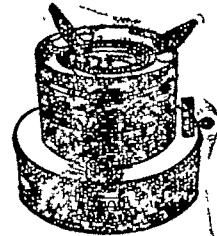
ঘাস জ্বলতা কেরোসিন কুকার—নিত্য
প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিস।
এই কেরোসিন ঠোঁড় ব্যবহারে কোন
সামেলা নেই। গঠনে মজবুত, বেগতে
সুন্দর, খরচে লাভাঙ্ক। অল্প সময়ে বে
কোন দায়া করা যায়।

‘দীপ্তি’ মার্কা এলুমিনিয়াম বাসন—
অল্প দিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর
অপেক্ষা দায়া সমাদৃত হচ্ছে।

বি ওরিয়েন্টাল মেটাল
ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
৩১ ও ৩২ বিন্দু বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রট,
কলিকাতা-১২



দীপ্তি লম্বন



ঘাস জ্বলতা



এলুমিনিয়াম বাসন

Kalpana Chatterjee

ভগিনী নিবেদিতা : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

উর্বশী ভেনাস নয় ; শান্ত স্তম্ভা দীপ্তিময়ীতিনি,
বিদেশিনী, কী মহান প্রেরণায় ভারতে এলেন,
যেন কোনো দেবকন্ডা ঋষির আশ্রমে । কী জিজ্ঞাসা
মৈত্রেয়ী গার্গীর মতো তাঁকেও ব্যাকুল করেছিল ?
পবিত্র ভারতভূমি প্রাণে তাঁর কী অম্লান দীপ জ্বলেছিল ।

অলিম্পিয়া দেবস্থান গ্রীসে রোমে আরুঠ, তথাপি
সিকুগদা কৃষ্ণা গোদাবরী—বিধৌত প্রান্তর—এই
আসমুদ্র হিমাচল ভারতকে তীর্থক্ষেত্র ভেবে
এ-দেশের মানুষ ও প্রকৃতিকে কী ভালোবাসলেন ।
সঁপলেন সর্বত্র তাঁর আর্ত মানবতার সেবায় ।

গুরু মহাপ্রাণ যোগী, জলন্ত স্বদেশপ্রেম তাঁর ।
দীক্ষা তাঁর স্পর্শমণি-স্পর্শ যেন শিষ্যের জীবনে ।
সন্ন্যাসিনী, ভারতের মহিষসী নারীর গৌরব
পুনরায় প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হলেন । পরাধীন
ভারতের মুক্তি তাঁর ঐকান্তিক প্রাণের প্রার্থনা ।

ভারতের বেদ ও দর্শন, পুরাণ এবং কাব্য
সংস্কৃতি ও ইতিহাস, লোকগাথা ভালোবেসেছেন ;
ভারতপ্রেমিকা, আহা, ভারতের আকাশে বাতাসে
মুক্তিকায় পেয়েছেন ভোগরিক্ত প্রাণের পাণ্ডেয় ;
স্মৃতি তাঁর ভারতের আর একটি পবিত্র দীপশিখা ।

মহীমসী নিবেদিতা : শান্তনীল দাশ

ভালবেসেছিলে এ ভারতভূমি, দূর প্রতীচ্য হ'তে,
গুরুর আদেশে চলে এলে তুমি, চিন্ত অচঞ্চল ;
তুলে নিলে ভার এ দেশসেবার, যেথায় লক্ষ কোটি
কাঁদে নরনারী, বড় অসহায়, আধিব্যাধি প্রপীড়িত ;
নেইকো শিক্ষা, নেইকো স্বাস্থ্য, দীর্ঘ সংস্কারে,—
গুরু দেখালেন তোমাকে এ ছবি, দীক্ষা দিলেন আর,
'এদের সেবায় জীবন তোমার কর তুমি নিয়োজিত' ।
অকাতরে তুমি সেই ভার তুলে নিলে জননীর মত ;
সারাটি জীবন সে কঠোর ভার পালন করেছ তুমি ;
শ্রান্ত হওনি, অতরু সেবা, বিমিত জনগণ ;
এ কোন মানবী ? নয়ামায়া স্নেহ পরমা মূর্তিমতী ।

দিয়েছে তোমার চরণে অর্ঘ্য অমল কুসুম রাজি ।
ভারত মাতার চরণে তোমার নিবেদিত ও জীবন,
গুরু দেওয়া নাম সার্থক তুমি করে গেলে নিবেদিতা ।
শত বর্ষের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অরি ওই স্তম্ভ নাম,
ও চরণে রাখি শ্রদ্ধা আশ্রুত প্রণাম, শত প্রণাম ।

বন্যাত্তগণকে সাহায্য করুন

“অভূতপূর্ব ধরার ফলে আমরা যে বিপুল সঙ্কটের সম্মুখীন হই, গত দুই বছরে জাতীয় পর্যায়ে প্রায় অমাসুখিক উচ্চমে পরিশ্রম করে আমরা সেই সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হই। এখন আবার আমাদের দেশের বহু জায়গায় ভীষণ বন্যা হওয়ায় বহু লোক গৃহহীন ও সহায়হীন হয়ে পড়েছেন। এঁদের অবিলম্বে সাহায্য করা প্রয়োজন। যে স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুরা নিদারুণ দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁদের যাতে অবিলম্বে অতি প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠানো যায় সেজন্য আমি আপনাদের কাছে, প্রধান মন্ত্রীর সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করার জন্য, আবেদন জানাচ্ছি।”

প্রধান মন্ত্রী
জাতীয় সাহায্য তহবিলে
মুক্তহস্তে
দান করুন

-ইন্দিরা গান্ধী
নিম্ন ঠিকানায় সাহায্য পাঠান
দি সেক্রেটারি
প্রাইম মিনিষ্টারস্ হাশনাল
রিলিফ ফাণ্ড
প্রাইম মিনিষ্টারস্ সেক্রেটারিয়েট
নূতন দিল্লী

davp 67/F—4
Bengali



ধারাবাহিক রচনা

দ্বিতীয় অধ্যায় : ষষ্ঠ কিত্তি

নেতৃত্বের অঙ্কুর

সত্যগ্রহ আন্দোলনের ওপর সরকারের দমননীতি যেমন নেমে এল আন্দোলন ও ততই ছুঁবার হয়ে উঠল। বাংলা দেশে গান্ধীজীর প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ; কিন্তু সত্যগ্রহ আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠার ফলে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটা বৌকও এখানে দেখা গেল। বস্তুতপক্ষে ১৯২১ সালে গান্ধীজীর জন্মদিবস বেশ সাড়ম্বরেই উদযাপিত হল কলকাতায় ও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে। কলকাতার নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হল জনসভা—আর প্রত্যেক জনসভাতেই পোড়ানো হল বিদেশী বস্ত্রের তুপ। ঢাক বাঙ্গানোর সঙ্গে সঙ্গে জনতার সম্মিলিত কণ্ঠে “গান্ধী মহারাজ কি জয়” ধ্বনি উচ্চারিত হল এবং তারই সঙ্গে পোড়ানো হল বিলাতী কাপড়, জামা ও অন্যান্য পরিচ্ছদ। হালিডে পার্কের সভাই হয়েছিল আয়তনে সবচেয়ে বড়। সেখানে সভায় সভাপতিত্ব করতে যেয়ে শামসুন্নার চক্রবর্তী বললেন যে মহাত্মাজী এমুগের স্বর্ষি। তিনি করুণার প্রতিমূর্তি। তাই বিদেশী বস্ত্র পোড়ানোর পিছনে কোনো বিদ্বেষভাব তাঁর নেই, বরং এই বস্ত্রাঘির আগুনে আমাদের হৃদয় হয়ে উঠবে আরও পবিত্র, যুগযুগান্তের পাপভার নেমে যাবে আমাদের কাঁধ হতে,—আমরা আরও শুদ্ধচিত্তে স্বরাজের সাধনায় যোগ দিতে পারব। এই কথা বলে শামসুন্নার বাবু প্রায় দশহাজার টাকা মূল্যের বস্ত্ররূপে আগুন ধরিয়ে দিলেন। সরকারপক্ষ

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

এই ঘটনাকে বলশেভিকবাদ বলে প্রচার করলেন; বিপিন পাল লিখলেন, রাশিয়ার বলশেভিকবাদ সফল হয়নি, এখানেও হবে না। (স্টেটসম্যান, ২রা অক্টোবর ১৯২১)

কলকাতায় বিলিভী কাপড় পোড়ানো—তাও গান্ধীজীর মতো শান্তিপূর্ণ অহিংসবাদীর জন্মদিনের উৎসব উপলক্ষে—কী করে বলশেভিকবাদের পর্যায়ে পড়েছিল তা বোঝা মুশ্কিল। অথচ একই সময়ে ডি ভ্যালেরার আপসবিহীন স্বাধীনতা সংগ্রাম—যার সাফল্য গ্রেটব্রিটেনকেই ভাগ করার ওপর নির্ভর করে—তাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে খোদ ইংলও গবর্নমেন্টের পক্ষে বাধেনি। লয়েড জর্জ ডি ভ্যালেরার কাছে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আবেদন জানিয়ে পুনরায় অক্টোবর মাসে লণ্ডনে এক সম্মেলনে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্ত নিমন্ত্রণ জানালেন। ডি ভ্যালেরাকে আইরিশ জাতির নেতা ও তাঁর দলকে আয়র্ল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করার একমাত্র অধিকারী সংগঠন বলেও স্বীকার করে নিলেন লয়েড জর্জ ঐ পরে। এই ঘটনার বহু বছর পর ইংলণ্ডের সরকার গান্ধীজীকেও লণ্ডনে ভারতীয় সম্মতার আপস মীমাংসার জন্ত এক গোলটেবিল বৈঠকে ডেকেছিলেন। কিন্তু ডি ভ্যালেরার সঙ্গে গান্ধীজীর পার্থক্য ছিল : দৃঢ়চিত্ততা, দূরদর্শিতা ও ব্যক্তিগত পার্থক্যই হয়তো বা,—তাই বিশাল ভারতের একচ্ছত্র নেতা হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজীকে ইংরেজ

সমগ্র ভারতের হয়ে কথা বলার অধিকার হয়নি; তাঁর দল কংগ্রেসকেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার একমাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বলে ইংরেজ মানেনি, তাই ডি ভ্যালেরা যেখানে সফল হয়েছিলেন, গান্ধীজী সেখানে হয়েছিলেন সম্পূর্ণ বিকলকায়। কারণ আগাগোড়া গান্ধীজীর সংগ্রামের হ্রস্ব ছিল অতি নিচু খাদে বাঁধা—অনেক সময়ই তা ছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট ও অপ্রাণলিক বিষয় নিয়ে মস্ত।

আয়ারল্যান্ডের সংগ্রামের কথা আমাদের মূল আলোচনার পক্ষে অপরিহার্যই বটে। কারণ স্বভাষচন্দ্রের চিন্তে সিন্ ফিন্ আন্দোলনের সংগ্রাম পদ্ধতি ও ডি ভ্যালেরার নেতৃত্ব-বৈশিষ্ট্য রেখাপাত করেছিল। তিনি ডাবলিনে গিয়েছিলেন, সিন্ ফিন্দের নেতাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল এবং তাঁদের সংগ্রামকৌশল তিনি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সিন্ ফিন্দের সংগ্রামপদ্ধতির অনেকগুলি দিক তাঁর যেমন যথার্থ বলে মনে হয়েছিল, তেমন গান্ধীজীর আন্দোলন-পরিচালনার অনেকগুলি দিক তাঁর পছন্দ হয়নি। স্বভাষ বখন ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন তখনই, সেই ১৯২১ সালেই, গান্ধীজীর নেতৃত্বের দুর্বলতাস্থলি তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। গান্ধীজীর লক্ষ্যহারা ভাব তাঁর আঁধো ভালো লাগেনি। গান্ধীজীর সঙ্গে মত ও পথের বিরোধ স্বভাষচন্দ্রের ঘটেছিল প্রথম হতেই: সম্ভবত এই দুই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গঠনের ভিতরই ছিল সেই পার্থক্যের বীজ;—কালে সেই বিরোধই ব্যাপক ও প্রকাশ্য রূপ নিয়ে দাঁড়ায়।

গান্ধীজীর আরেকটি ক্ষেত্রের ব্যর্থতাও সেই ১৯২১ সালেই দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ভারতের মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলনের অংশীদার করে তোলার আশায় তিনি খিলাফত আন্দোলনের জন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল ভারতের মুসলমানরা তার কলে মোটেই জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেনি, বরং

তাদের ভিতর উগ্র সাম্প্রদায়িকতাই জেগে উঠেছে। প্রথমত এই আন্দোলনের ফলেই ভারতের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে একটা জাগরণ ঘটে ও তাদের ভিতর রাজনৈতিক সচেতনতা ও ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনবোধ দেখা দেয়। কিন্তু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার আদর্শকে অবলম্বন করে এই জাগরণ ঘটায় তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও সম্মতক্ষমতার প্রয়োগ সাম্প্রদায়িক স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির গ্রেপ্তার ও করাচীতে তাঁদের বিচার ভারতের মুসলমান সমাজের সমস্ত দৃষ্টিকে তাদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় ও গৌরবের দিকেই নিবদ্ধ করে; আলি লাহড়য় আদালতে প্রদত্ত জবানীতেও তাঁদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব গোপন রাখতে পারেননি। এই সময় পাকিস্তানের মুসলমানরা বড়লাটের কাছে এক স্মারকপত্র পেশ করে। আলি লাহড়য়ের গ্রেপ্তার ও বিচারে তাদের অসন্তোষ ও ক্ষোভই এই স্মারকপত্র প্রেরণের মূলে ছিল। তাদের অভিযোগ ছিল এই যে আলি লাহড়য়কে গ্রেপ্তার করে সরকার মুসলমান ধর্মের প্রতি আঘাত করেছে। ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের জন্ত বিশেষ বিশেষ অধিকারও তারা দাবী করেছিল—মুসলমানদের দেওয়া এই স্মারকপত্রের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে বড়লাট তার উত্তরে একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতিতে প্রথমেই তিনি মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস দিয়েছিলেন এই কারণে যে ভারতের বৈশ্ববিক আন্দোলনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই এবং প্রিন্স অফ ওয়েলসকে আসন্ন ভারত সফর কালে তারা সম্বর্ধনা জানানো স্থির করেছেন। তারপর তিনি মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও আইন সভায় বিশেষ প্রতিনিধিত্বের দাবীকে স্বাগত জানিয়ে আশ্বস্ত করেছেন যে এবিষয়ে ইন্ডিয়া অ্যাক্টমতে যেসব বিধান করা হয়েছে তার কোনো রদবদল হবে না।

খিলাফত আন্দোলনের ফলে ভারতের মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সম্মত হয়েছিল এবং তাদের

সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হয়েছিল। এরই একটা উগ্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে মালাবারের মৌপলা বিদ্রোহে—যেখানে মৌপলা নামক মুসলমান সম্প্রদায়টি হিন্দু ও খৃষ্টানদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার চালায়, হত্যা, পীড়ন, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ করতে থাকে, ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে। শাসক কর্তৃপক্ষ সে বিদ্রোহ অবশ্যই দমন করেছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবীগুলিকে যেনে নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে পাকা আসন করে দেন। গান্ধীজীর সংগ্রাম-কৌশলের এই দুর্বলতা ও দূরদৃষ্টিহীনতা স্বভাষচন্দ্রকে পীড়িত করেছিল।

কিন্তু প্রকাশ্যে খিলাফৎ আন্দোলনের সমালোচনা করা ১৯২১ সালেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ অসহযোগ ও খিলাফৎ দুটি আন্দোলনই একত্রে পরিচালিত হচ্ছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে এবং প্রকাশ্যে নেতার আত্মসমর্পণী থাকা ও নেতাকে সমর্থন করাই ছিল সেদিন তাঁর কর্তব্য। অক্টোবর মাসের ৫ তারিখে বম্বে শহরে ভারতের নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়েছিলেন তদানীন্তন পরিস্থিতি বিচার ও ভবিষ্যতের কর্তব্য নির্ধারণ করতে। বাংলা হতে দেশবন্ধু এই নেতৃ-সম্মেলনে যোগ দিতে যাননি—গিয়েছিলেন শামসুদ্দীন চক্রবর্তী ও জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জী। কলকাতার দৈনিক সংবাদপত্র ‘নায়ক’ (সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়) লিখলেন যে করাচীতে আলি শ্রীতৃদয় ও অন্যান্য বন্দীদের যে বিচার চলছিল সেই বিচারে অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করা উচিত হবে কিনা এই ছিল নেতৃসম্মেলনের আলোচিতব্য বিষয়। ইতিপূর্বে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে কোন অসহযোগীই গ্রেপ্তার হলে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে না। সেই সিদ্ধান্ত পাল্টানোই বম্বে সম্মেলনের উদ্দেশ্য। ‘নায়ক’ শব্দ প্রস্তুত ছিলেন এই বলে যে বাংলাদেশে বাদশা মিঞা, শরৎ ঘোষ প্রভৃতি যেসব অসহ-

যোগী নেতা গ্রেপ্তার বরণ করেছেন তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থন করেননি কংগ্রেসের প্রস্তাবমতো—এখন সেই সুযোগ অন্ধান নেতাদের দেওয়া হবে কেন? এই প্রশ্ন সেদিন খানিকটা বিক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হতে অতএব স্বভাষচন্দ্র বম্বে সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগনা নিরসনের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি দিলেন। বিবৃতিতে তিনি বললেন: “বম্বের নেতৃসম্মেলন করাচীর আদালতে আলি শ্রীতৃদয় আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন কিনা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্ত আহুত হয়নি। জনসাধারণের স্ফূর্তার্থে একথা বলতে পারি যে আরও গুরুতর বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন অস্থগীত হচ্ছে। কী ধরনের সমস্তা নিয়ে আলোচনা সেখানে হচ্ছে তা পঞ্চাশজন নেতার স্বাক্ষরযুক্ত যে ইশতেহার প্রচারিত হয়েছে তা হতেই বোঝা যাবে।” (Indian Daily News, ৭ই অক্টোবর ১৯২১) পঞ্চাশজন নেতার স্বাক্ষরযুক্ত ইশতেহারটিতে বলা হয়েছিল: “কোন ভারতীয়ের পক্ষে সরকারী চাকরি—তা সামরিক বা বেসামরিক যাই হোক—স্বীকার করা জাতীয় মর্যাদাবোধের পরিপন্থী, বিশেষত সৈন্ত হিসাবে চাকরি করা তো শোরতর অন্তায়। প্রত্যেক সরকারী চাকুরিয়ারই উচিত চাকরি ত্যাগ করে জীবিকার্জনের আর কোনো পথ অবলম্বন করা।” এই ইশতেহারে স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, লাল লাক্ষণ্য রায়, মোলানা আবুল কালাম আজাদ, মতিলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি। গান্ধীজী “বম্বে ক্রনিকল” সংবাদপত্রে লিখলেন যে তাঁকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হবে বলে যে গুজব রটেছে তা যদি সত্য হয় তাহলে তিনি সরকারকে অভিনন্দন জানাবেন। সরকারের সঙ্গে সর্বস্তরে অসহযোগ করার যে আন্দোলন দেশে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটির উদ্যোগে বিস্তৃতি লাভ করেছে তিনিই সে আন্দোলনের মূল নেতা। আলি শ্রীতৃদয় এবং অন্যান্য অসহযোগীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। অথচ তাঁকে রেহাই

দেয়া হচ্ছে—সরকারের এ আচরণের মধ্যে সজ্জিত কোথায়? অসহযোগ আন্দোলন যদি সফল হয় তাহলে ভারতে ইংরেজ সরকারের কাঠামোটাই ভেঙ্গে পড়বে। গান্ধীজী আরও জানালেন যে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এলে তিনি তো কোনো বাধা দেবেনই না এবং জনগণও যেন হরতাল বা অন্য কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পথে পা না বাড়ান। - তিনি গ্রেপ্তার হলে দেশবাসীর কর্তব্য হবে আরও বেশি চরধা কাটা, বিদেশী বস্ত্র পরিত্যাগ ও হিন্দুদের কর্তব্য হবে ধ্বংসকণ্ড আন্দোলনে বেশি করে সামিল হওয়া। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে মুসলমানদের সন্তুষ্টি না করা গেলে স্বরাজ লাভ করা হবে অকল্পনীয়। (Swaraj without conciliation of Musalmans is inconceivable)

বম্বে শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিরও বৈঠক বসে এবং তাতে তিনটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যথা : (১) সামরিক বা বেসামরিক—সরকারী চাকরি মাঝেই পরিত্যাগ্য। সরকারী চাকুরিয়ারা চাকরি ছেড়ে এলে কংগ্রেস তাদের জীবিকার্জনের উপায় করে দেবার দায়িত্ব নিতে পারবে না বটে তবে ভারতীয় মাঝেরই সরকারী চাকরি ছেড়ে আসা উচিত ও চরধার সাহায্যে স্ত্রীকে ও তাঁত বুনে প্রত্যেকেই জীবিকার্জন করতে পারেন। (২) বিদেশী বস্ত্র বয়কট আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করলেও পুরাপুরি সফল হয়নি—অতএব ঐ আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে। (৩) ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্ত করাকেও কংগ্রেস সমর্থন করবে কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগতভাবে সে সম্পর্কে কোন দায়িত্ব নেবে না ও সাধারণভাবে আইন অমান্ত করার ডাকও দেবে না। অহিংসা ও শান্তিপূর্ণ অসহযোগ ভিন্ন অন্য কোনো পন্থাকেও কংগ্রেস স্বীকার করে নেবে না।

ইতিমধ্যে এলে পড়ল স্বর্গাপূজা এবং তদ্রূপ সামরিক ভাবে বাংলায় চাই অক্টোবর (যেদিন কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির প্রস্তাব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়) হতে রাজনৈতিক

আন্দোলন বন্ধ থাকে। তবে পূজার পর আন্দোলন কোন লক্ষ্য অভিমুখে পরিচালিত হবে তার আভাস কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। এই প্রস্তাবগুলির ভিতর অভিনবত্ব ছিল না। তবে একটা জিনিস ছিল লক্ষ্যণীয়। কার্যকরী কমিটির একটি প্রস্তাব-মতে প্রিন্স অফ ওয়েলশের ভারতে পদার্পণের দিনে সারা ভারতে স্বেচ্ছাবৃত হরতাল পালনের কথা স্থির হয়, কিন্তু ঐ সম্পর্কে যাবতীয় দায়িত্ব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। বস্তুতঃ পক্ষে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি এবিষয়ে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হবার অধিকার পায়। বাংলা দেশে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা সেকারণেই বাংলার নিজস্ব ও স্বাধীন আন্দোলন হয়ে উঠেছিল। এমন কি বস্ত্রবয়কট আন্দোলন অপেক্ষা, কিংবা ধ্বংসকণ্ড আন্দোলন অপেক্ষা বাংলাদেশে সুবরাজ-আন্দোলনের গুরুত্ব তাই ছিল সাময়িক এবং ঐ আন্দোলনের মাধ্যমেই বাংলার স্বভাবচক্রের নেতৃত্ব প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

যাই হোক, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই সময়ে আরও কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব ছিল এই যে (ক) ভারত সরকার ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখতে যতটা যত্নপর ভারতের সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে ততটা আগ্রহ তার নেই, (খ) ভারত স্বাধীন হলেও প্রতিবেশী দেশগুলি হতে তার কোনো বিপদাশঙ্কা নেই, কারণ ভারতবাসী অন্য দেশ দখল করতে বা অন্য দেশের পক্ষে ক্ষতিকর কোনো ব্যবসায়ে লিপ্ত হতেও চায়না এবং এইসব প্রতিবেশী দেশ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যেসকল চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছে সে চুক্তিগুলিও পুনর্বিবেচিত হবে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে কংগ্রেসের বক্তব্য এই যে ইসলামের নির্দেশ ঐ রাষ্ট্রগুলি যেনে চলুক স্বাধীন ভারতবর্ষ তাই

চাইবে। আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পর এই সব প্রস্তাবের ভিতর দূরদৃষ্টির অভাব বেশ খানিকটা প্রকট হয়ে পড়েছে। আমাদের জাতীয় নেতারা, বিশেষত গান্ধীপন্থী নেতারা যে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বাস্তববুদ্ধির অভাবের পরিচয় দিতেন—১৯২১ সনের প্রস্তাব হতে তা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

পূজার দিনগুলির মধ্যেই হুতাবচল সংবাদপত্রে আর একটি বিবৃতি দিলেন বাংলায় জাতীয় বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে। বিবৃতিটি দীর্ঘ—তবু উদ্ধৃত করছি, কারণ সেদিনের ইতিহাসে বাংলার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের গুরুত্ব কোনো অংশেই কম ছিল না। তিনি বলেছিলেন : “সরকারী বা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে যে সব ছাত্র নাম প্রত্যাহার করে এসেছিলেন তাঁদের কী হল এ বিষয়ে যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে শোনা যায়। আমরা এ সম্পর্কে অসুস্থান করে জেনেছি যে ঐ অসহযোগ ত্রতী ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই কোনো না কোনোপ্রকার দেশসেবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। যথা রাজনৈতিক প্রচার, খেচ্ছাসেবক-ত্রত পালন, চরখায় হুতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন ইত্যাদি।) অনেকেই নানারকম ব্যবসায়, বিশেষত স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবসাতে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু আবার অনেক ছাত্রই জাতীয় স্কুলগুলিতে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমান আন্দোলন সূত্র হবার পর থেকে এই স্কুলগুলি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও তৎকর্তৃক গঠিত শিক্ষা পর্ষদের নিকট স্বীকৃতি ও অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য দরখাস্ত পাঠাচ্ছেন। গত আগষ্ট মাস পর্যন্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দপ্তরে যত দরখাস্ত এসেছে সেগুলি হতে আমরা বাংলা দেশে কত সংখ্যক জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও ঐ স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা কত সে সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে পেরেছি।

বিভাগ	স্কুলের সংখ্যা	মোট ছাত্রসংখ্যা
ঢাকা	৬৫	৭,৮৪৪
চট্টগ্রাম	১৭	১,৩৩২
রাজশাহী	৮	৬২২
প্রেসিডেন্সি		
(কলিকাতা সহ)	১৮	২,৩৫৬
বর্ধমান	১৫	১,২৭৫
সুর্ধা উপত্যকা	৬	৫৩৬

অতএব বাংলা দেশে জাতীয় স্কুলের মোট সংখ্যা হচ্ছে ১২৯ ও ঐ সব স্কুলে পাঠরত মোট ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে ১৩,৯৬৫ জন।

এই সংখ্যাগুলি কিন্তু পুরানো—আধুনিকতম সংবাদ এতে পাওয়া যাবে না। কারণ যে রিপোর্টগুলি হতে সংখ্যাগুলি উদ্ধৃত হয়েছে সে রিপোর্টগুলি ছুন জুলাইতে লেখা হয়েছে,—ইতিমধ্যে হয়তো অনেক পরিবর্তনই ঘটে গেছে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক কংগ্রেসের পাবলিসিটি বোর্ড গঠিত হবার পর জাতীয় স্কুলগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলেছে। ৫০টি স্কুলের শেষতম সংবাদ নিয়ে আমরা জেনেছি যে ছাত্র সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

কতগুলি স্কুলের অবস্থা দেখে মনে হয় যে সে স্কুলগুলি স্থায়ী হবে। কিন্তু আর কতগুলি স্কুল সম্পর্কে আশঙ্কা এই অর্থাভাবে সেগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। এই স্কুলগুলির সংগঠক ও শিক্ষকবৃন্দের উৎসাহ ও নিঃস্বার্থ মনোভাব দেখে বিস্মিত হতে হয়। যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে বাংলা দেশের জাতীয় স্কুলগুলির ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই অতিশয় উজ্জ্বল হবে। সব স্কুলগুলি হতে রিপোর্ট পাবার পর আমরা জাতীয় স্কুলগুলি সম্পর্কে হালকিল খবর দিয়ে একটি বুলেটিন প্রকাশ করব। (The Indian Daily News, Oct. 10)

ভিলক স্বরাজ্য কাণ্ড সম্পর্কেও হুতাবচলের আর একটি

বিবৃতি এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বিবৃতির উদ্দেশ্য ছিল ভ্রান্তি নিরসন। বাংলা দেশে তিলক স্বরাজ্য ভাঙার কত টাকা জমা পড়েছে তাই নিয়ে একটা ভুল ধারণা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। হুভাষচন্দ্র তাই বিবৃতি মারফৎ জানিয়েছিলেন : “তিলক স্বরাজ্য ভাঙার বাংলায় মোট দান সম্পর্কে যথেষ্ট ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এরকম একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে বাংলার মোট দান পঁচিশ লক্ষ টাকা। এই ধারণার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তিই কখনো দাবী করেননি যে বাংলায় পঁচিশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এই ধারণার উৎসমূল হচ্ছে ১লা জুলাই তারিখে বঙ্গ হতে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস কর্তৃক প্রচারিত একটি সংবাদ, যা পরের দিন কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংবাদে বলা হয়েছিল যে বঙ্গ স্টক এক্সচেঞ্জ ব্রোকারদের এক সভায় মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বাংলা হতে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন যে বাংলায় মোট পঁচিশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। আসলে শ্রীযুক্ত দাসের টেলিগ্রামটির ভুল ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করেই সংবাদটি প্রচারিত হয়েছিল। এই সম্পর্কে জনসাধারণকে একথা আমরা জানাতে পারি যে বঙ্গ শহরে শ্রীযুক্ত দাস যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি এই

কথাই বলেছিলেন যে নগদ, অলঙ্কার ও প্রতীকৃতি—সব মিলিয়ে বাংলার মোট পনেরো লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু তিনি আশা রাখেন যে শেষ পর্যন্ত পঁচিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাংলার সংগ্রহ করা যাবে। বঙ্গোত্তে শ্রী দাসের আশাকেই বাস্তব সংগ্রহের পরিমাণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত এই মর্মে সংবাদ প্রচার করে দেওয়া হয় যে বাংলার মোট দান পঁচিশ লক্ষ টাকার পৌঁছেছে।” (ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ, ৮ই অক্টোবর ১৯২১)

হুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতিটি নিয়েও সেদিন বিতর্কের ঝড় উঠেছিল : কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রতি সন্দেহ ও কারও কারও মনে ক্ষেপে উঠেছিল। প্রশ্ন উঠেছিল এই যে বাংলায় যে পঁচিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা যায়নি সে কথাটা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয়নি—কেন প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ দুমাস ধরে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করলেন? হুভাষবাবু জুলাই মাসের গোড়াতেই যে বিবৃতি দিতে পারতেন তিনি অক্টোবরের ৮ তারিখে দিলেন কেন? বাংলার নেতাদের পক্ষে এই দীর্ঘ নীরবতা জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে বলে কয়েকজন পত্রলেখক সংবাদপত্রে খোঁচা-খুলি মত প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে পূজা কেটে গেল—বাংলার আবার এল আন্দোলনের জোয়ার।

(ক্রমশঃ)

ভাষা-সমন্বয়

অশোক কুমার মজুমদার

১

বাইবেল পাঠে জানা যায় যে একদা ঈশ্বর দেবদূতদের ডাকিয়া বলিলেন : “Let us go down and confuse their language that they may not understand one another's speech.” (Old Testament, Genesis).

বর্তমানে আমাদের দেশে যে খৃষ্টানদের ঈশ্বরের কার্যে অরিস্ত হইয়া গিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই আন্দোলনের মূলে কয়েকটি মূল্যবোধ অবশ্যই আছে, তাহা মোটামুটি এইরকম :

- ১) প্রত্যেক জাতির একটি জাতীয় ভাষা আছে ;
 - ২) জাতীয় ভাষা জাতীয় সংহতির পুষ্টিকারক ;
 - ৩) ভারতবর্ষে বহুভাষাভাষীর বাস ; অতরাং পরস্পরের যোগসাধনের ও শাসন কার্য পরিবাহনের জন্ত একটি সামান্য-ভাষার প্রয়োজন ;
 - ৪) বিদেশী ইংরেজের ভাষা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে, এবং অপমানজনকও বটে ;
 - ৫) অতরাং প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে যথা সম্ভব মর্যাদা দিয়া, হিন্দিকে বঙ্গনী বা সামান্য-ভাষা করা কর্তব্য।
 - ৬) অতঃপর ইংরেজি শিক্ষা চালু থাকিলেও ক্ষতি নাই, বরং লাভের সম্ভাবনায় অপরিহার্য বলা যাইতে পারে।
- এই অনুমানগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক।
- প্রত্যেক জাতির একটি জাতীয় ভাষা আছে ইহা সত্য নহে। সুইজারল্যান্ডে তিনটি ভাষা (ফরাসী, ইতালীয়, ও

জার্মান) ; কানাডায় দুইটি ভাষা (ইংরেজি ও ফরাসী) ; পাকিস্থানে দুইটি ভাষা (উর্দু ও বাঙ্গলা) যদিও বর্তমানে পাকিস্থানে ইংরেজির মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। কানাডাতেও সাধারণতঃ ইংরেজি ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এক ভাষাভাষী হইলেই এক জাতি হওয়া যায় না। এগারটি আরবদেশ, কেবল এক ভাষা ব্যবহার করেনা, একই ধর্ম পালন করে। কিন্তু বাহিরের শত্রুর আক্রমণেও ইহারা এক হইতে পারিল না। অথচ আমাদের এত ভেদ ও বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও, যখনি পাকিস্থান কি চীন আমাদের আক্রমণ করিয়াছে তখনই আমরা এক হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছি। ইহা হইতে দেখা যায় যে আমাদের ঐক্য ভাষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

আরবদের দ্বারা লাতিন আমেরিকার ২১টি দেশ স্প্যানীশ ভাষা-ভাষী ও রোমান ক্যাথলিক ; (একমাত্র ব্রাজিলে পর্তুগীজ ভাষা ব্যবহৃত হয়।) কিন্তু ইহাদের ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে ইহাদের মধ্যে সম্প্রতি শান্তি বিরাজমান করিলেও বহুদিন যাবৎ ইহারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিবাদ করিয়াছে।

অতরাং দেখা যাইতেছে যে, জাতিগঠনের মূলে ভাষার ভিত্তির গুরুত্ব আপেক্ষিক।

ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায় যে, পশ্চিম ইউরোপের জাতিগুলি যেমন একটি ভাষাকে ভিত্তি করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, তেমনি পরস্পরকে শত্রু বলিয়া গণ্য করিয়াছে। বস্তুতঃ ভাষা যেমন ঐক্য সাধন করে, তেমনি বিভাগ সৃষ্টি করিয়া বিবাদেরও কারণ হয়।

ভারতবর্ষে কংগ্রেস ১৯৩৭এ মন্ত্রিস্থ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার ভিত্তিতে বিবাদের স্রব্ধপাত হয়। প্রথমে বিহারে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে সরকারী আন্দোলন আরম্ভ হয়; বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই এই বিদ্বেষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই রকম উগ্র প্রাদেশিকতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলে, জাতীয় সংহতি কতদিন টিকিয়া থাকিবে কে জানে?

হিন্দিকে সামান্যভাষা করিবার বিরুদ্ধে মাদ্রাজে ভীষণ আন্দোলন হইয়াছে ও হইতেছে। জোড় করিয়া হিন্দিকে সামান্য-ভাষা করিলে মাদ্রাজ ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইবার চেষ্টা করিবে। ধর্মের ভিত্তিতে একবার ভারত বিখণ্ডিত হইয়াছে, ভাষার ভিত্তিতেও আবার বহু-খণ্ডিত হইতে পারে। মনে রাখা উচিত যে পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে হিন্দি-উর্দু'র সমস্তা আগাগোড়া বর্তমান ছিল।

২

ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিলে যে আমাদের জাতীয় মর্যাদার লাঘব হয় তাহা সত্য। কিন্তু আমরা যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহাতে ইংরাজি ভাষার ব্যবহার অক্ষুর রাখা ভিন্ন অন্য কোনো উপায় নাই।

ইংরাজি ভাষার ব্যবহার শিখিতে হইলে প্রাথমিক হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত ইংরাজির মাধ্যমে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষা ও পরীক্ষা বাঙ্গলার মাধ্যমে হইয়া আসিয়াছে। তাহাতে ইংরাজি শিক্ষার ক্ষতি হয় নাই। কারণ নিম্ন শ্রেণী হইতেই ভাষাটি শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল। অনেকে বলেন যে উঁচু ক্লাশে উঠিয়া ইংরাজী শিখিলেই চলিবে। তাহা হয় না। কারণ ইংরেজী সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষা, শেখা কষ্টকর ও সময় সাপেক্ষ; তুলনায় হিন্দি শেখা সোজা।

অনেকে বলেন যে যেন তেন প্রকারেন ধানিকটা কাজ চলা গোছের ইংরাজি শিখিলেই ভারতবাসীদের কাজ চলিবে। সুতরাং ইংরাজির উপরে বিশেষ মনোযোগ দিয়া ছাত্রদের

সময়ের অপচয় করা উচিত নহে। মনে হয় ইহাদের মতে ইংরেজী শেখাটা তেমন দোষনীয় নহে। ভাল ভাবে শেখাটাই অস্তায়। বস্তুতঃ কয়জন ভারতবাসী ভালভাবে ইংরাজি লিখিতে বা বলিতে পারে? শৈশব হইতে চেষ্টা করিয়া যে ভাষা আমরা এখনও সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিতে পারি নাই, তাহা বর্তমান যুগের ছাত্রগণও বিভ্রালয়ে দু'এক বছর পড়িয়া শিখিতে পারিবে না বলাই বাহুল্য। গুজরাতে এইভাবে ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল এখন দেখা যাইতেছে যে M. A. ক্লাশের ছাত্ররা পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া বুঝিতে পারে না।

অনেকে বলেন যে কতগুলি বিষয় এখনই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিখান যায়; যেমন সংস্কৃত। ইহার উত্তরে একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। মহারাষ্ট্রে কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার (মারাঠি, গুজরাতি ও হিন্দি) মাধ্যমে এম. এ পর্য্যন্ত পড়ান হয়। এই বৎসর সেই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটি ছাত্রী সংস্কৃত দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হইয়া পাশ করিয়া বসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য থিসিস লিখিবার অনুমতি চায়। কোনো কারণে আমাকে এই মেয়েটির interview লইতে হয়। মেয়েটির ইচ্ছা সংস্কৃত 'রসের' উপর নিবন্ধ লেখা। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে 'সাহিত্য দর্পণের' একটি অধ্যায় পড়িয়াছে; কিন্তু মহামহোপাধ্যায় কাণের 'Introduction to Sahitya Darpana'এর নাম শোনে নাই, কাণে মহোদয়ের নামও জানেনা, যদিও মেয়েটি মারাঠি। ডঃ হুশীল দের 'History of Sanskrit Poetics'এর নাম বা ডঃ দের নাম জানেনা; হুশীল দে, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বা কিং সাহেবের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আছে বলিয়া জানেনা। বেদ সম্বন্ধে এক special paper পড়িয়াছে, কিন্তু, সাহিত্য, ত্রাঙ্কণ ও উপনিষদের পার্থক্য সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই।

অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার হইলেও স্বীকার করিতে হয় যে, সংস্কৃত শিখিতে হইলেও এখন ইংরাজি শিখিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, বেদ ভাণভাবে অধ্যয়ন করিতে হইলে জার্মান শিখিতে হয়, এবং বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে চর্চা করিতে হইলে ফরাসী শিখিতে হয়, যেমন জৈনধর্ম লইয়া আলোচনা করিতে হইলে জার্মান জানা আবশ্যক। কেবল যে বিদেশী পণ্ডিতেরা নিজের ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, ভারতীয় পণ্ডিতেরাও ইংরেজী ভাষায় লিখিয়াছেন। ইহার উত্তরে রাজনৈতিক নেতারা বলেন যে অনুবাদ করিয়া লওয়া যাইবে।

কিছু অনুবাদ করা সম্ভব; যেমন উপর্যুক্ত কাশে মহোদয়ের, 'Introduction to Sahitya Darpana': কিন্তু তাঁহার 'History of the Dharmasastras' কে অনুবাদ করিবে? বক্তৃতা মঞ্চে উঠিয়া 'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব হইতেই হইবে,' বলিতে কোন বিশেষ পরিশ্রম হয়না। কিন্তু মহামহোপাধ্যায়ের 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস,' ভারতের যে কোন ভাষায় অনুবাদ করিবার লোক আছে বলিয়া জানি না। যাহাদের অনুবাদ করিবার যত বিজ্ঞা আছে, তাহারা কখনও এই নিষ্ফল হাড়ভাঙা ষাঁটুনিতে প্রবৃত্ত হইবেন না। যাহা হউক টাকায় বাধের ছদ্ম মিলে; হুতরাং প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া এই বইটির অনুবাদ করা অসম্ভব নহে; একটি ভাষায় অনুবাদ করিতে বছর দশ পনের সময় এবং ন্যূনাধিক দুই লাখ টাকা খরচ হইবে। বই প্রকাশিত হইলে হয়ত দশ কপি বিক্রয় হইবে, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাব্লিক লাইব্রেরী ভিন্ন এই বই কেহ কিনিবে এমন আশা করিবার কোনো হেতু নাই। অথচ ধর্মশাস্ত্র পড়িতে গেলে মহামহোপাধ্যায় কাণের বই পড়া অত্যাশঙ্কক। সেইরকম বেদ পড়িতে গেলে, Vedio Index, Vedio Mythology, Vedio Concordance, Vedio Bibliography ইত্যাদির প্রয়োজন। প্রাচীন পন্থা অনুসরণ করিয়াও সংস্কৃত শেখা যায়; কিন্তু

টোল, চতুষ্পাঠির মূলোচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে; হুতরাং সেই শিক্ষা পদ্ধতির পুনরাবর্তন অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে একটি অপ্রিয় সত্য বলা আবশ্যক। প্রাদেশিক ভাষায় উচ্চশিক্ষা দিবার জন্ত এখন প্রায় সমস্ত প্রদেশগুলিই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সমস্ত প্রাদেশিক ভাষা এক পর্যায়ের নহে; বাংলা বা তামিল ভাষা যতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে অল্প অনেক ভাষা ততটা পারে নাই। এখন ইংরেজী উচ্চশিক্ষার বাহন বলিয়া সব বিশ্ববিদ্যালয়ে মোটামুটি একটা মান রক্ষা সম্ভবপর। ভবিষ্যতে যখন প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইবে, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অল্প বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের বিভাগ পার্থক্য থাকিলেও, একই মর্যাদা দেওয়া হইবে।

৩

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের মূল গ্রন্থগুলির অনুবাদ প্রায় শতাব্দিক বৎসর পূর্বেই হইয়া গিয়াছে: অথচ বেদান্ত-দর্শন ইত্যাদি অনুবাদ অর্থসাধ্য নহে। অথচ ইংরাজীতে লিখিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলির কথা দূরে থাক, অর্থনীতি, রাজনীতি বা ইতিহাসগুলিরও অনুবাদ এখনও পর্যন্ত হইল না। যাহা হইয়াছে তাহা অতি সামান্য। ইহার নানাবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু সেই কারণগুলির আড়ালে বোধ হয় একটি সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দর্শনশাস্ত্রগুলি আমাদের দেশের; আমাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তি; হুতরাং আমাদের সহিত নাড়ীর যোগ আছে। হুতরাং ব্রহ্মহৃদের অনুবাদ ও আলোচনা দেশী ভাষায় করিতে ততটা বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু আধুনিক শাস্ত্রগুলি সমস্তই ইউরোপের দান; কেবল পদার্থবিজ্ঞা, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদি নহে, অর্থনীতি, রাজনীতি, এমনকি ইতিহাসও আমরা ইউরোপের কাছ হইতে শিখিয়াছি। ইউরোপেও বিজ্ঞান পীঠস্থান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া ও ইতালী।

ইউরোপের অন্তর দেশবাসীদেরও এই ভাষাগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটি আয়ত্ত করিতেই হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বর্তমান সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা; একটি পাশ্চাত্য ভাষা না জানিলে ইহার অযোগ্য গ্রহণ করা অসম্ভব। তাহা ইংরেজীও হইতে পারে, কিম্বা ফরাসী, জার্মান বা রাশিয়ান হইতে পারে। ইংরেজীর পক্ষে কয়েকটি যুক্তি আছে; আমরা অনেকেই ইংরাজি জানি; ইংরাজি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক, অভিধান প্রভৃতি সবই স্থলভ; এবং আমেরিকানদের কল্যাণে এখন ইংরাজিতে প্রায় অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত technical বই ও যান্ত্রিকপত্রগুলির অনুবাদ পাওয়া যায় এবং ইংরাজি ভাষার প্রসার ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে।

ইংরাজির বিরুদ্ধে একটি প্রধান যুক্তি এই যে আমাদের জনগণ (mass) ইংরাজি বোঝে না; সুতরাং ইংরাজিতে বই লিখিলে বা আইন প্রস্তুত করিলে তাহারা বুঝিতে পারিবেন না। এই যুক্তির প্রয়োগ গান্ধিজী আরম্ভ করেন। ইহার উত্তরে বলা যায় যে আমাদের দেশের জনগণ চায়, খাওয়া, বস্ত্র ও একটি মাথা জুজিবার জন্য কুঁড়ে ঘর। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার মহাশয়েরা কি বিষয় পঠন-পাঠন করেন, তাহা জানিবার জন্য তাহাদের কোনো কৌতুহল নাই। নতুন মহোদয়গণ যদি ‘জনগণের’ উচ্চ পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন ইত্যাদি শিক্ষার অযোগ্যের জন্য ব্যস্ত না হইয়া তাহাদের বরাদ্দ চাউল কয়েক শত গ্রাম বাড়াইয়া দিতে পারিতেন, তবে ‘জনগণও’ স্থখী হইত, এবং দেশের কল্যাণও হয়। তবে চাউলের বরাদ্দ বাড়াইতে গেলে দক্ষতা, চারিত্রিক বল ইত্যাদির প্রয়োজন, তদভাবে শিক্ষা-পদ্ধতির বিপর্যয় ঘটাইয়া বাহবা লওয়াই স্বকর। আমাদের শাস্ত্রে চরম শাসন ক্ষমতা বা দৈনিকত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে বলা হইয়াছে, কস্তূর, অকস্তূর অনর্থককস্তূর। অর্থাৎ, তিনি করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন, এবং অনর্থ করিতেও পারেন। আমাদের শাসকগোষ্ঠি যে কি করিতে

পারেন, তাহা এখনও সম্যক বোঝা যায় নাই, তাহারা যে কি করিতে পারেন না তাহা সকলেই অবগত আছি, এখন মনে হইতেছে যে তাহারা যে অনর্থ করিতে পারেন তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্যই তাহাদের বর্তমান প্রয়াস।

কিছুদিন পূর্বে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে হওয়াই রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর উদ্দেশ্য ছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে সেন মহাশয় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। সুতরাং তাহাদের উক্তির পর্যালোচনা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের একটি জীবন-দর্শন ও গান্ধিজীর কতকগুলি আদর্শ ছিল, উভয়েই বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ কখনই তাহা হইতে চ্যুত হন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাহার দর্শনের একটি রূপ দিবার জন্য শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহারা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিবর্তিত হইয়া উঠা একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া দাঁড়াইল; অর্থাৎ যেই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়কে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে কঠোর উপহাস করিয়াছেন, তাহার মৃত্যুর পর তাহার প্রতিষ্ঠান সেই রূপ গ্রহণ করিল। হয়ত এই সম্ভাবনা কবিশঙ্কর অজানা ছিল না, সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে তিনি গান্ধিজীকে বিশ্বভারতীর ভার নিতে অমুরোধ করেন, ও গান্ধিজী স্বীকৃত হন : কিন্তু তাহারা অকালমৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের আশা সফল হয় নাই। সুতরাং দেখা বাইতেছে যে রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে একমাত্র বৃদ্ধ গান্ধি ভিন্ন আর কেহই তাহার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন না। কাজেও তাহা হইল। কিন্তু যে পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধিজীর মত ব্যক্তির অপেক্ষা করে, সে পদ্ধতিতে দৈনন্দিন জীবনের অংশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর আদর্শের মূলে ছিল প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও যান্ত্রিক সভ্যতার বিরোধিতা। তাহাদের মতের অনেক অমিল থাকিলেও এই একটি জায়গায় দুজনের

মতানৈক্য ছিল। কিন্তু বর্তমান ভারতে কি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কি তাঁহারা কোন দিন চিন্তা করিয়াছেন? কিন্তু আজ তাঁহারা জীবিত থাকিলে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকে বোধহয় সমর্থন করিতেন। কারণ দেশের উন্নতির জন্য কোনো স্থলভ সমাধান নাই।

এই যান্ত্রিক সভ্যতার মূল পাশ্চাত্যে; পাশ্চাত্য ভাষার সহিত ইহার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। ভাষাকে বর্জন করিয়া ভাব গ্রহণ করা যায় না।

একটি বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করিতে হইলে সর্বদা তাহার অনুশীলন করিতে হয়। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ B. A. পর্য্যন্ত ফারসী ভাষা পড়িয়াছিলেন, এবং তিনি ঐ ভাষার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি পাটনার আইন ব্যবসারে যখন লিপ্ত ছিলেন, তখনও তাঁহাকে নিশ্চয়ই উর্দু দলীল পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু যখন পরিণত বয়সে Constituent Assemblyর President, তখন দেখা গেল তিনি উর্দু পড়িতে অক্ষম। (Objectives Resolution গৃহীত হইবার সময় উপস্থিত হইলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রথমে ইংরেজিতে মূল প্রস্তাবটি ও পরে হিন্দি অনুবাদ পড়িয়া বলেন : "I have got the Urdu translation also. Unfortunately I am not able to read it. I shall be glad if some other member could read it for me." শ্রীমোহনলাল সাকসেনা উর্দু প্রস্তাবটি পাঠ করেন। Constituent Assembly Debates, vol 1, 22nd January 1947, p.303) রাজেন্দ্র প্রসাদের ছাত্র অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরও যখন এই অবস্থা হয়, তখন ইংরাজিকে 'গ্রন্থালার ভাষা' করিয়া রাখিলে সাধারণ লোকেরা কি পর্য্যন্ত ইংরাজি বুঝিবে তাহা সহজই অনুমেয়।

এই প্রসঙ্গে জিভাষা সূত্রের কথা মনে পড়ে। প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করিবে, অথচ আন্তঃ-প্রাদেশিক কাজের জন্য হিন্দি ব্যবহার করিবে এবং আন্তর্জাতীয় কাজের জন্য ইংরাজি ব্যবহার করিতে পারিবে, এইরকম মহামেধাবী বিভাগাগর আমাদের দেশে আছে কি? থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা কত? সাধারণ ছাত্রদের কি অবস্থা হইবে? তাহারা যে প্রাদেশিক ভাষা ছাড়া একটি ভাষাও শিখিবে না, একথা একরকম নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

অনেকে প্রশ্ন করিতেছেন যে তবে কি ইংরাজি আমাদের চিরকালের জন্যই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার উত্তরে বলা যায় যে, আজ হইতে শত বর্ষ পরে কি হইবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন দেখি না। বর্তমানে রাজনৈতিক নেতাদের মনোভাব দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহারা এক শত বৎসরের জন্য নহে, মনুষ্যতির ছায় কয়েকহাজার বৎসরের জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরদের একটি দিক্‌দর্শন দিয়া বাইতে তৎপর। অর্থাৎ যাহারা বর্তমানে কি কর্তব্য জানে না, তাঁহারা ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিতে সক্ষম। সুতরাং তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য। অতএব তাঁহাদের উচিত বর্তমানে বাহাতে গৃহবিবাদ না লাগে, ভারত আবার শৃঙ্খিত না হয়, সেই বিষয়ে অবহিত হওয়া। ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ মহাকালের হাতে।*

* প্রবন্ধটি পূজা সংখ্যার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু ঘেরাতে পৌছানোর সে সংখ্যায় ছাপানো সম্ভব হয় নাই। সেজন্য আমরা দুঃখিত। জঃ সঃ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংকট

অরিন্দম সেন

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের সাম্প্রতিক কার্যের সমর্থনে ও প্রতিবাদে এ পর্যন্ত অনেক কিছুই বলা হয়েছে, করাও হয়েছে। পরিস্থিতি খুবই জটিল, সন্দেহ নেই। নানান মতের আবর্তে পড়ে সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা খুবই অস্বস্তিকর। স্পীকারের কংলিং-এর ফলে যে সমস্তার সৃষ্টি হয়েছে যে ভাবেই তার সমাধান হোক না কেন এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কারণ আজ হোক, কাল হোক অথবা চার বছর পরেই হোক নির্বাচনের সময় চূড়ান্ত বিচারের ভার নাগরিকদের উপরই ছাপ্ত হবে। তাই নিজস্ব মতগঠনের ক্ষমতা প্রয়োজনীয় সব রকম উপাদান তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে, নইলে রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘর্ষে তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীড়নকে পরিণত হবেন।

বাদী ও প্রতিবাদী সকল পক্ষই আত্মপক্ষ সমর্থনে সংবিধানের শরণ নিয়েছেন : রাজ্যপাল ১৬৪ (১) নং অমুচ্ছেদের উল্লেখ করেছেন ; স্পীকার ১৬৪ (২) নং অমুচ্ছেদের আশ্রয় নিয়েছেন এবং বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান নির্ভর করেছেন ১৬৪ (২) ও ৩৬৭ অমুচ্ছেদের উপর।

এই সমস্তার দুটি দিক আছে : একটি সাংবিধানিক, অঙ্কটি সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক। প্রথম প্রশ্ন হল রাজ্যপালের স্ববিবেচনায় কাজ করার ক্ষমতা সংবিধানসম্মত কি না? এই ক্ষমতা গণতন্ত্রবিরোধী কি না? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল : রাজ্যপালের এই ক্ষমতা যদি সংবিধানসম্মত ও গণতন্ত্রসম্মতও হয় তবুও এই ক্ষমতা প্রয়োগ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে

সমীচীন হয়েছে কি না? প্রথম প্রশ্নটি সংবিধানগত ও দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক ঔচিত্যের।

প্রথমে প্রথম প্রশ্নটির বিচার করা যাক। উপরে সংবিধানের যে সব অমুচ্ছেদের উল্লেখ করা হয়েছে সেইসব অমুচ্ছেদ ও অন্যান্য সম্পূর্ণ অমুচ্ছেদগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে,

(ক) রাজ্যপাল শুধুই সাংবিধানিক প্রধান নন (১৫৪, ১৫৯, ১৬৬, ১৬৭ ও ১৭৪ নং অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ;

(খ) সংবিধানের ১৬৩ (১, ২ ও ৩) অমুচ্ছেদে একথা স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, রাজ্যপালের স্ববিবেচনায় কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে যদিও ১৯৩৫-এর ভারতশাসন আইনের মত এই ক্ষমতাপ্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি পরিষ্কার ভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। এ অমুচ্ছেদটি সাধারণ ভাবেই প্রযোজ্য ; শুধু ৬ষ্ঠ ভাগিকার বর্ণিত আসামের রাজ্যপাল বা ২৩৯ অমুচ্ছেদে বর্ণিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলশাসনে রাজ্যপালের ক্ষমতার ক্ষেত্রে নয়) ;

(গ) সংবিধানের ১৬৩ (২) নং অমুচ্ছেদে রাজ্যপালকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে,—একমাত্র রাষ্ট্রপতি (ও রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার) ব্যতীত অন্য কেউই তাকে তার সিদ্ধান্ত (ও প্রয়োজন হলে, পদ) থেকে নড়াবার ক্ষমতা রাখেন না (১৫৬ নং অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ;

এবং (ঘ) সংবিধানের ১৬৪ (১) নং অমুচ্ছেদে রাজ্যপালকে মন্ত্রীনিয়োগের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ৩৬৭ নং অমুচ্ছেদে উল্লিখিত অনারেল কন্ডেজ্ঞ এ্যাক্ট (১৮৯৭)

এর ১৬নং ধারা অনুযায়ী তার অর্থ এই যে, মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাজ্যপালের আছে।

বর্তমান অধ্যক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনে কেন যে শ্রীনগেশের আলির কলিং-এব নজির দেখিয়েছেন তা বোঝা কঠিন। শ্রীআলি তার কলিং দিয়েছিলেন বিধানসভার বাজেট প্রস্তাব বাতিল হওয়ার পর অর্থাৎ Collective responsibility-র নীতি অনুযায়ী মন্ত্রিসভার পরাজয়ের পর এবং যথেষ্ট সময় পাওয়া সত্ত্বেও আত্মপক্ষসমর্থনে কোন আত্মসম্মতিকপ্রস্তাব আনায় মন্ত্রিমণ্ডলীর ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হওয়ার পর—তার আগে নয়। এক্ষেত্রে সেরকম কিছুই করা হয়নি। সরাসরি বিধানসভার মতামত আনার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সভার উপর স্পীকার তার নিজস্ব মত চাপিয়ে দিয়েছেন। অপরপক্ষে রাজ্যপাল সব সময়ই বিধানসভায় শক্তিনির্ধারণের উপর জোর দিয়েছিলেন।

রাজ্যপাল ও স্পীকারের সাংবিধানিক ক্ষমতার পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে মন্ত্রিমণ্ডলীর নিয়োগ ও বরখাস্ত করা ও বিধানসভা ডাকার যে ক্ষমতা রাজ্যপালের আছে সে ক্ষমতার উপর নিজস্ব বিচার চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা স্পীকারের নেই। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যা করেছেন তার যে নজির নেই তাও নয়। ১৯৩১ সালে ইংল্যান্ডে রায়মন্ড ম্যাকডোনাল্ডের দলত্যাগ ও মন্ত্রিসভা-গঠনের কথা স্মরণ্য। এক্ষেত্রে স্পীকার শুধু সংবিধানের একটি ফাঁকের সুযোগ গ্রহণ করে সাময়িক সংকটের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের শাসনতন্ত্রে স্পীকারকে সরাসরি উপায় রয়েছে। (১৭৯-১৮১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য); কিন্তু এই অবস্থায় বিধানসভার অধিবেশন ডাকলে সুরক্ষিত স্পীকারকে বাদ দিয়ে সভার কাল চালানো যাবে কি না—এই বিষয়ে সংবিধানে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। নানান গণ্ডিত নানান ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, রাজ্যপালের এই ক্ষমতার তাৎপর্য

কি এবং এই ক্ষমতা গণতন্ত্রসম্মত কি না? আপাতদৃষ্টিতে দেখলে ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় শাসনের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্র নিতান্তই সীমিত। এটা ভালো কি মন্দ সে-প্রশ্ন এখানে আলোচনা নয়। শুধু একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, ভারত বিভাগ, নানানরকম বিভেদমূলক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপরিচালনার ফলে উদ্ভূত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা—এই সব কারণ বিচার করলে এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, শাসনতন্ত্রচয়িতারা কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কথাই ভেবেছিলেন—সম্পূর্ণরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থার কথা নয়। রাজ্যপালের ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রশ্নের সব কিছুই নির্ভর করছে আমাদের শাসনতন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যের উপর। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা বিকেন্দ্রিক তবে রাজ্যপালের স্ববিবেচনায় কাজ করার ক্ষমতার যৌক্তিকতা সন্দেহে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। এই দুই ক্ষেত্রে (অর্থাৎ যে রাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য উভয়েরই সমান প্রাধান্য এবং যে রাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলি প্রধান, কেন্দ্র গোণ) রাজ্যপালের এই বিশেষ ক্ষমতা গণতন্ত্রবিরোধী বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু যে শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকৃত ও অঙ্গরাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা সীমিত, সেই শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই পরস্পর বিরোধিতার কোন সংগত কারণ আছে কি না ভেবে দেখা উচিত। কেন্দ্রীয় শাসন-যদি অগণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত হ'ত অথবা যদি রাজ্যপালের এই বিশেষ ক্ষমতার উপরে গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার কোন জোর না খাটত তা হ'লে এই নিরক্ষুশ ক্ষমতা যে গণতন্ত্রবিরোধী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকত না। কিন্তু (১) আমাদের রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত ও (২) সংবিধানের ১৫৬

নং অমুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যপালের এই ক্ষমতা নিরক্ষর নয় — তিনি রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ প্রতিনিধি। স্পষ্টতঃই রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি। রাষ্ট্রপতি (ও কেন্দ্রীয় সরকারের) বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা রাজ্যপালের নেই; কোন রাজ্যপাল যদি সে চেষ্টা করেন, তবে তাকে তার আসন থেকে সরে যেতে হবে।

আমাদের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির স্ববিবেচনায় কাজ করার ক্ষমতা নেই। এই সংগে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও অপসারণের পদ্ধতি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর সংগে এক যোগে কাজ করতে হয় (৫৪, ১৫, ৬১ ও ৭৪ দ্রষ্টব্য)। তার স্ববিবেচনায় কাজ করার ক্ষমতা নেই। এই ক্ষমতা থাকলে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীকে উপেক্ষা করে স্ববিবেচনায় কাজ করতে পারতেন ও তার এই ক্ষমতা নিরক্ষর হ'ত। ফলে সংসদের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হ'ত। কিন্তু এই ধরনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়ার ইচ্ছা সংবিধান রচয়িতাদের ছিল না। সেই কারণেই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার বর্ণনায় কোথায়ও 'in his discretion' এই শব্দসমষ্টির ব্যবহার করা হয়নি।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ১৬৪ (২) নং অমুচ্ছেদে শুধু ক্যাবিনেট প্রধার মূল অঙ্গটি স্বীকৃত হয়েছে। ১৬৩ (১, ২ ও ৩) ও ১৬৪ (১) নং অমুচ্ছেদে কেন্দ্রপ্রধান যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার যে মূলনীতি দৃষ্ট হয়েছে তার সংগে এর কোন বিরোধ নেই। একে অস্ত্রের সম্পূরক মাত্র।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটির আলোচনা করা যাক। প্রশ্ন হ'ল: পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না কেন? যুক্তফ্রন্ট সমর্থকদের মতে ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হরভো ফ্রন্ট সমর্থক সর্বভারতীয় নেতাদের চেষ্টায় কয়েকজন দলত্যাগীদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হ'ত এবং কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্যেরও সমর্থন পাওয়া যেত। এই আশা দৃঢ়ভিত্তিক কিনা সন্দেহ আছে।

কারণ: এ রাজ্যে দলবদলের (ও দলবদলের চেষ্টা) প্রকৃতি ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যা ঘটেছে ও ঘটছে তার মত নয়। (দলবদলের হারও অনেক কম।) পশ্চিমবঙ্গে ফ্রন্টত্যাগের মূল কারণ হ'ল কম্যুনিষ্টদের সংগে কাজ করার তিক্ত অভিজ্ঞতা। যারা নির্বাচনোত্তর যুক্তফ্রন্টের সমর্থক হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই (বিশেষ করে বর্তমান পি. ডি. একের সকলেই) কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট বিরোধী মঞ্চ থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের মধ্যে চার জন আবার নির্বাচনে কংগ্রেস এবং বাম ও দক্ষিণ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রার্থীদের হারিয়ে জয়ী হয়েছিলেন। বর্তমানে কম্যুনিষ্ট সংসর্গ ত্যাগ করে তারা যে নির্বাচক মণ্ডলীর রায়ের বিরুদ্ধে গেছেন একথা বলার যুক্তি খুবই কম। নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্বও ছিল না, কংগ্রেস-বিরোধী শক্তিশালী নির্বাচনী ঐক্যও বাম ও দক্ষিণ কম্যুনিষ্টদের কোন্দলের ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আসলে বাম কম্যুনিষ্টরা ফ্রন্টের অন্ত্যন্ত দল, সরকারী নীতি ও অকম্যুনিষ্ট মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে বিধাবোধ করেনি। এ রাজ্যে কম্যুনিষ্ট দল দুটির সাংগঠনিক শক্তি বেশী হওয়ায় কোন কংগ্রেসবিরোধী ফ্রন্টে অকম্যুনিষ্ট দল ও ব্যক্তিদের পক্ষে বৈধ বজায় রেখে কাজ করা নিতান্তই দুর্বল। তাই কম্যুনিষ্টদের নিয়ে গঠিত ফ্রন্টের কার্যকারিতা সন্দেহ প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল। তাই একটি অকংগ্রেসী অকম্যুনিষ্ট সরকার গঠনের কথা অনেক আগেই অনেকে ভেবেছিলেন।

চরমপন্থী বাম কম্যুনিষ্টরা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তাই তারা এর বাইরে থেকে বিপ্লব ঘটাতে চায়। অপর পক্ষে নরমপন্থী বাম কম্যুনিষ্টরা সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশ গ্রহণ করে প্রমাণ করতে চায় যে, এ পদ্ধতি অচল।

[লেখাংশ ৫৮৭ পৃষ্ঠায়]

নিবেদিতা ও জাতীয় শিক্ষা

রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার

এক

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের কাহিনী যারা জানেন, তাঁরা খুব সহজেই নিবেদিতার জীবনের সঙ্গে তাঁর মিল খুঁজে পাবেন। বিবেকানন্দের তখনও ছনিয়া-জোড়া নাগ হয়নি। তিনি তখন নরেন্দ্রনাথ। গুরুতর বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক সংকটে তাঁর মনের শান্তি নেই। ও নিবেদিতা সেই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের।

এই মানুষটির সঙ্গলাভ করার পর ধীরে ধীরে তাঁর সংকট কেটে গেল। দেখার আছেন, এ বিষয়ে তিনি শুধু পুঁথিগত সংবাদ জানলেন না, একটি মানুষের জীবনের দৃষ্টান্ত থেকে তিনি তাঁর সজীব প্রমাণ পেলেন এবং নিজ সাধনার যোগে তা উপলব্ধি করলেন। মনের অন্ধকার দূর হ'ল। ধর্মের নতুন এবং জীবন্ত অর্থ তাঁর কাছে শরীরী রূপে দেখা দিয়েছিল বলেই নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে রূপান্তর।

এই সংকট মিন্‌ মার্গারেট নোবেলের জীবনেও দেখা দিয়েছিল। খৃষ্টীয় চার্চের নিষ্ঠাধর্মচার তাঁর মনে শান্তি দিচ্ছিল না। অথচ, মনে তাঁর ধর্মের ষড়ার্থ রূপ জানার জন্তে ঐকান্তিক আগ্রহ। অস্তি ও নাস্তির দোলায় চিত্ত তাঁর অশান্ত। এমন সময় ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি লগুনের ওয়েস্ট এণ্ডের এক ভদ্রমহিলার ড্রয়িং রুমে কয়েকজন জিজ্ঞাসুর সঙ্গে মার্গারেটও এলেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে এই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। তারপর আস্তে আস্তে তাঁর আধ্যাত্মিক সংকট কাটলো। বিবেকানন্দের মধ্যে তিনি ধর্মজিজ্ঞাসার জীবন্ত সার্থকতা খুঁজে পেলেন।

কুমারী মার্গারেট নোবেলের জীবনে অভূতপূর্ব রূপান্তর এল। ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের জানুয়ারীতে গুরুত্ব নির্দেশ পেয়ে মার্গারেট ভারতের বুকে জীবন উৎসর্গ করতে এগিয়ে এলেন। ২৮শে জানুয়ারী কলকাতায় উপস্থিত হলেন। ২৫শে মার্চ স্বামিজী তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দান করে বললেন, “যাও, যিনি বুদ্ধদেবের পূর্বে পাঁচশত বার অপরের জন্ত জন্মগ্রহণ ও প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর।” এই সময়েই স্বামিজী তাঁর নাম দিলেন নিবেদিতা। তিনি ঈশ্বরের চরণে, ভারতবর্ষের সেবায় নিবেদিত হলেন। নিবেদিতার তুলনাহীন আত্মনিবেদন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য ক্ষমতা আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই।’

দুই

এই আত্মোৎসর্গই নিবেদিতাকে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ‘কর্মযোগের’ ভূমিকা নিতে প্রেরণা দিয়েছে। ভারতের কল্যাণের জন্তে শিক্ষার বিস্তার একান্ত প্রয়োজন। স্বামিজী বারবার বিভিন্ন বক্তৃতায় চিঠিতে এর উপর জোর দিয়েছিলেন। জী-পুরুষ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সমস্ত ভারত-বাসীর মধ্যে শিক্ষার আলোক ছড়িয়ে দিতে বলেছেন। ভারতের বহু রোগতাপের অব্যর্থ চিকিৎসা হিসেবে শিক্ষাকে নির্দেশ করেছেন। স্বযোগ্য শিক্ষা নিবেদিতাও তাই প্রধানতঃ ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেই নিজের কর্মপদ্ধতিকে প্রয়োগ করেছিলেন। প্রধানতঃ বলছি এই কারণে যে,

নিবেদিতার অবদান জনজীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে। ভারতীয় ইতিহাসের সেই সন্ধিলগ্নে তাঁর কল্যাণ হস্তের স্পর্শ সমস্ত কিছুর উপরই পড়েছে। স্বাধীনতাসংগ্রাম, সাহিত্য-শিল্প, আর্থসেবা, ধর্মপ্রচার সবনিকেই তাঁর দান স্বীকৃত। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সাধনা যথার্থ 'কর্মযোগ'। আর ভারতীয় জীবনগঠনে শিক্ষার প্রয়াস চিরকালের সমাজ-সংস্কারে স্বাক্ষরে চিহ্নিত থাকবে। স্বাধীনতা শিক্ষার স্থান এবং সমাজ গঠন পাশাপাশি না থাকলে স্বাধীনতা যে অপূর্ণ থাকে তার বড় প্রমাণ আজকের বিপর্যস্ত ভারত। রাজনৈতিক স্বরাজ আর পূর্ণ স্বাধীনতার কী আকাশ-পাতাল দূরত্ব! ভারতের অগণিত লোক না খেয়ে মরছে, রাজনৈতিক নেতারা দিশেহারা, গ্রাম ও শহরের বিরাট সংখ্যক নরনারী এখনও অন্ধকার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। শুধু আইন করে সমাজজীবনে পরিবর্তন আনা যায় না, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও যুগ্মাঙ্গিক পরিবর্তন দরকার। আইনে বলবে, বিয়েতে পণ নেওয়া চলবে না। লোকাচার তখন টাকার হিসেবে পণ নেবেনা। উপহার দেবার নামে পণের চাইতেও নিন্দনীয় দেওয়া-নেওয়ার নাটক চলবে। আইন বলছে, জাতিভেদ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু, কলকাতা শহরের অশিক্ষিত বাবুরা পর্যন্ত রাস্তায় 'কুলীন' বামুন না রেখে মনে শাস্তি পান না। বামুনটি হয়ত অল্প প্রদেশের ভিন্নজাতের লোক। কিন্তু বাবুর মান রাখার চেষ্টাই ঐ চণ্ডাল-পুজবের গলায় স্মৃতি। যজ্ঞোপবীতের এমন অপমান হামেশাই দেখা যায়। যুগযুদ্ধ, যুগান্তর, সংস্কারযুক্তি যাই বলুন না কেন, সবার আগে মানসিক প্রত্যয়ের জন্মান্তর দরকার। আর তার জন্মে অগ্রাধিকার শিক্ষার, যথার্থ শিক্ষার। পুণ্ডিত বা জীবন-বিমুখ শিক্ষা ভারতকে অবনতির চরম সীমায় নানিয়েছে। বিজ্ঞানের গবেষক অনেক সময় বৈজ্ঞানিক মনোভাবকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর কৃত্তিষ্ণের উৎসব পালন করেন

কালীবাড়ীতে ছুটি নিরপরাধ নিরীহ পাঠার সন্তানকে বলি দিয়ে। দৈবর গুপ্তের কবিতায় আছে, পাঠার বোকা নাম হতেই পারে না। কারণ মানুষের জন্মে আত্মত্যাগে প্রতিটি ছাগনন্দন দ্বিতীয় দধীচি। কিন্তু দধীচির আত্মদানে বজ্র নির্মিত হয়েছিল। ছাগশিশুর আত্মদানে মানব সন্তানদের রসনার দৈর্ঘ্য বাড়ে মাত্র। বর্তমান জগতে দধীচির ত্রুত নিয়ে এসেছিলেন নিবেদিতা। সমস্ত রকম মানবিকতা-বিরোধী সংস্কারগুলি তাঁর আত্মত্যাগের মহিমায় ম্লান হয়েছে। নিবেদিতার এই দধীচি-ত্রুতের প্রধান অঙ্গ শিক্ষা। যথার্থ ভারতীয় শিক্ষা। আইরিশ ছুহিতা নিবেদিতা ভারতকে জন্মভূমির আগনে বসিয়ে এই মাতৃস্বল্পার সেবার জীবন পাত করে গেলেন।

আজ কল্পনা-দৃষ্টিতে একটি ছবি ভাসছে। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের প্রাঙ্গণে স্বামিজীর পাশ্চাত্য শিষ্যশিষ্যারা দাঁড়িয়ে। পবিত্র মন্দিরে স্নেহাচার অচল, বিধর্মীর প্রবেশ নিষেধ। নিবেদিতার মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নেই। অঞ্জলিবদ্ধ অবস্থায় নিবেদিতা দাঁড়িয়ে আছেন মন্দিরের দিকে মুখ করে। চোখে জলের ধারা। মায়ের মন্দিরে ঢোকায় অধিকার তাকে সেদিনের অন্ধ পুজারীরা দিলনা। কিন্তু মা তো প্রবেশ করলেন তাঁর স্বপ্নে। নিবেদিতার চোখের জল পবিত্রতার আত্মবী-ধারা, স্বপ্নে তাঁর মাতার নিবেদিতার শক্তির অস্ত্র মন্দির। নিবেদিতা ভারতকে ভারত দৃষ্টি চিনেছিলেন বলেই সত্যিকার ভারতীয় শিক্ষার রূপায়ণও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। তাঁর শিক্ষাচিন্তা বাস্তব-বুদ্ধি এবং তত্ত্ববুদ্ধির সমন্বয়ে গঠিত। ভারতে আগার আগেই গেন্ডালফসি এবং ঋষবলের শিক্ষাচিন্তার ধারাসূরণে তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং শিক্ষিকার কাছে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। নিবেদিতা ছিলেন জাত শিক্ষিকা এবং জন্মব্যাপী ছাত্রী।

ভিন

নিবেদিতার শিক্ষাচিন্তার বিভিন্ন দিকের প্রতি পাঠকদের নিয়ে যাবার আগে আরেকবার বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর মিলের অল্প একটা দিক স্মরণ করবো। বিবেকানন্দ প্রথমেই

শ্রীরাঘবকৃষ্ণকে গুরু বলে মানেননি, তাঁর সব গুরু শিষ্যের কথা বিনা বিচারে মাথা পেতে নেননি। সম্পর্ক ভারতীয় শাস্ত্রে আছে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্তে শিক্ষার্থীর নিরন্তর ‘পরিপ্রসন্ন’ দরকার।

ভারতীয় শিক্ষায় গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের এই ধারার বিশেষ নাম ‘বাদ-বিচার’। জিজ্ঞাসা, পরিপ্রসন্ন, তর্কের মধ্য দিয়ে শিষ্য গুরুর কাছ থেকে আসল কথাটি জেনে নেন। তবে এই ‘বাদ-বিচারে’ শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধা বা অমুরক্তির অভাব নেই, গুরুর প্রতি ভক্তি এবং ভালোবাসার বশেই তো তাঁর জিজ্ঞাসার উৎপত্তি এবং সমাপ্তি। আজকালকার যুগের ইস্কুল-কলেজের ছাত্র শিক্ষককে ঠকাবার জন্তে প্রশ্ন করে মুচকি হাসে এবং শিক্ষকও অনেক সময় অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞাস্য ছাত্রের ভূষণ না মিটিয়ে তাকে দাবিয়ে দেন। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষকের প্রতি ছিল ছাত্রের শ্রদ্ধা, ছাত্রের উপর শিক্ষকের ছিল অমুরাগ এবং উভয়ের মধ্যে যথার্থ তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে শিক্ষা বাস্তব রূপ নিত। স্তুনেছি, স্বর্গত দার্শনিক ব্রহ্মেন্দ্রনাথ শীল তাঁর নতুন একটি বই তাঁর একজন প্রাক্তন ছাত্রকে উপহার দেবার সময় ছাত্রটির নামের নীচে লিখেছিলেন, ‘শ্রদ্ধাশ্রমে’। বিহ্বল ছাত্রটি নিজেকে অপরাধী মনে করে তাঁর কাছে ছুটে গেলেন। তিনি তাঁকে অবাক করে দিয়ে বললেন, ‘তোকে শ্রদ্ধা জানাবোনা তো কাকে জানাবো? তুইই তো আমাকে বিকশিত করেছিস তোর আগ্রহ এবং জিজ্ঞাসার আঘাতে আঘাতে’।

শ্রীরাঘবকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ ছিলেন এই ধরনের গুরু-শিষ্য। শ্রীরাঘবকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলতেন সব সময় বাজিয়ে নিয়ে তাঁকে গ্রহণ করতে। অন্ধভক্তির আনুগত্য নয়,

সাধকের সন্ধানে তৎপর থেকেই গুরুকে শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে স্বামিজীর সম্পর্কও ঠিক এই রকম ছিল। প্রশ্নে প্রশ্নে নিবেদিতা তাঁর কাছ থেকে জানতে চাইতেন। বিচার-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে অন্ধ গুরুভক্তির আরতি বিবেকানন্দ নিবেদিতা কারোরই ছিলোনা। বিশেষতঃ নিবেদিতা আজীবন গুরুর উদাহরণ অনুসরণ করেই স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির জয়যাত্রা বজায় রেখেছেন। এজন্তে দুঃখ তাঁকে কম পেতে হয়নি। বন্ধু বান্ধবেরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছে, আত্মীয়-পরিজন থেকে দূরে নিবেদিতার সাধনার বেগী নির্মিত হয়েছে। সেই সাধন-বেদীর একটি ছোট্ট অথচ স্মরণ অতিব্যক্তি সেদিনকার নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত নারী শিক্ষায়তন। আজ নিবেদিতা স্কুলের নামও প্রচার হয়েছে অনেক। কিন্তু সেদিন এই ছোট্ট স্কুলের কর্মক্ষেত্রেই মহীয়সী নিবেদিতার বিকাশ দেখা গিয়েছিল। রক্ষণশীল গৌড়া হিন্দুসমাজ তাঁর ইস্কুলে মেয়ে দিতে চাইতেন না, তাঁর ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতেন। ছাত্রী জোগাড় করা ছিল সমস্যা। ধীরে ধীরে অবশ্য এইসব অস্ববিধে দূর হয়েছে এবং কাগজপে নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় একটি আদর্শ জীশিক্ষায়তনে পরিণতি লাভ করেছে।

চার

নিবেদিতার জীশিক্ষা সম্বন্ধে যে ধারণা তার অনেকখানি নিজের বিদ্যালয়ে রূপদানের চেষ্টা করতেন। ভারতীয় নারীরা প্রাচীনকালে আদর্শনিষ্ঠা, কর্মশক্তি, বুদ্ধি, শাস্ত্রচর্চা কোনো দিকেই পিছপা ছিলোনা। কালক্রমে ভারতের মেয়েদের সেই সমুন্নত প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়েছে।

নারীশিক্ষা সমাজজীবনে তারা অবহেলিত হয়ে, সমাজের নিফল ভারবাহী জীবনযাত্রা পর্ববসিত হয়েছিল। নিবেদিতা চেয়েছিলেন, ভারতীয় নারীর শিক্ষার কেন্দ্র মূল থাকবে ভারতীয়তা। স্বামিজী

বলতেন, ভারতের আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। পবিত্রতা, আত্মত্যাগের স্তমহান ঐতিহ্যে তাদের প্রতিষ্ঠিত করে আধুনিক যুগের মনোভাব জাগাতে হবে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্তে এমন কিছু কাজ শেখাতে হবে যাতে নিজের জীবিকার সংস্থান হয় এবং পরিবারের গলগ্রহ না হতে হয়। সেই জন্তেই নিবেদিতা বলেছেন, ‘ভারতীয় আদর্শের অর্চনা ছাড়া কোনো সার্থক জীর্ণাঙ্গ হতে পারে না। সেই আদর্শ রূপ লাভ করেছে তার ইতিহাস এবং বীর গাথাপূর্ণ সাহিত্যে।’ কিন্তু এই আদর্শ সামনে রাখলেও একথাটি সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় নারীকে কর্মক্ষেত্রেও কুশল এবং দক্ষ হতে হবে—‘But woman must undoubtedly be made efficient.’

এই দক্ষতা এবং আদর্শের মিলিত রূপ তিনি পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক ভারতের নারীদের মধ্যে দেখেছেন। পত্নীশ্বের আদর্শ দেখেছেন সতী, সাবিত্রী অথবা সীতার মধ্যে। কুমারীশ্বের আদর্শ উমাতে, নারীশ্বের পূর্ণপ্রতিফলন গান্ধারীতে। ঐতিহাসিক যুগের নারীরা কেউ জীবনের সংকট লগ্নে, কেউ রাজ্যশাসন এবং যুদ্ধে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সংকটে পদ্মিনী, চাঁদবিবি এবং কাঁসীর রাণীর বীরশ্বের তুলনা কোথায়? ভক্তির, সাধনা এবং কবিশ্বের মূর্তিরূপা মীরা বাঈ। প্রশালনে রাণী ভবানী, অহল্যা বাঈ এবং জাহ্নবী।

ভারতীয় নারীর শিক্ষার প্রথম যুগে যেমন রামমোহন এবং বিজ্ঞানগণের মত যুগন্ধর পুরুষেরা এগিয়ে এসেছিলেন, তেমনি অদম্য উৎসাহ, সহানুভূতি এবং ভারতীয় দৃষ্টি নিয়ে একদল ত্যাগী যুবককে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্তে নিবেদিতা ডাক দিয়েছেন। নারীদের স্বনির্ভর হতে হলে নিজেদের সমস্তা নিজেদেরই মেটাতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের এই ছিল অভিমত। কিন্তু সে পথ বহুদূরে। তার আগে পুরুষকে অনেকখানি কাজ এগিয়ে দিতে হবে।

আর এতে অ-গৌরবেরও কিছু নেই। নারীশিক্ষার জগতে পুরুষকে এগিয়ে আসতে দেখে কেউ যদি হতাশ হন, তাকে নিবেদিতা এই কথা স্মরণ করতে বলেন, ‘...is she not mother of man as well as of woman?’ সেই ‘ভূম্যা দেবী’র হৃৎমোচনে নর-নারীর সমান অধিকার। মাতার হৃৎযোচাবার দায় কি ছেলের নয়? কিন্তু এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বারবার মনে রাখতে হবে, বিক্রম সমালোচনা বা নিরুৎসাহবাচক কথায় কিছু কাজ হবে না। নারীদের শক্তি-সম্ভাবনাতে আস্থা রেখে, তাদের শিক্ষার কাজে এগোতে হবে এবং সব সময় মনে রাখতে হবে, ‘Only by the love of our own people can we learn the love of humanity and only by a profound belief in the future of the Indian woman can any man be made worthy to help in bringing that future about.’

পাঁচ

নিবেদিতা অগণিত সাধারণ ভারতবাসীর শিক্ষার জন্তে খুবই চিন্তিত ছিলেন। জনসাধারণের শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজী চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু পড়া, লেখা এবং হিসাবের (reading, writing, arithmetic) বুনিয়াদী বিজ্ঞান করতাই বহু সময় এবং চেষ্টা দরকার। শুধু প্রাথমিক ও নাম লই করতে পারার মধ্যে যে কতখানি জনশিক্ষা নিজের উপর বিশ্বাস করে আসে, তা একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়। যে লোকটি টিপ সই দেয় এবং যে লোকটি নিজের নাম জাঁকা-বঁাকা অক্ষরেই লই করে,—এই দুয়ের মধ্যে বিস্তর তফাৎ, অন্ততঃ আত্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে। ভারতীয় জনসাধারণকে সাক্ষর করে তোলাও একটা বড় কাজ। জনশিক্ষা ব্যতীত জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। একথা নিবেদিতা মনে-প্রাণে বুঝেছিলেন

কলেই অগণিত ভারতবাসীকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার কালকে তিনি এত বড় মনে করতেন। এই বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্তে তাঁর প্রস্তাব ছিল, কলেজ বা বিদ্যালয় শিক্ষাশেষে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তদের গ্রামাঞ্চলে তিন বছরের মত জনশিক্ষার কাজে আবশ্যিকভাবে যোগ দিতে হবে। অধুনা যেমন এদেশে সময় শিক্ষাগ্রহণ প্রায় আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি নিবেদিতা একদল শিক্ষাসৈনিক গড়ে তোলার প্রস্তাব করেছিলেন। অবশ্য একথাও বলেছিলেন, যে ছাত্রের শিক্ষা সমাপ্তির উপর তার মা-বাবা ভাই বোনের ভরণ-পোষণের দায় নির্ভর করছে, তাকে এই পরিকল্পনা থেকে বাদ দিতে হবে। আজকাল স্তন্যপাই গ্রামাঞ্চলে ডাক্তারের অভাব পূরণের জন্তে ডাক্তারী পরীক্ষা শেষে হবু ডাক্তারদের কয়েক-বছরের জন্তে গ্রামাঞ্চলে কাজ বাধ্যতামূলক করার কথা সরকার ভাবছেন। অমূল্য পরিকল্পনাই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিবেদিতার ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে স্তন্যপাই, এর মধ্যেই হবু ডাক্তাররা সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করছেন। অগণিত দেশবাসীর টাকায় পুষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের শিক্ষা দেশবাসীর রক্ষণানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষিতরা যদি অন্ততঃ কটি বছরও অশিক্ষিত দেশবাসীর সেবায় ব্যয় করতে না চান, তবে বিবেকানন্দের মতে তাঁরা 'দেশদ্রোহী', 'বিশ্বাসঘাতক'।

এই শিক্ষানীতির প্রত্যক্ষ ফল হল জনসংযোগ। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যকার সীমাহীন দূরত্ব এ থেকে ভেঙ্গে যাবে এবং তথাকথিত বাবু দেশের মানুষের সত্য পরিচয় লাভের সুযোগ পাবেন। এই গ্রামশিক্ষকগণের খরচ অনেক সময় গ্রামবাসীরাই স্বেচ্ছায় বহন করতে পারবেন। কিন্তু পরিবর্তে তাঁদের গ্রামজীবনের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। আজকালকার যুগের গ্রামসেবক বা সেবিকাদের মত আধুনিক আধুনিকা সেজে গ্রামের কাজ হবে না। বরং দান ও গ্রহণের প্রাণপ্রদ

আবহাওয়ার পুরোপুরি একটি সমাজবোধ গড়ে উঠবে—
'...so the teacher and the taught make the perfect social unit.'

ছয়

নিবেদিতা ভারতে আসার আগেই শিক্ষকতার কাজে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এবং শিশু শিক্ষা দেশবিদেশের শিক্ষাবিদগণের চিন্তার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। ভারতে আধুনিক পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার সমস্তাটি নিবেদিতাকে কম ভাবায়নি। পেটালুগি ও তাঁর ভাবশিষ্টা ফ্রবেলের শিক্ষাপদ্ধতি এ প্রসঙ্গে তাঁকে সাহায্য করেছে। ফ্রবেলের শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথাই হচ্ছে, শিশুকে স্বাভাবিক পরিবেশে আনন্দদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতে হবে। এই ধারণা নিয়েই কিগার-গার্টেন শিশু-শিক্ষালয়ের আবির্ভাব। নিবেদিতা কিগার-গার্টেনকে বলেছেন শিশু উদ্যান (garden of children)। উদ্যানে যেমন চারাগাছ আকাশ-মাটি জল-হাওয়ার স্বাভাবিক পরিবেশে হ্রদর হয়, তেমনি মানব শিশুও ঘীর ঘীরে বিকশিত হবে এবং আনন্দের আবেগে তার মনের বিকাশ ঘটবে। ফ্রবেল শিশুদের শিক্ষার জন্তে কতকগুলি উপহারের (gift) প্রবর্তন করেছেন। এগুলি একদিকে যেমন খেলনা, অল্পদিকে শিশুর কৌতূহলের আকর। এই কৌতূহল বর্ধনই তো শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। ফ্রবেল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান খুব ধরচ-সাপেক্ষ। এজন্তে নিবেদিতা ভাণ্ডারীয় পরিবেশে কম ধরচে শিশু উদ্যান পরিচালনা করার কথা বলেছেন। ভারতীয় শিশু জন্ম থেকেই কতকগুলি ব্রতপালন করে। এগুলি পালনে তার কষ্ট হয়, কিন্তু সার্থক সম্পাদনে তার মানসিক তৃপ্তি। ব্রতের মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিশু স্বাভাবিকতাবেই কষ্টসম্ভব আনন্দ এবং মানসিক উৎকর্ষ লাভ করে। এই অল্পময় ব্রতপালনের সঙ্গে ফ্রবেল-পদ্ধতির যোগ হতে পারে

কতকগুলি ভারতীয় খেলনার সরবরাহে। যেমন মাটির পুতুল, মাটির নানারকম আকৃতিবিশিষ্ট গঠন। মোটকথা শিশুকে ভয় দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় না। আনন্দ দিয়ে তাকে বেশে আনিতে হয়, এবং সেই আনন্দ থেকেই তার শিক্ষার উদ্ভব হয়। অবশ্য এই আনন্দের শিক্ষা তাকে আত্মের ছলনা করে না, কষ্ট পেতে পেতে আনন্দলাভ করতে শেখায় এবং ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ মানব-ব্যক্তিত্ব অর্জনের জন্য তাকে প্রস্তুত করে। খেলনা, আনন্দ এসবের মধ্য দিয়ে শিশুশিক্ষার ঝাঁপা বিরোধী তাঁদের প্রতি নিবেদিতার উত্তর—“The joy that the child feels there is the joy of self-control, the joy of energy and absorption, the joy of work.”

সাঁজ

শিক্ষাব্যবস্থায় হাতের কাজ বা কারুশিল্পের গুরুত্ব সম্বন্ধে আজকাল নানাজায়গায় আলোচনা হিচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থায় ‘Manual Training as a part of হাতের কাজ General Education in India, ৩ প্রবন্ধে নিবেদিতা এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তার সার সংকলন করে বলা যায়, সাধারণ এবং বিশেষ শিক্ষা—উভয় ক্ষেত্রেই কারুশিক্ষার (manual training) অসাধারণ গুরুত্ব। আমাদের শিক্ষা তত্ত্বভিত্তিক, জীবনবিমুখ। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য—ব্যক্তিত্বের উন্নীকন, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি। শুধুমাত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অথবা শুধুমাত্র কারিগরী শিক্ষায় মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিপুষ্ট হতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্রে তাই ‘কারিক শিক্ষণ’ ও একটা তত্ত্ব, তবে জীবনভিত্তিক তত্ত্ব। এই পদ্ধতির শিক্ষা চালু করতে গিয়ে আমাদের দেশে বুনিয়েদী শিক্ষার (Basic Education) প্রবর্তন হয়েছে। এই বুনিয়েদী শিক্ষাকে সাধারণভাবে বলা হয়, ‘কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা’ (work

centered)। একটি বিশেষ হাতের কাজকে (craft) কেন্দ্র করে একটি বিষয়ের শিক্ষাকে পরিচালিত করতে হয়। তত্ত্ব বা জানছি, কাজে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি। বইয়ে যা পাচ্ছি, চোখে তা দেখার চেষ্টা করছি। এজন্তে চোখ-কান (audio-visual)কে এই শিক্ষায় সমান সমাগ রাখতে হয়। শুধু মুখস্থ নয়, ধাতস্থ করতে হয়। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের দেশের অভিজাত এবং বড়লোকেরা বুনিয়েদী বিভাগে ছাত্র ভর্তি করতে ভয় পান। পিতা-মাতার ভয়, ছেলে বুদ্ধি হাতের কাজেই শুধু শিখবে, বুদ্ধিজীবী (আন্তেলেক-চুয়াল) হবে না। আন্তেলেকট-এর সঙ্গে যে জীবনবিমুখতার যোগ নেই—এ কথা তাঁরা বুঝতে চাননা। এদেশে শুনি, জাতীয় ভাষার একনিষ্ঠ প্রচারক নিজ ছেলেকে অভিজাত বিভাগের ইংরেজী মাধ্যমে (English medium) পড়াতে দেন। তেমনি ‘বুনিয়েদী শিক্ষার কর্ণধারও অনেকে নিজেদের ছেলেকে কারিগর বানাতে রাজী নন। এই হাতকর ভণ্ডামির জন্তেই ভারতবর্ষে ইদানীং বুনিয়েদী শিক্ষা উঠে বাবে বলে শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু নিবেদিতার দৃষ্টিতে কারুকর্ম একটা মানসিক সংযম এবং ভবিষ্যতের সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিণীম। বিশেষ শিক্ষার (Specialised Education) ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। নিবেদিতার মতে, ‘It (কারিক শিক্ষা) rests entirely on the nature of the human nervous system and on known facts regarding the correlation of brain-centres with the development of physical impression and expression.’

আট

ভারতের জাতীয় শিক্ষানায়কগণ আজকের যুগে সর্বভারতীয় সংহতির প্রসঙ্গ নিয়ে আকুল পাধারে ভাসছেন।

আন্তর্জাতিকতাবাদীরা জাতীয় শিক্ষায় ইংরেজী তথা বিদেশী ভাষাকে অপরিহার্য মনে করছেন। জাতীয় শিক্ষায় আবার কঠোর জাতীয়তাবাদীরা দেশ বিদেশী ভাষা-রসাতলে গেল বলে রণহকার দিচ্ছেন। সংস্কৃতির গুরুত্ব এই ডামাডোলের বাজারে উভয় পক্ষকে একজন বিদেশিনীর কথা শ্রবণ করতে বলি। নিবেদিতার মত একাধারে জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় আর কখনে পাওয়া যায়? তিনি বলেন, 'It (সর্বমানবিক ঐক্য) is never even dimly perceived by him who has taken the half for the whole, the outcast from human experience, the seeker after foreign ways and foreign thoughts, whose shame is his own mother—the man who has no native land'. এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গোরার কথা মনে পড়ে। গোরা চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতার যে সমন্বয় ঘটিয়েছেন তার মূল প্রেরণা নিবেদিতা-চরিত্র। নিবেদিতার এই রূপটি বর্তমানকালের দেশপ্রেমিক এবং বিশ্বপ্রেমিকাদের পথ দেখাবে, সস্তা ভাবালুতায় শুধু গেল গেল রব তোলা থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করবে।

নয়

এপর্যন্ত নিবেদিতার শিক্ষাভাবনার বিশেষ বিশেষ দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করা হ'ল। এখন তাঁর নিবেদিতায় শিক্ষাদর্শনের মূল ভিত্তিটুকু নির্দেশ করে শিক্ষাচিন্তার এ প্রসঙ্গের উপসংহারে আসবো। ভাবগত দিক ও বিবকাননের মতোই, নিবেদিতা ব্যক্তিত্ব জাতীয় শিক্ষার তথা মনুষ্যত্বের বিকাশকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন। আর স্বাধীন চিন্তার জাগরণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব। শিক্ষক শুধু সহায়তা করবেন, শিক্ষার্থী নিজ

সাধনার ক্রমশ উপরে উঠতে থাকবে। আর ভারতীয় শিক্ষাকে ভারতীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠ নিতে হবে। ভারতবর্ষের ছাত্রকে স্বার্থ ভারতীয় হতে হবে, তারপর তার বিশ্ববোধ। তাই নিবেদিতা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'A national education, is first and foremost, an education in the national idealism.' জাতীয় শিক্ষার অর্থ দেশবাসীর জন্মে অকুরন্ত ভালোবাসা এবং তাদের কল্যাণের জন্মে আত্মত্যাগ। দেশকে ভালোবাসতে হবে এমন ভাবে, যাতে আমরা নিজেকে ভুলে দেশকে, দেশবাসীকে ভালোবাসতে পারি—'only the good of the beloved and has no thought of self.'

নিবেদিতা ভারতে এসেছিলেন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। তাঁর ইহলোক ত্যাগ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। এই সময়টা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নিবেদিতা চোখের সামনে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্মে কত ভারতবাসীকে জীবন দান করতে দেখেছিলেন। সেদিন ভারত ছিল পরাধীন। বিদেশী শিক্ষার বিজাতীয় আবহাওয়ায় মানুষ হয়েও সে যুগের তরুণদল দেশজননীর চরণে আত্মবলি দিয়েছিল।

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন। কিন্তু আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন কম নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা লাভ করেছি। কিন্তু ভারতীয় সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সমাজগঠনের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্মে আজ অগণিত স্বার্থত্যাগী ও ব্রহ্ম-তরুণীর দরকার। স্বাধীনদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এরকম ত্যাগী ভারতবাসী কজন সৃষ্টি করতে পারছে, তার উপরই নির্ভর করবে ভারতীয় শিক্ষার স্থায়ী মূল্য। যুগের এই অভ্যন্তরীণ অমুহূর্তিতেই শিক্ষার অন্তিম সার্থকতা।

আবেগপূর্ণ ভাষায় নিবেদিতা আমাদের বলেছেন, 'Ihis',

the desire to serve, the longing to better conditions, to advance our fellows, to lift the whole, is the real religion of the present day.'
চণ্ডীতে আছে, মাতা সর্বভূতে বিরাজমান। এমন কি তিনি ক্ষুধাতেও বিরাজমান। ভারতবাসীর জ্ঞানক্ষুধা তৃপ্তির উপায় হ'ল অগণিত দেশবাসীকে শিক্ষিত করে স্বার্থ ভারতধর্মে দীক্ষিত করে তোলা। তাতে তাদের দুঃখ অনেকাংশে কমবে। এই বিরাট দায়িত্বপালনকে নিবেদিতা এ যুগের প্রত্যক্ষ ধর্ম বলছেন।

গ্রন্থপঞ্জী

১. ভগিনী নিবেদিতা (২য় সং)—

প্রত্নাঙ্গিকা মুক্তিপ্রাণা

২. ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ—

গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী

৩. শিক্ষাপ্রসঙ্গ (৪র্থ)—স্বামী বিবেকানন্দ

৪. Hints on National Education in India

—Nivedita.

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

শ্রীগীতা	৬.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫.০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫.০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১.৫০
কর্মবাণী	১.২৫
Soul of India Speaks	5.00

বাংলার ঋষি	৩.০০
বাংলার মনীষী	১.৩০
বাংলার বিদ্বদ্বী	২.০০
বীরভৈ বাঙালী	১.৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২.০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪.০০
রাজর্ষি রামমোহন	১.৫০
রবীন্দ্রনাথ	১.২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১.৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১.৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.ট.

বিজ্ঞানাগর	২.২৫
মানুষের মত মানুষ	১.৭৫
শিশু রামায়ণ	১.৬২
শিশু মহাভারত	১.৭৫

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রোগ্রিডেসমী লাইব্রেরী :

১৫ কলেজ স্কোয়ার :

কলিকাতা—১২

: উপভাস :

কণ্ঠভরা নিশ

মি হির মুখো পা ধ্যা য

একত্রিশ

সমুদ্র, সমুদ্র। সহস্র তরঙ্গ বাহিনীর অবিশ্রাম আঘাত,
অপ্রাপ্ত আক্রমণ।

উদ্দীপ্ত, উন্নতশীর্ষ, শত্রুপাণি যোদ্ধার মত উদ্ভূত গৌরবে ছুটে
আসে, পরমহুর্তেই শ্রান্তির ফেনায় ফেনায় মাথা লুটিয়ে যেন
পরাজিতের মতো ফিরে যায়। আবার পশ্চাতের বাহিনী
দ্বিগুণ বিক্রমে কাঁপিয়ে আসে। অপরাহ্নের অটল বেলাভূমি।
অবিরাম সহস্র আঘাত তুচ্ছ করে, তরঙ্গভঙ্গের আতর্জনাদ
উপেক্ষা করে স্থির নিবিচার। বালুকা জুপের গায়ে হেলান
দিয়ে বসে বসে তরঙ্গ বাহিনীর এই নিষ্ফল অভিযান প্রত্যক্ষ
করে ভারতচন্দ্র। দেখে দেখে আর তৃপ্তি হয় না।

এক একদিন খুব ভোরেই চলে আসে। সমুদ্রে সূর্যোদয়
ঐক্যতির এক বিপুল বৈভবের দৃশ্য। ত্রীক্ষেত্রে না এলে হত
না এই অপূর্ণ দর্শন, পরিচয় পেত না এক অনাধাদিত
অভিস্রুতার। প্রতিদিন যেন একটি মহৎ গৌরবময় নাটকের
দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে ভারতচন্দ্র। যে নাটকের কুশীলব—সমুদ্র
আর আকাশ, সূর্য আর পৃথিবী। যে নাটকের প্রেক্ষাপটে
আলো আর অন্ধকার। দিবস-রজনীর সন্ধিগম—বুসর রক্তিম
প্রাতঃসন্ধ্যা।

এক একদিন শেষ রাত্রির তরঙ্গ অন্ধকারে এসে শান্তভাবে
অপেক্ষা করে। সেই প্রথম যৌবনে পড়া বাণভট্টের বর্ণনা
মনে আসে। ভগ্ন পাণ্ডুর চন্দ্র যেন পদ্ম মধুর ছায় রক্তবর্ণ
পক্ষপুটধারী বৃক্ষ হৃৎসর মত মল্যাকিনী পুলিন থেকে পশ্চাতের
পশ্চিম দিগন্তপ্রান্তে ধীরে ধীরে অবরতণ করে।

তারপর পূর্ব দিগন্তে, আকাশ ও সমুদ্রের মিলন রেখার
আলোর উৎসব শুরু হয়।

আতপ্ত স্বর্ষরশ্মি রেখাগুলি যেন পদ্মরাগশলাকার সম্মার্জনীর
মত গগন-প্রাঙ্গন থেকে নক্ষত্র পুষ্পমণ্ডলীকে উৎসাদিত করে
দেয়।

আজ প্রায় পাঁচ মাস এই পুরুষোত্তমধাম ত্রীক্ষেত্রে এসেছে
ভারতচন্দ্র আর রঘুনাথ। এর আগে কিছুদিন ছিল কটকে,
যারাঠা-সর্দার শিবভট্টের শিবিরে।

বর্ধমান-রাজের কয়েদখানা থেকে পালাবার পর কয়েকমাস
মেদিনীপুরের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছে। দিনের বেলা জঙ্গলে
লুকিয়েছে। ভাঙ্গা গঠ, মন্দির, কিছা বর্গীর হাঙ্গামায়
পরিত্যক্ত গ্রামের ভাঙা ঘরে লুকিয়ে থেকেছে। জনমানুষের
সামনে সহজে আসেনি। রাত্রিবেলা অন্ধকারে গা-ঢাকা
দিয়ে পথ চলেছে। বর্গীর ভয়ে, বর্ধমান-রাজের লোকজনের
ভয়ে কেমন দিশেহারার মত পথ খুঁজেছে। একই পথে
অনেকবার ঘেরাঘুরি করেছে। তিনদিনের পথ তিন সপ্তাহে
পার হয়েছে। কখন কোন্ দিক নিরাপদ স্থির করতে অনেক
সময় নষ্ট হয়েছে।

দেশটা যেন শ্মশান হয়ে গেছে। চারপাশে শুধু হত্যা আর
লুণ্ঠনের দৃশ্য।

পথে ঘাটে মানুষ পড়ে আছে। অসহায় নিরীহ মানুষের মৃত
দেহ। গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে দিয়েছে বর্গীরা। ধনী-
নির্ধন, জী পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে উৎপীড়ন করেছে, হত্যা
করেছে। কারো রেহাই নেই, কেউ রক্ষা পায়নি। মুখে

শুধু এক বুলি বর্গীদের—রূপী দেও, রূপী দেও। অর্থাৎ টাকা দাঁও, টাকা দাঁও। টাকা দিলেও যে সব সময় রক্ষা পাওয়া গেছে এমন নয়। হয়তো কোন গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে ছ'জন। ছপুর রাতে হঠাৎ গোলমাল উঠল—পালাও, পালাও, বর্গী আসছে। শাঁখ বাজিয়ে, ঢেঁড়া পিটিয়ে সবাইকে সাবধান করে দেওয়া হল।

দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে পালাচ্ছে গ্রামবাসীরা। যে যেখানে পারছে। কাছাকাছি জঙ্গলে, জলাভূমিতে, শুকনো নদীর খাতে কিম্বা পুকুরের জলে কালো হাঁড়ি মাথায় দিয়ে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রয়েছে সারারাত। ভারতকেও পালাতে হয়েছে, রঘুনাথও ছুটেছে সঙ্গে সঙ্গে। গাঁয়ের বাইরে বাঁশবন, আগাছার ঝোপঝাড়, ডোবা, পুকুর—যেখানে হোক, যেমন-ভাবে হোক, যে অবস্থায় হোক, কোনরকমে লুকিয়ে থাকতে হবে। তাদের সঙ্গে টাকা নেই, সোনারপোয় গয়না নেই, ধনদৌলত কিছুই নেই। তবু প্রাণের ভয়ে পালাতে হয়েছে। শুধু বেঁচে থাকার জন্ত, শুধু প্রাণটুকু বাঁচাবার জন্ত চোরের মত, ভীত বস্ত্র পশুর মত পালাতে হয়েছে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ক্রমাগত পালিয়ে বেড়িয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে পথ চলেছে। স্নানের সময় নেই, আহারের স্থিরতা নেই, বিশ্রামের বিরতি নেই, নিদ্রার নিশ্চয়তা নেই। পালাতে পালাতে ক্লান্ত হয়েছে ভারত।

আর কতকাল এভাবে পালিয়ে থাকে যায়। বর্গীদের ভয়ে, বর্ধমান রাজ সরকারের ভয়ে, সভ্য সমাজের আইন-কানূনের ভয়ে আর কতকাল সে পালিয়ে বেড়াবে, কেরারী আসামী হয়ে থাকবে।

—না আর পালাবো না রঘু, যা থাকে কপালে—ছপুর রাতে আচম্কা ঘুম থেকে উঠে বেকে বসেছে, ভারত। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খল কলরব। তাড়াতাড়ি পোটলাপুটলি গুছিয়ে নিয়েছে রঘু, ছোট কর্তাকে ডেকে তুলেছে। বাড়ির সবাই ততক্ষণে পালাবার জন্ত তৈরী হয়েছে।

ভূপতি জানা পালাবে। ভূপতির জী, ছেলে শ্রীপতি, ছেলের বউ, মেয়ে যমুনা, জামাই হুবল। যে যতটা পারে হাতে হাতে জিনিসপত্র কিছু গুছিয়ে নিয়েছে। শ্রীপতি গিয়ে গোয়ালের গরুগুলি খুলে দিয়েছে। মারাঠা বর্গীরা নিষ্ঠাবান হিন্দু। গরু মারে না। কিন্তু যদি আঙন দেয়। গোয়ালে আঙন লাগালে অবোলা জীব দড়ি বাঁধার জন্ত বেঘোরে পুড়ে মরবে।

রঘু বলেছিল—এহেনে থাকতি চান কি মরবার জন্তি—ভূপতি বলেছিল—বাবাঠাকুর আর দেরি করবেন না, চলুন চলুন—

কিন্তু পালাবে কোথায়, যাবে কোনদিকে? ঘুরঘুরি অন্ধকার। এ অঞ্চলের পথঘাট তেমন চেনা নেই। ভূপতির জী বাতব্যাধিতে ভুগছে। তার পক্ষে বেশীদূর যাওয়া সম্ভব নয়। তাড়াতাড়ি স্থির হয়েছিল, গাঁয়ের পশ্চিম সীমায় মজানদীর কিনারায় শ্মশানের কাছে যে পুরনো মন্দির, শ্মশানের শিবের মন্দির আছে, সেখানে লুকিয়ে থাকবে যেয়েরা।

এক বায়গায় থাকবে না সবাই। থাকা নিরাপদ নয়। শ্রীপতি আর হুবল যাবে আরো দূরে, গাঁয়ের বাইরে ধানক্ষেতে লুকোবে। ভূপতি বাড়ির কাছাকাছি থাকতে চায়।

বাড়ির পেছনে পুকুর। তারপর এক সার তালগাছ। থানিকটা পোড়ো জমি, আগাছার ঝোপজঙ্গল, একটা মস্ত কাঁঠাল গাছ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘনপাতার ডাল-পালা ছড়ানো।

সেই গাছে উঠলো ভূপতি, রঘু আর ভারতচন্দ্র। বৃকের কাছে পুঁথি-পঞ্জরের পুটুলিটা ধরে আছে ভারত। শহস্র বিপদ-বিশৃঙ্খলার মধ্যেও এই পুটুলিটা এক মুহূর্তের জন্তেও হাতছাড়া করেনি। শ্রীপতি আর হুবল মেয়েদের নিয়ে চলে গেল শিবমন্দিরের দিকে। সেই ভয়াবহ রাত্রির কথা কোনদিন ভুলতে পারবে না ভারত।

পক্ষকাল পূর্বে এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল তারা। তার

আগে দিনের পর দিন শুধু পথে পথে ঘুরেছে। আশ্রয় দেবার মতো কোন গ্রাম চোখে পড়েনি, আশ্রয় দেবার মত কোন মানুষ ছিল না।

গ্রাম-গঞ্জ, হাট বাজার, ঘর গৃহস্থালি সব অশ্রয় হয়ে গেছে। ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে পোড়া ফসলের মাঠ। পেটভরে দুবেলা খাওয়া জোটেনি বহুদিন। গৃহস্থ বাড়ির অন্ন-ব্যঞ্জনের আশা যেন ভুলে গেছে ভারত। জনশূন্য, লুপ্তিভ, দগ্ধ গ্রাম থেকে কখনো কিছু চাল, ছ'মুঠো চিড়ে যোগাড় করেছে। তেল-মুগ ছাড়াই আধপোড়া বেগুন কিম্বা এক-ফালি লাউ জুটলে মহাভাগ্য মনে করেছে। বুনো ফল কদাচিত জুটেছে। ভারতচন্দ্রের দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ জীর্ণ হয়েছে। উজ্জল গৌরবর্ণ মলিন হয়েছে। চোখ বসে গেছে। এক মুখ দাড়ি গোঁফের মধ্যে শুধু খাঁড়ার মত নাকটি আরো প্রকট হয়েছে।

চোখে সেই স্নিগ্ধ প্রশান্তি নেই, মমতা নেই, আনন্দ নেই। ভীত কুটিল সন্দিক্ধ দৃষ্টি। গেকরয়া রঙের বৃত্তি ফতুয়া চাঁদর ধূলি-ধূসর। মাথায় রক্ত চুলের বোঝা, গুলোর ঘামে জটা বেঁধেছে।

রঘুনাথেরও ওই রকম চেহারা। তার কালো রঙ আরো ভয়ঙ্কর হয়েছে। চোখে মুখে একটা হিংস্রতা। পেটের জ্বালা সহ্য করতে পারে না রঘুনাথ। এক এক সময় ইচ্ছে হয়, এই অরাজকতার মধ্যে, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে কোন গাঁয়ে ঢুকে বা পায় লুটেপুটে খায়। কিন্তু ছোট কর্তার জন্ত পারে না।

এক এক সময় ইচ্ছে হয়, লাঠি হাতে বর্গীদের সামনে রুখে দাঁড়ায়। অন্ততঃ ছ'একটাকে মেরে যদি মরতে পারে, তাতেও শান্তি। ছোটকর্তার জন্ত হয় না। নিজের জন্ত ভাবে না রঘু। ছোটকর্তার জন্তই ভাবনা। একা একা-থাকলে এতদিনে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলত সে। ছোটকর্তা তাকে বাধা দেন।

এমন কি দিনমানে লাঠি হাতে পথে পর্যন্ত বেরোতে দেন না।

এমনিতে অঝোরোহী মারাঠারা উপেক্ষা করে চলে যেতে পারে, অনেক সময় চলেও যায়।

কিন্তু কোন অস্ত্র কিম্বা লাঠি, যত সামান্যই হোক, যত ক্ষুদ্রই হোক, হাতে দেখলে আর রক্ষা নেই। নিবিচারে খুন করবে।

অচেনা অরণ্য, অজানা জনপদ, আদিগন্ত রক্ষ প্রান্তর অতিক্রম করে, নানা পথ ঘুরে ঘুরে, যতটা সম্ভব লুকিয়ে লুকিয়ে চলেছে দুজনে। একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল কোনরকমে স্বর্ণ-রেখা পার হয়ে উড়িয়া যাওয়া। যদিও মেদিনীপুর জেলা তখন উড়িয়ার সঙ্গেই যুক্ত ছিল।

নবাব আলিবর্দী খাঁ যখন ক্রান্ত হয়ে, বাধ্য হয়ে, বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি করলেন, তাদের চৌধ আদায়ের জন্ত উড়িয়া অঞ্চল ছেড়ে দিলেন, সে সময় মেদিনীপুর জেলা কেটে এনে বাংলা-দেশের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব অনেক পরের কথা।

তখন সবে বর্গীর হান্সামার প্রথম পর্ব শুরু হয়েছে।

দুর্দান্ত ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গী-বাহিনী বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হুগলী, মেদিনীপুর জালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। এক সময় এমন অবস্থা হয়েছিল যে, কয়েকটা বড় বড় শহর ছাড়া সারা পশ্চিম বাংলায় নবাবের যেন আর অধিকারই ছিল না। বর্ধমানের অবরোধ কেটে কোনরকমে কাটোয়া পৌঁছলেন নবাব। কিন্তু সৈন্যদের অবস্থা শোচনীয়। খাণ্ড নেই, আশ্রয় নেই। কাটোয়া শহর আগেই লুণ্ঠ করে চলে গেছে বর্গীরা।

নবাবের বড় ভাই হাজী আহম্মদ আরো সৈন্য, আরো রসদ, আরো গোলাবারুদ নিয়ে এসে পড়ায় কিছু সুরাহা হল বটে। কিন্তু নবাব কাটোয়া শহরে পৌঁছবার দিন পাঁচেক পরেই বর্গীরা খাল মুর্শিদাবাদ শহরে হামলা করল। স্ববে-বাংলার

সবচেয়ে সম্মানিত ব্যবসায়ী, শ্রেষ্ঠ ধনী মহাশয় জগতশ্রেষ্ঠ ফতেচাঁদের কুঠি জালিয়ে তিন লাখ টাকা লুটে নিল ভাস্কর পশ্চিমের দল। পরের দিন নবাব এসে পৌঁছলেন।

অভ্যদিকে পালিয়ে গেল বর্গীরা। এই হয়েছে মুক্তি। কখনো মুখোমুখি চূড়ান্ত লড়াই হয় না। লড়াই করার সুযোগ দেয় না বর্গীরা। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, ছোট ছোট টাটু ঘোড়ায় চেপে আগ এখানে, কাল ওখানে, পরন্তু সেখানে হামলা করে বেড়ায়। নবাবের ফৌজ পৌঁছবার আগেই লুটপাট শেষ করে সরে পড়ে। কখনো সুযোগ পেলে আচম্কা নবাবী ফৌজকেও আক্রমণ করে। তবে বর্ধমানের অবরোধ ভেঙে যাবার পর, তেমন সুযোগ আর পাননি বর্গীরা।

আলিবর্দী খাঁ সাহসী, পরিশ্রমী এবং অভিজ্ঞ সেনাপতি। প্রথম ধাক্কা সামলে ওঠার পর পাল্টা মার শুরু করলেন তিনি। সবদিকের আটঘাট বেঁধে বর্গীদের তাড়াতে লাগলেন, বিভিন্ন এলাকার রাজা-মহারাজা, জমিদার, ফৌজদার, তালুকদার, পশুনিদারদের কড়া হুকুম দিলেন সব সময় সজাগ সতর্ক থাকতে।

সত্তর বছরের বুদ্ধ নবাব যেন যৌবনের শক্তি নিয়ে জেহাদ ঘোষণা করলেন। উদ্ধার মত চতুর্দিকে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই লড়াই-এর চেহারা অনেক বদলে গেল। বর্গীরা পালাতে শুরু করল। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যেদিনীপুরের পথে পালাতে লাগল উড়িষ্যার দিকে।

উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম তখন শেখ মাসুম খাঁ। নবাব আলিবর্দী খাঁর প্রতিনিধি কটকে বসে উড়িষ্যার শাসন কার্য চালান। নায়েব নাজিমকে চলতি কথায় বলা হত ছোট নবাব। যুদ্ধের এই গতি-প্রকৃতি বুঝতে পারেনি ভারতচন্দ্র, বোঝা সম্ভবও ছিল না। কিছু উড়ো খবর আর নানা শুজব ছাড়া সে যুগের সাধারণ মানুষ যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা নবাবী

কাণ্ড-কারখানার কোন খবরই পুরোপুরি পেত না, সঠিক জানত না।

ভারতচন্দ্র আর রঘুনাথ ঘুরতে ঘুরতে এক দুপুরে এসে হাজির হ'ল বীরভদ্রপুরে।

যেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় ছোট একটি গ্রাম এই বীরভদ্রপুর।

ক্রোশ তিনেক দূরেই স্ববর্ণরেখা। চাষীপ্রধান গ্রাম। বেশ শান্ত নিরিবিলা।

এ গাঁয়ে এখনো বর্গীর উৎপাত হয় নি। যদিও কাছাকাছি কয়েক ক্রোশ এলাকার মধ্যেই পাঁচ-সাতটা গ্রাম লুট হয়েছে। বর্গীরা দলে দলে স্ববর্ণ-রেখা পার হয়ে উড়িষ্যায় ঢুকছে।

তখন শরত কাল। সামনে পূজো। বাঙলাদেশে এ বছর আর পূজোর আনন্দ নেই।

ভারত ভাবল পূজোর কটা দিন বীরভদ্রপুরেই কাটাবে। যদি কোন গৃহস্থ বাড়ি আশ্রয় মেলে। নয়তো কোন পুরনো মন্দির কিংবা বোষ্টমের আখড়া।

গাঁয়ে ঢোকায় মুখেই মস্ত একটা অশ্বখ। গাছের নিচে ছোট একটা মুদি দোকান। দোকানের সামনে এক বুড়ো বসে তামাক খাচ্ছিল। পাশে একটা গরু তাড়াবার পাতন, কাঁধে গামছা। নতুন মানুষ দেখে বুড়ো হ'কো নাযাল। মাথার চুল সব শাদা। বয়স বোধহয় ষাটের ঘরে। কিন্তু শরীরের গড়ন ভাল। গলায় তুলসীর মালা।

দোকানের সামনে এসে প্রথম কথা বললো রঘু—একটু জল দিবেন—

দোকানের মাচার উপর বসেছিল মুদি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সেই বুড়ো মানুষটি জিজ্ঞেস করল—কোত্থেকে আসা হচ্ছে—

—আমি হুগলী থেকে—জবাব দিল ভারত।

মধ্য বয়সের মোটাসোটা মুদি আর পাকা মাথার বুদ্ধটি দুজনেই

খুব সন্দেহের চোখে অপরিচিত আগন্তুকদের আপাদমস্তক দেখে নিল। দিনকাল যা পড়েছে, কাউকে আর বিশ্বাস নেই। তবু গেরুয়া কাপড়ের একটা মহিমা আছে।

—আপনারা কি?—বুদ্ধি আবার জিজ্ঞেস করল।

—আমি ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাস নিয়েছি, এ আমার শিষ্য—ভারতের জবাব শুনে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল বুদ্ধি—আপনি ব্রাহ্মণ, প্রণাম হইগো বাবাঠাকুর—মাথা নিচু করে জোড় হাতে নমস্কার দিল। ঝকঝকে পেতলের ঘটিতে জল আনল মুদি।

হাতমুখ ধুয়ে শুড় আর জল খেয়ে একটু স্বস্থ হ'ল মুদ্রনে।

বুদ্ধি আবার জিজ্ঞেস করেছিল—কোথায় যাচ্ছেন গো বাবাঠাকুর?

—যাব পুরীধাম, জগন্নাথ দর্শনে, চারদিকে যা গোলমাল, ভাবছি যদি কিছুদিন আশ্রয় পাওয়া যায়—

বুদ্ধি যেন কৃতার্থ হয়ে গেল—আত্মন বাবাঠাকুর, দয়া করে গরীবের ঘরে চলুন, যতদিন ইচ্ছে থাকুন, আমার নাম ভূপতি, ভূপতি জানা—

স্বপ্ন আর দেরি সহ্য হচ্ছিল না। পোটলাপুটলি নিয়ে তখুনি তৈরী। বেলা দুপুর।

পেটের মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। ভূপতি মানুষটাকে ভালই বলতে হবে। সাদামাটা মানুষ। না হলে এমন দিনকালে কে কাকে ডেকে আদর করে আশ্রয় দিতে চায়।

যেতে যেতে হাঁক দিল ভূপতি—ও চরণ, গরু কটা দেখো, ছিপতিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

মুদির নাম বোধ হয় চরণ। অস্থখ গাছটার কাছাকাছি তিন-চারটে গরু খোঁটার সঙ্গে বাঁধা। চাব পাশেই পাকা কসলের ক্ষেত। এ সময় গরু খুলে রাখা ঠিক নয়।

সরু মাটির রাস্তায় যেতে যেতে বল্লো ভূপতি—বাবাঠাকুর, আপনার দয়ায় এই সব ক্ষেতে আমার কসল আছে, গাঁয়ের সবাই আমাকে চেনে—

সম্পন্ন চাষী গেরস্থ ভূপতি জানা। ধানের ক্ষেত আছে।

গোলায় ধান, গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ। বড় বড় মাটির ঘর। মাটির দেয়াল, বাঁশের খুটি, খড়ের ছাউনি, বুক সমান উঁচু ভিত। শরতের দুপুর। আকাশে শাদা মেঘের ছায়া। মিষ্টি রোদ। দেশব্যাপী এই দুর্ভোগের মধ্যে এমন শান্ত, স্নিগ্ধ গ্রাম অনেকেদিন চোখে পড়েনি। ভারি ভাল লেগেছিল ভারতের।

বক্ত্রিশ

কোনদিন ভুলতে পারবে না ভারত। বীরভদ্রপুরের ভূপতি জানা। ভূপতির ছেলে শ্রীপতি, মেয়ে যমুনা, জামাই স্ববল। বহুকাল এমন শান্ত, স্বন্দর, সহজ পারিবারিক জীবন দেখেনি সে। সেই দেবানন্দপুর ছেড়ে আসার পর এমন স্নিগ্ধ পরিবেশে দিন কাটায় নি।

যমুনা মেয়েটি বেশ। বছর পনেরো বয়স। শ্যামলা রঙ। গোলগাল শান্ত মুখশ্রী। একপিঠ কোঁকড়া চুল। ভারতকে দেখাশোনার সমস্ত ভার যমুনার।

রোজ অন্ধকার থাকতে উঠতো। উঠোনে গোবর ছড়া দিত, কাঁট দিত। ততক্ষণে চারদিক ফর্সা হয়ে যেত। তখন এসে ডাকত যমুনা—বাবাঠাকুর মুখ ধোবার জল এনিছি—

চোখে মুখে একটু জল দিয়ে যমুনার হাত থেকে নিশ ডালের দাতন কাঁটি নিয়ে পুকুর ঘাটে যেত ভারত। বাড়ির সঙ্গে পুকুর। তালগাছের শুঁড়ি ফেলা ঘাট। কাকচন্দ্র জল। এক-কোনে শালুক আর পদ্মবন। শ্রীপতির বউ একগলা ঘোমটা টেনে বাসন নিয়ে বসেছে। একটু পরেই যমুনা আসত তেল, গামছা হুতি নিয়ে। স্নান করে এসে আঁধিকে বসত ভারত। উঠোনে কয়েক মুঠো ধান ছড়িয়ে দিত যমুনা। এক কাঁক পায়রা আর কয়েকটা চড়াই ওর চারপাশে উড়ে উড়ে খুশির হাওয়া ছড়াত। বহুকাল আগের একটা ধূসর ছবি মনে পড়ত। বড় মায়ার মেয়ে বাসন্তীদি রোজ সকালে এমনি মুঠো মুঠো ধান ছড়িয়ে দিত এক ঝাক পায়রার জন্ত। কুড়ি

বাইশ বছর আগের কথা। বাসন্তীদির চেহারাটা স্পষ্ট মনে পড়ে না। সেই প্রিয় মায়াবাড়ির ছবিটাও কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে। যমুনার নাকে নাকফুল, হাতে সোনার বালা, কান-পাশা, পাটিহার—সব সোনার।

গেল বোশেখ মাসে বিয়ে হয়েছে। এই গাঁয়েই স্বস্তুর বাড়ি। এ পাড়া-ওপাড়া।

জামাইটিও বেশ। যমুনা বাপের বাড়িই থাকে বেশি সময়। স্বস্তুরাং স্ববলেরও আড্ডা হয়েছে স্বস্তুর-বাড়ি। এক একদিন হয়তো এক ছড়া কলা, এক গাছা আখ কিম্বা দুটো বাতাপী লেবু নিয়ে এসে বলে—আপনার জন্মি আনলেম গো, বাবাঠাকুর—

ভূপতি বলেছিল—কটাদিন থাকুন বাবাঠাকুর, আমার বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা হয়, নবান্ন হয়, নবান্নের পর যদি ইচ্ছে করেন, না হয় যাবেন, হাজিমা কমুক, পঞ্চ-ষাট একটু ঠাণ্ডা হোক—

রঘুনাথ মহাপুর্ণি। এরা বেশ মানুষ। সাদামাটা গাঁয়ের লোক। অতিথিকে দেবতার মত দেখে। বেশ যত্ন আশ্রিত করে। খুব সকালে উঠে মাঠের কাজে চলে যায় ভূপতি। ত্রীপতি আঃ অবলও যায়। এক একদিন রঘুও ওদের সঙ্গে যায়। কোন কোন দিন মাঠের পাশের নালা থেকে কইমাছ পুঁটি মাছ ধরে আনে রঘু কিংবা পুকুরে ছিপ ফেলে বসে। এক এক দিন হয়তো দু একটা মাঝারি গোছের কই কিংবা কাতলা মাছ জুটে যায়। সে সব দিন তো মহাভোজ। দুপুরে আট দশ খণ্ড মাছ, মাছের বোল ভাতের পর সেরখানেক দুধ এক চুমুকে উড়িয়ে দেয়।

আশ্বিন মাস। পূজোর কিছুদিন আগে বীরভদ্রপুর এসেছিল ভারতচন্দ্র আর রঘুনাথ। এ গায়ে দুর্গাপূজা হয় না। তবে লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা হয়। শশানেশ্বর শিবমন্দিরের পাশে শিবরাত্রির দিন ছোটখাট একটা মেলাও বসে। এ সব বিবরণ ভূপতির মুখে প্রথম দিনেই শুনেছিল

ভারত। ষষ্ঠি সপ্তমী গেল। অষ্টমীর দিন রাতে পরিপাটি ছুরিভোজনের পর দাঁওয়ার একপাশে কাঁঠাল কাঠের পিড়ি পেতে বসেছিল ভারত।

হুকো-কন্ধি হাতে ভূপতি এসে সামনে বসল—বাবাঠাকুর, একটা কথা বলবো—

রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছিল ঘরের ভেতর। এ ঘরটা বাইরের দিকে। কালেভদ্রে আস্ত্রীয় কুটুম কিংবা অতিথি এসে থাকে। আপাতত ভারত আর রঘুর আস্থানা হয়েছে। সামনে উঠোন। উঠোনের একপাশে একটা শিউলি গাছ। অজস্র ফুল ফুটেছে।

ভূপতির ভণিভা শুনে জবাব দিয়েছিল ভারত—বলো কি বলবে—

একটু সময় তামাক টেনে বলেছিল ভূপতি—আমার মন বলছে, বুঝলেন গো আমার মনের কথা—

আবার চূপচাপ তামাক টানল—বাবাঠাকুর ঘর ছেড়ে বিগাণী হয়েছে বটে, কিন্তুক সন্মেলি আপনি হতে পারেন নি—

একটু হাসল ভারত—কি করে বুঝলে হে—

কথার পিঠে জবাব না দিয়ে আরো একটু সময় তামাক টানল ভূপতি। শেষে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো—আমার মন বলছে, বুঝলেন গো বাবাঠাকুর, এ গায়ে এক ঘর বায়ুন নেই, আপনি যদি ইচ্ছে করেন, ঘর দোর তুলে বাস করাই—

রঘু ঘরের ভেতর ছিল। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে উবু হয়ে বসল—এতো ভালো কথা মোড়ল মশাই, এহেন থাকবার ঠাই পালি, কে আর ছুটোছুটি করতি চায়—

কোন জবাব না দিয়ে সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিল ভারতচন্দ্র।

গাছ-গাছালির আড়ালে অষ্টমীর চাঁদ। মেটে মেটে জ্যোৎস্না। এক এক ফালি মেঘ ভেসে যাচ্ছে। বাতাসে শিউলির মৃদু গন্ধ। কোথায় যেন একটা পাখি ডাকছিল—

টি-টি-টি-টি—যন্দ কি! যদি এই গাঁয়ে, এই শান্ত নিরিবিলি
বীরভদ্রপুরে বাকি জীবনটা থাকে যায়।

এখানে কলহ নেই, কোলাহল নেই, স্বার্থের টানাটানি নেই।
ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত ভারত।

আর কতকাল সে এইভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে?
আত্মীয় নেই, বান্ধব, ঘরের আশ্রয় নেই, ভবিষ্যতের কোন
নিশ্চয়তা নেই। শক্তি আর ধৈর্য, সাহস আর সহিষ্ণুতারো
তো একটা সীমা আছে। ভূপতির হাত থেকে হুকোটা নিয়ে
একটু আড়ালে গিয়ে বসেছে রঘুনাথ।

ভারতের মুখের দিকে তাকিয়েছিল ভূপতি। বাবাঠাকুর এখন
কি মতটা দেন, শোনার জন্ত মনটা বড় ছটকটাক্সিল। কোন
কথা না বলে চুপচাপ সেই নিশাচর পাখিটির ডাক শুনছিল
ভারত। বাতাসে শিশির ভেজা শিউলির গন্ধ। উঠোনে
ম্লান জ্যোৎস্নার আলাপনা। ঠিক এই সময় উদ্ধারণপুরের
ঘাটের কাছে বড় বড় নৌকোর সেতু বেঁধে নিশেকে নদী পার
হচ্ছিল নবাবী ফৌজ। কাটোয়া শহরে খুব জাকজমক করে
ছুর্গা পূজার আয়োজন করেছিলেন মারাঠা সর্দার ভাস্কর
পণ্ডিত। লুঠের টাকায় পূজা হচ্ছে। কাছাকাছি এলাকার
জমিদারের কাছ থেকে জোরজবরদস্তি করে মোটা টাকার
প্রণামী আদায় করা হয়েছে। কেউ কেউ আবার মারাঠা-
সর্দারকে খুশি করার জন্ত বেচ্ছায় মোটা টাকার নগরানা
দিয়েছে। খুব ধুমধামের মধ্যে যষ্টি, সপ্তমী কাটল। ষটি
ঘটি সিদ্ধি খেয়ে মারাঠারা খুব নাচ গান হজ্ঞা করল।
মহাষ্টমীর দিনটাও নির্বিঘ্নে কেটে গেল। রাজির প্রথম প্রহর
পার হল।

প্রচুর ধূপ-ধূনা জালিয়ে দেবীর আরতি হচ্ছে। আটমশ-
জনের এক একটা দল পালা করে উদ্ভাস নৃত্যে যেতেছে।

যেদের নৃত্যের নাম, ‘লাস্ত্র’ আর পুরুষের নৃত্য হল
‘তাণ্ডব’।

মারাঠা শিবিরে সেই তাণ্ডব নৃত্যের সমারোহ। ধূপের

ধোয়ান, সিদ্ধির নেশায় সব কিছু ঝাপসা, অস্পষ্ট। সব
কিছু ঘুরছে ঘুরছে। ঢাকির প্রাণপণে ঢাক বাজাচ্ছে।

কাঁসের ঘণ্টার শব্দে কান পাতা দায়। পূজা মণ্ডপের
একপাশে চণ্ডীপাঠ হচ্ছে। নিকটেই যুগচর্যেব আসনে
নিম্নলিখিত নেত্র ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
ভাস্কররাম কোল্‌হটকর। শ্রামবর্ণ, দোহারী গড়ন। উচ্চতা
মাকারি।

লগাটে যজ্ঞভস্মের টিপ, কণ্ঠে শুভ্র উপবীত, অঙ্গে গরদের
মুতি উত্তরীর।

মুখে শিবাজীর মত দাড়ি। মুখভাব কিছুটা কঠোর মনে
হলেও, এই ধ্যানমোহন সাধারণ চেহারার ব্রাহ্মণকে দেখে
অসুস্থান করার উপায় নেই যে, হবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা
তিনি এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করেছেন।

আজ বীরষ্টমী। অস্ত্রপূজার দিন। পূজা মণ্ডপের বাইরে
বিশাল প্রাঙ্গনে কয়েকহাজার মারাঠা সৈন্য সমবেত হয়েছে।
আটমশজন পুরোহিত তাদের অস্ত্রে মস্তপুত সিঁদুর-বিন্দু একে
দিচ্ছেন। মাথায় পবিত্র গঙ্গাজল ছিটিয়ে আশীর্বাদী ফুল-
বেলপাতা দিচ্ছেন।

প্রায় চার-পাঁচ হাজার সৈন্য অশ্রদ্ধাভাবে সারিবদ্ধ হয়ে
একের পর এক আশীর্বাদ গ্রহণ করে চলে যাচ্ছে। সে এক
অদ্ভুত দৃশ্য। বেলা দুপুর থেকে শুরু হয়েছে।

সন্ধ্যার পর চারিদিকে মশাল জ্বলে উঠল। পূজা মণ্ডপের
ভেতর ঝাড় লঠনের আলো। সমবেত সমস্ত সৈন্যের
আশীর্বাদ গ্রহণ শেষ হতে বোধ হয় রাত ভোর হয়ে
যাবে।

পূজা মণ্ডপের একপাশে প্রধান একুশজন সর্দারের নিজস্ব অস্ত্র
সস্তার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তরবারী, বজ্রম, ঢাল, বর্ষ,
শিরদ্বাপ। সামনে হোমশিখার আগুন। দু’জন পুরোহিত
সেই হোমশিখার পরিচর্যায় ব্যস্ত। প্রধান সর্দারদের লগাটে,
কাঁদের প্রত্যেকটি অস্ত্রে পবিত্র যজ্ঞভস্মের টিপ।

কাটোয়া শহরের পূর্ব দিকে গলা, উত্তর ও কিছু পশ্চিম দিকে অজয় নদ।

অষ্টমীর রাত দুপুর হবার আগেই উদ্ধারগপুরের ঘাটে গজার উপর সেতু বেঁধে নবাব আলীবর্দী খান তাঁর প্রধান বাহিনীকে গজার পশ্চিম কূলে এবং অজয়ের উত্তরে এনে ফেললেন। কাটোয়া শহরের দাঁইহাটায় মারাঠা শিবিরে তখন উৎসবের আনন্দ উদ্ভাস হয়ে উঠেছে। মণ্ডপের ভেতর ভাস্কর পণ্ডিত ধ্যান শুরু। অল্প অল্প সিঁদুর নেশ।

সর্দারদের কেউ কেউ কাছাকাছি বসে আছেন। কেউ কেউ ঘুরে ঘুরে তদারক করছেন।

একদিকে উদ্ভাস আরতি-নৃত্য। একশত আটজন বাঙালী চুলি নেচে নেচে ঢাক-ঢোল বাজাচ্ছে, কঁাসর ষণ্টার শব্দে কানে ভালা লাগে।

আরেকদিকে অল্পপুজোর উৎসব। বীরাষ্টমীর ব্রতপালন। লাঠি খেলা, অসি খেলা, মজযুদ্ধ, রণপায়ে নৃত্য। হস্ হস্ মহাদেও, ভবানী মর্দি কী জয়—বলে ঘন ঘন জিগির দিচ্ছে মারাঠারা। সমস্ত কাটোয়া শহর ভয়ে বিষয়ে এই উৎসব দেখছে।

মারাঠা শিবির থেকে মাত্র আধক্রোশ দূরে অজয়ের উপর আরেকটা মাঝারি আকারের সেতু তৈরী করালেন নবাব আলবর্দী খান। বারো হাজার বেলদার মাত্র কয়েকদণ্ডের মধ্যে সেতুটি তৈরী করে দিল। শেষ রাত্রির শীতল অন্ধকারে তিন হাজার বাছা বাছা নবাবী সৈন্য নিপুণ নৈশদ্যের মধ্যে সেই সেতু পার হয়ে উৎসব ক্লাস্ত মারাঠা শিবিরের উপর কাঁপিয়ে পড়ল।

ওদিকে উদ্ধারগপুরের ঘাটে নদী পার হয়ে প্রধান বাহিনীও দ্রুত এগিয়ে এল।

পুজোর সমস্ত আয়োজন, যুদ্ধ শিবিরের সমস্ত সম্পদ পেছনে ফেলে দিশেহারার মত পালিয়ে গেল মারাঠারা। শুধু পড়ে রইল কয়েকশত হতাহত। সামান্য কয়েক দণ্ড নামমাত্র লড়াই হল। নবমীর সূর্য ওঠার আগেই কাটোয়া ছেড়ে পালাতে হল বর্গীদের।

প্রধান দল পালিয়ে গেল পঞ্চকোট আর হাজারীবাগ জেলার রানগড়ের পথে। বর্ধমান, হুগলী, হিজলী অঞ্চলে যে সব ঘাঁটি ছিল মারাঠাদের, সেখান থেকেও তাড়াতাড়ি করে পড়ল তারা।

কিন্তু কয়েকটা দিন পরেই হঠাৎ দক্ষিণে ঘুরে বিষ্ণুপুর, চন্দ্রকোণা লুণ্ঠ করে মেদিনীপুরে আবার মাথা তুলে দাঁড়ালেন ভাস্কর পণ্ডিত। নারায়ণগড়ে ঘাটি করে চতুর্দিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হত্যা আর লুণ্ঠনের আগুন জ্বালালেন।

দলে দলে মারাঠারা স্ববর্ণরেখা পার হয়ে উড়িষ্যায় ঢুকতে লাগলো।

সর্দার শিবভট্টের নেতৃত্বে অগ্রগামী একটা দল কটকের কাছে আজপুুরের যুদ্ধে উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম শেখ মাহমুদ খাঁকে পরাজিত করল, হত্যা করল।

কাটোয়ার বিপর্যয়ের মাশখানেকের মধ্যেই সমস্ত উড়িষ্যায় মারাঠাদের অধিকার স্থাপিত হ'ল।

(ক্রমশঃ)

জল

মাটি

মন

ম হী তো য বি শা স

আঘাতটা বড়ো লাগল সকলের। আর লাগারই তো কথা। দু'দিন বামে ঘরে নতুন ধান উঠবে। ধরে-বিধরে গোলাপালা ভ'রে উঠবে। কাঠুখালির বিলের হা-ভাত মাহুঙলো মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলবে।—কিন্তু সব আশায় ছাই পড়ল। একটা চলে-ই সব ধোয়া-মোছা হ'য়ে গেল।

উপরের দিকের আউশ ধানের জমিগুলো অবস্থা এখনো ডোবেনি। তবে ডুবতে কতোক্ষণ। জলের অবস্থা এবার বড়ো বাড়-বাড়ন্ত। সারা বিলটা থই-থই করছে উপরি-বর্ষার জলে। কোথায় রোদের তাপ খেয়ে জলটা একটু কমবে। তা নয়। দিনকে দিন জল যেন আরো বাড়ছে। কাঠুখালির বিল থেকে মাইল কয়েক দূরে ভৈরব-নদ। এর মধ্যেই নদীটা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। মাটি গোলা গেরুয়া-জল দুই পাড় ভাগিয়ে দিয়ে তীব্র-প্রোতে ছুটে চলেছে। কাঠুখালির মাহুঙলো বড়ো ভয় পেয়ে গেল। উপরের দিকে আউশ ধানের জমি অতি সামান্য। কারো আছে, কারো বা নেই। যাদের আছে, তারা যতটুকু পারল কাঁচা-পাকা অবস্থায় কেটে-কুটে ঘরে তুলতে লাগল। আর যাদের উপর-ক্ষেতে আউশ ধান নেই, তারা অসহায়ের মতন হাত কচলে বেড়াতে লাগল।

সারা বর্ষাকালটা জুড়ে এখন চলবে অভাবের রাজত্ব। প্রায় সকলেরই ঘরে খাবার ধান ফুরিয়ে গেছে। দু'একজনের ঘরে হয়ত কিছু পুরোনো ধান আছে। আর কারো কারো গোলায় হয়ত সামান্য কিছু নতুন আউশ ধান উঠেছে। কিন্তু সে আর ক'জনের। প্রতি গাঁয়ে গোনা-গুনতি দু'পাঁচজন ছাড়া বেশী মিলবে না। যার ঘরে দুই-চার মুঠো আছে, এখন আর কেউ কাউকে তা থেকে ধার-কর্জ দিতে চাইবে না। সকলেই আগে বাঁচতে চায়। নিজে বেঁচে তারপর পাড়া-পড়শী, আত্মীয়-কুটুম। এখন বেহিসেবী হলে চলবে না। টিপে-টুপে এ-ক'টা মাস চালাতে হবে। দান-খয়রাতী করতে চাও, এর পরে যতো খুশী ক'রো। কিন্তু এখন না। কাঠুখালির বিলের মাহুঙলোর চোখে মুখে তৃষ্ণিতা আর উদ্বেগ যেন দানা বেঁধে উঠেছে।

তবে সব ভয়ের মধ্যেও এখন ঐ এক আশা। আশা এখন আমন ধানগুলো নিয়ে। আর তো মাত্র ক'টা মাস। অজ্ঞান পড়তেই আমন ধানে পৌঁচ দেওয়া যাবে। মাঝের কয়টা মাস কোনো মতে কাটিয়ে দিতে পারলে আর ভয় নেই। উপরি-বর্ষায় আমন ধানের বেশী কোনো ক্ষতি হয়নি। দিন কয়েক জলের নীচে ডুবে ছিল। কিন্তু আমন ধান—বড়ান

ধান। জলের সাথে পান্না দিয়ে ওরা বেড়ে চলে। জলের গন্ধ পেয়েই তাই আমন ধানের গাছগুলো লকলক করে বাড় ছাড়ল। কিছুদিনের মধ্যেই জল ছাপিয়ে বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়ল আমন ধানের তেজালো গাছগুলো। বিল-ঝাপানো আমনের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে কাঠুখালির মানুষগুলোর বৃকে যেন একটু বল ভরসা এলো। কোনোমতে এই কয়টা মাস পার করে দেওয়া। তারপরে আর ভয় নেই। কিন্তু কি করে যে এই কয়টা মাস কাটবে তা ভগবানই জানে।

আন্তে আন্তে শ্রাবণ মাস শেষ হয়ে ভাদ্র পড়ল। জল ক্রমেই উপরের দিকে উঠে আসছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই জল গ্রাম-গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়বে। পথ-ঘাট-ভাগাড় সব ডুবে যাবে। গাঁয়ের মধ্যেও নৌকা-ডোঙা ছাড়া চলা-চলের উপায় থাকবে না।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি আসতেই চারিদিক ডুবে গেল। উঁচু-উঁচু ঢিপির উপরে বাড়ীগুলো ছাড়া কোথাও আর এক টুকরো শুকো জমি জাগন রইল না। অসম্ভব বেগে জল বাড়ছে। ছোটো ছোটো ছেলেরা জল মাপে। কাঠি পুঁতে রাখে কুল-বঁধা জলের মধ্যে। কাঠির মাথাটা থাকে জলের সমান-সমান। ওরা বলে 'টোঁয়া দেওয়া'। রাতে টোঁয়া দিয়ে রাখে। পরের দিন সকালে টোঁয়ার কাঠি খুঁজে পাওয়া যায় হ'য়ে ওঠে। প্রতি রাতে টোঁয়ারে কাঠির উপরে আট-দশ আঙুল করে জল বাড়ছে।

সকাল বেলা নৌকা নিয়ে বলরাম বেরিয়েছিল বিলের দিকে। একবার সাঁপুইতলির আমনের ক্ষেতখানায় যাওয়া দরকার। বড়ো একখানা কচুরিপানার বাঁক এসে ক্ষেতখানাকে ঘিরে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি কচুরিগুলো সরিয়ে না দিলে ধানের ক্ষতি হবে। হু-হু করে বানের জল নেমে আসে। আসার পথে যেখানে বা পায়, ভাসিয়ে নিয়ে আসে। বড়ো-বড়ো বিল-বাওড় জুড়ে থাকে ঘন কচুরি-

পানার বাঁক। লম্বা-লম্বা শিকড় আর ডাটা মেলে দিবি কামেয়ী সংসার গড়ে তোলে। আধ মাইল সোয়া মাইল জুড়ে ওদের অবাধ বিস্তার। তারপর বস্তার জল এসে যখন বিল বাওড় ভাসিয়ে দেয়, তখন ওদেরও যাত্রা শুরু হয়। শোভের টানে দল বেঁধে বেঁধে নেমে আসে নীচের দিকে। জলের পরে ওরা হ'ল স্টীম রোলার। ভাসতে ভাসতে কোনো ধান ক্ষেতের উপর এসে পড়লে আর রক্ষে নেই। ক্ষেতের সব ধানগাছ চেপে পচিয়ে মারবে। কাঠুখালির চাষী মানুষগুলোকে তাই এসময়ে সাবধানে থাকতে হয়। কড়া নজর রাখতে হয় ক্ষেতের দিকে। কচুরী পানার বাঁক ক্ষেতের কাছে আসলেই নৌকা বান্ধিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে হয় অন্তরিক।

অনেকক্ষণ বলরাম কচুরীগুলো ঠেলে চলল। ব্যাটারি যেন নড়তেই চায় না। তার উপরে কি একটা মরা জন্তু বেধে রয়েছে ওপাশে। ফুলে ঢোল হয়েছে। দুর্গন্ধে টেকা দায়। যা-যুখে আসে তাই বলে খানিক গালাগালি দিল বলরাম। তারপর একসময় নৌকাটাকে ঘুরিয়ে ফিরে চলল বাড়ীর দিকে। বিলের নীচের দিকটা ধপ্ধপ্ধ করছে। রাশি রাশি শাপলা ফুল ফুটেছে। জলের নীচে হৃদীয় নাল—আর তার মাথার উপরে পীপড়ি মেলা সাদা ফুল।—আউশ-ডোবা ক্ষেতগুলোতে ভরস্ব-ধানের প্রাণরস শুষে নিয়ে ওদের রাক্ষুসে হাসি যেন আরো কিকিয়ে উঠেছে।

একটু এগোতেই বলরাম দেখল ডোড়ায় করে বংশী আসছে এদিকে। সারা বিলেই এখন লোকজন ঘোরাকেরা করছে। কেউ নৌকায়। কেউ বা ডোড়ায়। বিলে এখন মাছ হয়েছে খুব। মাছের লোভে সারা বিল জুড়ে এখন লোকজনের আনাগোনা। সাঁপলাও তুলছে অনেকে। কাঠুখালির অনেক পরিবারকেই এখন ছুই-এক-বেলা সাঁপলা সিদ্ধ খেয়েই কাটিয়ে দিতে হচ্ছে।

বংশী ডোঙা বেয়ে এগিয়ে এলো বলরামের নৌকার

কাছে। বলরাম নৌকাটা দাঁড় করাল। বংশীকে বলল—
“আয়, নৌকায় উঠে আয়।”

বংশীর ডোঙায় বড়ো এক এক আঁটি শাঁপলা। আর কিছু কুচো মাছ। বংশী ডোঙাটাকে নৌকার গা ঘেষে দাঁড় করিয়ে নৌকার উপর উঠে এলো। নৌকার খোলে হুকো কল্কে আর আঙনের মালুসা ছিল। বলরাম হুকোটা সাঙতে এলো। বংশী নৌকায় উঠে চালির পরে বলল। বলরাম দু'একটা টান দিয়েই হুকোটা বংশীর দিকে বাড়িয়ে দিল। হুকোটা নিতে নিতে বংশী জিজ্ঞাসা করল—“গিলি য়ানো মনে হচ্ছে কোনো দিগি।”—

বলরাম উত্তর দেয়—“আর কোস ক্যানো ভোগান্তির কথা। সাপুইতলির ভুঁইতি গিলাম। সেই ব্যাহান-ব্যালান্তে কোচোড়ির ধাপ ঠেলতি-ঠেলতি গায়-গতরে ব্যাধা হয়ে গেছে।”

বংশী হুকো টানার ফাঁকে জিজ্ঞাসা করে—“তা দিয়ে আইছিস তো সব ঠেলে?”

বলরাম বলে—“দেলাম তো কোনো গতিকি এডু সরিয়ে। ফের আবার না আ'লি হয়।”

একটু পরে বংশী বলে—“স্তুনিছিস, কাল নকুল জ্যাঠা গাঙের জল দেখতি গিলো।” উৎসুক গলায় বলরাম বলে—
“না, তাতো স্তুনি। তানকুল কাকা ক'লো কি আ'সে?”
শুকনো মুখে বংশী বলে—“বা কয়, তা স্তুনলি তো ভয় নাগে। গাঙের জলে এবার নাকি বড়ো রাগ। গোল্ডও হইছে বেজায়। এ-দিগি জল তো দিনির দিন বাড়ুই চলিছে।”

বলরামও চিন্তিত মুখে বলে—“হয়, জলের বাড়ুডা এবার ভালো ঠেকজিছে না। তা আগে থাকতি অতো ভয় পাইয়েই বা নাভড়া হবে নে কি?”

একটুকু চুপচাপ কাটে। বংশী কেমন যেন উশ্খুল করতে থাকে। কি একটা কথা যেন বলি-বলি করেও মুখে

আটকে যাচ্ছে? বলরাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—
“কিছু এটা ক'বি যানো মনে হচ্ছে।”

শুকনো মুখে বংশী একটু হেসে বলল—“হয়, কবো ভাবতিলাম এটা কথা। তা তুই যদি কিছু না ভাবিস তো কই।”

বলরাম বংশীর কথা শুনে হেসে ফেলল। বলল—“আরে, তুই দেখতিছি সেই রূপ-কথার বিস্তৃত জুড়ে দিলি। সেই যে রাজার কাছে আসে সগোলে কয়—রাজামশায়, ভয়ে কবো, না নিতুয়ে কবো। তা তোর কথাডা কি নিতুয়েই ক'দেহি স্তুনি।”

একটু আমতা আমতা করে বংশী বলল—“কচ্ছিলাম কি, যদি ধামা-ধানেক ধান দিতিস এই কয়ডা দিনির জন্তি। তালি বড়ো উপুগারে নাগতো।”

কথাটা শুনেই বলরামের মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। কোনো জবাব দিল না।

তুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বংশী ধরা গলায় বলতে লাগল
“বড়ো কষ্ট যাচ্ছে রে। কালকে গোনেশের মা খালি কান্দিছে। আশাগোর জন্তি ভাবি না। নাল ঘেচু-শালুক খাইয়ে একভাবে কাটায় দিতি পারি। গোনেশ আর টেশিরে নিয়েই হচ্ছে ভাবনা। ওগের দিগি তাগালি পরাগডায় আর লহু পায়না। কয়দিন আগে গোনেশের মামাবাড়ী গিলাম। ক'য়ে বুলে ধামা আধেক ধান আনিলাম। ঘরে কয়ডা খেসারীর ডাল ছেলো। ডালি-চালি মিশিয়ে কোনোমতে একবেলা হাড়ি চড়তিছে। গোনেশ তা খাতি পারে না। কালকে আমার গল জড়ায় ধরে কচ্ছে—‘বাবা, আমি আর চাল-ডালির ভাত খাতি পারি না। আমারে কয়ডা ভালো ভাত আনে দিও।’—কি কবো ক’ বলরাম! শুনে তো ওর মা খালি কান্দে। চাল-ডালির ভাত তাই জুটোতি পারছি না। আর ছলে কয়—‘ভালো ভাত খাবো।’”

বলতে বলতে বংশী শেষে যায়। খাঁকারী দিয়ে গলাটা

একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলে—“ভাবতিলাম, আর একবার গোনেশের মাথাবাড়ী যাব। চাইরে-চিন্তে যদি আর ধামা-খানেক ধান আনতি পারি। কিন্তুক যাই কোন্ মুখ নিয়ে ক। ওগেরও তো অবস্থা ভালোনা। এক গাদা মানুষ সাংসারে।”

বলরাম উঠে গিয়ে নৌকার চরার উপর বসল। বাঁশের লম্বা লগিটা মাটিতে পোতা ছিল। টেনে তুলতে তুলতে বলল—“তা আমারই অবস্থাভা বা তুই কি এমন ভালো দেখলি? আমার ঘরে তো আর দুই-দশমন মজুত করে রাখিনি।”

বংশী হঠাৎ যেন বড়ো অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলে—“না, না, তুই রাগ করিস্নে বলরাম। না থাকলি তুই দিবি কনুতে ক’। আমি ভাবিলাম—”

কথাটা আর শেষ করতে পারে না বংশী। ডোঙাটা নৌকার গায়ে টেনে এনে উঠে পড়ে। বাইতে বাইতে বলে—“তো চল, বাড়ী যাবি তো একসাথে যাই।”

বলরাম অমৃতদিকে তাকিয়ে বলে—“তুই বাতি লাগ। আমি এটু পরে যাবো।”

বংশী ডোঙা বাইতে বাইতে চলে গেল। বলরাম খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। লগির খোঁচায় নৌকাটা সামনের দিকে এগিয়ে চলল। বেশ বেলা হয়ে উঠেছে। ভাদ্রের মেঘ-মোছা আকাশের রোদ। চামড়া যেন পুড়িয়ে তোলে। নীচু হয়ে হাত-বাড়িয়ে এক আল্লা জল তুলে বলরাম চোখে মুখে ছিটিয়ে দিল। তারপর উদ্বেগহীনভাবে নৌকাটাকে সামনের দিকে বেয়ে নিয়ে চলল।

খানিক দূর যেতেই সামনে পড়ল অনেকগুলো চারা তালগাছের সারি। বেশীরভাগই গোড়ার দিকটা জলে ডোবা। অনেকদূর চলে এসেছে বলরাম। পাশেই হাতিনাড়া গ্রাম। আর সামনে ঐ তালগাছেরা উঁচু জায়গাটা হল হাতিনাড়া গ্রামের শ্মশান। এখন অবশ্য কিছুই

বোঝার উপায় নেই। প্রায় সমস্ত শ্মশান-ভূমিটাই জলে ডুবে গেছে। শুধু উপরের দিকে চিপি-মতন একটা জায়গায় হাত করেক মাটি ভাসন আছে।

বলরাম আঙে আঙে নৌকাটা ওদিকেই বেয়ে নিয়ে চলল। তালগাছের গোড়ার কাছে এসেই নৌকাটা ঝাঁচ করে আটকে গেল। নৌকার তলায় মাটি ঠেকে গেছে। বলরাম নৌকায় বসেই জেগে-ধাকা মাটিটুকুর দিকে তাকাল। একটা তালগাছের শুকনো গোড়টা ঘিরে রাশি-রাশি পিপড়ে জমা হয়েছে। চারিদিকের সব শুকনো জায়গা ডুবে গেছে। এই জায়গাটুকুই মাত্র ভেসে আছে। প্রাণ বাঁচানোর একটুখানি মাত্র নিরাপদ ঠাই। যারা ভাসতে ভাসতে ভেসে গেছে, তারা তো গেছেই, যারা পেরেছে, সীতরে এসে এখানে উঠেছে। এ-আশ্রয়টুকুও বেশীক্ষণ থাকবে না তা ওরা বুঝতে পেরেছে। সময় থাকতে তাই তৎপর হয়েছে। যাদের সামর্থ্যে ফুলোচ্ছে, তারা গিল্পিল্প করে সারিবৈধে তালগাছের মাথায় উঠে যাবার চেষ্টা করছে। আর অক্ষম অসমর্থ দলা-পাকানো পিপড়েগুলো শেষবারের মতন ভেসে যাবার জন্ত প্রতীক্ষা করছে।

বলরাম কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওদিকে। তারপর কি মনে করে নেমে পড়ল নৌকা থেকে। ভারী স্তম্ভের দেখাচ্ছে জায়গাটা। চারিদিকে স্বচ্ছ, স্বচ্ছকে জল। সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে সে জলে। জল-ও যেন আলো হয়ে উঠতে চাইছে। অল্প-অল্প বাতাসের দোলায় ছোট-ছোট ডেউগুলো চারপাশে উছলে পড়ছে। ভারী ভালো লাগল বলরামের।

হঠাৎ পায়ের নীচে নজর পড়তেই ছ্যাৎ করে উঠল বলরামের বুকটা। তাড়াতাড়ি একপাশে সরে দাঁড়াল। ভালো করে লক্ষ্য করল জায়গাটা। তালগাছের গোড়টার একটুখানি নীচে থেকেই লম্বালম্বি খানিকটে জায়গায় নুতন মাটি ফেলা। ভালো ক’রে নজর করলেই চোখে পড়ে।

নীচের দিকটা জলে ডুবে গেছে। তবু জলের তলা-থেকেই বুঝা যায়।

একটু কাল ভাবল বলরাম। তারপর অপলকে তাকিয়ে রইল জায়গাটার দিকে। বুঝতে পারল, এখানেই পদ্মকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। গলায় দড়িদেওয়া মরা। গাউপারের শ্মশানে নিতে যাওয়ার নানান স্বাক্ষি আছে। পোড়ানোর কামেলার মধ্যেও যায়নি ভলহরি। অতো কাঠের জোগাড় করে কে। তাই এখানেই মেয়েটাকে মাটি চাপা দিয়ে রেখে গেছে।

জায়গাটার মাথার পাশ ঘেষে বসল বলরাম। আন্তে আন্তে ঝুরো-ঝুরো মাটিগুলোর পরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বলরামের সব পাপ আর অপরাধের ভার মাথায় নিয়ে সারাজীবনের ভালবাসাটুকু বুকে ব'য়ে পদ্ম হারিয়ে গেছে। কারো বিরুদ্ধে কোনো নালিশ বা অভিমান সে রেখে যায়নি। বুকের মধ্যকার সেই অসহ যন্ত্রণাটা আজ যেন ফুলে ফেঁপে ঠেলে বেরিয়ে এলো বলরামের। দাঁতে দাঁত চেপে আজ কদিন যন্ত্রণাটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু আজ এই নিরালস্য পদ্মর শেষ-আশ্রয়ের মাটিটুকুর পরে ব'সে বিশ্বাসঘাতক হঠকারী বলরাম নিজেকে আর সামাল দিয়ে রাখতে পারল না। অসহায় বেদনা গুমনে উঠল বুকের মধ্যে। শুকনো চোখ দুটো ছাপিয়ে বর্ষার আকাশ উথলে উঠল। ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। উপুড় হয়ে বলরাম আঁকড়ে ধরল মাটির রাশিটুকুকে। বলরামের চোখের জলে ভিজ ভিজ স্নিগ্ধ হয়ে উঠল জায়গাটা।

খানিক বাদে বলরাম ফিরে এলো। নৌকাটা এনে বাধল বাড়ীর ঘাটেই। নৌকা থেকে নামতেই নারায়ণ ছুটে এলো। হৈ চৈ করে বাবার হাত জড়িয়ে ধরল। সুবাসী সেদিকে তাকিয়ে একটু হাসল। নারায়ণকে লক্ষ্য করে বলল—“পাইছিস্ তোর বাবারে?”

নারায়ণকে নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বলরাম তাকায়

সুবাসীর দিকে। সুবাসী একটু হেসে চোখ নাগিয়ে নিয়ে বলে—“তোমার নারায়ণের কথা আর কইয়ে না। তা তুমি এট্টা কাজ করো। এট্টা ঝোলা বানায়ে ছাও। য়ানে যাবা, ওরে সেইডের মধ্য পুরে নিয়ে যাবো।”

বলরাম সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করে—“ক্যানো, হইছে কি?” সুবাসী গলাটা একটু চড়িয়ে বলে,—“হবে আবার কি? তুমি যাওয়া ইত্তিক সেই যে ঠালা ধরিছে—‘বাবার কাছে যাব’—, ‘বাবার কাছে যাব’ তার কি আর থামার নাম আছে নাকি? এহেবারে জালায়ে পোড়ান্নে খালে। এট্টা কাজ যদি এট্টু হস্তির হইয়ে কত্তি দেবে।”

বিশের লগিটাকে গোয়াল ঘরের পাশে হেলান দিয়ে রেখে বলরাম নারায়ণকে কোলে তুলে নিল। বাপের কোলে মুখ লুকিয়ে নারায়ণ মার দিকে তাকিয়ে জিত বের করে ভেংচি কাটল।

বারান্দায় এসে বলে হকোটা পেজে নিয়ে বলরাম টানল কিছুক্ষণ। তারপর হকোটা বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে নারায়ণকে বলল—

“শাগীণের বাড়ী যাবি নাকি?”

নারায়ণ উজ্জসিত হয়ে উঠল। এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল।

বলরাম বলল—“ভালি দাঁড়া, আমি আস্তিছি।”

বলে বলরাম ঘরের মধ্যে গেল। ঘরের একপাশে ছোটো একটা মাচা বাঁধা। মাচার পরে বিশের চাঁচ দিয়ে বোনা ধানের গোলা। একটা ধান হাতে বলরাম গিয়ে দাঁড়ালো গোলাটার পাশে। তাকালো গোলাটার মধ্যে। এক মুঠোও ধান নেই। সরে গিয়ে দাঁড়ালো পাশের একটা ডোলায় পাশে। সাকুল্যে ধান তিন-চার ধান বোধ হয় আছে আছে ডোলাটায়। সারা বর্ষাকালটার একমাত্র সম্বল। এই ধান কমটা ফুরিয়ে গেলে হাজার মাথা কুটলেও কোনো দিক

থেকে আর ছ'মুটো আগার উপায় নেই। সামনে এখনো এতোগুলো দিন।

ধামাটা তুলতে গিয়ে হাত ছ'খানা কেঁপে উঠল বলরামের, কিন্তু শক্ত করল বলরাম নিজেকে। অবিচল হাতে ধামাটা তুলে নিল। গুজে দিল ধানের মধ্যে। ঠেলে ঠেলে ধান বোঝাই করল। তারপর ধান-ভর্তি ধামাটা নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। নারাগকে বলল—“বাবি তো চল। নৌকায় গিয়ে ওঠে।”

বলরামের আগে আগে গিয়ে নারাগ নৌকায় উঠল। বলরাম ধামাটাকে নৌকার উপর নামিয়ে রেখে নৌকাটা বেয়ে চলল। সারা গ্রামের মধ্যেই এখন জলে জলময়। কোথাও নৌকা বাধে না। খানিকদূর যেতেই নৌকার পাশ ঘেষে নীচের দিকে তাকিয়ে নারাগ টেঁচিয়ে উঠল—“বাবা, কতো মাচ যাচ্ছে—।”

এ-জায়গাটা উঁচু ভাগাড়। জলটা একটু কম। রোদের আলো পড়ে জলের মধ্য দিয়ে তলার মাটি দেখা যাচ্ছে। বলরাম তাকিয়ে দেখল, এক বাঁক বড়ো বড়ো পুটি ছোটো-পুটি খেতে খেতে ছুটে যাচ্ছে। বলরাম সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ছেলেকে ধমক দিল—“তুই এটু চূপ করে বয় তো। অতো বাগস্তারাপানা করিস্নে। পড়ে গেলি ফটিকটাং বারোয়ে যাবেনে।”

বাতাসীদের বাড়ীর ঘাটে এসে নারাগকে নামিয়ে দিয়ে বলল—“তুই এটু ভোর মাসীর কাছে থাকতি নাগ। আমি এটু ভোর বোংশে কাকার কাছে যাছি। ফেরার সোমায় তোরে তুলে নিয়ে যাবানি।”

নারাগকে নানিয়ে দিয়ে বলরাম আবার এগিয়ে চলল। বংশীদের ঘাটে এসে নৌকা লাগাল। নৌকা থেকে না নেমেই গলা চড়িয়ে ডাক দিল—“বোংশে বাড়ী আহ্লি নাকিরে?”

কয়েকবার ডাকতেই বংশীর ছেলে গনেশ ঘাটের কাছে

এগিয়ে এলো। হাড় জিরজিরে রুগ্ন ছেলেটা। চেঁচিয়ে জবাব দিল—“বাবা বাড়ী নেই।”

বলরাম বলল—“বাড়ী নেই? গেছে ক'নে?”

গনেশের মা চন্দ্রী আগে বুরুতে পারেনি কে ডাকছে। ঘর থেকে বেরিয়েই বলরামকে দেখে খানিকটে ঘোমটা টেনে দিল মাথায়। গনেশকে বলল—

“ক' ঘে—ব্যাহান-ব্যালায় ক'নে গেছে। কিছু কইয়ে যায়নি।”

একটুকুণ ভাবল বলরাম। তারপর ধানের ধামাটাকে ওদের উঠোনে নামিয়ে রেখে বলল—“ধান কমডা তুলে ধোও। বোংশে আমারে এক ধামা ধানের কথা কইলো। তা দিয়ে গ্যালাম। বোংশে বাড়ী আ'লি কইয়েনে।”

বলরাম আর দাঁড়াল না। ধামাটা খালি করে দিতেই নৌকায় এসে বাইতে শুরু করল। ফেরার পথে নারাগকে তুলে নিল বাতাসীদের বাড়ী থেকে।

বাড়ী ফিরে এসে বাবান্দায় বসতেই একটুবাদে রান্নাঘর থেকে স্ববাসী এলো। হাতে একটা ভেলের শিশি। শিশিটা বলরামের পাশে রেখে দিয়ে বলল—“নারাগের নিয়ে ডুবোয়ে আশো। আমার রান্না হয়ে গেছে।”

বলরাম কোনো কথা বলল না। বলরামকে চূপ করে থাকতে দেখে স্ববাসী বলল—“ধামায় গুরে ধান নিয়ে গেলে মনে হলো। অতোগুলো ধান। দিলে নাকি কারো?”

বলরাম হঠাৎ যেন ফেটে পড়ল—“দিছি বেশ করিছি। তাতে তোমার কি? আমার খা'টে পিটে আনা ধান, আমি যারে খুশী দেবো। তোমার অতো চোখ-টাটানির ধার ধারি নাকি?”

স্ববাসী অবাক হ'ল। কিন্তু কোনো কথা বলল না। নিঃশব্দে সরে গেল সামনে থেকে।

খানিকক্ষণ শুন্ম যেরে বসে থাকল বলরাম। তারপর নারাগকে নিয়ে স্নান করে এলো। ওরা স্নান করে আসতেই

স্বাসী তাড়াতাড়ি খাবার জায়গা ক'রে দিল। ভাতের খালি প্রয়োজনের চেয়ে কয়েক মুঠো ভাত কম। স্বাসী খালি ভাতের পরিমাণ যে আরো কমে যায়, তা অসুমান করতে পারে বলরাম।—কিছুদিন ধরেই এইভাবে চালাতে হচ্ছে। পেট ভ'রে খেতে গেলে কদিন পরে যে একেবারে না খেয়ে থাকতে হবে।

ভাতের খালা টেনে নিয়ে এক গ্রাস ভাত মুখে তুলতে গেল বলরাম। মুখের কাছে নিয়ে আবার ভাত ক'টা নামিয়ে রাখল খালায়। স্বাসীকে ডেকে বলল—“এদিগি শোনো।”

ভয়ে ভয়ে স্বাসী তাড়াতাড়ি কাছে এসে দাঁড়াল।

বলরাম স্বাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথাটা নীচু করল। খালি ভাতগুলো নাড়তে নাড়তে বলল—“আমার কথো শুনে রাগ করলে নাকি তুমি?”

স্বাসী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল। কোনো কথা বলল না। বলরাম মাথাটা না তুলেই আবার বলল—“আমার কথায় তুমি রাগ হইয়ে না।”

মাথাডা আমার ঠিক ছেলো না।—কি করব কও। বিলি গিলান। বোংশে যাইয়ে কা'ন্দে-কাটে পড়িছে। ধান কমড়া না দিলি হয়ত ভালোকরতাম। কিন্তু ওর মুখখানার দিগি তাগায়ে বড়ো মায়ী হলো মনে। বড়ো ভরসা নিয়ে আইছে আমার কাছে।”

স্বাসী সরে গিয়ে বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে বলল—“বোংশে-ঠাউরপোরে ধান দেছো, তাতে আমি কইছি নাকি কিছু। দেছো, ভাণো করিছো। উপায় থাকলি কি কেউ আর পরের ছয়োরে হাত পাততি আসে। তা মানুষির দিন-বিদিনে যে এটু তুস-বাস্ত নেবো, সে ভাগ্যি কি আর দেছে ভগোমান আমাগের। আর কয়দিন পরে আমাগেরই যে কি দশা হবে কেউ জানে।”

সে ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা ভাবতে পারে না বলরাম। বুকের মধ্যে শিউরে ওঠে। তাড়াতাড়ি করে খালি ভাত-

গুলো মাথতে মাথতে বলে—“না, না—সে তুমি ভাবে না—সে তুমি ভাবে না—। একভাবে চলে যাবেই।”

তারপর নারাগের দিকে ফিরে একটা ধমক দিয়ে বলে—বলে—“আরে? তুই ব্যাটা গজা পণ্ডিত মতন হাঁ করে বসে আছিস ক্যান্? নে, নে—খাইয়ে নে—। প্যাট ভরে খাইয়ে নে—।”

২৩

জীব দিয়েছেন যিনি, আহা! দেবার ভারও তাঁরই উপরে। এই হল নিয়ম। আর এ-নিয়মের ব্যত্যয় হতে পারে না। কাঠুখালির মানুষগুলো তা জানে। প্রতিটি গ্রামে এখন অভাবের অন্ধকার। একবেলা যদি কোনোমতে হাঁড়ি চড়লো, তবে কয়বেলা পরে আর হাঁড়ি চড়বে তার হদিশ নেই। মানুষগুলো হতাশ হয়ে পড়ে। হাড়সার উপোষী শরীরটার সব শক্তি নিঃশেষে ফুরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু তবু যেন কেউ ভেঙে পড়েনা। যেমন করে হোক, বাঁচতে হবে। প্রাণধারণের তাগিদে সকলে হচ্ছে হ'য়ে বোরে। ভাত না জোটে, না ছুটুক। হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তাই দিয়েই উমরের রান্ধসটাকে ঠাণ্ডা রাখতে হবে। নেই বললে তো ও-রান্ধসটা শুনবে না। যে যা পারো জোগাড় করো। জোগাড় ক'রে পেটে দাও। জীবসৃষ্টির মালিক তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমার আহা! ও সৃষ্টি করে রেখেছেন। তুমি যেমন, করে পারো, খুঁজে পেতে নাও।

কাঠুখালির সারা বিল জুড়ে এখন শাঁপলা, ঢ্যাপ আর শালুকের ছড়াছড়ি। শাঁপলা আর শালুক সিঁদ্র খেয়ে দু'-একটা বেল পাঁচ করে দেওয়া যায়। ঢ্যাপ শুকিয়ে গরম খোলায় দিলে দিব্যি ফুর-ফুরে খই বেরিয়ে আসে। ছুই-চার মুঠো মুখে পুরে দিয়ে ঘটিখানেক জল খাও। খানিকক্ষণের মতন পেটটা ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে। এখানে লেখানে জলের পরে বড়ো বড়ো কলমীর ধাপ জন্মেছে।

দ্রব্য লবলকে ডগাঙলো। সিদ্ধ করে দু'ফোঁটা হুন ছিটিয়ে দিয়ে চোখ কান বুজে খেয়ে ফেলো। জীবন্তা ভগবানের পৃথিবীতে আহ্বারের কি অভাব আছে নাকি।

তবে এ-সময়টায় মাছের সত্যিই বড়ো আমদানী হল। কুচো থেকে শুরু করে বড়ো মাছ—ছুটোই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে লাগল। আর হবেই বা না কেন। যার যখন সময়। দিনে-দিনে জল বাড়ছে। মাছগুলোরও বিচরণের ক্ষেত্র বাড়ছে। কুচো মাছের হুটো-পুটিতে আর বড়ো মাছের 'হাফাল' খেয়ে টলমলে জল আরো টলমল করে উঠতে লাগল।

মাছ-ধরার সম্রাতিগুলো নিয়ে রাতদিন সকলে জলের উপর ঘোরাঘুরি করে। একে তো হা-ভাত সংসার। এ-সময়ে ভর-পেট মাছের ব্যবস্থাপণ কাম কথানয়। তাঁর চেয়েও বড়ো কথা—মাছ ধরার লোভ। 'একবার ও-নেশা মাথায় চাপলে আর দিনরাত সময় অসময়ের খেয়াল থাকে না। তবে মাঝে মাঝে দুর্ধটনা ঘটে বইকি। এতাবড়ো জলময় বস্তুমতী। মাছগুলোর এখন অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। ওরা তোমাদের হাতে মরবে। গাঙ-খাল উজিয়ে তোমাদের হাতে মরতেই এসেছে। কিন্তু তোমাদেরও ওদের চলাফেরার বিচার করতে হবে। সময়-অসময়ের হিসেব গুনতে হবে। তবেই ওদের মারতে হবে। তোমরা ওদের মারবে, কিন্তু হিসেবে ভুল হ'লে—অসাবধানে পা ফেললে, তোমাদেরও মরণ লেখা আছে ওদের হাতে। ওরা তো শোলাহুজি তোমাদের মারবে না। মারবে তোমাদের নিয়তির রূপ ধরে। দুর্ভাগ্যের ছদ্মবেশ নিয়ে।

কয়েকদিন আগেই ঘটে গেল ঐ-রকম একটা ঘটনা। কাঠুখালির বিলের একেবারে শেষ মাথায় হ'ল গোলাপোতা গ্রাম। এখানে-একটা ওখানে-একটা ফাকা বাড়ী। ও-পাশটা আরো নীচু। ডুবল-ও তাই বেশী করে। জল প্রথমে উঠোনে উঠল। তারপরে উঠোন ছাড়িয়ে ঘরে ঢুকল।

যাদের অন্ত গাঁয়ে ভালো। আত্মীয়-কুটুম আছে, তারা একে একে সেখানে উঠে যেতে লাগল। জল নেমে গেলেই আবার কিরে আগবে। যারা যেতে পারল না, তারা গরুবাছুর গুলোর কোনোমতে একটা ব্যবস্থা ক'বে ঘরের চালের একেবারে মটক শেষে মাচা বাঁধল। ঘরের মধ্যে দু-তিনহাত করে জল। ডাঙা বলতে কোথাও কিছু নেই। মাচার পরেই এখন সব কিছু। মাচার নীচে একটা করে নৌকা কি ডোঙা বাঁধা। এদিক ওদিক যেতে হলে ঐ ছাড়া আর উপায় নেই। রান্না-খাওয়াও ওরই পরে। গোলাপোতা গ্রামের দক্ষিণ-মাথায় হ'ল ভজন-মোড়লের বাড়ী। পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ে। ঘর ভরতি নাভি-নাভনী। উঠোনে জল উঠতেই ভজন মোড়ল সকলকে এখানে-ওখানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল। কিন্তু মেজ ছেলে যুগীনের মাথায় কি যে গাঁ চাপল ও-ই জানে। জেদ ধরল—সে যাবে না। নিজেও যাবে না, বউ আর কোলের ছয়মাসের ছেলেটাকেও যেতে দেবে না। ভজন মোড়ল অনেকক্ষণ ছেলেকে সাধাসাধি করল। শেষকালে না পেরে রাগ করে গালাগালি দিল—“ঘর তুমি সব কয়ডা জলে প'চে।”

ভজন মোড়ল সকলকে নিয়ে চলে যাবার কদিন পরেই জল উঠোন ছেড়ে বারান্দায় উঠল। তারপর ঘরে। যুগীন তৈরী ছিল। মাটি থেকে খানিকটা উপরে মটকার নীচে মাচা বাঁধল। বউ আর ছেলেকে নিয়ে উঠল তার উপরে। সঙ্গে কিছু চিড়ে আর চাল ছিল। তাতেই একভাবে চলে যেতে লাগল। সকাল হলেই যুগীন নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ছোটো বড়ো মিলিয়ে নানারকমের মাছ ধরে আনে। হাতে ওর অশ্রান্ত লক্ষ্য। অথৈ জলের তলা দিয়ে বড়ো বড়ো রুই কাতলা বোয়াল ঘুরে বেড়ায়। লম্বা লম্বা শ্রাওলা-গুলোর গায়ে নাড়া লাগে। ভেসে-থাকা শ্রাওলাগুলো ধির-ধির করে কেঁপে ওঠে। দূর থেকে তাক ক'রে যুগীন। সাঁই—করে ছুটে যায় ওর হাতের বিষণ্ণ-খানেক লম্বা বাঁকানো

চক্কে ফলা লাগানো দীর্ঘ 'জুতি'। দশাশই মাছটা অতোখানি জলের তলায়ও এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেথে যায়। মাছ পাগল যুগীন দিনরাত মাছের সন্ধানে জলে-জলে ঘুরে বেড়ায়। বউ মানা করে। অতো মাছ তো লাগে না। কতো আর খাওয়া যায়। শুধু-শুধু ফেলা যায়। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

রাতে যুগীন মাচার পরে বউ আর ছেলের পাশে শুয়েছিল। মনটা ভালো নেই। বে-কয়টা চাল ছিল, প্রায় ফুরিয়ে এগেছে। দিন কয়েক ধরে একটা বড়ো মাছও গাঁথতে পারেনি। যেজালাটা বিগড়োবারই কথা। ভোরে-ভোরে ঘুমটা ভেঙে গেল যুগীনের। মাচার চারপাশে আঠার মতন অন্ধকার লেগে রয়েছে। পরিষ্কার কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। হঠাৎ মাচার নীচে চোখ পড়ল যুগীনের। ঘরের মধ্যে এখন প্রায় হাত তিনেক জল। ভাঙা বেড়ার ফাক দিয়ে উঠি-উঠি স্বর্ষের আলো এসে পড়েছে সে-জলে। জলের দিকে তাকিয়েই চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল যুগীনের। শব্দ হয়ে উঠল মুখের দু'পাশের চোয়াল। নিশ,পিশ্ করে উঠল মাছমারা শিকারী হাতের কঙ্কীটা। ভালো করে চোখ দুটো মুছে আবার তাকাল। মাটি-গোলা ঘোলাটে জলটা মাঝে মাঝে পাক দিয়ে উঠছে। আর থেকে থেকে বুড়বুড়ি উঠছে জলের উপরে। যুগীনের মনে আর সন্দেহ রইল না। যাকে সে আজ কদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে, সে আজ নিজেই এসেছে। এসেছে একেবারে তার ঘরের মধ্যেই। ঘরের ভোয়ার মাটি খেতে খেতে একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বাছান। কিন্তু এবার! সতর্ক হাতে যুগীন পাশের থেকে কোচটা তুলে নিল। ভালো করে তাক করল জায়গাটা। তারপর প্রাণপণ শক্তিতে কোচটা ছুঁড়ে মারল বুড়-বুড়ি তোলা প্রকাণ্ড কাতলা মাছটার অদৃশ্য শরীরের দিকে। জলের নীচে গিয়ে মাছটাকে বেধেই কোচটা একবার একটু কঁপে উঠল। তারপরই স্থির হয়ে গেল।

কোচটাকে খানিকক্ষণ মাটির সঙ্গে চেপে ধরে রাখল যুগীন। তারপর আঙুলে আঙুলে সাবধানী হাতে টেনে তুলল। কিন্তু কোথায় কাতলা মাছ! ঘরের অন্ধকার তখন পাতলা হয়ে গেছে। আবছা আলোর যুগীন দেখল, তারই ছয়-মাসের ছেলেটাকে অষ্টে পৃষ্ঠে কোচের মাথায় গেথে তুলেছে। ভোরের দিকে কখন যে মার কোল থেকে ছেলেটা টুপ করে জলে পড়ে গেছে, তা দুজনের কেউই টের পায়নি। যুগীন শুধু টের পেলো কাতলা মাছে বুড়বুড়ি তুলছে। আর তাকেই যুগীন গেথে তুলল।

তোমরা মাছ মারো। মাছও তোমাদের মারে। বীভৎস ভয়ে যুগীন চীৎকার করে উঠেছিল। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওর বউয়ের। একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠেছিল দুজনে। তারপর মাচার উপর থেকে দুটো মানুষ কাঁপিয়ে পড়ল জলে। আর উঠল না।

তোমাকে প্রাণধারণ করতে হবে। আর সেজন্তে অন্তর প্রাণ হরণও করতে হবে। কিন্তু যাকেই তুমি মারো, আগে নিজের আট-বাট ভালো করে বেঁধে নাও। একটা প্রাণ নেবার আগে নিজের প্রাণ-পাখীটাকে সাবধান করে নাও। যে পথেই পা বাড়ানো, আগে ভালো করে সে পথের গুলুক-শাপুক জেনে নাও। যেখানে চোখের দৃষ্টি চলে, যেখানে তুমি সব কিছু দেখতে পাও—সেখানে আগ বাড়িয়ে যা কিছু করতে পারো। কিন্তু যেখানে চোখের দৃষ্টি চলে না, আঁধার নুতন অন্ধকার পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে,—সেখানে সাবধানে পা ফেলতে হয় বইকি। সারা রাজ্যটা এখন টলটল করছে জলে। ওর তলায় তোমার নজর যায় না। তোমার নিয়তি ওখানে অজানা। রহস্তের কান্দ পেতে রেখেছে। ডুলিয়ে-ভালিয়ে তোমাকে সেখানে টেনে আনতে চাইছে। অসাবধানে পা ফেললে সে কান্দে জড়াতে হয় বইকি! কাঠুখালির বিলের মানুষগুলোর মনে তাই সব-সময়েই একটা ছয়-ছয় ভাব। কখন কি হয়।

কিছুদিন আকাশটা বেশ পরিষ্কার ছিল। কিন্তু আশ্বিনের মাঝামাঝি এসেই হঠাৎ একদিন মেঘ জমল আকাশে। ঘন কালো পাথরের মতন কুচ্-কুচে মেঘ। কালো মেঘের ছায়া এসে পড়ল বিলের কালো জলে। সারা বিলের অতল কালো জল যেন আরো ভয়ানক, আর রহস্যময় হয়ে উঠল। দম্‌কায় দম্‌কায় শীতল পুবাল বাতাস বইতে শুরু করল। জলের বুকে ছলাং ছলাং করে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল ঢেউয়ের পরে ঢেউ। সাদা ফেনাগুলো কামটের দাঁতের মতন ঝকঝক করে উঠল। দুইদিন ধরে সারা বিলটা ঝোড়ো বাতাসের দোলায় একেবারে উথাল-পাথাল হয়ে গেল।

আমন ধানের গাছগুলো এতোদিন জলের তলে পাল্লা দিয়ে সমানে বাড়ছিল। কিন্তু সবকিছুরই তো একটা সীমা আছে। এতো জলের সাথে পাল্লা দেবার মতন শক্তি কোথায়। ক্ষেতভর্তি ধানগাছগুলো ক্রমেই নিশ্চেষ্ট হয়ে আসতে লাগল। মাথাটাকে জলের পরে জাগিয়ে রাখল কট, কিন্তু হাস-খানেক আগের অমন যে ডাগর-ডাগর ডগাগুলো—সব যেন কেমন সরু হয়ে গেল। ঐ-শরীরে কোলজোড়া ধানের বাইল কেমন করে তুলে দেবে কাঠুখালির চাষী মানুষগুলোর হুহাত ভরে! কয়দিনের ঝোড়ো বাতাসে ওদের মাথাগুলো যেন আরো মুয়ে এলো। অনেকেরই ঢেউয়ের দোলা সহ্য করতে পারল না। রাশি রাশি জলের নীচে শীর্ণ মূলটা আলগা হয়ে গেল মাটির থেকে। তারপর কাঠুখালির চাষী মানুষগুলোর হতাশ দীর্ঘশ্বাসের মতন নিরুপায় হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল অকূল জলের উপর দিয়ে।

আশ্বিন মাসের শেষের দিকে দুর্গা-পূজার তারিখ ছিল। পূজা আটকালো না। কিন্তু নামরক্ষা নাহ। কোনোমতে নমো নমো করে সেরে দেওয়া হল। ঘরে খাবার নেই। মনে ঝুঁক নেই কারো। এখন কি আর ফুটি-আমোদ জমে।

আশ্বিনের শেষাশেষি এসেই জলে টান ধরল। জলটা

এসেও ছিল যেমন শাঁই-শাঁই করে, বেতেও লাগল তেমনি তাড়াতাড়ি। আশ্বে আশ্বে জল উঠোন থেকে পথে নামল। পথ থেকে গড়িয়ে যেতে লাগল বিলের দিকে। সেখান থেকে নদীতে। পথ-ঘাট, আগাড় ভাগাড় জেগে উঠতে লাগল। স্থলচর জীবজন্তু আর পোকা-মাকড়ের বিচিত্র কোলাহলে আবার চারিদিক মুখর হয়ে উঠল। বাগঝাষা ঘাসের বেগুনী-রঙা ফুলের মধুর লোভে গুনগুন করে উঠল দলুকে-দল মোমাছি। অলস ডানা মেলে ধয়েরী রঙের নিঃসঙ্গ গাঙ্‌চিল আকাশ কাঁপিয়ে ডেকে ওঠে—চিলি—চিলি—ই-ই-ই—।

কাটিকে এসে অভাবের কামড়টা যেন আরো তীব্র হয়ে দেখা দিল। দিল যেন আর কাটতে চায় না। হিমের হোঁয়া বয়ে নিয়ে হ-হ করে ছুটে আসে উত্তরে হাওয়া। শিরশির করে হাড় পর্বন্ত কেঁপে উঠতে চায়। আর সেই সঙ্গে সারা শরীর জুড়ে কনু-কনু করে মোচড় দিয়ে ওঠে পাকস্থলীর অসহ্য নির্মম আর্তনাদ।

তবু আটকে থাকল না। কি-ই বা আটকে থাকে জগতে। উপায় একটা না একটা জুটে যারই। কাঠুখালির বিলের মানুষগুলোরও আর একটা উপায় জুটে গেল। জল কমে যাওয়ার সাথে সাথে নাল আর চ্যাপও কমে এলো। কিন্তু অল্প অল্প জলে একটা কি ছোটো করে সবুজ পাতা ভাগিয়ে দিয়ে জন্মাতে লাগল রাশি রাশি ধৈচু গাছ। কিছুদিনের মধ্যেই স্ততোর মতন সরু শরীরটার নীচে মাটিতে ধৈচু ফলে উঠল। ছোটো আলুর মতন দেখতে। খোলা ছাড়িয়ে ফেললে সাদা ধপ্‌ধপ্‌ করতে থাকে। সিদ্ধ করে খেলে ভাতের মতনই পেট ভরে ওঠে।

গাঁয়ের মধ্যে থেকে জল সরে যেতেই নকুল বালা চারিদিকে ঘুরে ফিরে দেখে। কাঁদা বাঁচিয়ে, ধান খন্দ পাশ কাটিয়ে সকলের বাড়ী গিয়ে তত্ত্ব-তালাশ নেয়। হিতাহিত পরামর্শ দেয়। বউঝিগুলোকে ডেকে বলে—

“বহুযাতা জাগোল হইছেন। এবার কিন্তু তোমাগেরও কাজ বাড়লো।”

নকুল বালাকে দেখে বউঝিগুলো ছুটে আসে। হাতের কাজ ফেলে, স্বগড়াঝাটি ভুলে সকলে নকুলকে ঘিরে বসে। মাধায় ঘোমটা টেনে দিয়ে কথা শোনে। অল্প বয়সী একটা বউ হয়ত ঘোমটার ফাঁকে কস্ করে বলে ফেলে—“তাঁ ঠাউর, আমাগের আবার কি কাজের কথা কও?”

নকুল বালা হেসে ধমক দেয়—“নবাবের বিটির আমার কাজের কথা শুনলি অতো ভয় লাগে ক্যানো? কাজ আছে—মেলাই কাজ আছে। ঘরের মামুষটার পরে সব ভার ছাড়ে দিয়ে বসে থাকিস্নে। ছুই-ব্যালা প্যাটে তো ছুডো দিতি হবে। তা ঘরের মামুষটার সাথে ভোগেরও এটু উজ্জু করতি হবে।”

অল্প কেউ হয়ত বলে—“তাঁ ঠাউর, আমরা হলান ঘরের বউ। আমরা কনুতে কি আনতি যাবো?”

নকুল বালা চোখ বড়ো বড়ো করে একটুকাল চুপ করে থাকে। তারপর বলে—“আছে—আছে। ভোগেরও আনার দোব্য আছে। সোমায় পালিই সগোলে হাঁড়ি নিয়ে বিলি চলে যাবি। হাড়ি ভরে ঘেঁচু তুলে আনবি।

নকুল বালার গলাটা থেমে যায়। তারপর যেন নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে বলতে থাকে—“মানকীর নজর সব দিগিই আচরে। জগতে মানানুতার হবে, মানবির অন্নকষ্ট হবে—

এড়াও তিনি জানেন। উপায়ও তিনি দেছেন। মানকী ডান হাতের মুঠ ভরে ধান ছড়িয়ে ছানু জগতে। জগৎ সোংসার ধনে-ধানে ভরে ওঠে। জন-মানিষির মুখি হাসি কোটে। আর সেই ধান যদি মারা যায়, তো জগৎ সোংসারে আকাল নামে। জগতের মানবির দ্রুত বাড়়ে। হালো-চাধীর কষ্টের পার থাকে না। তা সে কষ্ট মানকীর মুকিও বাজে। তিনি উপায় করে ছানু মানবির। তেনার ডান হাতের ধান যদি মারা যায়, তালি বা হাতের মুঠ ভরে ঐ ঘেঁচু ছড়িয়ে ছান বিল বাওড়ে। ঘেঁচু হলো মানকীর দেয়া পরাণ বাঁচানির আর এক উপায়।”

তারপর সকলের দিকে ফিরে বলে—“রোজ যাবি তোরা —রোজ যাবি। হাড়ি ভরে তুলে আনবি। তোরা যাবি। ছল মাইয়েরে দিবি। ঘরের মামুষটারও দিবি।”

জলে টান দিতেই রবি-শস্ত্রের বীজ ছড়ানো শুরু হ’ল। কিন্তু ধানের অবস্থা দেখে কারো মুখে আর হাসি এলোনা। পনেরো বোলা হাত লম্বা নাড়াগুলো জড়ি-বুটি হয়ে পড়ে আছে। মাধায় গিয়ে চোখে পড়ে-কি-পড়ে না এমন একটা করে বাইল। বাইলের অনেক ধানই অপুষ্ট। চিটে! তবু তাই দেখেই সকলের শুকনো মুখে শুকনো হাসি ফুটলো। ঝেড়ে-মুছে এখন যা ঘরে তোলা যাবে, তার মূল্য যে অনেক।

(ক্রমশঃ)

ভ্রম সংশোধন

নিবেদিতা সংখ্যার (কার্তিক, ১৩৭৪) ৪৭১ পৃষ্ঠায় শ্রীসৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত রচিত ‘নিবেদিতা-স্মরণ’ কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে শেষ পঙ্ক্তি হবে “শৃঙ্খলিত লক্ষ বুকে এনেছিল বিপুল স্পন্দন!” “বিপুল” শব্দটি বাদ পড়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

জ. স.



কান্তা সুগন্ধি আপনার মানোরঞ্জনের মন্ত্র জানে

কান্তা সুগন্ধি মেখে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সজ্জফোটা ফুলের মত আপনি সৌন্দর্য ছড়াবেন। আপনি পাশ দিয়ে গেলে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হবে; আপনাকে সকলেই মুগ্ধনেত্রে দেখবে। হয়ত ভেমন কারো দর্শনও মিলে যেতে পারে—যার কাছে সেই মধুগন্ধে হৃদয়ে অকস্মৎ আগুন পাবেন মধুর শ্রীময়ী আপনি!

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিমিটেডের তৈরী

SWATON

ভগিনী নিবেদিতা গ্রন্থপঞ্জী

বিজয় দেব

ভগিনী নিবেদিতা জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে বর্তমান বছরে। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র পত্রিকার যে সব রচনা নিবেদিতা সম্পর্কে মুদ্রিত অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে এবং ভগিনী নিবেদিতার ব্যক্তিগত রচনার একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী এ রচনার পরিবেশিত হলো। ১৩ই অক্টোবর ১৯১১ সাল পর্যন্ত নিবেদিতা যে সব পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং নিয়মিত ভাবে তাঁর রচনা প্রকাশ হতো তার একটি বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হলো।

New India, Dawn, Indian Review, Modern Review Prabuddha Bharata, Hindu Review, Mysore Review, Behar Herald, The Bengalee, East and West, Sindh Journal, Hindu, Balbharati, Amrita Bazar Patrika, Statesman, Advocate, Tribune, Maratha, Times of India, Bombay Chronicle.

ভগিনী নিবেদিতার রচনার তালিকা এখানে মোটামুটি সম্পূর্ণ বলেই ধরা যায় অবশ্য পুস্তকাকারে মুদ্রিত অবস্থায়। পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার তালিকা অসম্পূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৬৭ দিনটি নিবেদিতার শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী হয়তো অম্লরাণী পাঠককে কিছুটা আলোকিত করতে সাহায্য করবে।

BOOKS IN ENGLISH BY SISTER NIVEDITA

1. Noble, Margaret Elizabeth (1867-1911) Agressive Hinduism. Madras, G. A. Natesan, 1905 41 p. 12 cm.
2. The Civic and National Ideals ; authorised ed. Calcutta, Udbodhan Office 1912 148 p. 20 cm.
3. Cradle Tales of Hindusim. London, Longmans, Green & Co., 1907. 343 p. 18 cm.
4. Footfalls of Indian History. London, Longmans, Green & Co., 1915. 276 p. 28 p. 21 cm.
5. Glimpses of famine and flood in East Bengal. Allahabad, Indian Press, 19— . 95 p. 18 cm.
6. Hints on education. Calcutta,—, 1914.
7. Hints on national education in India. 3rd ed. Calcutta, Udbodhan Office, 1923. 180 p. 18 cm.
8. An Indian study of love and death. London, Longmans, Green & Co. ; 1908. 76 p. 17½ cm.
9. Indian thought (In Hollins, Dorothea, ed : Utopian papers, Pages 179-187).
10. Kali, the mother. London, Swan

Sonnenschein & Co., 1900. 11-114 p. 14½ cm.

11. Lambs among wolves....Missionaries in India. London, R. B. Johnson, 1903. 32 p. 18 cm.

12. The Master, as I saw him, being pages from the life of the Swami Vivekananda by his disciple Nivedita. Calcutta, Udbodhan Office, 1910. 514 p. 18 cm.

13. The Northern tirtha, a pilgrim's diary. Calcutta. 1911. 80 p. 18 cm. (title page wanting)

14. Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda. authorised ed. Calcutta, Udbodhan Office, 1913. 166 p. 19 cm.

15. Religion and dharma with a preface by S. K. Ratcliffe. London, 1915. 20 cm.

16. Noble, Margaret Elizabeth (1867-1911)

Select essays of Sister Nivedita with foreword by A. J. F. Blair. 2nd ed. Madras, Ganesh & Co., 1917. 270 p. 18 cm.

17. Siva & Buddha. Calcutta, Udbodhan Office, 1946. 47 p. 18½ cm.

18. Studies from an eastern home...with a prefatory memoir by S. K. Ratcliffe and a portrait. London, Longmans, Green & Co., 1913. 213 p. 19 cm.

19. Un Chant d'amour et mort ; preface et tr. française de Lizelle Reymond. Lyon, Paul Derain, 1951. 45 p. 16½ cm.

20. ...Vivekananda, tel que je l'ai vu ; tr. française de Rose Rigaud et Jean Herbert. Preface de Lizelle Reymond. Paris, Albin Michel, 1952. 316 p. 20 cm.

21. The Web of Indian life ; with an introduction by Rabindra Nath Tagore, new

ed. Bombay, Longmans, Green & Co., 1918. 276 p. 19 cm.

22. Noble, Margaret Elizabeth & Coomaraswamy, Ananda K. Myths of the Hindus and Buddhists with 32 illustrations in colour by Indian artists under the supervision of Abanindra Nath Tagore. London, George G. Harrap, 1913. 399 p. 24 cm.

23. (Utopian papers...by Sister Nivedita ... : Geddes, P.) 1908.

Books & Articles on Nivedita. (English)

24. Atmaprana, Pravrajika.

Sister Nivedita of Rama Krishna-Vivekananda. Calcutta, Sister Nivedita Girls' School, 1961. 297 p. 22 cm.

25. Reymond, Lizelle.

(a) Nivedita : fille de l'Inde. preface de Vishvabandhu. Paris, Editions Victor Attinger, 1945. 350 p. 20 cm.

(b) Dedicated ; a biography of Nivedita N. Y., John Day, 1953, 374 p.

26. G. A. Natesan & Co.

Sister Nivedita : a sketch of her life and her services of India. Madras, G. A. Natesan & Co., 1914.

Articles published in different Journals etc.

27. Ajayaprana, Pravrajika.

Sister Nivedita (The Vedanta Kesari, Vol. LI, No. 2 : June, 1964 p. 191-194.)

28. Atmaprana, Pravrajika.

The Master and the disciple. Bhagini Nivedita Janma Satavarshiki Smarak Grantha : Pratham Paryaya, ed. by Sankari Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh. p. 1-8.

29. Bhaktiprana, Pravrajika.
Reminiscences of the Holy Mother and Sister Nivedita. Vedanta Kesari. Vol. No. LIV, No. 3. July, 1967 : p. 153-154.
30. Bhattacharyya, Jogesh Chandra.
Sister Nivedita—a life of spiritual dedication. Bhagini Nivedita Janma Satavarshiki Smarak Grantha : Pratham Paryaya, ed. by Sankari Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh : p. 62-64.
31. Burman, Debajyoti.
Sister Nivedita and Indian revolution. Bhagini Nivedita Janma Satavarshiki Smarak Grantha : Pratham Paryaya, ed. by Sankari Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh : p. 68-75.
32. Chatterji, Pritibhusan.
Sister Nivedita's interpretation of Dharma. Bhagini Nivedita Janma Satavarshiki Smarak Grantha : Pratham Paryaya, ed. by Sankari Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh : p. 56-61.
33. Chatterjee, Bakhahari.
Sister Nivedita in the background of contemporary Indian politics. Bhagini Nivedita Janma-Satavarshiki Smarak Grantha : Pratham Paryaya, ed. by Sankari Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh : p. 76-94.
34. Ganguly, O. C.
The Sister Nivedita. Bhagini Nivedita Janma-Satavarshiki Smarak Grantha : Pratham Paryaya, ed. by Sankari Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh : p. 33-34.
35. Kshirsagar, S. K.
A rare interpreter of the Indian way of life. Bhagini Nivedita Janma-Satavarshiki Smarak Grantha : Pratham paryaya, ed. by Sankari Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh : p. 48-55.
36. Pendse, V. V.
Sister Nivedita and Shree. Gopal Krishna Gokhale. Bhagini Nivedita Janma-Satavarshiki Smarak Grantha : Pratham Paryaya, ed. by Sankari Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh : p. 9-32.
37. Lokeswarananda, Swami.
The Impact of Sister Nivedita on Indian society. Bhagini Nivedita Janma-satavarshiki Smarak Grantha : Pratham Paryaya, ed. by Sankari Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh : p. 35-41.
38. Smaranananda, Swami.
Understanding India : Nivedita's example. Bhagini Nivedita Janma-Satavarshiki Smarak Grantha : Pratham paryaya, ed. by Sankari Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh : p. 42-47.
39. Venkatachari, P. N.
Poet Bharati's panegyrics upon Sister Nivedita. Bhagini Nivedita Janma-Satavarshiki Smarak Grantha : Pratham Paryaya, ed. by Sankari Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh : p. 65-67.
40. Civic & National ideals (Notes). Modern Review ; January 12, '11 (1) : 111.
41. Notes. The Hindu Spiritual Magazine Vol. VI, Nos. 7-12 : September, 1911—February, 1912 (October, 1911 : p. 156).
42. The Sister Nivedita Memorial meeting (Notes). Modern Review ; April, 1912, 11 (4) : p. 450-451.
43. Sister Nivedita (Notes). Modern

Review ; N-D., 1911, 10 (5-6) : p. 514-517, 624. illus.

GUJARATHI.

1. Acarya, Gunavantayaya.

Nivedita. 2nd ed. Rajkot, Navayuga Pustaka Bhandar 1948, 899 p. 18 cm.

MARATHI.

2. Noble, Margaret Elizabeth (1867-1911)

Rastriya Hindu Dharma, tr. by Panduranga Sadasiva Sane. Poona, D. R. Kopardekara, 19—. 165 p. 18 cm.

3. Samajdharma, tr. by Panduranga Sadasiva Sane, ed by T. G. Bapat. 2nd ed. Poona, D. R. Kopardekara, 1952. 100p. 18 cm.

4. Kulkarni, Kasinath Vinayak. Bhagini Nivedita. Bombay, Author, 1961. 131 p.

5. Pendase, V. V. Vivekananda kanya Nivedita, Poona 1963. ii, 304 p.

ORIYA.

6. Misra, Krsnaprasad.

Nivedita. Cuttack. Cuttak Students' Store, 1954. 21 p. 18 cm.

TELUGU.

7. Satyanarayana Visvanatha.

Nivedita. Vijayawada Uma Publishers, 1964. 308 p. 18 cm.

[ভগিনী নিবেদিতা রচিত গ্রন্থসূচী, নিবেদিতা সম্পর্কীয় গ্রন্থ তালিকা এবং পত্র-পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ, কবিতার সংক্ষিপ্ত সূচী]

ভগিনী নিবেদিতা

(১) নোবেল, মার্গারেট এলিজাবেথ (১৮৬৭-১৯১১) শিব ও বুদ্ধ, দ্বিতীশচন্দ্র চৌধুরী অমু :। কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৪৯। ৬১ পৃঃ।

(২) —স্বামিজীকে বৈষ্ণব দেবিয়াছি।...মাধবানন্দ স্বামী অমু :। কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬১। ৪৬১ পৃঃ।

(৩) —স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে। ১৯১৭। ১৮ সি.এম।

(৪) গুপ্ত, প্রজ্ঞাৎ।

ভগিনী নিবেদিতা। কলিকাতা, চক্রবর্তী এণ্ড কোং ১৯৬—। ১১০ পৃঃ। ২১ সি.এম।

(৫) ঘোষ, নীরা।

ভারত কল্পা নিবেদিতা। কলিকাতা, এভারেষ্ট বুক হাউস, ১৯৬—। ১১০ পৃঃ। ২১.৫ সি.এম।

(৬) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ।

পরিচয়। ১৯৩২

(৭) তেজসানন্দ, স্বামী।

ভগিনী নিবেদিতা। কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৫৭। ১১২ পৃঃ। ১৮.৫ সি.এম।

(৮) দত্ত, নরেন্দ্রনাথ [বিবেকানন্দ]

ভারতীয় নারী। ১৯৩১

(৯) দাশগুপ্ত, মৃণালকান্তি।

ভারতে নিবেদিতা। কলিকাতা, শ্রীমা প্রকাশনী, ১৯৫৯। ১৬৮ পৃঃ। ১৮ সি.এম।

(১০) মুক্তিপ্রাণা—ভগিনী নিবেদিতা। কলিকাতা, ভারতী বুক ষ্টল, ১৯৬৩। ২৮০ পৃঃ। ২২ সি.এম।

(১১) দাসী, সরলাবালা।

নিবেদিতা। ১৯১২

(১২) দেবী, অন্নপূর্ণা।

ভগিনী নিবেদিতা। কলিকাতা, সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৪। ১৩১ পৃঃ।

(১৩ক) দেবী, স্বর্ণ কুমারী—নিবেদিতা। ১৯১৭

(১৩) দেবী, প্রভিমা।

নিবেদিতা। কলকাতা, নতুন প্রকাশক, ১৯৬৪।
১২৭ পৃঃ।

(১৪) নাগ, অজিত কুমার।

পঞ্চশিখা। কলকাতা, হৃদয় প্রকাশন, ১৯—।

৩৬০ পৃঃ। ২১.২.সি.এম।

(১৫) নাহা, রাধাল।

শিখাময়ী। হাওড়া, আর. কে. প্রকাশন। ১৯৬৬।

৬৩ পৃঃ। ১৬.৪.সি.এম।

(১৫ক) ব্রহ্মচারী, অল্পপট্টভট্ট : ভগিনী নিবেদিতার জীবনী

ও বাণী, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৯৬৭

(১৬) বাগচী, মণি।

নিবেদিতা। কলকাতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী,
১৯৫৫। ৩২২ পৃঃ। ২২.সি.এম।

(১৭) —লোকমাতা নিবেদিতা। কলকাতা অতুপা
প্রকাশনা, ১৯৬৩। ১০৪ পৃঃ। ২২.সি.এম।

(১৭ক) বিভাবিনোদ, ক্ষিরোদপ্রসাদ। নিবেদিতা।
১০২৫

(১৮) নিবেদিতা শতবার্ষিকী সমিতি। কলকাতা।

ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শত বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।
প্রথম পর্যায়। শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং সুনীল বিহারী ঘোষ
সম্পাদিত। Calcutta, Nivedita Centenary
Celebration Committee, 1968, 24 cm.

(১৯) মুক্তিপ্রাণা, প্রব্রাজিকা।

ভগিনী নিবেদিতা। কলকাতা, সিস্টার নিবেদিতা
গার্লস স্কুল, ১৯৫৯। ৪৭৭ পৃঃ। ২১ই.সি.এম।

(২০) রায়, তামলরঞ্জন।

ভারত ভগিনী নিবেদিতা। কলকাতা, কলিকাতা
পুস্তকালয়, ১৯৬৬। ৪৪০ পৃঃ। ২১.সি.এম।

(২১) রায়চৌধুরী, গিরিজাশঙ্কর।

ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ। কলকাতা,
জিজ্ঞাসা, ১৯৬০। ২১১ পৃঃ। ২২.সি.এম।

[এই গ্রন্থের মূল অংশ জয়ন্তীতে বৈশাখ ১৩৬০ হইতে
ভাদ্র ১৩৬১ পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল]

(২২) রেমঃ, লিজেল-নিবেদিতা, নারায়ণী দেবী অমঃ।
কলকাতা, উমাচল প্রকাশনী, ১৯৫৫। ৫৮২ পৃঃ। ১৮
সি.এম।

(২৩) সরকার, অমল। সেবিকা নিবেদিতা। কলকাতা,
জ্ঞানভবন, ১৯৬৬। ৬২+২ পৃঃ। ১৭.সি.এম।

(২৪) সরকার, সরলাবালা। নিবেদিতা। কলকাতা,
ব্রহ্মচারী গণেশনাথ ১৯৪৭, ৫৮ পৃঃ।

(২৫) সেন, নীলকমল। ভগিনী নিবেদিতা। কলকাতা,
দেবেশনাথ ভট্টাচার্য, ১৯৩০।

(২৬) সেন, প্রলয়। মৃগ ভগিনী নিবেদিতা। কলকাতা,
প্রতিমা পুস্তক, ১৯৬৪, ৮৯ পৃঃ। ২১.৫.সি.এম।

(২৭) নোবেল, মার্গারেট এলিজাবেথ।

আচার্য্য জীবিতকানন্দ (যেমনটি দেখিয়াছি)। উদ্বোধন,
বর্ষ ১৯ মাঘ, ১৩২৩—পৌষ, ১৩২৪ :

পৃঃ ১—৯, ৭৮—৮৭, ১৩১—১৩৮, ২১২—২২১,
২৫২—২৬৭, ৩৩৪—৩৪৩, ৩৯৩—৪০০, ৪৬৬—
৪৭৪, ৫২৭—৫৩৫, ৫৭২—৫৯০, ৬৫৩—৬৬১, ৭১৪
—৭২২,

বর্ষ ২০, মাঘ, ১৩২৪—পৌষ, ১৩২৫ : পৃঃ ১৫—২৮,
৬৫—৭২, ১৩০—১৩৭।

(২৮) পঞ্চাট পরিষ্কার রাখিবার প্রস্তাব (নারীগণের
প্রতি নারীর উক্তি) উদ্বোধন। বর্ষ ৬, সংখ্যা ১৩, ১লা
প্রাবণ, ১৩১১। পৃঃ ৪১২—৪১৬।

(২৯) প্রচারশীল হিন্দুধর্ম। উদ্বোধন, বর্ষ ২৪ সংখ্যা
২, কাক্তন, ১৩২৮ : পৃঃ ১১২—১১৮।

(৩০) প্রাথমিক শিক্ষা—অগ্রগামী শিক্ষক গৈনিকদের প্রতি

আজান। উদ্বোধন, বর্ষ ৬২, সংখ্যা ৫, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪।
পৃঃ ২৬৯—২৭১।

(৩১) ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং তাহার অধ্যয়ন।
সুপ্রভাত। বর্ষ ৫ সংখ্যা ১ : পৃঃ ২২—২৫, সংখ্যা ২ :
পৃঃ ৭৬—৮০, সংখ্যা ৩ : পৃঃ ১২৩—১২৫

(৩২) মহাকাব্যিকরী ধর্মশক্তি। উদ্বোধন, বর্ষ ৬,
সংখ্যা ৬, চৈত্র ১৫, ১৩১০। পৃঃ ১৮৭—১৯১

(৩৩) শিব। উদ্বোধন, বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১, মাঘ, ১৩২৯ :
পৃঃ ৭—১৬

(৩৪) আশা, ব্রহ্মচারিণী।

ভগিনী নিবেদিতা, উদ্বোধন, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ২
আশ্বিন, ১৩৬৫। পৃঃ ৪৭৫—৪৮০

(৩৫) গল্পোপাখ্যান, নারায়ণ।

তোমাকে দেখিনি আমি। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী
স্মারক গ্রন্থ। প্রথম পর্ষায়। পৃঃ ২৪—২৫

(৩৬) ঘোষ, বিমলচন্দ্র।

নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী
স্মারক গ্রন্থ। প্রথম পর্ষায়। পৃঃ ২০

(৩৭) চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রনাথ।

ভগ্নী নিবেদিতা (কবিতা), উদ্বোধন, বর্ষ ১৫
সংখ্যা ৬। পৃঃ ২১২—২১৩।

(৩৮) চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ।

নিবেদিতা স্মৃতি। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী
স্মারক গ্রন্থ। প্রথম পর্ষায় : পৃঃ ২৭

(৩৯) চৌধুরী, কর্ণাট কুমার।

ভগিনী নিবেদিতা। উদ্বোধন, বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৬।
৩৮২—৩৮৩

(৪০) জীবনক, স্বামী।

নিবেদিতা, উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৭৩ : পৃঃ ১৫৬—১৫৭

(৪১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ।

ভগিনী নিবেদিতা। প্রবাসী; বর্ষ ১১১২ (২),
অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। পৃঃ ১৬৩—১৭৩। সচিত্র।

(৪২) দত্ত, ব্রজগোপাল।

বাগবাজারে উৎসব কেন। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম
শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্ষায়। পৃঃ ২৮—১০০

(৪৩) দালাল, আন্ততোষ।

ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি। উদ্বোধন। বর্ষ ৩৫
সংখ্যা ৬, আষাঢ়, ১৩৪০। পৃঃ ২২৫—২২৬

(৪৪) দাসী, সরলাবালা।

নিবেদিতা। উদ্বোধন, বর্ষ ১৫ সংখ্যা ৪ বৈশাখ,
১৩১২ : পৃঃ ২৩১—২৫১

(৪৫) দেবী, নারায়ণী।

মৃত্যুস্রোতা মহাকালী। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শত
বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। প্রথম পর্ষায়। পৃঃ ১২—৩৩

(৪৬) দেবী, নিহারিকা।

নিবেদিতা (কবিতা), উদ্বোধন, বর্ষ ২৬ সংখ্যা
৮, ভাদ্র, ১৩১১। পৃঃ ৫০৮—৫০৯

(৪৭) দেবী, বাসনা।

ভগিনী নিবেদিতা, উদ্বোধন, বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ১০,
কার্তিক, ১৩৬৩। পৃঃ ৫৯৪—৫৯৮

(৪৮) দেবী, সরলাবালা।

নিবেদিতা। প্রবাসী, বর্ষ ১২১১ (১), বৈশাখ,
১৩১২। পৃঃ ১০২—১১২

(৪৯) দেবী, স্নহাসিনী।

ভগিনী নিবেদিতা। উদ্বোধন, বর্ষ ৫৫ সংখ্যা ১১,
অগ্রহায়ণ, ১৩৬০। পৃঃ ৬২২—৬২৭

(৫০) ধর, অক্ষয় চন্দ্র।

নিবেদিতা (কবিতা) উদ্বোধন, বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ১০,
কার্তিক, ১৩৬৩। পৃঃ ৫৯৯

(৫১) নাগ, কালিদাস।

জাতীয় শিল্প জাগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায়।

উদ্বোধন স্তব্ধ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৫৪। পৃ: ১১—১৫

(৫২) নীরদবরণ।

শিষ্টা ভদ্রী নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। প্রথম পর্যায়। পৃ: ৫৬—৭৫

(৫৩) প্রভবানন্দ, স্বামী।

নিবেদিতা স্মৃতি। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। প্রথম পর্যায়। পৃ: ৯৬

(৫৪) বসু, শঙ্করীপ্রসাদ।

গোপালের মা ও ভগিনী নিবেদিতা। উদ্বোধন, বর্ষ ৬৮ সংখ্যা ৯, আশ্বিন, ১৩৭৩। পৃ: ৪৮৫—৪৯০

(৫৫) শ্রী মা সারদাদেবী ও ভগিনী নিবেদিতা। উদ্বোধন বর্ষ ৬৯ সংখ্যা ৩ ও ৪, চৈত্র, ১৩৭৩, বৈশাখ, ১৩৭৪: পৃ: ১৪৪—১৫১, ১৯০—১৯৫

(৫৬) বেদপ্রাণা, প্রব্রাজিকা।

নিবেদিতার দার্শনিক ভাবনা। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়। পৃ: ৫-১১

(৫৭) ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রনাথ।

ভগিনী নিবেদিতার দান। উদ্বোধন; বর্ষ ৬৯ সংখ্যা, ৭, আশ্বিন, ১৩৭৪। পৃ: ৩৫২—৩৬৩

(৫৮) ভারতী প্রাণা, প্রব্রাজিকা।

স্মৃতিকথা। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়। পৃ: ৭৬—৭৯

(৫৯) ভৌমিক, গোপাল।

নিবেদিতা স্মরণে। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়। পৃ: ৩৬

(৬০) মজুমদার, বিমান-বিহারী।

ভগিনী নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তাধারা। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়। পৃ: ৩৮—৪২

(৬১) মজুমদার, মোহিতলাল।

নিবেদিতা। উদ্বোধন, স্তব্ধ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৫৪। পৃ: ৫৮—৬৬

(৬২) মজিক, কুমুদরঞ্জন।

নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়। পৃ: ৩৫

(৬৩) মুক্তিপ্রাণা, প্রব্রাজিকা।

লোকমাতা নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়: পৃ: ৮০—৮৯

(৬৪) মুখোপাধ্যায়, বলাই চাঁদ। (বন ফুল)

[কবিতা], ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়; পৃ: ৩—৪

(৬৫) রায়, কালিদাস।

নিবেদিতা শতবার্ষিকী। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়। পৃ: ৩৪

(৬৬) রায়, দিলীপকুমার।

দীপ্তিময়ী নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়। পৃ: ৫০—৫৫

(৬৭) রায়, দিলীপকুমার।

মহীয়সী নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ প্রথম পর্যায়। পৃ: ৯১—৯২

(৬৮) রায়, হুমীল।

নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়। পৃ: ৩৭

(৬৯) সরকার, নলিনীকান্ত।

ভগিনী নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়। পৃ: ৯০

(৭০) সরকার, হুমীলচন্দ্র।

নিবেদিতার কাব্যদৃষ্টি। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়: পৃ: ১৬—১৮

- (৭১) ভগিনী নিবেদিতা। উদ্বোধন বর্ষ ১৯ সংখ্যা ২; কাল্কিন, ১৩২০ : পৃঃ ১০৪—১০৬
- (৭২) সিল্টার নিবেদিতা (লঙনে)। উদ্বোধন বর্ষ ৪ সংখ্যা ২; মাঘ, ১৩০৮ : পৃঃ ৪৩—৪৫
- (৭৩) সংবাদ। ভবনরঞ্জী। বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৬ : পৃঃ ১৪২
- (৭৪) ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যু (বিবিধ প্রসঙ্গ)। প্রবাসী, ১১/২(১), কার্তিক, ১৩১৮ : পৃঃ ১০২—১০৩
- (৭৫) স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ভ্রমণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)। প্রবাসী, ১৩/১(১), বৈশাখ, ১৩২০ : পৃঃ ১১৩—১১৪
- (৭৬) ভগিনী নিবেদিতার বিভ্রাট (বিবিধ প্রসঙ্গ)। প্রবাসী, ১৭/২ (২), অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ : পৃঃ ২০৬—২০৭
- (৭৭) সাময়িক প্রসঙ্গ। বামা-বোধিনী পত্রিকা। বর্ষ ৯, খণ্ড ৩ সংখ্যা ৫৭৬ : পৃঃ ১৩৩—১৩৪
- (৭৮) আখ্যা নিবেদিতা। ভারতী, বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ৭, কার্তিক, ১৩১৮ : পৃঃ ৭১৯—৭২১
- (৭৯) ভগিনী নিবেদিতা। স্প্রভাত, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৪, কার্তিক, ১৩১৮ : পৃঃ ১৭২—১৭৩

অনিম্ন নান্দেন

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩.৫০ টাকা।

“...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিষ্কার করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বভ্রাতা। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতন্ত্র ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।”
... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১.২৫

“...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সমুদ্রে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া ‘নাস্ত পন্থা বিজ্ঞে’ অর্থনায়।” (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে

এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়ন্তী—৩০৯, গান্ধী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

[৫৫০ পৃষ্ঠার পর]

স্পষ্টতঃই এদের কেউই সংসদীয় গণতন্ত্র চায় না: এদের সকলেরই উদ্দেশ্য হ'ল গণতন্ত্র বানচাল করে দেওয়া। এদের সংগে কাজ করা সম্ভবই ছুড়ছ। পশ্চিমবঙ্গে প্রাক্ নির্বাচনকালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পথে এরাই সবচেয়ে বড় বাধার সৃষ্টি করেছিল ও নির্বাচনোত্তর ফ্রন্ট সরকার বানচাল করায় এরাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গত অক্টোবর মাসে শ্রীজয় মুখার্জির পদত্যাগের অভিধায়ের কারণ মুখ্যতঃ এটাই। এ রাজ্যের দল ত্যাগের ঘটনা এই বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। এই দিক থেকে দেখলে ১৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে রাজনৈতিক শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাসের কোন সম্ভাবনা ছিল কিনা বলা খুবই শক্ত।

যা হক্ ফ্রন্টের নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি থেকে এই ধারণাই হয় যে, ফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ রয়েছে। রাজ্যপালের মতঃ এই অবস্থায় বিধানসভায় দলগুলির শক্তি বাচাই হয়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

এ ছাড়া যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো কতট। দুর্বল হয়ে পড়েছিল তাও বিবেচ্য। সাধারণ নাগরিকের পক্ষে সঠিক ধর

সংগ্রহ করা কঠিন হলেও নকশালবাড়ি আন্দোলনের পতি প্রকৃতি, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার শৈথিল্য, সাধারণভাবে অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনমন ও সর্বোপরি শ্রীজয় মুখার্জির বিবৃতিতে বর্ণিত বাম কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্যকলাপ—এসব থেকে রাজ্যের জটিল অবস্থা সম্বন্ধে একটি ধারণা করা নিতান্ত অসম্ভব নয়। এদিক থেকে দেখলে এ রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে রাজ্যপালের উদ্বিগ্ন হওয়া মোটেই অমুচিত হয়নি। তার দিক থেকে এটা যে শুধুমাত্র্যাদার লড়াই তা মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। তার উপর ফ্রন্টের প্রবীণ নেতারা আসন্ন লড়াইয়ের যে আভাস দিয়েছিলেন তার কলে রাজ্যপালের শঙ্কিত হয়ে ওঠা মোটেই অসঙ্গত নয়। পশ্চিমবঙ্গের এই সাংবিধানিক সংকট যে ভাবেই মোচন হোক না কেন পুঙ্খ জনমত গঠনের জন্য রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থার প্রকৃত ছবিটি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা উচিত এবং অকম্যুনিষ্ট বামপন্থী দলগুলিকে এ নান্নিষ নিতে হবে। এই দলগুলি যদি আজ সাময়িক রাজনৈতিক লাভের আশায় এই কর্তব্যে অবহেলা করে তবে অদূর ভবিষ্যতে বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা থাকবে না বলেই মনে হয়।

নিবন্ধন

গ্রীসে অভ্যুত্থান

গ্রীসের রাজা কনষ্টানটিন দেশের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যর্থ বিদ্রোহ প্ররোচিত করে দেশত্যাগী হয়েছেন। গত ১৬ই ডিসেম্বর রাজা কনষ্টানটিন গ্রীসে নিয়মতান্ত্রিক শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার ফলেই সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাত বাধে এবং কর্ণেল জর্জ পাপাদোপোলিস রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় ইউনিট পার্টি জয়লাভ করলে পপেনদ্রিউ প্রধানমন্ত্রী হন। পপেনদ্রিউ দেশরক্ষা মন্ত্রীর পদচ্যুত করতে চাইলে রাজার সঙ্গে তার বিরোধ বাধে এবং পপেনদ্রিউ পদত্যাগ করেন। পপেনদ্রিউ-রাজার সংঘাতের পর গ্রীসের রাজনৈতিক অস্থিরতা পর পর মন্ত্রীসভার পতন ঘটায় এবং শেষ পর্যন্ত এ-বছর গত ২৮শে মে সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য হয়। এই নির্বাচনের পূর্বেই ২১শে এপ্রিল রাতে বিগেডিয়ার পাটাকাশের নেতৃত্বে সামরিক শক্তি এথেন্সে ক্ষমতা দখল করে এবং এদের আওতায় গ্রীসের এটলি জেনারেল কনষ্টানটাইন কোলিয়াসের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সাম্প্রতিক ব্যর্থ বিদ্রোহের পর কোলিয়াসের হাত থেকে কর্ণেল জর্জ পাপাদোপোলিস প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে গ্রীসে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

স্বকর্ণের বিচার আসন্ন

গত মার্চমাসে পদচ্যুত হবার পর বোগোর প্রাসাদে স্বকর্ণ বসবাস করছিল। নভেম্বর মাসে এই প্রাসাদ থেকে স্বকর্ণ বিতাড়নের জন্য স্বহাতের হুকুমনামা জারী হবার পর থেকেই স্বকর্ণের বিচারের দিনগুলি এগিয়ে আসছে, এই অসুস্থ মানুষ বাস্তবরূপ নিতে স্বকর্ণ করেছে। রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত হবার পরও স্বকর্ণ বোগোর প্রাসাদে বাস করে রাষ্ট্র প্রধানের ভূমিকায় ছলনা করবার স্বযোগ নিয়ে আসছিল, অভ্যুত্থান সেই ছলনার পথ বন্ধ হয়ে স্বকর্ণর ক্ষমতাচ্যুতি ক্ষুণ্ণ বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৯৬৫ অক্টোবর বিদ্রোহের অস্তিত্ব নায়করা দেশদ্রোহিতার অপরাধে যে-ভাবে চিহ্নিত হয়ে কঠোর শাস্তি পেয়েছে স্বকর্ণকে এখন সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলির জন্য দুঃখিত্ব অপেক্ষায় দিনযাপন করতে হচ্ছে।

১৫.১২.৬৭

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly
Founded in 1931

Advertisement Rate Schedule

Current from April, 1966

Ordinary

Full Page :	Rs. 100'00
Half Page :	Rs. 55'00
Quarter Page :	Rs. 30'00

Cover Page

Second Cover :	Rs. 175'00
Third Cover :	Rs. 200'00
Fourth Cover :	Rs. 350'00

For Special Position contact *Advt. Manager*
Jayasree.

Advertising Space 20'50m x 15'24Cm.
(8" x 6")

Contact

Manager, Jayasree
809, Ganguli Bagan,
Calcutta—47
Phone : 46-4116



29 DEC 1967

মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন!

গীহার অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভূজরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে গর্বদা প্রকৃষ্ট ও কর্মকর্ম রাখে

সাধনার মহা ভূজরাজ তৈল



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডা: নরেশচন্দ্র

এম. বি. বি. এস. (কলি:) আয়ুর্বেদ

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.

আয়ুর্বেদ পাঠী, এম. সি. এম. (গণন) এম. সি. এস (আয়ুর্বেদিক)

কামলপুর কলেজের বঙ্গীয় শাস্ত্রের কৃতপূর্ণ অধ্যাপক

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 1.00 with Postage Rs. 1.75

HEAD OFFICE JAYASREE

ডায়রী



নেতাজী সংখ্যা

পৌষ ১৩৭৪



সম্পাদিকা : লীলা রায়

সূচীপত্র

জয়ন্তী : পৌষ : ১৩৭৪

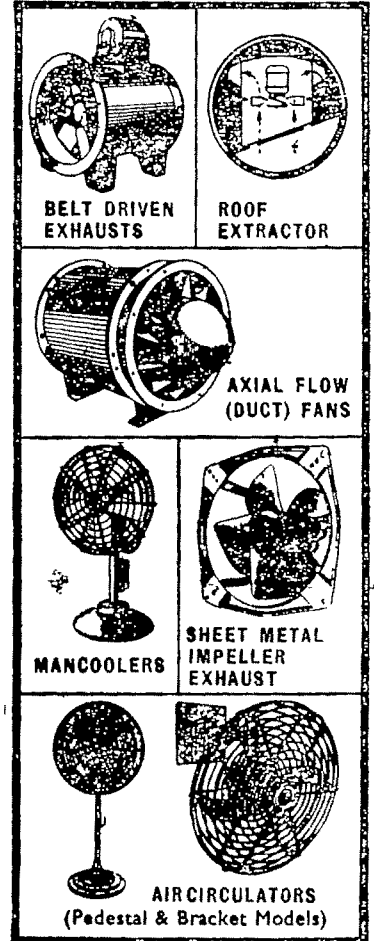
বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৫২১
স্বভাষচন্দ্র (কবিতা) শান্তশীল দাস		৫২৪
একটি উজ্জ্বল তারা		
(কবিতা) প্রভাকর মান্নি		৫২৪
স্বভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)		
পবিত্র ঘোষ		৫২৫
স্বভাষচন্দ্র (কবিতা) আবদুল ওজুদ		৬০০
২৩শে জাহ্নসারী		
(কবিতা) সাবিজীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়		৬০৪
চিঠির আলোকে		
স্বভাষচন্দ্রের মন (আলোচনা)		
দেবদাস জোয়ারদার		৬০৫
‘বুদ্ধের কঠিন হাসি’		
(ধারাবাহিক আলোচনা)		
শঙ্করীপ্রসাদ বসু		৬১১
বিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও স্বভাষচন্দ্র		
(প্রবন্ধ) সমর গুহ		৬১৫
আমার বাবাব সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র		
(আলোচ্য) বীণা ভৌমিক		৬১৯
স্বভাষচন্দ্র (চিত্র)	সাবিজীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	৬২৩
অভীভের শিক্ষা		
(প্রবন্ধ) কালীচরণ ঘোষ		৬২৬
কণ্ঠ ভরা বিষ (ধারাবাহিক উপভাস)		
মিহির মুখোপাধ্যায়		৬৩১
জল মাটি মন (ধারাবাহিক উপভাস)		
মহীতোষ বিশ্বাস		৬৩৭
শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে		
জুটি কয়েক কথা (আলোচনা)		
ডঃ শশধর সিংহ		৬৪৭
বর্তমান প্রসঙ্গ		৬৫৫

NAME THE PURPOSE

YOU HAVE A SIZE AND TYPE OF

CALCUTTA FAN

TO MEET YOUR SPECIFIC NEED.



**CALCUTTA FAN
WORKS PVT. LTD.**

Calcutta 16.

Manufacturers of all types of
Domestic & Industrial Fans

CF/PA/5-66

সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে পুরনো,
সবচেয়ে ভাল ?

এগুলোর কোনটাতেই আমাদের দাবী নেই।
কিন্তু আমাদের গর্ব এই যে, আমরা

আপনার ব্যাঙ্ক



আপনার শুভেচ্ছাই
আমাদের সবচেয়ে বড় মূলধন। আমাদের
সবচেয়ে বড় পুরস্কার আপনার
সন্তুষ্টি।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :
৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা-১

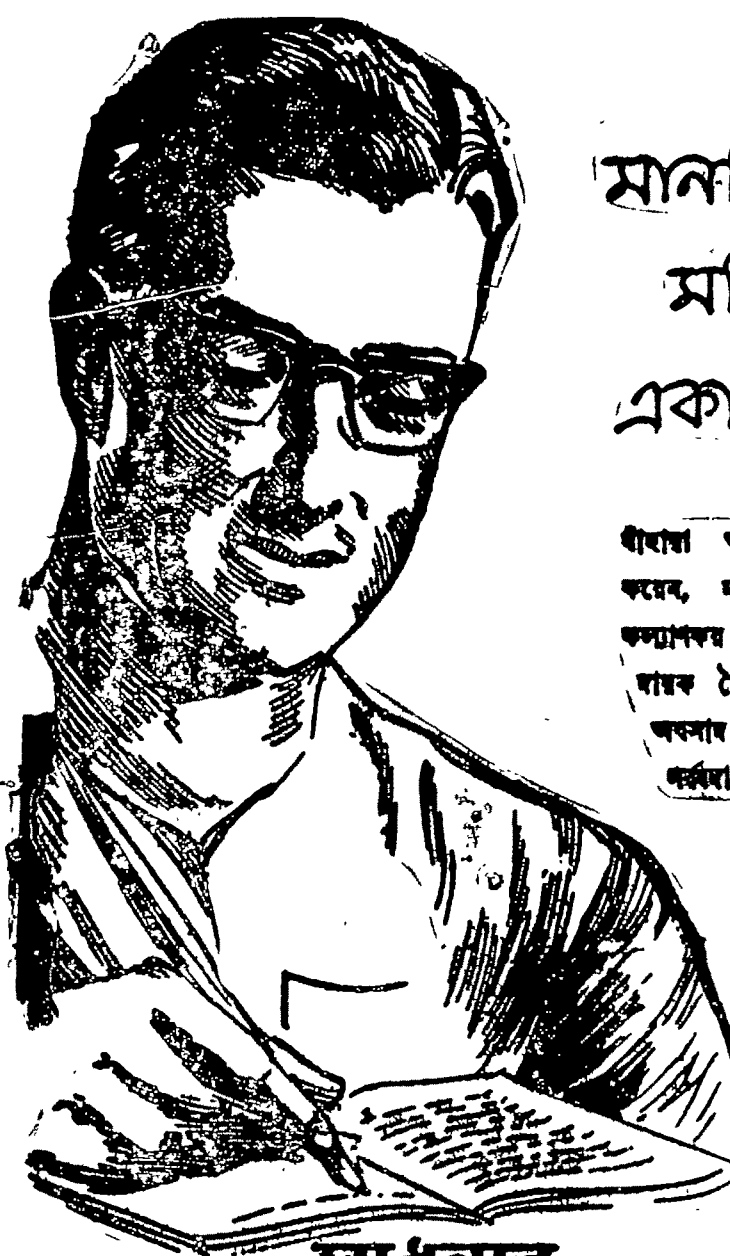
আমরা
সেবার সাথে
মিই
আরও কিছু

With best compliments from :—

KERAMIC AGENCIES.

20, POLLOCK STREET,

CALCUTTA—1.



মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন!

বীহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম
করেন, মহাভূঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম
কল্যাণকর। এই মস্তিষ্কর ও আরাধ-
নায়ক তৈল সর্বপ্রকার স্মৃতি ও
অবসান দূর করে, মেধ ও মনকে
জরীয়া প্রকৃত ও কর্মকম রাখে

সাধনার মহা ভূঙ্গরাজ তৈল



সাহেবজী ভূঙ্গরাজ-ভাঙ্গা
মায়দা ঊষার মোত কলিকাতা-৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলি) আর্কিমেডিস্ট

অধ্যক্ষ ঐক্যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আর্কিমেডিস্ট এম. বি. এস. (নতন) এম. বি. এস (আনুষ্ঠানিক)
ভাঙ্গার কলেজের ইন্সপেক্টর পদে পূর্তন অধ্যাপক হু.

দীপ্তি

আপনার
নিত্য
প্রয়োজনে

দীপ্তি লম্বন—এর পরিচয় নিশ্চয়োজন,
এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে
আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর
কম কেরোসিন খরচ।

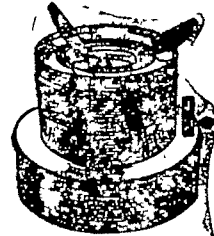
খাস জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য
প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ।
এই কেরোসিন ঠোঁড় ব্যবহারে কোন
ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে
সুন্দর, খরচে লাভাশ্রী। অল্প সময়ে যে
কোন রান্না করা যায়।

‘দীপ্তি’ মার্কা এলুমিনিয়ামের বাসন—
অল্প দিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর
উপের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে।

বি ওরিয়েন্টাল মেটাল
ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
৩৭ ও ১৭ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট,
কলিকাতা-১২



দীপ্তি লম্বন



খাস জনতা



এলুমিনিয়ামের বাসন

Kaipon's

লেক্সা তামাকটা ঠিক বলে টেঙ্কা দিয়ে চলে !

ক্ষত কাটতির দিক দিয়ে এদেশে তো বটেই, ভারতের বাইরেও রপ্তানি
সিগারেট হিসেবে লেক্সা বাজি মাৎ করেছে। লেক্সা, সবার সেরা—না
খুব মিঠে, না খুব কড়া। লেক্সা, এর আসল জাদু সেইখানেই।

সবার সেরা
তামাকে গড়া ...
না খুব মিঠে,
না খুব কড়া ...



লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

ইতিহাস ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত। অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি। মূল্য ২.৫০ টাকা।

বিশ্বপরিচয় ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটদের উপযোগী করে লেখা বিশ্বের ও শৌরঙ্গতের কাহিনী। মূল্য ১.৮০ টাকা।

পূজাপার্বণ ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

কতকগুলি প্রসিদ্ধ পূজাপার্বণের উৎপত্তি ও প্রকৃতির বর্ণনা ও সচিত্র আলোচনা। মূল্য ৩.০০ টাকা।

ব্যাধির পরাজয় ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম ও বিজয়ের কাহিনী। মূল্য ১.৫০ টাকা।

ভারতদর্শনসার ॥ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রাঞ্জল ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের দুক্লহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা। মূল্য ৩.৩০ টাকা।

বাংলা উপন্যাস ॥ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাসের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা, সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

মূল্য ২.০০ টাকা।

প্রাণতত্ত্ব ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীববিজ্ঞান মূলতত্ত্বের সরল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মূল্য ২.৩০ টাকা।

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ॥ শুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

লোভিষেট যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে ষাঁদের কৌতূহল আছে, এই বই তাঁদের পরিতৃপ্ত করবে। মূল্য ২.৩০ টাকা।

বাংলা সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

অঙ্গের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

রচনার বৈচিত্র্যে সাহিত্যের মতোই সরল ও সুপাঠ্য। মূল্য ২.০০ টাকা।

বাংলার নব্যসংস্কৃতি ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উনিশ শতকের বাংলাদেশে যে নব্যচিন্তা ও নবনির্মিতর সূচনা ও প্রসার হয়েছিল তার সূত্রধিত চিত্র। মূল্য ১.৪০ টাকা।

আহার ও আহাৰ্য ॥ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

শরীররক্ষা ও পুষ্টির জন্মে কী ধরণের আহাৰ্য আবশ্যক তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। মূল্য ১.৫০ টাকা।

হিন্দুসমাজের গড়ন ॥ শ্রীনির্মলকুমার বসু

প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা এবং ভারতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা।

বহু চিত্র সংবলিত। মূল্য ২.৫০ টাকা।

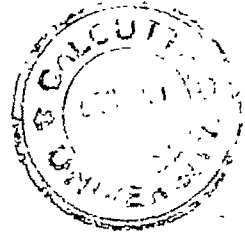
হিউএনচাও ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

চীনা পরিব্রাজক হিউএনচাওর ভারতভ্রমণকথা; তথ্যবহুল অথচ উপন্যাসের স্ভায় চিত্তাকর্ষক।

মূল্য ৩.০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭



ডায়রী

৩২ বর্ষ • নবম সংখ্যা • পৌষ ১৩৭৪

সম্পাদকীয়

১৯৬৭-র জামুয়াবীরিতে, গত নেতাজী জন্মোৎসবের প্রাকালে—আমরা চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পটভূমিকার বিশ্লেষণ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মতামত রেখেছিলাম। কিন্তু দেশ ও জাতির কল্যাণ অপেক্ষা নির্বাচনে জয়লাভ করে শাসন ক্ষমতার দখলদার হওয়া অনেক বেশী লাভজনক মনে হয়েছে নির্বাচন-প্রার্থীদের। এদেশের নির্বাচকমণ্ডলীও দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের কংগ্রেস একাধিপত্যে জীবনের সর্বদিকে রিস্ত আশাহত হয়ে কংগ্রেসকে ১টি প্রদেশে গদীচ্যুত করে বিকল্প যুক্ত-মূল্য সরকার গঠন করে। ভারতবর্ষের কুড়ি বছরের গণতন্ত্রে নিঃসন্দেহে এ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু পরস্পর-বিরোধী লক্ষ্য, আদর্শ ও কর্ম পন্থায় বিশ্বাসী এই দলগুলির পক্ষে কোন একটি বিশেষ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যতসহজ, সুনির্দিষ্ট নীতি, লক্ষ্য ও ঐক্যবদ্ধ কর্ম-পন্থা নিয়ে দেশ শাসন করা তত সহজ নয়। গত ১১ মাসে তা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষতঃ ভারতীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে যত স্পষ্ট প্রমাণ, যত জোরের সহিতই করা হউক না কেন, পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলির অনুকরণ ও অনুসরণে ভারতবর্ষে যে গণতন্ত্র চালু হয়েছে ভারতের ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা ও প্রয়োগ কতটা ফল-প্রসূ হয়েছে, ভারতের জনসাধারণের স্বার্থ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে এই সাধারণ নির্বাচনগুলি স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কতটা প্রকাশ করছে, তার বিচার করবার সময় এসেছে।

কোন বিশেষ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইতিহাস ও ভূগোল নিরপেক্ষভাবে সফল হতে পারে বলে আমরা মনে করি না। ভারত-বিভাগ করে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সম্বন্ধে ধ্বংস করে, শাসন ক্ষমতার আশীন হয়েছে কংগ্রেস, মুসলিমলীগ ও ইংরেজের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারার মাধ্যমে। এই মূল প্রাথমিক ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে এই উপ-মহাদেশের দুর্ভাগ্য। তার ফলে দক্ষিণ দক্ষিণ সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়, কাশ্মীর সমস্যা, পাক-ভারত সীমান্তের উপজাতি সমস্যা, অসুগ্রহণ এবং আরো হাজারো সমস্যা। প্রতিদিন যা জনসাধারণের মূল সমস্যাগুলি থেকে মনোযোগকে অপসারিত ও বিভ্রান্ত করে, একটার পর একটা গৌলমিল-পেয়া কৃত্রিম সমাধান সাধনের প্রয়াসে দেশকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে একদিকে ইদ-মাকিনী পশ্চিমী গোষ্ঠীর কক্ষপটে অথবা কম্যুনিষ্ট রুশ-চীনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ-সিদ্ধির পায়তারার চক্রে। এরা মূলতঃ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিরই কলসং দেখাচ্ছে। তবে এরা সকলেই ভারত-বিরোধী ও পাকিস্তানের সমর্থক।

যেহেতু, সে পথে নিজেদের স্বার্থরক্ষা সহজতর। বিশেষতঃ কংগ্রেসের ২০ বৎসরের আভ্যন্তরীণ নীতি যেমন দেশকে করেছে অধিকতর পরমুখাপেক্ষী থাকে ও অর্থনীতিতে তেমনি তার বাস্তবতা-হীন বন্ধ্য বৈদেশিক নীতি ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে করেছে মর্যাদা ও বহুহীন। নির্বাচনোত্তর পরস্পর-বিপরীতলক্ষ্য যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির, এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন আয়ত্তের বহির্ভূত ছিল। ভূমি-সমস্যা, কৃষক, শ্রমিক বা ভাষা সমস্যার কোনো সর্বদলীয় নিয়মতম সমাধান গ্রহণও এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় ভারতবর্ষে আবার এসেছে আর একটা ২৩শে জানুয়ারী—আবার নেতাজীর জন্মদিন—কিন্তু তার সঙ্গে এনেছে কি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন চিন্তা, নূতন পথের সন্ধান ও ইচ্ছিত ?

যখন গত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী কংগ্রেসকে ৯টা প্রদেশে গদীচ্যুত করেছিল তখন কুড়ি বৎসরের দুর্দশা মোচনের উত্তর খুঁজেছিল জনসাধারণ। আশা করেছিল তাদের জীবনে হয়তো কিছু পরিবর্তন হবে ; অন্ন, বস্ত্র, কর্ম সংগ্রহ হয়তো বা সহজতর হবে। কিন্তু সেদিক দিয়ে এরা পূর্ণ মাত্রায় নিরাশ হয়েছে। এটাই জাতীয় জীবনের পক্ষে সবচেয়ে অন্তত ফল। কংগ্রেসের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন ভারতের অধিকসংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলী চায় বলে আমরা বিশ্বাস করি না। কংগ্রেস নিজেদের সাধুতা ও সদাইচ্ছার যতই প্রদর্শনী করুক না কেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কংগ্রেস নানা শক্তি ও স্বার্থের সাহায্যে অনেকগুলি প্রদেশে যুক্তফ্রন্ট সরকার গুলিকে গদীচ্যুত করেছে ও করতে উদ্বৃত্ত। এ বিষয়ে তাদের সাহায্য করেছে একদিকে নিঃসন্দেহ স্থিতস্বার্থ ও নানা দুষ্টিচক্র এবং অন্যদিকে যুক্ত ফ্রন্টগুলির যুক্তি ও নীতিহীন আচরণ, বিশেষ ভাবে উভয় কমুনিষ্ট দলের নিজ নিজ আন্তর্জাতিক স্বার্থের উগ্র অনুসরণ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নির্বাচিত সদস্যদের নীতিহীন দলত্যাগের হিড়িক যা রোধ করবার কোন বৈধানিক ব্যবস্থা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। এসবের ফলশ্রুতি ভারতের তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। দেখা দিয়েছে উদ্বেগ ও লক্ষ্যহীন আন্দোলনের নিষ্ফল কার্যক্রম এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বয়ং-নির্ভরতাকে বিপর্যস্ত করে বৈদেশিক স্বার্থের অনুপ্রবেশ। এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যে জাতিকে নূতন পথের ও নেতৃত্বের সন্ধান দেবে কে ? এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ভারতের জীবন-মরণের প্রশ্ন।

একদিকে গান্ধিজীর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে কংগ্রেস ও কংগ্রেসত্যাগীরা। আর একদিকে সোচ্চার ধ্বনি তুলেছে আন্তর্জাতিক কমুনিজমের দেশীয় অনুগামীরা—সশস্ত্র বিপ্লবের। ভারতের বিভিন্ন দল ও নেতৃবৃন্দ ভারত সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশীয়া প্রভৃতিতে চীনের অনুসরণ ও অনুপ্রবেশের ফল প্রত্যক্ষ করেছেন কিন্তু সে অভিস্রুতা থেকে শিক্ষা লাভের প্রয়োজন অনুভব করছেন না। এমন কি নেতাজীর অনুগামী দল বলে ধারা জাহির করেন তারাও না। নেতাজীকে নানা বিশেষণে ভূষিত করে অথবা চৌ-রাস্তার মোড়ে নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে রাস্তার নামকরণ করে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবিরোধী-বিপ্লবী শক্তির ঐতিহ্য জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন বলে মনে করেন। নেতাজীকে কেবলমাত্র বীর সৈনিক ও শ্রেষ্ঠ সামরিক প্রতিভা আখ্যায়িত করেই ক্ষান্ত হন তাঁরা এবং এভাবে স্বাধীনতা-উত্তর জাতিগঠনে তাঁর অবদান ও ঐতিহ্যকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করেন। পৌষ সংখ্যা ত্রয়শ্রীতে নেতাজীর ধারাবাহিক জীবনী লেখক পবিত্রকুমার ঘোষ সমসাময়িক তথ্য সম্বলিত করে নেতাজীর নেতৃত্বের রচনাসম্মত দিকের-সুনির্দিষ্ট নজীর উৎপাদন করে এক মহৎ জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন।

আজকের উচ্চকণ্ঠ বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের প্রাঙ্গণ করি তাঁদের মধ্যে কয়জন তরুণবয়স থেকে এইরূপ অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট গঠনাত্মক পন্থার চিন্তা ও অনুসরণ করেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামের যুগে? যখন বিপ্লব বা বিদ্রোহ পথে পথে ছবি নিয়ে শ্লোগানের বিলাস ছিল না। যখন নিজের আদর্শকে অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সর্বস্বত্যাগ করতে নিত্য প্রাণ দিতে হ'ত। একটা জাতির ইতিহাস মাত্র কয়েক দশকেই শেষ হয় না—। আজকের নৈরাশ্রময় পরিস্থিতিতে নেতাজীর নেতৃত্ব-বিশ্বাসী, জনসাধারণ ও তরুণদের, নূতন করে দেশকে গঠন করবার কাজে ত্রুতী হবার শৃণু গ্রহণ করতে আমরা আহ্বান করছি। গত দুই দশকের বেশী দেশ নানা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবার খেসারত তারা নিজেদের জীবনে বহন করেছে, সে খেসারত যাতে আর দীর্ঘতর না হয় তাঁর জন্য নেতাজীর লক্ষ্য, আদর্শ, কর্ম পন্থাকে, তাঁর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিকে উদ্ধার, অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করে ভারতকে স্বাধীন সার্বভৌম মর্যাদাসম্পন্ন স্বয়ংভর জাতি করে গড়ে তুলুন তাঁরা।

বাইরে থেকে কোন নেতা এসে আমাদের জাতীয় কর্তব্য সমাধা করে দেবে না, আমাদের নিজেদেরই সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, যত কঠিনই তা হউক না কেন? নেতাজী অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট দিগন্তে রেখে গেছেন।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতের সমস্ত সমাধান সম্পর্কে এই একটা মাত্র ভারতীয় নেতার কোনো অস্পষ্টতা ছিল না— দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেই ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ পরিবেশে ভারতে শত্রু হাত থেকে স্বাধীনতা আহরণ করবার রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত এই আশ্চর্য মানুষটি যাকে শত্রু মিত্র নানাজনে নানাভাবে 'জাপানী দালাল' 'দেশের শত্রু', 'ফ্যাসিস্ট' আবার 'মিষ্টিক' ও 'আধ্যাত্মিক' আখ্যায় বার বার ভূষিত করেছেন। তাঁর কঠিন বাস্তবানুগ হৃদয়-প্রসারী দৃষ্টিকে অনুধাবন ও গ্রহণ করেছেন কি কেউ? গত কুড়ি বছরে কংগ্রেস বা অন্যতম ভারতীয় নেতা ও দলগুলি অধিকতর বাস্তবদৃষ্টি ও অবিলম্বিত বুদ্ধির দ্বারা ভারতের মূল সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত এবং তার সমাধান করতে পেরেছেন কি? আমি তাদের মনোবোগ আকর্ষণ করছি ১৯৪৪ এর ডিসেম্বরে টোকিওতে ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের সম্মুখে প্রদত্ত "Some of the fundamental problems that face my Country both in the present as well as in the future" নামীয় ঐতিহাসিক ভাষণের দিকে।

বর্তমান প্রাণজনক নৈরাশ্রের পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে নবভারত রচনার সংগ্রাম ও স্বার্থত্যাগে ইচ্ছুক যুক্তি-সংগ্রামীদের সেই কালজয়ী দলীলকে বার বার বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও গ্রহণ করতে আহ্বান করছি। স্বাধীনতা উত্তর ভারতের সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব অনুযায়ী নির্দেশিত করা হয়েছে (১) আত্মরক্ষা (Self-Defence) (২) দারিদ্র্য ও বেকারি (৩) শিক্ষা (৪) লিপির প্রসার মীমাংসা।

এ অপেক্ষা অস্পষ্ট নির্দেশ আর কেউ দিতে পেরেছেন কি?

সে পথ অনুসরণ করতে দ্বিধা কেন ও কিসের?

২৩শে জানুয়ারী ১৯৬৮

সুভাষচন্দ্র : শান্তশীল দাশ

একটি অশান্ত প্রাণ দেশে দেশান্তরে
ছুটে চলে, মাতৃনাম কণ্ঠে অবিরত ।
বন্দিনী সে জননীর শৃঙ্খল মোচন
ব্রত তার, কাটে কত বিনিস্ত রজনী ।
কত বাধা বিঘ্ন আসে, সতত নির্ভীক,
মৃত্যু আসে বারে বারে মানে পরাজয় ;
জননীর আশীর্বাদ দৃঢ় বর্ম তার。
অজ্ঞেয় সে বীর চলে ছুঁবার গতিতে ।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নিঃশঙ্ক নির্বাধ
গতিময় । বিশ্ববাসী বিশ্বিত অন্তর,
সে মহাসৈনিক পানে চেয়ে বারংবার
এনে দেয় শ্রদ্ধা-অর্থ্য উদ্দেশে তাহার ।
আজো রত অসমাপ্ত ব্রত উদ্‌যাপনে
মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর অলঙ্ক্যে সবার ।

জামুয়ারী ১৯৬৮

একটি উজ্জ্বল তারা : প্রভাকর মাঝি

একটি উজ্জ্বল তারা জলে উঠে মনের আকাশে—
কালান্তক অন্ধকারে সে আলোর মূর্ত অভিস্ফান ।
তার পুত্র স্পর্শে হয় অপগত সকল কুয়াশা,
জীবন বদ্ধত হয়ে উঠে ওর ক্রীণাংগু গেলেই ।

সে তারা সৈনিক, তাকে একমুঠো বিশেষণ ছুঁড়ে
অন্ধরের কারাগারে বন্দী করা চরম মৃত্যু ।
আরাকানে, মণিপুরে, বর্মার সীমান্তে সব স্থানে,
পথে ঘাটে উচ্চারিত সে তারার অমল বিস্ময় ।

দুর্গম বন্ধুর পথে প্রত্যাহের পাদ-চারণায়
অষ্ট অঙ্গে রক্ত ঝরে । আশা নেই । স্বপ্ন পলাতক ।
প্রিয়তম নক্ষত্রের দিকে মুহূর্ত সময়—
জীবন অপরাঞ্জিত, তার কণ্ঠ—যৌবন ছুঁবার ।

স্বাতী কিংবা শতভিষা কি তার অভিধা, নীলাকাশ ?
মানসের মানচিত্রে সে তারাটি নেতাজী সুভাষ ।

জামুয়ারী ১৯৬৮

সার্বস্বত্বিক রচনা

দ্বিতীয় অধ্যায় : সপ্তম কিত্তি

প্রথম কারাবরণ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রেক্ষাপট
বাংলার কংগ্রেস ও খেলাফত নেতৃবর্গ প্রেক্ষাপট

মহাত্মার বাণী

স্বরাজ্যের বিলম্ব নাই

—দৈনিক হিন্দুস্থান, ১২ই ডিসেম্বর ১৯২১

বাংলা সংবাদপত্র ‘হিন্দুস্থান’ বড় শিরোনাম দিয়ে উপরোক্ত খবরটি প্রকাশ করেছিল। খবরটি ছিল এই “গত শনিবার সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মৌলভী আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুক্ত বি এন শাসনুল, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে পুলিশে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। সহরে আগে হইতেই গুলজব রটিয়া গিয়াছিল যে, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করা হইবে। গবর্ণরের সহিত চিত্তরঞ্জনের যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহাতে মীমাংসা কিছুই হয় নাই। গবর্ণরের সহিত দেখা করিবার পূর্বে তাঁহাকে মিঃ গুল্‌সে যে পত্র দিয়াছিলেন এবং তিনি সেই পত্রের জবাবে কি লিখিয়াছিলেন তাহা দেওয়া হইল।

মিঃ গুল্‌সের পত্র

প্রিয় সি আর দাশ

.....আমি আপনাকে এখানে আসিবার জন্য লাট সাহেবকে বলিতে যাইতেছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

যে, রাজ্যে যাওয়া দাওয়ার পর আপনাকে আসিতে বলি। শনিবার রাজ্যে প্রায়ই তিনি পড়িবার ঘরে থাকেন। আপনি বর্তমান সমস্তা সম্বন্ধে যদি তাঁহার সহিত পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেন তাহা হইলে আমাকে টেলিফোন করিবেন।

চিত্তরঞ্জনের পত্র

প্রিয় মিঃ গুল্‌সে—মহারাজা প্রচোত কুমার আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, লাট সাহেবের সহিত দেখা করিতে আমার কোন আপত্তি আছে কি না। তাঁহার ধারণা ছিল যে আমি অসহযোগী বলিয়া লাট সাহেবের সহিত দেখা করিতে পারিব না। আমি তাঁহাকে জানাইয়াছি যে, তিনি যদি আমার সহিত দেখা করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহার সহিত দেখা করা আমার কর্তব্য। আগামী হরভাল সম্বন্ধে আমি যাহাতে গবর্ণরের সহিত একটা পরামর্শ করি সেই জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, লাট সাহেব কোন বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য যদি আমার সহিত দেখা করিতে চাহেন তাহা হইলে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিব।

মিঃ গুল্‌সের চিঠি

প্রিয় সি আর দাশ

..... যদি আপনার মনে হয় যে, পরামর্শে কোন লাভ

হইবে তাহা হইলে তিনি আনন্দের সহিত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। লর্ড রোণাল্ডসে (লর্ড সাহেব) আমাকে লিচ্ছাশা করিতে বলিতেছেন যে, কাল (বুধবার) ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ছয়টাব সময় দেখা করা আপনার সুবিধা হইবে কি না।

চিত্তরঞ্জনের পত্র

প্রিয় মিঃ গুলে—

... অসহযোগীরা অত্যন্ত কঠিন নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। আমার সহিত পরামর্শ করা যদি গবর্ণর প্রযোজন মনে করেন, তাহা হইলে তিনি বাহা আদেশ করিবেন আমি তাহা পালন করিব। বর্তমানে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কোন সফল ফলিবে কি না তাহা অনুমান করা অসম্ভব। গবর্ণমেন্টের সেলাল দেখিয়া আমার মনে হইতেছে যে, তাঁহার সহিত দেখা করিয়া কোন ফল হইবে না। কিন্তু সে কথা গবর্ণর বিচার করিবেন।

গুলের পত্র

প্রিয় সি আর দাশ

আজ বেলা ২-৪ বা ৬ টার সময় যদি আপনার কোন কাজ না থাকে তাহা হইলে সেই সময় গবর্ণর আপনার সহিত দেখা করিতে চাহেন।

গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসের সঙ্গে দেশবন্ধুর সাক্ষাৎকার ঘটেছিল কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে কোনো ফললাভ করা যায়নি। দুদিন না যেতেই দেশবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীরা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। ‘হিন্দুস্থান’ সংবাদ দিচ্ছেন; “ইংলিশম্যান পত্রের সংবাদদাতা গত শনিবার ভবানীপুরে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করেন। তিনি জানিতে পারেন শ্রীযুত দাশ মহাশয় নাকি গ্রেপ্তার হইবার পূর্বে নিম্নলিখিতঃ বাণী দেশবাসীকে সঙ্ঘোদন করিয়া প্রদান করিয়া গিয়াছেনঃ—আমাদের দাবী যদি ধর্মসঙ্গত হয়, আমরা জরী হইব। যদি তাহা না হয়, আমাদের পরাজয়

ঘটিবে। আমি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেছি। তিনিই আমাদের নেতৃত্ব করিবেন।

স্বদেশীই এখন আমাদের প্রধান ব্রত; নিরুপদ্রবভাবে তাহা পালন করিতে হইবে।” গ্রেপ্তার হবার পর দেশবন্ধু দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ বাণী দান করেন এই মর্মেঃ “হে ভারতের নরনারীবৃন্দ, আপনাদিগের নিকট আমাব এই শেষ বাণী। যদি আপনারা দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে অয় লাভ অদূরবর্তী। এই রূপ দুঃখ বিপদের ভিতর দিয়াই জাতির উত্থান হইয়া থাকে। এ দুঃখ বিপদ আপনাদিগকে সাহস ধৈর্য ও সংযমের সহিত সহ্য করিতে হইবে। মনে রাখিবেন, যতদিন আপনারা অহিংসার পথ অবলম্বন করিয়া থাকিবেন ততদিন আপনারা আমলাতন্ত্র শাসনকে অস্তায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত পথ হইতে বিমুদ্রাজ বিচলিত হইলে আপনারদের পরাজয় অনিবার্য। স্বরাজই আমাদের লক্ষ্যস্থল। ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া নহে, একেবারে সম্পূর্ণ স্বরাজই আমাদের পাইতে হইবে। হে ভারতের নরনারীবৃন্দ যে লক্ষ্যের জন্য আমরা এত প্রয়াস করিতেছি তাহা পাইব কি না— তাহা আপনারদের উপর নির্ভর করিতেছে।..... ভারতের ছাত্রবৃন্দকে আমি এই কথা বলি—তোমরা ভারতের আশা ও গৌরবস্থল। দুই আর দুইয়ে যোগ করিতে পারিলেই শিক্ষা সমাপ্ত হয় না, আমাদের সকলের দেশজন্যের সেবাই প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়। দেশমাতা তাঁহার কাজে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তোমাদিগের মধ্যে কে সেই আহ্বানে সাড়া দিবে?” (চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত “বাংলার কথা” , ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২১)

এই গ্রেপ্তারের সংবাদে মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে টেলিগ্রাম করে জানান “আপনাকে এবং আপনার স্বামীকে ধর্মবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদিগকে আদেশবাদের দেখিব, আশা করি।”

দেশবন্ধুর গ্রেপ্তার সংবাদের ভাষ্য কবে সাংবাদিক লিখেছিলেন : “ভারতের প্রজাশক্তির উপর কাহার অধিকার অধিক ? কংগ্রেসের না আমলাতন্ত্রের ? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য চিন্তাঞ্জন আমলাতন্ত্র কবলিত হইবার প্রাক্কালে বঙ্গদেশ তথা নিখিল ভারতবর্ষকে আছান করিয়াছেন। বাক্যে নহে কার্যে, তত্ত্বকথায় নহে সাধনায়, আদর্শে নহে চরিত্রে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।”

(সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বাংলার কথা, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯২১)

একখানি মুসলমান পরিচালিত সংবাদপত্র লিখল :

“জয় দেশবন্ধুর জয়

এতদিনে বাংলাদেশ একজন সত্যিকার নেতা পাইয়া দত্ত হইয়াছে। এ যাবৎ নেতারা পরের ছেলেগুলির কাঁচা মুণ্ডের বিকিকিনি করিয়াছেন, নিজে কলেজ চালাইয়া এবং ছেলেগুলিকে দস্তুর মত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধীনে রাখিয়া পরের ছেলেগুলিকে স্কুল কলেজ ছাড়িবার উপদেশ দিয়াছেন। নিজের গণ্ডা আঠার আনা বজায় রাখিয়া অন্যকে স্বার্থভ্যাগের উপদেশ দিয়াছেন।.....চিন্তাঞ্জন বাহা দেখাইয়াছেন, বাংলার ইদানীন্তন ইতিহাসে তাহা অভিনব, অভূতপূর্ব। অত্বে উপদেশ দিবার পূর্বে তিনি প্রথমে নিজের বধাসর্বস্ব মাতৃমন্দিরে উৎসর্গ করিয়াছেন। বাকি ছিল তাঁর একমাত্র পুত্র চিরঞ্জয়। তিনি তাহাকেও উৎসর্গ করিয়াছেন।” (মোহাম্মদী—হিন্দুস্থান পত্রিকায় ১২ই ডিসেম্বর উদ্ধৃত)

দেশবন্ধুর ও তাঁর সহকর্মীদের কারাগার গমন উপলক্ষে তরুণ কবি হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম লিখলেন “ভাষার গান” :

কারার ঐ লৌহ কপাট

ভেঙে ফেল, কররে লোপাট

* * *

গাঙ্গনের বাজনা বাজা

কে মালিক ? কে সে রাজা ?

কে ছায় সাজা

মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে ?

* * *

লাধি মার, ভাঙ রে তালা,

মা'র ঐ বন্দী-শালায়—

আঙুন জালা,

আঙুন জালা, ফেল উপাড়ি।

(বাংলার কথা, ২০শে জানুয়ারী ১৯২২)

দেশবন্ধু গ্রেপ্তার হবার অনেক দিন আগে হতেই গণ-আন্দোলনের জন্য দেশকে প্রস্তুত করছিলেন। গ্রেপ্তারের মাত্র একদিন আগে ‘বাংলার কথা’ মূল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন : “আপনাদের প্রতি আমার প্রথম ও শেষ কথা এই যে, আপনারা কখনও নিবিরোধ অসহযোগ মন্ত্র ভ্যাগ করিবেন না। আমি জানি এই মন্ত্রের সাধনা করা কঠিন। আমি জানি সময়ে অপর শক্তি হইতে উত্তেজনা এত বেশি আসে যে, কায়মনোবাক্যে নিবিরোধ থাকা অতীব কষ্টকর। কিন্তু এই আন্দোলনের সফলতা এই মহা সত্যের উপর সর্বভাভাবে নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেক কর্মীকেই ক্ষমা ও অহিংসার দ্বারা উত্তেজনার প্রভাব দমন করিবার শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।.....আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, আমরা জনসাধারণকে শাস্ত সংযত রাখিতে যে পরিমাণ অসমর্থ হইব—তা তাহারা গুণ্ডাই হউক আর আর যেই হউক—আমাদের অসহযোগ ব্রতও সেই পরিমাণে নিষ্ফল। দায়িত্ব সবই আমাদের।.....মন্দলোকই হউক আর ভাল লোকই হউক অপর কোন লোকই জনসাধারণকে কিস্বা তাহার কোন অংশকে বিরোধ ও রক্তপাতের পথে পরিচালিত করিতে পারিবে না। আমরা

যদি সাধারণের উপর আমাদের প্রভাব পরিচালন করিতে না পারি তবে আমরা সফলতার দাবী কেমন করিয়া করিতে পারি? আমি নিরুৎসাহ হই নাই। আমি আপনাদেরও নিরুৎসাহ করিতে চাই না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা এই সংগ্রাম ক্ষান্তভাবে চালাইবার উপযোগী যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করুন; সর্বপ্রকারে নিবিরোধ অসহযোগ ব্রত পালন করুন।” (বাংলার কথা, ১ই ডিসেম্বর ১৯২১) ঐ সংখ্যাতেই “কলিকাতার ছাত্রগণের প্রতি” শীর্ষক রচনায় তিনি লিখেছিলেন: “লালা লাজপৎ রায়ের হেণ্ডারে আমাদের আন্দোলনের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। আমার নিকট ইহার অর্থ গুরুতর। আমাদের সাক্ষ্যে বুরোফ্রেণী অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। উহারাজ হইয়াছে এবং প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ পর্যন্ত বুরোফ্রেণী পরোক্ষভাবেই প্রহার করিতেছিল। এইবারকার প্রহার প্রত্যক্ষ... আমি আহ্লাদ সহকারে এই প্রত্যক্ষ আঘাত গ্রহণ করিতেছি। ইহা প্রকাশ্যে কংগ্রেসের সহিত বুরোফ্রেণীর বল পরীক্ষা সূচিত করিতেছে, কংগ্রেসের বর্ষ শেষ হইতে চলিতেছে, এখন তার ফল প্রকাশের সময় উপস্থিত।... কিন্তু কলিকাতার কি হইল? এই প্রশ্নই আমাকে আজ বড়ই বিভ্রান্ত করিতেছে। কেবল পাঁচ হাজার মাত্র কর্মী বেচ্ছাসেবক হইয়াছে; এই বিশাল কলিকাতা সহরে এতগুলি স্কুল কলেজ থাকিতে কেবলমাত্র পাঁচ হাজার।... এই মহানগরীতে কেবলমাত্র পাঁচ হাজার বেচ্ছাসেবক তাহার পর কংগ্রেসের কার্য বন্ধ হইয়া যাইবে। কলিকাতার ছাত্রগণের কি কিছুই বলিবার নাই? এখন কি পড়িবার সময়? কপাতিয়া, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও অঙ্গশাস্ত্র! কি লজ্জার কথা। জননী ডাকিতেছেন আর উহাদের সেই আহ্বান শ্রবণের স্বপ্ন নাই। আমি এ মহানগরীতে আপনাকে নিঃসঙ্গ মনে করিতেছি। আমি যেখানে বাই, সেইখানেই আমার চতুষ্পার্শ্বে সহস্র যুবক দেখিতে পাই,

কিন্তু সংসারবুদ্ধিতে তাহাদের বদনে বার্ষিক্যচিহ্ন প্রকটিত। তাহাদের স্বপ্ন উৎসাহশূন্য ও সজীবতা বিরহিত। আমার বাগনা এই যে ভগবান যদি আমাকে উহাদের স্বপ্নে সজীবতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার শক্তি দিবে, তাহা হইলে আমি কলিকাতার এই সফল যুবককে আবার যৌবনমূলভ সজীবিত করিতাম। সর্বদেশে সর্বঘূর্ণে যুবকগণই স্বাধীনতার জন্ম দ্বন্দ্ব করিয়াছে। যুবকরাই নিষ্পাপ এবং সর্বদাই আত্মোৎসর্গের জন্ম তৎপর।

আমি ক্রমশঃ বৃদ্ধ এবং জরাজীর্ণ হইয়া পড়িতেছি, এখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল মাত্র। উহার এখনও আমাকে প্রেরণা করে নাই, কিন্তু আমি আমার মণিবন্ধে হাতকড়া ও দেহে লৌহ শৃঙ্খলের গুরুভার অনুভব করিতেছি। এই ত বন্ধনের বেগনা বিশাল কারাগার—আমি ধরা পড়ি কি না তাহাতে কি আসে যায়।

একটি বিষয় নিশ্চিত আছে। আমি জীবিত থাকি বা মরি, কংগ্রেসের কার্য চালাইতেই হইবে। কলিকাতায় মাত্র পাঁচ হাজার, তাহার পর কংগ্রেসের কাজ বন্ধ হইবে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি কলিকাতার ছাত্রগণের কি উত্তর দিবার কিছু নাই?”

দেশবন্ধুর এই আহ্বান সেদিন ব্যর্থ হয়নি। কলিকাতার ছাত্র ও যুবকসমাজ দেশবন্ধুর কারাগার গমনের পরও আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব।

সেদিনের “বাংলার কথা” পরিচয় লেখা থাকত “বাংলার নবযুগের সাপ্তাহিকমুখপত্র” বলে। পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন দেশবন্ধু নিজে ও সহযোগী সম্পাদক ছিলেন হেমন্তকুমার সরকার। এঁদের উভয়ের সঙ্গেই স্বভাষচন্দ্রের স্বস্ততা ছিল একজন রাজনৈতিক গুরু, আরেকজন সংগঠক ও সহকর্মী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই পত্রিকায় স্বভাষচন্দ্রের কোনো রচনাই প্রকাশিত হয়নি। খানিকটা আশ্চর্য্যই হ’বে

হয় সেজন্য। কারণ ইংলণ্ডে থাকাকালে নিজের বিষয়ে দেশবন্ধুকে যে প্রোগ্রাম তিনি পাঠিয়েছিলেন তাতে সাংবাদিকতার নিযুক্ত হবার কথা ছিল। এই সময়ে স্মৃতিচলনের চক্রবর্তী সম্পাদিত ইংরেজি স.বাদপত্র Servant-এ স্মৃতিচল প্রবন্ধ লিখতেন বলে শুনেছি, কিন্তু ঐ পত্রিকার কোনো ফাইল কোথাও না পাওয়ায় সেই প্রবন্ধগুলি উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু ‘বাংলার কথা’র কোনো প্রবন্ধই প্রকাশিত হয় নাই;—হয়তো বা বাংলা রচনায় অনভ্যস্ততার দরুণ তিনি লিখতে উৎসাহ বোধ করেন নি, অথবা কর্তার কঠিন চাপও বাধা হয়ে থাকতে পারে। তবে ‘বাংলার কথা’র প্রথম ভাগ, ৫ম সংখ্যায় (৪ঠা নভেম্বর ১৯২১) তাঁর স্বাক্ষরিত একটি কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল—বিস্তৃতিটি হতে জানা যায় যে জাতীয় শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন। সে সময়ে কি ভাবে রচিত হয়েছিল। পূর্বেই বলেছি ১৯২১ সালের ১১ই জানুয়ারিতে স্মৃতিচলনের যোগ দিয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের দিক ছাড়াও একটি রচনাস্বাক্ষর দিকও ছিল—একটা নতুন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার ভাবনাও সেই আন্দোলনের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল। স্মৃতিচলনের উৎসাহ ও আগ্রহ সেদিকেও কম ছিল না। পূর্বেই বলেছি স্মৃতিচলনের চিন্তা ও কর্মের এই দিকটি এখন চাপা পড়ে গেছে এবং ফলত তাঁর মানসিকতা ও কর্মধারা সম্পর্কে একটা অসম্পূর্ণ ও সেই কারণে ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে। স্মৃতিচলনের দৃষ্টিভঙ্গীর সামগ্রিক পরিচয় লাভ করতে হলে গঠনাত্মক কর্মের প্রতি তাঁর অভিনিবেশের কথা বিস্মৃত হলে চলে না। সেই কারণেই আলোচ্য বিস্তৃতিটি আমরা উদ্ধৃত করছি :

“কলিকাতা বিজ্ঞাপীঠ”

কলিকাতা বিজ্ঞাপীঠের পূর্ব সংস্কারের পর হইতে

অধ্যাপনার ভার উপযুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপর স্থাপন হইয়াছে—বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত বিজ্ঞাপীঠের পড়াশুনা ও অধ্যাপকাজকর্ম নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। বিজ্ঞাপীঠে শ্রুতি-কাটা ও বস্ত্র বয়নের অল্প চরকাও বয়নবিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগে বিজ্ঞাপীঠের সকল ছাত্রকেই চরকায় শ্রুতি কাটিতে হয়—কেবল প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পক্ষে বয়নকার্য অবশ্যকর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। বিজ্ঞাপীঠের ছাত্রগণ দ্বারা পরিচালিত পুস্তকাগার, পাঠাগার, তর্কসভা, মাসিকপত্রিকা ও সমবায় ভাণ্ডারের কার্যকলাপ বিশেষ আশাপ্রদ।

এখানকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা এই যে, কর্ম-কর্তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতি সপ্তাহে জ্ঞানী-ভূগী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অধিগত বিষয়ে বিশেষ বক্তৃতা হয়।

পর্যাপ্ত সংখ্যায় ছাত্র পাইলে ছাত্রাবাস খোলা হইবে।

বিজ্ঞাপীঠের কার্যনির্বাহক সমিতি “মধ্য” ও “উপাধি” শ্রেণীর অধ্যয়নের অল্প নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্বাচন করিয়াছেন :-

মধ্য (দুই বর্ষ কাল)

অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়।

- | | |
|------------------------------|--|
| ১। বাংলা সাহিত্য | } এই সকল বিষয়ের কেবল সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক। |
| ২। হিন্দি | |
| ৩। ইংরাজী রচনা-পদ্ধতি | |
| ৪। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল | |
| ৫। চরকা | |

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে ছাত্রগণ যে কোনও তিনটি বিষয় বেছামনোনয়ন করিতে পারিবেন :-

কলাবিভাগ

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ১। সংস্কৃত সাহিত্য | ২। ইংরাজী সাহিত্য |
| ৩। অঙ্কশাস্ত্র | ৪। ভূগোল |
| ৫। তর্কশাস্ত্র | ৬। মনোবিজ্ঞান |
| ৭। ইতিহাস | ৮। ফারসী |

বিজ্ঞান বিভাগ

- ১। পদার্থবিজ্ঞান ২। রসায়ন শাস্ত্র ৩। অঙ্কশাস্ত্র
৪। শারীর বিজ্ঞান ৫। উদ্ভিদবিজ্ঞান ৬। ভূগোল

উপাধি (মধ্য-পরীক্ষার পর দুই বর্ষ কাল)

অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়

- | | |
|--|--|
| ১। ধনবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব
(বিশেষভাবে ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া) | } এই সকল
বিষয়ের
কেবল
সাধারণ
জ্ঞান
আবশ্যক |
| ২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাদান
(বিশেষভাবে ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া) | |
| ৩। বাংলা সাহিত্য | |
| ৪। হিন্দি | |
| ৫। চরকা | |

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে ছাত্রগণ যেকোনও একটি বিষয় বেছে ন্যমোনায় করিতে পারিবেন :—

- ১। সংস্কৃত সাহিত্য
- ২। ইংরাজী সাহিত্য
- ৩। বাংলা সাহিত্য
- ৪। দর্শনশাস্ত্র
- ৫। অঙ্কশাস্ত্র
- ৬। ইউরোপের ইতিহাস (মধ্য ও আধুনিক যুগ)
- ৭। ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচ্যকে ভিত্তি করিয়া)

এখন বিজ্ঞাপীঠের বিজ্ঞান-বিভাগ সংক্রান্ত পরীক্ষাগার (Laboratory) গঠন করা হইতেছে। আগামী ৭ই কাতিক, ৩রা নভেম্বর বিজ্ঞাপীঠ খুলিবে। ছাত্রগণের মধ্যে যাহারা জাতীয় শিক্ষার প্রতি আস্থাবান তাঁহারা অবিলম্বে এই বিজ্ঞাপ্রতিষ্ঠানে যোগদান করুন। বিজ্ঞাপীঠ খুলিবার পর একপক্ষ কাল ছাত্রগণকে ভর্তি করা হইবে।

১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার

কলিকাতা।

৩রা কাতিক, ২০শে অক্টোবর

১৯২১

শ্রীহুভাষচন্দ্র বসু
সম্পাদক
প্রচার-সংসদ
বঙ্গীয় প্রদেশিক
রাষ্ট্র সমিতি

হুভাষচন্দ্রের কর্মধারা ও ভাবনাবৈশিষ্ট্যের পরিচয়ই শুধু বিজ্ঞপ্তিতে যেনো না। জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের যে আন্দোলন এই শতাব্দীর গোড়া হতে হুহু হয়েছিল বাংলা দেশে সে আন্দোলনের ইতিবৃত্তেও এ বিজ্ঞপ্তিটি একখানি দলিল হয়ে থাকবে। বিজ্ঞাপীঠ খোলার করেকদিনের ভিতরই এসে গেল জেলে যাওয়ার পালা; হুভাষচন্দ্র খেলে গেলেন। সেখান হতে মুক্ত হয়ে আসার পর আরও বৃহত্তর ও প্রশাসনিক সংগ্রামের মধ্যে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন—কারণ দেশবন্ধু তখন স্বরাজ্য পার্টি গঠনের কার্যক্রম নিয়েছিলেন। ১৯২১ সালের আন্দোলন সর্বভারতে পরিচালিত হয়েছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীনে; জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর দেশবন্ধু গান্ধীনেতৃত্বের বিকল্প নেতৃত্ব ভারতবর্ষের সমক্ষে উপস্থিত করলেন এবং দেশ তাঁকেই মেনে নিল। হুভাষ ১৯২১ সালে যেমন, তখনও তেমনই দেশবন্ধুর সংগ্রাম সহচর ও একনিষ্ঠ কর্মী। তবু সেই উত্তেজনাময়, ভারতবিশ্রুত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আবর্তের মধ্যেও হুভাষ এই জাতীয় শিক্ষার কার্যক্রমকে ছুলে যাননি, এবং কলিকাতা বিজ্ঞাপীঠে তিনি নিয়মিত অধ্যাপনাও করেছেন। তাঁর শৈশবসঙ্গী ছাত্রদের মধ্যে শুনেছি অধ্যাপনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আন্তরিক, প্রগাঢ় পাক্তিত্বের অধিকারী ও দুঃস্বপ্ন বিষয় বোঝাতে সমর্থ। কিন্তু তাঁর শিক্ষকজীবন দীর্ঘকালস্থায়ী হতে পারেনি, কারণ প্রথমবার জেলহতে বেরিয়ে আসার পর তাঁর রাজনৈতিক কর্মের গুরুত্ব, পরিধি ও বেগ আরও বেড়ে যায় এবং পুনরায় কারাবরণ ঘটে কিন্তু শৈশবের প্রসঙ্গে আপাতত আমরা বাব না।

স্বভাষচন্দ্রের জীবনের প্রথম কাঁচাবরণ এক দিক হতে তাঁর সৌভাগ্যের কারণ হয়েছিল। কারণ দেশবন্ধু অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য এই সময়ে তিনি পেয়েছিলেন। বাংলা দেশের সর্বত্র তখন গ্রেপ্তারের বহু চলছিল। তারই মধ্যে বিচারের গ্রহণও চলতে লাগল। ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের “হিন্দুস্থান” হতে নিম্নলিখিত সংবাদটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

“চিত্তরঞ্জনর বিচার”

গতকাল্য বিকালে আলিপুর জেলের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যৌলানা আবুল কাশাম আজাদ, শ্রীযুত বি. এন. শামসুল, শ্রীযুত স্বভাষচন্দ্র বসু, হাকিম আবদুল বাউখ, এবং অধিকা প্রসাদ বাজপেয়ী প্রভৃতির বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে ভালাস্ট্রারের দল গঠনে সাহায্য করার অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইয়াছে। আগামী ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে তাহাদের মামলা হইবে। গতকাল্য গিঃ এ, জে, থা এখান হইতে আলিপুর জেলে গিয়া বিচার করিয়াছিলেন।”

১৪ই ডিসেম্বর তারিখের ‘হিন্দুস্থান’ পত্রিকায় “শ্রীযুত স্বভাষচন্দ্র বসু” শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ;—তাঁর চরিত্র ও রাজনৈতিক ভূমিকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্ভবত এটি দ্বিতীয় আলোচনা। কারণ Servant পত্রিকায় ইতিপূর্বেই তাঁর সম্পর্কে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। স্বভাষচন্দ্র যে সেকালেই দেশের তরুণদের নেতা রূপে স্বীকৃত হয়ে গেছেন তারই সাক্ষ্য বহন করছে এই প্রবন্ধ। প্রবন্ধের সকল অংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই, তার কারণ তাঁর বাণ্য, কৈশোর, কলেজজীবন, আই সি এস পরীক্ষা ও পদত্যাগ ইত্যাদি জীবনীবিষয়ক আলোচনাতেই প্রবন্ধটি পূর্ণ। আমরা তাই অংশবিশেষ মাত্র উদ্ধৃত করছি :

“... বাংলার নব্য সম্প্রদায়ের নামক শ্রীযুক্ত স্বভাষচন্দ্র বসু যদিও বড়ঘরে জন্মিয়াছেন এবং আবাল্য স্বপ্নের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছেন তথাচ বাগ্যকাল হইতেই তাঁহার

হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে •ধ্যয়নকালে তিনি একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং কলেজের যাবতীয় অমুঠানে তিনি কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতেন। অনন্তর তিনি শিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে যান এবং মাত্র নয় মাসের পরিশ্রমের ফলে শিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। কিন্তু করিলে কি হয়? দেশমাতৃকার দুঃখদুর্দশা নিত্য বাহার হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে, সে কি কখনও দাঙ্গাধে আত্মবিক্রয় করিতে পারে? কাজেই তিনি বলে কিরিয়া আসিয়া কলিকাতা বিদ্যালীঠ ও পাবলিশিটি বিভাগের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি নীরবে, নিশ্চক্ৰাবে কেবল এই উত্তর বিভাগের কাজ করিতেন। তাঁহার চরিত্রের নির্মলতার ও অমায়িক ব্যবহারে বাহার তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইতেন।”

যে ব্যক্তির নামে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয় সম্ভব্য প্রকাশিত হয় তাঁর প্রতিষ্ঠা ইতিপূর্বেই ষটে গেছে ধরে নিতে হবে। মাত্র কয়েকমাস রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত থেকে স্বভাষচন্দ্র যে সমস্ত দেশে একজন নবীন নেতা রূপে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ তারই প্রমাণ দেয়। স্বভাষের গৌরবে দেশ গৌরাবান্বিত হয়েছিল সেদিনই—তাই সেই গৌরবের অংশভাগী হতে পেরেছিলেন তাঁর পরিবারবর্গ ও আত্মীয়বৃন্দ। মাত্র কয়েক মাস আগে আই, সি. এস হতে পদত্যাগ করায় তাঁর বাবা দুঃখিত হয়েছিলেন, স্বভাষের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বেগও তিনি হয়েছিলেন সম্ভবত। কিন্তু এই মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই তাঁর সকল উদ্বেগ প্রশান্তিত হয়েছিল এবং দুঃখের পরিবর্তে স্বভাষের কারণে মন তাঁর আনন্দে ও গৌরববোধে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তাই পুত্রের জীবনের প্রথম কাঁচাবরণের সংবাদ পেয়ে কটক হতে কলিকাতায় আবেগাতিশয্যে একখানি চিঠি লিখেছিলেন তিনি। অজ্ঞাত

পুত্রদের কাছে এই চিঠিতে তাঁর বক্তব্য ছিল এই : “শ্রীমান
অভাষের ছায় পুত্র পাইয়া আমরা গবিত। স্বার্থত্যাগের স্বফল
সম্বন্ধে আমার গভীর আস্থা আছে। সে যে কারাগারে
যাইবে, ইহা আমি প্রতিদিনই আশা করিতেছিলাম।
তোমাদের জননী এই ঘটনায় একটুও বিচলিত হন নাই।
তিনি মনে করেন, এইরূপ স্বার্থত্যাগের দ্বারাই পরিণামে স্বরাজ
লাভ হইবে। প্রিয় অভাষকে আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ
জানাইবে।” (হিন্দুস্থান, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২১)

শেষ কথা

অভাষচন্দ্রের জীবনের একটি অধ্যায়ের কথা অতিশয়
সংক্ষেপে আমরা বর্ণনা করেছি। এই পর্বে তিনি ছাত্রজীবন
সমাপ্ত করে প্রবেশ করেছেন কর্মজগতে—এবং দেশবন্ধুর
উত্তরসাধক রূপে বাংলা দেশে তখনই তিনি চিহ্নিত হয়ে
গেছেন। জীবনের প্রথম কাব্যবরণের ভিতর দিয়ে তাঁর
এই পর্বের সমাপ্তি। সেই কারাবরণে জননী প্রভাবতী দেবী
বিচলিত হননি, স্বার্থত্যাগত্রস্তী পুত্রকে জানিয়েছেন আন্তরিক
আশীর্বাদ। দেশজননীও বুঝি বিচলিত হননি সেদিন—কোন
অদৃশ্য মৌনলোকে এই সর্বভাগী সম্রাসী বালকের জন্ম তাঁরও
ঝরেছে আশীর্বাদের সঙ্গে আনন্দ-বেদনায় যেনা অঙ্গ।
জানকীনাথের কণ্ঠে বঙ্গ জননীর বানীই বুঝি সেদিন উচ্চারিত
হয়েছিল : “শ্রীমান অভাষের ছায় পুত্র পাইয়া আমরা গবিত”
আর বাংলার তরুণ সমাজ একটি কথাই শুধু বলতে পারত
সেদিন, “জয়ন্তু অভাষ হে সারথি! তোমার বিজয়যাত্রায়
আমাদেরও তোমার সঙ্গী করে নাও। আমাদেরও দিও
তোমার মহৎ বেদনার ভার, তোমার স্বার্থধর্মে দীক্ষা।”

[দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত]

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্ম

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংবেজী মাসের তৃতীয়
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ৯.৫০। ষাণ্মাসিক
৪.৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ
সংখ্যানগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে
হয় না।

লেখকদের জন্ম

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের অযোগ্য
সর্বপ্রায়ে দেওয়া হয়।
 ২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলফুল্যপের একপৃষ্ঠায় লিখে
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত।
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।
 ৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো
হয়।
- শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ-
যোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান

কলিকাতা-৪৭

সুভাষচন্দ্র : কাজী আবদুল ওয়দ

জানতাম এক সুভাষচন্দ্র বসুকে ।

এক সঙ্গে পড়তাম কলেজে,

চোখে তার চশমা,

রং ফর্সা, পানশে শাদা,

প্রায় রোগা গড়ন,

মুখে কঠিন সংকল্পের ছাপ,—

কিন্তু প্রিয় দর্শন ।

অশ্রান্ত ছিল তার বন্ধুদের দেশের পথে আহ্বান.....

একদিন কাঁধে হাত রেখে বলেছিল সে অমুচ্চ কণ্ঠে—

ত্যাগ করতে হবে ভোগবিলাসের পথ, হতে হবে ফকির ।

ফকির হয়ে করতে হবে দেশের সেবা, দেশের সেবা

—তাতেই জীবনের সার্থকতা ।

জানতাম তার কোমার্ণের কঠিন সংকল্প ।

জানতাম জলছে তার অন্তরে স্বদেশ প্রেমের তুফানল ।

শ্রদ্ধা করতাম এই সহপাঠিকে—গভীর শ্রদ্ধা করতাম ।

সে ছিল বিপ্লবের যুগ ।

তরুণ—নির্বোধ নয়—কে ছিল বাংলা দেশে

যার মনে সেদিন ছোঁয়া লাগেনি

এই সর্বত্যাগী বীরদের !

কিন্তু শ্রদ্ধা করতাম স্বদেশপ্রেমিককেই—

সাদা জাগাতো না অন্তরে তার সন্ন্যাসের আহ্বান ।

জেনেছি তখন তরুণীর মাধুর্য ও শুচিতা—

বাধতো ভাবতে নারী পথের বাধা ।

তারপর সেই সহপাঠী হল দেশ-গৌরব—বিচিত্র পথে ।

দেখতাম দূরে থেকে সেই তপস্বীর জয় ব্যাড়া ;

ভীত হতাম তার গতির তীব্রতা—ভয়াবহতা—দেখে

—বন্ধু-বিচ্ছেদ, গুল্লুর অসন্তোষ,

সব অতিক্রম করে' চললো ভারতীয় যোগীর

অ-ভারতীয় কর্মমার্গের বিচরণ ।

শেষে একদিন ছিন্ন করলে এই তরুণ সিংহ

যত জালের রশি ঘিরেছিল তাকে চারিদিক থেকে,

উপস্থিত হলো বিশ্বতাস হিটলারের দেশে

তারপর সমুদ্র সীতরে হাজির হলো পূর্ব-এশিয়ায় ।

গড়লে—অপরূপ বাহিনী মস্তবলে—

কাঁপিয়ে পড়লো জন্মভূমির শত্রুর উপরে ।

সাধীদের বলে সে ; দাও আমাদের তোমাদের শোণিত,

দেব আমি তোমাদের স্বাধীনতা ।

এক সুরে বলে উঠলো সবাই : নাও আমাদের সব ।

সেই হুঃসাহসী নিজের ও শোণিত দিলে নিঃশেষে,—

বলে বিধাতাকে—দিয়েছি আমাদের বুকের রক্ত—

দাও স্বাধীনতা হে করুণাময় !

বাহ্যিকল্পতরু পূর্ণ করে সবার বাহ্যী.....

দেখলে জগৎ সেই হুঃসাহসীর বাহ্যী হলো পূর্ণ—অচিরে ।

কি কথায় তব নিবেদন হবে এই হুঃসাহসীর প্রতি—

কবিগুরু করেছেন যাকে পূজা নিবেদন ।

মহানু-আত্মা বলে যার উদ্দেশ্যে—কোনো ক্রটি

স্পর্শ করে না বীরকে ।

আর কৃপাণধারী বীর মাত্র সে নয়—

বীর সে চিন্তাক্রম,

বীর সে বিচার ক্ষেত্রে

এই বীরকে নিবেদন করছে দেশ অশ্রু আর আকুতি ।

হায় হৃৎস্পর্শ !!!

ওরে মূর্খ—

বীরের পূজা হয় বীরেরে ।

পুনর্মুদ্রণ ৩য় প্র., পৌষ ১৩৬৮

২৩ শে জানুয়ারী : সাবিনী প্রথম চট্টোপাধ্যায়

কাল হতে কালান্তরে অরণের সরণী বহিয়া
চলে যাবে বহুদূরে, হে বরণ্য ভারত-পথিক
তবু তব পদচিহ্ন ধস্তকরি ধরণীর গুলি
পরিচয় দিবে তব সে জয়-যাত্রার ।
মুগ-মানবের মনে জাগাবে বিশ্বাস
চক্ষুর সম্মুখে রাখি পথের নিশানা
কোনো এক মহা বিপ্লবের,
প্রত্যঙ্গন মুহূর্তেরে করি রমণীর—
জেগে রবে অনাগত কালের প্রহরী ।

জন্ম ও মৃত্যু হাতে-রাঙা রাশী
তুমি যে পরায়ে দিলে আপনার হাতে
মহামৃত্যু—মহোৎসবে,
তাহারি মহিমা, দীপ্ত-পূর্ব-এশিয়ার
জীবনে এখনো জাগে নূতন স্পন্দন
বন্ধন-বিমুক্ত নব জীবনের আবির্ভাব লাগি ।

আমরা হেথায় বসি কোতুল ভরে
গবেষণা করি শুধু তোমার মৃত্যুর—
দুর্ঘটনা ? অপঘাত ? চক্রান্ত ? অথবা
শত্রু হস্তে গোপন হত্যার
তথ্য আহরণ করি পণ্ডিতের মত ।

তুমি কি করিবে ক্ষমা
অপৌরুষ এই মুচতার ?
লক্ষ্য অবহেলা করি
উপলক্ষ্য লয়ে যারা আজ
নিজেরা বিলাস্ত হয়ে আশ্রিত আনে মানুষের মনে
ভারাতো তোমার ভক্ত নয় ।
যারা ভক্ত তাহাদের হৃদয়-আসনে
অটল প্রতিষ্ঠা তব নিরবধি কাল ।

রেখে গেছ যে বৈভব মহামানবের
আকাশের মহাব্যাপ্তি, সাগরের নিঃসীম মহিমা
তারি মাঝে রয়েছে গোপন,
তাহারে প্রকাশ করি অনন্ত আলোকে
চলে যাবে অসংশয়ে তারা ।

মৃত কি জীবিত সূর্য
তারি লাগি দীপ্ত দীপালোক
স্তিমিত স্মৃতির পটে হারাইবে মহিমা তাহার ?

তুমি সত্য, সত্যতব সাধনার বাণী
আরো সত্য মৃত্যুহীন সে মহাজীবন
সেই দিবে অমৃতের পরম সন্ধান ।

পুনর্মুদ্রণ জরুরী, মাস ১৯৩৪

জিভিন্ন আলোক স্মৃতিচন্দ্রের মন

দেবদাস জোয়ারদার

দৈন্যমাতৃকার বেদীতলে আশ্রয়-নিবেদিত স্বভাষচন্দ্রের আবির্ভাবের পশ্চাতে ছিল তাঁর আবাল্য নীরব ও নিঃশব্দ প্রকৃতি। এই প্রকৃতির ইতিহাস আছে তাঁর নিজের লেখা চিঠিতে। কীটস্ তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন,

‘.....the silent workings of the dawn,
were the busiest’ *

আগ্ন প্রভাতের নিঃশব্দ প্রকৃতি চলে পূর্ব দিগন্তে অনেকক্ষণ ধরে। পাখির কলকলিতে। ক্রমে ক্রমে নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তাগমনে প্রভাতের পূর্ব সূচনা আভাসিত হয়ে উঠে। স্বভাষচন্দ্রের জীবন প্রভাতের নিঃশব্দ, অথচ ব্যস্ততম প্রকৃতির রেখাচিত্র পাই তাঁর চিঠিতে। চিঠিতেই একজনের সবচেয়ে বেশি নিভৃত মনের পরিচয় পাই। কেননা চিঠি মাহুষের অন্তরঙ্গ আশ্রয়প্রকাশের বাহন: চিঠিতে প্রবন্ধের মতো বক্তব্য প্রতিষ্ঠার তাড়া নেই। এখানে লেখক লিখতে লিখতে ভাবেন, ভেবে লেখেন না। চিঠিতে একজন আর একজনের কাছে নিঃশেষে তাঁর কণ্ঠস্বর উন্মুক্ত করেন। চিঠিতে ব্যক্তিমাহুষের নিরাবরণ ও নিরাভরণ আশ্রয়-প্রকাশের অযোগ্য ঘটে। তাই স্বভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বরূপ সন্ধানে তাঁর চিঠির মূল্য অপরিণীম। চিঠি যিনি লিখছেন এবং যাকে লিখছেন—এ দু’জনের মিলিত সৃষ্টি। তাই একই স্বভাষচন্দ্রের লেখা চিঠিতে তাঁর বিচিত্র আশ্রয়প্রকাশ। তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্র বহুকে লেখা চিঠিতে আছে তাঁর আদর্শ ব্যাখ্যা ও রাজনীতিকমতের আলোচনা। অতীতকে মেজ-

বৌদিদি বিভাবতী বহুকে লেখা চিঠিতে পাই হান্ত-কৌতুকোচ্ছল স্বভাষচন্দ্রকে। এই চিঠিগুলিতে বক্তব্যের গুরুভার নেই, আছে তুচ্ছতার রসসন্ধান। এই তুচ্ছতার রসকেই অনেক সমালোচক চিঠির মূল্যবোধ বলেন। বহুজনকে লেখা চিঠিগুলিতে আমরা তাঁর বিচিত্ররূপে আশ্রয় প্রকাশ দেখি। কখনো তিনি জীবনের পথ সন্ধান ব্যাকুল রাসিক, কখনো তিনি জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ধ্যানেবিভোর আশ্রয়-পুরুষ, আবার কখনো বা তিনি ভাবুক। তাঁর চিঠিগুলি পড়তে পড়তে এই আদর্শ-রিক্ত যুগের এক মহত্তম আদর্শলিঙ্গ জ্যোতির্ষ পুরুষের নিবিড় স্পর্শভারের আনন্দ পাওয়া যায়।

তাঁর বাল্যকাল থেকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লেখা চিঠিগুলি ছাপার অক্ষরে পড়ার অযোগ্য মিলেছে। একটি ধণ্ডা বাংলায় লেখা ‘পত্রাবলী’, অতীত ইংরেজিতে লেখা ‘Correspondence’ (১৯২৪-৩২)। এই দুই ধণ্ডার মধ্যে আবার এমন চিঠিও আছে যেগুলি দুটি ধণ্ডেই স্থান পেয়েছে। এক ভাবপ্রবণ বালক তাঁর মাকে চিঠি লিখছেন—‘মা আপনি ত মা,—ভারতবাসী যদি আপনায় সন্ধান হয়, তবে সন্ধানদের কষ্ট দেখিলে মার প্রাণ কি কাঁদিয়া উঠে না?’ এ কথাগুলি পড়ার পর আর সন্দেহ থাকে না যে এই বালক আর দশজন বালকের মতো নন। এই বালকের মধ্যে দেশের বেদনা অনিবার্য অগ্নিশিখার মতো জগছে। চিঠি-গুলিতে তাঁর জীবনের বিচিত্র উপকরণ ছড়িয়ে আছে। তাঁর ছাত্রজীবন, প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ওটেন

সংশ্লিষ্ট গণ্ডগোল, আধ্যাত্মিক প্রেরণায় কৈশোরে তাঁর গৃহত্যাগ, আই, সি, এসের জন্ত বিলাত যাত্রা, আই, সি, এস থেকে পদত্যাগ, দেশে প্রত্যাবর্তন, দেশের রাজনীতিতে যোগদান, কলকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে তাঁর যোগ, মান্দালয়ে কারাবাস, ভগ্নস্বাস্থ্যের বিবরণ,—এমন অজস্র উপকরণ আকীর্ণ রয়েছে এই দু'খণ্ড চিঠির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। কিশোর স্বেচ্ছাচলিত্ত্বের স্বির আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তি প্রথম বিচ্ছুরিত হতে দেখি হেমন্তকুমার সরকারকে লেখা একটি চিঠিতে—‘আমি এটা বেশ বুঝিতেছি দিন দিন যে আমার জীবনের একটা definite mission আছে। তারই জন্ত আমার শরীর ধারণ and I am not to drift in the current of popular opinion’। অস্ত্রের মতো তিনি গা ভাসিয়ে দিতে প্রস্তুত নন, জীবনে নির্দিষ্ট ব্রতোদ্ঘোষের জন্ত তাঁর শরীর ধারণ। এই mission এর কথা তাঁর কাছে পরে বার বার শুনেছি। কিন্তু ‘mission’ এর উল্লেখ বোধ হয় প্রথম এ চিঠিতেই পাচ্ছি। এই ব্রতোদ্ঘোষের জন্ত দেখ, মন, স্বপ্ন ও বুদ্ধিকে তিনি দিনের পর পর দিন প্রস্তুত করে তুলছেন। তাঁর মনকে তিনি যাবতীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নিয়ে যেতে চান। তবু সে মন কখনো কখনো মানবিক দুর্বলতায় ধরা পড়ে। মান্দালয় থেকে মুক্তির পরে শিলং থেকে মেজবোদিকে লেখা একটি চিঠিতে—এমন এক দুর্বল মুহূর্তের পরিচয় পেয়ে তাঁকে আমাদের পরমাত্মীয় মনে হয়। এখানে তাঁর সঙ্গে আমাদের লৌহদূত আদর্শের ব্যবধান নেই। এখানে তিনি আমাদের স্বর্গদ্রোহিতার সমস্তরে নেমে এসে লিখছেন—‘আপনারা সকলে হঠাৎ চলে যাওয়াতে একটু মুক্তি পড়েছিলুম। খালি বাড়িটা খাঁ খাঁ করতে লাগল—মনটা কেমন করে উঠল—দৈনন্দিন জীবনের খেইগুলো যেন কিছুক্ষণের জন্ত হারিয়ে গেল—একটু কষ্ট হয়েছিল বজ্র বোধহয় অত্যাশ্রিত হবে না। বহুকাল একপাশে আমার মনে স্থান পায় নাই।

আমি মনে করতুম যে আমি যাত্রা মমতার বাইরে। তাই একটু স্বা দিয়ে প্রকৃতি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে এখনও একেবারে মমতাহীন হতে পারিনি।’ এ চিঠিতে তাঁর ব্যক্তিত্বরূপকেই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও ঘরোয়ারূপে দেখেছি। এছাড়াই বলছিলাম, চিঠিতে একজন মানুষ নিঃশেষে নিজেকে ধরা দেন। শ্রীঅনাথবন্ধু দস্তকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর কাছে থেকে কারাবাসের বেদনাবরণের জন্ত মমতার স্পর্শ পেয়ে ঐ ব্যক্তিত্বরূপটিকেই অনাবৃত করে লিখছেন, ‘স্বদেশ-সেবী হবার স্পর্ধা রাখলেও আমি মানুষ। ভালবাসা প্রীতি ও করুণার নিদর্শন পেলে কে না স্থগী নয়? পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি জয় অথবা অতিক্রম করতে পারলেই ভাল হয়। উচ্চস্তরের কর্মীর পক্ষে সকল প্রকার প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা জয় করা উচিত, কিন্তু সেটা এখনও আমার কাছে আদর্শ-মাত্র।’ এই দু’টি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করার একটি মাত্র কারণ। কেননা মানুষ স্বেচ্ছাচলিত্ত্বকেই এখানে নিবিড় ভাবে পাই। আবার সৌন্দর্যময়িক ভাবুক স্বেচ্ছাচলিত্ত্বের কবিপ্রাণের স্পর্শ যেখানে ধমুধব করি এমন দুটি চিঠির কথা এখানে বলা যেতে পারে। একটি চিঠি তাঁর মেজদাদাকে লেখা। এ চিঠিতে আছে মান্দালয়ের কারা-প্রাচীরের অন্তরাল থেকে দেখা দিনাবসানের এক ঝড়ের রূপবর্ণনা। স্তরে স্তরে ধূলি জমছে। হাওয়া বইছে দুঃস্বপ্ন বেগে। অন্ধকার জমাট বাঁধছে। কারাকক্ষের সব কিছু উড়ে যাচ্ছে দমকা হাওয়ায়। করুণার মতো বুড়ির ধারা নেমে আসছে। সর্বব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে তিনি মিস্টন-বর্ণিত ‘Cimmerian darkness’ অনুভব করছেন। মুহূর্তে বিদ্যুতের স্পর্শে অন্ধকার যেন দৃশ্যগোচর হয়ে উঠছে। এই দৃশ্য গোচর অন্ধকারকে আবার তিনি মিস্টনের ভাষায় বলছেন ‘darkness visible’। তারপর তিনি সম্ভব করছেন, অন্ধকারের রূপবর্ণনায় মিস্টন নিপুণ, যেমন সেক্সপীয়ার অন্ধর চন্দ্রালোকের বর্ণনায়। মেঘে মেঘে

বক্ষণনিতে তিনি দেখতে পাচ্ছেন 'চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্টহাসি'। সমস্ত বর্ণনাটাই কবির চোখে দেখা প্রকৃতির রূপরূপের বর্ণনা। এমন আর একটি চিঠি তাঁর মেজবোদিকে শিল্প থেকে লেখা—'নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, চারিদিকে পাহাড়ের শ্রেণী, বনজঙ্গলের মধ্যে আলোছায়ার লুকোচুরি—বরগার অবিরাম কলকল নাদ—এ সব নিয়ে বেশ আছি। তাতে শরীর ও মন বেশ স্নিগ্ধ হয়। আকাশ যখন একটু পরিষ্কার হয় তখন বাহিরে বেরিয়ে পড়ি এবং প্রকৃতির নীরব ভাষা আমার অন্তরে প্রবেশ করে আর মনে পড়ে সেই কবির কথা—

And this our life exempt from public haunt
Finds tongues in trees in running brooks,
Sorrows in stones and in everything.'

এই ব্যক্তিমুখটির অন্তরের রহস্যলোকে প্রবেশের জন্য একটি চিঠির স্বর কান পেতে শোনা উচিত। এ চিঠিতে ভাষা বড়ো বেশি সংযত। আবেগের বিন্দুমাত্র স্পর্শ নেই। তাঁর মেজবোদিকে স্বাস্থ্যের বিবণ দিয়ে চিঠি আবস্ত। স্বাস্থ্য-পরীক্ষার পর চিকিৎসকদের মিলিত অভিমত সংক্ষেপে জানাচ্ছেন।

(১) যক্ষ্মার লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে।

(২) পেটের মধ্যে একটা গোলমাল আছে হয়তো এপিণ্ডিসাইটিস্।

(৩) অবিলম্বে স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠান উচিত।

(৪) হুইটজারল্যাণ্ডে অথবা ভায়ালিতে স্ত্রানিটো-রিয়ামে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। জেলে থাকিলে রোগের প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পাইবে।

যক্ষ্মার মতো মারাত্মক রোগের লক্ষণ ধরা পড়েছে। একথা জানাতে গিয়েও নিজের স্বাস্থ্যসম্পর্কে এতোটুকু চিন্তার কথা তিনি উল্লেখ করছেন না; একেই বলে চরিত্রের নিরাসক্তি। এই নিরাসক্তির সাধনাই তাঁর ব্যক্তি জীবনের সাধনার মূলসত্য। এজন্যই তাঁর নিজের জীবনকে এক

'adventure' রূপে গ্রহণ করতে পারছেন। বেদনাবহ সংবাদ জানাতে বসেও তাঁর উচ্ছ্বাস নেই। তিনি প্রশান্ত। চরিত্রের এই প্রশান্তিই তাঁকে জীবনে দুঃখজ্বরের সাধনায় সিদ্ধি দিয়েছিল।

এই চিঠিগুলিতে তাঁর লেখাপড়ার ধরও কিছু কিছু পাচ্ছি। মান্দালঘের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ভগ্নবাস্থ্যের বিডম্বনা সহ্য করেও তিনি বিচিত্র বিষয়ে লেখাপড়া করছেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রেরণার উৎস লোকমাত্র তিলক। তিলক এই মান্দালঘে কারাবাসের দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেই তাঁর গীতাভাষ্য রচনা করেছিলেন। তিলক হুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে মনীষার শঙ্কর ও রামানুজের সমতুল্য। তাঁর কাছে বার বার ছেলেবেলা থেকেই মনে হয়েছে কর্ম ও চিন্তা একই স্রোতে যুক্ত। চিন্তাহীন কর্ম শুধু উদ্বেজনােকেই প্রেরণ দেয়। তিনি সারাজীবন নির্জন চিন্তার পথ ধরেই কর্মের কোলাহলে গিয়ে পৌঁছেছেন। সেই চিন্তার উপকরণ তিনি সংগ্রহ করেছেন অজস্র গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। তাঁর মেজদাদার কাছে স্বল্প মান্দালঘ থেকে Experimental Psychology, তত্ত্বশাস্ত্র, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন এমন বিচিত্র বিষয়ের উপর বই চেয়ে পাঠাচ্ছেন। ঐ যে বি, এ পাশ করার পর তিনি পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের ছাত্ররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, এই বিশেষ বিষয়টির প্রতি তিনি আজীবন আকৃষ্ট ছিলেন। Mrs. Kurtyr স্মৃতিকথায় জানতে পারি যে তিনি এই মহিলাকে বলেছিলেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে না এলে মনোবিজ্ঞানের চর্চায়ই তিনি আত্মনিয়োগ করতেন। তাঁর ছাত্রজীবনে পাঠক্রমে বাংলাসাহিত্যের যথাযোগ্য স্থান ছিল না বলে নিজের শিক্ষার অপূর্ণতাবোধ তাঁর ছিল। কখনো তাঁর চিঠিতে পাই মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের ঐশ্বর্যের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি, আবার কখনো দেখি বাংলাসাহিত্যের উপর তাঁর ধারাবাহিক অশূদ্ধল অধ্যয়নের সঙ্কল্প প্রকাশ। একটি চিঠিতে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে

বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের এক ছিন্নশূন্য ব্রহ্মদেশে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে ধরিয়ে দিতে পারেন বলে তিনি তাঁর মেজদাদাকে জানাচ্ছেন। খিদিবপুরের মনসা ও মনসামেলার ইতিহাস সন্ধানে তদ্রূপ উৎসাহীদের নিয়োগ করার জন্য সন্তোষকুমার বহুকে অনুরোধ করছেন। ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলাতেই জাতীয় চিন্তের বিকাশ ঘটে। বলাবাহুল্য, আমাদের জাতীয় সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধা স্ত্রীভাষচন্দ্রের কাছে ইতিহাসের মূল্য অপরিণীম। ছবি আঁকা ও গান গাওয়া জানা থাকলে তিনি তাঁর কারাবাসের নির্জন মুহূর্তগুলিকে সৃষ্টির আনন্দে পূর্ণ করে তুলতে পারিতেন। তাই ভাইপো ভাইবিরদের এ দৃষ্টি বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর মেজদাদা ও মেজবৌদিককে লিখছেন। আরো লিখছেন, ছেলেমেয়েদের রাগারণ ও মহাভারত পড়ানোর জন্য। শিশুশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তার পরিচয় পাই শ্রীহরিচরণ বাগচীকে লেখা একটি চিঠিতে। শিশুর কাছে সবচিন্তাকেই বস্তুর আশ্রয়ে তুলে ধরা উচিত। কেননা তার কাছে নির্বাক চিন্তার মূল্য নেই। ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে তোলার অর্থই শিশুশিক্ষার পূর্ণতা। সৃষ্টির আনন্দের মধ্য দিয়েই একমাত্র শিশুচিন্তের উদ্বোধন হতে পারে। স্ত্রীভাষচন্দ্রের এ সব চিন্তা আধুনিক শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্মত।

এবারে আগামী দিনের রাজনীতির ক্ষেত্রে নেতাজী স্ত্রীভাষচন্দ্রের মানসিক প্রস্তুতির ইতিহাস তাঁর চিঠি থেকে সন্ধান করা যেতে পারে। অসুস্থমান করতে পারি, তন্ত্র-পাঠের মধ্য দিয়ে তিনি শাস্ত্রচেন্তনায় দীক্ষিত হচ্ছিলেন। জুঃধভোগের মধ্যে তিনি আনন্দ অনুভব করছেন। দেশ-দেশান্তরে, পার্বত্য জুঃগমপথে, সমুদ্রের অতলগভীরে সাবমেরিনের পথে, আশ্রয় হিন্দু কোজের সঙ্গে ব্রহ্ম আরাবান ইন্দ্রলের গহন অরণ্যে এই আনন্দই তাঁকে ঝড়ের মত ছুটিয়েছে। স্বাধীনতালাভের পর ভারতের বৈষয়িক পুনর্গঠন

সম্পর্কে তাঁর অস্পষ্ট চিন্তা ছিল। এমন-কি আই, সি, এন্স, পদভ্যাগের পরে দেশসেবায় কোন ধরনের কাজ দেশবন্ধু তাঁকে দিতে পারেন, এবিষয়ে জানতে চেয়ে তিনি যে চিঠি লিখছেন তার মধ্যেই তাঁর গঠনমূলক চিন্তার পরিচয় আছে। পরাধীনতার বন্ধন মোচনই ভারতের পক্ষে বঞ্চিত নয়। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের কর্তব্য সম্পর্কে তিনি যেমন অস্পষ্টভাবে ভেবেছিলেন, এমন ভাবনা খুব কম দেশনেতারই ছিল। কংগ্রেস সভাপতিরূপে পরিকল্পনা কমিশনের জনক স্ত্রীভাষচন্দ্রকে আমাদের প্র্যানিং সংক্রান্ত আলোচনায় অরণ করা হয় না। এ আমাদের সারাজাতির কৃতজ্ঞতার একটি কলঙ্কিত দৃষ্টান্ত। দেশবন্ধুকে চিঠিতে তিনি ইংল্যান্ড থেকে লিখছেন, কংগ্রেসের একটি গবেষণাবিভাগ থাকা উচিত। এই গবেষকদল দেশের সর্বশেষ তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন। এঁরাই স্বাধীন ভারতের কর্তব্য স্থির করবেন। জনশিক্ষা-বিস্তার ও সমবায়মূলক ব্যাক স্বাপনে, আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। দেশবন্ধুকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর গঠনমূলক চিন্তার অস্পষ্ট পরিচয় পাই 'এখন থেকেই ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করিয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিতে হইবে। জাতীয়জীবনের যে কোন সমস্যা সম্বন্ধে একটা policy ঠিক করিতে গেলে অনেকদিনের চিন্তা ও গবেষণা চাই।' স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যস্ততার মধ্যে স্বাধীনভারতের পুনর্গঠন সম্পর্কে আমরা সে যুগে অস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারিনি বলেই এযুগে আমাদের লক্ষ্যহীন পথচলায় অনেক শক্তি ও সময়ের অপচয় হয়েছে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ সরকারের সমান্তরাল জাতীয় সরকার গঠনের মধ্যদিয়ে জাতির আত্মশক্তির উদ্বোধন সম্পর্কে পরবর্তীকালে স্ত্রীভাষচন্দ্রের চিন্তার পরিচয় আছে তাঁর চিঠিগুলিতে। ভিক্ষুকতার বিদ্বৎনা থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে হবে তার আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক ঐশ্বর্যে। মালদহের গম্ভীরা গান বা এজাতীয় বাংলার অজস্র লোক শিল্পের ভিত্তিভূমির

উপরই আমাদের আগামীদিনের সাংস্কৃতিক সৌধ রচনা সম্ভব। এ বিষয়ে তিনি শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখছেন। এক অবিচলিত প্রত্যয় থেকে নেতাজী আশাদহিন্দ ফৌজকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, রাত্রি শেষের নিবিড়তম অন্ধকার আসন্ন প্রভাতেই পূর্বসূচনা বহন করে। তাই তাঁদের সংগ্রাম শেষের পতনের মধ্যেও ভবিষ্যৎ অভ্যুদয় সূচিত হচ্ছে। সেই প্রত্যয়দৃষ্ট কণ্ঠস্বরই শুনি তাঁর একটি চিঠিতে—‘আমাদের লক্ষ্য সত্য ও স্বাধীনতার লক্ষ্য। রাত্রিশেষে যেমন দিন আসে, অব্যর্থভাবে তেমনি সেই লক্ষ্যই শেষ পর্যন্ত সফল হবে। আমাদের দেহ বিলীন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু অক্ষয় বিশ্বাস ও অজয় ইচ্ছার জয় আমাদের হবেই। আমাদের উজ্জ্বল ও পরিশ্রমকে সাকল্যমণ্ডিত দেখার জন্য আমাদের মধ্যে কাঁবা বেঁচে থাকবো, এ স্থির করবেন বিধাতা। আমি শুধু আমার বেঁচে থাকতেই সন্তুষ্ট, আর সবকিছুই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।’ এ কণ্ঠস্বর অকুতোভয় ও অকম্পিত। Mission পালনের স্থির প্রত্যয়ের দীপ্তিতে উজ্জ্বল তাঁর প্রতিটি কথা।

স্বভাষচন্দ্রের এই দু’খণ্ড চিঠিতে তাঁকে কখনো অভিমানী পুরুষেরূপে দেখেছি পূজনীয়া বাগচী দেবীকে লেখা চিঠিতে। কখনো দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদে বেদনাক্লান্ত রূপে দেখেছি। কখনো আই. সি. এস থেকে পদত্যাগের অন্তঃকর্তাকে প্রস্তুত হতে দেখেছি। কখনো কিশোর স্বভাষচন্দ্র তাঁর প্রাণের কথা লিখছেন বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে। আবার কখনো মাসিক বহুমতীতে দেশবন্ধুর উপর স্মৃতিকথা পড়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লিখতে দেখেছি। হরিচরণ বাগচীকে লেখা চিঠিতে তিনি এক তরুণকে জীবনের পথ নির্দেশ দিচ্ছেন। এভাবে বিচিত্ররূপে যুগ যুগান্তরের ভারত ইতিহাসের এক উজ্জ্বল পুরুষ স্বভাষচন্দ্রকে পাওয়ার সুযোগ পেয়ে আমরা আনন্দিত। যিনি দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর স্বভাষচন্দ্রের friend, philosopher and guide, সেই শরৎচন্দ্র বহুকেই তাঁর অধিকাংশ চিঠি লেখা। তাকে লেখা

একটি চিঠি থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করি— ‘আমি আমার দীন উপায়ে আমাদের জাতির অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত পালনে রতরূপেই নিজেকে অমৃত্তব করি। আমি এই প্রায়শ্চিত্তে স্থখী এবং স্থখী থাকবো। আমাদের চিন্তা অমর। আমাদের আদর্শ জাতির স্মৃতি থেকে বিলীন হবে না। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমাদের প্রিয়তম স্বপ্নের উত্তরাধিকারী হবে। এই হচ্ছে আমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই আমার হৃৎকেন্দ্রের মধ্যে চিরকাল আমাকে রক্ষা করবে।’

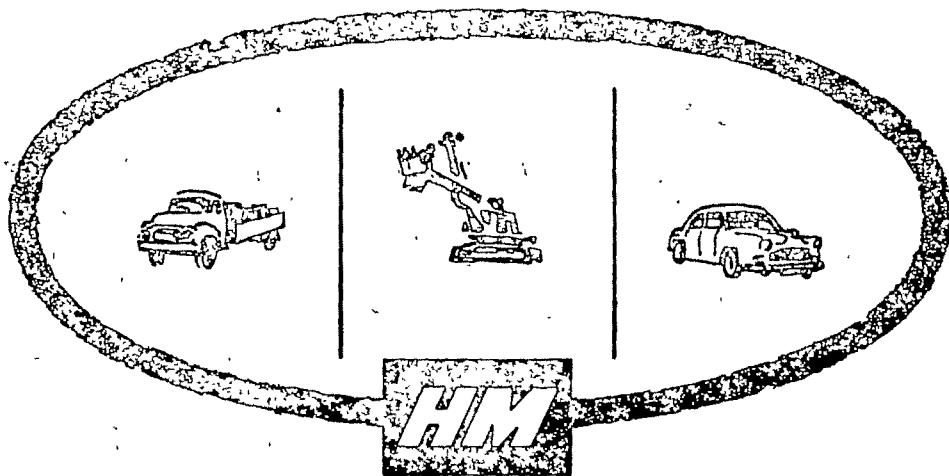
দ্বিধাবিভক্ত স্বাধীন ভারতের সর্বব্যাপী আদর্শহীনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে পরাধীন ভারতের এই আদর্শোজ্জ্বল নেতাজী স্বভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যে তাঁর জন্মদিনে ভক্তিনম্র প্রণাম জানিয়ে চিঠির আলোকে এই মহানু মনের আলোচনা শেষ করি।

SREE MA TYPE FOUNDRY.

Quality Printing Mono-Type Faces.
&
Wooden Press Furniture
Manufacturers

295, Rabindra Sarani,
Calcutta-5

Phone : { 22-6812 Office
55-3547 Factory
55-9028 Residence



With the Compliments of

HINDUSTAN MOTORS LIMITED

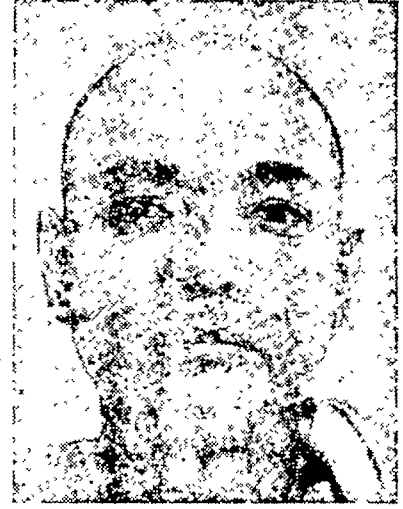
**INDIA'S LARGEST AUTOMOBILE
MANUFACTURERS**

‘বুদ্ধের কঠিন হাসি’

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

“আগার আঙ্গার গহন আলোড়িত হয়ে উঠল, আমি ও আমার স্বামী পরস্পরের দিকে দীর্ঘ সময় নীরবে তাকিয়ে রইলাম।.....এই আশ্চর্য সঙ্ঘাটির কথা ভুলতে পারবো না কখনো, এবং আশ্চর্য মানুষটির কথা—তঁার সন্তান অথচ স্বকঠিন বুদ্ধ-হাসির কথা।”

দ্বিতীয় আলাপের অন্তে, যখন সেই ‘আশ্চর্য’ লোকটি বিদায় নিলেন—তঁার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে চেকোশ্লোভাক মহিলার ঐ কথাগুলি মনে উঠেছিল অনিবার্য ভাবে। এবং তঁার লেখা পড়ে আবার আমাদের মনে হল, হাঁ বুদ্ধ, ঠিকই, তবে রাজনৈতিক বুদ্ধ, বিবেকানন্দই, বর্ষ পরে।



অপূর্ব একটি গ্রন্থ পেয়েছি, স্মৃত্যাকার, কিন্তু ক্ষুদ্র নয়, সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে চেক মহিলার এই স্মৃতিকথাখানি সুভাষ-সাগরের ঝড়ের বৃকের যৌন-গান শুনিরেছে, আমরা বুঝেছি; লেখিকার মত করেই, “এই অসাধারণ মানুষটি, এই মিষ্টিক মানুষটি, এই স্বগভীর আধ্যাত্মিক মানুষটি রাজনীতিতে জড়িত হয়েছেন, ঠিক, কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত উচ্চাশায় নয়, না, নিছক কর্তব্যবশে।” এ সব কথা আমরা জানি, আমরা এখনো ভারতীয়, মেনে নিয়েছি, কিন্তু তার তাৎপর্য চেষ্টা করে অনুধাবন করতে চাইনি (দিলীপকুমার রায়ের মত অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া); এহেন সময়ে বহিরাগত সহসা আলোক আমাদের চমকে দেয়ই, প্রাচ্য ভারতকে প্রতীচ্য মনাকালে উদিত দেখে সচকিত আনন্দ প্রকাশ করতে হয়ই, যেমন করছি এখন—শ্রীমতী কীটী কুর্তি বইখানি পড়ে।

শ্রীমতী কুর্তি সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চরিত্রের উপর আলোকসম্পাত করবার জন্ম গ্রন্থ রচনা করেন নি, তিনি তঁার দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের কথাই বলতে চেয়েছেন, এবং সুভাষচন্দ্র যদিচ নিজ রাজনৈতিক চরিত্রকে গোপন করেন নি—তিনি কিন্তু নিজের অধ্যাত্ম স্বভাবকেই মেলে ধরেছিলেন এই অমূল্যতত্ত্বপ্রবণ গ্রন্থিক মহিলার কাছে।

শ্রীমতী কীটী কুর্তির মন রহস্য গভীর, তঁার রচনাও ব্যঞ্জনাময়। সুভাষ-সাহিত্যে গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন-রূপে গ্রহীত হবে।

তিন দর্শন, চার সাংসার এবং কয়েকটি পত্র নিয়ে এই বই। প্রথম দর্শন ১৯৩০-এ বঙ্গভাষায় বাগিনে। বঙ্গ ভনে ও উপবনে, কিন্তু মনে নয় শ্রীমতী কুর্তির; কারণ চেকোশ্লোভাকিয়ার মনের সাধনে খাড়া হয়ে উঠেছে অস্তিত্ব :

* Subhas Ohandra Bose, As I knew him : By Kitty Kurti. Firma K. L. Mukhopadhyaya, price Rs .8-00

“অট্টিয়া কি মোজাটকে দেয়নি। তাঁর সঙ্গীতের অক্ষরস্বর আনন্দধারাকে? অট্টিয়া কি দেয়নি হিটলারকে, যার দান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।” মোজাটের বুকের সামনে বেয়নেট তুলে এখন উচ্চত হিটলার। সেই দিকেই চোখ রেখে, বসন্তেও আতঙ্কিত মহিলাটি একদিন ঘরে ফিরছিলেন, এমন সময়ে—লেখিকার নিজস্ব বর্ণনাই অমূল্যস্বরূপ করা যাক—

“বাসস্থানের দিকে ফেরার কালে হঠাৎ চমকে দেখি একটি বিস্ময়কর মূর্তি ধীর পদক্ষেপে আমার দিকে আসছে। দীর্ঘ আকার, ক্লশকায়, স্পষ্টতই ভারতীয়। কালো রঙের স্ট পেরা, প্রায় পাদরীদের মত। মাথায় ক্রীম রঙের ছোট গান্ধী টুপি।.....মুখ ঘন অলিভ রঙের, গোলপানা, শিশুর সরলতা সেখানে, কিন্তু বিস্ময়করভাবে বুদ্ধিদীপ্ত।

তাঁর মুখের বুদ্ধিদীপ্তিই মাত্র আমাকে সচকিত করে তোলেনি, সেইসঙ্গে তাঁর সর্বব্যাপক দৃষ্টিও ছিল, যা খুঁটিনাটি সব জিনিসেব পরিমাপ করে মুহূর্তের মধ্যে বস্তুর মর্মকেস্রে উপস্থিত হয়।..... আর অসাধারণ লেগেছিল তাঁর চলার ভঙ্গি। মহুর ঋজু পদক্ষেপে অসামান্য মর্যাদা ও সংঘের দৃঢ়তা।

এই আমার প্রথম দর্শন। কোনো সন্দেহ নেই, আমি অনন্ত পুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি, মিস্টিক, আধ্যাত্মিক পুরুষ। হায়, তরুণী-নারী না হয়ে আমি কেন তরুণ যুবক হলাম না! সেক্ষেত্রে শোনা তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে খোলাখুলি কথা বলতে পারতুম। কী দুঃখজনক এই রীতির দাসত্ব! কী দুঃখজনক—বাগিনের মত হট্টগোলের রাজ্যে এমন একটি মানুষের—এক প্রান্তক হিন্দুর—সংস্পর্শের অযোগ্য হারালুম। আধ্যাত্মিকার উদ্ভাসিত মানুষটি অগোচরে চলে গেলেন, হায়, সেই ক্ষণে, যখন আত্মার শক্তির এত প্রয়োজন।”

সত্যই পুরুষটি কিন্তু হারিয়ে যাননি, দ্বিতীয় দর্শন মিলল বিচিত্র পরিবেশে, যা বিমূঢ় করে তুলল এই মহিলাকে। বাগিনের কণ্ঠনালীতে সাঁড়াশির চাপ পড়েছে। আতঙ্কে কম্পমান নগরী। কারাগার, খুন, বিচার, ফাঁসী। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের গোড়ানি। চিন্তার মৃত্যু, সঙ্গীতের মৃত্যু, সাহিত্যের মৃত্যু। হিটলার এমনই এক সময়ে টেলিফোন বাজল কুঁতি-পরিবারের আবাসে। আমেরিকান কালচারাল ক্লাব থেকে আমন্ত্রণ—রেভারেন্ড জনসন জানানলেন—জনৈক অত্যাচারিত বহু ভারত সঙ্কে বলবেন, অতরাং ভারত সঙ্কে আগ্রহী কুঁতি দম্পতি আসতে পারেন।

তাঁরা গেলেন। সবিস্ময়ে দেখলেন, সেই ‘স্পষ্টই আধ্যাত্মিক’ মানুষটি এই সঙ্ঘ্যার বক্তা, এবং বক্তৃতার বিষয় দার্শনিক নয়, রাজনৈতিক। কিছুটা হতাশ হলেন ক্রীমতী কুঁতি, তবু লক্ষ্য করতে চাইলেন ভাল করে মানুষটিকে—

“আমি বুরলাম, ইনি কদাপি নিছক রাজনীতিক নন, ইনি সর্বোপরি একজন দার্শনিক। দেশের মুক্তির জন্ত ইনি যদিও অসম সাহসে সংগ্রাম করছেন, তবু একই সঙ্গে মানুষের, সমগ্র মানবের, ভাগ্য ও নিয়তির চিরন্তন চিন্তায় নিরত।”

বক্তৃতাস্তে সবাই এমন করে ঘিরে ধরল তাঁকে যে, ক্রীমতী কুঁতি চেষ্টা করেও নিকটে যেতে পারলেন না। শানিক পরে হঠাৎ অযোগ্য এল, ভিড় যখন পাতলা হয়েছে, ক্রীমতী বহু একা দাঁড়িয়ে আছেন—ক্রীমতী কুঁতি সাগ্রহে এগিয়ে গেলেন, হাসলেন তিনি, করমর্দন করলেন, কিন্তু বাক্য ক্ষুতির আগেই—আবার এক দল এগিয়ে এল—তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। কিছু পরে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

রেভারেণ্ড জনসনকে ধন্তবাদ জানানো বরকার। এমন একটি সন্ধ্যা, এমন একটি মানুষ, এবং তাঁর স্পষ্ট ভাষণ, কোটি কোটি বন্দী মানুষের প্রতিভূর কণ্ঠস্বর—শোনার ব্যবস্থা করেছেন রেভা : জনসন—হৃদয়ং ধন্তবাদ তাঁর প্রাপ্য।

দেখা গেল রেভা : জনসনকেও কয়েকজন ঘিবে আছেন। তাঁদের উচ্চারণ ভদ্রিতে শ্রীমতী কুর্তি বুঝলেন, তাঁরা ইংরেজ। রেভা : তাঁদের কথা শুনে লাগলেন, লগাটে ক্রকুটি ঘনাল, মুখ লাল হয়ে উঠল, কী যেন একটা রাগের আলা তাঁর সর্ব্বাঙ্গে। এধারে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে শ্রীমতী কুর্তি যেতে পারছেন না। এবং কৌতূহল না মিটিয়েও।

“মি: জনসন, অসাধারণ আজকের সন্ধ্যাটি,” স্বযোগ মেলা মাত্র শ্রীমতী কুর্তি বললেন, “আপনাকে অশেষ ধন্তবাদ। অতীব আকর্ষণীয় পুরুষ ঐ মি: বহু। আচ্ছা, উনি কে?”

যে রেভারেণ্ড জনসনকে কখনো রাগতে দেখেননি ইনি, বক্তাদের সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশের মত অমার্জিত যিনি কদাপি নন, তিনি রাগে-বিরক্তিতে গরগর করে বললেন—

“জানলে কখনো লোকটিকে নিমন্ত্রণ করি—কখনো না—কদাপি না। লোকটি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক। সম্ভবত: ভারতের মঙ্গলের পক্ষেও। আমার ভাল লাগে না। এ অনুষ্ঠান আমার করানো উচিত হয়নি।”

শ্রীমতী কুর্তি শুনে স্তম্ভিত। কিন্তু—ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক কি একই সঙ্গে ভারতের মঙ্গলের পক্ষেও বিশ্বাসঘাতক?

মানুষটি সম্বন্ধে রেভারেণ্ড অসম্ভষ্ট হলেন কেন—অসম্ভষ্ট হতে পারলেন কি ভাবে—মানুষটি এত স্পষ্টভাবে আধ্যাত্মিক। রাজনৈতিক?—বাধ্য হয়ে তাই হতে হয়েছে, উপায় ছিল না বলেই।

মানুষটি সত্যি কে?

বার্লিনের বাতাসে উত্তরোত্তর হিংসা। বার্লিনের বাতাসে উত্তরোত্তর বসন্ত। পাখির গান আর বৃষ্টির শব্দ, প্রেমের হাসি আর ফাঁসির ছায়া, ফুলের গন্ধ আর রক্তের স্বাদ। তবু নব বিবাহিত দম্পতি কুর্তিরা। চোখে মনে স্বপ্নের ঘোর। “হয়ত, হয়ত মানুষ ফিরে পাবে হারানো চৈতন্য। হয়ত বর্তমানের অন্তত সংকেত স্বেচ্ছাও ভবিষ্যতে বাজবে মঙ্গল শব্দ।”

পথে যেতে যেতে সহসা ধমকে দাঁড়ান শ্রীমতী কুর্তি।—“কে? আলেক্স দেখ—মি: বহু আসছেন! সেদিন কথা বলতে পারিনি। আজ যদি আলাপ করে ওঁকে বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ জানাই—যেদিন ওঁর স্ত্রীবা সেই দিন—কি বল?”

কক্ষ পোষাকে আচ্ছাদিত দীর্ঘ মূর্তিটি ক্রমে নিকটবর্তী হয়। মি: কুর্তির হাতে মিসেস কুর্তির অমুরোধের চাপ পড়ে। মি: কুর্তি এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে হাত মেলান।

হাঁ, শ্রীযুক্ত আসবেন পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজে।

(ক্রমশঃ)

দেশের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের

সংগে পরিচিত হবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িক পত্রপত্রিকা পড়ুন

পশ্চিমবঙ্গ : সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক। এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি। প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা। ষাণ্মাসিক : দেড় টাকা।
বার্ষিক : তিন টাকা।

ওয়েষ্টবেঙ্গল : পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক। প্রতি সংখ্যাতেই নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
প্রতি সংখ্যা : বারো পয়সা। ষাণ্মাসিক : তিন টাকা। বার্ষিক : ছয় টাকা।

প্রমিক বার্তা : অক্ষয়লাল সম্পর্কিত বাংলা ও হিন্দী সচিত্র দ্বিভাষী পাক্ষিক। বার্ষিক : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
পশ্চিমবঙ্গাল : নেপালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী। ষাণ্মাসিক : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
বার্ষিক : তিন টাকা।

মগ্গরেবী বঙ্গাল : সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত উর্দু পাক্ষিক। ষাণ্মাসিক : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
বার্ষিক : তিন টাকা।

পছিমবাংলা ; সীওতালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র পাক্ষিক। বার্ষিক : এক টাকা।

- * গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন।
- * চাঁদার টাকা তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে।
- * ভি. পি. পি —তে পত্রিকা পাঠান হয় না।
- * পত্রিকা বিক্রির জন্য ৩০% কমিশনে এজেন্ট চাই।

তথ্য অধিকর্তা

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাইটাস' বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

—ডবলিউ. বি. (আই অ্যান্ড পি. আর) অ্যাড ১৩৬৪/৬৮

বিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও স্মৃতিচক্র

সমর গুহ

১৮৯৭ সালে স্মৃতিচক্রের জন্ম। এই বছরেই বিপ্লব-তীর্থ আগারল্যাণ্ডের অগ্নি-কন্ডা ভগ্নী নিবেদিতা ভারতে আসেন বিবেকানন্দের সঙ্গে। ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক কিন্তু আত্মিক অনুভূতিতে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় বিপ্লববাদের স্বজ্ঞবেদী রচনা করেন বৈদান্তিক সম্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। এই স্বজ্ঞ-বেদীতে হোমায়ি সঞ্চার করেন ভগ্নী নিবেদিতা। স্মৃতিচক্র সেই বৈপ্লবিক হোমায়ির প্রজ্জলিত শিখা। বিপ্লব যন্ত্রের এই সাগ্নিক জলন্ত শিখা-রূপেই স্মৃতিচক্র ভাবত ইতিহাসে স্বর্গাসন লাভ করেছেন 'নেতাজীর' মহানায়কত্বের অধিতীয় পরিচয়ে।

স্মৃতিচক্রের স্বধন পাঁচ বছর বয়স তখন বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। স্মৃতিচক্র তখনও কটকে,—স্মৃতিচক্র সেই কৈশোরেই অগ্নি-কন্ডা নিবেদিতার জীবন শিখা নিভে যায়। স্মৃতিচক্রের সঙ্গে বিবেকানন্দ বা ভগ্নী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয়নি। তবুও জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লবমন্ত্রে স্মৃতিচক্রের দীক্ষাদাতা হলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগ্নী নিবেদিতা। এই দীক্ষা ও প্রেবণার ভাবাস্রক বাহন হলো বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক জীবনদর্শনের অনুভূতি,—যে অনুভূতিতে ভগ্নী নিবেদিতা তীক্ষ্ণ ও তীব্র করে তোলেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের দিশারী রূপে।

কিশোর স্মৃতিচক্রের জীবন-স্রগ্ব ক্রিভাবে সার্থক হয়ে উঠলো বিবেকানন্দের আত্মিক স্পর্শে তার বিবরণ স্মৃতিচক্র নিজেই অনুপম বর্ণনায় লিখে রেখেছেন। স্মৃতিচক্র তখন কিশোর,—মন তাঁর জীবন ভ'রে ফল ফলাবার আগ্রহে

উন্মুখ। কি হবে সেই ফলের বীজ,—কোন মহীকূহে পূর্ণতা লাভ করবে কিশোর স্মৃতিচক্র,—সেই প্রশ্ন তার কচি মনকে সেদিনে মগ্নিত করে তুলেছিল। স্মৃতিচক্র নিজের কথায় "সে সময়ে আমার মনলোকে এক প্রচণ্ড ঝড়ের যুগ চলছিল। মানসিক দৃষ্টে আমার মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সংঘাত ও বেদনার আমার সারা অন্তর জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। কোন বন্ধুর সঙ্গে এ বেদনার সমভাগী হওয়া সম্ভব ছিল না, বাইরে তা চোখেও পড়তো না। কোন কিশোরের জীবনে বোধ হয় স্বাভাবিকভাবে এমনি অভিজ্ঞতা দেখা যায় না। কিন্তু আমার মানসিক গঠনে কিছুটা অস্বা-ভাবিকতার স্পর্শ ছিল। আমি অনেক বেশি পরিমাণে শুধু যে আত্মানুগ ছিলাম তাই নয়—মনের দিক দিয়ে অনেকটা বেশি মাজায় বাড়ন্ত ছিলাম। পার্থিব আকর্ষণ বা স্বাভাবিক জীবনের অনুসরণের আগ্রহের বিরুদ্ধে আমার উচ্চতর অনুভূতি বিদ্রোহ করতে শুরু করেছিল। আমি যা চাই-ছিলাম,—অজ্ঞাতসারে যার সন্ধানে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম সে হলো একটি মৌল আদর্শ,—যার উৎসে নিয়ম থেকে, যার সংকল্পে অবিচ্যুত হয়ে জীবনের নানা বিক্ষেপকে অগ্রাহ করে এগিয়ে যেতে পারবো।"

জীবনের প্রভাবে এমনি স্বধন এক 'সংকট' স্মৃতিচক্র-জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল,—স্বপ্নাচারী কিশোর সেই সময়ে আকস্মিক একদিন বিবেকানন্দের রচনাবলীর সাক্ষাৎ লাভ করলো। যেন এক নতুন জীবনের সন্ধান পেলে সে। নিজেই স্মৃতিচক্র লিখেছেন সেদিনের এই নব

চেতনার উন্মেষের কথা : “আমি বুদ্ধদেব মত গ্রাস করতে লাগলাম সেই রচনাবলী,—আমার সমস্ত অস্থি মজ্জায় শিহরণ খেলে গেল। যে আদর্শের মধ্যে আমি আমার জীবনসত্যকে সম্পূর্ণ করতে পারি—বিবেকানন্দ তাই দিলেন আমাকে। দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস আমি মগ্ন হয়ে রইলাম তাঁর রচনাবলীর মধ্যে। আমার বয়স তখন মাত্র পনেরো, বিবেকানন্দ প্রবেশ করলেন তখন আমার জীবনে। আমার অন্তর্লোকে এক বিপ্লব সূত্র হলো—সব-কিছু উল্টে গেল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দোষে ও তাঁর শিক্ষার অমুখাবন করে,—বিবেকানন্দ আমার সামনে এক পূর্ণ-ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তিরূপে প্রতিভাত হলেন। বিবেকানন্দের পথই হলো আমার পরম দিশারী।”

বিবেকানন্দের কাছে স্মরণ যে জীবন-দর্শন পেলেন তাই স্মরণকে দিল বিপ্লব-মন্ত্রের দীক্ষা। ভারতকে তিনি দেখলেন বিবেকানন্দের অমুভূতি দিয়ে। তিনি নিজেই লিখেছেন “নিজের মুক্তির জন্মই মানবতার সেবা। এই মানব সেবার অর্থ অবশ্যই দেশসেবা। তাঁর (বিবেকানন্দের) জীবনী রচয়িতা এবং তাঁর প্রধান শিষ্যা ভদ্রী নিবেদিতা তাই লিখেছেন, “The queen of his adoration was his motherland,.....There was not a cry within her shores that did not find in him a responsive echo.” বিবেকানন্দ ভারতমাতার যে অমুভূতি লাভ করেছিলেন,—স্মরণ তারই স্পর্শ পেলেন নিবেদিতার লেখনীতে। সেদিনেই সেই কৈশোরেই জন্ম হয়েছিল বিপ্লব-বাদী ‘ভারত-পথিক’ স্মরণচক্রের।

ভারতে যে নতুন জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লববাদের চেতনা গড়ে ওঠে তারও পথিকৃৎ হলেন বিবেকানন্দ এবং তাঁর প্রবল প্রবক্তারূপে অভিব্যক্তি লাভ করলেন ভদ্রী নিবেদিতা। বিবেকানন্দ বোমা ছোড়েননি, ইংরেজ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে ভাষণ দেননি বা কোন রাজনৈতিক দল

গঠন করেনি। তবুও তিনিই ভারতীয় বিপ্লববাদের জনক বা মূল দার্শনিক। সে যুগে বিপ্লবীদের ঘরে ঘরে তজ্জালী করার সময়ে এক ফিরিঙ্গী শাসক ক্রিপ্ত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন “কে এই বিবেকানন্দ, তাকে ধরে এনে ফাঁসী দাও।” ভারতে বিপ্লবীদের সংগঠন ও কার্যকলাপের অমুসন্ধান করতে যেয়ে সিডিশন কমিটিও বলেছে যে ‘বিপ্লবীদের অবিচ্ছেদ্য অমুসন্ধানী ছিল বিবেকানন্দের রচনাবলী।’ বস্তুত, শুধু আত্মাহুতির প্রেরণার উৎসই নয়,—ভারত প্রেম ও দেশসেবার মর্যবাহীর সন্ধানও বিপ্লবীর পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের রচনাবলীতে।

ভারতে সমাজ চেতনা ও রাজনৈতিক চেতনা গড়ে উঠেছিল বিবেকানন্দের আবির্ভাবের আগেই। রাজা রামমোহন মানবতাবাদের ভিত্তিতে নতুন সমাজ চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন ভারতের, বিশেষ করে বাঙালীর, জন মানসে। এই চেতনার উৎস ছিল বেদান্ত কিন্তু আদিক ও আবরণে অতি মাত্রায় প্রাধান্ত ছিল পাশ্চাত্য আচরণবাদের। বিবেকানন্দের ‘বিশ্ববিজয়ের’ অভিযাত্রার আগেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু কংগ্রেসের এই জাতীয়তাবাদ ভারতীয়তাবাদের প্রমুখ্যে গড়ে ওঠেনি। পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ভাবধারা ও সংজ্ঞা দিয়ে ভারতের স্ফুটন্ত জাতীয় কংগ্রেস ভারতের জাতীয়তাবাদের কাঠাম তৈরী করেছিল। সেদিনের জাতীয় কংগ্রেস “ভারতের” হলেও আদর্শের সন্ধান ‘ভারতীয়’ ছিল না। বিপ্লববাদের আহ্বান তো দূরের কথা, ভারতীয় প্রমুখ্যে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলাও সেদিনের কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বিবেকানন্দই একথা প্রবল কণ্ঠে সর্ব প্রথম ব্যক্ত করেন যে পাশ্চাত্যের রাজনীতির আদর্শ ভারতের জাতীয়তাবাদের উৎস বা আবেদন হতে পারে না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হলো ভারতের ঋষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও

- মূল্যবোধের ঐতিহাসিক উপাদান। বিবেকানন্দ একথা প্রবল কণ্ঠে ব্যক্ত করেন যে রাজনীতিবোধ বা রাজশাসন কোনদিন ভারতের জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি করেনি। পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছে রাষ্ট্র ও শাসকগোষ্ঠির রাজনীতির আবেদনে। কিন্তু ভারতে ভারতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতার আত্মিক আবেদনে। বিবেকানন্দই ভারতের জনমানসে সর্বপ্রথম এই সচেতনতা সৃষ্টি করে বলেন যে সাংস্কৃতিক বা আত্মিক ঐক্যবোধই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল আবেদন ও উৎস। এই আত্মিক ভারতীয়তাবোধের সঙ্গে আধুনিক কালের রাজনীতির সমন্বয় ঘটিয়েই গড়ে তুলতে হবে ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তাবাদ বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম। বিবেকানন্দের ভারতীয় দর্শনই ভারতের জনমনে অপূর্ব ভারত-গর্বের প্রবল জোয়ার এনে দেয় আর এই জোয়ারই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপাদানের অবলম্বনে ‘জাতীয় শিক্ষা’ ‘স্বদেশী’ ও ‘জাতীয়’ পুনর্গঠনের জীবন-দর্শন গড়ে তোলে। রাজনৈতিক তাৎপর্যে দেশপ্রেম বা পেট্রিয়োটিক জমের যে সংজ্ঞা বিবেকানন্দের ভারতপ্রেমের মর্মার্থ তার চেয়ে অনেক গভীর এবং এই গভীরতার জন্মই ভারতের দেশপ্রেমের আদর্শ মুক্তি-সংগ্রামীদের মধ্যে সর্বত্যাগের আমন্ত্রণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।
- বিবেকানন্দের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল্য আরো এক দিক থেকে স্পষ্টতর। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কল্পনায় দেশ ও দেশপ্রেমের সঙ্গে জনতা ও জনসেবার আদর্শকে অঙ্গাঙ্গী করে গড়ে তুলে বিবেকানন্দই বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে অবিচ্ছিন্ন গ্রন্থীতে আবদ্ধ করেন। ভবিষ্যৎ ভারতের ব্যাপক জন আন্দোলন এবং সমাজবাদের ঐতিহ্যও বিবেকানন্দের এই জনসেবাভিত্তিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ থেকেই উৎসারিত হয়েছে পরবর্তীকালে।

১৮৮৫-১৯০৪ সাল এই যুগে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের বাহন বা হাতিয়ার ছিল সম্পূর্ণরূপে বৈধানিক বা কনস্টিটিউশনাল। পরবর্তী কালের গান্ধী যুগে বৈধানিক পন্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অহিংস অসহযোগের সত্যগ্রহ নীতি। কিন্তু ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৯ সাল এবং ১৯২৩-১৯২৮, ১৯২৮-১৯৩৪ এবং সর্বশেষ ১৯৪২-১৯৪৬ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাধান্য লাভ করে সশস্ত্র বিপ্লববাদ।

নিরুপদ্রব আইনামুগ আন্দোলন বা গান্ধীবাদী অহিংস সত্যগ্রহবাদের জন্য ভারতীয় বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অহিংসা ও শান্তিবাদে। গান্ধীবাদী জৈনধর্মী বংশগত ঐতিহ্যই তাঁকে শান্তি ও অহিংসাবাদের পন্থাসূত্রী করে গড়ে তোলে। বুদ্ধদেব বৈদিক কর্মবাদকে অস্বীকার করে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৃহত্তর সাম্য ও মৈত্রীর আহ্বানে ব্যাপক গণ-ধর্মে পরিণত করেন। বিবেকানন্দ বুদ্ধদেবের জ্ঞান ধর্মকে ব্রাহ্মণ্য বন্ধনীর কুক্ষি থেকে মুক্ত করে জনমানসের সমীপবর্তী করে দেন,—কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অহিংসা ও শান্তিবাদের আভিষ্য বর্জন বরং যুগধর্মী আহ্বান জানান। ভারতীয় ইতিহাসের গতিধারা বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দ দৃঢ় কণ্ঠে একথা ঘোষণা করেন যে শান্তি ও অহিংসাবাদের আভিষ্যপূর্ণ আচরণবাদ ভারতে যে ক্রীতবতা ও কুসংস্কারমুখী মনোবৃত্তি সৃষ্টি করেছিল তারই পরিণামে ভারত বহিরাঙ্গ-মণের পরাক্রমের সামনে বারবার পরাজিত হয়ে নিঃশেষ ও নিবীৰ্য হয়ে পশ্চাদগামী হয়ে পড়ে। বিবেকানন্দ তাই নব জাগ্রত ভারতের সামনে শক্তিবাদী জীবন ধর্মকে প্রবল ও প্রধান করে তুলবার প্রয়াসে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। বিবেকানন্দের অভিযানী শক্তিবাদের উৎসেই জন্মলাভ করে বাংলা তথা ভারতের বিপ্লববাদ। এই অর্থে সশস্ত্র বিপ্লববাদের দার্শনিকও বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ আরেক দিক থেকেও বিশেষভাবে স্বজন-ধর্মী। তিনি সমন্বয়ের দর্শনকে মুক্ত

করেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে। প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিচিত্র প্রমুখ্যের কোনটিকেই তিনি অস্বীকার করেননি,—তিনি এই বহুপ্রমুখ্যের যুগধর্মী সমন্বয় সাধন করেই ভারতীয় জীবন দর্শন গড়ে তোলার অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

অতএব ভারতীয় রাষ্ট্রীয় বিপ্লববাদের ক্ষেত্র তৈরী করেন বিবেকানন্দ বলে ভুল হবে না—সেই ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক বীজ বপনের কাজে অগ্রণী ভূমিকার অবতীর্ণ হন ভগ্নী নিবেদিতা। বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির কথা বলেননি—কিন্তু তাঁর সমস্ত কর্ম ও বাণীর অন্তরালে যে বিপ্লবের মন্ত্র স্পষ্ট ছিল অযোগ ও ক্ষেত্রের অপেক্ষায় ভগ্নী নিবেদিতা সেকথা সম্পষ্ট-ভাবে জানালেন। ভারতের মুক্তি ব্যতীত যে বিবেকানন্দের স্বপ্ন সার্থক হওয়া সম্ভব নয়—এবং অগ্নিমন্ত্রের পথই যে বিবেকানন্দের পথ সে সম্বন্ধেও নিবেদিতা ছিলেন নিশ্চিত। এজন্যই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-অন্তঃপ্রাণী নিবেদিতা সাক্ষ্য নয়নে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিল করেও ভারতের মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষ প্রেরণা-দাতা রূপে এগিয়ে আসেন। শুধু এগিয়ে আসেন যে তাই নয়—আইরিশ বংশজাত এই অগ্নি-কন্তা বিপ্লববাদের পথকে ভারতের মুক্তির পথরূপেও নির্দেশ করেন। অমূলীন সমিতির সদস্যদের আলোচনা বৈঠকে তিনি যোগ দেন, ফ্রপটকিনের যে রচনাবলী তাঁর কাছে ছিল তা দান করেন এই সমিতিতে ও বরোদার গাইকোয়াড়ের বিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্ত প্রেরণা দেন এবং খ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগ স্থাপন করেন বৈপ্লবিক কাজ কর্মে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে।

ভগ্নী নিবেদিতার কাজ ছিল বিবেকানন্দের তৈরী ক্ষেত্রে

বিপ্লবের বীজ ছড়ানো। এই কাজটি তিনি করেন ভারতীয় বিপ্লববাদীদের প্রেরণাদাতা রূপে। বিবেকানন্দ ভারতীয় বিপ্লববাদের যে যন্ত্রবেদী রচনা করেন—ভগ্নী নিবেদিতা তারই যুকে জালিয়ে দেন বিপ্লবের হোমায়ি শিখা।

ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামে বিপ্লববাদ ও অহিংস অসহ-যোগিতাবাদ চলেছে পাশাপাশি এবং পরস্পরের সম্পূরক-রূপে। গান্ধীজী বিপ্লববাদকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন অহিংসবাদ দ্বারা। বিপ্লববাদীদের হাত থেকে তিনি নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ১৯২০ সালে। কিন্তু ত্রিপুরার পরে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা দীক্ষিত বিপ্লববাদের অমূল্য অন্বেষণের হাতে এই নেতৃত্ব হস্তান্তরিত হয় এবং এই বিপ্লববাদের চরম অভিব্যক্তি রূপেই অন্বেষণে পূর্ণমূর্ত হয়ে ওঠেন মহানায়ক নেতাজী রূপে।

বিবেকানন্দ-নিবেদিতার আবির্ভাব না হলে এবং তাঁদের অবদানে ভারতের শক্তিবাদী জীবনদর্শন গড়ে না উঠলে ভারতের মাটিতে বিপ্লববাদ প্রসার লাভ করতো কি না সন্দেহ। প্রথম পর্য্যয়ে বৈধানিক আন্দোলন এবং দ্বিতীয় পর্য্যয়ে গান্ধীবাদী অহিংস সত্যগ্রহ—হয়তো এই হতো ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অভিব্যক্তি। আত্মদ হিন্দুর বৈপ্লবিক ঐতিহ্য হয়তো থাকতো সম্ভাবনার বাইরে। বিবেকানন্দ যন্ত্র-ক্ষেত্র তৈরী করেছিলেন—সেই ক্ষেত্রে হোম শিখা জালিয়ে ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা,—এবং তারই অবদানে অগ্নিহোত্রীর ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করে অন্বেষণে মহানায়ক নেতাজী রূপে ভারতের বিপ্লববাদী ঐতিহ্যকে সার্থক করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন বা শেষ আঘাত হেনেছিল শুধু ভারতে নয় সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় ব্রিটিশ ও অন্যান্য পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের উপর।

আমার বাবার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র সুভাষচন্দ্র

বীণা ভৌমিক

“অভ্যাসের” দিকে যত এগিয়ে চলেছি, দৃষ্টি বাবে বারে “পূর্বাচলের দিকে ফিরে যেতে চায়।—মা বাবা ভাই বোনদের স্নেহ যগতায়েরা হাসি আনন্দ প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরা আমাদের শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি। সেই সময়েই একটি নাম আমাদের ছোট্ট দিগন্তে দূরের শুকতারাব নতন উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছিল—সুভাষচন্দ্র।—যখন কটকে বাবার কাছে পড়েছিলেন তখন আমি জন্মাইনি; এর পর যখন কৃষ্ণনগরে বা কলকাতায় বাবাব কাছে তাঁর ঘনঘন যাতায়াত ছিল, বা পত্র বিনিময় ছিল, তখনও আমি অতি ছোট, কিছুই মনে পড়ে না। দিদিদের কাছে গল্প শুনতাম সুভাষবাবু বাগক বয়সে আমাদের বাড়ীতে এসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে “ধনধাচ্ছে পুষ্পে ভরা” গান বাবাকে গেয়ে শোনাতেন; আরও পরে যখন কলেজে পড়তেন তখনও নাকি বাবার কাছে প্রায়ই আসতেন Ethios পড়তে।

আমাদের ভাই বোনদের শৈশব কৈশোরের শিক্ষা-লাভ প্রধানত বাবার কাছেই। বাবাকে খুশী করার জন্য খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করতাম, “ভালো মেয়ে” হবার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। কিন্তু যত চেষ্টাই করি, কিছুতেই বাবার মন উঠত না। বাবা বলতেন “তোদের হাতের লেখা একটুও সুন্দর হচ্ছে না, কিরকম যে অক্ষরগুলো করিস। তখচ সুভাষের লেখা—পরীক্ষার খাতাতে যখন লিখত তখনও ঠিক যেন মুক্তির মত।”—আমাদের ইংরেজী লেখায় কত অজস্র ভুল, কীরকম অশুদ্ধ সব বানান। আর ঠিক ওই বয়সেই বাবার ‘সুভাষের’ খাতায় বাবা নাকি কলম ছোঁয়াতেও

পারতেন না, একটিও ভুল থাকত না!—মনে মনে দমে যেতাম, ভাবতাম বাবার নিশ্চয় এটা কিছুটা পক্ষপাতিস্ব, সুভাষ বাবুর সবই ভালো দেখেন। আর একটু বড় হলাম যখন, বাবাকে এক এক সময় জিজ্ঞাসা করেছি, “বাবা তুমি কি আমাদের চেয়েও সুভাষবাবুকে বেশী ভালবাস?” বাবা হেসে ফেলতেন, স্নেহোদ্ভাসিত মুখে বলতেন, “তোরা তো আমার জীবন যরণ! আর সুভাষ আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব।”

—ছোটবেলার সেই ছোট্ট ঈর্ষার কাঁটাটুকু কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় গিলিয়ে গেল।—বাবার জীবনের ‘শ্রেষ্ঠ গৌরব’কে জামরাও শ্রদ্ধা করতে শিখলাম। সসম্মানে I. C. S. পরীক্ষা পাশ করেও সরকারী চাকরীকে হেলান ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন আমাদে পরাধীনতা-জর্জর দুঃখ দারিদ্র্য প্রপীড়িত দেশের মুক্তি সংগ্রামের পুরোভাগে। মন আমাদের শ্রদ্ধায় আধুত হয়ে উঠল। আর মনে মনে ভারী একটা গর্ববোধ করতাম তিনি আমাদের বাবার একান্ত প্রিয়জন, আপনজন একথা ভেবে। সে সময়ের ছোট ছোট ঘটনাগুলি মনের মধ্যে গভীর রেখা বেটে গেছে। একদিন, আমাদের পাড়ায় কোনও এক সভায় সুভাষচন্দ্র এসেছেন, দেশবন্ধুও সেখানে উপস্থিত। বাবা সেই সভায় গিয়েছিলেন। সভান্তে অনেকদিন পরে সুভাষ বাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। বাবা তাঁকে আশ্রয় জানিয়ে এলেন সভার সব কাজ শেষ হলে আমাদের বাড়ী যেন রাতে থেয়ে যান। আমাদের ছোটদাও (৮নির্মলচন্দ্র)

দাস) সেইখানে উপস্থিত ছিলেন, ফিরে এসে মা'র কাছে অমুযোগ করলেন, “বাবা যে কি কাণ্ড মা! অত্যাচার এখন কত বড়, কত কাজ ওর। আগে বলা নেই কওয়া নেই, ও কি করে এমন হঠাৎ এখানে এসে খেয়ে বাবে? এ কখনও সম্ভব?”—বাবা কিন্তু নির্বিকার। মাও অল্প সময়ের ভিতর যতটুকু সম্ভব খাওয়ার আয়োজন করতে লাগলেন। রাত্রি খুব বেশী হলনা, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হাতোজ্ঞল মুখে অভ্যস্ত আমাদের গৃহে উপস্থিত হলেন—সারা বাড়ীতে উৎসবের সমারোহ আরম্ভ হয়ে গেল।

আরও পরের একদিন। আমরা বেথুন কলেজে ‘সাইনস কমিশন’ বয়কট উপলক্ষ্যে হরভাল করেছিলাম। গভর্নেন্ট কলেজে এরকম ব্যাপার এই প্রথম, কর্তৃপক্ষের রোষ তাই ভীষণ মূর্তিতে দেখা দিল। আমাদের মধ্যে মহা চাঞ্চল্য—কি করব, কি করা উচিত এই নিয়ে নানা চিন্তা, গবেষণা, হৈ চৈ। আমাদের অবস্থা দেখে বাবা কোন এক সময়ে নিজে গিয়ে অভ্যস্তকে আমাদের বাড়ী ডেকে নিয়ে এলেন। আমরা তো হাতে স্বর্গ পেলাম। তাঁর উপস্থিতিই যেন সব সমস্যার সমাধান করে দিল। কলেজের পরিস্থিতি সব তাঁকে খুঁচে বজ্রাস। তাঁর মতামত জেনে নিলাম। ওরি ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছিল অভ্যস্ত বাবুর প্রতি বাবার স্নেহের উজ্জ্বল। আমরা রাজনীতির আলোচনা করছি। আর বাবা খালি ব্যস্ত অভ্যস্তবাবুকে ভালো করে খাওয়াতে। মার-বামা ঘরের শাকসব্জি থেকে আরম্ভ করে গরম গরম লুচি ভাজিয়ে, দোকান থেকে-মিষ্টি আনিয়ে খাইয়েও বাবার তৃপ্তি নেই। খাবার শেষে ভাঁড়ার ধর থেকে ছুটি কমলালেবু এনে দিলেন। “অভ্যস্তবাবু এবার হেসে বজেন, ‘আর তো চলবে না!’ বাবা বজেন, ‘তবে পকেটে?’” তাতে অবশ্য আপত্তি নেই।

বাবার সঙ্গে অভ্যস্তের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি এক ছিল না;—সেজ্ঞ মাঝে মাঝে দুঃখও হয়তো

পেয়েছেন; সে তো তাঁর সন্তানদের কাছে আরও বেশীই পেয়েছেন। কিন্তু এসবই ছিল একান্তই বাইরের জিনিষ। অন্তরের গভীরভূমি স্থানে তাঁরা চিরদিনই ছিলেন দুজনের বড় কাছাকাছি। বাবা আমাদের বলতেন “অভ্যস্তের মনটা আসলে বড় পবিত্র, বড় নির্মল। বাইরের কোনও ঘটনা দিয়ে তার বিচার চলে না। ছোটবেলায় প্রথম যখন ও আমার কাছে এলো, মনে হয়েছিল ঠিক যেন একটি সস্ত ফোটা গোলাপ। তেমনি পবিত্র, তেমনি সৌরভময়।”—একবার অভ্যস্তবাবু যখন জেলে, বাবার হঠাৎ ইচ্ছা হ’ল ১লা বৈশাখ তাঁর জন্ম বাড়ীতে কিছু মিষ্টি তৈরী করে পাঠাতে হ’বে। মহাউৎসাহে, আমরা সবাই মিলে খাবার তৈরী করতে বসলাম,—বাবা নিজে গিয়ে জেল গেটে জমা দিয়ে এলেন। ১৯২৭ সালে দীর্ঘ দিন হৃদয় মান্দালয়ে অন্তরীণ থাকার পরে অসুস্থ হয়ে তিনি বাইরে এলেন। ডাক্তারেরা কঠিন যক্ষ্মারোগ বলে আশঙ্কা করছিলেন।

বাবার মুখে চিন্তার ছায়া যদিনে এলো, মুখে কিন্তু কিছুই বজেন না। সে সময় গ্রীষ্মাবকাশে বাবার সঙ্গে আমি ছুবনেশ্বরে গিয়েছিলাম, একটি ডাক বাংলোয় ছিলাম। একদিন অর্ধ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখি বাবা চেয়ারে বসে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কি যেন লিখছেন। মনে হল প্রায় সারারাতই যেন ওইভাবে কাটল। ভোরের ঘুম ভাঙতেই বাবা আমার হাতে কয়েকটি লেখা কাগজ দিয়ে বাইরে বেড়াতে চলে গেলেন। পড়ে দেখি বাবার অভ্যস্ত চন্দ্রের কাছে লেখা দীর্ঘ চিঠি। কাল সারারাত তাহলে বাবা তাঁর প্রিয় শিষ্যের সান্নিধ্যেই কাটিয়েছেন! রক্তস্রাবে চিঠিখানি পড়ে গেলাম। সমস্ত চিঠিখানির মধ্যে বাবা তাঁর অন্তরের পুঞ্জীভূত স্নেহধারা নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। চিঠি পড়ে এমন অভিভূত আর কখনও হয়েছি বলে মনে পড়ে না। আর অভিভূত হয়েছিলাম যেদিন নেতাজী আত্মজীবনীতে বাবার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধানিবেদন

পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল বাবার সেই চিঠির এটাই বৃদ্ধি যোগ্যতম প্রত্যুত্তর। স্তম্ভচন্দ্রের কটকাকর্ণ বিচিত্র ঘটনা-বহুল জীবনখানিকে বাবার অন্তরের নিবিড় স্নেহ আর আশীর্বাদ অহরহ ঘিরে থাকত। আমরা জানতাম, অসুস্থত্ব করতাম, কারাগারের অন্তরালে, রোগশয্যায়, সাগর পারে—নিরুদ্দেশেরযাত্রায়—যেখানে যেভাবেই থাকুন তিনি বাবার অতি নিকটেই আছেন। আর বাবার ভগবানের চরণে একটি নীরব প্রার্থনা এই অতি প্রিয় সন্তানটির জন্ম নিয়তই নিবেদিত হচ্ছে। এরপর স্তম্ভচন্দ্রের মহিমোজ্জ্বল

জীবনে যখন এক প্রগাঢ় রহস্যের যবনিকা নেমে এলো বিভ্রান্ত আমরা বাবার স্নেহের অন্তর্দৃষ্টির কাছে উত্তর খুঁজেছি, বারে বারে বলেছি, “তোমার কি মনে হয় বাবা।”

স্পষ্ট উত্তর তিনিও দিতে পারেননি, খালি বলেছেন, আমি যদি শুনি স্তম্ভ সন্ধ্যায় হয়ে গেছে আমি জন্ততঃ অবাক হ’বনা। রাজনীতিরও আগে ও সন্ধ্যাসের ডাক শুনতে পেরেছিল। ওর জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ—“আধ্যাত্মিকতা।”

**সুলেখা
ঐতিহ্য**
দেশে ও বিদেশে সমান প্রিয়...।

সুলেখা
ফাউন্টেন পেন-এর কালি

এই সব রঙে পাবেন :

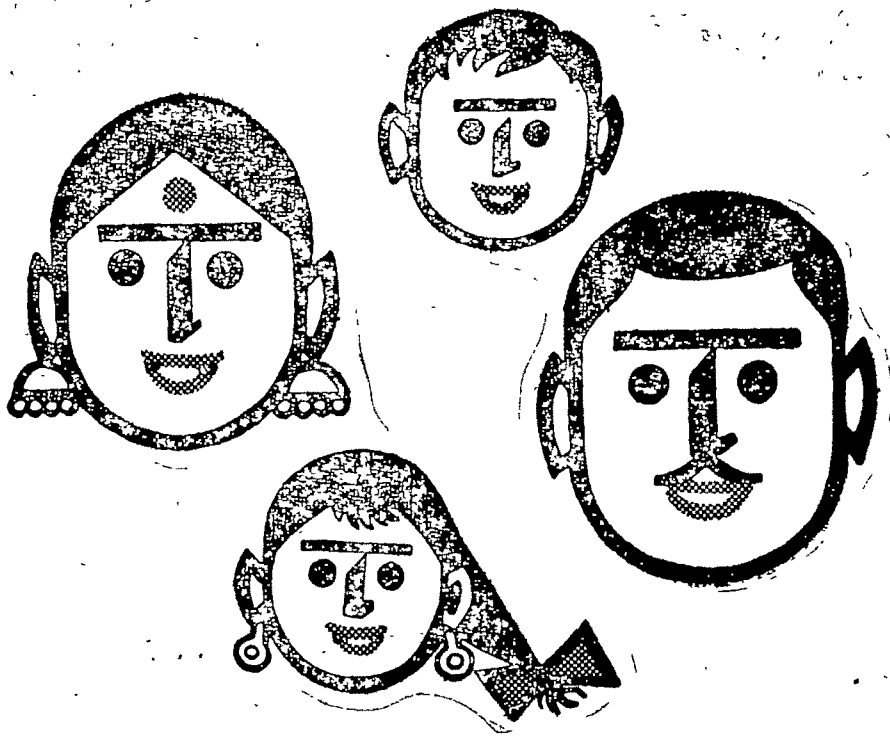
ব্লু ব্ল্যাক • রয়াল ব্লু • ব্ল্যাক
রেড • গ্রীন • ভায়োলেট

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২




Progressive/SW-32 B

দুটি বা তিনটি অঙ্কনই যথেষ্ট



পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলির পরিচায়ক লালত্রিকোণ

সংখ্যা ৬৭/১১৭

সুভাষচন্দ্র

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

“নীচের লেখাটা জয়ন্তী চৈত্র ১৩৫৩ থেকে পুনর্মুদ্রণ, ২১ বছর আগেকার লেখা, অর্থাৎ ১৯৪৭এ স্বাধীনতা লাভের আগের লেখা। ঘটনাটির সন তারিখ নেই—আজ আর সে জানবার উপায় নেই, কারণ লেখক সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় আর ইহলগতে নেই। তবে ‘সুভাষচন্দ্রের’ ভারতবর্ষ হতে অন্তর্ধানের—১৯৪১এর অন্তত বেশ কিছু পূর্বের ঘটনা। কারণ হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪০ জুন, তার পূর্বে—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে তিনি শেষবারের মত ঢাকা যান। এছাড়া লেখার মধ্যে ‘সুভাষচন্দ্রকে’ ‘প্রিয়দর্শন যুবক’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এ ঘটনা তাঁর অন্তর্ধানের বেশ কিছু পূর্বের হওয়াই স্বাভাবিক। “সুভাষচন্দ্রের” জীবনের শাস্ত লক্ষ্য, চরিত্র, মন ও পছন্দ এ একটি নিখুঁত ছবি। জঃ সঃ

সেদিন আকাশটা মেঘলা হয়ে আছে; সকাল থেকে কেমন যেন একটা গুমোট ভাব—বর্ষা যেন ঠিক ভাল ভাবে নামেনি কিন্তু মাঝে মাঝে মেঘের আড়ম্বর আছে এ যেন আসন্ন দুর্ভাগ্যের পূর্বসূচী। আকাশের এক দিকে ধানিকটা কালো মেঘ—দেখলে সন্দেহ হয় সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টি নামতেও পারে। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব।

অনেকটা দূর কাঁচা রাস্তা হেঁটে এলে সুভাষচন্দ্র নৌকায় চড়ে বসলেন, সঙ্গে ছাত্র নেতা অসীম ভট্টাচার্য্য, আরো কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী।

পদ্মানদীর মাঝি বয়স অনেক হয়েছে কিন্তু দেখলে মনে হয় এখনও যথেষ্ট কর্মঠ আছে, তবে অনেক ঝড় ঝাপ্টাও গেছে তার উপর দিয়ে।

মাঝি বলে—কর্তা একটু সবুর করে গেলে হয় না? সামনে মেঘ।

কর্তাটির সঙ্গে পূর্ব পরিচয় থাকলে মাঝি এমন অবাস্তব প্রশ্ন করতে কখনও ভরসা পতেনা।

সুভাষচন্দ্র হেসে উত্তর দেন—কেন হে ভয় লাগে নাকি?

মাঝি বলে—না কর্তা—আমাদের কাজই তো এই; তুফানের সঙ্গে লড়াই করে আমরা নদী পার হই, ভয় আমাদের লাগে না—কুত্তিই লাগে। তবে আপনারা যাবেন—তাই। আমার আর কি?

সুভাষচন্দ্র বলেন—তুফান? বেশত! তুমি তুফানে নৌকা বেরেছো?

আজ্ঞে—হ্যাঁ কর্তা।

কখনও নৌকা ডুবি হয়েছে?

কম হলও দু’ তিন বার? নৌকা তখন কুলছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

মাঝি আবার বলে,—একবার, হেই আল্লা! মাঝির মুখ দিয়ে আর কথা বেরয়না। মাথা নীচু করে সে লাড়

টেনে যায়। স্বভাষচন্দ্র বিস্মিত হয়ে মাঝির মুখ পানে চান।

মাঝি বলে—জোয়ান ছেলেটাকে এই পদ্মাতেই দিয়েছি কর্তা।

স্বভাষচন্দ্রের চোখ দুটি করুণায় আর্দ্র হয়ে আসে,— সেই যেবলা দিনের অস্পষ্ট আলোকেও স্বভাষচন্দ্রের আরক্তিম মুখের বিষয় ছায়া চোখে পড়ে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি প্রসঙ্গান্তরে আসার চেষ্টা করেন।

যেতে আমাদের কতক্ষণ লাগবে মিঞা? প্রশ্ন করেন স্বভাষচন্দ্র।

মাঝি বলে—আন্দাজ তিন চার ঘণ্টা।

তা হলে বুড়ি নাযার আগেই আমরা পৌঁছে যাব—কি বল?

মাঝি এতক্ষণে বোধহয় পুত্র-বিরোগের কথাটা ভুলে গেছে। সে একটু হেসে বলে—হুই যে গোপাল-তপীর ঘাট—ওই ঘাটে নেমে যেতে হয় আমার স্বস্তর বাড়ী।

নৌকা তখন হেলে ঝুলে চলেছে পদ্মানদীর খররদের উপর দিয়ে তাকে তরঙ্গভঙ্গ না বললেও—ভাঙ্গাটা যে বেশ শান্ত একথাও বলা যায় না। ঝড় উঠলে ঢেউ এর মাতন আরম্ভ হতে দেয়ী লাগবে না।

আরোহীদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করে—মাঝি তুমি সারি গান জান?

জানতাম বাবু—কিন্তু বয়স হয়েছে গলায় আর থৈ পাই না।

গাও না একথানা।

মাঝি চুপ করে থাকে—কথা বলে না। স্বভাষচন্দ্রের

গম্ভীর চেহারা দেখে সে হয়ত সমীহ করে। সেটা কিন্তু স্বভাষচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় না।

তিনি বলেন—লজ্জা কিহে, গাও না, আমি গান খুব ভালবাসি।

মাঝি প্রাণে ভরসা পায়; গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে গাইতে আরম্ভ করে—

নদীর মর্ম জানতে হোলে

গহীন জলে নাগতে হয়।

নিতলে তুই ডুবলি যদি

তুফানে তোর কিশোর ভয়।

নদী যদি দুকুণ ভাঙ্গে

বান ডাকে তোর মরা গাঙে

দূরের পান্না দিতে হ'লে

কড়ু উজান বাইতে হয়।

অবিরাম নৌকা চলছে। গান যে কখন শেষ হয়ে গেছে সে খেয়ালই কারো নেই। চারি দিক নিস্তক শুধু শোনা যায় দাঁড়ফেলার শব্দ—ছপ্ ছপ্ ছপাছপ্। ঢেউগুলি নৌকার দুইধারে গাছড়ে পড়'ছ—তারই শব্দে সৃষ্টি হয়ে চলেছে একটা একটানা কলগুঞ্জন। পিছনের গ্রামগুলি ছোট, দেখতে দেখতে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে বাঙলা দেশের শ্রায়মান বনশ্রীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। নিশ্চয় দৃষ্টিতে স্বভাষচন্দ্র চেয়ে আছেন সমুখের দিকে;—কিন্তু কোথায় তাঁর লক্ষ্য! দূরে বহুদূরে নদীর পরপারে' গ্রামের সীমারেখা ছড়িয়ে কোথায় কোন চরম লক্ষ্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ? প্রস্তর কঠিন নিশ্চল মূর্তি—দৃষ্টি উদাস বটে কিন্তু কিন্তু মন তাঁর উদাসীন নয়। এমন মাহুষের সামগ্রিক লাভ করা যেমন লোভনীয় তেমন অভিজুত হয়ে যেতে হয় তাঁর আত্ম-সত্য ব্যক্তিত্বে।

মেঘ তখন বেশ ঘনিয়ে এসেছে,—কালো মিশ মিশে মে'ঘ ফুলে ফুলে উঠছে পদ্মানদীর অগণিত তরঙ্গ-মালা— সাপ খেলান বাঁশীর সামনে অসংখ্য অজগরের মতো।

স্বভাষচন্দ্র নৌকার সেই অসহনীয় স্তব্ধতা ভঙ্গ করে
বললেন—

তোমরা কেউ শ্রামাসঙ্গীত জান ?

অবিনাশ বাবু উত্তর দিলেন—না।

জানলেও তোমরা কেউ গাইবে না—সে, আমি জানি।
এমনি মেঘের আলোড়নের মধ্যে শ্রামা সঙ্গীত খুব ভাল লাগে
আমার। তোমরা যখন গাইবে না—তখন আমাকেই গাইতে
হয়—আস্তে আস্তে, বলেন স্বভাষবাবু। সকলে বিস্মিত হয়ে
পরস্পর পরস্পরের পানে তাকায়—কেও কথা কয় না।
স্বভাষচন্দ্র ততক্ষণে গুণ গুণ করে গান ধরেন।

কবে আবার নাচবি শ্রামা

মুণ্ডমালা ছলিয়ে গলে

ওই কালো মেঘের অন্ধকারে

তোর, হাতের ঝড়ো উঠুক জ'লে।

মা, তোর জিনয়নের বহি-শিখায়

ছাই করে দে মনের কালি

আমি ভয়ভরে করবনা ভয়

তুই অভয় মস্ত্র দে মা কালী।

ওমা বারে বারে ডাকব তোমায়

মা হয়ে পালাবি কোথায়

এবার রাঙা জবার অর্ঘমালা

দিব, মা তোর চরণ তলে।

নৌকা থেকে গ্রামের ঘাটে নামতেই দেখা গেল—
বহুলোক সেখানে স্বভাষচন্দ্রের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।
বক্সিগ্রাম, গ্রামের পক্ষেরা স্বভাষচন্দ্রকে সন্মিলন করে

গ্রামের মধ্যে নিয়ে গেলেন—তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে
গেছে।

অস্বাভাবিক গৃহস্থের আদর অভ্যর্থনা ও অতিথি সংকারের
আয়োজনের প্রতি আক্ষেপ না করে—একজন দরিদ্র
মুগলমান কংগ্রেসকর্মীর গৃহে উপষাচক হয়ে অতিথি হলেন
স্বভাষচন্দ্র। সঙ্গীরা রইলো সেরাজির সত পূর্ব নির্দিষ্ট গৃহে।

সকালে গ্রাম্যস্কুলের খোলা মাঠে সভা বসল, হিন্দু-
মুগলমান ভিড় করে দাঁড়াল সেই সভায়।—এমন প্রিয়দর্শন
যুবকই যে স্বভাষচন্দ্র এ তারা কল্পনাও করেনি। এমন ঘীর
স্থির মিষ্ট কথাও তারা শোনেনি জীবনে। স্কুলের ভাদা
চেয়ার বেঞ্চি সাজিয়ে সভা—সেই সভায় সভাপতি স্বভাষচন্দ্র
মুখের ভাব দেখে মনে হয়—তিনি যেন আজ স্বাধীন ভারতের
রাষ্ট্রভঙ্গ রচনা করতে বসেছেন। আর অতি সামান্য জিনিসকে
স্বভাষচন্দ্র এমনি নিষ্ঠা ও অমুরাগের সঙ্গে গ্রহণ করতেন—
গুরুত্ব আরোপ করে অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারকেও তিনি মহৎ
সম্ভাবনায় বড় করে তুলতেন।

গ্রাম সংগঠন, পঞ্চায়ত প্রতিষ্ঠা, কুটীর শিল্পের উন্নয়ন,
প্রাথমিক শিক্ষা, দ্বীপশিক্ষা, ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যরক্ষা, কোন বিষয়
বাদ গেল না তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায়—কিন্তু সকল কথার সার
কথা ভারতের মুক্তির একমাত্র অবিরাম আপোষহীন সংগ্রামের
কথা সেই কথাই সেদিন ধ্বনিত হয়ে উঠল তাঁর উদার কণ্ঠে
অজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লীর ক্ষুদ্র সভায় তিনি যে বাণী সেদিন
সুনিবেদিত হলেন—মুক্তি সংগ্রামের বৃহত্তর পরিবেশে সেই একই
কথা বারংবার ধ্বনিত হয়েছে সংগ্রামী স্বভাষচন্দ্রের কণ্ঠে—।

পূর্ব এশিয়ার ভুল তাতে ভেঙ্গে ছিল,—কিন্তু ভারতের
যুগ কি এখনো ভাঙে নি ?

অতীতের শিক্ষা

কালীচরণ ঘোষ

পশ্চিম বাঙ্গলা তথা সারা ভারতবর্ষ আজ মহা দুর্দিনের সম্মুখীন। ইংরেজ শাসন ছিল বিদেশী। তার নানা দোষ ক্রটি উপদ্রব অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে, সে শক্তি অপসারিত হয়েছে। তার পরে এসেছে কংগ্রেসী শাসন। আপন লোকের হাতের মিষ্টি কশা দেশবাসী নিঃশেষে মেনে নিলেও দেখা গেল, তার আঘাত স্বক্ পেশী ভেদ করে, পৌঁছেছে অন্তস্থল পর্য্যন্ত। ক্রমে জনসাধারণ চঞ্চল হয়ে উঠে ভারতের অধিকাংশ রাজ্য থেকে কংগ্রেসকে বিতাড়িত করেছে।

ইংরেজ যাবার আগে এক বিদেশী শক্তি ছদ্মবেশী শ্রমিক কৃষক দরদী রূপ ধারণ করে বেশ জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে। তারা নেতাজী স্বভাষচন্দ্রকে দেশদ্রোহী বলেছে; দেশের স্বার্থ অপেক্ষা বিদেশীদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত হয়েছে। বিদেশী অর্থে পুষ্ট হয়ে দেশকে ভুলেছে। স্থানে স্থানে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত সভ্যের দেহে ভর করে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে অরাজকতা বিস্তার করেছে। তখন এঁরা হলেন স্বরূপে প্রকাশ। বিভীষিকা সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠা লাভ এই দলের মূলনীতি এবং পশ্চিম বাঙ্গলায় তারা বহুলাংশে সফল হয়েছে।

সাধারণ লোকের দুঃখ দুর্দশার আর অন্ত নেই। নিত্য নতুন রূপে তারা এসে দেখা দিচ্ছে এবং যে পাপ একবার এসে আবির্ভূত হচ্ছে তার আর বিদায় নেবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অভিশাপের গুরুত্ব এইখানেই বেশী।

কংগ্রেস আর ভারতীয় মুখোমুখি মাও-সে-তুং-দল

আজ দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ অবস্থায় পথ খুঁজে বার করবার জন্য লোক মাথা খুঁড়ে মরছে। এর মাঝের কি কোনো পথ নেই? মনে হয় বল বিভাগকালে সংগ্রামের পথে ঋণ্ডিত দুই বাঙ্গলা যে পথ অবলম্বন করেছিল, সেই অবস্থায় আমরা আবার ফিরে এসেছি।

এই দুর্দিন দুঃখের হাতে জাগে গেতে হলে সাধারণ মানুষের ভিতর থেকে নতুন নেতৃত্ব প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করাই এখন কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট বিভূষিত লোকের পক্ষে সর্ব প্রধান কর্তব্য। এই দু দলকেই সমান অবিজ্ঞানের চোখে দেখতে হবে এবং দু দলেরই অপ-প্রাধিক্ত থেকে আত্মরক্ষাই হবে মূল নীতি। আজ এরা যে ভাবে ভিত গেড়ে বসে গেছে, এদের প্রভাব খর্ব্ব করতে হলে আবার সম্মুখভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। “সত্য, সেবা, ত্যাগ” এই মন্ত্র গ্রহণ করে নতুন করে এগিয়ে পড়তে পারলে হয়ত আশার স্রোত আলোক প্রকাশের আবার সম্ভাবনা গড়ে উঠতে পারে।

আজ তাদের চাই, যাদের কথা “বন্দে মাতরম্” ১৮ মার্চ ১৯০৮ সালে বলেছিল : কর্ম্মীরা হবেন স্বার্থশূন্য; হবেন নিজের বড় পরিচিতি বা নেতৃত্ব লোভবিক্ষিত ও দেশের মঙ্গলে নিবেদিতপ্রাণ, উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি সমন্বিত ও নেতার নির্দেশ পাগনে তৎপর। স্বার্থলেশ বর্জিত অটুট বিশ্বাস এবং প্রতিষ্ঠান বা দেশের আত্মকশক্তি প্রসূত পরম উচ্চাশা তাদের স্বাস প্রাশাস সম পরিগণিত হবে।”

ভারতকে দেশের চরম অমঙ্গলের কারাগার থেকে মুক্ত

করতে হলে চাই এই কণ্ঠবৃন্দ। বিনা দম্বে কায়েমী স্বার্থের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করা যাবে না। এ সংগ্রাম আরও গুরুতর হবে, কারণ “শত্রু” দেশের মধ্যে অবস্থিত (বহিঃ শত্রুর সর্ব প্রকার সহায়তা আছে) এবং অসতর্ক লোককে ধোঁকা দেওয়া এদের পক্ষে বিশেষ অস্ববিধার নয়। ১৯০৬ সালে যেখানে আন্দোলনগর্গ ঘারা স্বাধীনতা লাভের কথা বলা হয়েছে এখানে তার ব্যতিক্রম হবে বলে মনে হয় না। আজ চক্ষুর সমক্ষে দেখা যাচ্ছে, নিজেদের সামান্য স্বার্থহানি, গদিচ্যুতি ঘটলে দেশকে রক্তের প্লাবনে ডুবিয়ে দিতে এরা পরাধীন নয়। সুতরাং “বৈরী” কোথায় নামতে পারে, তার নমুনা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

“যুগান্তর” পত্রিকা প্রকাশ লাভ করে ৩ মার্চ ১৯০৬। মনে হয় সে পত্রিকা নির্দেশিত সংগ্রাম অসমাপ্ত রয়ে গেছে। পত্রিকার প্রেরণা এসেছে অরবিন্দর কাছ থেকে। বারীন, উপেন, অবিনাশ, ভূপেন তাকে রূপ দিয়েছেন। “যুগান্তর” কি ভাবে দেশকে মাতিয়ে ছিল, তার পরিচয় দেওয়া যাক। বলে রাখা ভাল, এ ভাষা “যুগান্তর” পত্রিকার নিজস্ব ভাষা নয়, ইংরেজির স্বত্বাধার করা, তবে ভাবের ব্যত্যয় ঘটতে দেওয়া হয় নি।

১৫ এপ্রিল (১৯০৬) দেশের যুব শক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা হলো “সকল দেশেই তরুণ যুবকরা অত্যাচারীর বন্দুকের গুলির সম্মুখে সাহসে বক্ষস্থল উন্মুক্ত করে দাঁড়িয়েছে, তাদের শোণিত ধারায় দেশ ক্রন্দমুক্ত হয়েছে। তারা নৃসিংহ, বরাহ, করালীকালী রূপে অবতীর্ণ হয়ে সাধুর পরিত্রাণ এবং দুষ্টের বিনাশসাধন করেছে।” পরের সপ্তাহে দেখতে পাওয়া গেল “সর্বশক্তি, প্রয়োগে ছুঁড়নের অত্যাচার প্রতিহত করতেই হবে।...আজ আমাদের যেটা আত্মদানের পর্ব, সেটা কাল বিজয়ীর ধর্মে পরিণত হবে।... আজ ধারা নীরবে জীবন উৎসর্গ করছেন, কাল তাঁরাই ধর্ম-মুখে অমর হবার মন্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসবেন।”

দেশের অকল্যাণকারী রাজনৈতিক দল দুটি আজ খুব শক্তিশালী। আরও দুটি বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। দলীয় স্বার্থ রক্ষা এবং কল্লিত শত্রুর প্রতি এদের প্রবল অভিযান। তাদের উদ্দেশ্যে বলা চলে “প্রবল প্রতাপবিশিষ্ট অত্যাচারী সম্রাটের মুকুট নিলিষ্ট প্রজার পদাঘাতে একদিন ধূলায় লুপ্ত হতে হবে। অতি সামান্য অত্যাচারেরও প্রত্যাঘাত আছে” (১৪ এপ্রিল ১৯০৬)। উৎসাহহীন জাতির মনে শক্তি সঞ্চারিত করার জন্য ১১ নভেম্বর ১৯০৬ লেখা হলো: “.....আর নয়। যদি এক বিন্দু আর্থ্য শোণিত তোমার ধমনীতে প্রবাহিত হতে থাকে, তবে এ সকল অত্যাচারের প্রতিবন্ধানে আর কালবিলম্ব শোভা পায় না। তোমার ক্ষুদ্র জীবন দেশ-মাতৃকার চরণে উৎসর্গ কর। এই নব্বয় দেহের পরিবর্তে তুমি অবিনাশী সম্রা লাভ করবে।”

জাতীয় প্রস্তুতির জন্য “যুগান্তর” ২৩ মার্চ ১৯০৭ সালে দেশবাসীকে বলেছে “মায়ের লৌহ নিগড় ভগ্ন করার উদ্দেশ্যে সজ্জিত হয়ে উৎকট সময়ের জন্য প্রস্তুত হও। লক্ষ লক্ষ ভক্তের স্বপ্ন নিঃসৃত রুধির মধুন করে যে ভারত লক্ষ্মীর আবির্ভাব অবশ্যাস্তাবী তাঁর জন্য স্বর্গবেদী প্রস্তুত কর।” আবার বলেছে, ২রা মে ১৯০৭, “মাতৃমুখে দীক্ষিত তুমি, অসহায় পুত্র মত মৃত্যুবরণ তোমার শোভা পায় না। তোমার প্রতিবিন্দু রক্তে শত শত বীর আবির্ভূত হবে। তোমার প্রতি হৃদয়ে চতুর্দিক প্রকল্পিত হবে। মাতৃ সেবক মুখোচ্চারিত “বন্দে মাতরম্” নিনাদে স্বর্গ মর্ত্য ব্যোম ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠবে। তোমার শোণিত মধুন করে ভারতের ভাগ্যবিধাতা—হাসিমুখে দর্শন দেবেন।” যখন দেশের স্বাধীনতা যে কোনো সময় চীন পাকিস্তান দ্বারা বিপন্ন হবার সম্ভাবনা তখন জাতীয় চেতনা জাগ্রত রাখতে এই মন্ত্র সর্বদা স্মরণে রাখা কর্তব্য।

যে আপদ আমাদের হৃদিক থেকে দূরিত পদে এসে দিবে ফেলছে তাকে প্রতিরোধ করার বাণী উচ্চারিত হয়েছে

২৬ মে ১৯০৭ : “যথাবিধি উপচার না পেলে পূজা অসম্পূর্ণ থাকে।...এতদিন আমরা অলস শয়নে ছিলাম; ইংরেজ তাঁর স্ত্রীর মুখোস খুলে ফেলে নিজস্ব শয়তান মূর্তিতে আজ প্রকট হয়েছে। এতে অভিভূত হয়ে পড়ার পরিবর্তে আলস্য আমাদের পরিহার করুক।...ছিন্নবাস পরিহিতা ধূলি ধুসরিতা মায়ের দুঃখ বিমোচন করতেই হবে। প্রসন্ন হচ্ছে, ‘কে আসবে নব্বয় দেহ বিসর্জন দিয়ে মায়ের লজ্জা নিবারণ করতে? ...মৃত্যু আজ ঘারে অপেক্ষমান তার হাতে অমরত্ব নিয়ে। আজ যা অধীর আগ্রহে দেখছেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমৃতত্ব লাভ করার জন্ত কে আগে কাঁপিয়ে পড়বে?’”

কয়টি রাজনৈতিক দলের, এই দেশ? না, জাতিধর্ম, ধনী দবিত্ত, পুরুষ নারী শিশু নির্বিশেষে সকলেব মাতৃভূমি এবং তাদের সকলেরই কল্যাণ আমাদের প্রেয়ঃ? ৯ জুন ১৯০৭ বলা হয়েছে, “অত্যাচারের শত সহস্র প্রহরণ ধারণ করে ইংরেজ! তুমি তোমার রক্তের পিপাসা পরিভূক্ত কর। ভারতবাসী আজ দেখবে তোমার জীবন বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে কি না! এ দেশ আমার, না, তোমার? আজ সে পরীক্ষা হয়ে যাক্”।

কংগ্রেসী শাসন আর কমিউনিষ্ট ষ্ট্রাটেজি দেখেছে ভুক্ত-ভোগী লোক। একদল দেশকে দেউলিয়া ও বঞ্ছনীয় করেছে আর একদল বিদেশীর কাছে তাকে বন্ধক দিয়ে বিক্রী করে পাঞ্চম লামার মত রূপাপুষ্ট হয়ে থাকতে চায়। অবস্থা অতি সঙ্গীন। এরকম পরিবেশ যে ছিল না তা নয়। ‘যুগান্তর’ পথ খুঁজেছে ২২ জুলাই ১৯০৭ সংখ্যায়। তবে যে ‘নির্যাতন’-এর সংকেত দেওয়া আছে তাঁর নগ্নরূপ আমরা দেখছি। ইংরেজ আমলে যা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে মাত্র। ‘যুগান্তর’ এর ভাবায় : “আমরা চাই নির্যাতন, কারণ তার মধ্য দিয়ে আমরা সকল অনাচার সহ্য করবার শক্তি আহরণ করতে পারবো। এটা আমাদের নিকট অত্যন্ত শুভদিন; দয়াময়ী মায়ের ইচ্ছায় শত শতাব্দীর অপরিমেয়

পাপ ঝালনের জন্ত এই সুযোগ উপস্থিত। হাসিমুখে অবিকম্পিত চিত্তে বিরামহীন অত্যাচার সহ্য করবার শক্তি প্রকাশ করে, আমরা প্রমাণ করতে পারবো যে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন লাভ সম্ভব।” পরে ৩০ জুলাই বহু আশা নিয়ে পত্রিকা বলছে : “যখন ভারতবাসী বুঝবে ইংরেজ শাসনের এই তাঁলের ঘরের একটি ফুৎকারও সহ্য করবার শক্তি নেই, সেই দিনই ব্রিটিশ শাসনের পরিসমাপ্তি যন্ত্র জ্বলবে।...ভয় নেই; শতাব্দীর তন্ত্রাভঙ্গের লক্ষণ আজ চারিদিকে পরিস্ফুট। স্ত্রীর রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্ত মাতৃকোড় উজ্জল করে লক্ষ লক্ষ দেব শিশু আমাদের পুত্র দেশে প্রতিদিন জন্মগ্রহণ করছে। গীতার যুগ ভারতে পুনরাবির্ভূত হচ্ছে। আজ যারা শিশু, একদিন তারা সমরে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণরূপে শৌর্য প্রকাশ করবে। নিজেদের হৃদয় শোণিত তর্পণে তারা পিতৃ পুরুষদের আত্মার ভূমিসাধন করবে, অমৃতধারা গিঞ্জে তারা জাতির মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করবে। আমরা অমর; কাঁকেও আমরা ভয় করি না। ২রা আগষ্ট ১৯০৭ সংখ্যায় নিজেদের চেনবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে : “প্রাচীন ঋষিরা বলে গেছেন অসত্য (মায়ী) কে ধ্বংস কর।” ভারত ইংরেজের সাম্রাজ্য বলে মনে করে আমরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছি। এর চেয়ে ভয়ানক ধারণা আর কিছুই হতে পারে না; অতএব সর্বপ্রকারে এর বিলোপ সাধন করে সত্যকে উদ্ভাসিত কর।”

জাতির গণচেতনা, নিজেদের দুঃখ দুর্দশা কেবল বিধির বিধান নয়, আমাদের জড়তা একে চিরকালের জন্ত প্রতিষ্ঠিত করেছে।—এই বোধ ফিরে এসেছে। পথের সন্ধান করতে হবে। ‘যুগান্তর’ ২৬ আগষ্ট ১৯০৭ সংখ্যায় বলেছিল : “ভালই হয়েছে; তন্ত্রাত্মক জাতিকে কশার আঘাত জাগ্রত করে তুলেছে। সাত শত বৎসরের নিদ্রা ভাঙের পর সামান্য মাত্র চক্ষু উন্মীলন করে দেখি প্রভাত সূর্য্যের উজ্জল রশ্মি আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত। অপর

সকলের কর্ম ব্যস্ততায় যখন পৃথিবী মুখর তখন আমরাই জড়ের মত পড়ে আছি। নির্ব্যাভনের প্রতি আবাত জাতিদেহের নিম্ন হ'তে নিম্নস্তরে প্রবেশ করছে। জীবন যখন দুর্বল, তখন মন বলছে 'এ থেকে কি আমাদের উদ্ধার নেই?' সেদিন অশ্রুটপ্তরে মা বলেছেন, 'আছে'।"

"পথ কৈ? বাক্যাডম্বরে দেশ উন্নত হবে না। শত্রুর সহিত সংগ্রামে শক্তি সঞ্চয় করতে পারা যাবে এবং সেই শক্তির সম্যক প্রয়োগ করতে পারলে আত্মপ্রত্যয় ঘন্মাবে।... 'দেশ স্বতঃই জেগে উঠবে' এ কথা অস্তরের মুখেই শোভা পায়।"

একবার সম্ভবত্বভাবে কাজে নামতে হবে। নানা দলে বিভক্ত হ'লে দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সংগ্রাম চলবে না। স্বার্থহীন প্রবল নতুন দল দুটির কথা এই সঙ্গে ভাবতে হবে। ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯০৭ তারিখে পত্রিকা বলেছিল : "গৃহ, শৃগাল, সারসের মায়ের জগৎপিতৃ খণ্ড খণ্ড করছে; এখন যদি না হয়, কবে তোমাদের মোহ নিজা টুটবে?" এই পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণ করা ভাল, স্বরিত রাজ্যপদ গোভে কংগ্রেস ভারতের এক তৃতীয়াংশ শত্রুর হাতে ভুলে দিতে একবার দ্বিধাবোধ করে নি। তার পর দল ও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্ত চারিত্রিক, অর্থনৈতিক, বৈদেশিক নীতি সব জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের সর্বনাশ সাধন করেছে। তাদের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী কমিউনিষ্ট পার্টি, স্বল্পকালে তার যে রূপ প্রকটিত হ'য়েছে, তাতে দলীয় স্বার্থ ও বিদেশীর প্রভাব দেশের কথা ভুলিয়ে ছেড়েছে।

অপরূপ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, কয়েকটি নেতার স্বার্থে। কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে অবস্থা প্রকট হলো, তাতে অপরের লেজুড় হ'য়ে থাকা ছাড়া এবং সতৃষ্ণ নয়নে রাজ্যপার্টের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া এদের মতবাদ যে জাতির বড় কোনো অংশকে প্রভাবিত করতে পারে বলে মনে হয় না।

এখন কাজ হচ্ছে তাদের সমর্থন করা যারা নিজ বা দলগত স্বার্থের ওপরে দেশকে স্থাপন করতে পারে। "দেশের সেবক", জনগণই "সুপ্রিম কোর্ট" বলে জনসাধারণকে ভীততা দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা না করে, প্রকৃতপক্ষে তাদের স্বার্থে নিজেকে বলি দেবার জন্ত এগিয়ে আসতে হবে। আগে দেশ বাঁচলে তার পর নিজের দলীয় মতামত বাঁচতে পারবে।

শান্তি দলে দলে যে মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করে, একটি হ'তে আর একটির পার্থক্য যে কোথায় সেটা তাদের বিভিন্ন দলপতিরাই বোঝেন; আর কারও মাধ্যম প্রবেশ করে বলে মনে হয় না। একমাত্র পলিটিক্স ও পলিসি হচ্ছে মন্ত্রী গদি আলোকিত করা। জনসাধারণের স্বার্থকে সর্বোচ্চ আসন ছেড়ে দিতে হবে, তারপর নিজের দলীয় মত স্থান পেতে পারে। লোকের অন্ন, নিরাপত্তা, শিক্ষা, বাস ও চিকিৎসার সুযোগ—এই হ'লো আভ্যন্তরীণ কর্মপন্থা। বিদেশী শত্রুকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে বাম কমিউনিষ্টদের মতিগতি খুব স্পষ্ট নয়; তারা বিদেশী শত্রু-রাষ্ট্রের নেতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহন করে রাষ্ট্রীয় প্যারেড করে, শত্রুর সমর্থনে ধনি তোলে। তারা শত্রুর মতবাদ প্রচারের সুযোগ করে দেয়। তা না হ'লে আর সকল দল, কংগ্রেস সমেত যে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় জীবন পণ করবে, সে কথা উল্লেখ না করলেও চলে।

তবে এত দল কেন? যারা কেবল দলের স্বার্থই চায় এবং তাতে দেশের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের সম্ভাবনা সুযোগ বেশী, তারা দেশের শত্রুর সমতুল্য। কি ভাবে কত দ্রুত কত বেশী লোকের মঙ্গল করা যায়, তার কর্মপদ্ধতি নিয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে কোনো মীমাংসার না এসে অন্তর্ঘাতী ঘৃণা এবং শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি করার পদ্ধতি নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করার মত দুর্বুদ্ধিতা শোভা পায় না।

এক সময় “বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়” গড়ে উঠেছিল ; এখন সেই রকম সকলে দল মিলে অত্যন্ত কঠিন হলেও, একটা দল গঠন করা দরকার। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি কি পথে হ’তে পারে, তাই না ভেবে, কেবল ষার যা আছে, তাই কেড়ে নেবার লোভ দেখিয়ে অস্ত্র জনসাধারণকে ফেপিয়ে তোলা হচ্ছে। সম্পত্তি বা আয়ের তারতম্য বড় হ্রাস করা যায়, সেটার উপায় আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়, বিশেষতঃ রাজস্বস্তি বধন ভোটের উপর নির্ভর করে। কি ভাবে সম্ভব তার উপায় স্থিরভাবে আবিষ্কার করার জন্য দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থে ও বিদেশী শত্রুর সহযোগিতার পথ গ্রহণ করা চরম অবৈতিকতার কাজ।

সাধারণের প্রাণবায়ু নাসাগ্রে এসেছে : এখন বলতে ইচ্ছা করে, “কে আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে, এস কে কেঁদেছ নীরবে ?”

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সভাক ১৫০। ষাণ্মাসিক ৪৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের ত্র্যয়োগ সর্বপ্রায়ে দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিকার হরফে ফুলফ্যাণের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।
৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ-যোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

৩০২, গাঙ্গুলি বাগান

কলিকাতা-৪৭

: উপভাস :

কঠিনতা বিষ

মি হির মুখো পাধ্যা য

তেজিলা

এখনো এক এক সময় চোখ বুজলে সেই রাত্রির দৃশ্যটা যেন দেখতে পায় ভারত।

সমুদ্রগর্জনের মধ্যে এখনো যেন এক এক সময় ভূপতি জ্ঞানার আর্তনাদ শুনতে পায়।

বীরভদ্রপুর গ্রাম জালিয়ে দিচ্ছিল মারঠারা। আঙনের আভায় কৃষ্ণপক্ষের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। কয়েকদিন আগে লক্ষ্মীপূজা হয়ে গেছে। ভূপতি জ্ঞানার বাড়ির উঠানে সেই আলনার ছবি তখনো অমান ছিল।

বাড়ির পেছনে গুরুর। তারপর কিছুটা দূরে আগাছার জললে ভরা পোড়ো জমিতে ডালপাতা ছড়ান মন্ত একটা কাঁঠাল গাছের ঘনপাতার অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল রঘু, ভূপতি আর ভারতচন্দ্র। ঘরদোর জলতে দেখে আর্তনাদ করে গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছিল ভূপতি।

একবার শুধু ডাকার স্বযোগ পেয়েছিল ভারত—ভূপতি, ভূপতি, শোন শোন, যেওনা, এভাবে যেওনা—
রঘুও তাড়াতাড়ি নেমে তার হাত ধরেছিল।

হাত ছাড়াবার চেষ্টায় টানাটানি করতে করতে টেঁচিয়ে উঠেছিল ভূপতি—না বাবাঠাকুর, আমি কোন কথা স্তনব না, আমি বাব, বাব, আমাকে ছেড়ে দাও রঘু, হায় হায় সর্বনাশ হয়ে গেল, আমার ঘর, আমার গোলায় লক্ষ্মীরে ঘান, হায় হায় শো—

জোয়ান রঘুও ধরে রাখতে পারল না। হায়-হায় করতে করতে ছুটে চলে গেল।

ওই শেষ দেখা, শেষ কথা ভূপতির। পেছন পেছন যাওয়া আর নিরাপদ নয়। কোন উপায় নেই। অগত্যা আবার ঘন পাতার অন্ধকার আশ্রয়ে ফিরে এসেছিল রঘুনাথ। ধোঁয়া আর আঁশ। চারদিক ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। পাকা ধান পোড়া গন্ধ।

হঠাৎ কখনো মৃতদেহের পোড়া গন্ধে বাতাসটা ভারী হয়ে উঠেছে।

এক এক সময় যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

অশ্বক্ষুর ধ্বনি, বন্দুকের গর্জন, পৈশাচিক উল্লাসের কোলাহল, বিপন্ন আর্তনাদ—সব মিশে সেই শান্ত নগণ্য বীরভদ্রপুরের রাজিটাকে যেন জীবন্ত নরক করে তুলেছিল। সমুদ্রের পাশে বসে আছে ভারত। একটু পরেই স্বর্ষ উঠবে।

পূর্ব দিগন্তে দীর্ঘ উন্মুক্ত পদ্মকোরক বর্ণের মতো একটি ধূসর রক্তিমভা ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছে। খুব ভোরেই এসে সমুদ্রে স্নান করে ভারত। তারপর মন্দিরে যায়।

আর একটু পরেই প্রথম স্বর্ষের রশ্মি জগন্নাথদেবের মন্দির-শীর্ষ স্পর্শ করবে।

প্রশান্ত পবিত্র প্রভাত। আকাশ সমুদ্র আর ধূসর বেলাভূমি যেন প্রথম দিনের স্বর্ষের অপেক্ষায় শান্ত, সমাহিত। শুধু বাতাস আর তরঙ্গভেদের কলরব।

কখনো বা কোন স্নানার্থী কণ্ঠে স্বর্ষ-বন্দনার শ্লোক।

এই নিশ্চিন্ত আকাশের প্রান্তে স্বর্ষোদয়ের নিঃশব্দ সমারোহের সঙ্গে চারদাল আগের দেখা বীরভদ্রপুরের সকালবেলার কোন মিল নেই। অভিশপ্ত রাত্রির পর একটা ভয়াবহ স্বকৃত্য

বীরভদ্রপুরের সেই সকালবেলার বাতাসকে স্তম্ভিত করে রেখেছিল।

স্তম্ভ ভীত কাকের দল কর্কশ কলরবে জানিয়ে দিচ্ছিল আরো একটি অন্তত দিনের আবির্ভাব।

সূর্যোদয়ের পর কাঁঠাল গাছের নিরাপদ আশ্রয় থেকে ভয়ে ভয়ে বেরিয়েছিল দু'জনে। ভারতচন্দ্র আর রঘুনাথ। বগীরা ঘুরে চলে গেছে কিংবা কাছাকাছি কোথাও ছাউনি ফেলেছে কি না, বোঝা যাচ্ছিল না।

রঘু বলেছিল—জলদি চলেন কর্তা, এহেনে ঝাকা আর ঠিক হবেনি—

কিন্তু বাবে কোনদিকে, কোনদিকটা সবচেয়ে নিরাপদ বুঝতে পারা যাচ্ছিল না।

সাবধানে ভয়ে ভয়ে খানিকটা যাবার পর শিবমন্দিরের দিক থেকে মেয়েলি গলার কান্নাকাটির শব্দ শুনে যেন সম্বোধিতের মতই শেদিকে এগিয়ে গিয়েছিল দু'জনে। সেই প্রাচীন মন্দিরের দৃশ্যটা বহুদিন, বহুরাজি ভারতচন্দ্রের চেতনাকে আক্রমণ করেছে, নিজাকে আতঙ্কিত করেছে। শিবমন্দিরে আশ্রয় নিয়েও রেহাই পায়নি মেয়েরা।

গ্রামের আরো অনেক গৃহস্থ বৌ-ঝিরা শিশুসন্তানসহ আশ্রয় নিয়েছিল মন্দিরে।

কলে গোপনতার জন্ত প্রয়োজনীয় নৈঃশব্দ রক্ষা করা যায়নি। শিশু দলের কান্না লক্ষ্য করে খুঁজতে খুঁজতে এসে উপস্থিত হয়েছিল মারাঠারা। তারপরের পর্ব অবর্ণনীয়, অমানুষিক। রঘুর চীৎকার শুনে চমকে উঠেছিল ভারত—এদিকে জাহেন গো কর্তা হায় হায় রে—

মন্দিরের সামনে একটা বৃহৎ বেলগাছ। মোটাশুড়ির চারপাশে গোল করে বাঁধানো পাথরের বেদী। সেই বেদীর উপর শুয়ে ছটকটু করছে একটি মেয়ে, খোলা গলায় চেঁচাচ্ছে—জ'ল, জ'ল, একটু জ'ল দাঁও—

কাছে এসে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল ভারত। যমুনা।

বেশবাস ছিন্নভিন্ন। নাকের গয়নার জন্ত নাক কেটে নিয়েছে। কানের গয়নার জন্ত কান ছিঁড়ে নিয়েছে। সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। তার পনেরো বছরের শরীরটার উপর অত্যাচারের চূড়ান্ত করেছে বগীরা।

মন্দিরের পেছনের পুকুর থেকে জল নিয়ে এসেছিল রঘু। গেরুয়া চাদর নিঙ্রে মুম্বু'মেয়েটির মুখে কয়েক ফোটা জল দিতে পেরেছিল। বার কয়েক জোরে জোরে খাস টেনে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই অপবিত্র, ক্ষতবিক্ষত দেহটার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছিল যমুনার আত্মা।

কিন্তু শান্তি কি পেয়েছে? প্রার্থনা করেছিল ভারত, যেন শান্তি পায়। আবার যদি জন্মাতে হয়, তবে এই হতভাগা দেশে যেন আর মেয়ে হয়ে জন্মাবার অভিশাপ বহন করতে না হয়।

শ্রীপতি, শ্রীপতির মা আর বউএর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। খোঁজ নেবার চেষ্টা করেছিল ভারত। কিন্তু রঘু তাকে একরকম জোর করেই চলে আসতে বাধ্য করেছিল।

ওখানে ঝাকা আর ঠিক নয়! কে জানে হয়তো হঠাৎ আরেক দল বগী এসে উপস্থিত হবে। ভূপতির কোন ধবর পাওয়া যায়নি। নিশ্চয়ই মারা গেছে। হয়তো আগুনে পুড়ে কিংবা অল্প কোন বীভৎস যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে।

ভয়ে পাগলের মত হয়েছিল রঘুনাথ।

—পালিয়ে চলেন তো ছোটকর্তা, এহেনে আর ঝাকবার কান্না নাই—

ভারতও কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। রঘুর সঙ্গে সঙ্গে সেও দিশেহারার মত পালাতে চেয়েছিল এই অভিশপ্ত এলাকা থেকে। কিন্তু কোথায় পালাবে, গোটা বাংলাদেশ জুড়ে অভিশাপের আগুন জ্বলছে। দিশাহীন আতঙ্কের মধ্যে, অনিশ্চিত আশ্রয়ের পথে পালিয়ে যাবার সময় গাঁয়ের বাইরে ধান ক্ষেতের পাশে হঠাৎ চোখে পড়েছিল একটি জোয়ান মামুষ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পিঠের দিকে ফতুয়ার চাপ

চাপ রক্তের দাগ। পাশের পাকা ধানের গাছগুলি হাত-পা ছড়ান দেহের চাপে দুমড়ে কালো কালো রক্তের দাগ মেখে লুটিয়ে আছে মাটিতে। রাস্তা ছেড়ে কয়েকপা এগিয়ে এসেছিল রঘুনাথ।

তারপর হাতের পাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে চিত করে দিয়েছিল মৃতদেহটা।

পরক্ষণেই চমকে উঠেছিল দু'জনে। আকাশের দিকে খোলা মুখে, আতঙ্ক বিক্ষারিত চোখে তাকিয়ে আছে হুবল। ভূপতির জামাই, যমুনার স্বামী, সেই হাসি-খুশি স্বাস্থ্যবান যুবকটি। কিন্তু মৃত্যুতে বোধহয় তেমন কষ্ট হয়নি। হয়তো ছুটে পালাচ্ছিল। পেছন থেকে একটিনাড়া বন্দুকের গুলি পিঠ-বুক ভেদ করে চলে গেছে।

একটি স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ যৌবনের এমন অকালমৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল বেদনার বিমুঢ় হয়ে ছিল ভারত। তারপরেই এই বীভৎস মৃত্যুর অধিকার থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই বিত্তীর্ণ ধ্বংসলীলার মধ্যে, বেদনাময় দৃষ্টাবলীর সমুখে অসহায় দর্শকের মত দাঁড়িয়ে থাকা আরো মানিকর আরো অসহ মনে হয়েছিল।

—পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়, রঘু, আর সহ করতে পারছি না—ছোটকর্তার আর্তনাদ শুনে রঘুও চমকে উঠেছিল।

তারপর দুটো দিন, দুটো রাত অনিদ্রায় অনাহারে পথে পথে ঘুরেছে।

মারাঠা দস্যুদের চলাচলের পথ যতটা সম্ভব এড়িয়ে বনজঙ্গল, পাকা ফসলের পোড়া মাঠ, জনহীন লুপ্তিত গ্রাম, আশ্রয়হীন রক্ষ প্রান্তর অতিক্রম করে তৃতীয় দিন রাত্রির প্রথম প্রহরে অর্ধরাত্রি পার হয়ে উড়িষ্যার সীমান্তে এসেছে।

উড়িষ্যায় তখন রাজনৈতিক পট পরিবর্তন শুরু হয়েছে।

মারাঠা অশ্বারোহী বাহিনীর অগ্রগামী দল কটক অধিকার করেছে। বীরভদ্রপুর ছেড়ে আসার প্রায় পক্ষকাল পরে কটকে মারাঠা সর্দার শিবভট্টের দরবারে উপস্থিত হয়েছিল

ভারতচন্দ্র। বিনীতভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল। মারাঠারা তখন বিজয় উৎসবে মত্ত। এত সহজে উড়িষ্যা অধিকৃত হওয়ায় স্বভাবতই প্রগল্ভচিত্ত শিবভট্ট এই অঞ্চলে স্থায়ী অধিকার স্থাপনের ইচ্ছায় প্রজাপুঞ্জের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জনে উত্থোগী হয়েছিলেন। অনিন্দ্যস্থানর দেবোপম কান্তি এই সন্ন্যাসীকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন শিবভট্ট। মলিন বেশভূষার মধ্যেও এই নবীন সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য প্রকট হয়েছিল। তাঁর অনশনক্লিষ্ট কণ্ঠে বিস্তৃত উচ্চারণে মধুর সংস্কৃত শ্লোক শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন মারাঠা সর্দার, চোস্ত কারসী শুনে বিশ্বয়বোধ করেছিলেন।

উদার হাস্তে প্রসারিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন শিবভট্ট—
আপনার কি প্রার্থনা বলুন—

পর পর সাত দিন শিবভট্টের দরবারে হাজিরা দিয়েছিল ভারতচন্দ্র।

নবাব-দরবার কিংবা বর্ধমান রাজ-দরবারের মত মারাঠাদের যুদ্ধ-শিবিরে আদব-কায়দার কোন জাঁক-জমক নেই। মারাঠা-সর্দারের দরবারে বিলাস-ব্যসনের কোন আড়ম্বর নেই। সহজেই বাইরের প্রহরীদের কাছে আবেদন করে ভেতরে যাবার অনুমতি পেয়েছিল ভারত।

শুধু যাবার আগে তাঁর জামা কাপড় ভাল করে একবার তজ্জাগী করে নিয়েছে। তবে একথা ঠিক যে তাঁর আকৃতি, মুখশ্রী, বাচনভঙ্গি এবং সন্ন্যাসীর বেশ সহজেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করেছে। প্রথম প্রথম কটা দিন হিন্দীতে কথাবার্তা বলেছে ভারতচন্দ্র। মারাঠা-সর্দারকে সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়েছে। দরবারে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় উপবীত বার করে মধুর কণ্ঠে বিস্তৃত সংস্কৃতে আশীর্বাচন উচ্চারণ করেছে।

চারপাশে শশজ্ঞ বোদ্ধা ও সেনাপতিদের আনাগোনা। বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার নানা অঞ্চল থেকে প্রতিদিন প্রহরে প্রহরে দণ্ডে দণ্ডে সংবাদবাহকেরা নানা সংবাদ নিয়ে

আনছে। মারাঠাদের প্রধান বাহিনী নিয়ে পণ্ডিত ভাস্কররাম বোধহয় কিছুদিনের মধ্যেই কটকে আসবেন। তাঁকে অভ্যর্থনার আয়োজন হচ্ছে। নানা কারণে শিবভট্ট ভয়ানক ব্যস্ত। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বেশী সময় কথা বলার সুযোগ পায়নি ভারতচন্দ্র। সপ্তম দিনে ভাড়া ভাড়া ফারসীতে এই বাঙালী সম্মানীর কি প্রার্থনা জানতে চেয়েছিলেন শিবভট্ট। ভারত জবাব দিয়েছিল চোস্ত ফারসীতে—মালিক, আপনার দয়ায় এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ সম্মানী মাথার উপর আচ্ছাদনের মতো সামান্য পর্ণ কুটারের একটি আশ্রয় পেলে অমুগ্ধীত হবে, প্রাণ ধারণের নিমিত্ত নিত্যন্ত প্রয়োজনীয় দুই মুঠি অন্ন সংস্থানের উপায় হলে এই অধম নিজেকে ধন্য মনে করবে, হজুর, আপনি এবং আপনার মহামায়া প্রভু হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাস্কররাম কোলহট্টের জগদীশ্বরের কৃপায় সমগ্র উড়িষ্যা রাজ্যের অধিকার লাভ করেছেন, এই বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের কোন প্রত্যন্ত প্রান্তে কি এই দীন সম্মান ব্রতধারীর উপযুক্ত, নিভৃত ঈশ্বর চিন্তার অনুকূল, কোন নির্জন স্থান নির্দিষ্ট হতে পারে না, মালিক, আপনার অনুগ্রহে সমস্তই সম্ভব, আপনার জয় হোক, যে দেবাদিদেবের পবিত্র নাম আপনি ধারণ করেছেন, সেই শিবশঙ্কু আপনার অশেষ মঙ্গল সাধন করুন।

একটানা এতটা বলে নীরব হয়েছিল ভারত আর চমৎকৃত হয়েছিলেন শিবভট্ট।

—আপনি এমন সুন্দর ফারসী শিখলেন কোথায়?

—জগলীর নিকটবর্তী দেবানন্দপুর গ্রামের রামচন্দ্র দত্ত মুন্সী মহাশয়ের অনুগ্রহে, দত্তমুন্সী মহাশয় ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত, দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে মুন্সী উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

একটুকাল চুপচাপ থেকে কি যেন ভাবলেন শিবভট্ট। এই সময় তাঁর প্রধান পার্শ্বচর রণোজী যাদব নিম্ন স্বরে কিছু বললেন। শিবভট্ট মুচ্চকি হেসে মাথা নাড়লেন, জবাব

দিলেন। দু'জনেই ভারতের পক্ষে দুর্বোধ্য মারাঠি ভাষায় কিছু আলাপ করছিলেন। রণোজী ধূর্ত চোখে ভারতের আপাদমস্তক বারকয়েক দেখে নিলেন, তারপর কি সব বোঝাতে লাগলেন। মনে হ'ল, শিবভট্ট তাঁর কথায় তেমন সায় দিলেন না বটে, কিন্তু তাঁর মুখ চোখের চেহারা বদলে গেল।

ভারতচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন শিবভট্ট—আপনি হিন্দু সম্মানী, কি কারণে যবনভাষা শিক্ষা করলেন বলুন?

অনুমান করল ভারত, কোন কারণে মারাঠা সর্দারের মনে সন্দেহের সঞ্চার হয়েছে। বোধহয় রণোজী বাগবের কোন পরামর্শ এর কারণ। অবশ্য এই যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় অপরিচিত আগন্তুক কাউকে সন্দেহ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সতর্কভাবে জবাব দিল ভারত—অর্ধোপার্জনের অধিকতর সুবিধা লাভের জন্য পিতার আদেশে আমি আরবী-ফারসী ভাষা শিক্ষা করেছিলাম, কিন্তু অর্ধোপার্জনে আমার কোন আগ্রহ ছিল না, বিচ্ছাচটার আনন্দেই বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী কিছু উর্দু এবং হিন্দী ভাষা শিক্ষা করেছি। শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর সংসার ধর্ম আর ভাল লাগলো না, সম্মান নিয়ে গৃহত্যাগ করেছি—

শিবভট্ট আবার জিজ্ঞেস করলেন—আপনার নাম কী?

একমুহূর্ত না ভেবে চট করে জবাব দিল ভারত—সদানন্দ স্বামী—

—ওটা তো সম্মান-গ্রহণের পর পূর্বে কি নাম ছিল?

—সম্মান গ্রহণের পর পূর্ব নামে আমাদের আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তবু আপনার সন্তুষ্টির জন্য বলছি, আমার পূর্ব নাম ছিল রাখানথ রায়—

—নিবাস ছিল কোথায়?

—বর্ধমানজুক্তির মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তর্গত শাজিপুর গ্রামে—

আবার কিছুক্ষণ নিচু স্বরে রণোজী যাদবের সঙ্গে আলোচনা করলেন শিবভট্ট, তারপর ভারতচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে একটু উচু গলায় বললেন—দেখুন সাধুবাবা, আমি স্পষ্ট কথাই মাসুম, সোজা-সজি কথা বলতে ভালবাসি, আপনার মত বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত সন্ন্যাসী সাধারণত চোখে পড়ে না, আপনি যে নবাব পক্ষের গুপ্তচর নন, তার প্রমাণ কি? অন্ততঃ এরকম সন্দেহ হবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার কথা বোধ- হয় অযৌক্তিক নয়, কি বলেন— কথার শেষে একটু হাসলেন মারাঠা-সর্দার। ভারত ভয় পেল। অকারণ সন্দেহের বসে অকথ্য নির্ধাতন করা মোটেই অসম্ভব নয় বর্গীদের পক্ষে। হয়তো কয়েদ করে রাখবে। আবারো কি তার কপালে কারাবাস আছে। কিন্তু ভয়ের ভাব প্রকাশ পেলে বিপদ বাড়বে। যথাসম্ভব সংযতভাবে উপবীত বার করে শান্ত কণ্ঠে বললো ভারত—আমি এই উপবীত ছুঁয়ে বনুছি, জগন্নাথদেবের নামে শপথ করে বলছি, আমি গুপ্তচর নই, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন—

রণোজী যাদব এবার হিন্দীতে একটি কুট প্রস্তাব করলেন—
 স্তনেন্দ্ৰি, সন্ন্যাস গ্রহণের সময় উপবীত ত্যাগ করতে হয়, আপনি তো ত্যাগ করেন নি দেখছি, কি এরকম সন্ন্যাসী আপনি—

বিত্রত বোধ করল ভারত। এরকম প্রশ্ন সে আশা করেনি, বিপদ কণ্ঠে বললো—আজ্ঞে আমি এখনো গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিনি, সংসার ত্যাগ করে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি— শিবভট্ট বললেন—ধামুন, ওগব কৈফিয়ৎ শোনার অবসর আমার নেই, আপনি মারাঠা অধিকারের মধ্যে কোথায় বসবাস করতে চান বলুন—

ভারত জবাব দিল—শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে—

—বেশ, তাই হবে—শিবভট্ট আদেশ দিলেন—আপনি পুরীধামে গিয়ে বাস করুন। মন্দির থেকে প্রতিদিন আপনি

বিনামূল্যে বলরাম ভোগের প্রসাদ পাবেন, আমি সে ব্যবস্থা করে দেব—

—আপনার জয় হোক মালিক—আত্মমি নত হয়ে নমস্কার দিল ভারত।

—কিন্তু একটা কথা—শিবভট্ট গম্ভীর গলায় বললেন—আমার অনুমতি ছাড়া আপনি পুরীধাম ত্যাগ করতে পারবেন না, অন্য কোথাও স্বাধীনভাবে যেতে পারবেন না আর— একটুকাল চিন্তা করে বললেন—পুরীধামে আপনি কোথায় থাকবেন তাও আমি বলে দিচ্ছি—

রণোজী যাদবের সঙ্গে দু'চার কথায় পরামর্শ করে আবার বললেন—সুমন সাধুবাবা, পুরীধামে আপনি বৈষ্ণব মোহান্ত মাধবদাস বাবাজীর আশ্রমে থাকবেন, আমার হুকুম নামা নিয়ে দু'জন শিলাদার আপনার সঙ্গে যাবে—

এক সপ্তাহ পরে পুরীধামে এসেছিল ভারতচন্দ্র আর রঘুনাথ। তারপর প্রায় তিন মাস হয়ে গেল। সেই থেকে মাধবদাস বাবাজীর আশ্রমেই আশ্রয় পেয়েছে। মন্দির থেকে প্রতিদিন বলরাম ভোগের প্রসাদ আসে। প্রথম প্রথম রঘুকে সঙ্গে নিয়ে ভারত নিজে গিয়ে প্রসাদ আনতো।

আজকাল রঘু একাই যায়, নিয়ে আসে। পুরীধামের সর্বত্র এখন অবাধ গতি তার।

প্রথমদিন যখন মহাপ্রসাদ এনে বলেছিল ভারত—খালাস করে ছ'ভাগে বেড়ে দে, তুইও এই সঙ্গে বসে যা—

রঘুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিল, চোঁচিয়ে বলেছিল—এ যে ভাত ছোটকর্তা, আমি দ্বিবার পাকুম ক্যানু—

—খুব পারবি, দে না তুই, কোন দোষ হবে না—

—কি যে কনু কর্তা, আমি ছোটজাত, আপনি বামুন, মহাপাপ হবে আমার—

হাস্তে হাস্তে বলেছিল ভারত—আমাদের কি আর জাতজন্ম আছে রে, আমি বলছি কোন পাপ হবে না—

তবুও রাজি হয়নি রঘুনাথ। শেষে অনেক কষ্টে বুঝিয়েছিল ভারত। জগন্নাথদেবের লীলাক্ষেত্র এই পুরীধামে কোন বর্ণভেদ নেই, সবাই সমান, সবাই আপন, ছোটজাত কেউ নয়। তারপর সহজ হয়েছে রঘুনাথ। ভয় কেটেছে, সংকোচ দূর হয়েছে।

রঘুর ডাক শুনে পেছনে ডাকাল ভারত। সূর্য উঠেছে। বহলোক স্নান করছে সমুদ্রে। রোজ অন্ধকার থাকতে উঠে

সমুদ্রের পাশে চলে আসেন ছোটকর্তা। রোজ এক জায়গায় এসে বসেন। বসে বসে চুপচাপ সমুদ্র দেখেন। তার বসার জায়গাটি জানে রঘুনাথ।

রোজ সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শুকনো কাপড়-গামছা নিয়ে হাজির হয় সে ;

সমুদ্রে স্নান করে মন্দিরে যায় ভারত। এক একদিন রঘুও যায় পেছন পেছন।

(ক্রমশঃ)

খানকষেক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

শ্রীগীতা	৬.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫.০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫.০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১.৫০
কর্মবাণী	১.২৫
Soul of India Speaks	5.00

বাংলার ঋষি	৩.০০
বাংলার মনীষী	১.৩০
বাংলার বিদ্বান	২.০০
বীরভৈ বাঙালী	১.৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২.০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪.০০
রাজর্ষি রামমোহন	১.৫০
রবীন্দ্রনাথ	১.২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১.৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১.৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিজ্ঞানাগর	২.২৫
মানুষের মত মানুষ	৭৫
শিশু রামায়ণ	৬২
শিশু মহাভারত	৭৫

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :

১৫ কলেজ স্কোয়ার :

কলিকাতা—১২

জল

মাটি

মন

ম হী তো য বি শ্বা ন

পৌষ পড়তে-না-পড়তেই যার মেখানে যা ছিল সব কাটা-কোটা হয়ে গেল। ঐ কয়টা ধানের গোছা কাটতে কদিনই বা লাগে। দেখতে দেখতে শূন্য হয়ে এলো কাঠুখালির বিল। এখানে ওখানে দু'একটা ক্ষেতে সামান্য কিছু রবি শস্য ছাড়া কোথাও আর কিছু রইল না। রবি শস্যের চাষ কম হল। ঘরে বীজ নেই। কলাই যা ছিল তা-তো প্রায় সবই খাওয়া হ'য়ে গেছে। অভাবের মুখে রাই-সরষের বীজগুলোও অনেকে হাটে হাটে বিক্রি ক'রে ফেলেছে।

দিন যায়। রাত আসে। নিস্তরু কাঠুখালির বিল দিগন্তর-জোড়া হতাশাল নিয়ে অপলকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ধান-কাটা শূন্য ক্ষেতে শীতের বাতাস পাক খেয়ে খেয়ে ফেরে। ঝঙ্ক, ধারালো বাতাস। ছুরির মতন এসে গায়ে বেঁধে। গভীর-রাত্রে শিয়াল ডাকে। চাপ-চাপ কুয়াশায় আবিল হ'য়ে আসে চারিদিক। টুপ্-টাপ্ ক'রে ঝ'রে পড়ে শিশির-জল। উপোষী ইঁদুর গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসে ধানের লোভে। কাল-পুষ্করের মতন ভয়ঙ্কর চোখ মেলে মাধার পরে পেঁচা উড়ে যায়। আর যাবার সময় ছৌ সেয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় হতভাগ্য ইঁদুরটাকে।

বিকেলের দিকে হেঁসোখানা হাতে নিয়ে বলরাম বিলে এসেছিল। ধান কাটা হ'য়ে গেছে। এখন শুধু লম্বা-লম্বা নাড়াগুলো পাট-পাট হ'য়ে পড়ে আছে। অনেকেই নাড়া তুলছে। মাঝে মাঝে নাড়ার স্তূপ গাধা দেওয়া রয়েছে। এরপরে বড়ো বড়ো আঁটি বেঁধে ওগুলো বাড়ী নিয়ে যাওয়া হবে। সারাবছরের জ্বালানীর কাজ চলবে।

বলরাম-ও নীচু হয়ে নাড়া তুলছিল। খানিক বাদে দেখে, ভজহরি আসছে। বলরাম অনেক আগেই দেখেছে ওদের। পাঁচ-ছয়খানা ক্ষেতের ওপাশে ভজহরি আর মাধাই নাড়া তুলছিল। ভজহরির সঙ্গে বলরাম যেন আজ-ও সহজ হ'য়ে কথা বলতে পারে না। এক পাড়ায় থাকতে হয়। কাজ-গরজে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কথা-বার্তাও বলতে হয়। কিন্তু ক'টা বছর হয়ে গেল, আজও যেন ভজহরিকে দেখলেই বলরামের মনটা বিকল হ'য়ে ওঠে।

ভজহরি কাছে এসে দাঁড়াতেই বলরাম হাতের কাজ বন্ধ ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়াল। হেঁসোর মাধার খানিকটে নরম মাটি লেগেছিল। ছাড়াতে ছাড়াতে বলো,—“বাড়ী যাচ্ছে নাকি? নাড়া তোলা হয়ে গ্যলো?”

ভজহরি গাধা-দেওয়া নাড়াগুলোর কয়েকটা টেনে নিয়ে

বসল। বসে বলল,—“না, বেশী তোলা হয়নি। মাথাই তুলতিছে। তোমায়ে দেইহে ভাবলাম—মাই এটু ঘুরে আসি।”

বলরাম-ও বসল ভজহরির একটু ঘুরে। ভজহরি বলল,—“মাথাই কচ্ছিলো—তোমার তো সব নাড়া দরকার হবে না। তা দুই-একান ভূঁ-র নাড়া যদি আমাগের দিতে, তা’লি তুলে নেতাম।”

বলরাম বলল—“তোমাগের ভূঁ-র গুলো তুলতি তো নাগো। তারপরে যদি কম পড়ে তা’লি নিও না-হয় আমার একখানিতে তুলে।”

হঠাৎ মাথার উপরে প্রকাণ্ড একটা দাঁড়কাক কা—কা—ক’রে চীৎকার করতে করতে উড়ে গেল। ভজহরি এক-গোছা নাড়া আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চীৎকার ক’রে উঠল—“ধু-রো—ধু-রো—”

তারপর বলরামের দিকে ফিরে বলল—“কাউও গুলোর অহুকুনে ডাক শুন্তিছো! য্যানো খাই-খাই ক’রে ব্যাড়াচ্ছে।”

হঠাৎ গলাটা নেমে আসে ভজহরির। শূন্য ক্ষেতগুলোর দিকে তাকিয়ে উদ্ভাস গলায় বলে—“কতো আর খাবি। কতো আর খাতি চাস্ তোরা।”

বলরাম কি বলবে ভেবে পায় না। চুপ ক’রে বসে থাকে। শূন্য ক্ষেতগুলোর মধ্যে ভজহরির দৃষ্টিটা ঘুরে বেড়ায়। আন্তে আন্তে বলে—“মাইয়েডা নিজি-ও বড়ো জালা নিয়ে মরিচে। বড়ো বয়েসে আমারে-ও বড়ো খাই-ডা দিয়ে গ্যালো। মানুষি আকথা-কুকথা কচ্ছে। কিন্তুক, তুমি তো জানো বলরাম, পদ্ম আমার আর যা হোক, ও-সব ছেলো না।”

একটা তীব্র অস্বস্তি অনুভব করে বলরাম। ভজহরির কথাগুলো যেন আঙনের সঁাকার মতন মনটাকে ঝল্লে দিচ্ছে। পাড়ার সকলে পদ্মর আত্মহত্যার কারণ নিয়ে

হাসাহাসি করছে। জানাজানি হতে তো আর কোথাও বাকী নেই। মরেও মেয়েটার শাস্তি নেই। সকলের ছিঃ ছিঃ যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বাপ হয়ে ভজহরি মেয়ের এতো বড়ো অপবাদ সহজে মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু কাকে সে বলবে সে কথা। কে স্তনবে ভজহরির কথা। কি ভেবে কে জানে বলরামকেই লাকী মানছে। বলরাম তো অন্ততঃ চেনে পদ্মকে! বলরাম নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলবে না। জগতের একটা লোক অন্ততঃ বলুক—পদ্ম ভালো, “পদ্ম কোনো পাপ কাজ ক’রে মরেনি।

কি একটা কথা বলতে গেল বলরাম। কিন্তু কথাটা যেন গলায় এসে আটকে গেল।

ভজহরির উদ্ভাস গলাটা আবার শোনা যায়—“তোমার হাতে-ও যদি সেই সোমায় দেতাম মাইয়েডারে! তালি আজকে মাইয়েডা আমার এইভাবে অপোষাতে মরতো না। ভগমান কি বুদ্ধি যে দেলো আমারে সে সোমায়।

বলরাম উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে—“ও-সব পুরোনি কথা আর তুলে কি হবে। যা হওয়ার তা-তো হ’য়ে গেছে। খালি খালি ওসব কথা পচাল প’ড়ে মনরে কষ্ট দেয়া।”

ভজহরিও উঠে দাঁড়ায়। হেঁড়া চাদরটা গারে জড়তে জড়তে বলে—“কই না তো কারো কাছে। কারেই বা কবো! আর ক’য়েই বা আমার কি জুড়োবে।”

ভজহরি চলে যায়। বলরাম একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার নাড়া তুলতে শুরু করে। আন্তে আন্তে সন্ধ্যা বনিয়ে আসে। মাথার উপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে পাখীগুলো বাগায় ফিরে যাচ্ছে। গ্রামের মধ্যে বউকিগুলো সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। শাঁখের অম্পষ্ট কাঁপা-কাঁপা আওয়াজ ভেসে আসছে।

বলরাম তোলা-নাড়াগুলো এক পাশে গালা দিয়ে

রাখল। তারপর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো। অন্ধকার হয়ে আসছে। শীতে হাত পা কন্ কন্ করছে। খড়ি-ওঠা পায়ে নাড়ার ঘসা লেগে লেগে আরো চুলকোচ্ছে। খানিক দূরে কারা যেন নাড়ায় আঙুন দিয়েছে। অনেকখানি আগুনা জুড়ে নাড়ার আঙুন আন্তে আন্তে জলতে জলতে এগিয়ে চলেছে। আঙুনের আভার ও-দিকটা রাঙা হয়ে উঠেছে।

ভজহরির কথাগুলো যেন এখনো কানের কাছে বাজছে বলরামের। বলরাম কি পারে, পাড়ার সকলের মন থেকে পদ্মর নিন্দার কথাটুকুকে মুছে দিতে? ভজহরিকে কি বলতে পারে, তোমার যেনে আর যা হোক, ও-সব ছিল না? বুক ফুলিয়ে বলরাম কি বলতে পারবে একথা সবাইকে? না, পারবেনা। সে সামর্থ্য নেই বলরামের। পাড়ার সকলের মনে পদ্মর কলঙ্কের কথাটুকুই সত্যি হয়ে থাকবে। ম'রে গিয়েও পদ্ম সব পাপ আর কলঙ্কের বোঝাটুকুকে একাই মাথায় নিয়ে বেড়াবে। মরণের চেয়ে বড়ো অন্ধকার আর নেই। সেই অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েও পদ্ম অভিমানী গলায় বলরামকে ডেকে বলবে—“বোনাই, স্বপ্নি আর কারো কিছু হবে না বোঝাপাড়ার সব ভার আমার পরে ছা'ড়ে ছাও।” নিন্দা, পাপ, কলঙ্কের সমস্ত বোঝাপাড়ার ভার পদ্ম আজ একাই মাথায় তুলে নিয়েছে। কেউ আর কিছু বুঝতে-ও পারবে না। বলরামের উঁচু মাথা উঁচুই থাকবে। নিঃশাড়ে, নিঃশব্দে বলরামকে সব দায়মুক্ত করে পদ্ম অজানার অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

কিন্তু দায়মুক্তি ঘটছে কই বলরামের? সকলের কাছে লুকোনো যায়। কিন্তু আপন পাপ তো আপন মনের কাছে লুকোনো যায় না। এ-আঙুনের দাহন থেকে কে মুক্তি দেবে বলরামের মনকে।

আন্তে আন্তে দিন গড়িয়ে যেতে লাগল। চৈত্রের

মাঝামাঝি এসেই আবার সকলের মুখে-চোখে দুশ্চিন্তা ঘনিয়ে আসতে লাগল। অনেকেরই ঘরের ধানে টান প'ড়ে এসেছে। কষ্টে অষ্টে আর কিছুদিন চলতে পারে। তার-পরে কি হবে ভাবা যায় না। বর্ষাকালের চেয়েও এ-সময়ে কষ্ট হবে বেশী। বিলজুড়ে এখন আর শাপলা, শালুক কি ঘেঁচু, ঢ'্যাপ পাওয়া যাবে না।

দুপুরবেলায় কি একটা কাজে বলরাম ও-পাড়ায় গিয়েছিল। ফেরার সময় বংশীদেব বাড়ীর সামনে এসে চৌচাংচি শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বংশী আর ওর বউয়ের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে। বংশীর গলা তেমন শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু বউটা চৌচিয়ে-মেচিয়ে পাড়া একেবারে মাথায় তুলে নিয়েছে। বাবে-কি-বাবে-না একবার ভাবল বলরাম। তারপর আন্তে আন্তে বংশীদের বাড়ীর মধ্যে এগিয়ে যেতে লাগল। বংশীর বউ হাঁপাচ্ছে আর সমানে চৌচাচ্ছে—“অতো কিলির ধার ধারি আমি? দুই কালো দুডো প্যাটে জুটোনির মুরোদ নেই। এই ছেঁড়া তেনাটুক প'রে ব্যাড়াছি আজ ছয়মাস। তা তো কারো পোড়া চোখে পড়ে না। আবার গায় হাত তুলতি আসে! বোলে—ভাত দেয়ার ভাতার না, কিল মারার গোসাই।

ঝগড়াঝটি শুনে মজা দেখতে অনেকে এসে বংশীর ঘরের পাশে দাঁড়িয়েছিল। বংশীর ছেলে আর মেয়েটা একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বলরাম গিয়ে দাঁড়াতেই বংশীর বউ চুপ করে গেল। বউটা আজ কয়মাস পোয়াতী। কাঠিসার চেহারা। চোখ-মুখ ব'লে গেছে। ঝগড়া ক'রে আরো অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। বলরামকে দেখেই মাথায় একটু-খানি ষোমটা টেনে দিল। তারপর ভারী পেট-টা নিয়ে আন্তে আন্তে ঘরের মধ্যে চ'লে গেল।

ঝগড়াটা আর জমবে না বুঝে একে একে সকলে সরে গেল। বলরাম বারান্দার কোণে তাকিয়ে দেখে, বংশী শুটিশুটি মে'রে ব'লে আছে। রাগে ফুলছে। বলরাম ওর

পাশে গিয়ে বলল। একটু ধমকের স্বরে নিজাশা করল—
“কি হইছে-রে?”

বংশী কোনো কথা না বলে চুপ করে থাকল। বলরাম
গলাটা আরো একটু চড়িয়ে বলল—“কি রে, মুখখান কি
সুই দিয়ে সিয়েয় খুইছিল নাকি? কথা বারোচ্ছে না
যে—”

বংশী ও গলা চড়িয়ে উত্তর দিতে গেল। কিন্তু গলাটা
কেমন মিন্মিন্ ক’রে গেল—“কথা কবো না ক্যান্—? তুই
দেইহে নিস্ বলা,—ও হারামজাদীর গোস্তাগী যদি আমি না
ভাঙি তো আমার বাপের জন্মো না। ওর কোন্ ভাতারে
ওরে ঠ্যাছাতি আসে আমি জাখুবো। যে চড় আওড়াইলাম
নাগুতো তো ট্যার পাতো।”

ছকার দিয়ে উঠল বলরাম। বংশীর কাঁধ ধ’রে প্রকাণ্ড
একটা কাঁকানি দিয়ে বলল—“কি ক’লি তুই? ঐ মানুষির
গায় হাত দিতি গিছিল? বোধভাতি তোর বাড়তিছে দিন
দিন—তাই না?”

বংশী কিন্তু দমল না। বলরামের হাতখানা ঠেলে সরিয়ে
দিয়ে চীৎকার ক’রে উঠল—“আমার বউ আমি মারতিছি,
তা তোর এতো দরদ উল্লেয়ে উঠ’তিছে ক্যান্? তুই চুপ
ক’রে থাক্।” বলরাম লাফিয়ে গিয়ে বংশীর ঘাড়টা চেপে
ধরল। রাগটা যেন এবার ফেটে পড়ল বলরামের—“যতো
বড়ো মুখ না তোর ততো বড়ো কথা? আজকে তোর
একদিন কি আমার একদিন—”

বলরামের মার-মুখী চেহারার দিকে তাকিয়ে দংশী এবার
ভয় পেয়ে গেল। চুপ ক’রে নিজেকে বেড়ার গায়ে গুটিয়ে
নিল।

বংশীকে ছেড়ে দিয়ে বলরাম একটু দূরে গিয়ে বলল।
হঠাৎ ছেলেরাছয়ের মতন বংশী ভেউ ভেউ ক’রে কঁদে
ফেলল—“আমি ওরে একখান কাপড় কিনে দিতি পারি না,
—প্যাটু ভরে ছুডো খাতি দিতি পারি না,—পাড়ার

মানুষিরে সুনোয়ে সুনোয়ে তাই তো ক’লো এতোকোপ।
কিন্তু কনুতে আ’নে দেবো, সে কথাডা তো ক’লো না
একবার। সব দোষ তো তোরা আমার দেহিস্। স্বরে
আর মোটে কয়ডা ধান আছে। এটা পয়সা নেই হাতে।
আর কয়দিন পরে হাঁড়ি চড়ানি বন্ধ হ’য়ে যাবেনে। সব
ভাবনা বুঝি আমার একার—”

বংশীর কাঁদা যেন বাঁধ মানতে চাইল না।

সুদূর বলরাম কোনো কথা বলতে পারল না। উঠে
দাঁড়িয়ে আন্তে আন্তে পথের দিকে পা বাড়াল।

কেষ্টদের বাড়ী সেদিন রাত্রে সত্য-নারায়ণের সিমি ছিল।
পাড়া বোঁটিয়ে সকলে এসেছে। মুকুন্দি বুড়োরও বাদ
যায়নি। অতোবড়ো উঠোনটা ভরে গেছে। এক পাশে
ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলো কিচিমিচি করছে।
সকলেরই হাতে এক একটা বাটি। সিমির ভাগে বাটিটা
অন্ততঃ ভরে নিতে হবে। নিজের ভাগ। যে সব তাই-বোন
আসেনি তাদের ভাগ। সকলে লোন্টু হ’য়ে ব’সে আছে।

অনেকক্ষণ ধ’রে গানবাজনা চলল। খোল-করতাল
আর কাঁগির শব্দে চারিদিক ভ’রে উঠল। গানবাজনা
খামলে কেষ্ঠর বাবা উমাচরণ গল-বজ্র হ’য়ে আসরের মাঝ-
খানে দাঁড়াল। ভক্তিমুগ্ধ হয়ে প্রণাম করল তারপর
সকলের দিকে ফিরে বলল—“তোমরা সগোলে আইছো।
বেশ শান্তি পালাম মনে। তা এই ঠাউরির খানে দাঁড়িয়ে
তোমাগের সগোলের কাছে আমার এটা পোস্তাব আছে।”

সকলে চুপ ক’রে তাকাল উমাচরণের মুখের দিকে।
উমাচরণ সকলের দিকে আর একবার চোখটা বুলিয়ে নিয়ে
বলল—“কথাডা খালি আমার একার না। সগোলের
অবস্থা ভাব’বই আমি কছি কথাডা। কার স্বরে কি আছে,
আমি জানিনে। তা পুরোপুরি বা’ধে যাওয়ার আগে
আমার মনে কয় সগোলে মিলে এট্টা কিছু মুসোবিধে করা

দরকার। পেত্তাবড়া কি আমি কিছু অনৈষ্য কলাম না কি?’

নকুল এক কোণে ব’সেছিল। নাত্তি-নাতনী নিয়ে সিমিতে এসেছে। উমাচরণ চূপ করতে নকুল উঠে দাঁড়াল। ঠাকুরের ধানে প্রণাম করল। তারপর খানিকটে কেশে গলাটা পরিষ্কার ক’রে নিয়ে বলল—“উমাচরণ যা কইছে, প্রিকৃতই কইছে। এটা কথা কি জানো! ব’সে ব’সে খালি রাজার গোলাও ফুরোয়ে যায়। আর আমরা তো হলাম ক’নের—”

উমাচরণ মাথা ছুঁয়ে বলে—“হয়, হয়, এই কথাডাই আমি ক’তি চাচ্ছিলাম। নকুলদা ঠিক ধরিয়ে আমার পেত্তাব-ড়া।”

বলরাম, বংশী—ওদের দলটা খোল-করতাল নিয়ে আসরের গা ঘেঁষে বসেছিল। উমাচরণ আর নকুলের কথা মন দিয়ে শুনেছিল। ওরা ধামতে বলরাম উঠে দাঁড়িয়ে বলল—“জামাই যে পেত্তাবড়া দেছে, তা আমরা সগোলে মা’নে নেবো। কিন্তুক কথা হচ্ছে যে, যে আকালের বাজার পড়িছে, তাতে যে ছুড়ো পয়সা কোনো গতিকি জোগাড় করা যাতি পারে তা তো মনে হয়না। আমরা সব কাজ করতি রাজী আছি। কিন্তুক কাজ দেছে কেডা আমাদের।”

উমাচরণ দাঁড়িয়ে বলে—“সে কথাও আমি ভাবিছি। এই আকালের বাজারে কালের বড়ো মাঙ্গা—একথা ঠিক। কিন্তুক, তাই বুলে হাত-পাও ছা’ড়ে দিয়ে ব’সে থাকলি তো হবেনা। এটু ন’ড়ে চ’ড়ে দেখতি হবে। তা সগোলের যদি মত হয়, তালি আমি এটা পরামশেশা দিতি পারি।”

সকলে বাড়-নেড়ে উমাচরণের কথায় সাঁয় দিল।

উমাচরণ উৎসাহিত হয়ে বলে—“তালি কথাডা আমি কই। আমার বড়ো জামাইরে তো তোমরা সগোলে চেনো। কঙ্কেপুরির রামচন্দ্রের বড়ো ছল—মহীন্দর। তা

মহীন্দর কঙ্গদিন আগে আইলো ব্যাড়াতি। ওর কাছেই শোনলাম সব বিস্তেস্ত। ওগের গাঁয়ের লোকজনের অবস্থা আরো ব্যাটার। তা ওরা গেরাম-সুদ্ব এক দল বানাইছে। মাটি কাটার দল। বাউলির হাটের নাম শুনিছো তো তোমরা? ঐ বাউলির হাটের পাঁচ কোশ উত্তরে যাইয়ে হলোগে তোমার পুলিশির ধানা। ঐ ধানার পাশ দিয়ে গরমেন্ট রাস্তা বানাচ্ছে। হেই উঁচো তাল গাছের মতন রাস্তা। পেলাই বচ্ছে আসলিও ডোববে না। ওর উপর দিয়ে নাকি ভড়োর ভড়োর ক’রে কলের গাড়ী চ’লবে। রাজ্যির লোক জুটে কাজ করতিছে। পয়সা-কড়ির ঘাটতি নেই। মহীন্দররা শোনলাম—গেরাম সুদ্ব জোয়ানগুলো দল বাঁধিছে। তা আমিও কচ্ছিলাম কি—”

উমাচরণের কথা শেষ হবার আগেই সকলে হৈ-চৈ ক’রে উঠল—“ভালো পেত্তাব কইছো। আমরাও যাবো সগোলে—”

সিমি শেষে বড়োরা অপেক্ষা করল। অনেকক্ষণ ধ’রে আলোচনা চলল। সব বাড়ী থেকে একজন দু’জন করে নিয়ে বড়ো একটা দল হ’ল। কর্মক্ষম কেউই বাধ থাকতে চাইল না। বাড়ী ব’সে উপোষ ক’রে থাকার চেয়ে বেরিয়ে পড়াই ভালো। তাতে যাহোক দুটো পয়সা হাতে আসবে। ছেলেমেয়ের মুখে এক-পেটা আধ-পেটা দুটো মুন ভাত ভুলে দেওয়া যাবে।

নকুল অনেক ভেবে চিন্তে বাজার দিন-ক্ষণ ঠিক ক’রে দিল। বিদেশ বিহু’ই। তারপরে এইরকম একটা কাজে যাওয়া হচ্ছে। একটু দিনক্ষণ বাছতে হয় বইকি। সকলে তাই এসে নকুল বালাকে ঘিরে বসল। নকুল ভেবে-চিন্তে বলল—“ভা’হো, এ হলো গিয়ে তোমার ঠা’হা-বাধার কাজ। এর আর দিনক্ষণ কি। বাবা বুড়ো-শিব আর মা-সুগগার নাম নিয়ে বারোয়ে পড়লিই হ’লো। তউ তোমরা ব্যানে কচ্ছো—তা আমি এটা দিন ঠিক ক’রেই দিছি। আমার

জ্যাঠামশায় বড়ো গুণিন্ লোক ছে'লো। তা ডেনার কাছে 'স্তুনিছি, যাত্রাকালে আর কিছু না জানো, এটা কথা মনে রাখবা। কথাটা হলো গিয়ে তোমার—'মঙ্গলের উষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।'

সকলে জিজ্ঞাসা করেছিল—“কথাটার অর্থ কি ঠাড়া'লো?” নকুল একটু দম নিয়ে বলেছিল—“কচ্ছি, কচ্ছি। অতো ব্যস্ত হইয়ে না। এ-হ'লো গিয়ে শান্তরের বচন। মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভাবতি হয়। হটমুট এটা কইয়ে দিলিই হ'লো না।—তা যা কচ্ছিলাম। কথাটার অর্থ হলো গিয়ে,—পেখমে, মঙ্গলের উষা বুধে পা,—অথাৎ কিনা মঙ্গলবার শায় হয়ে গ্যালো, আর বুধবারে কেবল পা পড়ল,—এই যে সোমায়ডা, এইডা হলো গিয়ে যাত্রাকালের শুভ সোমায়। এ-সোমায় যথা ইচ্ছা তথা যাও, কোনো বিপদ-আপদ হবে না। তা তোমরাও ঐ সোমায়ডাই ঠিক করো।”

সকলে একবাক্যে নকুলের কথা মেনে নিল।

রাত্রে বলরাম অ্বাসীকে বলল কথাটা। মাটি কাটতে যাওয়ার ব্যাপারটা আজ কদিন সকলের মুখে-মুখে পাড়ায় চাউর হ'য়ে গেছে। অ্বাসীও শুনেছে। কিন্তু যাওয়ার তারিখটা জানত না। কাজকর্ম সেরে অ্বাসী শুতে এলে বলরাম কথাটা তুলল,—“স্তুনিছো, আমাদের যাওয়া ঠিক হইয়ে গেছে।”

—“কবে যাচ্ছে তাও ঠিক হইয়ে গেছে নাকি?”—বিছানাটা ঠিক করতে করতে অ্বাসী জিজ্ঞাসা করল।

“হয়, যাওয়ার দিনও ঠিক হইয়ে গেছে। বুধবারে ব্যালা ওঠার সাথে সাথে রওনা দিতি হবে।”

অ্বাসী কোনো কথা বলল না। গড়াতে গড়াতে নারাগের মাথাটা বালিশ থেকে নেমে গিয়েছিল। ওকে টেনে এনে মাথার তলায় বালিশটা সোজা করে দিল। শরের

কোণায় কুপিটা জ্বলছিল। উঠে গিয়ে ফু' দিয়ে নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে ভ'রে গেল ঘরটা। একটু বাদেই ফিকে অন্ধকার চোখ-সহা হয়ে এলো। ঝিরঝির ক'রে একটুখানি হাওয়া বইছে। গোয়াল ঘরের পাশে নেবু গাছটা ফুলে ভ'রে গেছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় গন্ধ ছড়াচ্ছে। খোলা দরজা দিয়ে ফালিখানেক আকাশ দেখা যাচ্ছে।

অ্বাসী আন্তে আন্তে এসে বলল বলরামের পাশে। বলরাম কাছে টেনে নিল অ্বাসীকে। অ্বাসীর শিথিল হাতখানা নিজের কপালের উপর রেখে বলল—“যাওয়ার কথা শুনে কিছু ক'লে না যে!”

অ্বাসী একটুকাল চুপ ক'রে থাকল। বলরামের রুদ্ধ চুলগুলোর মধ্যে আলতো আঙুলে আন্তে আন্তে বিলি দিল। তারপর ছোটো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—“আর কবে বাড়ী আসবা?”

—“তা তো ঠিক ক'তি পারতিছি না। দশজনের কাজ। শগোলের বা মত হবে, তাই করতি হবে। কোন্ হিসেবে কাজ হবে তা তো বোঝা যাচ্ছে না। আর, একবার কাজ জুড়ে দিল বেশী কামাই দেয়া যাবে না। বাড়ী আসতি দেয়ী হ'তি পারে।”

—বলরামের গলাটাও কেমন যেন অস্তমনস্ক হয়ে এলো।

অ্বাসীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলরাম আবার বলল—“কয়ডা দিন পারবা না থাকতি? নারাগ থাকলো। পেসী থাকলো। ঘরজুয়ার গন্ধ-বাছুর সব থাকলো। দেইহে-শুনে পারবা না কয়ডা দিন চালায়ে নিতি?”

নিশ্চুপ অ্বাসীর হাতখানা বলরামের হাতের মধ্যে স্তব্ধ হ'য়ে রইল। ফিকে অন্ধকার আন্তে আন্তে ঘন ঘুমোট হয়ে আসছে। বাতাসের ঝির-ঝিরানিটা এখন আর তেমন টের পাওয়া যাচ্ছে না।

বলরামের উদাস গলার স্বরটা কেমন যেন বিকৃত

শোনালো—“কি করবো কও! কি যে পোড়া আকাল আসলো তাশে। মন্থির অথ-শান্তি বলে আর কিছু রাখলো না। খালি প্যাটের ধান্দায় হ’তে হ’য়ে ঘুরে ব্যাড়াতি হচ্ছে।”

আচলের কোণ দিয়ে অস্বাসী ভিজে চোখ দুটো মুছে ফেলল। তারপর বলরামের হাতখানা নিজের দু’হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে শান্ত গলায় বলল—“তুমি ভাবে না। আমি পারবো থাকতি। বি-শাশে যাচ্ছে। অতো ভাবনা চিন্তে নিয়ে বাইয়ে না। আর, শরীল গতিকির দিগি নক রাইহে কাজ কাম করবা। কারো সাধে ঝগড়া-বিবেদ করবা না”—

মঙ্গলবার রাত্রি থেকেই তোড়জোড় চলল। ভোর হতেই সকলে তৈরী হ’য়ে গেল। সবহুদু দলে হ’ল তিরিশ জন। হাতে একটা ক’রে কোদাল কারো হাতে মাটি বওয়ার ঝুড়ি। কিম্বা রান্না খাওয়ার হাঁড়ি-খালা। আর কাঁধা-বালিশ জড়িয়ে ছোটো একটা নাম-মাস্তুর বিছানার মতন। সঙ্গে কিছু চি’ড়ে আর চাল-ডালও নেওয়া হল। কবে কাজ ছুটবে তার তো ঠিক নেই। কাজ ছুটলে না হয় হাট-বাজার থেকে চাল-ডাল কিনে নেওয়া যাবে। কিন্তু যাবের ক’টা দিন তো চালাতে হবে।

দলটা এসে দাঁড়ালো বলরামের বাড়ীর নীচে। এখানে বেলা উঠতে বেশ খানিক দেরী আছে। একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। গাছে গাছে পাখীগুলো কেবল ডেকে গুঠেছে। ওদের-ও সারা দিনের খাবার জোগাড় করতে হবে। একটা একটা ক’রে ওরা-ও এবার এদিক-ওদিক উড়তে শুরু করবে।

০ বংশী একটুখানি এগিয়ে এসে ডাক দিল—“কইয়ে বল, তোর গোছানি-গাছানি হলো না? তাড়াতাড়ি আর। সগোলে দাঁড়িয়ে রইছে তোর জন্মি।”

বলরাম চোঁচিয়ে উত্তর দিল—“তোরা হাট্টি লাগ। আমি আলাম বলে।” কাঁধা-বালিশের একটা শোঁটলা এনে অস্বাসী বলরামের হাতে দিল। বলরামের পিসী এখন অনেকটা ভালো হয়েছে। ভালো হবার কথা ছিল না। কিন্তু অতুত প্রাণশক্তি বড়ীর। দিব্যি আবার চাঙা হয়ে উঠেছে। লাঠি ভর দিতে দিতে বড়ী এসে বলরামের পাশে দাঁড়াল। কুঁজো শরীরটা একটুখানি। টান ক’রে বলরামের পিঠে একখানা হাত রেখে বলল—“তুই নিশ্চিন্তি হইয়ে যা বাবা। আমি তো থাকলাম। বউ আর নারাগরে নিয়ে আমি সোংসারডা চালায়ে নেবো।”

বলরাম বিছানার পুঁটলি আর ঝুড়ি কোদাল তুলে নিতে নিতে বলল—“এটু নজর রাইহে চলবা। পেনী—আর কবো কি। নারাগরে ডাখবা। রাত-বিরেতে হ’শ্ হইয়ে থাকবা। কোন অস্ববিধে হ’লি নকুলকাকারে থবর দেবা।”

জিনিষ-পজ নিয়ে বলরাম পা বাড়াল। নারাগ ছিল অস্বাসীর কোলে। বলরামকে যেতে দেখে নারাগ কান্না জুড়ল—বাবার সাধে যাবে অস্বাসী যতো ধামাতে চেষ্টা করে, নারাগ ততই আরো জোরে কাঁদতে থাকে। একটুখানি এগিয়ে বলরাম থামল। তারপর আন্তে আন্তে আবার ফিরে এলো। কাঁধ থেকে ঝুড়ি কোদাল নামিয়ে নারাগকে কোলে তুলে নিল। নারাগের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—“তোমার তো একফোটা বুদ্ধি নেই বাবা! গোবোধের মতন কান্দতিছো খালি। অতো কান্দতি হয় না কি? আমি তো তাড়াতাড়ি চলে আসবো আবার। তুমি ঠান্ডার কাছে ভালো হ’য়ে থাকবা। তোমার জন্মি এটু খোড়া কিনে নিয়ে আসবো। আর কান্দে না—ক্যামোন? মার কোলে ষাও এবার—।”

বলরামের সান্ধনায় নারাগ চুপ করল। অস্বাসী হাত বাড়িয়ে বলরামের কোল থেকে নারাগকে নিজের কোলে

টেনে নিল। জিনিষপত্র নিয়ে বলরাম আবার এগিয়ে চলল। বলরাম খানিকদূর এগিয়ে গেলে নারাণকে কোলে নিয়ে সুবাসীও একটুখানি এগিয়ে চলল। হঠাৎ নারাণ চীৎকার করে উঠল—“বাবা, বরো এটা ঘোরা নিয়ে আগবা—”

বলরাম অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়েছিল। নারানের ডাক শুনে ফিরে দাঁড়ালো। গলাটা চড়িয়ে বলল—“হয়, আনবো। তোমার জন্মি ঘোড়া কিনে আনবো। এবার তোমরা বাড়ী যাও।”

বলরাম আর দাঁড়াল না। পিছন ফিরে হনু হনু করে এগিয়ে চলল। দলটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ওদের ধরতে হবে। জোর পায়ে অনেকটা পথ পার হয়ে এলো বলরাম। হঠাৎ কেমন যেন বড়ো ক্লান্ত মনে হতে লাগল নিজে। পা দুটো জড়িয়ে আসতে চাইছে। কি মনে করে আবার পিছন ফিরে তাকালো। তাকিয়ে দেখল, ভাগাড়ের উঁচু টিপিটার পরে একটা কল-গাছের তলায় নারাণকে কোলে নিয়ে সুবাসী তখনো দাঁড়িয়ে আছে। একটু-ও নড়ছে না। অপলকে এই দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

একটা ঠোঁটের সঙ্গে আর একটা ঠোঁট শক্ত করে চেপে ধরল বলরাম। জোর করে চোখ দুটো ফিরিয়ে নিল পিছন থেকে। তারপর জোরে জোরে পা ফেলল সাননের দিকে।

(ক্রমশঃ)

অনিম্ন নান্দেন

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩৫০ টাকা

“...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিষ্কার করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বভ্রাতৃত্ব। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।”
... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১২৫

“...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া ‘নান্দ পন্থা বিজ্ঞতে অন্নায়।’ (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে
এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী—৩০৯, গাজুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd.
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

* * *

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

* * *

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY - 1



মন আজ
খুশিতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার
অব্যর্থ মহোষ প্রাতিদিন আহারের পর
দুইবার করে দু'চামচ মুন্ডসজীকীর সঙ্গে
চার চামচ মহাদ্রাকারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) পাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাঁধনা ঔষধালয় ঢাকা



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এক, সি, এস, (লণ্ডন),
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাঙ্গলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদচর্চা।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গুটি কল্লের কথা

শশধর সিংহ

আমি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। কবি-গুরুর সান্নিধ্যে আমার সৌভাগ্য হয়েছে এবং তাঁর শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি বিশদভাবে আলোচনা কবেছি আমার লেখা “Social thinking of Rabindranath Tagore” (Asia Publishing House, 1962) পুস্তকে। স্বত্বের বিষয় এই যে, এই বইটা দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। বস্তুতঃ এটা প্রকাশিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই, লন্ডনের Times Literary Supplement সমালোচনা করতে গিয়ে ১৫ই জুন সংখ্যায় লিখেছিল, “...Dr. Sinha's analysis of the strength and defeciencies of Tagore's educational ideas is particularly noteworthy....”

Autres temps autres moenrs

আজ দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে, শান্তিনিকেতনের গুরুত্ব বেড়েছে বই কমেনি; সুতরাং একে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং কি কি পরিবর্তন করলে পর ইহা দেশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণের বস্তু হ'তে পারে তা সবার ভেবে দেখা কর্তব্য। কারণ, শান্তিনিকেতন আজ ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নয়, এর ভবিষ্যৎ প্রগতি সর্ব দেশের দায়িত্ব।

রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় দুঃখ করে বলতেন যে তাঁর আশ্রমের ছেলেদের কিছু বলবার নাই, তারা প্রশ্ন করতে শেখেনি। এ কথাটা হয়ত সত্য হলেও, ছাত্রদের পক্ষে এই নীরবতা যে অতি স্বাভাবিক, তা তিনি কোনদিন বিচার করে দেখবার চেষ্টা করেন নি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে,

তিনি তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধী চিন্তাধারার জন্ত রুসোর কাছে এত ভাবে ঋণী! তথাপি, অন্ততঃ এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ রুসোর মতামত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে গেছেন।

সংক্ষেপে, রুসো তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ পুস্তক “Emile”তে লিখে গেছেন যে, শিক্ষক সাধারণতঃ অল্প বয়স্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে বয়সের বৈষম্য অত্যধিক না হলে ছাত্ররা শিক্ষকের সঙ্গে সহজ ভাবে আলাপ আলোচনা করতে সমর্থ হয়। তাই, তিনি মনে করতেন যে, শিক্ষকের বয়স অপেক্ষাকৃত বেশী হলে ছাত্ররা এই হযোগ ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়। এমন ক্ষেত্রে, তারা শিক্ষককে শ্রদ্ধা দিতে পারে সত্য, কিন্তু তাদের নিজস্ব চিন্তার আদান প্রদান করতে দ্বিধা বোধ করতে পারে। সেই ক্ষুদ্র বয়স্ক শিক্ষকের প্রতি তাদের মিশ্রিত মনোভাব সহজে বোধগম্য।

নিঃসন্দেহ, শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সঙ্গে কবির যোগাযোগ ছিল মূলতঃ শ্রদ্ধার, আশ্রমের ছেলেরা যে তাঁকে ভালবাসত না তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; প্রকৃত পক্ষে, তাঁর প্রতি তাদের গভীর অমুরক্তি ছিল। তথাপি, একটা কথা সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি ছিলেন তাদের গুরুদেব—ছাত্রদের অনেক উর্দ্ধে—শিক্ষক হলেও।

তাঁর সঙ্গে ছাত্রদের বয়সের পার্থক্য তো ছিলই। যথার্থতঃ, এই প্রভেদটা উপেক্ষা করা অসুচিত হবে। তাই, যে সব ছাত্রছাত্রী তাঁর সঙ্গে অবাধে নানা বিষয়ে আলাপ করতে পারত—আর তিনি তাদের প্রতি প্রশংসা হতেন—স্বীকার করতেই হবে যে, এই প্রগলভতা অনেকাংশ কৃত্রি-

মতের দোষে দুষ্ট ছিল। শিক্ষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ইহা হয়ত অস্বাভাবিক ছিল।

রবীন্দ্রনাথ কাব্যে তরুণ পদ্বী ছিলেন। তিনি লিখেছেন,

“ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা

ওরে সবুল, ওরে অবুঝ,

আধমরাবের ঘা দিয়ে ভুই ঝাঁচা।”

কিন্তু কাব্যে তরুণের প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও, শিক্ষা বিষয়ে তিনি ছিলেন মূলতঃ প্রাচীনের অমুরাগী। পরবর্তীকালে তিনি বর্তমান শিক্ষা বিজ্ঞান ও পদ্ধতি সম্বন্ধে পশ্চাত্য থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর শিক্ষা বিষয়ক আদিম বুনিয়াদ ছিল পুরাকালে—প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে।

১৯২১ সালে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা হবার পূর্বের যুগকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রচেষ্টার দিক দিয়ে, দুই অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। তিনি যখন প্রথম শিক্ষা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, সেই যুগকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্ব আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই পর্বে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর কোন অস্পষ্ট ধারণা ছিল না বললেও ভুল হবে না। তিনি এইমাত্র জানতেন যে, গতানুগতিক প্রাণহীন শিক্ষা ব্যবস্থার নিপীড়ন থেকে শিশুদের রক্ষা করা আবশ্যিক। এই অভিপ্রায়টাই তাঁর বাল্যজীবনের শিক্ষার অভিজ্ঞতারই একটা প্রতিফলন, বলা-বাহুল্য। শিশু রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের অস্থায়ী স্মৃতির সহিত অনেকেই পরিচিতি আছেন সম্মেহ নাই।

বোলপুরকে কবি তাঁর শিক্ষায়তনের পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থান বলে বিবেচনা করলেন, দুই কারণে। এইখানেই তাঁর পিতৃদেব “মনের আরাম, প্রাণের আনন্দ ও আত্মার শান্তি” পেয়েছিলেন। অতরাং বর্তমান শান্তিনিকেতন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। আর তখনও শান্তিনিকেতনের আদিম বস্ত্র ভাব বর্তমান

ছিল। তপোবনের শিক্ষার পক্ষে ইহা অপেক্ষা কোন স্থান শ্রেষ্ঠতর হতে পারত ?

এখানে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করার আরেকটা কারণ ছিল—তাঁর আর্থিক অনটন।

প্রকৃতির কোলে, স্বৈহের পরিবেশে ও গুরু সান্নিধ্যে সহজ জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার পক্ষে এ ছিল আদর্শ স্থল। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তখন এর চেয়ে অধিক কিছু করা সম্ভব হ’ত না।

বন্ধুবান্ধবদের শিশুদের নিয়ে তিনি অধ্যাপনা শুরু করলেন। কবির সাহিত্য সম্ভার ও সঙ্গীতই ছিল তখন এই বিদ্যালয়ের প্রধান মূলধন।

শুটি কয়েক ছাত্র নিয়ে এই ভাবে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ’ল এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, স্বাধীনতা ও কৃষ্টির পরিবেশই শৈশবে ছাত্রদের পক্ষে যথেষ্ট। এই বিশ্বাসকে ভ্রাস্কর্য বলতে পারি না। কারণ, ঐ অল্প বয়সে স্বাধীনতা, সৌন্দর্য ও বয়স্কদের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতাই শিশুদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কাম্য ও লোভনীয় বস্তু। বলা নিম্প্রয়োজন যে, তখনকার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্ররা এগুলি বহুল পরিমাণে পেয়েছিল।

পরবর্তীকালে সমাজের চাপ ও জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা যখন অনুভূত হ’ল, তখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ক্রমে বর্তমান শান্তিনিকেতনে পরিবর্তিত হ’ল। এই হল তাঁর শিক্ষা প্রচেষ্টার দ্বিতীয় অধ্যায় এবং এটাই হ’ল বর্তমান শান্তিনিকেতন পর্বের প্রারম্ভ।

কিন্তু ইতি মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্বদেশী আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টার অসাক্ষ্য ফলে, শান্তিনিকেতন দেশের অন্তান্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ের মধ্যে আরেকটা বিদ্যালয় মাত্র হয়ে উঠল। তখন থেকে ছাত্রদের লেখাপড়ার প্রধান লক্ষ্য হ’ল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়া। এই পরিণতি খুব

স্বাভাবিক। সমাজের দাবীকে উপেক্ষা করা কোন শিক্ষায়তনের পক্ষে সম্ভব নয় এবং এই দাবীকে অগ্রাহ করার চেষ্টা করলেও সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

আগেই বলেছি যে, পুরাকালের আদর্শ থেকে রবীন্দ্রনাথ যতই বর্তমান শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট হলেন ততই তিনি প্রগতিশীল পাশ্চাত্যে অমুপ্রেরণা খুঁজতে লাগলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে যুরোপীয় শিক্ষাব্রতী মাত্রই শিক্ষার অমুপ্রেরণা পেয়েছিলেন রুসোর "Emile" থেকে। এই সম্পর্কে, পেস্তালজির (Pestalozzi) নাম সব প্রথমেই মনে পড়ে। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথও যে রুসোর আদর্শে অমুপ্রাণিত হবেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? এই প্রশ্নে, কবির রচিত "My School" দ্রষ্টব্য। আরেকটা কারণ থাকতে পারে যে, রুসোর শিক্ষার আদর্শ ও চিন্তার সহিত তাঁর স্বতঃই সহানুভূতি ছিল। কারণ, এগুলিকে অনায়াসেই প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া সম্ভব হ'তে পারত।

সুতরাং, শান্তিনিকেতন দেশের অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত হয়ে গড়ে উঠলেও এর মধ্যে তপোবনের আদর্শ অনেকটা রয়েছে। এই সমস্যার মধ্যেই শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, বিদ্যালয় হিসাবে শান্তিনিকেতন সাফল্য লাভ করেছে কি না? বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নের একমাত্র প্রকৃত জবাব হ'তে পারে নগ্ণরূপ (negative)। কবির সান্নিধ্যে, তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীতের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হওয়ার দরুন শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা একটা কৃষ্টির চাকচিক্য পেয়েছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু শান্তিনিকেতন কোন কালে একটা উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয় হয়ে গড়ে উঠতে পারে নাই।

এই অসাক্ষ্যের বিবিধ কারণ আছে এবং বর্তমান কালে কবির অমুপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের এর

সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আর, ধারা এই বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাশীল, তাঁরা এই বিষয়ে ক্রিয়াশীল চিন্তা দিয়েই গুরুদেবের স্মৃতিকে সজাগ ও সক্রিয় রাখতে সমর্থ হবেন। প্রকৃত পক্ষে, এটা হ'ল জাতীয় কর্তব্য।

একটা সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে, শান্তিনিকেতন স্থাপিত হয়েছিল এবং কালে রবীন্দ্রনাথ রুসোর আদর্শও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এ কথা গুরুদেব যে জানতেন না তা নয়, তবে সামর্থ্য ও উপযুক্ত সহায়কের অভাবে, নতুন চিন্তাধারা ও পদ্ধতি তিনি তাঁর শিক্ষায়তনের সঙ্গে গাঁথে দিতে পারেন নি।

নিঃসন্দেহ, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন যে, শান্তিনিকেতনকে পাশ্চাত্য ও জাপানের আদর্শে উচ্চতরের বিদ্যালয়ে পরিণত করতে পারলেই, এই বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, ফ্রান্সের grande ecole, ইংল্যান্ডের public school বা জাপানের যুদ্ধপূর্ব Koto-gakko, অন্ততঃ পদ্ধতির জ্ঞান, শান্তিনিকেতনের আদর্শ হতে পারে।

জাপানের প্রসিদ্ধ সংবাদিক শ্রীযুক্ত কাওয়াইয়ের কথায় Koto-gakko স্থাপিত হয়েছিল মুখ্যতঃ "to produce leaders and thinkers of the most superior caliber (ইংরাজীতে calibre)."।

এই হেতু, ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়ে কেবল মেধাবী ছাত্রদেরই স্থান হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাপানের মত এরা সব সময়ে - প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই, শান্তিনিকেতনে যোগদান করার অধিকারী হবে। বলা বাহুল্য, এখন হতে এখানকার শিক্ষার প্রধান মানদণ্ড হবে বুদ্ধি, চিন্তার মৌলিকতা ও অধ্যয়নশীলতা। শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা প্রকৃতির কোলে বর্দ্ধিত হবার সুযোগ পাবে সত্য,

কিন্তু এই স্বাধীনতা হবে সংযত (disciplined) স্বাধীনতা এবং ছাত্রদের মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ। পরবর্তী জীবনে, এইরূপ শিক্ষা পেলে, এরাই দেশের চিন্তানায়ক ও কর্মবীর হয়ে উঠবে। বস্তুতঃ, পাশ্চাত্যে ও জাপানে শিক্ষা ও কর্মশীলতার মধ্য দিয়েই উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয়গুলির ছাত্ররা তাহাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আজ স্বাধীন ভারতে লক্ষ্য-হীন শিক্ষার কোন স্থান থাকে উচিত না। কেবল রবীন্দ্র সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার মাধ্যমে এই জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শ কোনকালে পরিপূর্ণ হতে পারে না, বলা বাহুল্য। এটা শোনা য় থাকারাপ, কিন্তু আজ সময় এসেছে যখন আমাদের সর্ব জাতীয় সমস্যা নির্ভয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা চাইতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি গান্ধীবাদ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা প্রত্যেকের স্মরণ রাখা কর্তব্য। তিনি লিখেছেন, "From the master the Mahatma we must learn the love of truth in all its purity, but the science and art of building up Swaraj is a vast subject.... For this task, aspiration and emotion must be there, but no less study and thought must be there likewise. For it, the economist must think, the mechanic must labour, the educationist and statesman must teach and contrive. In short, the mind of the country must exert itself in all directions."

...Above all, the spirit of enquiry must be kept intact...Its mind must not be made inactive by compulsion, open or secret."

স্বীকার করি যে, জীবনে সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার প্রয়োজন আছে এবং রবীন্দ্রনাথের জীবিত অবস্থায়,

শান্তিনিকেতনের বিশেষত্ব রক্ষা করার জন্য এগুলির প্রয়োজনীয়তাও ছিল। কিন্তু আজ কবিগুরু অবর্তমান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বিশ্বভারতীর দায়িত্ব স্তম্ভ হয়েছে। সুতরাং, শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা যাতে অস্তিত্ব উন্নত ও প্রগতিশীল দেশের ছাত্রদের মত প্রকৃত, অর্থাৎ কঠিন শ্রমাল ও সংযমের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার এবং আশা করা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে মনোনিবেশ করবেন।

ভাষা ভাষা জ্ঞান এই নতুন যুগের অমুপযুক্ত। প্রকৃত পক্ষে, এই যুগে তাঁদেরই যথার্থ জ্ঞান হতে পারে যারা সর্ব-বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করেছেন এবং অন্ততঃ একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে সমর্থ হবেন। কেবল ভাবুকতা দিয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় না।

আমাদের ছাত্রদেরও সব উন্নত দেশের সমকক্ষ হতে হবে এবং এই আদর্শটা সামনে রাখতে পারলেই যে, কালে আদর্শটা উপলব্ধি করা যাবে, তা আমি বিশ্বাস করি।

আমি বিদেশে প্রায় সারা জীবন কাটিয়েছি। অনেক দেশ দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশেছি। কিন্তু এঁরা যে ভারতীয়দের চেয়ে বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ তা কোন মতেই স্বীকার করতে পারি না। তথাপি, যে জিনিষটা সব সময়েই অনুভব করছি, তা আমাদের সাধারণ ছাত্রদের মনের আবিলতা, কোন বিষয়কে শৃঙ্খলার সহিত ভাবা বা লক্ষ্য স্থির করে তাহা করবার অক্ষমতা। অল্প কথায়, যে বিষয়ে পাশ্চাত্য ও হুদ্র প্রাচ্যের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ আমাদের ছাত্রদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে হচ্ছে এদের চিন্তার ও কর্মের method—তাঁদের চিন্তার শৃঙ্খলা ও কর্মের নিয়মানুবর্তিতা। এই গুণগুলি আয়ত্ত করতে পারলেই, ভারতীয়রা অল্প দেশের তুলনায় কোন অংশে পশ্চাদপদ হবে না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

"সত্যতার সন্ধি"এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ভারতবাসী

যে বুদ্ধি সাগর্যে কোন অংশে জাপানীদের চেয়ে নূন, একথা বিশ্বাস যোগ্য নয়।' এই উক্তি সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিম্নয়োজন, কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে, শিক্ষার ও কর্মে জাপানীরা আমাদের অনেক পশ্চাতে ফেলে গেছে, তাদের চিন্তার শৃঙ্খলা ও কর্মের নিয়মাবলি দ্বারা। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই গুণগুলি এরা পেয়েছে, প্রধানত: তাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে।

সেই জন্ত, এরা কোন অবস্থাতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। যা করণীয় তা তারা অম্লান বদনে করে গেছে। বুদ্ধির বড়াই করার কোন প্রয়োজনীয়তা এরা বোধ করেনি। প্রকৃত পক্ষে, শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধি জুড়ে দিতে পারলেই সেই বুদ্ধি ক্রিয়াশীল হয়। নতুবা, বুদ্ধি লাগাম ছেঁড়া ঘোড়ার মত সমাজের অকল্যাণের কারণ হয়ে উঠে।

লক্ষ্যহীন বুদ্ধিকে অনেক সময় আমরা বিপ্লবী মনোবৃত্তি বলে মনে করি; যথার্থত: এটাকে anarchist বা উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি বললে সত্যের অপলাপ করা হবে না।

এ যাবৎ আমি কেবল ছাত্রদের কথাই বলে এসেছি, ছাত্রীদের কথা বলি নাই। এর কারণ আছে। এই প্রসঙ্গে প্রায় সব দেশের শিক্ষাত্রতীরা স্বীকার করে থাকেন যে, জীবনের এক পর্বে শিক্ষা বিস্তারন অমুসারে, ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক ও মানসিক পার্শ্বক্য অগ্রাহ্য করা সমীচীন নয়। অর্থাৎ প্রাথমিক পর্বে, শিশুরা লিঙ্গ নির্বিশেষে একত্র শিক্ষা পাবে। সব উন্নত দেশেই এ বিষয়ে এদের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না। একত্র শিক্ষা পাওয়ার দক্ষণ এদের শিক্ষার ও জীবনে কোন হানি হয় না। বরঞ্চ এক সঙ্গে বদ্ধিত হওয়ার পক্ষে অনেক সহুষ্কি প্রদর্শন করা যেতে পারে।

কিন্তু সমস্তাটা ওঠে যৌবনের প্রারম্ভে এবং সব দেশেই উঠে থাকে। সকলেই প্রায় একমত যে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়ে বাশক বালিকাদের পৃথক

শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইরূপ প্রভেদ করলে পর উভয়েই লাভবান হয়।

অবশ্য, বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একথা খাটে না। সব প্রগতিশীল দেশেই, এরা একত্র অধ্যয়ন করে থাকে। এই আয়োজন শিক্ষার দিক দিয়ে কোন ক্ষতি করে না, অন্তত: করা উচিত নয়।

প্রকৃত শিক্ষা পেলেই, ছাত্রদের জীবনে সংযম আগবে এবং এই সংযম (discipline) থেকে সময় জাতি লাভবান হবে এই শিক্ষা তাদের জীবনকে লক্ষ্য দান করবে যা এখনকার নিকৃষ্ট স্তরের শিক্ষা দিতে অসমর্থ হয়।

সেই জন্ত শান্তিনিকেতনের শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি অনেকাংশে পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন, যাতে করে নতুন আদর্শ ও পদ্ধতি অবলম্বন কবে শান্তিনিকেতনে শিক্ষিত ছাত্ররা বর্তমান জগতের উপযোগী হতে পারে, যা জাপানী ছাত্ররা হয়েছে।

আধুনিক জাপানের প্রথম দিক হতেই, অর্থাৎ ১৮৬৮ সালে মেইজি তথা মিকাদো শাসনের পুন: প্রবর্তনের পর হতে, জাপানী শিক্ষার প্রসারকে জাপান প্রগতির পরিচায়ক বলে বিবেচনা করেছে। অধিকন্তু, সব সময়েই এদের শিক্ষার মানদণ্ড হয়েছে pragmatism, অর্থাৎ যা কার্যকরী সমাজের উপযোগী, যা দৈনন্দিন জীবনের উপযুক্ত।

অতীতকে, বিশেষভাবে উল্লেখ করার বিষয় এই যে, জাপানের নেতারা শিক্ষার স্বাধীনতা বা এতাদৃশ অবাস্তব সমস্তা নিয়ে মাথা ঘামাননি। তাই, কার্যকরী শিক্ষা জাপানীদের শক্তিশালী করেছে, এবং অতি অল্প কালের মধ্যেই এরা সর্ব বিষয়ে উন্নতি লাভ করেছে। স্তুরাং, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও, আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জাপান অত্যন্ত রাষ্ট্র বলে গণ্য হয়েছে। অথচ, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একথা বলা চলে না।

আমার বিবেচনায়, আমাদের পশ্চাতপন্থতার একটা

বিশেষ কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রথম থেকেই জাপানীদের মত প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রধান স্থান না দিয়ে, আমরা উচ্চ শিক্ষার উপর জোর দিয়েছি।

এই জোর দেওয়ার ফলে, শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থায় অল্প-সংখ্যক লোক লাভবান হয়েছে সত্য, কিন্তু এতে সমাজে শিক্ষিত অশিক্ষিতের ও উচ্চ নীচের প্রভেদ ক্রমেই বেড়ে চলেছে বই কমেনি। ভারতবর্ষ যে তিমিরে সে তিমিরে রয়ে গেছে।

আজ জাপানের মত আমাদের সমগ্র জাতি শিক্ষিত হলে, আমরা নিশ্চয়ই কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে এত অগ্রসর হতাম না, আমাদের জাতীয় কৃষ্টির স্তর তো উচ্চ হতই।

জাপানীরা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তির উপর তাদের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপনা করেছে। এইরূপ শিক্ষা দ্বারা শ্রেণী নির্বিশেষে, পরীক্ষা মূলক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে, ব্যক্তি হিসাবে জাপানীরা সমাজের ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে।

এই প্রকারে সমগ্র জাপানী জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, অথচ আমরা সোসেলিজমের কচকচি করা সত্ত্বেও, একটা বিভক্ত জাতি রয়ে গেছি।

জাপানে, ধনী নির্ধন বা শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই বলতে পারি না, কিন্তু এই প্রভেদের মূল সামাজিক বা অর্থগত বৈষম্য নেই। সব নির্ভর করে, ব্যক্তিগত ভাবে জাপানীরা এই অর্থগত সাম্য কি ভাবে ব্যবহার করেছে, তার উপর।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে প্রধানতঃ কবির দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন। তাই, শিক্ষা যে একটা বিজ্ঞান এবং এটাকে মুখ্যতঃ যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়েই দেখা উচিত, তা তিনি মনে করতেন না। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী দেখলেই তাঁর মনোভাব বোঝা যায়।

শিক্ষা বিজ্ঞান যে শিক্ষণীয় তা তিনি স্বীকার করতেন

না। এই প্রসঙ্গে, একটা দৃষ্টান্ত আমার চিরকাল মনে থাকবে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি বিলাত যাচ্ছি শুনে একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানে গিয়ে আমি কি পড়ব। আমি বললাম যে, সেখানে আমার “এডুকেশন পড়বার ইচ্ছা আছে।” এই শুনেই তিনি হেসে বলেন, “এডুকেশন কি পড়ে শেখা যায়? শিক্ষার প্রতি যাদের প্রকৃত প্রীতি নাই, তাঁরা শিক্ষক হতে পারেন না।” এই উক্তি মধ্য খানিকটা সত্য যে নাই, তা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলে রাখা প্রয়োজন যে ‘প্রাকৃতিক’ (natural) শিক্ষকের উপর নির্ভর করে কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে নাই। সেই জন্য, প্রত্যেক উন্নত দেশেই শিক্ষার কৌশল (teachers’ training) আয়ত্ত করার জন্য এত বিপুল প্রয়াস করা হয়েছে। সাধারণ নরনারীর পক্ষে এই কৌশল আয়ত্ত করা সম্ভব হয়, শিক্ষা ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তাই দেখি যে, আমেরিকানদের সাহায্য নিয়ে, এক সময়ে teachers’ training জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থায় এত উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। Normal School বা College খুলে, জাপানী নেতারা শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের পক্ষে শিক্ষা বিজ্ঞান আয়ত্ত করার জন্য দেশব্যাপী আয়োজন করেছিলেন। সেই জন্য, এঁদের শিক্ষা ব্যবস্থা এত প্রগতিশীল হয়েছে। এঁরা কখনও ‘হাতুড়ে’ (untrained) শিক্ষকদের উপর নির্ভর করেন নি।

অল্প দিকে ফ্রান্সেও দেখতে পাই যে, এক সময়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপককেও প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছিল। অতরাং ফ্রান্সের শিক্ষা ব্যবস্থা যে উৎকৃষ্ট হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই।

শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণ শিক্ষার মানদণ্ড দিয়ে বিচার করলে পর, শান্তিনিকেতনের

প্রাক্তন শিক্ষকরা মোটামুটি অযোগ্য শিক্ষকই ছিলেন, এমন কি এঁদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তম শিক্ষকও ছিলেন বলে অনুভূতি হবে না, কিন্তু মজার প্রয়োজন ৭ ছয় প্রকারের।

শান্তিনিকেতনকে উন্নত দেশগুলির মত একটা উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয়ে পরিণত করা যদি সাব্যস্ত হয়, শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ শিক্ষকরা উচ্চ শিক্ষক তো হবেন বটেই, যুগপৎ শিক্ষণ প্রাপ্ত (trained) শিক্ষকও হবেন। এঁরা কেবল যে পড়াবেন তা নয়, ছাত্রদের কাছ থেকে পড়াও আদায় করবেন। এই প্রসঙ্গে, অধ্যয়নের উপর শিক্ষকদের তত্ত্বাবধান বিশেষ আবশ্যিক। বলা বাহুল্য, ছাত্র স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা আমি উপেক্ষা করছি না, কিন্তু ছাত্রদের পক্ষে অধ্যয়নের সংঘম ও অভ্যাস আয়ত্ত করা চাই প্রথম থেকে। তা হলেই এদের শিক্ষা হবে পূর্ণ শিক্ষা।

এই সম্পর্কে শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ অধ্যক্ষেরও বিশেষ দায়িত্ব থাকবে। তিনি একাধারে দক্ষ শিক্ষক ও শৃঙ্খলা রক্ষক হবেন। এই হলেই তিনি উভয়েরই প্রয়োজন উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন এবং ফলতঃ তাঁর শৃঙ্খলা রক্ষার কর্তব্য অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

বর্তমান যুগে প্রাচীন বা প্রাচীন প্রথাকে অবস্থা নির্বিশেষে আঁকড়ে ধরে থাকবার কোন অধিকার নেই। আমাদের সবাইকে আধুনিক জগতেই বাগ করতে হবে; অতরাং আমাদের ছাত্ররাও যাতে এই জগতে বাগের উপযুক্ত হতে পারে, তার জন্য প্রস্তুত হওয়া অত্যাৱশ্যক।

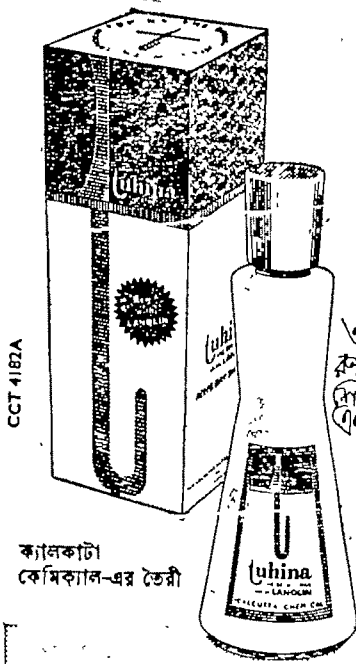
সর্বশেষে, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে দুয়েকটা মন্তব্য করেই আজকের মত আলোচনা শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে, এই দুই প্রতিষ্ঠানই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে গড়ে উঠবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁর এই অভিলাষ ইচ্ছামুখারী পূর্ণ হয়নি। প্রকৃত পক্ষে, প্রস্তাবিত নতুন ভিত্তিতে শান্তিনিকেতন পরিবর্তিত না হলে, তাঁর এই অভিলাষ চিরকাল অপূর্ণ থেকে যাবে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা পূর্ণ আধুনিক শিক্ষা পেলেই, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন দুইই লাভবান হবে। এই ছাত্ররাই এদের ভবিষ্যৎ রূপ জোগাবে এবং ভবিষ্যতে এরাই বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের গৌরব বর্ধন করবে কর্ণে, অধ্যয়নে ও গবেষণায়।

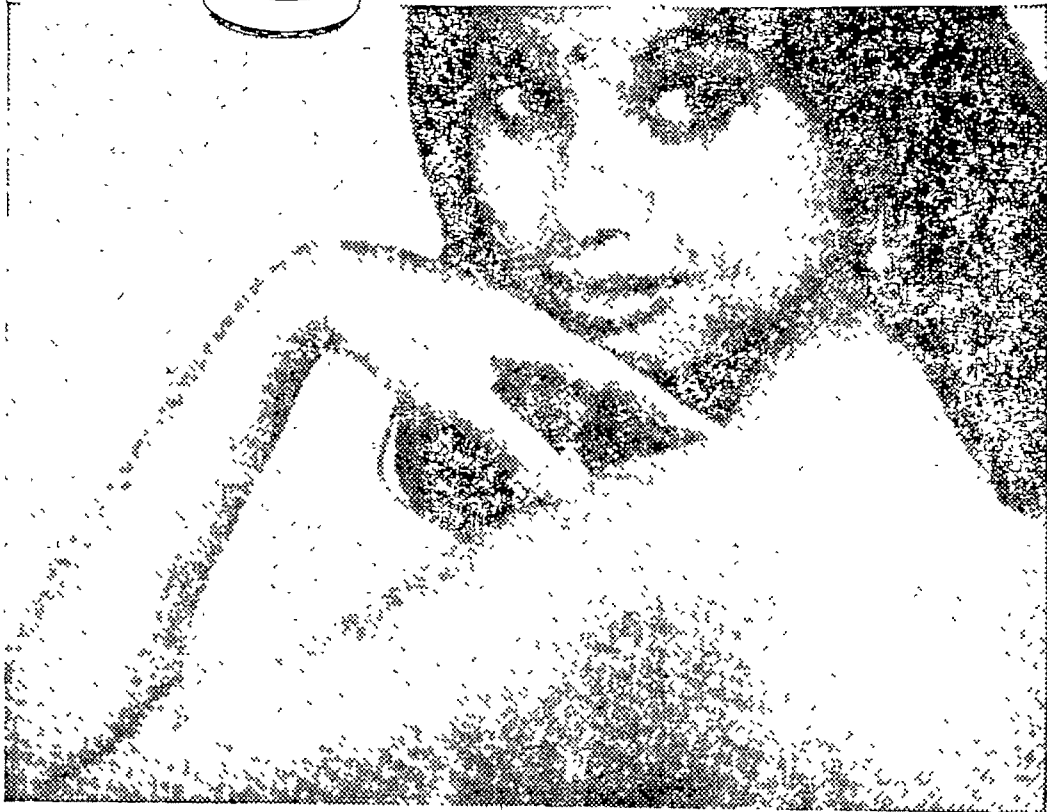
ল্যানোলিন মেশানো

নতুন **তুহিনা** বিউটি ফিল্ড

আরো ভালোভাবে মুখ ও
গা-হাত-পা ফাটা বন্ধ করে...
সারা শরীরে এনে দেয়
স্বচ্ছ কমলীয়তা !



নতুন তুহিনায় আছে ল্যানোলিন আব ময়েশ্চারাইজার—মৃৎগ, সুলভ চামড়ার জন্য এ দুটি জিনিস না হলে নয়। তুহিনা চামড়ার ভেতরে চলে গিয়ে চামড়ার স্বাস্থ্য কেবায়, সৌন্দর্য বাড়ায়—মুখ ও গা-হাত-পা ফাটার সমস্যা থেকে বেহাই দেয়। চামড়া কোচকানো কিংবা বসন্তসে হওয়া অম্মো ভালভাবে বন্ধ করে। সারা শরীরে শিশির-স্বচ্ছ কমলীয়তা নিয়ে আসে। আগনার মুখে, গলায়, কীধে, হাতে, কনুইয়ে, পায়েব পাতায় আব গোড়ালিতে (শরীরেব যে যে জায়গা সন্তচেবে বেশী খসখসে হয়) তুহিনা রাগুন। দেখবেন, ল্যানোলিন ও ময়েশ্চারাইজার মেশানো নতুন তুহিনা ক্রেকব জৌহুস ক্ষিমে দিয়েছে। প্রতিদিন রানের পব আব শোবার আগে নিষমিত তুহিনা রাখতে উলবেন না। মনে রাখবেন, মুখ থেকে পায়েব গোড়ালি—সারা শরীরেই সন্ত সেষ তুহিনা।



বর্তমান প্রসঙ্গ

হায়দারাবাদ কংগ্রেস

হায়দারাবাদ কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে এবং সভাপতির ভাষণে ধর্মকানি এবং শাসনিত্র প্রাচুর্য থাকলেও আত্ম-বিল্লম্বণের নত্বতা ও বিনয় খুব কমই স্থান পেয়েছে। রাজনৈতিক প্রস্তাবে অ-কংগ্রেসী সরকারগুলির বিরুদ্ধে কার্যত মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে এবং অ-কংগ্রেসী সরকারের দ্রুত অবসানের জন্য অস্পষ্ট ইঙ্গিতও প্রস্তাবে নিহিত রয়েছে। গোড়ায় প্রস্তাবের খসড়ায় সকল অ-কংগ্রেসী সরকার, কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবের লক্ষ্য থাকলেও মাদ্রাজ, কেরালা ও উড়িষ্যায় সরকারের নিশ্চিত স্থিতির স্বীকৃতি খসড়ার পরিবর্তন ঘটায়। ফলে সকল অ-কংগ্রেসী রাজ্য প্রস্তাবের লক্ষ্য না হয়ে কতকগুলি অ-কংগ্রেসী রাজ্য প্রস্তাবের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুক্ত ফ্রন্টগুলির অবিরোধিতা, বিপরীতমুখী লক্ষ্যের টানাপোড়েন, ফ্রন্টের অপরাপর শরীকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজ শক্তিবৃদ্ধি প্রভৃতি স্বাভাবিক-প্রতিঘাতগুলি মুক্তফ্রন্টের সর্বনাশ সাধন করেছে—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। মুক্ত-ফ্রন্ট সফল করবার ধ্বনি তুলে মুক্তফ্রন্টের প্রবল শরীকেরা প্রবলতর হয়েছে এবং দুর্বলরা আরও দুর্বল হয়ে বহুলাংশে অলক্ষ্যে আত্মঘাতী নীতির আশ্রয় নিয়েছে। একথাও সত্য যে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না এমন বহু দল মুক্তফ্রন্টের আশ্রয়ে শক্তিবৃদ্ধি করে ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলতার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের সমাধি রচনার জন্য উত্থোগী হয়েছে। এ-ছাড়া মুক্তফ্রন্টের অদীভুত কোনো কোনো দল ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি লঙ্ঘন করে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার বিষ লঙ্ঘারিত করে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতিতে সহায়তা করেছে।

অ-কংগ্রেসী সরকারগুলিকে তীব্র ভাষার আক্রমণ করে প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে যে এই সরকারগুলি প্রশাসনের প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রহণে হয় অস্বীকার করেছে না হয় চূড়ান্ত অক্ষমতা দেখিয়েছে এবং দায়িত্ব এড়িয়ে থাকার শোচনীয় প্রবণতা দেখিয়েছে। উত্তর প্রদেশে মুক্তফ্রন্টের শরীকদের বার বার পদত্যাগ, পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাসূচক ও অনাস্থাসূচক প্রস্তাব, মুখ্যমন্ত্রীর উপর কারণ-অকারণে চাপ সৃষ্টি, মন্ত্রীসভার শরীক হয়েও আলোচনের হুমকি, মন্ত্রী থাকাকালীন কারাবরণ, পশ্চিম বঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উপমুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি, মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো কোনো মন্ত্রীর প্রকাশ্য বিবৃতি; বিহারেও মন্ত্রীসভার টানাপোড়েন, পাঞ্জাবে ও হরিয়ানার ধন ধন দল বদল ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বিভিন্ন রাজ্যে অ-কংগ্রেসী মুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রীসভার ব্যর্থতা ঘোষণা করেছে। কেবলমাত্র দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী কম্যুনিষ্টদের প্রকাশ্য কোন্দল, নাস্ত্রিপন্থীদের বিরুদ্ধে গোপালনের অভিযান, কেরলের মন্ত্রীসভার দুর্বলতার স্বাক্ষর বহন করেছে।

কিন্তু কংগ্রেসের মুখে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রভৃতি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সংহতি-বিরোধী অভিযোগ কিম্বা গণতন্ত্রের সমাধি রচনার দায়িত্ব আরোপ আদৌ মানায় না। দীর্ঘ কুড়ি বছরের একটানা শাসনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস জাতীয় জীবনে ভাষা থেকে শুরু করে ধর্ম পর্যন্ত নানা স্তরে সঙ্কীর্ণতার বিবেচ্য বিষ ছড়িয়ে জাতীয় সংহতির ধ্বংস সাধন করে এসেছে। কংগ্রেসের প্রশাসন ও অর্থনীতি গণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে জাতীয়তাবিরোধী দল ও শক্তিকে পুষ্টিদান

করেছে এ-সময়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। গণতন্ত্রে বিরোধীদের ভূমিকাও কংগ্রেস-শাসনে সম্মান ও স্বীকৃতি পায় নাই। ফলে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদের যে স্থান নির্ধারিত রয়েছে ভারতবর্ষের সংসদীয় আচরণে সে ধরণের রীতিনীতি গড়ে ওঠবার অবকাশ না পেয়ে বিরোধীশক্তি ব্যর্থ ও বন্ধ্যা রাজনীতির প্রবণতায় সিক্ত হয়েছে। এই কঠিন সত্যকে উপেক্ষা করে কংগ্রেস যদি অকংগ্রেসী সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দলত্যাগে প্ররোচিত হয় এবং অকংগ্রেসী সরকারে ভাঙ্গন ধরতে উৎসাহী হয়, তার পরিণাম আরও বিষময় হবে।

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য যে এর চাইতে মহৎ নয় তার প্রমাণ হায়দরাবাদের রাজনৈতিক প্রস্তাবের কোনো কার্যকরী অংশ নেই। সেখানে খুবই অস্পষ্ট ও মামুলীভাবে বলা হয়েছে সংগঠনকে সবল ও সচল করতে হবে। কংগ্রেস অধিবেশনে কোনো অর্থনৈতিক প্রস্তাব উপস্থাপিত না হওয়ার এই দুর্বলতা আরও প্রকট হয়েছে। কেবলমাত্র একটি অর্থনৈতিক বিবৃতি দিয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে দেশের প্রতি বৃহত্তর অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করে, এ-ক্ষেত্রে মারাত্মক দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে।

শেখ আবদুল্লাহর মুক্তি

নুতন বছরে শেখ আবদুল্লাহকে পূর্ণ মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন যাবৎই এই উদ্দেশ্যে শেখ আবদুল্লাহর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ধীরে ধীরে শিথিল করে আনছিলেন ভারত সরকার। জরুরী অবস্থা বাতিল করবার পূর্বেই শেখ আবদুল্লাহকে মুক্তি দেওয়া হবে সে-সম্ভাবনাও কিছুদিন যাবৎই অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

শেখের অসুস্থতা ও প্লেবিসাইট সিস্টেমের নেতা মির্জা আফজল বেগ বেশ কিছুদিন আগে ছাড়া পেয়ে কাশ্মীর সমস্তার গতিবেগ বৃদ্ধির জন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি পাকিস্তানী হাই কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করে

আবদুল্লাহর পাকিস্তানী সরকার সম্পর্কে আলোচনাও করেছেন। আবদুল্লাহর মুক্তির পর ঘটনার গতিবেগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আবদুল্লাহর সঙ্গে পাকিস্তানী হাই কমিশনার আরশাদ হোসেনের সাক্ষাতের যে বিবরণ লাহোর রেডিওতে বিজ্ঞপিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারই শেখের চোখে মূল সমস্যা এবং এ-বিষয়ে পাকিস্তানেরও এজিয়ার রয়েছে। আবদুল্লাহ যদি এই উক্তি করে থাকেন তাহলে তা গুরুতর আশঙ্কাজনক। এ-ছাড়া সাংবাদিক সম্মেলনে কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে যেমন কোনো সরাসরি জবাব দিতে আবদুল্লাহ অস্বীকার করেছেন তেমনি তিনি কোন্ দেশের নাগরিক এ-প্রশ্নে ক্ষিপ্ত হয়ে সংশয়ের সৃষ্টি করেছেন। প্রধান মন্ত্রী অবশ্য বলেছেন যে আবদুল্লাহ ভারতীয় পাসপোর্টে পাকিস্তান গিয়েছিলেন অতরাং তিনি ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু এই সহজ স্বীকৃতিতে আবদুল্লাহ আদৌ সন্তুষ্ট হন নাই। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অতরাং কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে স্ফুটপথে আনাগোনার সুযোগ ভারত সরকার আবদুল্লাহকে দিলে নুতন বিপদ ডেকে আনবেন। কাশ্মীর ও পাকিস্তান সম্পর্কে আবদুল্লাহর অস্পষ্ট ঘোষণার পর আবদুল্লাহর অধিকারের সীমা নির্ধারিত হবে।

আইন অমাত্য

শ্রীঅজয় মুখার্জির মন্ত্রী সভা বাতিলের বিরুদ্ধে ও ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রীসভা বহালের প্রতিবাদে আইন অমাত্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় অভিযাত্রা হয়ে গেল। প্রায় দশ হাজার নর-নারী এই আন্দোলনে কারাবরণ করেছেন। এই আন্দোলনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে—যেমন উত্তরপাড়া কলেজে—দুর্ভাগ্যপূর্ণ অত্যাচার দেখা গেছে। তেমনি বোম্বা ও সস্তারের প্রাচুর্য কোথাও কোথাও আন্দোলনের গতিপথ পরিবর্তনে প্রবলভাবে উত্তোষিত হতে দেখা গেছে। প্রতিবাদ আন্দোলনের পাশাপাশি ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের স্ফীতি, তাই

সমগ্র প্রতিবাদ আন্দোলন সম্পর্কেই সংশয়ের স্রষ্টি করেছে এবং প্রশ্ন উঠেছে এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য কি?—যথার্থই প্রতিবাদ, না ধ্বংসাত্মক কাজের গতিবেগ বৃদ্ধি করে প্রশাসনকে অচল করে দিয়ে ক্রমশঃ দখল?

অজয় মুখার্জি-মন্ত্রীসভা বাতিলের প্রতিবাদে যে তুমুল আলোচনের সম্ভাবনা ছিল, অন্তত যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে যে তীব্র প্রতিবাদের জঙ্ঘম জনসাধারণকে উদ্বোধিত করা হয়েছিল, সে আন্দোলনের গতিবেগ খুব তীব্র হয়েছে বলা ঠিক হবে না। চৌদ্দ দলের যৌথ প্রচেষ্টায় কম বেশী দশ হাজার নর-নারীর কারাবরণ এই যৌথ উত্তোলের সফলতা ব্যক্ত করে না। তাছাড়া, আইন অমান্ত করে দলে দলে আগুনে মুক্ত হয়ে বাইরে আসার যে নজীর—যা ইতিপূর্বে কোনো আইন অমান্ত আন্দোলনেই ঘটে নাই—যুক্তফ্রন্ট স্রষ্টি করলেন তাতে আইন অমান্তের নৈতিক প্রভাব সংশয়াভীরূপে ম্লান হয়ে গেছে এবং অতঃপর এ-ধরনের আন্দোলনের কার্যকারিতার ওপর জনসাধারণের আদৌ কোনো বিশ্বাস থাকবে না।

যুক্তফ্রন্টের আন্দোলনের অন্তিম লক্ষ্যও অস্পষ্ট। শ্রীজয়

মুখার্জির মন্ত্রী সভাকে পুনর্বহাল করার প্রস্তাব যে অবাস্তব

—তার সংশ্যালিষ্ঠতাই—তার-বড় প্রশ্ন।—যতদিন-যাবে

ততই এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনসাধারণের স্রোহহৃৎ হবে।

তবে কি মধ্যকারীন নবাতন? সে-সম্পর্কেও যুক্তফ্রন্টের শরীকরা একমত নন। তাছাড়া, সেই আন্দোলন হবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। বর্তমান আন্দোলনের লক্ষ্য রাজ্য সরকার। হুতরাং তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলন আরম্ভ করবার পূর্বে আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে অস্পষ্টভাবে যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে ঘোষণার অবকাশ আছে। তা না হলে হয় ব্যর্থতার উষ্ম মরুতে আন্দোলন পরিণতি পাবে আর না হয় তোঁ যাঁরা এই আন্দোলনকে ধ্বংসাত্মকরূপে দিতে চান, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দল ও ব্যক্তির তাঁদের প্রভারণার

লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়াবে। হুতরাং এ-সম্বন্ধে অস্পষ্ট ঘোষণা চাই।

আজাদ হিন্দ ফৌজের পাওনা

অবশেষে ভারত সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের সকল শ্রেণীর সদস্যদের পাওনা টাকা ফেরৎ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইতিপূর্বে যারা মুচলেকা দিয়েছিল কিম্বা খেচ্ছায় আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দেয় নাই বলে বিবৃতি দিয়েছিল তাঁদেরই হয় সামরিক বাহিনীতে পুনর্গ্রহণ কিম্বা বকেয়া বেতন ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। অজ্ঞাতদের নানা শ্রেণীতে চিহ্নিত করে সেনাবাহিনীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। ভারত সরকারের এই বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বিশেষ করে নেতাজী ও আজাদ হিন্দের দীপ্তিময় ঐতিহ্যলোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে এসেছে। কিন্তু ভারত সরকারের দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। নুতন লোকসভায় দেখা গেল ভারত সরকারের চৈতন্যহীন হয়েছে এবং আজাদ হিন্দের প্রতি কুষ্ঠিত মর্যাদা দিতে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন। বিলম্বে হলেও এই কুষ্ঠিত স্বীকৃতির জঙ্ঘম ভারত সরকারকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি।

জাতীয় জীবনের অ-স্বাভাবিক দুটি বিষয়

(ক) এবারকার মকর-সংক্রান্তি স্নান

সারা বৎসর প্রতীক্ষা অন্তে মকর-সংক্রান্তির পূর্ণ প্রভাতে স্নান করবার দুরশায় নিয়ে সাগর সমুদ্রে একে বন্দ পূণ্যার্থীর সমাগম হয়েছিল। ভারতের প্রান্ত প্রান্ত থেকে গভ কয়েকদিন কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী সকল স্থান অস্থানে আমাদের হাজার হাজার দেশবাসীদের জঙ্ঘম কারো কোনো মাধাব্যথা বা মনোকষ্ট হতে দেখিনি—গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে জাকঠ নিমজ্জিত বামপন্থীদের বা সেই একই গণতন্ত্রের দাবিতেই শাসনে অধিষ্ঠিত পি ডি এফ সরকারের বা তার সমর্থক ও পশ্চাতের খুঁটি কংগ্রেসের। কাগজে দেখছি সাগর সমুদ্রে চার লক্ষ পূণ্যার্থী স্নান করেছেন।

আরো কত পুণ্যার্থী তাঁদের প্রতীক্ষিত পুণ্য লাভে বঞ্চিত হয়েছেন তার হিসেব রাখবার অবসর কোথায়? দেখছি মাত্র একটি ক্ষেত্রেই ১২০০ স্নানার্থী স্টিমার প্রত্যাবর্তনের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় সারা রাত্রি অতিবাহিত করেছেন হাওড়া স্টেশনে। আবার জাহাজের অপটু ডেক ভেঙ্গে ৭০ জন গুরুতর আহত আর ৪ লক্ষ লোকের আববণের স্থলে দশ হাজার লোকের মত ব্যবস্থা। এসব ধবরে বিচলিত হবার মত “সাধারণ” ননু কেউ, বড় বড় বিষয় তাঁদের “অসাধারণ” মগজে ভিড় করে আছে—কিন্তু দেশবাসী সর্বসাধারণের নৈরাশ্র, আশাভঙ্গ, কষ্ট, অবজ্ঞা অমানুষিক ব্যবহার এদেশের জাতীয় চরিত্রকে রক্ষা করতে পারবে তো? এবং জাতীয় চরিত্রকে হত্যা করে জাতি-রক্ষা পাবে তো? সর্বশ্রেণীর সরকারী বেসরকারী দেশ সেবার সব দাবীদারদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

(খ) হিন্দু মৃতদেহ সংস্কারের অন্তর্জাতক

অব্যবস্থা

এই বিশাল কলকাতা সহরে লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের সংস্কারে ব্যবস্থা সম্বন্ধে কর্পোরেশন ও অত্যাশ্রয় সেবা প্রতিষ্ঠানও উদাসীন। আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে যে হিন্দুসংস্কার সমিতির শবদাহী গাড়ীর সংখ্যার অপ্রতুলতাই শুধু নয় সেগুলি সুরক্ষিত ও সুই ভাবে রক্ষণাবেক্ষণেরও অভাব— এমন কি আমাদের পরিচিত একটা বিনিষ্ট পারিবারের একটা মৃতদেহ বহন করার জন্য হিন্দু সংস্কার সমিতির পরিবর্তে শিখসংস্কার সমিতির গাড়ীর ব্যবস্থা করতে আঞ্জীয়রা বাধ্য

হন। মন্তব্য নিশ্চয়োজন—কিন্তু আমাদের নিজেদের আশ্রয় দিকার দিচ্ছি।

জরুরী অবস্থার অবসান

১৯৬২-তে চীনা আক্রমণের পর যে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল, ১০ই জানুয়ারী থেকে তার অবসান হল। কিন্তু জরুরী অবস্থার অবসান ঘোষিত হলেও ভারত রক্ষা আইনের আয়ু আরও ছয়মাস কাল বলবৎ থাকবে। জরুরী অবস্থার অবসান ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি আবার প্রতিষ্ঠিত হোলো।

জরুরী অবস্থা অপসারণের দাবী ক্রমশই দুর্বল হয়ে উঠেছিল। চীনা আক্রমণ, পাকিস্তানী আক্রমণ, নাগামিজো বিদ্রোহ এবং দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার অনিশ্চিতি জরুরী অবস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করলেও, দলীয় স্বার্থে জরুরী অবস্থার সুযোগ গ্রহণে এই অবস্থা সম্পর্কে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। জরুরী অবস্থার অবসানের পর আরও ছয়মাস ভারতরক্ষা বিধির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিতে সেই অসন্তোষ ও আশঙ্কা থেকে যাবে। ইতিমধ্যে নিরাপত্তা আইন ও বেআইনী কার্যকলাপ নিবোধ আইন জরুরী অবস্থার শূন্য স্থান পূর্ণ করবে। জাতীয় সংহতি ও নিরাপত্তার জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগ জাতিয়তাবাদী মনস্তত্ত্ব বিম্বাসীদের সমর্থন পাবে। কিন্তু একই সঙ্গে কঠোর আইন প্রয়োগের ক্ষমতা সরকার নাহলে জনগণের অপচেতাই নারাজক হয়ে ওঠে।

১৫. ১. ৬৮

সূচীপত্র

জয়ন্তী : মাস : ১৩৭৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৬৬১
ভাষা সমস্যা কি ও কেন (আলোচনা)	শশধর সিংহ	৬৬৭
তিনটি কবিতা (কবিতা)	প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	৬৭৩
অভিষেক (কবিতা)	সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত	৬৭৪
শেষ পরিক্রমা (কবিতা)	মঞ্জুষ দাশগুপ্ত	৬৭৪
মুখলী (কবিতা)	বিজয়কুমার দত্ত	৬৭৪
প্রভু নয় বন্ধু বা পাকিস্তানের রাজনীতি (প্রবন্ধ)	অশোককুমার মজুমদার	৬৭৫
‘বুদ্ধের কঠিন হাসি’ (ধারাবাহিক চিত্র)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৬৮৩
নেতৃত্বের সংকট গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ)	অরিন্দম সেনগুপ্ত	৬৮৯
স্পীকারের সংকট (আলোচনা)	অনীল দাস	৬৯৩
সমকালীন ভারতীয় সাহিত্য (সমালোচনা)	শ্রীনিবাস আচার্য্য	৬৯৫
অস্থায়ী সরকার গঠনকালে		
পূর্ব-এশিয়ায় আজাদ হিন্দের		
রাজনৈতিক সংকট ও সামরিক শক্তি		
(ঐতিহাসিক ঘটনা)	জেনারেল কাওয়ারবে	৬৯৯
কণ্ঠ ভরা বিষ (ধারাবাহিক উপভাস)		
	নিহির মুখোপাধ্যায়	৭০০
জল মাটি মন		
(ধারাবাহিক উপভাস)	মহীতোষ বিশ্বাস	৭১১
পুস্তক পরিচয়		৭১৮
কিছুকাল অধরতা শিক্ষা নেব বলে (কবিতা)	গৌরাজ ভৌমিক	৭২১

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly
Founded in 1981

Advertisement Rate Schedule

Current from April, 1986

Ordinary

Full Page :	Rs. 100.00
Half Page :	Rs. 55.00
Quarter Page :	Rs. 30.00

Cover Page

Second Cover :	Rs. 175.00
Third Cover :	Rs. 200.00
Fourth Cover :	Rs. 350.00

For Special Position contact *Advt. Manager*
Jayasree.

Advertising Space 20.5Cm × 15.24Cm.
(8" × 6")

Contact

Manager, Jayasree

309, Ganguli Bagan,

Calcutta—47

Phone : 46-4116

দীপ্তি

আপনার নিত্য প্রয়োজন

দীপ্তি লম্বন—এর পরিচয় নিম্নয়োজন,
এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে
আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর
কম কেরোসিন খরচ।

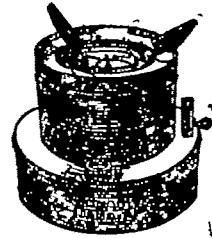
খাস জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য
প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ।
এই কেরোসিন ঠোঁড় ব্যবহারে কোন
ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে
সুন্দর, খরচে সামান্য। অল্প সময়ে যে
কোন রান্না করা যায়।

‘দীপ্তি’ মার্কা এনামেলের বাসন—
অল্প বিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর
জগের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে।

বি ওয়িস্টার্স মটাল
ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
৩১ ও ১২ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২



দীপ্তি লম্বন



খাস জনতা



এনামেলের বাসন

Kalpana Chandra

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd.
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

* * *

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

* * *

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY - 1

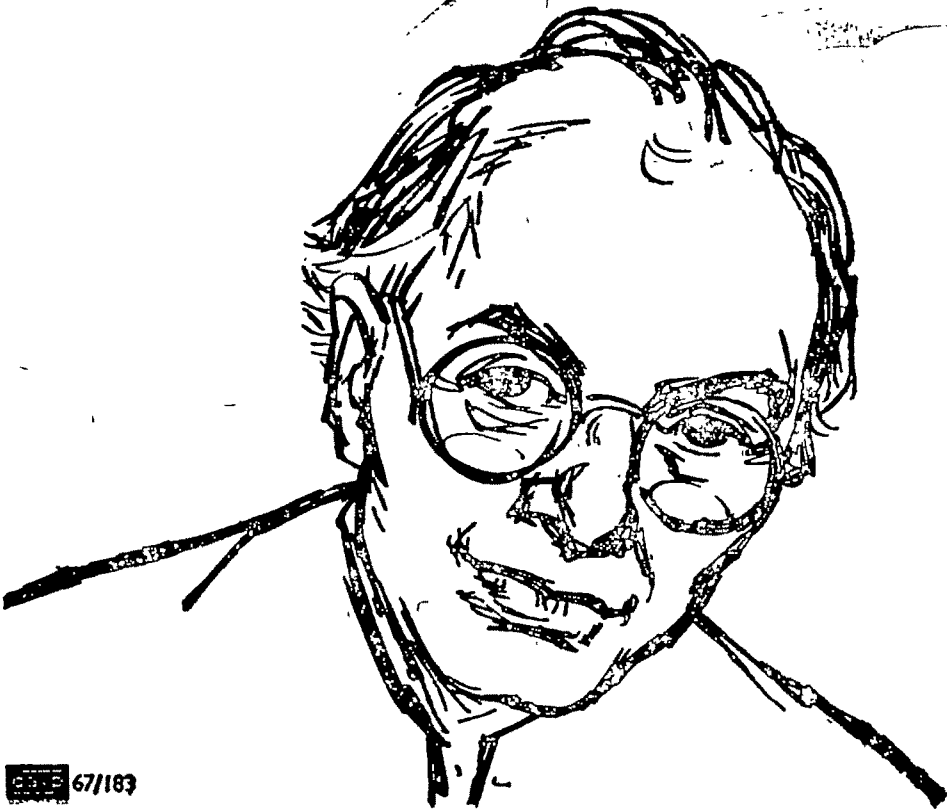
ইনি ফুডের একজন শিক্ষক। দেশ ও জাতির প্রতি অমলস সেবার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি একটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কার বা এই সম্মানই অবশ্য তাঁর আনন্দের উৎস নয়। তিনি বলেন, “আমার সম্মানরা তাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে আর সেই জন্যই আমি সুখী। আমার দুটি মেয়ে। একটি মেয়ে কলেজের লেকচারার হয়েছে অন্যটি ডাক্তারি পড়ছে। ছেলেমেয়ে কম হওয়াই



ভালো কারণ তাতে ছেলেমেয়েদের যেমন উপযুক্তভাবে মানুষ করা যায় তেমনি নিজেদেরও দুর্ভাবনা কম থাকে। আমি সেজন্যই সুখী।”

ইনি সুখী।

আপনি ?



30 JAN 1968

প্রতিদিন
প্রতিঘরে



লক্ষ্মী ঘি

সকলকে তৃপ্তি দেয়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী

খাবার বেশ

সুস্বাদু ও রুচ্য হয়

LG-4/67

શ્રાવ

૨૭૫૮

સમ્પ્રદિન ;
લીલા વાય





জয়ন্তী

৩২ বর্ষ • দশম সংখ্যা • মাঘ ১৩৭৪

সম্পাদকীয়

বিস্তৃতি

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকাল সওয়া সাড়টা নাগাদ শ্রীযুক্তা লীলা রায় অকস্মাৎ মস্তিকে রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। গত ১৩ই ডিসেম্বর রাজিবেলা হঠাৎ পড়ে গিয়ে তাঁর ডান উরুর হাড় ভেঙ্গে যায়। সেই অবধি পা প্ল্যাষ্টার করা অবস্থায় তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। এই অবস্থায়ই মস্তিকে রক্তক্ষরণ রোগে সংক্রান্ত হয়ে পড়েন। সেদিন বিকালেই তাঁকে স্বপ্নলাল কার্ণানী হাসপাতালে (প্রাক্তন প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল) হার্ট ইউনিটের ক্যাবিনে স্থানান্তরিত করা হয়। গত তেইশ দিন যাবৎ মৃত্যুর সঙ্গে কঠিন সংগ্রামের পর বর্তমানে চিকিৎসকের মতে তাঁর অবস্থা কিছুটা ভালর দিকে, যদিও তাঁর সংজ্ঞা এখনও ফিরে আসে নি। তাঁর শরীরের ডান দিকটা সম্পূর্ণ অবশ হয়ে আছে।

ইতিপূর্বে ১৯৫৫ ও ১৯৫৯ সালে তিনি করোনারী থ্রম্বোসিস রোগে এবং ১৯৬৩ ও ১৯৬৭ সালে সেরিব্রেল থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হন। এবার তৃতীয় সেরিব্রেল আক্রমণ। তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে আবার আমাদের পরিচালনা করুন বিধাতার কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি। তাঁর রোগের প্রচণ্ডতার ও আকস্মিকতার দরুন হাসপাতালে আমাদের উদ্বিগ্ন দিনরাত বাপন করতে হয়েছে। এই কারণে জয়ন্তীর এই সংখ্যা বিলম্বে প্রকাশিত হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

পরিচালকমণ্ডলী

জয়ন্তী

২৬.২.৬৮

পশ্চিম বঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। সেইদিনই পি, ডি, এফ-কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ক্যাবিনেটের বৈঠকের পর রাজ্যপালের নিকট পদত্যাগ করেন। ইতিপূর্বে এঁরা বলেছিলেন বিধান সভায় সংখ্যা-লঘিষ্ঠতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত পদত্যাগ করবেন না। কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে পি, ডি, এফ-কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দিল্লী যাবার পর এঁদের মত পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়।

পি, ডি, এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশনের বক্তব্য ছিল তারা বিধান সভায় সম্মুখীন হবার জন্ত সর্বদাই প্রস্তুত। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিধান সভায় অধিবেশনেও তারা শক্তি পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন এবং সেখানে পরাজিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু স্পীকার-এর রুলিং-এর ফলে গত ২২শে নভেম্বরের মত বিধান সভা আবার অনিদিষ্টকালের জন্ত মুলতুবি ঘোষিত হওয়ায় তা সম্ভব হোলো না। ১৪ই ফেব্রুয়ারী সভায় পি, ডি, এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশন নিশ্চিতভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত হয়েছিল। স্পীকারের রুলিং তাই তাদের অনিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।

পশ্চিম বাংলার পরিষদীয় রাজনীতিতে যুক্ত ফ্রন্টের আমল থেকেই অস্বৈর্য দেখা যায়। যুক্ত ফ্রন্টের বড় শরীক মাস্টারবানী কম্যুনিষ্ট পার্টি এই অস্বৈর্যের জনক। দলীয় নীতি ও কর্মপন্থার প্রয়োগ ও প্রভাব বিচারে আভিয্য ও অসহিষ্ণুতার জন্ত মন্ত্রীসভায় তাদের প্রতিনিধিরা বার বার মন্ত্রীসভার যৌথদায়িত্ব লঙ্ঘন করে অস্বাস্থ্য মন্ত্রীদেয়, এমন কি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীরও, বিরোধিতা করেছে; যুক্ত ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো দলের বিরুদ্ধে প্রচার ও বলপ্রয়োগেও কুঠা বোধ করে নাই। এমন কি পশ্চিম

বাংলার রাজনীতিতে জাতীয়তার বিধ্বংসী চীনমুখীনতাকে এরা প্রজ্ঞার দিয়ে চীনা-আনুগত্যের প্রবল মানসিকতা প্রস্তুতিতে সহায়ক হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের ২রা অক্টোবর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এই কারণেই পদত্যাগে উদ্বৃত্ত হয়েছিলেন। যুক্ত ফ্রন্টের প্রাক্তন খাজনদার বিরুদ্ধেও এদের নিরন্তর প্রচার, আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি, বিরোধীপক্ষের সভ্যদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ, ভ্রমরীতির ফলে শিল্পে অশান্তি, ভূমি সংস্কারে অবহেলা করে ভূমি-সমস্যা সমাধানের জন্ত কৃষকদের প্রতি প্রত্যেক সংগ্রামের আহ্বান ইত্যাদি ঘটনা যুক্ত ফ্রন্টের আমলেই পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে অস্বৈর্য ডেকে এনেছিল।

এই অস্বৈর্যে ইন্ধন যুগিয়েছিল যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিলে রাজ্যপালের ভূমিকা, যুক্ত ফ্রন্টের সদস্যদের দলত্যাগে প্ররোচনা দিয়ে পি, ডি, এফ-এর আবির্ভাব ও সংজ্ঞাপনে পি, ডি, এফ কর্তৃক মন্ত্রীসভা গঠন এবং মাত্র কয়েকমাস পূর্বে পরাজিত কংগ্রেসকে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ দান।

সর্বোপরি এই অস্বৈর্যের স্বারিস্ফদানে পশ্চিম বাংলার বিধান সভায় স্পীকারের অবদানও কম নয়। স্পীকার বিধান সভায় অধিবেশনের পথরোধ করে যে সাংবিধানিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছিলেন সেই সঙ্কটের মীমাংসার জন্ত অনন্তোপায় হয়েও রাষ্ট্রপতির শাসন প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। স্পীকার বিধান সভায় অধিকারের রক্ষক এবং জনমতের প্রতীক যে সভা সেই সভায় জনমতের প্রতিফলনের সঙ্গাগ প্রহরী। কিন্তু স্পীকারের অমুস্বত কার্যক্রম সেই সভায় অধিবেশনগুলিকেই বানচাল করে দিল এবং শেষ পর্যন্ত নিজের সর্বনাশ সাধন করলো। স্পীকারের এই আত্মধ্বংসী নীতি এবং জনমতের ইচ্ছার কর্তরোধের বোধ হয় নজীর নাই। রাষ্ট্রপতির শাসনে স্পীকারকেও নিমূল করে দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির শাসন অনিবার্য করে তুলতে বিরোধীদের ভূমিকাও অকিঞ্চিৎকর নয়। বিধান সভার সংখ্যালঘিষ্ঠ বোম-মন্ত্রীসভাকে পরাজিত করার চাইতে তারা রাজ্যপালের উপর সঙ্কল্পভাবে নির্ভর করেছেন বোম-মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করার জন্য। অথচ, এরাই তারপরে অল্প মন্ত্রীসভাকে রাজ্যপাল কর্তৃক বরখাস্তের বিরুদ্ধে সততভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রাজ্যপালের যে অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ জনমত প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে, সেই অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগের উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে বিরোধীদের নীতিতে বাধে নাই। তাছাড়া বিধান সভাকে এড়িয়ে গিয়ে এই সভাকে বাতিল করিয়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণের জন্য বিরোধীদের আকুল আবেদন, বিধান সভার সার্বভৌমত্ব তথা, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা ও অবজ্ঞার স্বাক্ষর বহন করেছে। বিধান সভার শক্তি পরীক্ষার অযোগ্য না নিয়ে রাষ্ট্রপতির সাহায্যে বোম-মন্ত্রীসভার অপসারণ করে পরিষদীয় ক্ষমতাকে শাসনবিভাগের পশ্চানত করতে বিরোধীরা সহায়ক হয়েছেন। অতঃপর পরিষদীয় রাজনীতির মর্যাদা শাসনবিভাগ কর্তৃক লঙ্ঘনের অযোগ্য তৈরী হয়ে রইলো।

রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রয়োগে দলত্যাগীদের অবিসংবাদী ভূমিকা রয়েছে। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় যে সুবিধাবাদী নীতিহীন গোষ্ঠি যুক্ত ফ্রন্টের সদস্যদের দলত্যাগে প্ররোচিত করে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নিয়েছে, সেই নীতিহীনদেরই মন্ত্রীসভা গঠনে উৎসাহ দান ও সমর্থন দানে যুক্ত ফ্রন্টের বিভিন্ন দল দ্বিধাবোধ করলেন না। যুক্ত ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের পক্ষে, বিশেষ করে যে সব জাতীয়তাবাদী দল পরিষদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, এই নীতিহীন সুবিধাবাদী আচরণ সর্বতোভাবে গণিত ও নিন্দনীয়। যুক্ত ফ্রন্টের যে সব দল গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা পরিষদীয় রাজনীতির কবর খুঁড়তে ব্যস্ত।

কংগ্রেস এতোকাল সেই কালে তাদের সহায়তা করে এসেছে। যুক্ত ফ্রন্টের জাতীয়তাবাদী দলগুলিও সেই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে রইলেন।

রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে বিধান সভা বহাল থাকবে এই বাস্তবস্ত-ধারণা নিয়ে তারা রাষ্ট্রপতির শাসনের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তারা হতাশ হয়েছেন সব চাইতে বেশী। নীতিহীন রাজনীতি যে শেষ পর্যন্ত আত্মধ্বংস ডেকে আনে সে খেয়াল তাদের ছিল না। এবার সে শিক্ষা হল।

রাষ্ট্রপতির শাসনের পরের পর্যায় মধ্যবর্তী নির্বাচন। নীতিহীন ও সুবিধাবাদী নির্বাচনী জোট যে সমস্তার সমাধান দেয় না, গত নির্বাচনে তা দেখা গেছে। সে-শিক্ষা নিয়ে এবার জাতীয়তাবাদীরা অগ্রসর হবে কি না সেটাই লক্ষ্যীয়।

উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন

উত্তর প্রদেশেও রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। সংযুক্ত বিধায়ক দলের তীব্র অন্তর্ঘর্ষ চরণ সিং সরকারের অস্তিত্ব কয়েকবারই গুরুতররূপে বিপন্ন করে তুলেছে। গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে চরণ সিং-এর শেষবারের মত পদত্যাগের পর সংযুক্ত বিধায়কদলের চরণ সঙ্কট দেখা দেয়। চরণ সিং মন্ত্রীসভার ঘোষণা দ্বারা বহুদিন পূর্বেই বিপর্যস্ত হয়েছিল। সংযুক্ত সমাজবাদী দল, কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং জনসঙ্ঘ এই তিনটি দলই প্রকাশ্যে চরণ সিং-এর বিরোধিতা করে এসেছে। চরণ সিং তার পদত্যাগ পক্ষে অস্পষ্টভাবে তার উল্লেখ করেছেন। সংযুক্ত সমাজবাদী দল তো মন্ত্রীসভা থেকে এবং সংযুক্ত বিধায়ক দলের সকল সংগঠন থেকেই তাদের প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টিও মন্ত্রীসভা থেকে প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে নিয়ে গেছে পূর্বেই। সংযুক্ত বিধায়ক দল এদের পুনরায় যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিল। সে আহ্বানে কোনো সাড়া পাওয়া যায় নাই। চরণ সিং-এর স্থলবর্তী নেতা নির্বাচন নিয়ে

বিরোধেই সংযুক্ত বিধায়ক দলের অস্তিত্ব শয্যা রচিত হয়। জনসংখ্যা রাজ্যপালেশের কাছে রামচন্দ্র ভিকলের নাম সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতাক্রমে প্রস্তাব করে পাঠাবার পরই অস্তিত্ব দল তার বিরোধিতা করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বিধায়ক দলের চরম ভাঙন অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিধায়ক দল কোনো নেতা নির্বাচনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হোলো। কিন্তু বিধায়ক দল এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকার দক্ষণ বিধান সভায় তাদের পরাজয় ব্যতিরেকে এই শাসন প্রবর্তন গণতন্ত্রসম্মত কাজ হয় নাই। তাছাড়া, এদের পরাজয়ের পর বিধান সভা জিইয়ে রাখবার যৌক্তিকতা দেখা দিত, বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা নির্ণয়ের জন্ত। একে একে, কয়েকটি অকংগ্রেসী কোয়ালিশন সরকার ভেঙে গেল। এই ভাঙনের জন্ত কংগ্রেসের উপর স্থলভ দোষারোপ করলে দায় এড়ানো যাবে না। অকংগ্রেসী কোয়ালিশনের অন্তর্দৃষ্টি, আদর্শবিহীন মিলনই এজন্ত দায়ী।

দীন দয়াল উপাধ্যায়

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী মোগল সরাই স্টেশনের নিকট জনসংখ্যার সভাপতি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের সন্দেহ-জনক মৃত্যুতে সমগ্র দেশ গভীর শোকের ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছে। লক্ষ্মী থেকে পাটনা যাবার পথে পণ্ডিত উপাধ্যায়ের বগী মোগল সরাই স্টেশন ইয়র্ডে পাঠানকোট এক্সপ্রেস থেকে তুফান এক্সপ্রেসে জুড়ে দেবার পথে রাজনৈতিক কারণে আততায়ীর হাতে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান করার সম্ভাব্য কারণ রয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের এবং উত্তর প্রদেশের গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারেরা অনুসন্ধান পরিচালনা করেও এ যাবৎ আততায়ীর সন্ধান পান নাই। আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ফলাফল লক্ষ্য করছি। মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে এই পণ্ডিত, অনাড়ম্বর ও

জনসংখ্যার অন্ততম প্রাণস্বরূপ জননেতার মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তার সহকর্মীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

কচ্ছ ট্রাইবুতালের রায়

১৯৬৫ র এপ্রিলে সিদ্ধ-গুজরাত সীমান্তে কচ্ছ-এর রান এলাকায় পাকিস্তান আক্রমণ করে। পাকিস্তানের দাবী ছিল কচ্ছের রানের মাঝামাঝি ২৪ অক্ষরেখা বরাবর এই সীমান্ত অবস্থিত; আর ভারতের পক্ষ থেকে বলবার ছিল এই রানের উত্তর সীমান্ত যেঁষে এই সীমান্ত রয়েছে। ইংরেজ সরকারের মধ্যস্থতায় দুই পক্ষই বিরোধটি একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুতালের হাতে তুলে দিতে সম্মত হয় এবং অতঃপর সকল বিরোধই আলোচনার মধ্য দিয়ে সীমান্তের অভিপ্রায় প্রকাশ করে। কিন্তু কয়েক মাস পরে, সে-বছর সেপ্টেম্বর মাসেই পাকিস্তান পুনরায় কাশ্মীরের ছাষ এলাকায় আক্রমণ করে কচ্ছ চুক্তির প্রাথমিক সর্ত লঙ্ঘন করে। সে-সময়ই ভারতবর্ষ কচ্ছ বিরোধ নিষ্পত্তির ট্রাইবুতালের সর্ত অস্বীকার করতে পারতো। তার আগেই পার্লামেন্টে কচ্ছ ট্রাইবুতালের সীমান্তা ঘাষহীনভাবে মেনে নেবার জন্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

রানের ৩৫০০ বর্গমাইল বিরোধ সীমান্তের জন্ত ভারতের প্রতিনিধি যুগোল্লাভ জজ ওলেগ বেবলার, পাকিস্তানের প্রতিনিধি ইরাণের জজ নসরুল্লা এন্তেজাম ও রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল কর্তৃক মনোনীত আইডিস জজ গানার লেগেরএনকে নিয়ে ট্রাইবুতাল গঠিত হয়েছিল। সংখ্যাধিক্যের মতে এই ট্রাইবুতাল রানের ৩৫০ বর্গমাইলে পাকিস্তানের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। ট্রাইবুতালের সভাপতি লেগেরএন বলেছেন পাকিস্তান তার দাবী অধিকতর যৌক্তিকতার সঙ্গে এবং অঙ্গুভাবে উপস্থাপিত করেছেন। পাকিস্তানী এলাকা দ্বারা বেষ্টিত ভারতীয় দুইটি

★ ছিটমহলও পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে, এই যুক্তিতে যেহেতু ঐ এলাকাগুলি পাকিস্তান এলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত, সংঘাত এড়াবার জন্ত এবং শান্তির খাতিরে এই দুইটি অঞ্চলকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়াই সম্ভব। এই যুক্তিতে অতঃপর সীমান্তে কোনো ছিট মহলের অবস্থিতিই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

কচ্ছ ট্রাইবুতালের রায় গুরুতর শঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। ভারতের ৩৫০ বর্গ মাইল এলাকা পাকিস্তানী দখলে দেবার অধিকার কোনো সরকারের নেই। ট্রাইবুতালের প্রধান বিচারপতির মতে পাকিস্তানী পক্ষ অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে তাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। তাই প্রশ্ন হচ্ছে ভারত সরকার সেনৈকি ব্যর্থ হলেন কেন। পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণের পর কচ্ছ ট্রাইবুতালের সর্ব থেকে ভারত সরকারের মুক্ত হওয়ার নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। বর্তমানে গণভোট গ্রহণ ছাড়া কচ্ছ ট্রাইবুতালের বিধান অনুযায়ী ভারতীয় এলাকা পাকিস্তানের দখলে দেবার কোনো অধিকার ভারত সরকারের নাই। পাকিস্তান যাতে জবরদস্তি এই এলাকা দখল না করতে পারে সেনৈকি থেকেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সতর্ক প্রহরার প্রয়োজন আছে।

রেলের বাজেট

ভারত সরকারের রেল বাজেটে সবই বাড়তির দিকে, এক আয় ছাড়া। ঘাটতি বাড়তির দিকে, ভাড়া বাড়তির দিকে, মাসুল বাড়তির দিকে এবং ব্যয়ও বৃদ্ধির দিকে। এ-বছর (১৯৬৭-৬৮) ২ কোটি টাকার আনুমানিক ঘাটতি ২২.৫৯ টাকায় পৌঁচেছে। ১৯৬৮-৬৯-এ আনুমানিক ঘাটতি ২৭ কোটি টাকা—ভাড়া মাসুল ইত্যাদি বৃদ্ধি করে মাত্র এককোটি টাকা বাড়তির হিসাব করা হয়েছে। সকল শ্রেণীর যাত্রীদেরই ভাড়া বাড়ছে। শীতাতপ

নিয়ন্ত্রিত গাড়ীতে শতকরা ১০ ভাগ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ডিমুজ গাড়ীর চেয়ারে অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া লাগবে, তৃতীয় শ্রেণীর তিন মাচা কিম্বা দুই মাচা বিশিষ্ট শয়ন কক্ষতে প্রতি রাজিতে অতিরিক্ত চার টাকা ভাড়া লাগবে। প্ল্যাটফর্ম টিকিট ২০ পয়সা এবং ৫ টাকা পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটের উপর অতিরিক্ত পাঁচ পয়সা, পাঁচ থেকে পনের টাকা পর্যন্ত টিকিটের উপর অতিরিক্ত দশ পয়সা এবং পনের টাকার উপরের টিকিটের জন্ত অতিরিক্ত পনের পয়সা লাগবে। এ ছাড়া মালের মাসুলের উপর অতিরিক্ত চার্জের ওপর শতকরা ৩ ভাগ বেশী ভাড়া লাগবে।

রেলওয়ের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে মহার্ঘ ভাতার পরিমাণ বর্তমানে ২২ কোটি টাকা, বছরে ২৮ কোটি টাকা বেশী,—রেলের জ্বালানির খরচের পরিমাণ ২২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, কয়লার দাম ও সেলস ট্যাক্স বাড়বার দরুণ। যে সব লাইনে লোকসান হয় ব্যয় সঙ্কোচের জন্ত সে গুলি তুলে দেবার প্রস্তাব রেলমন্ত্রী করেছেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বহু অঞ্চলের যোগাযোগ বিঘ্নিত হবে। পরিকল্পিত অর্থনীতির বিরতি, শস্য উৎপাদনে কমতি রেলের মাল চলাচলের পরিমাণ কমিয়ে আরো ঘাটতি এনে দিয়েছে। পরিকল্পনার এই পরিহাসের খেলারত মেটাবার জন্ত যাত্রীদের ও জনসাধারণের ডাক পড়েছে।

পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ

সম্প্রতি কোসিজিনের ভারত-ত্যাগের পূর্বে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী যে যুক্ত বিবৃতি দেন তাতে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের প্রশংসা প্রায় অমূল্যবিশিষ্ট থেকে গেছে। সোভিয়েট রুশ ও আমেরিকা পরমাণু অস্ত্র প্রসারের নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে যে খসড়া প্রস্তাব রচনা করেছে তাতে পরমাণু শস্ত্রধারী রাষ্ট্র ও পরমাণু অস্ত্র-বর্জিত রাষ্ট্রের প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাবের আভাস থাকতেই পরমাণু

অস্ত্রের প্রসার নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে সোভিয়েত রুশ ও ভারতের মনোভাব বিপরীতমুখী। সে-কারণে ভারতবর্ষের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে না। প্রথমত, পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার সীমিত রাখবার চুক্তিতে পাঁচটি পারমাণবিক রাষ্ট্রের মধ্যে কেবলমাত্র সোভিয়েত রুশ, আমেরিকা ও ব্রিটেন স্বাক্ষর দেবে, ফ্রান্স ও চীন দেবে না। অতরাং বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সকলে পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার নিরোধের দায়িত্ব না নিলে পারমাণবিক অস্ত্র-বিহীন রাষ্ট্রগুলির বিবাদ থেকে যাবে। দ্বিতীয়তঃ, পারমাণবিক অস্ত্রসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলি পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে উদাসীন তো বটেই এবং

১৯৬৩ র আংশিক পারমাণবিক পরীক্ষা চুক্তির পর এদের পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। এ-ছাড়া পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পথেও পারমাণবিক অস্ত্র বিহীন রাষ্ট্রদের পক্ষে নানা বাধা নিষেধ আরোপিত করে তাদের এই ছায়ায় সজ্জিত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। অতরাং ভারতের মত দেশের কোনোক্রমেই এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া সম্ভব নয়।

২৬.২.৬৮

ভাষা সমস্যা কি ও কেন ?

শশধর সিংহ

প্রায় বার তের বছর পূর্বে আমি তখন কেন্দ্রীয় সরকারে কাজ করতাম। তখন ভাষা প্রশ্নে একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমাকে তখন প্রায়ই বেতার ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ করা হত। একদিন দিল্লীর বেতার কেন্দ্রে ভাষণ দিতে গেছি, তখন সেখানকার একটা কর্মচারী এসে আমাকে স্বাগত করলেন এবং আমার ভাষণের কয়েক পঙতি বাদ দিতে অনুরোধ করলেন। কারণ, তাঁর মতে, সেগুলি সরকারী ভাষানীতির বিরুদ্ধ মতামত।

উত্তরে আমি বললাম, “আমি স্বাধীন লেখক, কাউকে ভুট্ট করার জন্ত লিখিনা। স্বতরাং, প্রয়োজন হলে, অজ্ঞ কাউকে ডাকুন। নমস্কার, আমি বাড়ী চলে যাই।”

তখন তিনি ডাইরেক্টর-জেনারেলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্ত অন্তর্ধান হলেন এবং আমাকে কিছুক্ষণের জন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। সৌভাগ্যবশতঃ, আমাকে বেশী সময় অপেক্ষা করতে হল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি ফিরে এসে বলেন, “ডক্টর সিংহ, আপনার ভাষণে কোন পরিবর্তন করা নিষ্প্রয়োজন, আপনার বক্তব্য আপনি বলে যান।”

আমার ভাষণে আমি বক্তব্য রেখেছিলাম যে, সমগ্র দেশের প্রশাসনিক সংস্থাকে ভাষা-ভিত্তিকনীতির উপর স্থাপিত করে দেশের ভবিষ্যৎ ঐক্যকে বিপন্ন করা হয়েছে। এই হেতু, ভারতীয় সরকারকে একদিন বেগ পেতে হবে। কিন্তু তখন আমি ভাবিনি যে, ভাষা-সমস্যাটা এতদীর্ঘ দেখা-দেবে ও ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠবে।

বলাবাহুল্য এই মত কেবল আমার একার নয়, বহু দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ একই মত পোষণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ, অধ্যাপক টয়নবির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

অর্থাৎ, আজ যদি দেশকে প্রশাসনিক (administrative) ভিত্তিতে ভাগ করা হত, তা হলে বর্তমানে ভাষার প্রশ্ন এইভাবে উঠত না বলে অনুমান করা হবে না।

সর্ব ভাষাভাষী ভারতীয় নাগরিক হিন্দুস্থানের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বাস করবার সুযোগ পেত এবং এইরূপে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থই এদের চোখে প্রাধান্য লাভ করত। ফলে, ভাষার স্থান হত অতি গৌণ, এমনকি নগণ্য হত বলে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। অধিকন্তু সহাবস্থান ও প্রশাসনিক স্থায়িত্বের দৌলতে, সর্ব ভারতবাসী নিজের বাসস্থান ও সহরবাসীদের বিষয়ে গর্ব করতে শিখত। কালে হয়ত বিবাহাদির ভিতর দিয়ে এরা সবাই ভারতবাসী বলে গৌরব অনুভব করতেও পশ্চাৎপদ হত না। এটা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

এই সম্পর্কে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রণীত ‘Nationalism’ পুস্তকে লিখেছেন, “Yet, remember that in Switzerland the races can intermarry, because they are of the same blood. In India there is no common birthright”

একই পুস্তকে তিনি আবার লিখেছেন, “And when we talk of Western Nationality we forget that the nations there do not have the physical

repulsion, one for the other, that we have between different castes. Have we an instance in the whole world where a people who are not allowed to mingle their blood shed their blood for one another except by coercion or for mercenary purposes ?”

একথাটা নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার পাবেন যে, ভাষার প্রথম মূলতঃ কৃষ্টি সত্ত্ব নয়, এটা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক। ভাষার দোহাই দিয়ে তাই অনেক হিন্দীভাষী আজ এই সমস্যাটাকে রাজনীতির বাহনরূপে প্রয়োগ করবার স্বযোগ খুঁজছেন। বস্তুতঃ, এরা মনে করেন যে, হিন্দী একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হলে তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য অপ্রতিষ্ঠিত হবে। বলাবাহুল্য, অহিন্দীভাষীরাও এই মনোভাবের সঙ্গে একেবারে অপরিচিত নন। উল্লেখ্য হিন্দীর বিরুদ্ধে এঁদের এত তীব্র বিরোধিতা।

মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজী যখন আমাদের শাসকের ভাষা ছিল, তখন এটার উচ্ছেদ সাধন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও অরবিন্দ প্রমুখ অনেক নেতৃস্থানীয় ভারতবাসী একই মত প্রকাশ করে গেছেন। দৃষ্টান্তরূপে, অরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত ‘The Ideal of Human unity’ পুস্তকে লিখেছেন “Modern India is another striking example. Nothing has stood in the way of rapid progress in India, nothing has more successfully prevented her self-finding and development under modern conditions than the long over-shadowings of Indian tongues as cultural instruments by the English language.”

অথচ, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইতিমধ্যেই এসম্বন্ধে লোকমতের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ফলতঃ অধুনা অনেক

লোক ইংরেজী ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করেন ও ইহাকে দেশ থেকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য উত্তোষী হয়েছেন।

এর কারণ আর কিছু নয়, ইংরেজের রাজনৈতিক ও সংশ্লিষ্ট ক্ষমতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইংরেজীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন এবং ভাষা প্রসঙ্গে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছেন। কারণ, ইংরেজী ভাষা আজ আমাদের রাজনৈতিক বা কৃষ্টির মর্যাদার পরিপন্থী নয়। এটা আর আমাদের স্বাধীনতাকে কোনভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে না। বরঞ্চ, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জন্য বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য ইংরেজী বা অন্য কোন বিদেশী ভাষা জাতীয় জীবনে কোন স্থান অধিকার করা উচিত কি না সে সম্বন্ধে তাঁরা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বলে রাখা প্রয়োজন যে, ইংরেজী-পন্থীদের হিন্দীবিরোধিতাও মূলতঃ রাজনৈতিক, কৃষ্টির প্রয়োজনে নয়।

ইংরেজী তো শিখতেই হবে, কারণ, সব যুরোপীয় ভাষার মধ্যে ইংরেজীর সঙ্গেই আমাদের ঐতিহ্যের যোগাত্মক সর্বোপেক্ষা প্রবল। আমাদের পক্ষে ইহা শেখাও অসম্ভব বিদেশী ভাষা থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ। আর আমেরিকার ক্ষমতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, এর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, ইংরেজীকে জাতীয় মর্যাদা দেওয়া সমীচীন হবে কি, না ?

একথা মানতেই হবে যে, ভারতবর্ষে, ইংরেজী ভাষা কোনকালেই জনগণের ভাষা হয়ে গড়ে উঠতে পারবে না। এটা সবসময়েই শিক্ষিত সমাজের ভাষা হয়ে থাকবে, যেমন ফরাসী একসময় যুরোপে ছিল।

এক্ষেপে বিচার্য, সমগ্র ভারতে যোগাযোগের ভাষা বা তথাকথিত “link language” কি হবে ?

এই প্রসঙ্গে, সকলেই স্বীকার করবেন যে, হিন্দী বা হিন্দুস্থানী সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সেই জন্ত ইহাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া অমুচিত হবেন না। মোগল আমলে, ফারসী মিশ্রিত হিন্দী বা উর্দু (তাঁবুর ভাষা) জাতীয় ভাষা ছিল। স্তত্রাং হিন্দী তথা হিন্দু-স্থানীকে জাতীয় সম্মান দিলে, আমাদের ঐতিহাসিক, ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দান করা হবে মাত্র।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, দেবনাগরী হরফের সংশোধন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, যাতে করে সকলে ইহা সহজে পড়তে ও লিখতে সক্ষম হয়। এর ফলে, আমাদের জাতীয় সংহতি স্বদৃঢ় করা হবে এবং অস্তান্ত সংশ্লিষ্ট, যথা, ছাপা ও লেখার, অবস্থা তো আছেই। এই সম্পর্কে যুদ্ধকালীন Roman Hindis কথা অনেকের স্মরণ থাকতে পারে। রোমকলিপি যদি ভিয়েটনামী, ইন্দোনেশীয় ও তুর্কীরা গ্রহণ করতে পারে, তা হলে আমাদের পক্ষে এই লিপি ব্যবহার করা কোন লজ্জার কারণ হতে পারে না। যথার্থতঃ, অনেক পণ্ডিতদের মতে, সব ভারতীয় লিপির বিদেশোদ্ভূত।

এখন দেখা যাক, হিন্দীভাষীরা কি চায় ? বলাবাহুল্য, হিন্দীভাষা বলতে, আমাদের প্রধানতঃ, উত্তরপ্রদেশের কথাই ভাবা কর্তব্য। বিহার, রাজস্থান প্রভৃতি অস্তান্ত হিন্দী ভাষী প্রদেশ উত্তর প্রদেশের অনূচর বা satellite মাত্র। অবশ্য, যুগপৎ এ কথাটাও স্বীকার করতে হবে যে, অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকার দরুণ, এরা সবাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে অল্প বিস্তর লাভবান হয়েছে।

উত্তর প্রদেশ ভারতবর্ষের সর্বাধিক বৃহৎ রাষ্ট্র এবং এই হল হিন্দী-ভাষীদের উচ্চাঙ্গার মূল ভিত্তি। উপরন্তু, এই প্রদেশ হল নেহেরুর জন্মস্থান।

পানিকার (Panikkar) লিখেছেন, 'Uttar Pradesh

is nearly equal to Andhra, Telengana, Karnatak and Kerala put together.'

একথাটাও সর্ব সময়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে, নেহরুর সর্বভারতীয় প্রাধান্ত উত্তর প্রদেশের উপরই স্থাপিত। এই রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া তাঁর পক্ষে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য হওয়া কিছুতেই সম্ভব হতনা বলে আমার বিশ্বাস এবং তিনিও উত্তর প্রদেশের ক্ষমতা কোন প্রকারে লাঘব করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা উত্তর প্রদেশোদ্ভূত, তিনি কাম্বীরী ছিলেন বলে নয়।

সর্দার পানিকার States Reorganisation এর সভ্য ছিলেন। সেই হিসাবেই তিনি ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে তাঁর Note of Dissent এ লিখেছেন,

"One of the commonest arguments advanced by leaders in Uttar Pradesh was that the existence of a large and well-organised "State" in the Gangetic Valley is a guarantee for India's unity, that such a "State" would be able to correct the disruptive tendencies in other states, and to ensure the ordered progress of India. The same idea has been put to us in many other forms such as Uttar Pradesh is the 'back-bone' of India, the centre from which all other "States" derive their ideas and culture, etc," তিনি আরও লিখেছেন, "It is not necessary to examine these claims seriously, for nothing is more certain to undermine our growing sense of unity than this claim of suzerainty or paramountcy by one "State" over others."

কিন্তু এই প্রতিবাদ এবং এই অতিকার রাষ্ট্রের বিস্তৃতি

সম্বন্ধে প্রস্তাব করা সত্ত্বেও নেহেরু সর্দার পানিকারের মতামত উপেক্ষা করে গেছেন। এইভাবে তিনি ভাষাসমস্যার একটা স্থায়ী প্রতিকারের সুবর্ণ সুযোগ হারিয়েছেন।

তার Note of Dissent এ পানিকার যা বলে গেছেন তা প্রাধান্যযোগ্য। সংক্ষেপে, তিনি বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত এই বৃহৎ রাষ্ট্র অবিভক্ত থাকবে অর্থাৎ, ইহা আকারে অল্প রাষ্ট্রগুলির সমতুল্য না হবে ততদিন অজ্ঞান ভারতীয় রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বা নিরাপত্তা কোনকালে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। কারণ, যে নীতির উপর আমাদের সাংবিধানিক সাম্য নিহিত আছে, এই বৃহৎ রাষ্ট্র চিরকালই তার বাধা স্বরূপ হয়ে থাকবে।

তিনি লিখেছেন, "The consequence of the present imbalance caused by the denial of the federal principle of equality of units; has been to create feelings of distrust and resentment in all States outside Uttar Pradesh not only in the southern States but also in Bengal, Punjab and elsewhere where the view was generally expressed before the Commission that the present structure of Government had led to the dominance of Uttar Pradesh in all-India matters. The existence of this feeling will hardly be denied by anyone. That it will be a danger to our unity if such were allowed to exist and remedies are not sought and found now, will also not be denied."

Since the formal constitutional device for equalising growing disparities between the units in a federation, that is the provision of equal or at least heavily weighted representa-

tion in the house representing the federal principle, is not possible and even if it were possible, would not now be a satisfactory solution, in view of the dominant position of the House of the People, the only remedy open to us is to reconstitute the overgrown State in such a manner as to lessen the differences—in short to partition the State. This seems to me an obvious solution."

এখন সবাই উপলব্ধি করবেন যে, অজ্ঞান ভাষা সমস্যার আসল উৎস কোথায়?

এ বিষয়ে আমি আমার "Indian Independence in Perspective" পুস্তকে লিখেছিলাম,

"Language thus got inextricably entangled up with politics. In fact, as is known, language has become for many a convenience for political ends—for power and preference in the country's economic and political life. Hence the exacerbation of regional rivalry and the growing struggle for power by those who hold the linguistic balance in their favour. It is also true that the problem has been further complicated, as has been pointed out, by the heavy slant the Mahatma gave it by his heavy dependence on certain favoured areas for the fulfilment of his political ambitions."

এখন সকলেই বুঝতে পারবেন যে, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও, প্রকৃত পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ এখনও অবসান হয় নাই। তাই বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

✱ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর মাত্র। এই হল ভাষাপ্রশ্নের আসল কারণ।

সুতরাং, উপরোক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এ প্রশ্নের একটা যথাযথ উত্তর পেতে হবে এবং পেলে পর ভাষা সমস্যার সমাধান স্বগম হবে। ইহা স্বাভাবিক প্রগতি।

অর্থাৎ এখন থেকে জনশিক্ষার জন্ত আঞ্চলিক ভাষা হবে প্রধান ভাষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলে, সেই শিক্ষাই জনগণের দৈনন্দিন প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট হবে, যা সবদেশেই হয়ে থাকে। মধ্য ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তারপর ছেলেমেয়েরা অনার্সালে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী শিখতে পারবে দেশের সংহতি রক্ষার জন্ত। এই প্রস্তাবে কারো আপত্তি থাকে উচিত নয়। বস্তুতঃ, উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয়দের পক্ষে এতে কোন অসুবিধা হওয়াব কোন কারণ নাই। একমাত্র তামিল ভাষীদের ছাড়া, অল্প দক্ষিণ ভারতীয়দেরও, এ সম্বন্ধে আপত্তি থাকার ভয় ভিত্তিহীন। শেষ পর্যন্ত, তামিলভাষীরাও অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার খাতিরে হিন্দী শিখতে বাধ্য হবে বলে আমার মনে হয়। যথার্থতঃ, এঁরা যদি একটা বিদেশী ভাষা শিখতে পারে, তবে হিন্দী-ভাষা শেখার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিগত কারণ থাকতে পারে না। অবশেষে, উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা হিসাবে, বস্তুতঃ কিছুকালের জন্ত, ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই, বস্তুতঃ থাকে উচিত না। দেশের ভাষাগুলির উন্নতি ও প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার জন্ত এদের প্রয়োজনীয়তার বিষয় ভাববার সময় হবে, এটা বর্তমান সমস্যা নয়।

অনিমল নান্দেন

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩.৫০ টাকা।

“...সমাজতত্ত্বের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিষ্কৃত করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতত্ত্ব অর্থনৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।”
... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১.২৫

“...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া ‘নান্ত পন্থা বিজতে অয়নায়।’ (ভূমিকা)

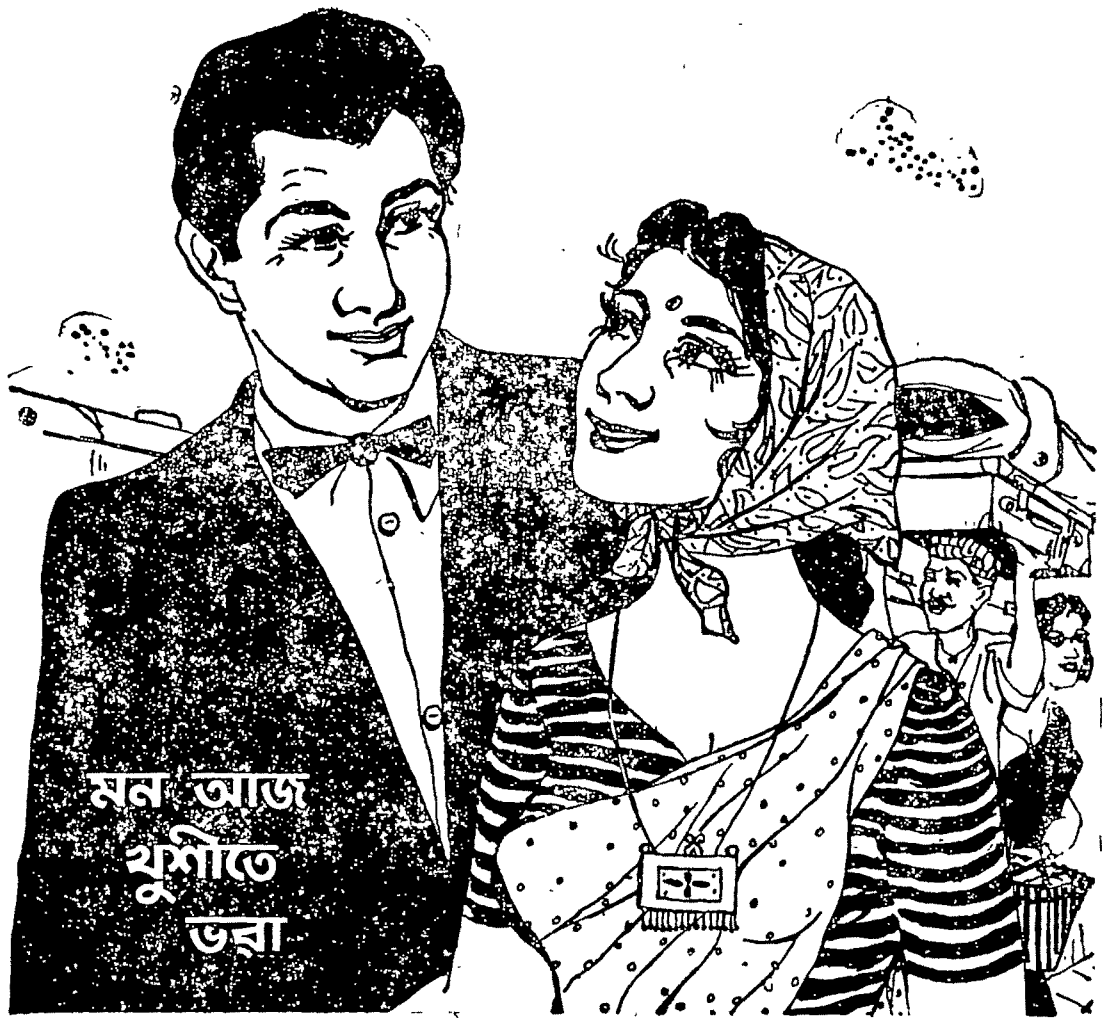
নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে
এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়দ্রী—৩০৯, গান্ধী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯



মন আজ
খুশীতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জন্মের জন্ত
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্ত।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্ত সাধনার
অব্যর্থ মহোষধ প্রতিদিন আহারের পর
দুইবার করে দু'চামচ **অ্যান্টিবায়টিক** (৬ বৎসরের
চার চামচ **অ্যান্টিবায়টিক** (৬ বৎসরের
পুরাতন) থাকেন। এতে ক্রান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাম্রাট **অ্যান্টিবায়টিক** চাকা



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আইআরসিআই, এক, সি, এস, (লণ্ডন),
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাঙ্গলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রে ডক্টর
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি, বি-এস, আইআরসিআই।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

তিনটি কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

স্মৃণা

স্মৃণা, কিন্তু হাত-পা-মুখ নেই,
কে যেন কী অঙ্ককারে বলেছিলো
আমার সামনেই

তৈরী নিলো

স্মৃণা ;

এখন তবে ভূতের সঙ্গে লড়াই,

স্মৃণা ?

খেদ

কী এনেছো ? আমার জন্তে কি আছে ?

তুমি এখন অনেক দূরে থাকো কেন ?

তুমি পাঠিয়েছিলে একটি ভাঙা মানুষ

(তোমার সঙ্গে থাকে ? নাকি প্রেমিকই সে ?)

আমার তাকে ভালো লাগলো না ॥

কলহ

এভাবে খেলার কোনো মানে হয় না—

তুমি যে নেশার ঘোরে উল বোনো,

চাঁদা পাও এখানে সেখানে

ভারই বা কি মানে ?

বঁচে থাকা যায়, যদি ভাব হয় সমানে-সমানে ॥

অভিষেক : সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

নয়তো অভ্যঙ্গে ফিরে আসা
এ বিজন একান্তের ঘরে
খুলে যার হাজার ররোকা
দৃশ্য হতে দৃশ্যের অন্তরে ।

রম্য রুদ্ধ রাগে একাসনে
অকস্মাৎ খুশীর ঝলক
অপগত সময়ের ঝড়
ভিতরে তাকাই অপলক ।

বুকের ভিতর কী যে হয়
বাতাসে দূরের পরিমল
এ যেন নতুন অভিষেক
হৃদয়ে মেলেছে শতদল ।

শেষ পরিক্রমা : মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

ওই চাঁদ করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ
পৃথিবীও করে সূর্য পরিক্রমা—
ভেবো না নিয়ত তোমারি চতুর্দিকে
আমি ঘুরে যায প্রতিদিন প্রিয়তমা ।

আগ্রহ ছিল যদিও সিদ্ধরসে
ভাঙবো না আমি পুরোনো দেউলটিরে,
তবু সমুদ্রে জোয়ারে জলোচ্ছ্বাসে
সব ডুবে যায় কক্ষাতিধির ভীড়ে ।

যদি ফুল তুলে প্রতিদিন সাজি ভরে
টেবিলে রাখতে—কাজকরা ফুলদানী
পূর্ণতা নিয়ে নিশ্চিত খুশী হতো—
কত অসহায় অমর্ত্য রাজধানী ।

আজ বিকেলের নিরাল। অবাঞ্ছিত,
আমার পৃথিবী সহসা কেন্দ্রচ্যুত
আমি ঘুরে যাই অতকিছুর টানে
আমার হৃদয় বেদনার আশ্রুত ।

জানলে না তুমি ভূকম্পনের ফলে
আমি সরে গেছি অল্প ভূমণ্ডলে ।

মুখশ্রী : বিজয়কুমার দত্ত

তোমার মুখের শান্ত ভাস্কর্যের নিটোল রেখায়
কৈশোর জ্যোৎস্নার আলো চকিত বিদ্যুতে
ফিরে আসে হৃদয়ে আমার—

যে দৃশ্য কখনো আমি দেখিনি আশ্চর্য
সেই সব বনবীথি, খেজুর গাছের নীচে অপরাহ্ন বেলা—
আমার চোখের সামনে ছায়াছবি হয়ে উঠতে চায় ।

যে নদীর স্নিগ্ধ ধারাজল,
নক্ষত্র আকাশতলে দৌরলোক, ছিলজানি অস্পর্শ আমার,
তোমার চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে
সেই জলে যেন স্নানশেষে
শুদ্ধ হয়ে উঠি । তোমার নরম চোঁটে

দেখেছি নিরুদ্বিগ্ন ভাঁজ, যেন সেই পাথর প্রতিমা

বিসর্জনে যেতে যেতে, হঠাৎ 'তু' চোখ ভরে আনে লোনাজল
তুমি কি চিরটা কাল, দূরে দূরে পড়ে থাকবে, আর
আমার বুকের ক্ষীণ ফাটলে নন্দিত থাকবে—ইহকাল কিংবা

পরকাল ?

প্রভু নয় বন্ধু বা পাকিস্তানের স্বাধীনতা

অশোককুমার মজুমদার

ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আয়ুব খান, পাকিস্তানের বর্তমান রাষ্ট্রপতি; তিনি সম্প্রতি তাঁহার আত্মজীবনী^১ প্রকাশ করিয়াছেন।

বইটিতে যে সকল তথ্য, বিশেষতঃ মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আয়ুবের বইকে এক হিসাবে 'propaganda' বলা যাইতে পারে; প্রথমত তিনি নিজের দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতিকল্পে কি করিয়াছেন

তাঁহার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে। কিছু উন্নতি তিনি নিশ্চয়ই করিয়াছেন : দেশে অতি বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল, এখন আর তাহা নাই। তবে পূর্ব-পাকিস্তানের অস্থিরতার জন্ত তিনি পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের দোষ দিয়াছেন, তাহা কতটা সত্য বলা কঠিন। গত ১লা ডিসেম্বর (১৯৬৭) পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের প্রথম দিন, ডাঃ আলিম-আলি রাজি "প্রভু নয় বন্ধু"র উপর প্রশ্ন করিবার মোটীশ দিয়াছিলেন। পরিষদে এই প্রশ্নটি গৃহীত হয় এবং নম্বর হয় ১৫। কিন্তু পরিষদের অধিবেশনের দিন প্রশ্নটি রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়া যায়, এবং প্রশ্নের তালিকার ১৪ নম্বরের পর ১৬ নম্বরের প্রশ্ন দেখা যায়। প্রশ্নকর্তা এবং তাঁর সমর্থকেরা এই ব্যাপার লইয়া আপত্তি করেন ও স্পীকারের

সঙ্গে বাগ-বিতণ্ডা আরম্ভ হয়। পরিশেষে স্পীকারের নির্দেশে দুইজনকে সার্জেন্ট বজপূর্বক সভাগৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়, ফলে বিরোধী পক্ষ এই পরিষদের সেশন বয়কট করেন।

পূর্ববঙ্গের সভ্যদের উত্তেজিত হইবার কারণ আয়ুব তাঁহার বইয়ে পূর্ববঙ্গবাসীদের বিরুদ্ধে নানারকম মন্তব্য করিয়াছেন, এমন কি পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অতি কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছেন।^২ যাই হোক ইহা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, অতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বোধ হয় বলা আবশ্যক। আমাদের শাসক গোষ্ঠির অভ্যাচারে জর্জরিত হইয়া একদল লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে ভারতেও পাকিস্তানের ছায় 'সামরিক একনায়কত্ব' অথবা military dictatorship প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমাদের সব সমস্যার অবসান হইবে। তাঁহারা পাকিস্তানের প্রকৃত তথ্য ভাল করিয়া জানেন বলিয়া মনে হয় না। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁর মৃত্যুর পর হইতেই, পাক্কাবী ও অ-পাক্কাবী মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয়। সেই দীর্ঘ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বর্তমান প্রবন্ধে নিম্নয়োজন।

২। Ibid, p. 187.

১। Mohamoed Ayub Khan, President of Pakistan: *Friends not Masters*; Oxford University Press, London, 1967.

আয়ুব প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে পূর্ব পাকিস্তানে অধিবাসীগণ ভারতের আদিম অর্ধাৎ অসভ্য জাতিদের বংশধর, এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা বিজেতাদের বংশধর।

কেবল মনে রাখা উচিত যে আবুশাহীর প্রবর্তনের সঙ্গে পাক্সাবাদের সম্পূর্ণ জন্ম হয়। পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিট করে পাঠান, বাসুচ ইত্যাদি জাতিদের ব্যয়তশাসন কেড়ে নেওয়া হয়, এবং দেশের বেশীর ভাগ সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতি করে লাগান হয়। আসলে পাকিস্তানের সৈন্য বাহিনীকে, ‘পাক্সাবী সৈন্যবাহিনী’ বললে অত্যাঙ্ক হয় না। পূর্বপাকিস্তানের আশ্রয় চেষ্টার অত্যাধি দুইটি battalion পূর্ব পাকিস্তান হইতে লওয়া হইয়াছে। দুই battalion এ প্রায় ১৫০০ (দেড় হাজার) সৈন্য; সমগ্র পাকিস্তান স্বপবাহিনীর সংখ্যা অন্ততঃ দশ ডিভিশন, অর্থাৎ দুই লাখ। এই অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান-বাসীরা পাকিস্তানে কি গর্হাণা বা সম্মান লাভ করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ভারতের সামরিক একনায়ক প্রতিষ্ঠিত হইলে অমূল্য অবস্থা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। সামরিক অফিসার প্রায় সমগ্রাণে হইতে নিযুক্ত হইলেও, ভারতীয় সেনা-বাহিনী মানাকরণে রাজপুত, শিখ, জাঠ, পাক্সাবী গাড়ওয়ালী কুশাহী, মারাঠী, ওড়িয়া, বিহারী ও যুক্তপ্রদেশী ও মাদ্রাজি লইয়া গঠিত। যে কোন প্রকার সামরিক শাসনে এই সব ভাষাভাষীরা প্রাধান্য লাভ করিবে। পূর্বোক্ত ভাষাভাষীদের মধ্যে পাক্সাবী এবং শিখদের প্রাধান্যই অধিক, সুতরাং উত্তর ভারতে তাহারা প্রভুত্ব করিবে, এবং স্বল্পে শিবসেনার কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় যে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে পশ্চিম ভারতে অর্থাৎ গুজরাতে আবার মারাঠী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আবুশাহীর এই দিকটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

* * *

আমাদের পক্ষে অবশ্য ‘প্রভু নয় বন্ধু’তে আবু তাঁর পররাষ্ট্রনীতির যে দিকটা দেখাইয়াছেন, তাহাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিজের বৈদেশিক নীতিকে সমর্থন

করিবার জন্য তাঁহাকে নানাপ্রকার মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইয়াছে^৩।

এই কারণেই, প্রেসিডেন্ট আবুয়ের মতে, পাকিস্তানের সৃষ্টি অবশ্য ফর্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। অর্থাৎ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দেও ভ্রাতৃগণের ভ্রাতৃত্বপদের ছায়া মাড়াইতেন না। অতীতে কি হইয়াছিল তাহার ইতিহাস পরে আলোচিত হইবে।

ইসলামের প্রতি হিন্দু নেতাদের মনোভাব সম্পর্কেও আবু এই বাক্য মতের অপলাপ করিয়াছেন, যথা :

Indian nationalism is based on Hinduism,
and Pakistan's nationalism is based on Islam.
(p. 128)

পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদ তথা-কথিত ইসলামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার কেন? আবু আবার লিখিতেছেন :

“The Indian attitude can be explained only
in pathological terms. The Indian leaders
have a deep hatred for the Muslims, and since

৩। It was Brahmin chauvinism and arrogance that had forced us to seek a homeland of our own where we could order our life according to our thinking and faith. They wanted us to remain as serfs, which was precisely the condition in which the Muslim minority in India lived to-day. There was the fundamental opposition between the ideologies of India and Pakistan. The whole Indian society was based on class distinction in which even the shadow of a low-caste man was enough to pollute a member of the high caste.

(I bid, p. 172)

they must disclaim and deny it all the time they are the victims of continual tension." (p. 115)

"India particularly has a deep pathological hatred for the Muslims and her hostility to Pakistan stems from her refusal to see a Muslim power developing next door." (p. 188)

এই রকম নির্জলা মিথ্যা উক্তির প্রত্যুত্তর সাধারণতঃ না দিয়া চুপ করিয়া থাকাই সুস্তি-যুক্ত। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে ইহাকে পাগলের প্রলাপোক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কারণ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এই মন্তব্য করিয়াছেন; এই দেশ গত কুড়ি বছরে তিন বার আমাদের আক্রমণ করিয়াছে, এবং অধুনা আমাদের আক্রমণ করিবার জন্য প্রাণপণ বেগে নিজের সামরিক শক্তি বাড়াইয়া চলিয়াছে, চীনের সাহায্য লইতেছে ইত্যাদি।

হিন্দুরা যে মুসলমানদের নির্ধাতন করে, এই অভিযোগ পুরাতন। সার লৈয়দ আহম্মদ খানের সময় হইতেই যখনই এক শ্রেণীর মুসলমানদের ইংরাজের নিকট হইতে রূপাতিক্ষা করিতে হইয়াছে, তখনই ডাহারা এই ধূমা তুলিয়াছে। এই সঙ্গে তাহারা আর একটি দাবীও উত্থাপন করিত, যে ইংরাজেরা মুসলমানদের পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, অতরাং মুসলমানদের দেশটা ফিরাইয়া না দিলেও, বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া কর্তব্য।

এ দুইটি দাবী পরস্পর-বিরোধী এবং দুইটিই ভিত্তিহীন। বিতীয়টিই প্রথমে আলোচনা করিতেছি। ইংরাজেরা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল প্রধানতঃ মারাঠা এবং শিখদের নিকট হইতে। মুসলিম শক্তির মধ্যে হায়দারাবাদের নিজাম প্রায় প্রথম হইতেই ইংরাজের আয়ুগত্য স্বীকার করিয়া

নিজেকে বাঁচান। টিপু-সুলতান অবশ্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অযোধ্যার নবাবকে যখন ডাংহোসি প্রায় পেরাদা পাঠাইয়া প্রেষ্টার করেন ও রাজ্যচ্যুত করেন, তখন তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। গিরাজদৌলা অবশ্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অরণ শক্তিতে নির্ভর করিয়া বোধ হয় লেখা যায় যে সে যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে যত লোক হতাহত হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যক্তি পশ্চিম বাংলার খোষ মন্ত্রীকে হতাহত হইয়াছেন; এবং লর্ড ক্লাইভের হাতে যত বাঙ্গালী মরিয়াছিল, তদপেক্ষা বেশী বাঙ্গালী কংগ্রেসী আমলে বাংলার ঘায়েল হইয়াছে। খালম্ অন্তিনিস্তারো।

এইবার প্রথম দাবিটির আলোচনা করা যাক অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের চাপে বা অত্যাচারে মুসলমানদের ধর্ম, সমাজ ও ঐতিহ্য নাশ হইবার আশঙ্কা আছে কি না। হুডরাং ইংরাজ দেশ দখল করিবার পূর্বে হিন্দু ও মুসলমানদের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে, যে কে কাহার উপর ধর্মান্তার বশীভূত হইয়া অত্যাচার করিয়াছে।

ইসলামের প্রতি হিন্দুরা চিরকাল সহনশীলতা দেখাইয়াছে, ইহা বলিলে অত্যাশঙ্কিত হইবে না। আরবরা সিন্ধুদেশ দখল করার (710 খৃঃ) পরও, আরব বণিকগণ স্বচ্ছন্দে ভারতে বাণিজ্য করিতেন। সুলতান মাহমুদ ১০২৫ খ্রীঃ গুজরাত আক্রমণ করিয়া গোমনাথের মন্দিরটি ধ্বংস করেন, কিন্তু ১০৫৩ খ্রীঃ বর্তমান আহম্মদাবাদে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিক মুহম্মদ উফি লিখিয়াছেন যে বর্তমান ক্যাশে নগরে পার্শীদের ঘারা উত্তেজিত হইয়া হিন্দুগণ এবটি মসজিদ ধ্বংস করিলে গুজরাতের সম্রাট জয়সিংহ সিদ্ধবাজ (১০৯৩-১১৪৩ খৃঃ) স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাম্র করিয়া অপরাধীদের দণ্ড দেন এবং মসজিদটি পুনর্নির্মাণের জন্য মুসলমানদের এক লক্ষ মুদ্রা দেন। উফি মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহার সহিত তুলনা করিবার ঘটনা কখনও

শেনা যায় নাই। গুজরাতে এই সময়ে হিন্দুরা মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণের জন্য আরো সাহায্য করিয়াছিল তাহার অন্ত্যস্ত প্রমাণ আছে।

কেবল গুজরাতে নহে, মুসলিম সাধকগণ, ভারতে মুসলমান স্থলতানত্বে, প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই যথেষ্ট বিচরণ করিডেন, এবং আজমীর, নগৌর, কনৌজ, বিলগ্রাম, এবং কাহারো কাহারো মতে বারাণসীতেও তাঁহাদের বসবাস ছিল।

হিন্দুরা যে মুসলমানদের প্রতি কোনো অত্যাচারই করে নাই, তাহা নহে। পরবর্তী কালে গুজরাতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং গুজরাতে স্থলতানেবা রাজত্বানের অনেক মন্দির ধ্বংস করার পর, মহারাণা কুন্ত গুজরাতে একটি মসজিদ ধ্বংস করেন। এইভাবে আওরঙ্গজেবের অত্যাচারের ফলে মহারাণা রাজসিংহের পুত্র, কুনওয়ার ভীম, গুজরাতে কয়েকটি মসজিদ ধ্বংস করেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। কিন্তু ইহা যে অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ যদি হিন্দু এবং শিখেরা বাস্তবিকই ইসলাম বিদ্বেষী হইত, তাহা হইলে পরবর্তীকালে যখন শিখ এবং মাঝাঠারা পাঞ্জাব এবং উত্তর ভারতে প্রভুত্ব বিস্তার করিল তখন শিখেরা কখনও মুসলমান ধর্মের অবগাননা কবে নাই, ইহা সর্বজন বিদিত। মারাঠাদের সম্বন্ধে ইতিহাসের সাক্ষ্যও তাই ৪।

During the first half of the eighteenth century, precisely the same question arose.... The Marhatta Infidels had overrun the Muhammadan Empire of India. Provinces which had formerly been ruled over by Musalmans or Hindu Deputies, according to

৪। বঙ্গবীর মধ্যের সংখ্যা আয়ুবখানের পুস্তকের পৃষ্ঠার সংখ্যা নির্দেশ করে।

the Muhammadan Law, were seized by an Unbelieving Dynasty. Among the more devout Musalmans, the question of their status under the conquerors and of their obligation to rebel against them, immediately arose. It was decided that, in as much as the Marhattas satisfied themselves with taking one-fourth of the revenue without further interfering with the actual administration, India still remained a country of Islam. They left the Muhammadan Governors of Provinces untouched. They maintained the Muhammadan Judges and Law officers undisturbed. On the demise of a Musalman Governor, a new ruler of the same religion was appointed. Indeed the confirmation of his hereditary successor was considered a matter of right upon payment of a present to the distant Marhatta court. The following is the Decision which the greatest authority of that time (Kazi Muhammad Ali) gave forth : 'Now let us suppose that a Country of Islam has fallen into the hand of Infidels who, however, permit the Muhammadans to say their Friday and 'Id Festival prayers; who maintain the law of Islam, and appoint Kazis to carry it out according to the wishes of the Musalmans, but in which, nevertheless, the Muhammadans have to ask the Infidels to appoint (the Musalman) Governors. Such countries un-

happily exist in our time, where Muhammadan Governors are appointed by Infidels, and where the Friday and 'Id prayers are still said. For the Infidels (Marhattas) have taken possession of some of our Provinces. It is therefore needful for every Muhammadan to know what the law says in such a case.

'The truth is that if such a Mahammadan Province falls into the hands of the Infidels, it continues a Country of the Faithful, because no country of the Enemy is adjacent to it, and because the law of the Infidels is not introduced, and because the Governors and the Judges are Muhammadans, who decide according to the laws of I-lam, and because even the Infidels themselves refer all matters to the Muhammadan law, and the Musalman Law officers pass sentence on the Infidels.'^৫

এই ফতোয়ার উপর সন্তব্য করিয়া হাক্টার লিখিয়াছেন :

Not one of the reasons here assigned for India continuing a Country of the Faithful holds good at the present time.^৬

অর্থাৎ মারাঠাদের অধীনে মুসলমানগণ যে স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করিতেন, ইংরাজ আগলে তাহা লুপ্ত হয়। অতরাং

ইতিহাসের বিচারে দেখা যায় যে মুসলমানদের হিন্দু-বিভীষিকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

এখানে বোধ হয় বলা আবশ্যক যে মারাঠাদের নিকট হইতে সমস্ত স্ববিধা পাওয়া সত্ত্বেও শাহ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখ নেতাগণ, আহম্মদশাহ আবদালীকে ভাবত আক্রমণ করিতে অমুরোধ করেন। এবং এই ওয়ালীউল্লাহকেই, আবদুলহান ভারতে মুসলমানদের নব জাগরণের কৃতিত্বের জন্য উল্লেখ করিয়াছেন।^৭

আহম্মদ শাহ্ আবদালী মারাঠাদের পরাজিত করিলেও, ভারতে আর মুসলমান শক্তির পুনরুত্থান হইল না। ইংরাজ দেশ জয় করিতে আরম্ভ করিল। মুসলমান ওয়াহাবীরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ব্যর্থ হইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুদের সহিত ষোগ দিয়া সিপাহী বিদ্রোহ করিল; ফলে ইংরাজের হাতে এমন নির্যাতন ভোগ করিল যাহা ভারতে মুসলমানদের কখনও ভোগ করিতে হয় নাই। তাহার পর আর গৈয়দ আহম্মদের নেতৃত্বে তাহার ইংরাজের সহিত ষোগ দিয়া ভারতের গণজাগরণের বিরুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা করিতে আরম্ভ করিল। এই কুকর্মের যে একশ্রেণীর মুসলমান নেতা ইংরাজের নিকট হইতে সর্বপ্রকারের সাহায্য পাইয়াছেন, তাহা সর্বজনবিদিত।

এই ধরনের রাজনীতির মূলে, মুসলমানদের ধর্মভিমান। মুসলমানদের ধারণা যে তাহার কখনও অস্ত্রধর্মাবলম্বীর অধীনে থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বিজেতাভিমান। একসঙ্গে মুসলমানগণ উত্তর-ভারত বিজয় করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুদের

৫। W. W. Hunter : *The Indian Muslims*. The Comrade Publishers, 1945; pp. 128-29.

৬। Ibid, p. 129,

৭। 'The Muslim renaissance in the sub continent began with Shah Waliullah who started probing into the past and thinking in terms of the future. Then came Sir Syed Ahmed... (Ibid p. 202)

উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই গর্ব মুসলমানদের মনে এখনও আছে।

সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর সার সৈয়দ বুঝিতে পারিলেন যে, ভারতে মুসলমান রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। ভবিষ্যতে হয় ইংরাজ শাসন কায়েম হইবে, নচেৎ স্বায়ত্তশাসন। যদি ইংরাজ শাসন কায়েম হয় তাহা হইলে নূতন আদেশিকতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, ইংরাজকে সম্বলিত করিতে পারিলে নানা প্রকার অবিধা পাওয়া যাইবে। আর স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা লাভ হইলেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইতে বাধ্য। গণতন্ত্রে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে বাধ্য; সুতরাং মুসলমানরা আর হিন্দুদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও, আহমদ শাহ্ আবাদলীকে আনিয়া হিন্দু-মারাঠাদের পরাজিত করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাহা অসম্ভব হইয়া দাড়াইল। একমাত্র ইংরাজের সাহায্য ভিন্ন ভারতীয় মুসলমানদের স্বাভাব্য প্রতিষ্ঠা করার আর অন্য উপায় রহিল না। পূর্বেই বলিয়াছি যে ইংরাজ শাসক গোষ্ঠীও এই ধরনের পরিস্থিতির সম্পূর্ণ অযোগ্য লইতে উন্মুখ হইয়াছিলেন। সুতরাং সহজেই ইংরাজ ও মুসলমানের ঐক্য স্থাপিত হইল। মুখ্যতঃ ইংরাজ ও মুসলমান অথবা মুসলিম লিগের একই উদ্দেশ্য হইলেও, মূলতঃ পার্থক্য ছিল। ইংরাজের উদ্দেশ্য মুসলিম লিগের সাহায্যে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদকে দাবাইয়া রাখা। মুসলিম লিগ, বিশেষতঃ জিন্নার উদ্দেশ্য ইংরাজের সাহায্যে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদকে শক্তিশীন করিয়া মুসলমানদের জুগ্ম শক্তির পুনরুদ্ধার। বুদ্ধির যুদ্ধে শেষ-পর্যন্ত জিন্নার জয় হইল; ইংরাজেরা—ভারতবর্ষ ছাড়িয়া বাইতে বাধ্য হইল সুতরাং মুসলিম ভোষণনীতি তাঁহাদের স্বার্থ কায়েম করিতে পারিল না। কিন্তু জিন্না পাকিস্তান পাইলেন।

কিন্তু পাকিস্তান পাইয়াই জিন্না এবং পাকিস্তানের নেতারা

সম্বলিত হইলেন না। তাঁহাদের চেষ্টা হইল যে কিভাবে ভারতকে শক্তিশীন করিয়া এই উপসহায়ে পুনরায় মুসলমান প্রভুত্ব স্থাপন করা যায়।

ভারত ও পাকিস্তান যখন স্বাধীনতা লাভ করে, তখন পাকিস্তানের তুলনায় ভারত এত অধিক শক্তিশালী ছিল যে, অন্যায়সেই পাকিস্তান জয় করিতে পারিত। কিন্তু বিজেতা-মূলত মনোভাব লইয়া, পাকিস্তান প্রথম হইতেই ভারতের সহিত অন্ত্যস্ত অসহ্যবহার করিতে লাগিল। মুসলমানদের এই উগ্রতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় হায়দ্রাবাদে। ভারতীয় সেনাবাহিনী একরকম বিনা যুদ্ধেই হায়দ্রাবাদ দখল করে; কিন্তু তাহার পূর্বে হায়দ্রাবাদের মুসলমান বেকরাগ হাজার দিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হইতেছিল যেন, হায়দ্রাবাদের নেতা কাশিম রিজভী মুলতান মাহমুদের মত হিন্দুদের পরহাস্য করিবেন।

বাহা হউক পাকিস্তানের নেতারা কাশিম রিজভীর মত মূর্থ নহেন; কোনো একটি বৃহৎ শক্তির সাহায্য ব্যতীত ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে কি ফল হইবে, তাহা তাঁহারা প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আনুবেব একটি উক্তি বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য :

'In 1951 when the Indians built up heavy military concentration against us all along the border, Liaquat Ali Khan seemed tempted by the prospect of war. He said, 'I am tired of these alarms and excursions. Let us fight it out.' I submitted to him that before making up his mind he should take into account the views of those whose profession it was to fight. We had only thirteen tanks with about forty to fifty hours engine life in them to face the Indian army at the time, and not only our

politicians but our troops were itching to settle accounts with India. It was my job to hold them back, which, thank Heavens, I did.'

(p. 40)

(আমুস এই সময়ে পাকিস্তানের কমান্ডার-ইন-চিফ ছিলেন।)

অতঃপর ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পাঠানো গেলো না, এবং পাকিস্তানের নেতৃগণ ভারতের সহিত শান্তিপূর্ণ ভাবে কাশ্মীর সমস্যা মিটাইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯৫৩ আগষ্ট মাসে ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ জনমতের দ্বারা গৃহীত হইবে, এই মর্মে একটি যুক্ত ইত্তাহার প্রকাশ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্বেই পণ্ডিত নেহরু জানিতে পারিলেন যে পাকিস্তান আমেরিকার নিকট হইতে প্রচুর সামরিক সাহায্য পাইবে। ২১ ডিসেম্বর, ১৯৫৩, নেহরু এই সাহায্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীকে পত্র দিলেন এবং আমেরিকার এই সাহায্যের ফল হইবে: "A qualitative change in the existing situation and, therefore, it affects Indo-Pakistani relations, and most especially, the Kashmir problem."

এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও পাকিস্তান আমেরিকার বিপুল সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিল, বিনিময়ে তাহারা SEATO ও বাগদাদ চুক্তির অংশীদার হইল। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিলেন যে আমেরিকার সামরিক সাহায্য পাওয়াতে, কাশ্মীর সমস্যা সহজেই মিটান যাইবে। উক্তরে পণ্ডিত নেহরু লিখিলেন:

That means, that you wish to settle this issue by force of arms or by threat to arms.

প্রেসিডেন্ট আমুস এই চিঠির উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন:

On December 23, 1953, Pandit Nehru indicated that he could not go forward with agreements set out in the joint communique on Kashmir because the whole context in which these agreements were made will change if military aid comes to Pakistan from America. (p. 181)

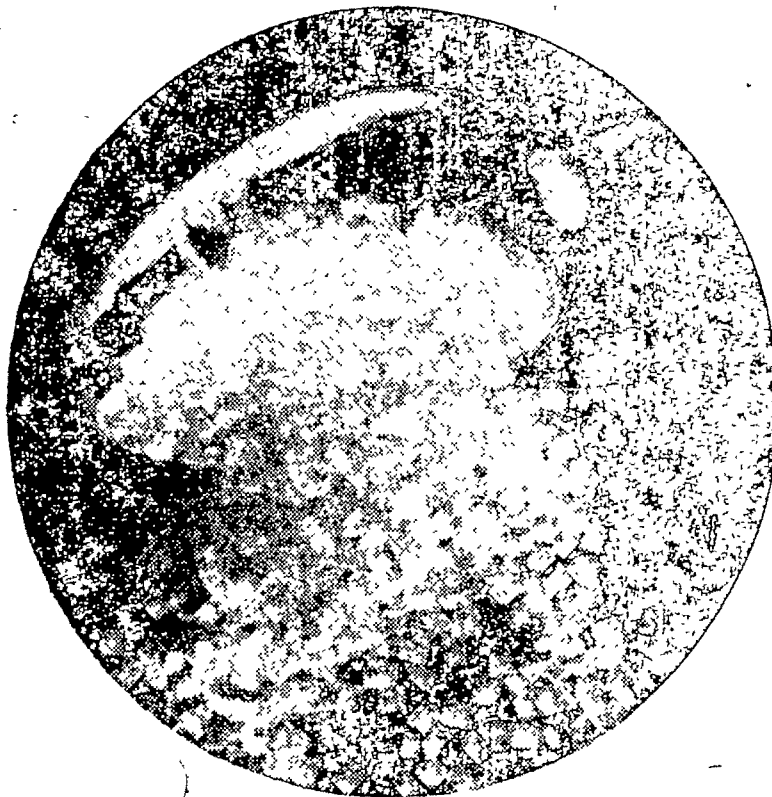
এইভাবে ভারত ও পাকিস্তানের সমাগতপ্রায় মৈত্রী সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া পাকিস্তান আন্দোলনের সহিত আমেরিকার নিকট হইতে অল্প সাহায্য গ্রহণ করিল, এবং আমেরিকা অকাতরে সাহায্য দান করিল। যেমন পূর্বে ইংরাজরা জিন্না ও মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। এখন হইতে আমেরিকা হইল পাকিস্তানের 'বন্ধু'। আমুস লিখিয়াছেন:

Now, I do not deny that the objectives which the Western powers wanted the Baghdad Pact to serve were quite different from the objectives we had in mind. But we never made any secret of our interest. (Pp. 155-56)

অর্থাৎ আমেরিকার প্রদত্ত অল্প যে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিবে, তাহা পাকিস্তান আমেরিকাকে জানান সত্ত্বেও, আমেরিকা পাকিস্তানকে সাহায্য দিয়া আসিয়াছে। অবশ্য ইহা আখ্যের কথা।

(ক্রমশঃ)

in any language, it's sweet



In old French it was called ZUCHRE. In Arabic and Persian it is SUKKAR and SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek. One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other has been known to mankind from the neolithic age.

Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar.

Issued by :

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD. THE OUDH SUGAR MILLS LTD. NEW INDIA SUGAR MILLS LTD. THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD. BHARAT SUGAR MILLS LTD. GOBIND SUGAR MILLS LTD.

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PVT. LTD.

Industry House, 159, Churchgate Reclamation, Bombay-1

“মুন্সের কঠিন হাসি”

শঙ্করী প্রসাদ বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীমতী কুন্ডি চমকে শিউরে উঠলেন, তাঁর স্বামীও। আধ্যাত্মিক মানুষটির মুখে এ কী কথা! অসম্ভব—অবিশ্বাস—হঠাৎ ছন্দ পতন হল যেন—

তবু—সেই একই মানুষ—তিনিই—এসেছিলেন কুন্ডি দম্পতির মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। প্রতীক্ষায় ছিলেন তাঁরা, দরজার ঘণ্টা বেজেছিল, তিনি ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, খাছু ভঙ্গিতে, অসাধারণ মর্যাদার সঙ্গে। সকলে টেবিলে বসেছিলেন, ‘অবিলম্বে আবহাওয়া এক বিচিত্র প্রভাবে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, ‘মনে হয়েছিল বার্গিনের পরিচিত ধূসর আলো বেন নির্মল উজ্জ্বল হয়ে গেছে; পরম আকর্ষণীয় বিচিত্র মানুষটিকে ঘিরে মিস্ট্রিসিংয়ের দ্ব্যতি—’

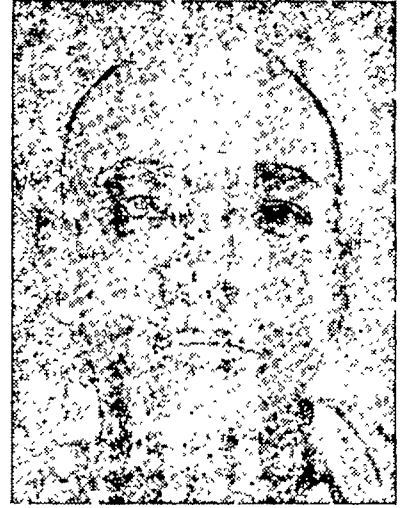
আরও মনে হয়েছিল, এই মানুষটির দৃষ্টি পড়িয়ে প্রবেশ করে যায়, ইনি অপর মানুষদের চেয়ে অনেক দ্রুত অনুভব করেন, ‘এই মধুর রহস্যময় স্নাতাটির অসাধারণ ক্ষমতা আছে অস্ত্রের বস্ত্রব্য উপলব্ধি করার’ এবং আছে মধুর মধুর হাসি, মুখে লেগেই আছে তা, অগ্নান আলোকের ধারার মত ঝড়ে পড়ছে নিয়ত।

মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্ত টেবিলে বসার পরে শ্রীমতী কুন্ডি জেনেছিলেন, উনি মাংস খান না তা নয়, তবে অল্প খান, ইউরোপীয়দের ভুলনার হিন্দুরা সামান্যই মাংস খায়। যখন তিনি কথা বলছিলেন, তাঁর নমনীয় হাতের আকার লক্ষ্য করেছিলেন শ্রীমতী কুন্ডি, একেবারে প্রাচ্য হস্ত, হুঁহাম হাড়, সঙ্গ সংবেদনশীল আঙ্গুল, দেখে বোঝা সম্ভব নয় শক্তি আসে কোথা থেকে—

“মিঃ বসু, বড় স্নিগ্ধ রোদের দিনটি আজ; এখন বেড়িয়ে আসছেন না কি?”—শ্রীমতী কুন্ডি প্রশ্ন করলেন। তারপরেই বোমা বিস্ফোরিত হল। কান কাঁ কাঁ করে উঠল কুন্ডি দম্পতির—এমন ধাক্কা খেলেন যে ধানিকক্ষণ অসাড় হয়ে গেল ইন্দ্রিয় যেন।

মিঃ বসু বললেন—

“না, মিসেস কুন্ডি, মিঃ গোরেরিঙের সঙ্গে আমার একটা ইন্টারভিউ ছিল। আমি সোজা তাঁর অফিস থেকেই এখানে আসছি।”



নাজীদের সম্বন্ধে এই চেক মহিলার যে মনোভাবের কথা আগে জেনেছি, তাতে সহজেই বুঝতে পারি, কী দারুণ আহত তিনি হবেন স্বভাষচন্দ্রের কথায়। স্বভাষচন্দ্রের মত আধ্যাত্মিক এবং দীপ্তবুদ্ধি মানুষ অবশ্যই জানবেন, নাজী জার্মানী কাদের প্রতিনিধি? নিশ্চয় তিনি অসম্ভব করেছেন, জার্মানীতে 'নৈতিকতার সম্পূর্ণ বিনাশকে, নিদারুণ উদ্ভাস্তিকে। শুধু জার্মানীর নয়, ইউরোপের, কিংবা বলা চলে সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার।'

কুর্তি দম্পতি অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করেছিলেন। সে যন্ত্রণায় কোনো ভঙ্গি ছিল না, অপরপক্ষে ভালবাসা ছিল সত্যের ও ভ্রাতৃত্বের প্রতি। সেইজন্যই তাঁদের পক্ষে অপরদিকে স্বভাষচন্দ্রের যন্ত্রণার আকৃতিকে বোঝা সম্ভব হয়েছিল। তরুণ বালক কী যন্ত্রণায় নিম্ফলে পাথরে মাথা কুটে মরে, তা তাঁরা জানতেন বলেই পাথর-ফাটা অগ্নিগিরির অভ্যুত্থানকে শেষ পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করতে পেরেছিলেন, যদিও জানতেন তা পৃথিবীকে নাড়া দেবে,—মরবে, হয়ত মরবে মানুষ।

এই অংশে শ্রীমতী কুর্তির গণিত-গভীর রচনাংশ অনুবাদ করে দিই—

"গোয়েরিঙের সঙ্গে এমন মানুষের কী প্রয়োজন থাকতে পারে? কি ভাবে ইনি লোকটার আকার, তার গন্ধ সহ্য করতে পারেন—সেই বৃহৎ পশু—নাজী, জার্মানীর খ্যাতি বাড়টিকে—! যদি কখনো সম্পূর্ণ বিপরীত ছুটি মানুষ হয়ে থাকে, তাহলে গোয়েরিঙ ও বোস তাই।

আমি অবশ্য বুঝেছিলাম, ইউরোপের, বিশেষতঃ গ্রেট ব্রিটেনের সম্পূর্ণ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ভারত হয়ত স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হবে। এবং তা ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী যুদ্ধের ফলেই হওয়া সম্ভব, যা ইউরোপকে সম্পূর্ণ দুর্বল করে দিয়ে ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশের মুক্তি এনে দেবে।.....

হিটলার—গোয়েরিঙ গোয়েবলস্—এই ত্রিমূর্তি ইউরোপের আবর্জনার প্রতিনিধি—আমি জানতাম। আর, সর্বদেশের নির্বোধ জনতার পিছনে উৎসানি দিতে রয়েছে মহা স্বযোগ সন্ধানীর দল—বৃহৎ ব্যবসা, অতিকায় শিল্প, প্রতিপত্তিশালী অর্থনৈতিক গোষ্ঠী এবং নীতিহীন সংবাদপত্র—এরাই এখন বিজয়ী, পতনের যুগে যা হয়ে থাকে। জানতাম, এরা জোটবদ্ধ হয়ে আমাদের সকলকে শেষ করে দিতে পারে—শরীরে মনে প্রাণে, ভিতরে বাহিরে, সর্বাংশে ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভবপূর্ণ। মিঃ ব্রুও তা জানেন, স্পষ্টতঃই। এবং, সেই মুহূর্তে, আমি বুঝলাম, কেন তিনি বাঁগিনে।

এক মুহূর্তের জন্য আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। পরস্পরকে বুঝলাম। আমি বিচলিত। তিনি কাঁধে একটু নাড়া দিলেন, যেন এই কথাটাই বলতে :

আর করবারই বা কী আছে? জঘন্য কাজ, কিন্তু করতেই হবে। কাউকে না কাউকে করতে হবে। একটি মাত্র স্বযোগ এ জীবনে পেয়েছি, তাকে ছেড়ে দিতে পারি না। ভারতের জনগণকে অনাহারে, উৎপীড়নে, শোষণে নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিরদিন এ জিনিস চলতে দেওয়া যায় না। এ কাজ করতে এসেছি, কারণ না করে আমাদের উপায় নেই। পথ নেই, পথ নেই। বুঝতে পারছ না?

এবার আমাকে দীর্ঘ প্রতিবাদে কাঁধ নাড়াতেই হল। ইতস্ততঃ করে বললাম :

"হ্যাঁ, সে কথা ঠিক, তা বুঝি। আমি ও আমার দেশকে মুক্ত করতে সবকিছু করতাম—শুধু ঐ নাজীদের সঙ্গে

সম্পর্ক করা ছাড়া। ওজিনিস কদাপি করতে পারতাম না। তাদের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়া করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। অসহ ওরা। ঘৃণ্য, ছুঁলে শিউরে উঠতে হয়, সংক্রামক রোগের মত। আপনি কি সত্যই নিজের পৃথিবীর রক্ষার জন্য শয়তানের প্রতিনিধির সঙ্গে মিজতা করতে পারেন—বলুন!”

“ভয়ঙ্কর, সত্যই, কিন্তু উপায় নেই,” তিনি বললেন, “আমাদের পক্ষে একটি পথই খোলা আছে। ভারতকে তার স্বাধীনতা পেতে হবেই, যে-কোনো মূল্যে। তার অর্থ হয়ত ইউরোপের ধ্বংস। কিন্তু ইউরোপ—এ ইউরোপ তো আবর্জনার স্তুপ! অতরাং তার জন্য আমার মাথাব্যথা নেই। নিশ্চয় চমৎকার কিছু মানুষ আছেন, এখানে, ইংলণ্ডেও, যাদের জন্য আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও প্রীতি রয়েছে; তাঁদের কেউ থাকবেন, কেউ যাবেন, তাদের বিনাশে আমি বেদনাবোধ করব। অপরপক্ষে ভারতবর্ষে কিছু লোক টিকে যাবে, যাদের বাঁচার অধিকার নেই। কিন্তু ভাবালু হয়ে লাভ নেই কিছু। আমাকে আমার নির্ধারিত কর্তব্যই করতে হচ্ছে। শিঃ কৃতি, মিসেস কৃতি, ভারতের নৈরাশ্র, দ্বন্দ্ব, অপমানের চেহারা সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে? সে যে কী কষ্ট, কী লাঞ্ছনা—কল্পনা করতে পারেন? আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি, এখানে নাজিতস্ব যেমন, ভারতে বুটি^{*} সাম্রাজ্যবাদ তেমনই—একই রকম অসহনীয়। কিন্তু, মনে হয়, এসব কিছু আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব নয়।”

খানিক নীরবতা, ঘনীভূত গাঙ্গীরের মুহূর্ত। সঠিক উত্তর আমরা খুঁজে পেলুম না, কারণ তিনি যেভাবে অনুভব করছেন, সেভাবে অনুভব করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু মানুষটিকে আমরা যথার্থই বুঝছি। মূলে তিনি আত্মিক পুরুষ, স্বগভীর, যথার্থ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, এবং অভিজ্ঞতা, নিজের আত্মার আকৃতিকে রক্ষা করে নিয়েছেন রাজনীতিকের ভূমিকায়। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা—গভীর এবং সত্য।”

অভাষচন্দ্রকে—তাঁর অধ্যাত্ম স্বভাবকে কৃতি সম্প্রতি কিছুটা বুঝেছিলেন, তাঁর বিপ্লবী স্বরূপকেও কিছুটা, এবং তাঁরা ঐ বিপ্লবচেতনার মূলে কেবল উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকেই দেখেছেন, যা বহুলাংশে সত্য, কিন্তু অভাষচন্দ্রের চরিত্রের একটি গভীর দিককে বোধহয় সম্পূর্ণ ধরতে পারেন নি, যেখানে রয়েছে তাঁর বিপ্লব-চেতনার উৎস, যা কেবল স্থূল প্রতিবাদ-স্পৃহা নয়, যা তাঁর আধ্যাত্মিক চরিত্রেরই বিশেষ প্রকাশ—অভাষচন্দ্র নিজেকে নিয়তি-চালিত বলে মনে করতেন, মনে করতেন, কর্মেই তাঁর অধিকার। অভাষচন্দ্র ‘ভারতীয়’ বিপ্লবী, কারণ তিনি শক্তিবাদী বৈদান্তিক, বিবেকানন্দের অনুগামী। সৃষ্টি যখন আবর্জনাপুঞ্জ, তার অগ্নিসংকার করতেই হয়, তথাকথিত ভালোর সঙ্গে মন্দও গোড়ে একই শয্যায়। ভয়ঙ্করকে দেখতে হয়—ভয়ঙ্করকে দেখতে হয়—ছুঁচোখ খুলে। তাই দেখে এঁরা গেয়ে ওঠেন—‘কালী, তুই প্রলয় রূপিনী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।’”*

* এখানে মনে রাখতে হবে, অভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি কদাপি নীতিবাদী ভঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। গান্ধীজীর মত ছেলেমানুষি ব্যাখ্যা অভাষচন্দ্র কখনো দিতে পারেন না। বিহারের ভূমিকম্পের পরে গান্ধীজী বলেছিলেন, অস্পৃশ্যতার পাপের ফলেই এই প্রাকৃতিক দুর্বিপাক। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, এই পাপে পাপী নন, এমন লোকও

মনে হয় না, কুর্তি দম্পতি ভারতীয় চিন্তার এই ভয়ানক দিকটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

কয়েক বৎসর পরে। মধ্য তিরিশের সময়। ‘পায়ের তলায় পৃথিবী কাঁপছে। যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছে জার্মানী।’

সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলি, আতঙ্ক-নীল বিষাক্ত দিনগুলি যখন ইউরোপের প্রতিটি সভ্যমানুষের আনন্দ হরণ করে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, তেমনি একটি দিনে—সকাল বেলায়—শ্রীমতী কুর্তি একলা প্রাতরাশের টেবিলে বসে, কেন না স্বামী কাজে বেরিয়ে গেছেন, বাইরে বেল বাজল। এ সময়ে হঠাৎ কে? ক্ষুধা ওঠে গেলেন দরজায়। দরজা খুলেই চমকে ওঠেন—বিশ্বের আনন্দের ধ্বনি বেরিয়ে আসে একই সঙ্গে। স্বয়ং স্বভাষচন্দ্র বহু দ্বারে দাঁড়িয়ে। কী করে সন্ধান পেলেন এই বাসার? শেষবার দেখা হওয়ার পরে দুবার বাসা বদলেছেন এঁরা।

“ওঃ! মিঃ বহু! কী কাণ্ড, আপনি! কী অপূর্ব! আপনার দেখা পেলুম।”

যথোচিত সম্ভাষণ বিনিময়ের পরে স্বভাষচন্দ্রকে ঘরে এনে শ্রীমতী কুর্তি বসালেন। তাঁর আনন্দের সীমা নেই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেলেন।

“কত দিন যে আপনাকে দেখিনি? এক যুগ পরে দেখা। সোজা ভারতবর্ষ থেকে আসছেন নাকি?”

“না, এখন সোজা আসছি ভিয়েনা থেকে। এখানে কাজে এসেছি, কয়েকদিন মাত্র থাকব।”

আরও কিছু সংলাপ। তারপরই স্বভাষচন্দ্রের গম্ভীর কণ্ঠ—

“মিসেস কুর্তি, আপনাদের কাণ্ড দেখে আমি বিস্মিত। এখানে দারুণ অবস্থা, বিকট মনোভাব, তবু আপনারা এখানে আছেন কেন? এ দেশ আপনাদের ত্যাগ করা উচিত, যত তাড়াতাড়ি ততই ভাল।”

মিসেস কুর্তি বললেন, “আমাদের মতলব তাই। বিপদ সম্বন্ধে আমরা সচেতন। যত শীঘ্র পারি চেকোশ্লোভাকিয়ায় ফিরে যাব।

“চেকোশ্লোভাকিয়া?”—স্বভাষচন্দ্র প্রায় আঁতকে ওঠেন—“না না, মিসেস কুর্তি, চেকোশ্লোভাকিয়া একেবারে গায়ের কাছে, আর নিতান্ত দুর্বল। বলদ্বীপ আফ্রাসী দেশের প্রতিবেশী সে, নিতান্ত সংকট অবস্থা তার। আচ্ছা, আপনি একবার ইউনাইটেড স্টেটসে যাবার কথা বলেছিলেন না।”

“হাঁ, বলেছিলেন, তা ঠিক, কিন্তু স্বদেশ, স্বজন, চাকরি ছেড়ে যাওয়া কি সহজ! তা ছাড়া সে দেশে যাওয়ার ভিত্তি পেতেও যথেষ্ট সময় লাগে। তবু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

“হাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যান—কোনোমতে ব্যাপারটা স্থগিত রাখবেন না। পরিস্থিতি শোচনীয়। পায়ের তলায় জমি নেই এখানে।”

তো মরছে—তার ব্যাধ্যা কি? স্বভাষচন্দ্রের কাছে, মন্দ যে করলো, সেই কেবল মন্দ নয়, মন্দ যে বাধা দিল না, তেমন নিষ্ক্রিয় ভালোও মন্দেরই দলে পড়ে।

৬৬৭ - “বুদ্ধের কঠিন হাসি”

সে কথা কি কুঁড়িরা জানেন না? নিশ্চয় জানেন। তবু হুভাষচন্দ্র তাগিদ দেন—“মোটো দেবী করবেন না—
কথাপি নয়—”

“ভাল, আমরা তাহলে শীত্ৰই যাব—”

“শীত্ৰই তো—”

“হাঁ, অবশ্যই—”

মিসেস কুঁড়ি অতঃপর লিখেছেন, “এ সকল কথা তিনি অতীব সংযত ভাবে বলেছিলেন, তাঁর সেই নিজস্ব
অসাধারণ উপায়ে। কিন্তু তার ভিতর থেকেই তাঁর উদ্বেগের আকার দেখতে পেলুম, গভীর ক্রতস্ক্রতা বোধ করলুম তার
জন্ম। নাজীদের প্রতি তাঁর হৃগভীর ঘৃণাও দেখলুম—যে মনোভাবকে তিনি আমার কাছ থেকে গোপন করার একটুও
চেষ্টা করেন নি।”

পাঠকদের একটি কথা কেবল এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে-নাজীদের তিনি ঘৃণা করতেন মনেপ্রাণে,
তাঁদের সঙ্গেই তিনি মিত্রতা করছিলেন এই সময়ে, এবং যে আমেরিকায় বাবার জন্ম তাঁর এই বন্ধু দম্পত্যিকে প্রবল তাগিদ
দিয়েছেন, সেই আমেরিকার বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষে যুদ্ধযোষণা করেছিলেন, কিছুদিন পরে।

অর্থাৎ আশুন জলবে, যা পোড়াবে এবং আলো দেবে। সেই আশুনকে যুগে যুগে আহরণ করবেন মানব
সংসারের কল্যাণের জন্ম প্রমিথিউসের অবতারেরা।

হুভাষচন্দ্র ভারতের পক্ষে সেই অবতার।

[ক্রমশঃ]

এগ মার্ক দেওয়া জিনিস কেন কিনবেন?

যে সব জিনিসের ওপর এগ মার্কের মোহর থাকে, সেগুলি যে ভালো সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারেন। ঘি, মাখন, ডিন, মধু ইত্যাদি কৃষিজাত ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে তারপর এই সরকারি মোহর দেওয়া হয়। আপনি যখন এগমার্ক দেওয়া কোন জিনিস কেনেন তখন আপনি নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন যে সুরক্ষার বৈজ্ঞানিক মান অনুযায়ী সেগুলির ভোগ্যবিভাগ করে প্যাক করে, বাজারজাত করা হয়েছে।



এগমার্ক হ'ল
বিশুদ্ধতার
মাপকাঠি

নেতৃত্বের সংকট ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

অরিন্দম সেনগুপ্ত

বর্তমানে ভারতবর্ষে—সুদূর ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকায়—গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে সকলেই চিন্তিত। অনেকের মতে প্রাচ্যে গণতন্ত্র অচল। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যেভাবে গণতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে ও বর্তমান পশ্চিমী সভ্যতায় গণতন্ত্র যেভাবে কাজ করছে প্রাচ্যে তা সম্ভব নয়—অনেক পশ্চিমী চিন্তাবিদই এই মতের সমর্থক। সুদূর দারিল্ল ও অশিকাই নয়, গণতন্ত্রের আংশিক ব্যর্থতার মূলে আরও অজ্ঞাত কারণ রয়েছে। শিক্ষা ও সমৃদ্ধি হয়তো গণতান্ত্রিক উপায়ে মতনির্ধারণে সহায়তা করে কিন্তু নিজেদের প্রয়োজন, রাষ্ট্রের কার্য ও লক্ষ্য ও এগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে এবং উদ্দেশ্য সাধনের বিকল্প রাজনৈতিক উপায়গুলির মধ্যে চরম পার্থক্য থাকলে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধ ও ধারণার ভিত্তিতে গঠিত বিকল্প আদর্শগুলির পছন্দক্রম নির্ধারণ করা নির্বাচকদের পক্ষে খুবই শক্ত কাজ, সন্দেহ নেই। এই কারণে আমাদের দেশে নির্বাচকরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের রাজনৈতিক কার্য-সম্বন্ধে উদাসীন ও নিষ্পৃহ হয়ে পড়ে। পশ্চিমী দেশগুলিতে নির্বাচকদের ঔদাসীন্য ভিন্ন প্রকৃতির। সে সব দেশে, বিশেষ করে যেসব দেশে দ্বিদলব্যবস্থা প্রচলিত, নির্বাচকদের সামনে যেসব বিকল্পগুলি রয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য খুবই সামান্য। তা হাড়া বিকল্পগুলি আদর্শভিত্তিক নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের বৈকল্পিক কর্মপন্থা সংক্রান্ত। এই কারণে সে সবদেশে নির্বাচকদের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ এবং বহুকালের অভ্যাসের ফলে তারা

প্রায় বাস্তবিক উপায়ে নিজেদের কার্য সম্পাদন করেন। এই ধরণের ঔদাসীন্যের ফলে পশ্চিমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বর্ভূতাবে কাজ করতে পারে, কিন্তু প্রথম প্রকার ঔদাসীন্যের ফলে আমাদের দেশে তা সম্ভব হয় না। এদেশে নির্বাচকরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করেন না এবং জাতীয় নেতারাও এগুলিকে উপেক্ষা করে সরাসরি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন ও তাদের রায় নির্ধারণ করতে চান। এই অবস্থার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতারা দায়ী। এরা নির্বাচকদের প্রতিনিধি-মূলক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবহার করার শিক্ষা দেননি এবং রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কর্মপন্থার বিকল্পগুলির স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা গঠন করতে দেননি। ফলে বর্তমান রাজনীতিতে আলোচনার পরিবর্তে বল প্রয়োগের দ্বারা বিভর্ক ও বিরোধের মীমাংসা করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

বলপ্রয়োগের এই প্রবণতা সরকার, রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ইত্যাদি সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সকলেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করে ও তা ছায়া সংগত বলে মনে করে। স্বাধীনতার পূর্বে (ইংরাজ আমলে ও তারও আগে) আমাদের দেশে বলপ্রয়োগ ও সম্ভ্রাসনশীল দ্বারা রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় ও আঞ্চলিক বিরোধের নিষ্পত্তি করার চেষ্টা হয়েছে ইংরাজশাসনের প্রথম ভাগে ও তারও আগে অল্প কয়েক

উপায়ে রাজনৈতিক পরিবর্তন দুঃসাধ্য ছিল। ইংরাজশাসনের উত্তর ভাগে প্রচলিত নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিসর সীমিত হওয়ার এই পদ্ধতির ব্যবহার একেবারে লোপ পায়নি। কিন্তু স্বাধীনতার পর কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও আজ কেন বলপ্রয়োগ ও সন্ত্রাস স্থিতির প্রয়োজন হয়? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও যে পশ্চিমী দেশগুলিতে বলপ্রয়োগ ও সন্ত্রাসস্থিতির পদ্ধতি অবলম্বিত হয়নি, এমন নয়: ক্যাঙ্গীল্‌ম্‌ ও নাংসীল্‌ম্‌-এর উদ্ভব ও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পশ্চিমেই হয়েছে। কিন্তু একথা ঠিক যে সেখানে একমাত্র চরম অবস্থা (যে সংকট-জনক অবস্থায় অল্প কোন উপায় কার্যকর হয় না) ছাড়া অল্প সবরকম অবস্থায় আলোচনার মাধ্যমে বিতর্ক ও বিরোধের মীমাংসা এবং নীতি নির্ধারণের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে রাজনৈতিক ভারসাম্যের স্থিরত্ব বজায় থাকে ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে: ভারতবর্ষে অনুরূপ রাজনৈতিক স্থিরত্ব দেখা যায় না কেন? এই স্থিরত্ব কিসের উপর নির্ভর করে? মূলতঃ এ নির্ভর করে রাষ্ট্র আমাদের কি দিতে পারে এ সম্বন্ধে আমাদের বিভিন্ন ধারণা ও সেগুলির বিস্তৃতি, সাদৃশ্য ও বিরোধিতার উপর। আমরা আমাদের রাষ্ট্রের কাছে যেসব জিনিষ দাবী করি, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সংগে সেগুলির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাও আমরা করি না। শুধু অর্থনৈতিক অবস্থা কেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সীমিত উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে সেগুলির সংগতিসূরক চেষ্টাও আমাদের নেই। তার উপর রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে এত বিভিন্ন প্রকারের মত ও আদর্শ আমাদের দেশে প্রচলিত যে এ বিষয়ে কোন রকমের কার্যকর মতৈক্য গঠন করাও প্রায় অসম্ভব। ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর আমরা এত বেশী চাপ দিচ্ছি ও তার উপর এত বেশী গুরুত্ব

আরোপ করছি যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে এ ভার বহন করা খুবই কষ্টসাধ্য। এই কারণে দেশে রাজনৈতিক স্থিরত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে কোন মত (এমন কি গণতন্ত্রবিরোধী মতও) প্রকাশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা থাকায় এই সমস্যার প্রকৃতি জটিল ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক উপায়ে কর্তৃত্ব বজায় রাখাও মাঝে মাঝে রাষ্ট্রের পক্ষে কঠিন হয়। অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অসুস্থ স্বাধীনতা নেই। রাষ্ট্রনায়কদের ইচ্ছার উপরই সব কিছু নির্ভবশীল। ফলে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকমতা ব্যবহার করে তারা তাদের অভীক্ষিত লক্ষ্যদেশকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাদের সাক্ষ্য ও ব্যর্থতার উপর তাদের রাজনৈতিক জীবনের গতি ও পরিণতি নির্ভর করে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূষ্ঠ কার্যসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি নির্ভর করে নির্বাচকমণ্ডলী, রাজনৈতিক দল ও নেতাদের ধারণা, কার্যকলাপ ও পারস্পরিক সম্পর্কের উপর। ভারতবর্ষে (তথা এশিয়া ও আফ্রিকায়) রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীনতার-আন্দোলনের সময় দেশে যে জাতীয় নেতৃত্বের উদ্ভব হয়েছিল তা গণআন্দোলন সংগঠন ও তার মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করেনি। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে একপ্রকার অতিমানবিক ঐশী ক্ষমতার বিকাশ হিসাবেই লোকের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল ও দলীয় ক্ষমতাও সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ'ত। রাজনৈতিক দল ও তার কর্মী, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও শাসনব্যবস্থা সবকিছু ডিজিরে জাতীয় নেতৃত্ব ও জনগণের মধ্যে প্রত্যক্ষ বোগদান স্থাপনের চেষ্টা করা হ'ত (এখনও হয়)। ফলে পশ্চিমী

গণতন্ত্রে জনমত গঠনের ও তদনুযায়ী রাজনৈতিক দল, নির্বাচকশক্তি ও নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র-পরিচালনার যে স্বাভাবিক পদ্ধতিটি প্রচলিত রয়েছে আমাদের দেশে ঠিক সেবকমটি হয় নি।

ঔপনিবেশিক শাসনে আমাদের দেশ পাশ্চাত্য সভ্যতার, পাশ্চাত্যের সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং পশ্চিমী মূল্যবোধ ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়।

ফলে দেশের চিন্তাধারা নানান নূতন খাতে বইতে শুরু করে ও সংগঠনের মাধ্যমে কার্যে পরিণত হতে থাকে।

ঔপনিবেশিক শাসনের সংঘাতে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক, কাঠামোর ও পরিবর্তন শুরু হয় ও

ফলে সমাজে পুরানো নেতৃত্বের স্থলে নূতন নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। ইংরাজশাসনের শেষের দিকে, বিশেষ করে স্বাধীনতার পরে, এই ক্রমপরিবর্তন অনেকগুলি

স্ফুটন ঘটেছে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বনিয়াদ গড়ে তোলার

কাজ শুরু হয়। স্বাধীনতা অর্জনের সময় জাতির নেতৃত্ব যাদের হাতে ছিল তারা ক্ষত পশ্চিমীকরণের জন্য রাষ্ট্রীয়

ব্যবহারে উদ্যোগী হলেন, কিন্তু অধিকাংশ দেশবাসীকেই লক্ষ্য ও পছন্দ এবং এ দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তা

সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা দিতে পারলেন না। এই সব অতিমানবিক নেতারা তাদের বিরাট কার্যক্রমের ভিত্তিতে

সরাসরি জনগণের আহুগত্য দাবী করলেন। রাজনৈতিক কার্যক্রমে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের ফলে সংসদীয়

গণতন্ত্রে জনমত প্রকাশ, সংগঠন ও তদনুযায়ী রাষ্ট্রশাসনের যে অনুক্রম পশ্চিমী গণতন্ত্রে নির্বাচকশক্তি, রাজনৈতিক

দল, প্রতিনিধি শক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যকর রয়েছে আমাদের দেশে তা বিস্মিত হয়েছে। জাতীয় নেতৃত্বের

যে প্রকৃতি ও তার প্রতি জনগণের যে মনোভাব আমাদের দেশে পরিলক্ষিত হয় তার পরিবর্তন না

ঘটলে উচ্চস্তরের জাতীয় নেতৃত্বের অবর্তমানে নূতন নেতৃত্বের সৃষ্টি হবে না। ফলে গণতন্ত্র ও জাতীয় সংহতি বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবসময়ই থেকে যাবে।

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার পরিণতি নির্ভর করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গতি-প্রকৃতির উপর। স্বাধীনতাসংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কংগ্রেস

জাতীয়তাবাদী দল হিসাবে পরিচিত। এই দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও তার মাধ্যমে পরিবর্তনের সমর্থক, কিন্তু এই

দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মীরা নির্বাচকশক্তির দিকে না তাকিয়ে নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে আছেন। ফলে এরা

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীন ব্যবহারে নির্বাচকশক্তিকে শিক্ষিত করে তুলতে পারেন নি। তবুও এরা বর্তমান ব্যবস্থা

ও পরিবর্তনের বিরোধী নন, এই কারণে এই দলের প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরায়নি। বর্তমান ব্যবস্থার বিরোধী

ও পুরানো ব্যবস্থার সমর্থক দলগুলিকে (সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় দলগুলি) পরিবর্তনশীল সমাজে টিকে থাকতে হলে,

দলীয় নীতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী

দলগুলির, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী দলগুলির, দায়িত্ব অনেক। নির্বাচকশক্তিকে

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহারে শিক্ষিত করে তোলা এবং গণতন্ত্র কার্যকর করার জন্য উপযোগী রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করা

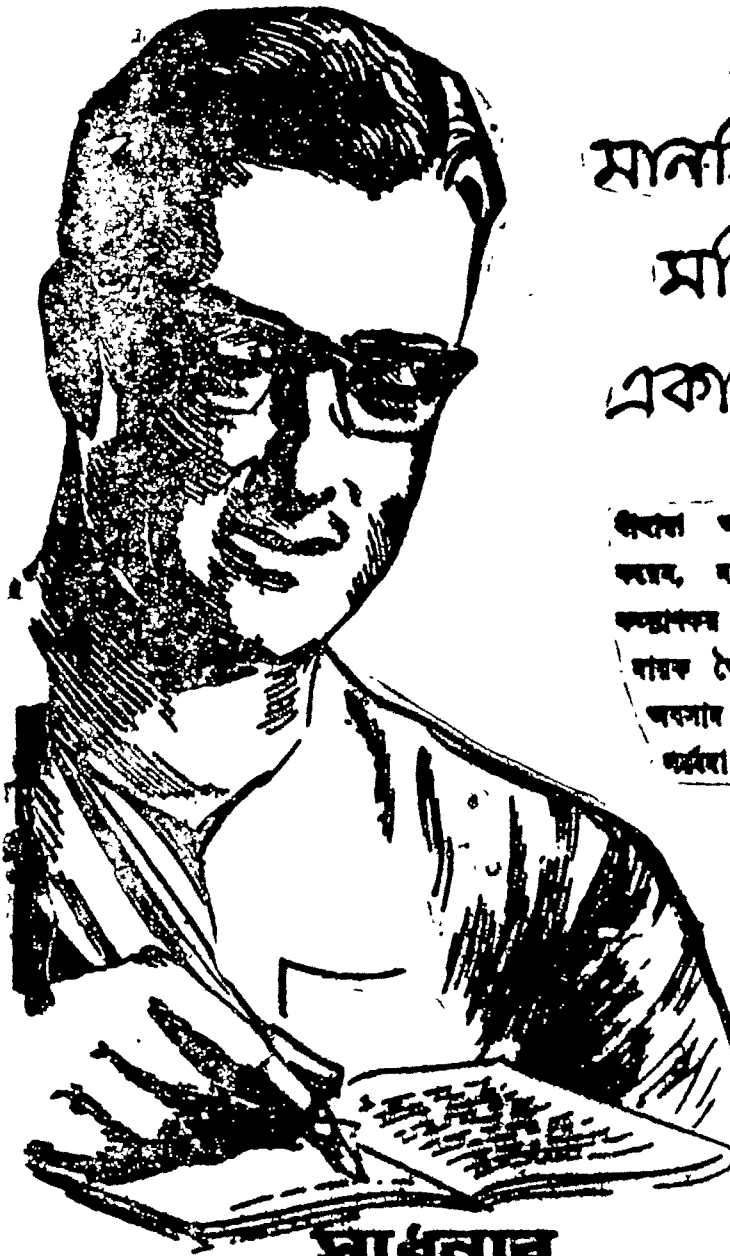
ও বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব এই সব দলগুলিকে নিতে হবে।

পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সামান্য হুশিয়ার কারণ থাকতে পারে, কিন্তু

ভিতর থেকে দেখলে বোঝা যায় যে, গণতন্ত্র এদেশে এসেছে ও থাকবে এবং পশ্চিমীকরণের কাজ এদেশে শুরু হয়েছে ও চলবে। কোনটাই বন্ধ হবে না। ইতিহাসে কখনও তা

‘হয়নি’। পশ্চিমীকরণ অর্থাৎ শিল্পায়ন, শহরীকরণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সমাজ ও রাষ্ট্রের কার্যে নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান হারে অংশগ্রহণের ফলে যে নূতন নাগরিক গোষ্ঠী ও নেতৃত্বের

সৃষ্টি হবে তা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সহায়ক হবে।



মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন!

জীবনে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম
করে, মহাভুসরাজ ঔষধের পরাম
কল্পনা কর। এই ঔষধের ও আয়ুর্ভ-
দায়ক তৈল সর্বপ্রকার স্নান ও
অবসান দূর করে, মেহ ও মলকে
কার্যে প্রবৃত্ত ও কার্যকর রাখে।

সাধনার মহা ভুসরাজ তৈল



সাগরানা ঔষধালয়-ভাঙ্গা

দাখা ঔষধালয় সেরা কলিকাতা-৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ মহেশচন্দ্র বোস,
এম. বি. বি. এম. (কল্যাণ) বাহুবলীচন্দ্র

অধ্যক্ষ প্রিয়োৎপল বোস, এম. এ.
বাহুবলীচন্দ্র, এম. বি. এম. (কল্যাণ) এম. বি. এম. (অধ্যাপক)
জগদীশ্বর কল্যাণের মহাশয় পণ্ডিত বৃন্দার অধ্যাপক ড.

স্পীকারের সঙ্কট

জনীল দাস

পশ্চিম বাংলার বিধান সভা আবার এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বিধান সভার স্পীকার গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাঁর গত ২৯শে নভেম্বরের 'প্রাইমা ফেনি' ক্রলিং-এর পুনরাবুত্তি করে বিধান সভা অনিদিষ্ট কালের জন্য মূলত্বী করে দিয়েছেন। স্পীকারের অনুনা-খ্যাত 'প্রাইমা ফেনি' ক্রলিং-এর গুণাগুণের বিচারে না গিয়েও বলতে হয় যে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে ঐ ক্রলিং-এর পুনরাবুত্তি এক গুরুতর সাংবিধানিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছে।

স্পীকার বলেছেন গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী দুই সভার যুক্ত অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণান সম্পর্কে তার কিছু জানা নেই। সেই কারণে সেই দিনেরই বিধান সভার পৃথক অধিবেশনে সংবিধানের ১৭৬ (২) ধারা অনুসারে রাজ্যপালের ভাষণ সেই সভার গোচরে আনবার কোনো কারণ বটে নাই। বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান অবশিষ্ট এ-বিষয়ে বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁর মতে সেদিন দুই সভার যুক্ত অধিবেশনে রাজ্যপাল ভাষণ দিয়েছেন। সুতরাং, সংবিধানের ১৭৬ (২) ধারা অনুযায়ী ১৪ই ফেব্রুয়ারী পরিষদের পৃথক অধিবেশনে চেয়ারম্যান রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে উল্লেখ করেন।

সংবিধানের ১৭৬ (১) ধারায় একটা স্পষ্টভাবে বিবৃত আছে যে প্রতি বছরের প্রথম অধিবেশনে রাজ্যপাল বিধান সভার ভাষণ দেবেন অথবা যে রাজ্যে বিধান পরিষদও রয়েছে সে রাজ্যে সভা ও পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দেবেন। এই ভাষণ আবশ্যিক। * সুতরাং বছরের প্রথম

অধিবেশনে—সে অধিবেশন বিধান সভারই হোক কিম্বা বিধান সভা ও বিধান পরিষদের যৌথ অধিবেশনই হোক না কেন—রাজ্যপালের ভাষণ যদি উহা থেকে যায় কিম্বা বঞ্চিত হয়, সেই প্রথম অধিবেশন সংবিধান অনুযায়ী অসিদ্ধ থেকে যায়। সংবিধানের ১৭৬ (১) ধারা অনুযায়ী সে ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সংবিধানের ১৭৬ (১) ধারা যদি কার্যকর না হতে পারে, অর্থাৎ অপূর্ণ থেকে যায় বছরের প্রথম সভায়—সে সভা বিধান সভার একক সভাই হোক কিম্বা সভা ও পরিষদের যৌথ সভায়ই হোক না কেন—রাজ্যপালের ভাষণ বঞ্চিত কিম্বা উহা থাকার দরুণ, সেক্ষেত্রে সংবিধানের ১৭৬ (২) ধারার প্রয়োগ আদৌ সম্ভব হবে না। কারণ, যদি রাজ্যপাল প্রথম যৌথ অধিবেশনে ভাষণ না-ই দিলেন এবং ফলে সে সভা সাংবিধানিক দৃষ্টিতে অসিদ্ধ থেকে যায়, সংবিধানের ১৭৬ (২) ধারা অনুযায়ী রাজ্যপালের ভাষণ সেদিনকারই বিধান সভার পরবর্তী পৃথক অধিবেশনের গোচরীভূত করতে স্পীকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের জন্য আহত এই পৃথক সভা সাংবিধানিক দৃষ্টিতে অসিদ্ধ হয়ে যাবে।

সেদিনকার ঘটনা-পরস্পরা সম্পর্কে স্পীকারের মতামতানুযায়ী যুক্ত অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণ প্রদত্ত হয় নাই। অর্থাৎ, ১৭৬ (১) ধারা অনুযায়ী রাজ্যপালের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালিত না হবার ফলে যেহেতু বছরের প্রথম পরিষদীয় অধিবেশন ১৪ই ফেব্রুয়ারী আদৌ শুরু হয়

* ".....at the commencement of the first session of each year the Governor shall

address the Legislative Assembly or in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together....."

নাই, সেই কারণে বিধান সভার পরবর্তী পৃথক অধিবেশনের সাংবিধানিক অসিদ্ধতা স্বার্থহীন। সে-অবস্থায় ১৪ই ফেব্রুয়ারী এই অসিদ্ধ বিধান সভার পৃথক অধিবেশনে স্পীকার কোনো বৈধ পদাধিকার ব্যতিরেকেই (functus officio) উপস্থিত ছিলেন। অতীত সভায় অতীত উপস্থিতি সেই সভায় প্রস্তুত স্পীকারের 'প্রাইমা ফেসি' কলিংকেও অসংলগ্ন ও অসিদ্ধ করে তুলেছে। বত অল্প সময়ের জন্যই হউক না কেন যুক্ত অধিবেশনে রাজ্যপালের উপস্থিতি ও পরবর্তী ক্ষণস্থায়ী ভাষণকে অস্বীকার করে স্পীকার বিধান সভায় পরবর্তী পৃথক অধিবেশনে তার উপস্থিতিতে সাংবিধানিক বাতুলতার পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছেন। কারণ স্পীকারের নিজ স্বীকৃতিতেই যেখানে ১৭৬ (১) ধারার প্রয়োগ অপূর্ণ রয়ে গেছে, ১৭৬ (২) ধারার প্রয়োগের সেখানে অবকাশই নেই।

আইন সভা জনমতের প্রতীক। শাসন বিভাগের হাত থেকে আইন সভার সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার দায়িত্ব একান্তভাবে স্পীকারের উপর স্তব্ধ। ভাগ্যের পরিহাস এই যে স্পীকার তাঁর 'প্রাইমা ফেসি' কলিং দিয়ে নিজের অজান্তলারে জনমতের নির্বাধ প্রকাশের পথ রোধ করে আইন সভার সার্বভৌমত্ব হ্রাসের সহায়ক হয়েছেন। রাজ্যপালের কোনো অগণতান্ত্রিক কিম্বা সংবিধান বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে ক্রোধে দাঁড়াতেই হবে এবং আইন সভার সাংবিধানিক মর্যাদা রক্ষার জন্য স্পীকারেরও সতর্ক প্রহরা থাকবে। রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রীসভার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবার স্পীকারের কোনো সাংবিধানিক অধিকার আছে কি না সে সম্পর্কে গভীর সংশয় রয়েছে, যেমন অধিকার নাই কোনো ক্রিকেট খেলার আত্মপারের বিরোধী হুই খেলোয়ার নলের নির্বাচন সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে তাদের খেলা বন্ধ করে দেবার। স্পীকারের রাজনৈতিক সভা তার সাংবিধানিক বিচারের উপর প্রভাব বিস্তার করে

তাকে পরিচালিত করেছে যার পরিণতিতে আইন সভা ক্রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে গেছে। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির তীব্রতার গতিবেগ বৃদ্ধি পেলে স্বধন দেখা গেলো গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী যৌথ সভা সম্পর্কে স্পীকারের অভিমত এবং পরবর্তী পৃথক সভায় তার কলিং-এর ফলে সেদিন বিধান সভায় একটি সংখ্যালঘু মন্ত্রীসভা নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেলো।

স্পীকার যে ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিধান সভায় একটি সংখ্যালঘু মন্ত্রীসভার জাগতিকারূপেই শুধু চিহ্নিত হয়েছেন তা নয়, সেই সংখ্যালঘু মন্ত্রীসভাকে অপসারণের জন্য সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির শাসন প্রয়োগের দাবী করে স্বীয় অধিকার বিসর্জন দিয়ে আইন সভার সার্বভৌমত্ব শাসন বিভাগের-পায়ের তলায় লুটিয়ে দিয়েছেন। সংখ্যাধিক্য ভোটে বিধান সভায় সংখ্যালঘু কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে পরাজিত করার সুযোগ না নিয়ে তাদের বরখাস্ত করার জন্য রাজ্যপালের উপর সতর্কণ নির্ভরতা এমনিতেই একটি অশোভন কাজ—রাজ্যপাল কর্তৃক পূর্বতন মন্ত্রীসভা বরখাস্তের বিরুদ্ধে সজ্ঞতাগেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে—কিন্তু নিজ সৃষ্ট সাংবিধানিক সঙ্কট উদ্ভবের পথে বিধান সভা বিলোপের জন্য শাসনবিভাগের ক্ষমতা প্রয়োগের আহ্বান জানানো স্পীকারের পক্ষে শোচনীয়রূপে অশোভন কাজ। বিধান সভা বিলোপের আহ্বান জানিয়ে কার্যত স্পীকার শাসনবিভাগকে নিজ ধ্বংসসাধনে উজোগী হবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। স্পীকার স্বীয় কাজের দ্বারা অনিবার্যভাবে আত্ম-পরাজয় ও আত্ম-ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। স্পীকারের কাজ বর্তমানে তাকে এই সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। *

১৫.২.৬৮

* মূল প্রবন্ধটি ইংরেজিতে লেখা। প্রবন্ধটি কয়েকটি ইংরেজী দৈনিকে ছাপার জন্য পাঠানো হয়েছিল রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হবার কয়েকদিন পূর্বেই। প্রবন্ধটিতে কয়েকটি মৌলিক সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে, তাই পরিবর্তিত অবস্থাতেও প্রবন্ধটির মর্মসুবাণ ছাপা হোলো। জ: স:

সমকালীন ভারতীয় সাহিত্য*

শ্রীনিবাস আচার্য

সাহিত্য অকাদেমী কোনো এক জারগায় তাঁদের পরিকল্পনার অন্তর্গত এই স্মৃতিটি বিজ্ঞাপিত করেছিলেন : ‘ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন এবং পরস্পর সহযোগিতাই ইহার কার্যসূচী।...অকাদেমীর প্রকাশন মুখ্যত ভারতীয় ভাষাতেই। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশনের প্রচেষ্টা সাধারণতঃ ভারতীয় লেখক ও তাঁহাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।’ সম্ভবত সেই অসুযায়ী আলোচ্য বইখানিতে সমকালীন ভারতীয় প্রধান আঞ্চলিক ভাষাগুলির অনতিবিস্তারিত পরিচয় একত্রিত করা হয়েছে। বেহেতু আমাদের আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই বললেই চলে আর বেহেতু ইংরেজি এখনো আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের এমন কি ভাবনাবিনিময়ের অনন্তসম্মল, সেই হেতু ইংরেজি। লেখকেরা সকলেই সুপরিচিত, সেই পরিচয় আঞ্চলিকতার গভী-পেরোনো পরিচয়, আর সকলেই নিজের নিজের ভাষা সম্বন্ধে বলবারও অধিকারী। কাজেই এই প্রকাশনাটিতে সর্বভারতীয় জিজ্ঞাসাজনের অংশে নির্ভর করার মতো জোরও রয়েছে। আবার আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষায় লেখা সাহিত্যগুলির সম্বন্ধে যে-সব অভ্যন্তরীণ কৌতূহলী আছেন, ইংরেজি ভাষা জানা থাকলে এই বইটি তাঁদেরও সবার উপকারে আসবে।

চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষা ছাড়াও এই বইতে

ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্য এবং সমকালীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধেও দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। সংস্কৃত যদিও ভারতের নব্যপ্রাকৃত ভাষাসমূহের প্রাচীনা জননী, তথাপি আজও পর্যন্ত সংযোগভাষা হিসেবে তার দাবি রয়েছে, আর সেই দাবী রয়েছে ইংরেজির বিরুদ্ধে। অর্থাৎ সর্বভারতীয়তার সর্বজনমান্যতা এখনো তার খাস দখলে। নব্য আর্থভাষাগুলির তো কথাই নেই, এমন কি আজকের ড্রাবিড়-ভাষাগুলি পর্যন্ত তার ধনে যে কতখানি ধনী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু শুধুমাত্র তা-ই নয়। সংস্কৃত আজও পর্যন্ত জীযন্ত ভাষা, আজও তাতে নতুন কাব্যনাট্যকাহি লেখা হয়, চিন্তাকর সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়ে থাকে। তেমনি ভারতীয়দের ইংরেজি ভাষার সাহিত্যচর্চায়ও এতদিনে একটি সুস্পষ্ট ইতিহাস তৈরি হয়ে গেছে সন্দেহ নেই। এমন কি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসপ্রণেতারাও স্ব-ভাষার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের ফেলতে পারেননি। স্বতন্ত্র জাতি-কুল-শীল নিয়েও তাঁদের অনেকেই নিজস্ব বিদেশীভাষায় কীর্তি অর্জন করেছেন। ইংরেজী পাঠককূলের চিত্ত স্পর্শ করেছেন, তার স্বীকৃতিও পেয়েছে। ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্য অস্বাভাবিক ইংরেজ-উপনিবেশের ইংরেজি সাহিত্যচর্চার সঙ্গেও সঙ্গম নয়—তার বিশেষত্বগুলি নিতান্তই তার নিজের, স্বয়ম্ভব এবং এবং স্ববিহিত। কাজেই এই অধ্যায় দুটি অস্বাভাবিকতার মতোই সমান জরুরি, সন্দেহ নেই। আমাদের অজ্ঞ জিজ্ঞাসার পরিপূরক হিসেবে তো বটেই, ভারতীয় স্বজনশীল চিন্তার অন্ততম প্রকাশ হিসেবেও অবিস্মরণীয়।

বিভিন্ন পরিচ্ছেদগুলি ধারালিখেছেন তাঁদের নাম করছি।
 অসমীয়া সাহিত্যের ইতিবৃত্ত লিখেছেন বিরিকিকুমার বড়ুয়া।
 বাঙালার লিখেছেন কাজী আবদুল ওহুদ। গুজরাটী :
 মনমখলাল জাতেরী। হিন্দী : সচ্চিদানন্দ বাৎসায়ন।
 কানড়ী : ভি. কে. গোকাক। কান্নীরা : পি. এন. পুসপ।
 মালয়ালম : সি. কুণহন রাজা। মরাঠী : এম. ভি. রাজাধ্যাক।
 ওড়িয়া : নায়াদর মানসিংহ। পাজাবী : খুসবন্ত সিং।
 সিন্ধী : লালসিং হরি সিংহ আজোয়ানি। তমিল : টি. পি.
 মীনাক্ষিন্দরম। তেলুগু : কে. রামকোটিশ্বর রাউ। উর্দু :
 খাজা অহমদ ফারুকি। এছাড়া ইন্দো অ্যাংলিয়ান বা
 ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসটি লিখেছেন শ্রীনিবাস
 আরেঙ্গার। আর সংস্কৃত : ভি. রাঘবন।

সমস্ত পরিচ্ছেদগুলিরই জোর মূলত আধুনিক সাহিত্য-
 পরিসরের উপরে, ইংরেজ-বিজয়ের পরেই মোটামুটিভাবে
 যে আধুনিক পরিসর শুরু হয়েছে। তথাপি সকলেই প্রাচীন
 উৎস ও উত্তরাধিকারের প্রবাহটির একটি ধসড়া করে
 দিয়েছেন, ইতিহাসও পরম্পরা সঘনো পাঠকের যাতে একটি
 পুরো ও স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে পারে। সেই অংশটি
 যথাসম্ভব অল্প কথায়—কখনো খুবই সংক্ষেপে—সেয়ে
 নিয়েছেন সবাই। এই বইয়ের নামও স্পষ্ট করেই লেখা
 আছে : সমকালীন ভারতীয় সাহিত্য।

তা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও কিন্তু নিশ্চিতভাবেই
 কৌতূহল মেটে না। এই ধরনের বইতে ভাষাগত আলোচনা
 খুব একটা জরুরি নয় ঠিকই। কিন্তু তবু ভাষা-গত ভূমিকার
 কোথাও কোথাও সমধিক প্রত্যাশা থাকে একথাও ঠিক।
 যেমন ধরা যাক হিন্দী সাহিত্যের কথা। ‘হিন্দী’ বলতে
 একসময়ে বোঝাতো সমস্ত হিন্দুদের ভাষা। কিন্তু
 হিন্দী সাহিত্য যথার্থ অঞ্চলবিশেষের ভারতীয় আর্থভাষার
 উপরে দাঁড়িয়ে—ভারতীয় আর্থভাষার মধ্যদেশীয় শ্রেণীতে তা
 গড়ে। আবার আধুনিক হিন্দী সাহিত্য যে ভাষায় লেখা তা

হলো একধরনের ঠেঠ হিন্দী বা খাঁটি হিন্দী ভাষা, একদিকের
 উৎসম অস্তমিকে আরবী-ফারসী যথাসম্ভব ঝেড়ে ফেলা ভাষা
 —যার পারিভাষিক নাম পরিচয় ‘খড়ী বোলী’ বা খাড়া
 দাঁড়িয়ে থাকা জীৱন্ত ভাষা। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ বাৎসায়ন
 লিখেছেন : ‘Khari Boli is barely a century old,
 and as the channel of the main stream of
 Poetry it was established only with the
 beginning of the present century’ আরো
 লিখেছেন : ‘There has always been controversy
 about the delimitation of the frontiers of
 Hindi ; recent political developments and the
 rising aspirations of regional languages have
 aggravated the situation. Philological study
 has only introduced fresh complications by
 introducing evidence, which militates against
 the historical and traditional status of Hindi’.
 কাজেই বোঝা যায় ভাষাতত্ত্বগত একটি বিশদ ভূমিকা এই
 সাহিত্যের আলোচনাতে অন্তত নিরতিশয় জরুরি।

সেই প্রয়োজন উর্দু সাহিত্যের বেলায় আরো সমধিক,
 তার কারণ সেই অর্থে উর্দু কোনো আঞ্চলিক ভারতীয়
 ভাষাও নয়—ঐতিহ্য থেকে যে জাত। উর্দু প্রায় পুরোপুরিই
 তৈরি করা ভাষা—মধ্যভারতীয় আর্থ আর ফারসির মিশ্রণে
 —মোগল রাজদরবারের অভ্যন্তরীণ মুসলমানদের হাতে তার
 সৃষ্টি ও প্রতিপত্তি : যার অভিধান আরবী-ফারসী শব্দের,
 ব্যাকরণ ও রচনারীতি ফারসী সাহিত্যের অনুকারী, লিপি
 ফারসী। উর্দু মূলত দিল্লীর নব্য মুসলমানী সাহিত্যিক ভাষা,
 ‘জবান-ই-উর্দু-ই-মু-অল্লা,’ শরীফ বা অভিজাত ঘরানার
 মুসলমানদের ঘরে ঘর প্রচার ও প্রতিপত্তি। অষ্টাদশ শতক
 থেকেই মূলত ঐ ভাষার সচেতন সাহিত্যপ্রয়াসের শুরু, এবং
 হিন্দীর প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবে তখন থেকেই তার আঙ্গ-

প্রতিষ্ঠার আয়োজন। এই ভাষার সাহিত্য আলোচনার গোড়াতেই ভাষা-গত একটি ভূমিকার প্রত্যাশা সর্বাত্মক পাঠকের আগা স্বাভাবিক, খালি আহমদ ফারুকী বা উপেক্ষা করেছেন।

এই উপেক্ষা দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষাগুলির বেলাতেও ঘটেছে। বাইরের যারা আর্থভারতীয় ভাষাগুলির মোটামুটি খবর রাখেন, তেলুগু কানড়ী তমিল বা মালয়ালম ভাষাগুলির সম্বন্ধে তাঁদেরও খুব একটা জানাশোনা আছে বলে মনে হয় না। এই ভাষাগুলিরও সুপ্রাচীন ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য আছে, কালক্রমে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তাঁদের একটা মিলনমিশ্রনেরও ইতিহাস আছে। একমাত্র তমিল সাহিত্যের আলোচনিতা মীনাক্ষিসুন্দরমের লেখায় ক্ষীণ উল্লেখ ছাড়া তা কিন্তু একেবারেই অমানিত হয়েছে। তাঁরা সবাই সমস্ত তাঁদের নির্ভর রেখেছেন আধুনিক সাহিত্যের উপরে, যে আধুনিক সাহিত্য প্রাচীনের সঙ্গে তুলনার হয়তো বা কিঞ্চিৎ কুশলই প্রতিপন্ন হবে। অবশ্য সেটি আমাদের প্রশ্নও নয়, আমাদের যা কিছু জিজ্ঞাসা ঐ সাহিত্যগুলির ভাষাতত্ত্বগত একটি পঞ্চাংগট সম্বন্ধে।

এই আলোচনাগুলিতে ব্যবহৃত উপকরণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবার মতো সম্পন্নতা অবশ্যই নেই। যে কথা জানিয়েছেন লেখকেরা শুধু সেই কথাই অসংশয়ে আমাদের গ্রহণ করবার আছে, তার বেশি নয়। তাঁদের আলোচনার পদ্ধতি সব জায়গাতেই উপকারী ও সহজবোধ্য। কেউ কেউ প্রকরণের ভিত্তিতে কেউ বা কালানুক্রমে সাজিয়েছেন আলোচনা। পরিশেষে একটি করে গ্রন্থপঞ্জিও সংযুক্ত আছে। তাতে ঐ ভাষার এবং ঐ ভাষার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাগুলির সংবাদ আছে। যদি বিশেষ করে এদের মধ্যে নাম করতে হয় কোনো লেখার, তাহলে শ্রীনিবাস আরেয়ার বা রাঘবনের লেখার কথাই প্রথমত মনে আসে : আঞ্চলিক কোনো ভাষাবিশেষ যাদের বিষয় নয়। কিন্তু অল্প

লেখাগুলিও ন্যূন নয় কোনোদিক থেকেই। বিশেষ, বাৎস্তায়ন বা মায়াদর মায়সিংহের লেখা চোখে পড়বার মতো লেখা, বলা যায়।

আমাদের যা আরো বিশেষভাবে চোখে পড়েছে তা হলো বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক লেখাটি। এই লেখাটি কিন্তু কাজী আবদুল ওহুদের মতো সুপণ্ডিত ব্যক্তিও বিশেষ সুবিচার করতে পারেন নি, এবং এই লেখা এই বইয়ের অঙ্কতম প্রধান রচনা। কাজী আবদুল ওহুদের আলোচনা-পদ্ধতিও অঙ্কাত্মগুলির তুলনায় একটু অপরিচ্ছন্ন। তাঁর কোনো কোনো সিদ্ধান্ত আমরা সমর্থন করতে পারিনি। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত আরো সুচিন্তিত হলে আমাদের ভালো লাগতো। বাঙলা নাটকের মান সত্যিই, দুর্ভাগ্যত যথেষ্ট উঁচু নয়। কিন্তু যত সংক্ষেপে তিনি ঐ প্রকরণটির নিষ্পত্তি ঘটিয়েছেন তাতে যুক্তি বা বিচার কারোকেই মানা হয়েছে বলে মনে হয় না। তিনি দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ দিয়ে শুভসূচনা নির্দেশ করেছেন, যা অচিরে প্রাবৃত হয়ে গেছে মেলোড্রামায়, তার মধ্যে মধুসূদন দত্তের উল্লেখটুকুমাত্র রাখলে আর একটু জোর পেতো বলে মনে হয়। দুইয়েকটি চোখে পড়ার মতো অমূল্যের রয়েছে আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে। পূর্ণেন্দু পত্রী এবং গোবিন্দ চক্রবর্তী পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছেন কবিতালিকায়, অথচ নীরঞ্জননাথ চক্রবর্তী কিংবা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ নেই। এমন কি অসীম রায়ের নামও তাঁর অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু অমিরভূষণ মজুমদার অমূল্যবিত। আর প্রবন্ধরচয়িতাদের তালিকাটি এতদূর খণ্ডিত যে উল্লেখযোগ্য অমূল্যেরের কথা বলতে গেলেও তা আরো একটি তালিকা হয়ে দাঁড়াবে। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনাতোও তিনি চোখে পড়বার মতো সরলতার পরিচয় দিয়েছেন।

অঙ্কুর আরো যে এক আখটি অমূল্যের আমাদের চোখে

[শেষাং ৭২০ পৃঃ]

ল্যানোলিন মেশানো

নতুন **তুহিনা** বিউটি মিস্ক

আরো ভালোভাবে মুখ ও
গা-হাত-পা ফাটা বন্ধ করে...
সারা শরীরে এনে দেয়
স্বিচ্ছ কমলীয়তা !

CCT 4182A



ক্যালকাটা
কেমিক্যাল-এন্ড তৈরী

আপনি
কমলী
স্বাভাবিক
বিশিষ্ট

নতুন তুহিনা আছে ল্যানোলিন আর ময়েস্চারাইজার—মসৃণ, হৃদয়
চামড়ার জন্য এ দুটি জিনিস না হলে নয়। তুহিনা চামড়ার ক্ষতের চলে
গিয়ে চামড়ার স্বাভাবিক ফেরার, সৌন্দর্য বাড়ায়—মুখ ও গা-হাত-পা
কাটার সমস্যা থেকে বেড়াই দেয়। চামড়া কোচকানো ফিংগার বসবসে
হওয়া আরো ভালভাবে বন্ধ করে। সারা শরীরে শিশি-স্বিচ্ছ কমলীয়তা
নিষে আসে। আপনার মুখে, গলায়, কাঁধে, হাতে, কনুইয়ে, পায়ের
পাতায় আর গোড়ালিতে (শরীরের যে যে জায়গা সবচেয়ে বেশী খসখসে হয়)
তুহিনা মাখুন। দেখবেন, ল্যানোলিন ও ময়েস্চারাইজার মেশানো
নতুন তুহিনা স্বকের জোড়স ক্রিয়াকে দিচ্ছে। প্রতিদিন প্রানের পর
আর শোবার আগে নিয়মিত তুহিনা মাখতে ভুলবেন না। রনে
রাখবেন, মুখ থেকে পায়ের গোড়ালি—সারা শরীরেই বহু নেয় তুহিনা।



অস্থায়ী সরকার গঠনকালে পূর্ব-এশিয়ার আজাদ হিন্দের রাজনৈতিক সংগঠন ও সামরিক শক্তি

জেনারেল কাওয়াবে

ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানের সময়ে বর্ষা ফ্রন্টে জাপানী সৈন্য বাহিনীর পরিচালনা করেন জেনারেল কাওয়াবে। সেই জাপ-সেনাপতি 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও জাপান' নামে জাপানী ভাষায় একটি বই লিখেছেন। জয়ন্তী সম্পাদকীয় বিভাগের অধ্যাপক সমর গুহ যখন দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ায় গফরে যান তখন জেনারেল কাওয়াবে বইটি তাঁকে দিয়ে এটি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। এই বইটি থেকে ইতি পূর্বে কয়েকটি অংশ জয়ন্তীতে অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে। এই অংশটি তাঁর গ্রন্থের আর একটি অনুচ্ছেদ। মূল জাপানী থেকে ইংরাজীতে এবং ইংরেজী থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত করেছেন যথাক্রমে বারীন বর্দ্ধন ও জয়ন্তীর সম্পাদকীয় বিভাগ। জ: স:

পূর্ব-এশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পর চন্দ্র বসুর সামনে দুইটি মূল কার্যক্রম ছিল, (১) অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন (২) আজাদ হিন্দ বাহিনীর পূর্বাঙ্গ শক্তি বৃদ্ধি। বাণিন ধাকাকালীনই তাঁর মনে পূর্ব-এশিয়াকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রবর্তী ভূমিতে পরিণত করবার ইচ্ছা তাঁর মনে বারবার আনাগোনা করেছে। এবার তাঁর সুযোগ এলো।

জাপানে পৌঁছে সেখানকার পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর এবং বিশেষ করে প্রধান মন্ত্রী তোজোব সঙ্গে আলোচনার পরই অস্থায়ী জাতীয় সরকারের পরিকল্পনা তিনি সর্ব প্রথম প্রকাশে উল্লেখ করেন। এ-বিষয়ে তাঁর এই প্রকাশ্য উল্লেখের পর জাপানী কর্তৃপক্ষ জানান যে তাঁদের কোনো মৌলিক আপত্তি নেই। প্রধানমন্ত্রী তোজোর শোনান পরিদর্শনের পর এ-বিষয়ে জাপানী কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত মতামত জ্ঞাপন করা হবে। সুতরাং, শোনানে পৌঁছবার পর সুভাষ

চন্দ্র সেখানকার ভারতীয়দের কাছে ধীরে ধীরে অস্থায়ী জাতীয় সরকার সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা তুলে ধরেন। স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেন্ডেন্স লীগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে লীগের শক্তি-বৃদ্ধিও যেমন তার লক্ষ্য ছিল তেমনি পূর্ব-এশিয়ার ভারত সীমান্তে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবল প্রভাবে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে গভীর আলোড়ন সৃষ্টিও তাঁর আর একটি হৃদয়ঙ্গম লক্ষ্য ছিল।

অস্থায়ী সরকারের কর্তৃকর্তা নির্বাচন এবং জাপানী সরকার কর্তৃক এই সরকারের স্বীকৃতি, এই দুইটি সমস্যাই প্রথমে দেখা দিল। সমগ্র পূর্ব-এশিয়া অঞ্চলে উপযুক্ত লোকের সন্ধান করা হোলো এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা হোলো। এদিকে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী শোনান পরিদর্শনকালে তোজো অস্থায়ী সরকার গঠনে একমত হন এবং অক্টোবরের (১৯৪০) দ্বিতীয়ার্ধে

জাপানী সরকার অস্থায়ী ভারত সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। টোকিওতে ব্যক্তিগতভাবে বহু উপস্থিতি জাপানী সরকার ও জনসাধারণের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

আজাদ হিন্দ সরকার শুরুতে সাধাসিধাভাবে গঠিত হলেও, কালক্রমে ভারতীয় জনসাধারণের নানা সমস্যা ও দাবীর মীমাংসায় এই সরকারের কিছুটা প্রকৃতিগত পরিবর্তন করতে বহু বাধ্য হন এবং দপ্তরবিহীন মন্ত্রীপদ সৃষ্টি ও অস্বাভাবিক পরিবর্তন করেন। অস্থায়ী জাতীয় সরকারের শক্তিবৃদ্ধির জন্য দ্রুত ভারতের অভ্যন্তরে এলাকা দখলের প্রয়োজনীয়তা বহু উপলব্ধি করেন। জাপানী বাহিনীর সহযোগে ইক্ষল আক্রমণের পরিকল্পনাও এই কারণেই রচিত হয়েছিল। এই সুযোগে অস্থায়ী জাতীয় সরকার বর্মার অভ্যন্তরে অগ্রসর হবে। বর্মার সরকার সে-পথে কোনো অন্তরায় হবে না। যদিও ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ক্ষমতার কেন্দ্র সৃষ্টিই অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের লক্ষ্য ছিল, ইক্ষলের অভিযান ব্যর্থ হয়ে সে লক্ষ্য অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

চল্ল বহু অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে সেনাবাহিনীর মধ্যে সংহতির অভাব ছিল। অযোগ্য অফিসারেরা সেনাবাহিনীর মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। বহু ক্ষমতা গ্রহণ করার সময় সেনাবাহিনীর শক্তি ছিল ১৩,০০০। এদের সংগঠন গরিলা যুদ্ধের উপযোগী ছিল এবং সেই কারণে এদের হাতে হাঙ্কা যুদ্ধাঙ্গই বেশী ছিল। বহু শোনানে উপস্থিত হয়ে এদের সংখ্যা বৃদ্ধির তাগিদ দিলেন—বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল প্রায় ৫০,০০০ পর্যন্ত। কিন্তু জাপান যে পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহে সক্ষম ছিল—বিশেষ করে হাঙ্কা অস্ত্র—তা দিয়ে ৩০,০০০ হাজারের বেশী সেনাবাহিনীর যুদ্ধোপকরণের ব্যবস্থা হবে না। বহু দ্রুত তিন ডিভিশন—৩০,০০০ হাজার—সেনাবাহিনী এবং ২০,০০০ ভলান্টিয়ার

সংগঠিত করেন। পূর্ব এশিয়ার যুবক নাগরিকদের এবং যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে এই সংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হয়ে যাবে অনুমান করা গিয়েছিল। জাপানের সাদা কাম্যাণ্ডার-এর দিক থেকে যদি আই এন, এর কমিশন-প্রাপ্ত অফিসারদের এবং জাপানের প্রতিশ্রুত অস্ত্র-সরবরাহের কথা বিবেচিত হতো—যেখানে ৩০,০০০ হাজার সেনাবাহিনীর অস্ত্র সরবরাহের সীমাই জাপানীদের চূড়ান্ত ক্ষমতা—সেখানে সাময়িকভাবেও যদি কাম্যাণ্ড হেড কোয়ার্টার এবং অস্ত্রসরবরাহ ব্যতিরেকে ২০,০০০ ভলান্টিয়ার বাহিনী সংগৃহীত হোলে অনতিবিলম্বে তাদের অংশহত সমষ্টিতে পরিণতির সম্ভাবনা ছিল। তা সত্ত্বেও জাপান প্রধানমন্ত্রী তোজোর শোনান পরিদর্শনকালে বহু আই, এন, এর শক্তিবৃদ্ধির জন্য জাপানী সাহায্যবৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু তারপর থেকেই সাদা কাম্যাণ্ডের কার্যকলাপে বহু অসন্তুষ্ট হন এবং এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে বহু ও তোজোর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টিতে সাদা কাম্যাণ্ড তৎপর হয়ে উঠেছে।

১৯৪৫ সালে ২০,০০০ নতুন ভলান্টিয়ার সংগঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং সংগৃহীত ভলান্টিয়ারদের নিয়মিত সেনাবাহিনীতে পরিণত করা হয়। আই, এন, এ-এর বর্ধিত শক্তি বহু তিনটি ডিভিশনে পুনঃ সংগঠিত করলেও, তাদের প্রকৃতি গরিলা যুদ্ধের উপযোগীই থেকে গেল কোনো ক্ষেত্রেই এই ডিভিশনগুলি নিয়মিত বিচ্ছাদের সময়োপযোগী ডিভিশন ছিল না। বহুর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল প্রচার। তাঁর নিজের ভাষায় “ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সেনার ছয়শতাংশ শক্তিবৃদ্ধি প্রচারিত হয়ে থাকে এবং ভারতীয়রা তাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমরাও বলতে পারি যে অস্থায়ী সরকার ত্রিশ ডিভিশনেরও বেশী সেনাবাহিনী সংগঠিত করেছে, আমরা আগল ডিভিশনের অমুরূপ সেনাবাহিনী তৈরী করবো এবং দ্রুত তার সংখ্যাবৃদ্ধি আমাদের লক্ষ্য।”

আই, এন, এর অগ্রগতির সময় এই বাহিনী ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেন্ডেন্স লীগের শাখা মাত্র ছিল কিন্তু অস্থায়ী সরকার গঠিত হবার পর এই বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব, অস্থায়ী সরকার এবং সেনাবাহিনীর প্রধান গ্রহণ করেন। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটিশ ও ফরাসী সেনাবাহিনীর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা মনে করে বহু

আই, এন, এ ও জাপানী সাদাধর্ম কম্যাণ্ড-এর সংহত নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু এই দুই কম্যাণ্ডের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি জটিল হয়ে দাঁড়ায়। মোট কথা, গোড়া থেকেই চন্দ্র বহু যুদ্ধের পুরোভাগে আই এন এর নেতৃত্বদানের জন্য প্রবল আগ্রহী ছিলেন। *

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

শ্রীগীতা	৬.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫.০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫.০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১.৫০
কর্মবাণী	১.২৫
Soul of India Speaks	5.00

বাংলার ঋষি	৩.০০
বাংলার মনীষী	১.৩০
বাংলার বিদ্বান	২.০০
বীরভৈ বাঙালী	১.৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২.০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪.০০
রাজর্ষি রামমোহন	১.৫০
রবীন্দ্রনাথ	১.২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১.৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১.৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যামাগর	২.২৫
মানুষের মত মানুষ	১.৭৫
শিশু রামায়ণ	১.৬২
শিশু মহাভারত	১.৭৫

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :

১৫ কলেজ স্কোয়ার :

কলিকাতা-১২

ইনি একটা কারখানার সহকারি ফোরম্যান।
এই কারখানাটির গবেষণাগারে একজন
সহকারি হিসেবে যোগ দিয়ে, সাত বছরের
মধ্যে তাঁর এই পদোন্নতি হয়েছে। তিনি
বলেন, “আমি যে উন্নতি করেছি, চেষ্টা ও যত্ন
থাকলে অন্যও অবশ্য এই রকম উন্নতি করতে
পারেন। তবে আমি যখনই যে কাজ করি,
তা নির্ভার সঙ্গে করি। আমার কয়েকজন
সহকারী, ছেলেমেয়ে বেশী আর তাঁদের
দুর্ভাবনা আমি সব সময়েই দেখছি। আমার



মাত্র দুটী সন্তান
এবং তাদের আমি,
আমার সাধ্যানুসারে
মানুষ ক'রে তোলবার
চেষ্টা করছি। সেই
জনাই আমি স্মৃতি।”

ইনি স্মৃতি।

আপনি ?



: উপভাস :

কঠোর বিষ

মি হি র মুখো পা ধ্য য

চৌত্রিশ

মাধবদাস বাবাজীর আশ্রমটি চমৎকার। মাটির ঘর। খড়ের ছাউনি, মাটির দেয়াল, বৃকসমান উচু মাটির ভিত্তি, বাঁশের খুটি। তক্তকে উঠোনে সিঁদুর পড়লে তুলে নেয়া যায়। প্রশস্ত উঠোনের চারপাশে সারি সারি ঘর। তুলসী মঞ্চ। পশ্চিমের ভিটের পূর্বমুখী অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে মুখ করে মহাপ্রভুর ঘর। কষ্টি পাথরের কৃষ্ণমূর্তি, বামে শ্বেত পাথরের শ্রীরাধা। দ্ব'পাশে গৌর নিতাই। শ্বেত পাথরের উর্ধ্ববাহু দুই মূর্তি। স্তম্ভের গঠন, প্রেম-বিহ্বল চোখ। মাধবদাস বাবাজী সারাদিন এই ঠাকুরের পরিচর্যায় কাটান। ঠিক মানুষের মত-সেবা করেন। ঠাকুরকে স্নান করান, খাওয়ান, বাতাস করেন, পরম যত্নে হাত-পা মুখ মুছিয়ে দেন। রঘু একদিন বলেছিল—মানুষটা একটু ক্ষ্যাপা আছেন গো কঠা, আপনাদের ওই মোহাস্ত বাবাঠাকুর—

—কেন ক্ষ্যাপা বলছিল কেন, ক্ষ্যাপামির কি দেখলি তুই—

—রাস্তির বেলা কেঁঠঠাকুরের পা টিপে ডানু, বলেন, সারা দিনমান ঠায় দাঁড়ায় থাক্তি হয়, ঠাকুরের পা ব্যথা করে—
প্রথমে বিশ্বাস করেনি ভারত। কয়েকদিন লক্ষ্য করে দেখল, কথাটা মিথ্যে নয়।

রোজ সন্ধ্যায় আরতির পর ভোগ হয়। তারপর ঠাকুরকে বিছানায় শুইয়ে পদসেবা করেন মাধবদাস। সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বলে ঠাকুরের নাকি পা ব্যথা করে। ভারতকেও ওই কথা বলেছিলেন মাধবদাস। কিন্তু ঠাকুর

বলবে কি করে? ওতো দাঁড়ানো মূর্তি।

পাথরের বিগ্রহের আবাব পা ব্যথা কি? এসব যুক্তির কথা মনে এলেও মুখে বলতে পারেনি ভারত, হাসি পেলেও হাসতে পারেনি। মাধবদাস বাবাজীর ভক্তি আর বিশ্বাসের সামনে কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল সে। বাবাজীর কাছে ঠাকুর জীবন্ত, পরমব্রহ্ম, পরিপূর্ণ সজীব। বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণ স্পন্দনের কেন্দ্র তিনি, 'যস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, প্রণিতে প্রণিতং জগত', তিনি কি জড় পাথরের মূর্তিমান হতে পারেন? সমস্ত ভক্তজনের আনন্দ-বেদনার, সুখ-দুঃখের সমভাগী তিনি। যারা অজ্ঞান তারা বুঝতে পারে না, তারা উপলব্ধি করতে পারে না। তারচেয়ে নামগান শোনো। কলিযুগে নামগান ভিন্ন গতি নেই, নাম-কীর্তন ছাড়া মুক্তি নেই। পথে পথে বুধাই ঘুরে বেড়ালে, ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হলে। এবার বাইরের আন্দোলন থেকে মনকে ফেরাও, আপন অন্তরে সমাহিত হও। মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করো। এক একদিন এমনি কত কথা বলেন মাধবদাস। বলতে বলতে এক একসময় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, চোখে জল আসে। নামগান করতে করতে বিভোর হয়ে যান।

ভারতচন্দ্র বৈষ্ণবনয়, বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাঁর অন্তরের কোন যোগ নেই, কিন্তু বৈষ্ণবদের আন্তরিকতার সে মুগ্ধ, অভিভূত। মাধবদাস বাবাজীর আশ্রমে প্রতি পূর্ণিমার অহোরাত্র কীর্তন হয়। অষ্ট প্রহর নামগান। তিনটে পূর্ণিমার উৎসব দেখেছে ভারত। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। সাধারণতঃ আশ্রমে আট দশ জন বৈষ্ণব আর ছ'সাতজন বৈষ্ণবী স্থায়ীভাবে

থাকেন। কিন্তু পূর্ণিমার দিন বহুভক্ত সমাগম হয়। দু'-একখানা পাকী ও এসে আশ্রমের বাইরে অপেক্ষা করে। বিশিষ্ট কেউ কেউ হয়তো আসেন। মহিলা ভক্তবৃন্দ বৈষ্ণবীদের আশ্রম-ঘরের দাওয়ায় চিকের আড়ালে বসেন। মস্ত উঠোনে কীর্তনের আসর। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে আসর জমে ওঠে। উদ্দাম নৃত্য শুরু হয়। এক পূর্ণিমায় ভক্তদের সঙ্গে রঘুও নেচেছিল খুব। পরের দিন সর্বাঙ্গ ব্যাধা।

নিরামিষ খেয়ে খেয়ে এই নাচ আর পোষাবে না।

রঘুর স্পষ্ট কথা—রাইভভর নাচবার পাক্রম না কর্তা, ওরে বাপরে, গা-গতর আর নাভবার পারি না—নিরামিষ খেয়ে খেয়ে রঘুও মুখে অন্নচি ধরে গেছে। জগন্নাথদেবের প্রিয় ভরকারী কথার অর্থাৎ চালকুমড়ো। দিনের পর দিন ওই কথার আর বেতারর ঘণ্ট। অর্থাৎ চাল কুমড়ো আর মিষ্টি কুমড়োর ঘাঁট। চৈতন্তদেব নাকি বাইশ রকম শাক ভালবাসতেন। মাধায় থাকুন মহাপ্রভু। মাছ না খেয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে রঘুনাথ। রোল সমুদ্রে স্নান করে মন্দিরে যায় ভারতচন্দ্র। তারপর আশ্রমে ফিরে এসে পরিষ্কার ঠাণ্ডা কুঁয়োর জলে আরেকবার স্নান করে। সমুদ্রের জলে কেমন ঝাঁপটে গন্ধ লাগে। চুল কেমন আঠা-আঠা হয়ে যায়। কুঁয়োর জলে স্নানের পর সন্ধ্যা আস্থিক। তারপর কোনদিন চিড়ে গুড়, কোনদিন কিছু ফল খেয়ে ঘরের দাওয়ায় পুঁথি-পত্তর নিয়ে বসে। আশ্রমে কিছু বৈষ্ণব গ্রন্থ আছে। চৈতন্তচরিতামৃতের বিশাল পুঁথি। একটু একটু করে পড়ছে ভারত। আশ্চর্য কবিশক্তি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর। তাঁর কবিরাজ উপাধি সার্থক। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি কবিত্ব; বৈষ্ণব দর্শনের দ্বন্দ্ব বিষয় কত সহজ করে বলেছেন। আবার কী বিনয়। চৈতন্তলীলার ব্যাস দাস বলাবন, তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্চন। আরে বাপ, কি কথার ঝাণুনি, উচ্ছিষ্ট চর্চনের নমুনা যদি এই হয়। ভারত মুগ্ধ

হয়ে গেছে, যত পড়ছে ততই বিশ্বাস বাড়ছে, আগ্রহ অনিবার্য হচ্ছে।

রঘুর রাগ হয়। ছোটকর্তার ওই এক দোষ। পুঁথি-পত্তর পেলে আর শিধে-ভেট্টা থাকে না। ভাল-মন্দ না খেলে শরীর টিকবে কেন? রঘু সারাদিন কোথায় একটু দ্ব্য, কোথায় একটু দ্বি, কোথায় ভাল শুভ পাওয়া যায়, এই ধান্দায় ঘোরে।

মাছের নাম মুখে আনতে পারেন না। একদিন এনেছিল। শুনে তো ভারত তেলে বেস্তনে জলে উঠেছিল। সোজা বলে দিয়েছে, আর কোনদিন মাছ মাংসের নাম মুখে আনলে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব। বৈষ্ণবদের সঙ্গে থেকেও ছোট-কর্তার মেলাজটি ঠাণ্ডা হয়নি। ছোট বেলার সেই একশুরে স্বভাবটিও তেমন বদলায়নি। একবার তো বাবা-মার কটুকথা শুনে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন। গেলেন তো গেলেন, আর বারো বছরের মধ্যে ঘরমুখো হলেন না। কতই বা বয়স ছিল তখন। পনেরো-ষোল। রঘুর চেয়ে বছর তিনেকের বড় হবেন। রঘু তাই ছোটকর্তার মেলাজ বুঝে চলে।

সেদিন ঘরের দাওয়ায় বসে পুঁথি পড়ছিল ভারতচন্দ্র। চৈতন্তচরিতামৃতের পুঁথি। আদি, মধ্য, অন্ত্য—তিন খণ্ডে মহাপ্রভুর তিন লীলার বর্ণনা।

পড়তে পড়তে দুপুর গড়িয়ে গেল। তারপর এক সময় বিকেলের আলোও নিবে এল। পুঁথির অন্ধরে আর চোখ চলে না। পুঁথি বন্ধ করল ভারত। চতুর্দশীর টাঁদ উঠেছে। আশ্রমেও সামনেই মস্ত একটা নিম গাছ। উঠোনে নিমের ছায়া। আলো ছায়ার আলপনা। আগামী কাল পূর্ণিমা। ফাল্গুনী পূর্ণিমা। মহাপ্রভুর জন্মদিন। আশ্রমে মহোৎসব। মহাপ্রভুর জন্মদিনের সেই পূর্ণিমা নিশীথে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই নৈসর্গিক ঘটনাটি আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে কাব্যে স্থান দিয়েছেন।

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন ।
সকলক্কে চক্ষু আর কোন প্রয়োজন ॥
এত জানি চক্ষু রাহ করিলা গ্রহণ ।
হরি হরি কৃষ্ণ নামে ভাসে জিহুবন ॥

আশ্রমে অষ্টগ্রহর নামকীর্তন হবে সবাই সেই আয়োজনে
ব্যস্ত । রঘুও সাধামত সাহায্য করছে । আশ্রমের সকলেই
কিছু না কিছু কাজ করে । কারিক শ্রমের কাজ ।
জপ-তপ নামগান ছাড়াও কিছু না কিছু সাংসারিক কাজ
সকলকেই করতে হয় ।

মোহান্ত বাবাজী থেকে শুরু করে বৃদ্ধা বৈষ্ণবী হরিদাসী
পর্যন্ত সবাই সানন্দে এই কাজ করে । শ্রবণ-কীর্তন, স্মরণ
-বন্দনের মত এই শ্রমও সেবার অঙ্গ ।

আশ্রমবাসীরা সকলেই এই সেবার সুযোগ পায় । এক
ভারতচন্দ্র ছাড়া । ইচ্ছে থাকলেও কোন কাজ করার উপায়
নেই তাঁর । রঘুনাথ হা-হা করে ছুটে আসবে ।
—আপনে কাপড় কাচতি লাগছেন ক্যান, আমি রইছি কোন্
কামে—

কাপড় কাচা কিংবা ঘর ঝাট দেয়া, কুরো থেকে জল তোলা
কিংবা নিজের এটো পাতা ফেলে দেয়া—কোন কাজই করার
সুযোগ পায় না ভারত । সর্বক্ষণ সজাগ থাকে রঘুনাথ ।
ছোটকর্তার যেন কোন অসুবিধা না হয়, কোন কষ্ট না হয় ।
এই মুহুর্তে রঘুকে কাছাকাছি দেখা গেল না বটে, তবে
ভারতের প্রয়োজনের সময় যে এসে হাজির হবে, তাতে
সন্দেহ নেই ।

দাওয়া থেকে উঠোনে নামল ভারত । বেশ জ্যোৎস্না
সুটেছে । হঠাৎ নজরে পড়ল নিমগাছের নীচে ছায়ার
অন্ধকারে একটি নারীমূর্তি । ঘননীল ওড়নার ঢাকা সর্বাঙ্গ ।

সেই ওড়নার উপর অলঙ্কারের মত জ্যোৎস্নার আলো ।
একটু আগে উঠোন কাঁট দিচ্ছিল হরিদাসী । এখন
নিমগাছের নিকটে দাঁড়িয়ে কথা বলছে । কোন বিশিষ্ট

মহিলাভক্ত হবেন হয়তো । সম্ভ্রান্ত ঘরের কেউ । তেমন
লক্ষ্য না করে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল ভারত । সমুদ্রের
দিকে যাবে সে ।

হঠাৎ হরিদাসী বললো—ওগো নতুন বাবাঠাকুর, এই একে
একটু এগিয়ে দেবেন গো—

ধম্কে দাঁড়াল ভারত । মাথায় নীল ওড়না । শুভ্র ললাটে
কুন্তল চূর্ণ, এক জোড়া ধনুর মত ভুরু, আর গভীর কালো
চোখে জ্যোৎস্নার মত নরম স্নিগ্ধ দৃষ্টি । এক পলক শুধু
দেখেতে পেল ভারত । চোখে চোখে তাকিয়েছিল যেহেঁটি,
পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে মাথার ওড়না আরেকটু টেনে দিল ।
তারপর কোন কথা না বলেই সামনে এগিয়ে গেল । কোন
কথা বলার অবসর পেল না ভারত । কোন প্রশ্নের সুযোগ
হল না । যেহেঁটির স্ত্রীম দেহভঙ্গী, গবিত প্রকল্পে যেন
তাকে নিঃশব্দে শুধু অমূল্যর করার নির্দেশ দিল ।

পেছন থেকে হরিদাসীর গলা আর একবার শোনা গেল—যাও
গো বাবাঠাকুর, পৌছে দিয়ে এসো—

পাঁয়ত্রিশ

উড়িষ্যা কিন্তু বেশী দিন মারাঠা অধিকারে থাকল না । কয়েক
মাসের মধ্যেই নবাব আলিবর্দী আবার উড়িষ্যায় এলেন ।
এবার সব দিকের আটঘাট বেঁধে এমনভাবে এলেন যাতে
মারাঠারা তেমন সুবিধে করতে না পারে । কোনকালেই
এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সব শক্তি জড়ো করে মুখোমুখি
লড়াই দিতে চায় না বর্গীরা । ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে
আচমকা কাঁপিয়ে পড়ে । লুটপাট খুনজখম করে চটপট
পালিয়ে যায় । আবার আরেকদিকে হানা দেয় । একই
সঙ্গে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে
আক্রমণ চালায় মারাঠারা । একটি কেন্দ্রীয় ঘাটি থেকে
সমস্ত অভিযান পরিচালিত হয় । মেদিনীপুরের নারায়ণ-
গড়ে এমনি ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলেন পণ্ডিত ভাস্কররাম ।
তারপর সরে এলেন উড়িষ্যার দিকে । নবাবও তাঁর বাছা

বাহা সেনাপতিদের নিয়ে পেরন পেরন চললেন। বর্গীদের তিনি দম ফেলারও অবসর দেবেন না। কিন্তু এদিকে আরেক বিপদ উপস্থিত হল।

দিল্লীর বাদশাহর হুকুমে অযোধ্যার স্ববাদের সফদারজঙ্গ বাংলা দেশ থেকে বর্গী তাড়বার জন্য পাটনার এসে হাজির হলেন। সঙ্গে ছয় হাজার পারসিক সৈন্য, দশ হাজার হিন্দুস্তানী অশ্বারোহী আর বড় বড় তোপ। ভরানক উজ্জ্বল এই স্ববাদের সৈন্যরা। বিশেষত পারসিকরা। এরা আগে ছিল নাদির শাহর দলে। দিল্লী লুণ্ঠ করে নাদির শাহ ফিরে যাবার পরেও এরা ছোট ছোট দলে এদেশেই রয়ে গেছে; এক একজন রাজা-মহারাজা স্ববাদের ফৌজদারের দলে যোগ দিয়ে স্ববিধেমনত লুণ্ঠ-পাট, খুন-জখম করে বেড়াচ্ছে। সফদারজঙ্গও পাটনার এসে এমন হুঁ-তধি শুরু করলেন যে তিনিই হবে-বাংলার নবাব। গুজব রটতেও বেরী হ'ল না। দিল্লীর বাদশাহ মুহম্মদ শাহ নাকি সফদারজঙ্গকেই হবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব করে পাঠিয়েছেন।

নবাব আলিবর্দী খান বাহাদুর পড়লেন মহামুস্কিলে। দক্ষিণে মারাঠা আর পশ্চিম থেকে এলেন বন্ধু বেলী এক শত্রু। আফগান সর্দার মুস্তাফা খান আর রাজা জানকীরাম হলেন নবাবের ডান হাত আর বামহাত। এই দুই প্রধান পরামর্শদাতার সঙ্গে অনেক সলাপরামর্শের পর উপায় স্থির হল। সফদারজঙ্গকে আর মুর্শিদাবাদের দিকে এগুতে দেয়া ঠিক নয়।

অনেক মুসাবিদা করে সফদারজঙ্গ বাহাদুর বরাবরের একখানি চিঠি লিখলেন নবাব আলিবর্দী খান। এলাহি ভরসা। বর্গী দুশমনদের দমন করার জন্য খোদাতালার দোয়া ছাড়া কোন মানুষের মেহেরবাণী কামনা করেন না নবাব। সফদারজঙ্গ বাহাদুর যেন পাটনা থেকেই নিজের দেশ অযোধ্যা ফিরে যান। আল্লার কুদ্রতে নবাব আলিবর্দী খান একাই

দুশমনদের শাস্তি করতে পারবেন।

চিঠি পাবার পরেও কিন্তু কিছুদিন পাটনার বাঁটি গেড়ে বসে রইলেন সফদারজঙ্গ বাহাদুর। খুব নাচগান আগোদ-ফুটি চললো। অগ্রহায়ণ মাস কেটে গেল। ভারতচন্দ্র আর রঘুনাথ তখন পুরীধামে মাধবদাস বাবাজীর আশ্রমে আশ্রয় পেয়েছে। সেখানে বসেই খবর শুনল, নবাব আলিবর্দী খান বর্গীদের তাড়া করে চিলকা হ্রদ পার করে দিয়ে এসেছেন। উড়িষ্যায় মারাঠা অধিকার শেষ হ'ল বটে, কিন্তু নবাবের কপালে বিশ্বাসের স্বপ্ন ছিল না। কটকে এসে শিবির স্থাপন করলেন আলিবর্দী খান। উড়িষ্যার শাসন-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করলেন। পৌষ মাস শুরু হ'ল। কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।

পৌষের মাঝামাঝি সফদারজঙ্গ পাটনা থেকে ডেরাডাঙা তুলে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন। নবাব কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার অবসর পেলেন না। মাঘ—ফাল্গুনেই আরেক বিপদ ঘনিয়ে এল। মারাঠা রাজ্যের প্রধান পেশবা বালাজী বাজিরাও চতুর্দশ হাজার সৈন্য নিয়ে হবে বাংলায় এসে হাজির হলেন। কী ব্যাপার? না, দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে বর্গী দমন করার জন্য পাঠিয়েছেন।

রঘুজী ভৌসলা যদিও কার্যত স্বাধীন, তবুও পেশবার প্রতি আনুগত্য থাকা উচিত। হোলকার, সিন্ধিয়া, গায়কোয়াড়—মারাঠা রাজ্যের সমস্ত প্রধানরা পেশবাকে মাস্ত করেন। কিন্তু রঘুজী হ'ল যতিশ্রম। ভাস্কর পণ্ডিতের পরামর্শে তিনিও এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন। উড়িষ্যা হারিয়ে সম্মান নষ্ট হয়েছে রঘুজীর। সম্মানের লড়াই দ্বিতে বিপুল বিজয়ে এলেন।

বাংলা দেশে তখন তিনটি প্রবল পক্ষ। আলিবর্দী খান, রঘুজী ভৌসলা এবং স্বয়ং পেশবা বালাজীরাও। এই তিন প্রধানের লড়াইতে বাংলাদেশ এবার শাসন হয়ে যাবে। —চলো, ঠাকুর, এই পোড়া দেশ ছেড়ে আমরা পালিয়ে

যাই—ভারতচন্দ্রের বুকের ওপর হাত রেখে প্রায় কিস্কিন্স করে বলেছিল বিশাখা। দেবদাসী বিশাখা। সুন্দরী বিশাখা। পদ্মপাতার মত নরম সেই হাতের ছোঁয়ার রক্তের ভেতর যেন সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেরেছিল ভারত। একটু উত্তেজিত অস্থির কণ্ঠে আবার বলেছিল বিশাখা—চলো, আমরা বৃন্দাবন পালিয়ে যাই, এখানে আমি আর টিকতে পারছি না, এই হতভাগা জায়গায় আর থাকতে পারবো না, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, চলো, আমাদের নিয়ে চলো ঠাকুর—পুরীর মন্দিরের দেবদাসী বিশাখা। সাধারণ মেয়ের মতো ভীষণভার সঙ্কোচ নেই, লজ্জার সংস্কার নেই। এই দুঃসহ জীবন যাপনের ধানি থেকে মুক্তি চাইছে। মুক্তিব জন্ম ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মাথার মধ্যে যেন মহাপ্রভুর নগরী কর্তন শুরু হয়েছে। যেন সহস্র মূপুর ক্রমাগত বেজে চলেছে। ঝম্-ঝম্-ঝম্-ঝম্।

মুদ্রের তালে তালে পা কেলে কেলে নেচে চলেছে বিশাখা। মন্দির প্রাঙ্গণে আরতি নৃত্য। প্রথমে একক নৃত্য, তারপর সমবেত নৃত্য। তারপর আবার একক, আবার সমবেত।

অনেকক্ষণ ধবে এই নৃত্য চলবে। বিশেষ অমুমতি ছাড়া এই নৃত্য সাধারণ কেউ দেখার সুযোগ পায় না। মাধবদাস বাবাজীর আশ্রমের লোক বলে, মারাঠা নারক শিবভট্টের অমুগ্ধীত বলে এই বিশেষ অমুমতি পেরেছিল ভারতচন্দ্র। ঝম্-ঝম্-ঝম্-ঝম্। মৃদঙ্গ, মন্দিরা, বাঁশী। আট-দশজন দেবদাসী আশেপাশে বসে বাজাচ্ছে। বিশাখার নিম্নাঙ্গে সাদা জরির কাজ করা ঘননীল ঘাগরা, পায়ে ঘুঙুর, উর্ধ্বাঙ্গে ঘননীল কাঁচুলি। কণ্ঠে, কর্ণে, বাহুতে ফুলের আভরণ। অশ্লষ মসলিনের ওড়না। কানাড়ী ছন্দে কবরী বাঁধা।

প্রায় একশত প্রদীপ জলছে। স্থপের সৌরভ। প্রশস্ত অঙ্গনের কোণে কোণে আবছা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ছায়ার মত পুরোহিত আর পাণ্ডারা এদিক-ওদিক চলাফেরা করছে।

আবছায়া অন্ধকারে একটি স্তম্ভের আড়ালে বসে আছে ভারতচন্দ্র। তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে এক অপূর্ণপ অগ্নিশিখা। ছলছে ঘুরছে, কখনো নিকটে, কখনো দূরে। কখনো মনে হয় ক্রান্ত বিষয়, করুণ। পরক্ষণেই উন্নত, উদ্দীপ্ত, অস্থির।

বাত্তের তালে তালে স্তম্ভ শরীরে যেন সমুদ্র তরঙ্গের লীলা। সেই প্রবল তরঙ্গের আঘাতে যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে ভারতচন্দ্র। দক্ষপক্ষ মুগ্ধ পতঙ্গের মত তাঁর সমস্ত শরীর জলছে। প্রতিটি শিরা উপশিরায় যেন তরল অগ্নির স্রোত। বিশাখার কণ্ঠে, কটাক্ষে, বাহুতে, গ্রীবায়, হাতের পাতায় আঙুলে বিচিত্র মুদ্রার প্রকাশ। পতাকা, মুদ্রাক্ষ, স্বত্বতুণ্ড, হংসপক্ষ্ম, অঞ্জলি, হংসাঙ্ঘ। কখনো মুকুর মুদ্রা, কখনো স্রমর মুদ্রা, কখনো বৃগশীর্ষ, কখনো অরুণাভ। সেদিন হরিদাসীর অমুরোধে কতটা যেন মোহাবিষ্টের মতো পেছন পেছন গিয়েছিল ভারত। পরের দিন পূর্ণিমা। গুরুপক্ষের রাত। শুভ সৈকতভূমি। ডান পাশে কৃষ্ণনীল সমুদ্র, বামে পুৰীধামের গৃহশ্রেণী। সম্মুখে অবগুপ্তিতা রহস্যময়ী। গুরুশ্রোণিতারে মেন দীর্ঘ মহরগামিনী। গতিছন্দের সঙ্গে সর্পাকৃতি দীর্ঘ বেণী মৃদু মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। গমনভঙ্গিমায় মুগ্ধ হয়ে গেল ভারতচন্দ্র। পদ্মিণী নারীহুলভ দেহ সৌষ্ঠব। যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল সেই রহস্যময়ী।

—ঠাকুর, তোমার দেশ কোথায় গো—অন্তরঙ্গ সহজ সর, কোন জড়তা নেই, কুষ্ঠা নেই।

—বাংলা দেশ—

—তুমি বাঙালী!—পাশাপাশি যেতে যেতে আবার জিজ্ঞাস করছিল মেয়েটি—নাম কি গো তোমার?

—আমার নাম শ্রীরাধানাথ রায়—

—এই আশ্রমে কেন এসেছো, তুমি কি বৈকব—

—না বৈকব নই, হয়তো শাস্ত্রও নই, কোন গৌড়ামি নেই আমার, হিন্দু ব্রাহ্মণ আমি—

—তবে এই আশ্রমে কেন, তুমি কি সম্যাস নেবে—

—সে অনেক কথা, সংসার ত্যাগ করে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তবে সম্যাস নেব কি না জানি না, অন্ততঃ এখন পর্য্যন্ত কিছু স্থির করিনি—

—তোমার দেশে কে আছে—যেতে যেতে সামনে চোখ রেখে কথা বলছিল মেয়েটি, এবার পাশে মুখ তুলে তাকল। মাথার ঘোমটা সরে গেছে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। মুহূর্ত্তমাত্র দুজনে চোখে চোখ রাখল। আবার সামনে তাকাল মেয়েটি। মাথায় আর ওড়না তুলে দিল না। কাছাকাছি কেউ নেই। নির্জন সমুদ্র সৈকত। ছোট ছোট বালির টিপি। চন্দ্রালোকে সহস্র তরঙ্গশীর্ষ স্বটিক খণ্ডের মতো জ্বলছে। বসন্তের হঠাৎ হাওয়া একপ্রকার ছুটে আসছে। মেয়েটিব কপালের কাছে চুলের গুচ্ছ উড়ছে, ঝাঁচল উড়ছে, বেগী ছলছে। ভারতের লম্বা চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

একটু ভেবে জবাব দিয়েছিল ভারত—সংসারে আমার আপন জন কেউ নেই—

—কেউ নেই, বাবা-মা, ভাই-বোন, জ্বী-পুত্র কেউ নেই—মেয়েটির কণ্ঠস্বর কেমন বিষম মনে হল।

—সব থেকেও কেউ নেই, আমার সব কথা বলতে গেলে মহাভারত, তার চেয়ে তোমার পরিচয় শুনি, তোমার নাম কী—

—আমার পরিচয়, আমার নাম—স্নানভাবে একটু ঘেন হাসল মেয়েটি, থমকে থেকে ভারতের মুখের দিকে পরিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে বলেছিল—আমার পরিচয় তুমি জানো না ?

—বাঃ কি করে জানবো—

—আবার পাশাপাশি ধীর পায়ে যেতে যেতে বললো মেয়েটি—আমাকে তুমি এর আগে আশ্রমে কখনো দেখনি ?

—ঠিক মনে পড়েছে না, আশ্রমে তো অনেকেই আসে, অনেক মহিলাও আসেন, আমি ভেমনভাবে কাউকে লক্ষ্য করিনি—

—আমি কিন্তু তোমাকে লক্ষ্য করেছি, যতবারই দেখেছি, তুমি

শুধু পুঁথি-পত্তর নিয়ে বসে আছো, তুমি খুব পড়াশোনা কর, অনেক শাস্ত্র পড়েছো তুমি, ঠিক না—ছোট মেয়ের মতো খুশি খুশি মুখে মাথা ছলিয়ে বলার ভঙ্গিটি দেখে একটু হাসল ভারত—কি করে বুঝলে আমি অনেক শাস্ত্র জানি—

—তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়, কেমন সুন্দর পণ্ডিত পণ্ডিত চেহারা তোমার—

—তাই নাকি—হাসি মুখে বললো ভারত—কিন্তু তোমার পরিচয় তো বললে না, তোমার নাম কি—

—আমার পরিচয় শুনে কি লাভ হবে তোমার, আমার জীবন বড় দুঃখের—

—তোমার আপত্তি না থাকলে বলো, আমি শুনবো তোমার দুঃখের কথা—

—আজ সব কথা বলার সময় নেই—একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল মেয়েটি।

—শুধু শুনে রাখো মহাপ্রভু জগদ্বাদেবের মন্দিরের আমি একজন দেবদাসী—

—দেবদাসী !—চমকে উঠেছিল ভারতচন্দ্র, থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, বিস্ময়ে বিমুঢ় চোখে তাকিয়েছিল একটু কাল।

মেয়েটিও একটু থেমে আয়ত চোখ তুলে স্নান হেশ বলেছিল—

খুব অবাক হয়েছ না, আমাদের আর কোন পরিচয় নেই, কোন পরিচয় থাকেও না, কোন মাহুষের সঙ্গে আমাদের কোন আত্মীয়তা হয় না, হতে পারে না, আমাদের কোন সংসার নেই, সমাজ নেই, আমরা এক একজন ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ, সে যে কী শাস্তি, তুমি বুঝতে পারবে না—কণ্ঠস্বর ভারী হতে হতে কথা থেমে গিয়েছিল, বোধহয় চোখের জল গোপন করার জন্যই মুখ নিচু করেছিল মেয়েটি।

বেদনাহত কণ্ঠে বলেছিল ভারতচন্দ্র—তোমার নামটি জানতে পারি—

—আমাদের পুরনো নাম আমরা ভুলে যাই—ধীরে ধীরে মুখ তুলেছিল সে, চোখের পাতা ভেজা ভেজা, থেমে থেমে

বলেছিল—দেবদাসী হবার পর, বৃন্দাবনের ঘোষণাত গোপিনীর নামে আমাদের নতুন নামকরণ হয়, আমার নাম বিশাখা—

—বিশাখা, বি-শা-খা—আন্তে আন্তে টেনে টেনে নামটি ছ'বার উচ্চারণ করেছিল ভারত।

আশ্চর্য মেয়ে, পরক্ষণেই চোখের জল মুছে চটুল স্বরে হেসে বলেছিল—ও নাম জপ করে কোন লাভ নেই, বড় অভিশপ্ত নাম, কিন্তু তুমি এবার ফিরে যাও, আমি এখন একাই যেতে পারবো, আবার দেখা হবে, আচ্ছা আসি—

খেয়াল হল ভারতের। রাত্রির প্রথম প্রহর প্রায় উত্তীর্ণ। সামনেই কিছুদূরে জগন্নাথদেবের মন্দির চূড়া। একটি সংকীর্ণ গলি-পথের মুখে তারা দাঁড়িয়ে আছে।

লঘু পায়ে দ্রুত ওই গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই রহস্যময়ী নারী। দেবদাসী বিশাখা।

(ক্রমশঃ)

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্ম

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সড়াক ৯৫০। বার্ষিক ৪৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্ম স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্ম

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাপ্রায়ে দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিষ্কার হরফে স্কলস্কাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।
৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

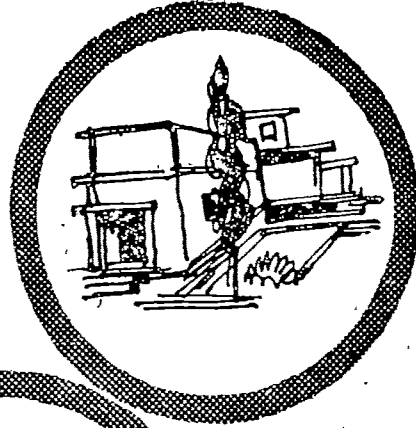
শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ-যোগিতার জন্ম আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান

কলিকাতা-৪৭



আপনার মেয়ের বিয়ে বা ছেলের লেখাপড়া
অথবা নিজের একগানা বাড়ী যে উদ্দেশ্যেই
হোক না কেন তার জন্য যে টাকার ব্যয়কার
তার সহজ উত্তর হ'ল ক্রমবর্ধমান
নির্দিষ্টকালীন জমার একটি হিসেব।

১। পোস্ট অফিসে, আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী
৫, ১০ বা ১৫ বছরের জন্য প্রতি মাসে টাকা জমা
বাধুন। তবে সেই টাকার পরিমাণ (৫ টাকা দিবে
বিশভাজ্ঞা) ৩০০ টাকার অন্তর্গত হওয়া চাই। নির্দিষ্ট
সময়ের পরেই আপনি আপনার প্রয়োজনীয় টাকা
পেয়ে যাবেন। অর্থাৎ আপনি যে টাকা জমা রেখেছেন
তা এবং সেই সঙ্গে কর্তৃত্বইীন হবেন।

২। যতদিন আপনি এই বকম ভাবে সঞ্চয় করবেন
ততদিন আপনি ১৫ বা ১৫ বছরের হিসেবে যে
টাকা জমা দেবেন সেই পরিমাণ টাকা, আপনার
করযোগ্য মোট আয় থেকে বাদ যাবে।

৩। এই বকম ভাবে জমা টাকার সম্পদ কবও
দিতে হয়না।

সমস্যার সম্পাদন হয়ে গেল

নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে
ক্রমবর্ধমান
নির্দিষ্টকালীন
জমার একটি
হিসেব খুলুন



জাতীয়
সঞ্চয়
সংস্থা

জল

মাটি

মন

ম হী তো য বি খা স

২৫

সাবাদিন ধ'রে বলরামদের দলটা এগিয়ে চলল। গড়ান-বেলায় গিয়ে হাজির হল বাউলির হাটে। আজ হাট নেই। সারি সারি চালাবরগুলো ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সামান্য ছ'একটা লোক ছাড়া কেউ কোথাও নেই। একপাশে বড়ো একটা বট গাছ। ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ধানিকঙ্কণ বিশ্রাম করল বটগাছের ছায়ায় বসে। জল-টল খেলো। তারপর আবার চলতে শুরু করল। সন্ধ্যো নাগাদ গিয়ে পৌঁছলো নল-পোতার ধানার কাছে। ধানার পাশ দিয়েই রাস্তা তৈরী হচ্ছে। সত্যিই বটে! ডাল গাছের মতনই উঁচু রাস্তা। অন্ধকার হয়ে এসেছে। কিন্তু এখনও জায়গায় জায়গায় হারিকেন জালিয়ে কাজ চলছে। রাস্তার দুই পাশ দিয়ে ফাঁকা মাঠ। সেখানে হোগলা পাতার-ছোটো ছোটো ছাউনি। রান্নার আয়োজন চলছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে আকাশে।

একে তো অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। তারপরে অচেনা জায়গা। তারও উপর সারাদিনের এতোখানি হাঁটাচাটের পরিশ্রম। ইচ্ছে থাকলেও সব জায়গা ভালো করে ঘুরে-ফিরে দেখা সম্ভব হলনা বলরামদের পক্ষে। যা দেখার বা

করার, কাল সকালে করলেই চলবে। গতরটা আজ আর নড়তে চাচ্ছে না। একটা ফাঁকা জায়গা দেখে ওরা রাতের মতন বিশ্রামেব আয়োজন করল। আজ রাতে আর রান্না-বান্নার পাট নেই। সঙ্গে চি'ড়ে আছে। তার কতকগুলো চিবিয়ে পেটভরে জল খেয়ে সকলে স্তয়ে পড়ল।

পরদিন লোকজনের হৈ-হল্লায় ভোর-ভোর ওদের ঘুম ভেঙে গেল। চারিদিক পরিষ্কার হতেই ভালো করে দেখল জায়গাটা। সত্যিই একটা কাজের মতন কাজ হচ্ছে বটে! আর কতলোক খাটছে। রাস্তার কিছু দূরে দূরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বড়ো বড়ো খাদ। প্রতি খাদের মাঝখানে একটা করে মাটির খামের সাকী। কোদালীরা মাটি কেটে ঝুড়ি বোঝাই করছে। তারপর সেই ঝুড়ি তুলে দিচ্ছে বগুন-দারদের মাথায়। বগুন-দারেরা পি'পড়ের সারির মতন পিল্ পিল্ করে মাটি ঢেলে দিয়ে আসছে রাস্তায়।

কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে তো আর চলবে না। নিজেদেরও কাজের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। একটু বেলা হতেই বলরাম, কেষ্ট, বংশী এবং আরো কয়েকজন বেরিয়ে পড়ল। খুঁজে খুঁজে কেষ্টর ভগ্নী-পতি মহীন্দরকে বের করল। মহীন্দররা আগে এসেছে। হুতরাং এখানকার

হাল গতিকটা ওরা একটু বেশী বুঝবে। মহীন্দর বলরামদের কন্ট্রাক্টর বাবুর কাছে নিয়ে গেল। একটা তাঁবুর নীচে শোলার টুপি মাথায় দিয়ে চেয়ারে বসে কন্ট্রাক্টরবাবু মজুরদের পাওনা-গণ্ডার হিসাব-পত্তর করছিলেন। মহীন্দর বলরামদের নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল। কাজ ফেলে মহীন্দর বেশীক্ষণ থাকতে পারল না। পরে আবার দেখা হবে বলে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

লিখতে-লিখতে কন্ট্রাক্টর বাবু কপাল থেকে শোলার টুপিটা একটু উপরে ঠেলে ধরলেন। তারপর ওদের দিকে আড়-চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন—“তোমরা কাজ করতে চাও ?”

বলরাম তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে এলো। হাত-ছুটে জোড় হাতের ভঙ্গীতে এক করে বলল—“হয় বাবু, কাজ করবো বলেই তো আইছি।”

লিখতে লিখতে কন্ট্রাক্টর বাবু প্রশ্ন করলেন “দলে কতোজন আছো তোমরা ?”

বলরাম একটুখানি ভেবে বলল—“আজ্ঞে তিরিশজন।”

—“তা মাটি কাটার কাজ করতে পারবে তো তোমরা ?”

—কন্ট্রাক্টর বাবু প্রশ্ন করলেন।

বলরাম কুন্তিতভাবে একটু হেসে বলল—“আজ্ঞে কি যে ক’ন বাবু। আমরা হলাম কারুখালির চাষী মানুষ। নাজল ঠেলে খাই। আমরা মাটি কাটার কাজ করতি পারব না।

কন্ট্রাক্টরবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—“তা, কবে থেকে কাজ আরম্ভ করতে চাও ?”

উৎসাহিত বলরাম সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বলল—“আজ্ঞে বাবু, আদেশ জান্ন তো আজকেই না’গে যাই।”

কন্ট্রাক্টরবাবু লেখা ধামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—“মজুরী কি রকম চাও তোমরা ?”

এইবারই আসল কথা। দর-দামের কথা কিছুই আগে ঠিক করা নেই। আম্তা আম্তা ক’রে বলরাম বলল—

“আজ্ঞে বাবু, সে আপনি যেটা নেম্য মনে করেন, তাই দেবেন।”

কন্ট্রাক্টরবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—“দেখো, অনেকেই আমার কাছে কাজের লজ্জা আসছে। কিন্তু সকলকে আমি নিচ্ছি না। তা তোমরা যখন এতো ধরাধরি করছ, তখন তোমাদের কাজ দেব। তবে ফুরোনের কাজ আর দেব না। হিসেব নিলিয়ে দৈনিক মজুরী হস্তাহ অন্তর একদিন মিটিয়ে দেব। আর দৈনিকের মজুরী তোমাদের দেড়টাকার বেশী দিতে পারব না। খাই-খরচা ওরই মধ্যে।”

কথাটা শুনে বলরামের উৎসাহ কমে এলো। এ-হিসেবে কাজ করলে পরিশ্রম পোষাবে না। ছোটো পয়সা ঘরে নিতে এসেছে। কিন্তু ঐ তো পয়সা। তার উপরে আবার ঐ থেকে খাই-খরচা। বলরাম সকলের দিকে ডাকাল। দেখল, ওরাও নিরাশ হ’য়ে পড়েছে। এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

বংশী এতোকণ পিছন দিকে দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে এসে বলরামের পাশে দাঁড়িয়ে বলল—“দেন্, দেন্, কন্ট্রাক্টরবাবু, আর আট্টো আনা পয়সা অন্ততঃ বাড়িয়ে দেন্। গরীব মানুষ আমরা। ষ্ট্রু পড়্তা মতন করে দেন্। আপনার ভো মেলাই নাভ হবে।”

—“না, না—তোমাদের আমি কাজ দিতে পারব না। ওসব দরাদরির মধ্যে আমি নেই। দেখতেই তো পাচ্ছ, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নেই।”

—কন্ট্রাক্টর বাবু গম্ভীর মুখে রেখে দেওয়া কলমটা নিয়ে আবার লিখতে শুরু করলেন।

সকলেই হতাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু উপায় কি! ঐ মজুরীতেই রাজী হতে হবে।

বলরাম সকলের সঙ্গে একটু পরামর্শ করল। তারপর বলল—“আমরা রাজী আছি বাবু। ঐ মজুরীতেই কাজ করবো আমরা ?”

কণ্ট্রাক্টরবাবু লিখতে লিখতে বজ্রেন,—“বল্ল্যাম তো, তোমাদের আমি কাজ দিতে পারব না। আমার লাভ-লোকশানের হিসেব তোমাদের রাখতে হবে না। কাজও করতে হবে না।”

সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। বংশীর কথায় কণ্ট্রাক্টর বাবু রেগে গেছেন বুঝতে পারল। সত্যিই যদি কাজ না দেন। কি হবে তাহলে?

বলরাম তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বলল—“আপনি রাগ করেন না বাবু। ওর এটু মাথার গোলমাল আছে। ওর কথা ধরবেন না।”

বলরামের দেখাদেখি বংশীও হাত জোড় করে বলল—“মাপ করেন বাবু আমাদের। চামড়ার মুখ তো বাবু, হড়কায় বারোয়ে গেছে কথাটা। তা অমন কথা আর কবো না। মাপ ক’রে নেন আমাদের।”

কণ্ট্রাক্টর বাবু কটমট করে একবার তাকালেন বংশীর দিকে। তারপর বজ্রেন—“ঠিক আছে। কাজ তোমাদের দিচ্ছি। কিন্তু খব্দার! কারো মুখে যেন আলতু-ফালতু কোনো কথা না শুনি।”

একে একে কণ্ট্রাক্টর বাবু ওদের সকলের নাম ধাম লিখে নিলেন।

কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে কণ্ট্রাক্টরের লোক এসে ওদের কাজ-পত্তর বুঝিয়ে দিল। কোথা থেকে মাটি কাটতে হবে। কোথায় ফেলতে হবে। সব কিছু। তাড়াতাড়ি করে এক আধ-গাল চিড়ে ভিজিয়ে খেয়ে নিল সবাই। তারপর ঐ দিনই কাজ আরম্ভ করে দিল। সারাদিন ধরে কাজ চলল। ছপুর বেলায় খাবার ছুটি। এবার তাড়াতাড়ি করে রান্নার জোগাড় করতে হবে। কিন্তু খেটেখুটে এসে সকলের হাত পা যেন ধরে এসেছে। এখন দুটো রাঁধা-ভাত পেলে বেশ হত। সকলেরই মনটা একটু অস্থগনক হয়ে গেল। হয়ত এক ঝলক বাড়ীর কথাও মনে পড়ল।—

যাহোক, বসে থাকলে তো চলবে না। হাতে হাতে সবাই মিলে জোগাড় যত্তর দিয়ে ফ্যানে-ফ্যানে দুটো ভাত সেদ্ধ করে নিল। খেয়ে উঠে একটু বিশ্রাম করে আবার কাজ শুরু হল।

দশ বারোজন মিলে মাটি কেটে দিচ্ছিল। বাকী সকলে ঝুড়ি ভর্তি মাটি নিয়ে রাস্তায় ঢালছিল। খাদ থেকে রাস্তাটা বেশ খানিকটে দূরে। এক-নাগাড়ে এতোখানি জায়গা মাটির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে যেতে বেশী কষ্ট হয়। তাই মাঝখানে খানিকটে ফাঁক রেখে রেখে ওরা সারি বেঁধে দাঁড়াল। একজনে ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে একটুখানি এগিয়ে আর একজনের মাথায় তুলে দেয়। সে আবার খানিকটে এগিয়ে আর একজনের মাথায় তুলে দেয়। এইভাবে ভর্তি ঝুড়িগুলো এগিয়ে চলল। ফেরার সময় হাতে হাতে ফাঁকা ঝুড়ি-গুলোও ফিরে আসে কোদালীর কাছে। নতুন করে মাটি ভরার জন্য। বেশ এগিয়ে চলেছে কাজ। মাঝে মাঝে কণ্ট্রাক্টর বাবু এসে দেখে শুনে যাচ্ছেন। মাপ-পত্তর বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আর ঘণ্টাখানেক মতন কাজ করতে পারলেই আঞ্জকের মতন ছুটি। রাতের বিশ্রাম।

বলরাম মাটি কেটে দিচ্ছিল। ওর সারিতে প্রথম বগুনদার বংশী। শীর্ণ, দুর্বল মানুষটা। বেতের মতন লিপ্কিক করছে। মাথায় ঝুড়ি তুলে দিলে শরীরটা যেন ওর আবো কুজো হয়ে আসে। পাখবের মতন ভারী মাটি। ঝুড়িটা মাথায় তুললে কানের পাশ দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত যেন টাটিয়ে ওঠে। বংশীর মাথায় ঝুড়ি তুলে দিতে গিয়ে প্রতিবারেই বড়ো মায়া হচ্ছিল বলরামের।

সকলেই এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। শরীরে আর কুলোচ্ছে না। ঝুড়ি মাথায় তুলছে আর ভাবছে—কখন কণ্ট্রাক্টরবাবু যদি দেখে ছুটির সময় বলবেন। হাত মাথায় একটু জিরেন মিলবে।

আর কিছুক্ষণ কাজ করলেই হয়ে যাবে। দৈনিক মজুরীর

কাজ হলেও মোটামুটি মাটির মাপের একটা গড়-পড়তা হিসেব আছে। সেটুকু মাটি অন্ততঃ দিনে কাটতে হবে। কট্টাকটরবাবু বারবার সমঝে দিয়ে গেছেন। প্রথম দিকে বলরাম ঝুড়িতে একটু কম-কম করেই মাটি তুলছিল। বংশীর মাথায় অতোখানি ভর্তি ঝুড়িটা তুলে দিতে ভীষণ খারাপ লাগছিল। কিন্তু এখন বাধ্য হয়েই ঝুড়িতে পুরো মাটি তুলতে হচ্ছে। না-হলে মাপের মাটি শেষ হবে না। প্রথম দিকে বংশী ঝুড়ি অদল-বদল করার ফাঁকে বলরামের সঙ্গে এটা ওটা কথাবার্তা বলছিল। হাসি ঠাট্টাও করছিল। কিন্তু এখন একেবারে চুপ করে গেছে। প্রাণপণে কোনোমতে ভর্তি ঝুড়ি বয়ে নিচ্ছে। তারপর কাঁকা ঝুড়িটা নিয়ে টলতে টলতে এসে বলরামের পাশে ফেল দিচ্ছে।

বংশীর মাথায় ঝুড়ি তুলে দিয়ে বলরাম কেবল পিছন ফিরেছে। ফিরেদাঁড়িতে একটা কোপ দিয়েছে। হঠাৎ ধপাস করে পিছনে একটা শব্দ হল। বলরাম তাড়াতাড়ি মাথা উচু করে পিছন দিকে তাকাল। বংশীর মাথা থেকে ঝুড়িটা ছিটকে একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। আর তার পাশে মুখ খুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেছে বংশী। বলরাম তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বংশীকে তুলল। আশপাশ থেকে আরো অনেকে ছুটে এলো। বংশীও ততক্ষণে একটু সামলে উঠেছে। নিজেই চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিয়ে ঢকঢক করে ঝানিকটে জল খেলো। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠেছিল। টালু সামলাতে পারেনি।

বংশীর মাথায় আর ঝুড়ি দেওয়া হল না। বাকী সকলে আবার কাজ আরম্ভ করল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ছুটি হয়ে গেল।

ওদের নির্দিষ্ট জায়গায় সকলে ফিরে এলো। জিনিষপত্র রাখবার জম্ম হোগলা-পাতা দিয়ে একটুখানি জায়গা ঘিরে নিয়েছে। সকলেই বংশীকে নিয়ে বেশ তৃপ্তিমান পড়েছে। এ-রকম হলে তো ওকে নিয়ে কাজ করা বাবে না। দলের

বদনাম হবে। কেউ কেউ স্পষ্ট বলেই ফেলল—বংশীকে বাড়ী ফিরে যাবার জম্ম। বংশী কারো সাথে কোনো কথা বলল না। চুপচাপ এসে মুখ গৌজ করে এক একপাশে শুয়ে পড়ে থাকল।

একটু জিরিয়ে-শিতিয়ে কেউ কেউ রান্নার জোঁগাড়ে লেগে গেল। কেউকে নিয়ে বলরাম গেল মহীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। দেখাশাফাৎ করে যখন ফিরে এলো তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। এসেই দেখে, সকলেরই মধ্যে বেশ খাওয়ার তাড়া পড়ে গেছে। সাবান দিন বেদম খাটনি গেছে। কোনো মতে ছোটো পেটে দিতে পারলেই এখন টেনে ঘুম।

রান্না হয়ে যেতেই যে যার থালা নিয়ে বসে গেল। দুজনে পরিবেশন করল। ওরা পরে খাবে। বংশীকে অনেক ডাকাডাকি করা হল। কিন্তু বংশী উঠল না। সেই যে এসে শুয়েছে বংশী, আর একবারও ওঠেনি। সকলেরই পেট জ্বলছে। কে আর এখন অতো খোশামোদ করতে যায়। যে যার থালা টেনে নিয়ে বসে পড়ল। ভার ভার মুখে সকলে খেয়ে যেতে লাগল।

বলরাম আর কেউ পাশাপাশি খেতে বসেছিল। খেতে খেতে বলরাম সকলকে শুনিয়ে বলল—“বোংশের ব্যাপারটা তোমরা কিছু ঠিক করলে।”

প্রথমে কেউ কোনো কথা বললো না। উশ্খুশ্ করতে লাগল। ওপাশ থেকে মাধাই বলে উঠল—“চুপচাপ থাকলি তো হবে না। পষ্ট কথা কওয়াই ভালো। তা, আমার তো মনে কয় বোংশে-দার বাড়ী চলে যাওয়াই ঠিক হবে।”

মাধাইয়ের বয়সী অনেকেই মাধাইয়ের কথায় সাঁম দিল। বলরাম এবার অল্প সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—“তোমাগেরও কি সেই মত নাকি?”

এবার কথা বলল নিবারণ। নিবারণের বয়সটা একটু বেশী। ঠাণ্ডা মাথার মানুষ বলে সকলে কাজে-গরজে ডাকে। পরামর্শ নেয়। নিবারণ বলল—“বোংশেরে নিয়ে সগোলেরই

এটা ভাবনা হইছে। কিন্তুক ভাবনাটার কোনো মিটমাটই হইছে না। সগোলে মিলে কাজ করতি আইছি। কারো বাদ দিতি তো মন চায়না। কিন্তুক বোংশেরে নিয়ে তো বড়ো মুশকিল হলো। এহেবারে নরম মানুষ—”

নিবারণ কথাটা শেষ করল না। কিন্তু বোঝা গেল, ঘুরিয়ে নিবারণও ঐ একই কথা বলতে চাইছে।

আর কেউ কিছু বলে কি না দেখল বলরাম। তারপর জোরালো গলায় বলল—“তোমরা যে যাই কওনা ক্যানো, বোংশেরে বাদ দেয়া যাবে না। কারোরেরই বাদ দেয়া যাবে না। বি-জ্ঞান-বিভূই আইছি। যা করবো, সগোলে একজোটে হইয়ে করবো।”

মাধাই ফস্ করে বলে উঠল—“বোংশেরার ঝুড়িটা তুমি তা’লি ব’য়ে দিও বলা-না।”

মাধাইয়ের কথা শুনে অনেকে হেসে ফেলল।

কেষ্ট ধমক দিয়ে উঠল—“তুই চুপ করুনা মাধাই। তোরে ফোড়ন কাটতি কচ্ছে কেভা?”

কেষ্টর ধমক খেয়ে যারা হাসছিল তারা চুপ করল। কেষ্ট এবার সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—“বলরাম যা কইছে, আমারও সেই কথা। একসাথে আইছি সগোলে। কারো বাদ দেয়া যাবে না।”

নিবারণ বলল—“বোঝলাম তোমাগের কথা। কিন্তুক বোংশে যদি না পা’রে ওঠে, তো করবানে কি?”

বলরাম বলল—“সগোলের যদি মত হয় তো আমি এটা কথা ক’তি পারি।”

তু-একজনের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। উঠি-উঠি করছিল। কিন্তু বলরামের কথা শুনে সকলে চুপ করে বলল।

বলরাম গলায় জোর দিয়ে বলল—“কথাটা আমি তোমাগের সগোলেরেই কছি। থির হইয়ে এটু বিবেচনা করো কথাটা। কছি কি—কাজকাম করে আসে সগোলেরই বড়ো ছেরোম হয়। তারপরে কারো আর রান্না-বান্নার হাত

দিতি ইচ্ছে হয় না। আর এ-তো একদিনের কাজ না যে কোনোমতে দায় পা’রে দিলাম। এ হলো গিয়ে রোজকের কাজ। তাই আমি কচ্ছিলাম, বোংশেরে কাজে না নিয়ে ঘরে খুয়ে যাব। ও হাটবাজার করবে আর রান্না টান্নার কাজগুলো সারে রাখবে। তালি হবিধে হবে। সগোলে ছুডো রান্না-ভাত খাওয়া যাবে। আর আমরা সগোলে কিছুকিছু দিয়ে বোংশের ভাগের পয়সা মিটেয়ে দেবো। কি কও তোমরা সগোলে এ কথার?”

কেষ্ট উঠে দাঁড়িয়ে বলল—“খুব ভালো কথা কইছে বলরাম। এর চাইতে অযুক্তি আর কিছু হতি পারে না।”

প্রায় সকলেই মেনে নিল এ কথা। তু একজনের একটু আপত্তি ছিল হয়ত। কিন্তু বলরাম আর কেষ্টকে একজোটে কথা বলতে দেখে সকলেই চুপ করে গেল। ঐ কথাই ঠিক হল। কাল থেকে বংশী আর খাদে কাজ করতে যাবে না। রান্নাবান্নার দিকটা সামলাবে।

খাওয়া শেষ হতেই সমতল মাটির উপরে যে যেখানে পারল পাট-পাট হয়ে শুয়ে পড়ল। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর নেতিয়ে পড়েছে। শুতেই চোখ জড়িয়ে এলো ঘুমে। বলরামও কাঁধটা পেতে এক পাশে শুয়ে ছিল। খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এলো না চোখে। উপরের দিকে তাকালেই অন্ধকার আকাশটা দেখা যাচ্ছে। রাশি-রাশি তারার ফুল ছড়ানো সারা আকাশ জুড়ে। কোথায় যেন একটা কুকুর ডাকছে খেউ-খেউ করে। সারাদিন এভোলোকের হৈ-চৈ কথাবার্তা কাজকর্ম চলেছে জায়গাটার। এখন সব চুপচাপ। স্থির। বাড়ীর কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল অবাঙ্গী আর নারায়ণের কথা। কালও এসময় বাড়ীতে ছিল বলরাম। এখন ভাবতে যেন কেমন লাগছে। মনে হচ্ছে, কতোদিন যেন ওদের দেখেনা। আর কবে বাড়ী বাওয়া হবে, কে জানে। নিশ্চয়ই কটা দিন অবাঙ্গী চালিয়ে নিতে পারবে। ঘরে ধান যা আছে, তাতে

এখনো কুড়িয়ে বাড়িয়ে দিন পনেরো কুড়ি চলে যেতে পারে। নানাকথা এলোমেলো খানিকক্ষণ ভাবল বলরাম। তারপর কখন চোখ দুটো একটুখানি ঘূমে বুজে এসেছিল। হঠাৎ হাতে একটু নাড়া লাগতেই বলরামের ঘুমটা ভেঙে গেল। অচেনা জায়গা। সাবধানে থাকতে হয়। ধড়মড় করে উঠে বসে বলল—“কেডা?”

“আমিরে! আমি বোংশে—”

বংশী আন্তে আন্তে বলল বলরামের পাশে।

বলরাম নিশ্চিন্ত গলায় বলল—“ওঃ, বোংশে! আমি ভাবলাম কেডা না কেডা। তা এ্যাতো রাস্তিরি ঘুরে ব্যাকছি—বোম পড়িস্নি? ভাতও তো খাশিনে।”

বংশীর গলাটা বড়ো ক্লান্ত শোনাল। বলল—“বোম আস্তিছে না মোটে। ভাবলাম, তোর কাছে একবার ঘুরে যাই। মনডায় যদি এটু ভালো নাগে।”

বলরাম সাহস দিয়ে বলল—“মন অতো দুকল হলি চলবে ক্যান? বি-ভাশে আইহিস। মন শক্ত রাইহে কাজ করতি হবে। তা, কাল তোর আর খাদে বাতি হবে না। রাক্ষার কাজ থাকলো তোর পরে। মত করাইছি সগোলের।”

বংশী আন্তে আন্তে বলল—“আমি শুনিছি সব। তুই আমারে ঝাঁচাইছিল ভাই! তোরা সগোলে মিলে আমারে বাদ দিলি কি আর কস্তাম আমি। চলিই যাতাম। কিন্তুক বাড়ী আমি আর যাতাম না। বাড়ী গেলিও তো না খাইয়ে মরতি হ’তো। তার চাইতে পথে-বাটে কোনো জাগার ম’রে প’ড়ে থাকতাম।”

বলরাম ধমক দিল—“চুপ কর বোংশে, চুপ কর। ওসব ওসব অহুকুনে কথাগুলো কোসুনে। সগোলে একসাথে আইছি। তোরে বাদ দেবো ক্যান?”

বলতে বলতে বলরামের গলাটা কেঁপে উঠল। তারপর কথাটা পাল্টানোর জঙ্কই যেন বলল—“বাড়ী খুঁয়ে আইছিল

নাকি কারো? গোনেশের মা এ্যা’লা পারবেনে থাকতি?”

ঘাড়ের ব্যথা জায়গাটায় হাত বুলাতে বুলাতে বংশী বলল—“গোনেশের দিদিমা আইছে। আমি না-যাওয়া পজ্জন্ত থাকবে এ-কয়ডা দিন। আর জেঠিরা-ও তো আইছে ও-পাশে। পারবে থাকতি। ধান যা আইছে, তাতে মনে কয় আরো কয়দিন চলতি পারে। গোণেশের দিদিমা ক’রে দেছে—বেশী আটকে গেলি ধার কজ্জা করে চালায়ে নেবে। আমি বাড়ী যাইয়ে শোধ দেবো।”

একটু চুপ করে থেকে বলরাম বলল—“তো যা, এবার শুয়ে পড়গে। মেলা রাত হয়ে গেছে। কাল আবার কাজকন্মো আইছে।”

বংশী কোনো কথা বলল না। উঠলও না। মাথার হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকল।

একটুখানি কি ভাবল বলরাম। তারপর উঠে দাঁড়াল। গায়ের ডলার পাতা দোঁড়াল করা কাঁথাখানা ভাঁজ খুলে বড়ো ক’রে পাতল। তারপর বংশীর দিকে তাকিয়ে বলল—“আম, তোর আর বাতি হবে না। আমার কাছেই শুয়ে থাক।”

বংশী উঠে এসে বলরামের পাশে গুটিহুটি হ’য়ে শুয়ে পড়ল।

কাঁঠখালির বিলের বিকল্প ভাগ্য-দেবতা এখন কোথায় কতোঘুরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে। আর এখানে খোলা আকাশের নীচে অসহায় মানুষগুলো দলা পাকিয়ে পড়ে রইল। কারো হু’চোখ ভ’রে ঘুম এসেছে। কারো বা ঘুম আসেনি। তারা-জ্বলা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে বাড়ীর কথা ভাবছে। আর কেউবা ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে গিয়ে গায়ের ব্যথায় কাতরে উঠছে।

কথাটা সকলে যেন একরকম ভুলেই গিয়েছিল। সেদিন খাম থেকে ফিরে এসে হঠাৎ-ই মনে পড়ে গেল। কাল মাসের শেষ। চৈত্র-সংক্রান্তি। কথাটা মনে পড়তেই সকলের মনটা উদাস হয়ে গেল। আজ বাড়ী থাকলে কি

আমোদেই না কাটত দিনটা। সারা গ্রামটা পূজোর আনন্দে ভরে উঠতো। কতোবড়ো কৃতির দিনটা আজকে।

খাওয়া-দাওয়ার পর আজ আর কেউ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল না। এক জায়গায় বসল সবাই গোল হয়ে। অষ্টকের গান ধরল। প্রথমে এক পদ বংশী গেয়ে যায়। তারপর আর সকলে হর টানে। রামের বনবাস পালা। দেখতে দেখতে জমে উঠল। বংশীর সুরেলা গলাটা ফাঁকা মাঠের মাঝখানে যেন আরো কেঁদে উঠল। তন্ময় হয়ে বংশী গেয়ে চলল। ওর শীর্ণ মুখখানায় যেন এখন অকুণ্ণ একটা আলো খেলা করছে। আশ-পাশের মাটিকাটার দল থেকেও অনেকে এলো গান শুনতে। সকলে বংশীর গানের তারিফ করল। অনেকেই চোখের পাতা ছুঁতে ভিজে এলো— গান শুনতে শুনতে মাহুগুলোর বৃকের মধ্যে পুত্র-হারা মা-কৌশল্যার বেদনা যেন গুয়ে উঠল। ফেলে-আসা কাঠুখালির বিলটা যেন ছয়ছাড়া অযোধ্যার মতন ওদের ‘ফিরে আয়, ফিরে আয়’ বলে ডাকতে লাগল।

বড়ো রাত্বে থেকে খানিকটে এগিয়ে গেলে গ্রামের শুরু। এখানে সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। এখানে চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলাও হয়। পরের দিন কাজ থেকে ফিরে বলরামেরা দল বেঁধে মেলা দেখতে গেল। এক হুটার মজুরী পেয়েছে। হাতে কিছু পয়সাকড়ি আছে। খুব বেশী লখ হলে এক-আধটা জিনিষও কেনা যাবে।

মেলার মধ্যে সকলে ঘুরে ঘুরে দেখল। হরেক-রকমের জিনিষপত্র এসেছে। ওদের হাতিনাড়ার মেলার চেয়ে এ-মেলাটা অনেক বড়ো। দোকান-পাটও অনেক বেশী। ঘুরতে ঘুরতে বলরাম হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। পুতুল বিক্রি হচ্ছে। কতো রকমের জীবজন্তু আর মাহুগের পুতুল।

দোকানটার কাছে এগিয়ে গেল বলরাম। পুতুলগুলোর মাঝখানে বড়ো একটা ঘোড়া চোখে পড়ল। কি কুচকুচে কালো রং ঘোড়াটার। বেশ পছন্দ হয়ে গেল বলরামের। দামটা একটু বেশীই পড়ল। তবু কিনে নিল বলরাম। ঘোড়াটা পেলো নারায়ণ খুব খুশী হবে।—নারায়ণের সেই খুশী-খুশী মুখখানার কথা ভেবে ভারী ভালো লাগল বলরামের।

দোকান থেকে বেরিয়ে একটু এগোতেই বংশীকে চোখে পড়ল। বংশীও বলরামকে দেখে এগিয়ে এলো। বলরাম বলল—“কিছু কিনলি নাকি?”

মুখখানা রাঙা করে একটু হাসল বংশী। তারপর বলল—“হয়রে। কেনলাম এটা জিনিষ।”

বলরাম সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল—“কই, দেখি না তো হাতে তোর কিছু। কিনলিডা কি?”

বংশী কাপড়ের খুঁট থেকে একটা কাগজের পুটলি বের করল। পুটলিটা লম্বা খুলে বলল—“এই ভাখ। বউভার জন্মি ছুডো কাঁচের চুড়ি কেনলাম রে। কমল কায়দার ফুল কাটা দেহিছিস্! গোনেশের মা পরলি যা মানাবে না!” —খুশীতে বংশীর চোখ ছুঁতে চক্চক করে উঠল।

তারপর চুড়ি ছুঁতে কাপড়ের খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে বলল—“কিনতি তো কতো কি ইচ্ছে করে রে! গোনেশের মার ভারী লখ এটা পাখর বাটির। কিন্তুক যা দাম। হোয়া যায় না।”

একটু থেমে আবার বলল—“তো চল, আদ্বার হ’য়ে আসতিছে। ফিরে যাই।”

হাঁটতে হাঁটতে বলরাম বলল—“চল।”

পুস্তক পরিচয়

যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়। কালীপদ বিশ্বাস। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। কলিকাতা: ১২৪ দাম পনেরো টাকা।

বাংলা দেশের রাজনীতির একটা রূপ ছিল বৈপ্লবিক—এই গ্রন্থে সে রূপের প্রতিবিম্বন নেই। ১৯০৫ সালে একবার এবং দেশবন্ধুর অধিনায়কত্বে দ্বিতীয়বার বাংলা দেশে ব্যাপক বামপন্থী গণ-আন্দোলন শুরু হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিক পর্যন্ত সেই আন্দোলনের ধারা অব্যাহত ছিল, ১৯৪৬ সালে সেই ধারাটি দ্বার আকার ধারণ করার সম্ভাবনা ঘারে উপনীত হয়েছিল;—এই গ্রন্থে সেই গণআন্দোলনের বেগবান ধারাটির পরিচয়ও বিদ্যুত হয়নি। এই দুটি ধারা বাদ দিলে প্রাক-স্বাধীনতা যুগের বাংলা দেশের রাজনীতির আর যে দিকগুলি অবশিষ্ট থাকে তা হল আইনসভার ভিতরে ও আইনসভাকেন্দ্রিক রাজনীতি, ইংরেজের অনুগ্রহপ্রার্থীদের রাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। বস্তুতঃ বঙ্গভঙ্গের তথা ভারতবিভাগের মূলে এই দ্বিবিধ রাজনীতিই ইন্ধন যুগিয়েছে। লেখক তাঁর সমস্ত মনোযোগ বঙ্গীয় রাজনীতির এই তিনটি কুটিল ধারা ও তাদের ষড়-প্রতিষাতে সৃষ্ট স্বর্ণাবর্তের ওপর নিবদ্ধ করেছেন। ফলে বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় সাধনার যে পরিচয় আমরা এই গ্রন্থে পাই তা একটা সামগ্রিক পরিচয় নয়, এমনকি অস্বচ্ছ, বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত পরিচয়ও নয়;—বাঙালীর রাজনীতিচর্চার যে অংশটি ইংরেজের অজুলিহেলনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়েছিল সেই অংশটিরই বর্ণনা এই গ্রন্থে উপলব্ধ্য।

লেখক স্বর্গত ফজলুল হককে তাঁর উপাখ্যানের কেন্দ্র

চরিত্র রূপে নির্বাচিত করেছেন এবং অপরিণীত দরদের সঙ্গে তাঁর জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন। ফজলুল হকের জীবন, চরিত্র ও কার্যকলাপের প্রশংসনীয় ও নিম্ননীয় উভয় দিকের উপরই লেখক আলোকপাত করেছেন, তাঁর আলোচনা ও বিশ্লেষণকে পক্ষপাতহীন তাই কদাচিত্ মনে হয়। ফজলুল হকের কাহিনী এ-গ্রন্থের বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী ও নাটকীয় দৃশ্যের মধ্যে সংযোগস্থল রক্ষা করেছে,—অর্থাৎ লেখক ফজলুল হকের ভূমিকাকে ব্যবহার করেছেন মুখ্যত বাংলা দেশের বিশ বছরের রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্বের একটা ইতিহাস ফুটিয়ে তোলার সাহায্যক হিসাবে। গ্রন্থটি স্থলিখিত ও স্থলিত; কিন্তু প্রাণাণ্য ইতিহাস-গ্রন্থের মর্যাদা হতে লেখক নিজেই তাঁর রচনাটিকে বঞ্চিত করেছেন ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা দূর করে,—অর্থাৎ গোটা বইটি স্মৃতিকথা ও প্রসঙ্গ-কথার আকারে লেখা; মুখ্য ও গৌণ ঘটনাক্রমকে সমান আলোচনার বিষয় হতে দিয়ে ঘটনাক্রমের সন্নিবেশ যথেষ্টক্রমে ঘটিয়ে এবং একটা সামগ্রিক বস্তুব্য ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির অভাব রোধে লেখক এই বইটির বৃহৎ সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করেছেন।

অথচ বর্ণিতব্য বিষয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, বর্ণনার সরল কিন্তু সংযত ভঙ্গী, বিচার করার নিপুণতা—এসবই লেখকের করায়ত্ত ছিল। তবু এ-বইয়ের ইতিমত্তঃ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন রচনাভঙ্গী কেন তা বোঝা দুষ্কর।

বইটির সবচেয়ে প্রশংসার দিক এই যে এমন বহু ঘটনায় কথা এখানে আছে যা আর কোথাও আমরা পাইনা। বাংলা দেশের একটা যুগের রাজনীতিচর্চার বিশেষ একটা দিকের কথা পরিবেশন করে লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। লেখকের দৃষ্ট অঙ্কনের ক্ষমতা অসাধারণ—তার

কলে সেই লুপ্ত দিনগুলির বহু জীবন্ত দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ আমাদের ঘটে। যেমন একটি দৃশ্য,—

“কলকাতা ইউনিভারসিটির গ্র্যাণ্ট নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা। ইউনিভারসিটির তরফ থেকে প্রথম বলতেন অধ্যক্ষ ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি। ডাঃ মুখার্জিরও এটা ছিল বাৎসরিক কাজ। ভদ্র বাঙালী, ভদ্রতার ক্ষা করেই বক্তৃতা করতেন অনেকটা অনাসক্ত ভাবে। তাঁর বক্তৃতান্তেই উঠতেন শ্রীমা প্রসাদ। হাউসে তখন শোরগোল পড়ে যেত। উভয় পক্ষের সদস্যরা ভীড় করে বলতেন তাঁর বক্তৃতা শুনতে।

সামনে প্রায় মুখোমুখি অবস্থায় ফজলুল হক গালে হাত রেখে শুনে চলেছেন একদিন সে বক্তৃতা। হঠাৎ উদ্বেজনা-ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন—তাহলে গ্র্যাণ্ট দেবনা।

হাতে ধরা ক্রিপে আটা কাগজগুলো টেবিলের উপর ছুঁড়ে শ্রীমা প্রসাদ দীর্ঘমাত্রা দিয়ে উত্তর করলেন—তবে তাই হোক। কখনো আপনার দ্বিতী-মা পাটের ছালা পরে, ভিক্ষুক বেশে এখানে উপস্থিত হবে না।

হাউসে বিদ্যুৎ সঞ্চারণ হয়ে গেল। দমকা হাওয়ার ঝাপটায় সরকারী ও বিরোধী পক্ষ নিশ্চল ও নীরব।

ফজলুল কিন্তু অবিচলিত। স্বগতোক্তি করলেন—বাঘের বাচ্চা বাঘ।

সে উক্তি শোনবার পর বিধানসভা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।” (পৃঃ ৪৬)

দেশবিভাগের জন্ত ইংরেজ সরকার ও এদেশীয় ইংরেজরা কত বিস্তৃত ভাবে ষড়যন্ত্র করেছিল এ গ্রন্থে সে সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, লেখক লিখেছেন যে পাকিস্তান ধ্বনি বাংলা দেশে প্রথম তোলা হয় হাওড়ার মাঠের এক জনসভায়। স্টেটসম্যান পত্রিকায় সে সভার সামান্য বিবরণ বেরিয়েছিল—কেননা মূল ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তখনো স্টেটসম্যান কতৃপক্ষ পরিচিত হয়নি। কিন্তু অবিলম্বে

উচ্চমহল থেকে যখন তাদের তা জানিয়ে দেওয়া হল তখন দুদিন পরই ঐ একই জনসভার বিবরণ বৃহত্তর আকারে আবার প্রকাশিত হল। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে একথাও জানানো হল যে এখন থেকে “পাকিস্তান” শব্দটি মাঠে-বাটে শোনা যাবে। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে যেদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে তার একমাস আগে ইয়োরোপিয়ান এসোসিয়েশন চটকলের সাহেবদের মধ্যে একটি গোপন সাক্ষাৎ প্রচার করে। তাতে সাহেবদের সতর্ক করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধলে তারা কি করবে এবং কি করে অল্প ব্যবহারই বা করবে। অমৃতবাজার পত্রিকায় এই গোপন সাক্ষাৎটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ইয়োরোপিয়ান এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করে সে সাক্ষাৎয়ের পশ্চাতে যে কোনই তাৎপর্য নেই সেই কথাই জানিয়েছিলেন। কিন্তু একমাস পরে যখন দাঙ্গা বাধল তখন বোঝা গেল এই দাঙ্গার প্রাকপ্রস্তুতি কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

চিন্তারঞ্জন দাস, হরেন্দ্রনাথ বানার্জীর যুগ থেকে দেশ-বিভাগের সময় পর্যন্ত বাংলা ও ভারতের রাজনীতিতে বীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন ছোট বড় তেমন বহু নেতার আলোচ্য এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, ফজলুল হকের চরিত্রের ওপরই লেখকের আলোকসম্পাত বেশিমানায় ঘটেছে। লেখক ফজলুল হকের চরিত্রের একটা মূল্যায়নও করেছেন। তিনি বলেছেন ফজলুল হক ছিলেন বহু আপাত-বিরোধিতার সমন্বয়ে গড়া মানুষ। কিন্তু তাঁর চরিত্রে এইসব আপাত-বিরোধী লক্ষণের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর সমাজ ও যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। তিনি শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে উন্নত হিন্দু বাঙালী সমাজের দিকে তাকিয়ে সারাজীবন ভেবেছেন বাংলার দরিদ্র অশিক্ষিত ও অসংস্কৃত মুসলমান সমাজকে কেমন করে উন্নত করে তোলা যায়। সেই চেষ্টাই ছিল তাঁর জীবনের সকল কর্মপ্রয়াসের

মূল কথা। কিন্তু তাঁর এই কাজে তিনি বাধা পেয়েছিলেন হিন্দু বা ইংরেজদের কাছ থেকে নয়, মুসলমান সমাজেরই একাংশের নিকট হতে—তার নাজেমুদ্দীন প্রভৃতি যে অংশের নেতৃত্ব করতেন। উদারস্বয়ং, একান্তভাবে বাঙালী ফজলুল হক ঘটনার টানাপোড়েনে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব করেছেন, আবার মুসলিম লীগ হতে বহিষ্কৃতও হয়েছেন। লাহোরে পাকিস্তান-প্রস্তাবের তিনিই ছিলেন উত্থাপক, আবার দেশবিভাগকেও প্রসঙ্গ চিন্তে তিনি মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু দেশবিভাগ ও উজ্জ্বলিত দুঃখদর্শনা সৃষ্টির ইতিহাসে

ফজলুল হকের অবদান রয়েছে—লেখক লেখাও বলেছেন। আমাদের আপশোস এই যে, লেখক যদি এলোপাখাড়ি ঘটনার সমাবেশ ও বর্ণনার বইখানি পূর্ণ না করে শুধু ফজলুল হকেরই একখানা প্রামাণ্য জীবনী লিখতেন তবে তা অনেক মূল্যবান ও উপভোগ্য হত। প্রকৃতপক্ষে ফজলুল হকের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী এখন প্রকাশিত হওয়া দরকার।

পবিত্রকুমার ঘোষ

[সমকালীন ভারতীয় সাহিত্য ৬৯৭ পৃষ্ঠার পর]

পড়েছে তার মধ্যে ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের আলোচনাটিই প্রধান সূত্র। সেখানে তরু দত্ত অরু দত্ত সাহিত্যে আলোচিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের বশবী পূর্ব স্মিরামামবাগান দত্ত পরিবারের গোবিন্দচন্দ্র, হরচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র বা শশিচন্দ্র-বাঁদের ইংরেজি সাহিত্যচর্চা শুধু স্বদেশীয় খ্যাতিতেই সমাপ্ত ছিল না, তাঁদের নাম নেই। অধুনাকালীন খ্যাতনামা ইংরেজি সাহিত্য গবেষক জে. সি. ঘোষ এর নামও আমাদের প্রত্যাশা ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা পড়ে মনে হলো অধুনা কালে বাঙলাদেশে সংস্কৃতের কোনো স্বজনশীল চর্চা নেই।

কিন্তু এই উল্লেখ-অনুলেখ দিয়ে এই প্রবন্ধগুলি কিছুতেই বিচার্য নয়। সমকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব সাহিত্য চিন্তা ও রচনা-চর্চা চলেছে, এই প্রবন্ধগুলি তার একটা রূপরেখা মাত্র একে দিতে শর্তবদ্ধ। যাতে ভারতের এক প্রান্ত অথবা প্রান্ত সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে অবহিত থাকে, যাতে ভারতীয় বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে বহুধা-বিচিত্র ভারতবর্ষের মোটামুটি সামগ্রিক একটা সাহিত্য পরিচয় নিয়ে রাখা যায়। এই বইতে তা যে বহুল পরিমাণেই সাধিত হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সূচীপত্র

জয়ন্তী : ফাল্গুন : ১৩৭৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৭২৩
জ্ঞানদায়ী ডেমোক্রাসী :		
ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির		
নতুন কৌশল (প্রবন্ধ)	হুসীল দাস	৭২৪
ইয়োরোপে নেতাজী স্মৃতিচিহ্ন		
(প্রবাসের চিত্র)	অশোক নাথ বসু	৭৩৫
পরামনোবিজ্ঞান ও		
ইন্দ্রিয়াজীত অসুভাব (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মোহিতকুমার রায়	৭৪৩
মুক্তি কোন্ পথে (প্রবন্ধ)	শশধর সিংহ	৭৪৭
ফুলের স্বপ্ন (কবিতা)	কিরণশঙ্কর সেন	৭৫৫
কবিতা শুদ্ধ (কবিতা)	মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৭৫৬
প্রভু নয় বন্ধু		
বা		
পাকিস্তানের রাজনীতি		
(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	অশোককুমার মজুমদার	৭৫৯
কণ্ঠ ভরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্যাস)		
	মিহির মুখোপাধ্যায়	৭৬৩
জল, মাটি, মন (ধারাবাহিক উপন্যাস)		
	মহীতোষ বিশ্বাস	৭৭১
পুস্তক পরিচয়		৭৭৭

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ৯.৫০। ষাণ্মাসিক ৪.৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

- শক্তিশালী নতুন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।
- লেখা পরীক্ষার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।
- উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।
- শক্তিশালী নতুন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ-যোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

৩০৯, গাদুলি বাগান

কলিকাতা-৪৭



মন আজ
খুসিতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জন্মের জন্ত
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্ত।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্ত সাধনার
অব্যর্থ মহোষধ প্রতিদিন আহারের পর
দুইবার করে চু'চামচ মুক্তসঞ্জীবনীর সঙ্গে
চার চামচ মহাজোজ্জ্বলিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে,
ধিমে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

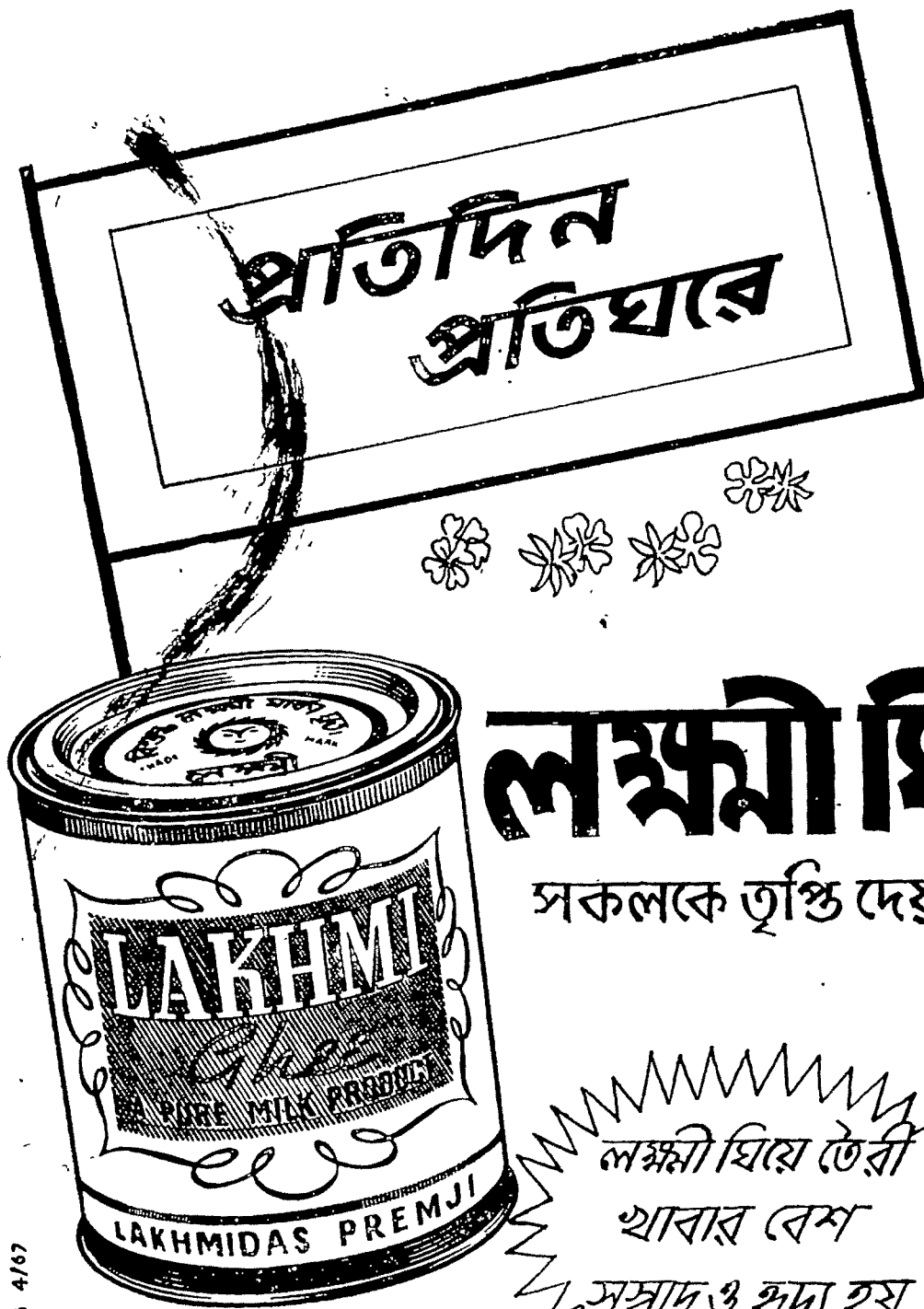


অথবা ডাঃ বোসেল চেন্নি বোম্ব, এম-এ,
আইরকেনশাপ্পী, এম, সি, এস, (লন্ডন),
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের কৃতপূর্ব
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন্দ্র চেন্নি বোম্ব,
এম-বি, বি-এস, আইরকেনশাপ্পী।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

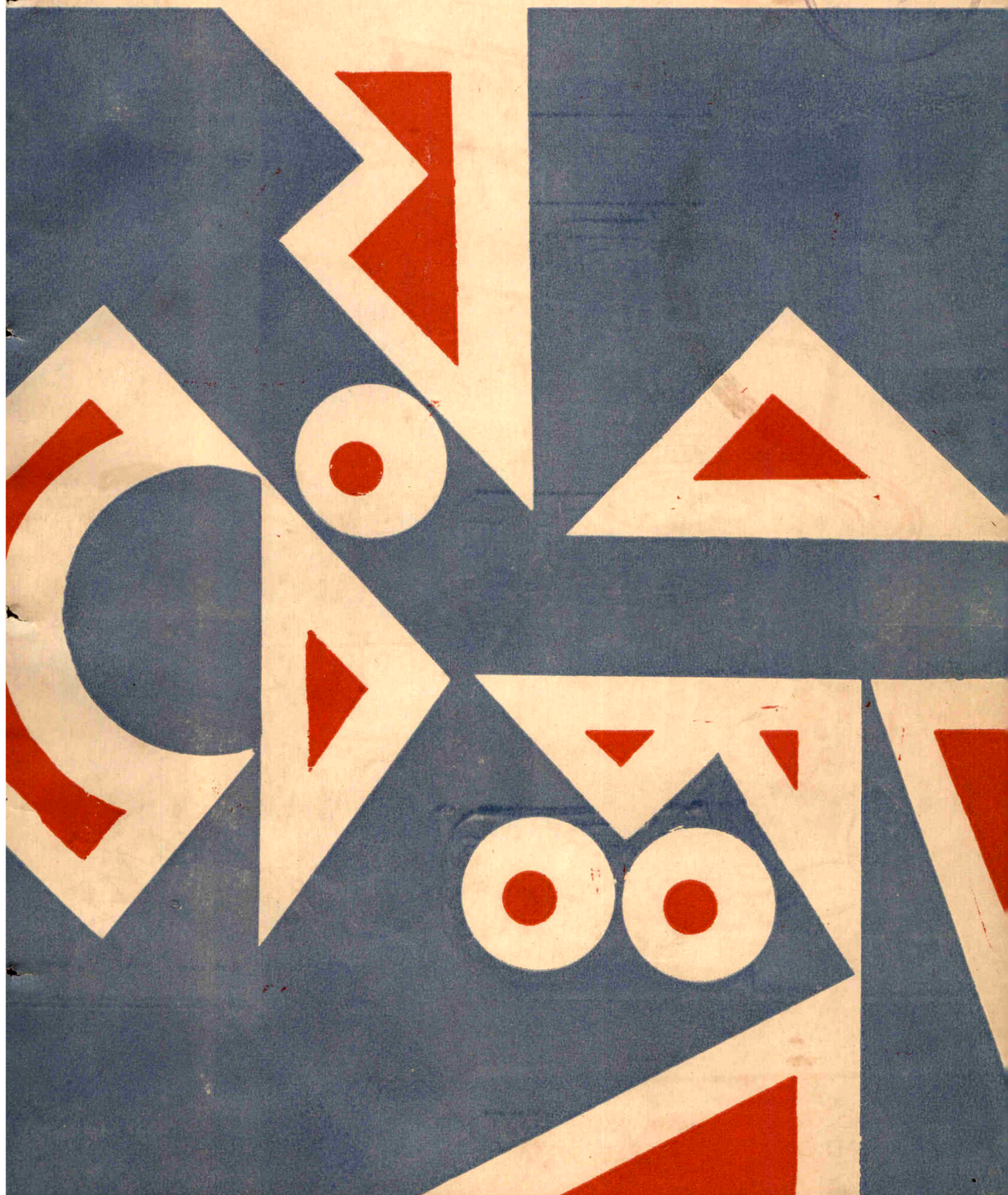
8 MAR 1968



ଜାତୀୟ

୨୦୧୫

ମହାଦଳ୍ଲି ;
ଲୀଳା ଦାସ





সুপার সিপিডি ৫-৯৫

সেন্টার কোর্ট ১০-৯৫

Bata

গতিশক্তি সঞ্চালক

দ্রুত পদক্ষেপ আর অনুপম আবাস—এই
অভিপ্রায়ে বাটার খেলাব জুতোব বৈশিষ্ট্যগুলি
দেখুন। কুশল আর্চ আর ইনসোল আর্কাইসমক
আঘাত থেকে রক্ষা করে। ঘনবুনোট
ক্যান্সিসেব আপাব—অবশ্যীল সন্ধিক্ষণে
টেকসই বশ্যন। ভারী বামপাব
টোম্বার্ড। আপাব আর জুতোব তালিষ
অভেলা বশন। ঢালাই সোল আর
হিল এমন কৌশলে ভৈবিষা
পাবতপক্ষে হডকাবে না। সব
মিলিবে, আশ্চর্য সমর্থ সমাবেশ।

হকি ৮-৯৫

কিছুকাল অমরতা শিক্ষা নেব বলে : গৌরাম্ভৌমিক

আরও এক বৃক্ষ আছে, ওইখানে চন্দনের

দেহের অ্বাসে

আলোর পাখিরা আসে, বাসা বাঁধে

তার স্নিগ্ধ-গূঢ়তর ডালে। একাকী নির্জন হলে

আমি সেই পাখিদের চোখে চোখ রাখি।

কেননা, পাতার শব্দে তারা নাকি শুনে গেছে

ভাপ্পিরখী নদীর সঙ্গীত। শিকড়ে পৌঁছার আগে

আমি আজ সে সংবাদ জেনে নিতে চাই।

ইচ্ছে হয়, মাঝ পথে, শহরের কোলাহল ছুঁড়ে ফেলে দিই।

ইচ্ছে হয়, আমি সেই বৃক্ষের সখীপে চলে যাই।

আর সেই—

চন্দনের গন্ধ দিয়ে শহরের সারা অঙ্গ ঢাকি।

কিংবা সেই বৃক্ষটাকে রোদ্দুরের দিকে তুলে ধরি,

অথবা সময় দিয়ে

ডেকে ডেকে

শহরের ঘুম কেড়ে নিই।

.. কেননা, আমার ইচ্ছে আমারই রক্তের পুণ্যে কেনা।

কোনু সে আদিমকালে আমি সেই বৃক্ষটাকে নির্মাণ করেছি।

আত্মজ রক্তের ভ্রাপ তার দেহে যন্ত্রের মতন—

রাজকীয় অভিষেকে আমি তার সঙ্গীত শুনেছি।

যদিও এখন ওড়ে চতুর্দিকে আশানের ছাই। এ শহরে

আজ রাতে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

আমি সেই সর্বনাশ চোখ থেকে তীব্র ছুঁড়ে ফেলি :

চন্দনবৃক্ষের কাছে কিছুকাল অমরতা শিক্ষা নেব বলে।

দীপ্তি

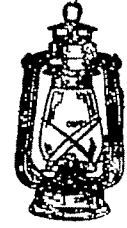
আপনার
নিত্য
প্রয়োজনে

দীপ্তি লম্বন—এর পরিচয় নিম্নরোজন,
এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে
আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর
কম কেরোসিন খরচ।

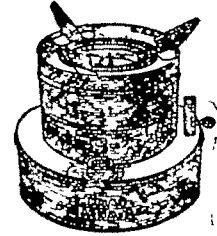
ধাস জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য
প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিস।
এই কেরোসিন চৌক ব্যবহারে কোন
ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে
সুন্দর, খরচে লাভান্বিত। অল্প সময়ে যে
কোন রান্না করা যায়।

‘দীপ্তি’ মার্কা এনামেলের বাসন—
অল্প বিনিয়োগে মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর
গুণের দ্বারা সমাপ্ত হচ্ছে।

বি ওরিয়েন্টাল মেটাল
ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
৩১ ও ১১ বিপিন বিহারী গান্ধী স্ট্রিট,
কলিকাতা-১২



দীপ্তি লম্বন



ধাস জনতা



এনামেলের বাসন

ইনি কুদের একজন শিক্ষক। দেশ ও জাতির প্রতি অনলস সেবার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি একটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কার বা এই সম্মানই অবশ্য তাঁর আনন্দের উৎস নয়। তিনি বলেন, “অম্মার সম্মানরা তাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে আর সেই জগ্গাই আমি স্মৃখী। আমার দুটি মেয়ে। একটি মেয়ে কলেজের লেকচারার হয়েছে অন্যটি ডাক্তারি পড়ছে। ছেলেমেয়ে কম হওয়াই



ভালো কারণ ভাঙে ছেলেমেয়েদের যেমন উপযুক্তভাবে মানুষ করা যায় তেমনি নিজেদেরও দুর্ভাবনা কম থাকে। আমি সেজন্যই স্মৃখী।”

ইনি স্মৃখী।

আপনি ?



জয়ন্তী

৩২ বর্ষ • একাদশ সংখ্যা • ফাল্গুন ১৩৭৪

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীযুক্ত লীলা রায় বাহাদুর দিন যাবৎ পি. জি. হাসপাতালে। ডেইশ দিন সংজ্ঞাহীন থাকার পর গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। স্মৃতিও অনেকটা ফিরে এসেছে, যদিও সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু বাকশক্তি তিনি আদৌ ফিরে পান নি আজ পর্যন্ত। ডান হাত পা'র অবশ অবস্থারও বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তাঁর স্বাস্থ্যের এই ধীর-উন্নতি তাঁকে বাকশক্তি ফিরিয়ে দিক এবং তার অবশ অঙ্গগুলিকে পুনরায় সচল করে তুলুক, বিধাতার কাছে নিরন্তর আমরা এই প্রার্থনা জানাচ্ছি। তাঁর অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী, অনুরাগী ও অনুসারীদের গভীর উদ্বেগ লক্ষ্য করে তাঁর স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা জানাচ্ছি।

২৭শে মার্চ, ১৯৬৮

পরিচালকমণ্ডলী

জয়ন্তী

কেন্দ্রীয় বাজেট

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট এবার ব্যবসায়ী-শিল্পপতি মহলে 'বুদ্ধিমানের বাজেট' রূপে অভিনন্দিত হয়েছে। অর্থমন্ত্রীও আগামী বার্ষিক বছর সম্বন্ধে আশাবাদী। নূতন বছরে মন্দা দূর হয়ে বৈষম্যিক উন্নতির গতিবেগ বৃদ্ধি পাবে বলে তার ধারণা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থমন্ত্রীর উল্লাসের কারণ এবং তার ধারণা বর্ধিত কৃষি-উৎপাদন মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণে এবং ক্লাসে সহায়ক হবে। কিন্তু বাজেটে যে ঘাটতি রয়ে গেছে,

তা থেকে এই আশা সম্পর্কে স্বভাবতই সংশয় দেখা দেবে। চলতি বছরে ৩০০ কোটি টাকা বাজেটের ঘাটতি দেখা দেবে বলে অনুমিত হয়েছে এবং এই ঘাটতি পূরণের কোনো উদ্যোগও নাই। আগামী বছরের অনুমিত বাজেটে ৩১৫ কোটি টাকার ঘাটতি রয়ে গেছে। তার মধ্যে ২৫ কোটি টাকা রাজস্বের সাঙ্কুল্য বৃদ্ধিতে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২৯০ কোটি টাকা।

(শেষাংশ ৭৮১ পৃঃ)

স্বাশ্রয় ডেমোক্রাসী: ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির নতুন কোশল

হুনীল দাস

কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসের পূর্বপট

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেস গত ফেব্রুয়ারী মাসে পাটনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তাদের সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালে বিজয়বাড়িতে। তখন সবেমাত্র মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্টরা দল ভেঙ্গে পৃথক দলের পত্তন করেছে। এবারকার পরিস্থিতি একটু আলাদা ধরনের। এই কনবছরে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্টদের তীব্র বিবেচ ও দ্রুত অভিযোগের জালিম আবহাওয়া থেকে কিছুটা বেরিয়ে এসেছে। তাদের বিরুদ্ধে শোষণবাদের স্তিমিত অভিযোগ মার্ক্সিষ্টদেরই আর একটি উগ্র শাখা খাম মার্ক্সিষ্টদের বিরুদ্ধেই নির্মম তীব্রতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছে। ফলে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে ঐক্যের বা মিলনের সেতু রচিত না হলেও এই দুই দল পরস্পর কাছাকাছি এসেছে। বিভিন্ন রাজ্যে কর্মসূচীগত সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে এই সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়েছে। যদিও আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে দুইদলের মত-পার্থক্য রয়েছে। বস্তুতপক্ষে কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাওকে বলতে শোনা গেছে যে দল ভাঙাভাঙির সময়ের চাইতে এখন এই দুই দল পরস্পরের খুবই কাছাকাছি এসেছে। রাজেশ্বর রাও আরও বলেছেন : “Since 1964 the C. P. I (M) has shifted its position considerably and its approach to broad and national issues was much nearer to that of the C. P. I.” কিন্তু তা বলে দুই দলের এখনই

মিলন নয়, বিলয়ন নয়। পশ্চিম বাংলা, পাকিস্তান ও বিহারের প্রতিনিধিদের মিলন সম্পর্কে জোরালো দাবী ছিল এবং পাটনায় দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির ঐক্যবাহীরা সামান্য ভোটেই (‘narrow margin’) পরাজিত হয়েছে।

সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা

কম্যুনিষ্ট পার্টির কংগ্রেসে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি শক্তিশালী ডেপুটেশনের উপস্থিতি নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের ষষ্ঠ কংগ্রেসে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির মূল তাত্ত্বিক স্বয়ং অশলভ উপস্থিত ছিলেন। সপ্তম কংগ্রেসে ছিলেন সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক বি. এন. পোনোমারেভ। পোনোমারেভ সেবারকার কংগ্রেসে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সঙ্গতভাবেই বলেছিলেন : “your party is a distinguished detachment of the international communist movement.”^১ —‘আপনাদের পার্টি আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট বাহিনী’। এবারও এ, পেলস্বেব নেতৃত্বে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি শক্তিশালী ডেপুটেশন পাটনায় উপস্থিত ছিলেন। পেলস্বেব বস্তুত মাওসেতুং-এর নিন্দা থাকলেও দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির ঐক্যের ওপর জোর ছিল বেশী। পেলস্বেব আরও বলেন কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্বোধন

১। News & Views from the Soviet Union Vol XXIII, No 83, December 22, 1964, Pp 9.

ভারতবর্ষের সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্য চাই এবং এই ঐক্যের পূর্বগর্ত দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির ঐক্য : 'Key condition for securing the unity of all progressive and democratic forces in India.'

‘বামপন্থী’ ও গণতান্ত্রিক শক্তির বৈপরীত্য

অষ্টম কংগ্রেসে দেশের আভ্যন্তরীণ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক এবং বামপন্থী শক্তিসমূহের জোটের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এরা কারা তা স্পষ্ট করে বলা না হলেও, তার রেখাঙ্কন রয়েছে কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে। কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসের মতে দেশের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী প্রতিজিরাশীলদের সংহতির সামনে বামপন্থী নেতৃবৃন্দ প্রয়োজনীয় সংহতি নেই। প্রস্তাবে বার বারই ‘Left and Democratic forces’-এর উল্লেখ করা হয়েছে। ‘বামপন্থী’ এবং ‘গণতান্ত্রিক’ এই দুই প্রকৃতির শক্তির ঐক্য ও সংহতির অনিবার্হতার মধ্যে ক্ষমতালাভের পরিণতি নিহিত রয়েছে, এই মর্মে পুনঃপুনঃ উল্লেখ ‘বামপন্থী’ এবং ‘গণতান্ত্রিক’ শক্তির মধ্যে একটা বৈপরীত্যের ইঙ্গারা দেওয়া হয়েছে। যেন মনে হয় যারা বামপন্থী তারা গণতান্ত্রিক না-ও হতে পারে কিম্বা সকল ‘গণতান্ত্রিক’ শক্তি ‘বামপন্থীর’ মর্বাদায় চিহ্নিত হবার যোগ্যতা না-ও রাখতে পারে। এই আপাত-বৈপরীত্যের মধ্যে ‘বামপন্থী’ এবং ‘গণতান্ত্রিক’ শক্তির ভবিষ্যৎ পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্র স্থপ্ত রয়েছে। ঐক্যের বা সংহতির আডালে যে বৈপরীত্য আপাতত চাপা পড়বে ভবিষ্যতে তা-ই বিরোধের আকারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

যুক্ত ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত

১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর যুক্ত-ফ্রন্ট সরকারগুলির অভিজ্ঞতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলি শক্তি-বৈপরীত্যে আকীর্ণ ছিল। এক এক রাজ্যে এক এক

রকম বৈপরীত্য যুক্ত ফ্রন্টে সংহত হয়েছিল। সময়ের অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এই বৈপরীত্য যত বেশী মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো যুক্ত ফ্রন্ট সরকারগুলির পতনও সেই অনুপাতে অনিবার্হ হয়ে উঠলো। উত্তর প্রদেশ ও বিহারে জনসংঘ, সংযুক্ত সমাজবাদী ও কম্যুনিষ্টদের বিরোধ এবং পশ্চিমবঙ্গে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দল ও তাদের সমর্থকদের সঙ্গে অ-কম্যুনিষ্টদের বিরোধ, এই রাজ্যগুলিতে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের পতনের আশু কারণ। কম্যুনিষ্ট পার্টিও সে-কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর মাত্রাতিরিক্ত দোষ চাপিয়ে যুক্ত ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্তির অনিবার্হ পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারণের মনে ধোঁকা দেবার প্রবণত কম্যুনিষ্ট পার্টির বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে।

মুখে ঐক্য কাজে উৎসাদন : কম্যুনিষ্টদের ‘কোয়ালিশন’ নীতি

জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের শক্তিবৃদ্ধিতে কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেও এদেরই সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী মন্ত্রী সভা গঠনে কম্যুনিষ্ট পার্টি উদগ্র আগ্রহও দেখিয়েছে। জনসংঘের প্রকৃতি বিচার করে কম্যুনিষ্ট পার্টি বলেছে : “Jan Sangh is basically a party of reaction, championing obscurantism and the cause of reactionary classes.” তবুও এদের সঙ্গে ক্ষমতা দখল করতে আগ্রহের অবধি ছিল না কম্যুনিষ্ট পার্টির। একবার যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে এদের সাহচর্যে ক্ষমতা হাতে এনে কম্যুনিষ্ট পার্টি এদের প্রতি কি আচরণ করবে, সে-সম্পর্কেও কম্যুনিষ্ট পার্টি যে নিঃসংশয় ছিল তা বোঝা যায় ‘নিউ এজ’ পত্রিকায় অষ্টম কংগ্রেস সম্পর্কিত নিবন্ধের দ্বিতীয় স্তবকে। সেখানে লেখক দ্ব্যর্থহীনভাবেই বলেছেন : “.....the party was guided by the understanding that reaction

must be isolated in all situations, whether inside coalition or outside.” (New Age, 10th March’ 68 pp12) কোয়ালিশনের এক অংশীদার সম্পর্কে যাদের এই মনোভাব, পৃথক আদর্শসম্পন্ন অথবা কোনো অংশীদার সম্পর্কেই বা ভিন্ন মনোভাব হবে কেন? কম্যুনিষ্টদের এই মনোভাবই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুক্ত ফ্রন্ট পরিচালিত করেছে এবং এই কৌশল প্রয়োগেই কম্যুনিষ্ট পার্টি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কোয়ালিশনে তার অংশীদারদের একে একে উৎসাদিত করেছে। মুখে ঐক্য, কানে উৎসাদন : যুক্ত ফ্রন্টের অভ্যন্তরে বিপরীত আদর্শের রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টির বহু-ব্যবহৃত কৌশল।

প্রকৃতি বিচারে পরিবর্তন

জনসম্মত ও স্বতন্ত্র দল সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট পার্টির শঙ্কা প্রকাশ করলেও মাত্রাজের দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কালীগাম দল সম্পর্কে মতের পরিবর্তন করেছে। ডি, এম, কে বামপন্থী নয় কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টির দৃষ্টিতে অতঃপর আর প্রতিক্রিয়া-শীলও নয়। ডি, এম, কে এখন.....essentially belonging to the democratic camp.” শুধু তাই নয়, অস্ত্রাস্ত্র পার্টি সম্পর্কেও কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রকৃতি-নির্ণয়ে (categorisation) গুরুতর রদবদল হয়েছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি ; এরাও এখন কম্যুনিষ্ট পার্টির ভাই ভাই, কংগ্রেসের ‘বি টিম’ নয়। রাজ্যস্তরে অস্ত্রাস্ত্র পার্টিও রয়েছে।

এবার যুক্তফ্রন্ট নয় : গ্রামিনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এদের নিয়ে এবার আর যুক্ত ফ্রন্ট নয়, গ্রামিনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠনই হোলো কম্যুনিষ্ট পার্টির আশু রাজনৈতিক কর্তব্য। ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালের মক্কা খোষণা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসও সমাজবাদে

শান্তিপূর্ণ উত্তরণের নীতি গ্রহণ করেছে। শ্রমিক শ্রেণীর সশস্ত্র সংগ্রামের ভূমিকা আপাতত মূলত্ববী রেখে এই নীতি গ্রহীত হলেও, কম্যুনিষ্ট পার্টি সকল অবস্থাতেই ‘non-peaceful methods’—অ-শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম—বাতিল না করেও ‘বামপন্থী এবং ‘গণতান্ত্রিক’ শক্তিগুলির সংহতির মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনগণের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা বিস্তারের দায়িত্ব নেবার পক্ষপাতী। আর এরকম গণসমর্থন সম্ভব করে তুলতে পারলে সশস্ত্র সংগ্রামের ভূমিকা আপনিই তৈরী হবে। সেজন্য কম্যুনিষ্ট পার্টি মার্ক্সিস্ট শিবিরের উগ্রপন্থী হঠকারিদের সতর্ক করে বলছে : “It is impermissible to resort to arms without the necessary mass support which only gives a handle to the reactionary force to isolate such a struggle.”

সকল অবস্থার ক্ষমতা তৈরী হও

কম্যুনিষ্ট পার্টি সাংবিধানিক ও পরিষদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে আশু কর্মপদ্ধতি সীমিত রেখে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের জন্ত সচেষ্ট হলেও একটি শক্তিশালী গণভিত্তিক দল গঠনে নিরন্তর সচেষ্ট থাকবে ; যে দল পরিস্থিতির যে কোনো আকস্মিক পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়াবার সামর্থ্য রাখবে : “we must have a strong mass Communist Party—a party that is able to face all contingencies and sudden turn in the situation.”

অর্থাৎ, পার্টনা কংগ্রেসের প্রস্তাব সম্পৃষ্টভাবেই বলছে, যতদিন পর্যন্ত সম্ভব পরিষদীয় পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম চলবে। অবস্থান্তরে বিকল্প ব্যবস্থা। যাদের পরিষদীয় গণতন্ত্রে আস্থা থাকবে, তাদের লক্ষ্য ও আদর্শ হবে চরম মূল্য দিয়ে এই পদ্ধতির সংরক্ষণ। কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখে

'all contingencies'-এর স্বার্থহীন অর্থ হোলো এই যে সশস্ত্র বিপ্লবের স্বযোগ উপস্থিত হলে, কম্যুনিষ্ট পার্টি ক্ষমতা দখলের জন্য সে পথে অবশ্যই পা বাড়াবে।

পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীতে ধ্বস : স্পীকারের

আচরণ

কম্যুনিষ্ট পার্টি পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে আস্থাশীল হয়ে পশ্চিমবঙ্গ স্পীকারের 'সাহসিকতার' (courageous action) প্রশংসা করেছে। অথচ এই স্পীকারই বিধান সভার রক্ষক হয়েও সভার কঠোরোপে সহায়ক হয়েছেন এবং রাষ্ট্রপতির শাসন ডেকে এনে শাসন বিভাগের পায়ের তলায় পরিষদের সার্বভৌমত্ব লুটিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় পরিষদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর এবং সংবিধানের প্রতি অবজ্ঞা ও ও উপেক্ষা চিহ্নিত হয়ে আছে, এই আচরণের মধ্য দিয়ে। কম্যুনিষ্ট পার্টি তাকেই তারিফ করে পরীষদীয় গণতন্ত্র ধ্বংসের ফেলার পথে এগিয়েছে।

কম্যুনিষ্ট বনাম প্রগতিশীল কংগ্রেস

কম্যুনিষ্ট পার্টি এ যাবৎ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একদল প্রগতিশীল কংগ্রেসসেবীদের আবিষ্কার করে তাদেরই সাহায্যে কংগ্রেসের প্রগতিমুখীনতার বিশ্বাস করে এসেছে। ফলে দেখা গেছে নির্বাচনের সময়, অনেক বিশিষ্ট কংগ্রেস সদস্যদের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টি কোনো প্রার্থী না দিয়ে তাদের সাহায্য করেছে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই ধরনের কংগ্রেস সদস্যরা প্রচ্ছন্ন কম্যুনিষ্ট বলে চিহ্নিত হয়ে আছেন এবং কংগ্রেস সদস্য হয়েও আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় স্বার্থের চাইতে বিভিন্ন সমস্যার সোভিয়েত রুশের দৃষ্টিকোণকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। কম্যুনিষ্টদের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ মেনন এ-রকম একজন 'প্রগতিশীল' কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেস-এ

জানা গেছে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অতঃপর আর কোনো প্রগতিশীল প্রবণতার ভরসা না রেখে কম্যুনিষ্ট পার্টি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করতে মনোযোগী হবে।

কংগ্রেসের দক্ষিণায়ন : কম্যুনিষ্টদের স্ববিধাবাদ
কংগ্রেসের দক্ষিণমুখী প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেসের বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তি ও দক্ষিণমুখী শক্তির মধ্যে তুলনামূলকভাবে শেফোক্তাদের পরিষদীয় শক্তি ক্রমাগত অধিকতর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কম্যুনিষ্ট কংগ্রেস বলছে একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের ক্রমশ এই বিশ্বাস জন্মেছে যে কংগ্রেসের একক শক্তি তাদের স্বার্থরক্ষায় অসমর্থ হয়ে পড়েছে এবং ফলে অভ্যন্তরীণ দক্ষিণ-মুখী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন অনিবার্য হয়ে পড়েছে; মুখে যদিও কংগ্রেস এই প্রকার কোয়ালিশনে গভীর অনাগ্রহ প্রকাশ করেছে। কংগ্রেসের ও দক্ষিণমুখী প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্পর্কে এই সমালোচনা আদৌ অযৌক্তিক না হলেও, অংকগ্রেসী সরকারগুলিতে শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে পরস্পর-বিরোধী আদর্শ-সম্পন্ন এবং দক্ষিণমুখী শক্তির সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির জোটের প্রকৃতগত বিভিন্নতা নেই। এই স্ববিধাবাদী রাজনীতিরও এই বলে কম্যুনিষ্ট কংগ্রেস সাফাই দিয়েছে যে এর ফলশ্রুতি-রূপে দেশের বামপন্থীদলগুলি কাছাকাছি এসেছে এটাই লাভ—"But the great gain is to be measured in the coming together of the leftist parties in the country." ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ও মাক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি' কাছাকাছি এসেছে, এই ফলশ্রুতির কথাই বোধহয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মাক্সবাদী দলগুলিও রাজ্য-ভিত্তিতে নিকটতর হয়েছিল 'অকংগ্রেসী সরকারগুলিতে। কিন্তু স্বার্থবুদ্ধির বিচ্ছিন্নতা তাদের সংহতির

পথে প্রবল অন্তরায় হয়ে রয়েছে। এ-ছাড়া মার্ক্সবাদী নয় এমন বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে সম্পর্কেও দূরত্ব পূর্বের মতই অব্যাহত রয়েছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব জীর্ণ হয়ে অকংগ্রেসী সরকারের ‘মহৎ লাভ’ (‘great gain’) জনসাধারণের চোখে অপচিত হয়ে গেছে। এই ‘মহৎ লাভ’ একদিকে যে কোনো প্রকারে ক্ষমতার কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকার স্ববিধাবাদী রাজনীতির, আর একদিকে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে সোভিয়েট প্রতিনিধিসমূহের নেতা পোনোমারেভের ভাষায় ‘distinguished detachment of the international Communist movement’-এর ভূমিকায় ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের সুপ্রতিষ্ঠিত হবার অধিকতর সুযোগ এনে দিয়েছে।

আশনাথ ডেমোক্রাসী : কৌশলের নবায়ন
অষ্টম কংগ্রেসে গ্রহীত আশনাথ ডেমোক্রাসীর নূতন কৌশলও এই রাজনীতিরই নবায়ন। একথা সত্য যে ভাবতবর্ষের জটিল পরিস্থিতিতে কোনো সহজ পন্থার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়, এবং কোনো পুরাতন নজীব থেকে দিক-নির্দেশ গ্রহণের অবকাশও নেই। কম্যুনিষ্ট পার্টি অকপটে একথা স্বীকারও করেছে যে এই দলের সাধ্য নাই যে পরিস্থিতির দায়িত্ব একক বহন করতে পারে। তাই আশনাথ ডেমোক্রাসী নামক চমকপ্রদ কৌশলের উদ্ভাবন হয়েছে। এই কৌশল অমুখারী শ্রমিকশ্রেণীর অসমত্ব নেতৃত্বের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের সহযোগে— “anti-imperialist, anti-feudal, anti-monopoly national democratic revolution”—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদ-বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে হবে; অষ্টম কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসের এই স্বির সিদ্ধান্ত হলেও পরিণতিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই সমাজবাদী বিপ্লব সার্থক করতে হবে।

এটাই হবে তাদের অন্তিম লক্ষ্য। সুতরাং, জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের, সে-পর্যন্ত সন্ত্রেও রাখতে হবে। কারণ কম্যুনিষ্ট পার্টি মনে করে দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম ব্যতিবেকে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া নেতৃত্বের অবসান ঘটানো যাবে না : “The forging of working-class leadership in the national-liberation movement, in other words, dislodging the national bourgeoisie from its position of leadership involves a very complicated, arduous and generally very prolonged struggle, extending over years.” অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট পার্টির আন্ত লক্ষ্য সমাজবাদী, গণতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী অস্বাস্থ্য দলগুলির মত একচেটিয়া পুঁজিবাদের ধ্বংস সাধন হলেও, অন্তিম লক্ষ্য জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের বিলোপ। মাঝখানে কিছু সময়ের জন্য ‘আশনাথ ডেমোক্রাসী’ নামক রণকৌশলের আলিঙ্গনে অস্বাস্থ্য অ-কম্যুনিষ্ট গণতান্ত্রিক দলগুলিকে আবদ্ধ রেখে তাদের আদর্শগত বৈপরীত্যের ক্ষরধার তীক্ষ্ণতাকে পঙ্কু করে এই অন্তিম লক্ষ্যের পথ হ্রগম করবার মহৎ সঙ্কল্প নিহিত রয়েছে এই নূতন রণকৌশলের মধ্যে।

আশনাথ ডেমোক্রাসীর প্রকৃতি বিচার
‘আশনাথ ডেমোক্রাসী’ নামক এই নূতন রণকৌশল আসলে খুব বেশী নূতন নয়। সোভিয়েত রুশের নীতি-নির্ধারণদের কাছে বার বার একটি মৌলিক নীতিগত সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশ-গুলিতে সোভিয়েত রাজনীতির প্রয়োগও বার বার এই সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে সোভিয়েত রুশের গভর্নর সময় থেকেই এই সঙ্কটের উদ্ভব। সোভিয়েত রুশের সম্পদ ও শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপ্লব সংগঠনে নিয়োজিত হবে, না, সোভিয়েতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিভিন্ন

দেশে জাতীয়তাবাদী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, অ-কম্যুনিষ্ট দল ও সরকারকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে অধিকতর পার্থক্যের সঙ্গে শাখিত হবে—এই সঙ্কটই সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতিতে ১৯২০ সাল থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে। সে-বছর কোমিনটার্ন-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন সোভিয়েত রুশের সমর্থক সংগ্রহের এবং নূতন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী অবরোধ ভাঙবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের ('Bourgeois Nationalist') সমর্থনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেই সব দেশের নব-গঠিত কম্যুনিষ্ট দলগুলিকেও এদের সমর্থনের নির্দেশ দেন : উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ভারতের কংগ্রেসকে এবং তুর্কীতে কেমাল আতাতুর্ক-এর দলকে সমর্থনের জন্ত বলেন। এই সমর্থনের ফলে স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি'গুলিকে সাময়িকভাবে বর্জন করতে হতে পারে; এই জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি ক্ষমতালভ করে নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী এবং দেশের বাইরে সোভিয়েত-বিরোধী হতে পারে—সেই ঝুঁকি নিতেও লেনিন প্রস্তুত ছিলেন। কারণ লেনিন ভেবেছিলেন জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের দ্বারা আঘাতে সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটলে পুঁজিবাদের পতন স্বাধীন হবে। অপরপক্ষে, সোভিয়েত রুশের সঙ্গে ঐ সব দেশের জাতীয়তাবাদীদের মৈত্রী, সাম্রাজ্যবাদের দুর্গে দুর্বীর আঘাত দিয়ে সোভিয়েতের নিরাপত্তা ও মস্তকোর মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।

স্টালিনের আমলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েতের শক্তি ও সম্পদ বিশেষে কম্যুনিষ্ট কিম্বা সোভিয়েতের বশবৎ রাষ্ট্র গঠনে উদ্যোগী হয়েছে, সোভিয়েত রুশের সংলগ্ন রাষ্ট্রগুলিতে সেই লক্ষ্য সম্ভবপর করে তুলেছে এবং ১৯৪৮ সাল থেকে বছর কয়েক ইউরোপে ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের প্ররোচনা শুনিয়েছে। স্টালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির গুরুতর পরিবর্তন সাধন করেন। এমন কি ১৯৫৬-র জুনে মোলোটভ, ম্যাগলেনকভ,

কাগানোভিচ প্রমুখ তথাকথিত 'anti-party group' বহিষ্কারের সময় যে নেতৃবৃন্দের সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তার পূর্বেই ক্রুশ্চেভের হাতে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল। টিটোর সঙ্গে পুনর্মিলনের পদক্ষেপ, ১৯৫৫-এ জেনেভায় শীর্ষসম্মেলনের শরীকিয়ানা, বুলগারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে সে-বছর ভারতবর্ষ, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি ভ্রমণ-কালে সোভিয়েতের অব্যাহত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি: এশিয়া ও আফ্রিকার সবেমাত্র স্বাধীন এবং পরাধীন দেশগুলিতে একটি নূতন শক্তিশালী বন্ধুর সম্মান এনে দিয়ে এদের একদিকে যেমন সোভিয়েত রুশ-মুখীন করে তুললো, তেমনি অপর পক্ষে এই সব দেশে কম্যুনিজম সম্পর্কে অসুস্থ মানসিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করলো। এশিয়া ও আফ্রিকার এই দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী চক্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের বাজার, লবী এবং অলভ কাঁচা মালের উৎস থেকে বঞ্চিত করে সোভিয়েত রুশের পক্ষে নূতন অযোগ্য এনে দেবে এ ধারণা সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের মনে দৃঢ়মূল হয়ে গেলো।

সোভিয়েতমুখীনতা স্বরায়নে আরও কয়েকটি পদক্ষেপ অনিবার্য হয়ে উঠলো ক্রুশ্চেভ-নেতৃবৃন্দের কাছে। স্টালিনের আগলের কঠোর বিধি-নিষেধ শিথিল হল, কম্যুনিজমের লক্ষ্যে উপনীত হতে একাধিক পথ স্বীকৃতি পেলো। কোনো কোনো দেশে রক্তসিক্ত গৃহযুদ্ধ ব্যতিরেকে পরিষদীয় গণতন্ত্রের পথে ক্ষমতা দখল যেমন স্বীকৃত হল, তেমনি সশস্ত্র বিপ্লবের পথও উন্মুক্ত রইলো। কোনো দেশে অস্ত্রাভ্যাস দলের সঙ্গে ক্ষমতার শরীক হবে; কোনো দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টি' একদলীয় শাসন কামেম করবে। ১৯৫৭ সালে ষাটটি দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি'র বৈঠকের ঘোষণায় এই সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সোভিয়েতের নূতন নীতি তাদের হিসাব মত কার্যকর হয়নি। বিভিন্ন দেশ যেমন সোভিয়েত

সাহায্য গ্রহণ করেছে, তেমনি পশ্চিম ইউরোপ, আমেরিকা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্যও গ্রহণ করেছে। কিন্তু কিউবার ক্যাস্ট্রোর বিপ্লবের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা গেলো। ষাট বছর আমেরিকার আধিক, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাবের আওতায় বাস করেও ক্যাস্ট্রোর কিউবা আমেরিকার সঙ্গে আপোষের সকল সম্ভাবনাব মূলোচ্ছেদ করে সোভিয়েত রুশের সহযাত্রী হয়ে দেখা দিল। ক্যাস্ট্রোর কিউবার দৃষ্টান্ত ‘স্টাশনাল ডেমোক্রেসী’র অভিব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং সোভিয়েতমুখীনতা ‘স্টাশনাল ডেমোক্রেসী’র অনিবার্য অনুষঙ্গ। ‘স্টাশনাল ডেমোক্রেসী’র প্রকৃতি-বিচারে তাদেরই চিহ্নিত করা যাবে, যে সব দেশ সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের আওতাভুক্ত হয়ে কমুনিষ্ট ব্লকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এখনও সমাজবাদী গঠনের উপাত্ত এসে পৌছাতে পারে নি কিন্তু বুর্জোয়াস্হস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সামাজিক পরিবর্তনের পন্থন করেছে। অর্থাৎ সোভিয়েত ব্লকের কনিষ্ঠ সহযোগীরূপে যে রাষ্ট্রের স্থান নির্ধারিত হয়েছে তাদেরই ‘স্টাশনাল ডেমোক্রেসী’ বলা যেতে পারে! *

* “National Democracy was defined as an intermediate stage in which an oppressed people has broken loose from imperialist oppression and has been taken under the wing of the Communist bloc, domestically, however, it is engaged in carrying through ‘bourgeois’ reforms and has not yet embarked on the ‘building of socialism.’ Stated in other terms, a national democracy is a state that has achieved the status of a junior associate of the

ক্যাস্ট্রো কনিষ্ঠের মর্যাদা অগ্রাহ্য করে দাবী করে যে কিউবাতে সমাজবাদী সংগঠন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু মস্কো সহজে সে দাবী স্বীকার করতে রাজী হতে চাইনি। ক্যাস্ট্রোর দাবীয় উত্তরে তারা বলেছে কিউবা সোশ্যালিস্ট-পূর্ব (Pre-Socialist) স্তরে রয়েছে। পরিশেষে ১৯৬১ সালে কেনেডির কিউবা অভিযান ব্যর্থ হলে, কিউবা ‘স্টাশনাল ডেমোক্রেসী’র স্তর অতিক্রম করবার স্বীকৃতি পায়।

রেভলুশনারী ডেমোক্রেসী : অপার এক স্ট্রোগান

সোভিয়েত নীতি আর একবার মোড় নেয় ১৯৬৩ সালে। এবার সোভিয়েত নীতি আওয়াজ তোলে ‘রেভলুশনারী ডেমোক্রেসী’র (‘Revolutionary Democracy’)। অ-কমুনিষ্ট বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলিকে এই নূতন নামাকরণ দিয়ে চিহ্নিত করা হলো। এ-সব দেশ ক্যাস্ট্রোর মত সমাজবাদী সংগঠনের (building socialism) দাবী তোলে নাই। বরং এরা, যেমন মিশরে ও আলজিরিয়াতে, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কমুনিষ্টদের নির্মমভাবে দমনও করেছে। অথচ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রূপে দাঁড়িয়ে সোভিয়েতের উপর একান্ত রাজনৈতিক নির্ভরতা, তাদের সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির সমর্থনে বাধ্য করেছে। গিনি, ঘানা, মালী, সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র, আলজিরিয়া কংগো, ব্রাজিলিয়ে প্রভৃতি অকমুনিষ্ট একদলীয় রাষ্ট্রগুলিতে “রেভলুশনারী ডেমোক্রেসী”র অভিব্যক্তি দেখা গেছে। এদের প্রভাবে নিজ নিজ এলাকায় পশ্চিমী ও মার্কিনী প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়ে

Soviet bloc; only after it has entered the stage of “socialist construction” will it achieve full membership in the Commonwealth of socialist nations. [Foreign Affairs Quarterly; October 1967, Pp 67.]

সোভিয়েতের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। 'রেভলুশনারী ডেমোক্রাসীর' প্রয়োগ তাই অনিবার্হভাবে সোভিয়েত স্বার্থের স্চীমুখ সেই সব রাষ্ট্রে স্টি করবে।

আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম-এর বহুকেন্দ্রিকতা

আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের খাতিরে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি'র নীতির বার বার পরিবর্তন ঘটেছে। সোভিয়েত রুশে স্টালিনের আমলে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র স্বসংগঠিত হবার পর থেকে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনও সোভিয়েত রুশ-এর পররাষ্ট্র নীতির হাতিয়ারে পর্যবসিত হয়েছিল। প্রথমে যুগোস্লাভিয়া ও পরে ক্রুশ্চেভেরই আগলে চীন ও আলবানিয়া এ-নীতি অস্বীকার করে প্রধানত উন্নয়ন-শীল দেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে পুঁজিবাদ-বর্জিত উন্নতির ক্রুশ্চেভী-তত্ত্বের বিরোধিতা করে। (Theory of non-Capitalist development in developing countries in a peaceful manner)। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত তাঁবেদারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নির্ধনভাবে দমন করা হয়েছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে বিজয়ী সোভিয়েত সেনাবাহিনী যে সব দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টি'কে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল, সেখানে বর্তমানে মস্কোর তাঁবেদারী থেকে মুক্তির চাঞ্চল্যের আভাস দেখা যাচ্ছে। রুমানিয়া তার একটি দৃষ্টান্ত। পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাও সে-ই দিকই বহন করছে। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের একক মস্কো-কেন্দ্রিকতা বহুকেন্দ্রিকতার (polycentric) রূপ নেবার পথে মোড় নিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি, একান্তভাবে মস্কো-নির্ভর, আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম-এর বশব্দ—'faithful detachment of the international Communist movement.'

ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের মস্কোমুখীনতা

পূর্বকার ঐতিহাসিক নজীরগুলি ছেড়ে দিয়েও হু একটি ফাঁকুন ২

সাম্প্রতিক ঘটনা দিয়ে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি'র একান্ত মস্কোমুখীনতার দৃষ্টান্ত সম্পষ্ট হয়ে উঠবে। ১৯৬৫র পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি' পাকিস্তানের বিরোধিতা করলেও, তাসখন্দ বৈঠকের পর কাশ্মীর সম্পর্কে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। তাসখন্দ বৈঠকের পর সোভিয়েত রুশের চোখে কাশ্মীর আর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, কাশ্মীর সমস্যা পাক-ভারত বিরোধের অজ্ঞাত উপকরণের মধ্যে একটি উপকরণ মাত্র। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি'ও অতঃপর কাশ্মীর সমস্যাকে এই দৃষ্টিতেই দেখতে শুরু করেছে। * কাশ্মীর সম্পর্কে সোভিয়েত রুশের এই মত পরিবর্তন দেশের সঙ্কটের তালিকায় আর একটি সংযোজন।

২ * "That the right wing of the C. P. I blindly follows the Moscow line is beyond doubt. All rudiments of independent thought such as those which made their appearance following the condemnation of Stalin and the Hungarian uprising have withered away. The Party's central Organ, the weekly magazine 'New Age' follows every small meander or change of course dictated by Moscow. This was verified in the event of the India-Pakistan conflict. After open hostilities had broken out between the two countries, 'New Age' reported Soviet support for New Delhi, a policy that promised to be of great importance for the right wing. The paper published vehement attacks against Pakistan and opposed a solution put forward through the United Nations. When, however, the Soviet

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটে ইসরায়েলের কাছে আরব রাষ্ট্রপুঞ্জের পরাক্রম সোভিয়েৎ রুশের কূটনীতি ও সমরাজ্ঞের পরাজয়। ইসরায়েল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সোভিয়েতের স্বীকৃতি পেলেও, ইসরায়েলের অস্তিত্ব বিলোপের উদ্দেশ্য নিয়ে আরব রাষ্ট্র সমূহের সমরাজ্যে সোভিয়েত রুশ সহায়তা করেছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের আশ্রয়ার্থে পশ্চিম এশিয়ায় আরবদের প্রতি আশ্রয়ার্থে কলে যে যুদ্ধ পরোক্ষে সোভিয়েত রুশ জড়িত হয়ে গেছে, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তার নির্বিচার সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছে।

ভিয়েৎনাম সঙ্কট একটি মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। উত্তর ভিয়েৎনামে আমেরিকার বোমাবর্ষণ বিরতির অনিবার্হতা সত্ত্বেও গোড়ায় ভিয়েৎনাম যুদ্ধবিরতি নির্ভর করছিল আলোচনা বৈঠকে চীন ও উত্তর ভিয়েৎনামের অংশগ্রহণের সম্মতির ওপর। এই অসম্মতি সোভিয়েত রুশকে বুটেনের সঙ্গে যৌথভাবে সমরমত ১৯৫৪ সালের জেনেভা সম্মেলন আহ্বান করে ভিয়েৎনাম সঙ্কট উত্তরণের উত্তোগী হতে দেয় নাই। আমেরিকার বোমাবর্ষণের পাশাপাশি হানয়-পিকিং-এর এই প্রতিবন্ধকতা যে বিশ্বশান্তি পুনঃস্থাপনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সোভিয়েত রুশ সে কথা ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েত রুশের এই গুরুতর

দায়িত্বপালনের ব্যর্থতা সম্পর্কে মুক হয়ে রয়েছে। এ-বিষয়ে চীন ও আমেরিকার দায়িত্ব ঘোষণায় তারা অবশ্য সঙ্গতভাবেই সরব।

সঙ্কটের সীমানা

দেশের অভ্যন্তরে প্রগতিশীল শক্তি ও প্রতিক্রিয়া-শীল শক্তির সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধির কলে অতঃপর ক্ষমতাবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জাতীয়তা-বাদীদের (national bourgeois) একান্ত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে দেবে না একথা ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে। সে-অবস্থায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিক্ষোভ 'নৈমিত্তিক ঘটনা' হয়ে দাঁড়াবে। এই সঙ্কট উত্তরণ সম্ভব হবে, কম্যুনিষ্ট পার্টির মতে, যদি অনিশ্চিতভাবে দেশের রাজনৈতিক জীবন বামমুখীন হয়ে ওঠে: "bring about in the country's political life a decisive shift to the left." কম্যুনিষ্ট পার্টির দৃষ্টিতে "জাশজাল ডেমোক্রাসী"র কৌশল এই বামমুখীনতার প্রকৃষ্ট পন্থা, যে "জাশজাল ডেমোক্রাসী"র অন্তিম পরিচয়—"The status of a junior associate of the Soviet bloc." —সোভিয়েট ব্লকের কনিষ্ঠ সহচররূপে। পার্টনার কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসের বামপন্থার প্রকৃতি বিচার এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছে দেয়। তাই ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারত-চীন, পাক-ভারত বিরোধ, মিজো-নাগাদের বিদ্রোহ, ভিয়েৎনাম ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট কি ষাট-প্রতিষাট স্বষ্টি করেছে এবং তার পরিণতি জাতীয় জীবনে, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চল ভারতে, কোন্ বিপদ সঙ্কেত বহন করতে পারে সে-সম্পর্কে পার্টনার কম্যুনিষ্ট কংগ্রেস স্হচতুরভাবে নীরব রয়েছে।

Union decided to take a diplomatic initiative and promote negotiations in Tashkent, the Party Organ immediately took up the line although the two proposals for a solution were not substantially different." (Moscow's Hand in India; Peter Sager. Pp, 164-165: Swiss Eastern Institute, Berne.)

আন্তঃসত্তরীণ সঙ্কটের পাশাপাশি সীমান্ত সঙ্কট
বর্তমান পরিস্থিতিতে একথা অসম্পষ্ট যে দেশের অভ্যন্তরে বহুমুখী সঙ্কটের আঘাত আগামী দিনে ছুনিবার রাজনৈতিক সঙ্কটের ভূকম্পন সৃষ্টি করবে। পূর্বাঞ্চল ভারত যে এই ভূকম্পনের কেন্দ্র হবে ঘটনার গতিবেগ তার লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তুলছে। এই আন্তঃসত্তরীণ সঙ্কট অতিক্রম করবার ক্ষমতা বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসকদের যে আপো নাই গত কয়েকবছরের চূড়ান্ত প্রশাসনিক ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে তা সংশয়াতীতরূপে প্রমাণ হয়ে গেছে। দেশের অভ্যন্তরে এই বিপর্যস্ত ভারসাম্যের পাশাপাশি সীমান্তে চীন ও পাকিস্তানের বিপদ, পূর্বাঞ্চল ভারতের আন্তঃসত্তরীণ সঙ্কটকে আরও অস্থিরতা, আরও অনিশ্চিতি এবং আরও তীব্রতার মুখোমুখী করে তুলবে। ভারতবর্ষে বর্তমান পরিস্থিতির গণতন্ত্রের সঙ্কটও এই আসন্ন সঙ্কটের পূর্বাভাস মাত্র।

সঙ্কটের পরিণতি : বৈদেশিক শক্তিবর্গের সম্ভাব্য সংগ্রামভূমি

এই সামগ্রিক সঙ্কটের স্বযোগে যারা দেশের প্রতি আনুগত্যহীন, জাতীয়তাবাদ ঘাণের কাছে প্রতিক্রিয়াশীল শৃঙ্খল মাত্র, জাতীয় জীবনে যারা বৈদেশিক শক্তির প্রসারিত বাহ্যর ভূমিকায় নিয়োজিত, তাদের পক্ষে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করা সহজ হবে। 'মাও সে তুং জিন্দাবাদ,' 'ভিয়েৎনাম লাল সেলাম,' 'শ্রামলী বাংলার অপর নাম ভিয়েৎনাম,' 'ভিয়েৎনামের পথ আমাদের পথ, বলে যারা পশ্চিম বাংলার এবং পূর্বাঞ্চল ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত করছেন তাদের লক্ষ্য ভিয়েৎনামের মত পূর্বাঞ্চল ভারতকে বৃহৎ শক্তিবর্গের সংগ্রামভূমিতে পরিণত করে তোলা। অস্বর্গাতমূলক প্রয়াস ও গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি বৈদেশিক আনুগত্যসম্পন্নদের এই মানসিকতার পরিণত ফল।

আন্তঃসত্তরীণ এবং সীমান্তবর্তী প্রত্যাসন্ন আন্তর্জাতিক

সঙ্কটের বাত-প্রতিঘাত যে বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার জনক, কমিউনিষ্ট কংগ্রেস সে-সম্পর্কে নীরব থেকে কেন্দ্রে আশঙ্কাজনক ডেমোক্র্যাটিক কোয়ালিশনের সমাধান দিয়ে সাধারণ মানুষকে আগামী বিপদের স্বরূপ ও প্রস্তুতি সম্পর্কে বিদ্রোহ রাখতে তৎপর হয়েছে। একথা নিঃসন্দেহ কংগ্রেসী শাসন দেশের সর্বনাশ সাধন করে বর্তমানের এই-মারাত্মক সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেস শাসনের অপসারণ তাই ভারতীয় জনসাধারণের অনিবার্য কর্তব্য। কিন্তু কংগ্রেসের বিকল্প যে বিপরীত আদর্শসম্পন্ন রাজনৈতিক পার্টিগুলির কোয়ালিশন নয়, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট কিম্বা উত্তর প্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক সরকার বা অম্বাজ রাজ্যে আদর্শে স্বাভাৱ্য-হীন রকমফের অকংগ্রেসী সরকার তা প্রমাণ করেছে। আগামী দিনে আন্তঃসত্তরীণ ও সীমান্তবর্তী আন্তর্জাতিক সঙ্কটের আঘাতে কংগ্রেসীশাসকদের চৌচির হয়ে যাবে এবং দেশের আনুগত্য চারটি শিবিরে অনিবার্যভাবে বিভক্ত হয়ে যাবে। এই সম্ভাব্য শিবিরগুলির মধ্যে তিনটি শিবির বিগত চতুর্ধ নির্বাচনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে এবং আগামী নির্বাচনগুলিতে উত্তরোত্তর বর্ধিত প্রভাব বিস্তার করবে। চীন, রুশ ও মার্কিন—এই তিন বৈদেশিক শিবির ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে ঠাঁই করে নিয়ে ভারতের সার্বভৌমত্বের শত্রু মাটিতে ফাটল ধরিয়েছে। চতুর্ধ শিবিরই এই ভারতীয় সার্বভৌমত্বের বা ভারতপন্থীদের শিবির। চীন, রুশ ও মার্কিনপন্থীদের শিবিরের প্রস্তুতি চলছে পূর্ণোন্মেষে। কিন্তু ভারতপন্থীদের শিবির আজও অগতঃ, আজও আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সর্বতোভাবে অচেতন ও নিরুদ্বিগ্ন। অথচ জাতীয় জীবনে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

কংগ্রেসের অপসারণ ও ভারতপন্থীদের দ্বার

সংগঠন : সঙ্কটের সমাধান

সংগ্রাম "ভাষাভাষা ডেমোক্রাসী" নয়—দেশপ্রেমী।

জাতীয়তাবাদীদের আশু কর্তব্য ভারতপন্থীদের শিবিরকে দুর্ব্বার করবার। আজ সর্ব্বপণ করে ভারতপন্থীদের একযোগে দাঁড়িয়ে জাতীয় জীবনের এবং জাতীয় মানসের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্ত রুখে দাঁড়াতে হবে। কংগ্রেসের অপসারণ এই প্রতিরোধের প্রস্তুতির পথে পূর্ব্বগত হলেও সীমান্তবর্তী দুনিবার আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সঙ্গে সংযুক্ত আন্তর্জাতিক সঙ্কট রুখবার জন্ত চাই দুর্ব্বার সংগঠন, জাতীয়তার আদর্শে যারা একাগ্র, শক্তিবাদকে যারা অঙ্গীকার করেছে এবং শক্তিবাদ ও জাতীয়তাবাদের দ্বৈত আদর্শের প্রয়োগে যারা আত্মনিয়োগ করবে এবং ভারতপন্থার আস্থানে যারা আত্মনিবেদন করবে। পরিষদীয় গণতন্ত্রের পাশা খেলায় দিকভ্রান্ত হলে পরিষদীয় গণতন্ত্রেরও যেমন অচিরে অস্তিত্বশয্যা রচিত হবে, জাতীয় জীবনেও তেমন চীন-রুশ-মার্কিনের প্রচণ্ড টানা পোড়েনে ভারতবর্ষে বিশেষ করে পূর্ব্বাঞ্চল ভারতে আর একটি ভিয়েতনামের সৃষ্টি হবে। অন্তর্দ্বন্দ্বে জীর্ণ 'ছাশনাল ডেমোক্রাসী'র কোশল এই পরিণতিকেই স্বরাশ্রিত করবে।

১৮. ৩. ৬৮

অনিম্ন নানোন্নত সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩৫০ টাকা।

“...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিষ্কৃত করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্ব্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাত্ত।”
... (ভূগিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১২৫

“...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবগম্যন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সমুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া ‘নাস্ত পন্থা বিজ্ঞতে অয়নায়।’ (ভূগিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে
এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়ন্তী—৩০৯, গান্ধী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

ইয়োরোপে নেতাজী

সুভাষচন্দ্র

অশোকনাথ বসু

[অশোকনাথ বসু ৬শরৎচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৯৩৭ সালে নেতাজী যখন তৃতীয়বার ইয়োরোপে যান সেই সময় লেখক মিউনিক কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। সেই সময়েই ইয়োরোপের নানাজায়গায় নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস করার সুযোগ ও সৌভাগ্য লেখকের হয়েছিল। নিয়মিত পত্র, টেলিগ্রাম, টেলিফোন যারফৎ উভয়ের যোগাযোগ থাকত। এই স্বল্পপরিসর রচনায় লেখকের সেই সময়কার দিকপঞ্জী ও পত্রাদির সাহায্যে ইউরোপে নেতাজীর বহুমুখী কাজের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। জঃ সঃ]

ইংলণ্ডে ছাত্রাবস্থা কাটিয়ে এবং “আই, সি, এস” প্রত্যাহ্বান করে নেতাজী দেশে ফিরে আসেন ১৯২১ সালে। এইটি ছিল তাঁর প্রথম ইয়োরোপ প্রবাস।

নেতাজীর দ্বিতীয়বার ইয়োরোপে অবস্থান কাল ১৯৩৩—৩৬ সাল। ১৯৩৭ সালে ডিসেম্বর মাসে, হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হবার প্রাক্কালে (১৯৩৬ সালে) কয়েক সপ্তাহের জন্য তিনি তৃতীয়বার ইয়োরোপে যান। ইয়োরোপে যে তাঁর পুনরায় পদার্পণ ঘটবে সে কথা তিনি ভেবেছিলেন এবং তার প্রস্তুতি তিনি করেছিলেন মূলতঃ ইয়োরোপে দ্বিতীয়বার অবস্থানের সময়। যারায়ক রোগ যন্ত্রণাভোগ ও চিকিৎসা পর্বের মধ্যে কি অদ্ভুত কাজগুলি যে তিনি করেছিলেন আজও তাহা প্রায় অপরিজ্ঞাত। বিভিন্ন দেশের উচ্চতম পর্যায়ের ভাগ্য নিয়ন্তাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার কেন যে হয়েছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে নেতাজীর চতুর্থবার ইয়োরোপ অবস্থান কালের মধ্য দিয়ে। উপরন্তু তার প্রথম বই, “ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাগ্ল” তিনি ঐ সময়ের

মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে ইয়োরোপে লেখা আরম্ভ ও সম্পূর্ণ করেন এবং তাঁর দ্বিতীয় বই, “ইণ্ডিয়ান পিলাগ্রিম” বা “ভারত পথিক”—এর উপাদানের বহুলাংশ ঐ সময়ে সংগৃহীত হয়।

উপরোক্ত গুরুত্ববিশিষ্ট সময়ে নেতাজীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে এ যাবৎ প্রায় কোনও তথ্যই ভারতীয় জন সাধারণের সামনে রীতিসঙ্গতভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি। কিন্তু ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রমে নেতাজীর তৎকালীন জীবনযাত্রা ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোকপাত করার বোধহয় প্রয়োজন আছে। ইয়োরোপে নানা জায়গায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিয়েনায় ও কার্লসবাদে নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস করার সুযোগ ও সৌভাগ্য লেখকের হয়েছিল। তাছাড়া, নেতাজীর সেই সময়ে ইয়োরোপে অবস্থান কালে তাঁর সঙ্গে পত্র, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন যারফৎ লেখকের প্রাত্যহিক সংযোগ থাকত। নেতাজীর তৎকালীন বিভিন্ন পত্রাদি ও লেখকের নিজের দিনপঞ্জীগুলির সাহায্যে তার বহুমুখী

কার্য্যধারা সম্বন্ধে কিছু স্বল্প পরিস্ফুট তথ্য নীচে উপস্থাপিত করা হল।

গোড়াতে, ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে নেতাজী ইয়োরোপ যাত্রার পটভূমিকা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা বোধহয় অবান্তর হবে না। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে শান্তনু দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়ে যাবার পর মহাত্মা গান্ধী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই সময় বোম্বাইতে মহাত্মা গান্ধীর সাথে দেখা করে ফিরে আসবার পথে ট্রেনেই বোম্বাই-এর অনতিদূরে নেতাজী কুখ্যাতি ভিন আইনে (Regulation III of 1818) এন্টার হন এবং তাঁকে প্রথমে জব্বলপুর এবং পরে মধ্যপ্রদেশের সেওনি জেলে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখা হয়। বন্দী হবার কিছুদিন পর থেকে তাঁর নানারকম ব্যাধি দেখা দেয় এবং শেগুলি ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করে। অতঃপর তাঁকে ক্রমাগত জব্বলপুর, মাদ্রাজ এবং অন্তান্ত জেল ও জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পর শেষ পর্য্যন্ত ১৯৩২ সালে অক্টোবর মাসে উক্তর প্রদেশের ভাওয়ালী স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠান হয়। কিন্তু সেখানেও তাঁর যথার্থ রোগ নির্ণয় হয়নি বা সেখানকার চিকিৎসায় আশারূপ ফল পাওয়া যায়নি। অবশেষে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার ৮নীরন্তন সরকার প্রমুখ আমাদের পারিবারিক চিকিৎসকদের অভিযত অনুযায়ী চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার জন্য তাঁকে ইয়োরোপে যেতে দিতে রাজী হয়। ঐ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে নেতাজীকে সেই সময় বিদেশযাত্রার জন্য যে ছাড়পত্র (পাসপোর্ট) দেওয়া হয়েছিল তাতে জার্মানী এবং পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশসমূহ, এমনকি ইংলণ্ড স্রমণও অস্বাধীন ছিলনা।

অতঃপর নেতাজী ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ সালে— 'লয়েড ট্রিয়েটিনো কোম্পানীর জাহাজ "S. S. Gange"তে বোম্বাই থেকে ইয়োরোপের পথে যাত্রা করেন। তিনি জাহাজে ওঠবার পর তাঁকে বন্দীদশা থেকে মুক্তির আদেশ

দেওয়া হয়। নেতাজী স্থির করেছিলেন যে তিনি ইতালীয় বন্দরে নেমে গোলা ভিয়েনায় যাবেন এবং সেখানে প্রখ্যাত চিকিৎসকদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। নেতাজী ৬ই মার্চ তারিখে ইটালির ভেনিস বন্দরে অবতরণ করেন। পূর্ব ব্যবস্থামত বর্তমান লেখক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জাহাজ বন্দরে ভেড়বার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ কোম্পানীর বড় গাহেব এসে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করেন। সংবাদ পাওয়া গেল যে রাজধানী রোমএর সরকারের উচ্চতম মহল থেকে আদেশ এসেছে নেতাজীর স্বাস্থ্যবিধার দিকে নজর রাখতে। 'কাষ্টমস্' এর ব্যক্তি থেকে তাঁকে রেহাই দেওয়া হল।

ভেনিসে ইটালীর সমস্ত মুখ্য সংবাদপত্রের যথা Popolo D'Italia, Popolo Di Roma, Observatore Romano প্রভৃতির প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নেতাজী বলেন যে তিনি প্রথমতঃ চিকিৎসা ও আরোগ্য লাভের জন্য ইয়োরোপে এসেছেন। কিন্তু তিনি যেখানে থাকুন বা যে অবস্থাতেই থাকুন ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্যে এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবী এবং তার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের মর্যাদা যাতে যথাযোগ্য স্বীকৃতি পায় এবং প্রয়োজনীয় কাজ করা যায় সে জন্য তিনি সদা সর্বদাই প্রস্তুত থাকবেন। ভেনিসে একদিনের জন্য বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন ট্রেনযোগে রওনা হয়ে ৮ই মার্চ তারিখে নেতাজী ভিয়েনায় পৌঁছান।

চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে ভিয়েনার খ্যাতি অগম্যাপ্ত। সেই সঙ্গে ভিয়েনার চিকিৎসকসমগৌর্য্য পারদর্শিতা অমূরুপ পর্য্যায় পড়ে। অন্তান্ত বছরের মত সেই সময় বহু ভারতীয় ছাত্র ভিয়েনায় চিকিৎসাবিজ্ঞান স্বাভিকোত্তর অধ্যয়নে রত বা বিভিন্ন হাসপাতালে নিযুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ করে ডাঃ শর্মা,

ডাঃ কটিয়ার ও ডাঃ গাইরোনা নেতাজীর সেবা ও তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রণী হয়েছিলেন। অল্পদিকে নেতাজীর ভিয়েনায় উপস্থিতির সংবাদ পাওয়া মাত্র সেখানকার স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলির প্রতিনিধিরা দলে দলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য আসতে লাগলেন। “রয়টার” সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানও তাঁর উপস্থিতি উপেক্ষা করতে পারেনি এবং তাঁদের তৎকালীন ভিয়েনার প্রতিনিধি স্কোফিল্ড, মাঝে মাঝে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। ২২দিকে ভিয়েনার Socialist Party-র নেতারা তাঁর সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতেন। পরে অল্পদলে, এমন কি Communist Partyর নেতারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

ভিয়েনায় পৌঁছাবার কয়েকদিনের মধ্যে নেতাজীকে ভিয়েনার কয়েকজন বিখ্যাত চিকিৎসকদের দ্বারা পরীক্ষা করান হয় এবং যথোপযুক্ত চিকিৎসা ও রোগের উপসর্গাদি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েকদিন পরে Sanatorium Dr Furth নামক স্বাস্থ্যনিবাসে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। সেইসময় নেতাজীর প্রধান উপসর্গ ছিল পেটে তীব্র ব্যথা, যেটা প্রায় সর্বক্ষণই লেগে থাকত। অধিকাংশ চিকিৎসকদের মতে তাঁর ব্যাধির মূল ছিল পেটে; ফুসফুস বা শ্বাসপ্রশ্বাস সংক্রান্ত কোনও বিপ্রজ্ঞনক রোগের লক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে পাওয়া যায়নি।

উপযুক্ত স্বাস্থ্য-নিবাসে নেতাজী স্থানান্তরিত হবার দু'এক দিনের মধ্যে ভিয়েনার বিখ্যাত সাহিত্যিক ও লেখক, Mr Rene Fuellep-Miller ও তাঁর পত্নী, Frau Heddy Fuellep-Miller তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করতে আসেন। শ্রীযুক্ত মিলার তাঁর দুইটি বই—“Lenin and Gandhi” এবং “Mind and Face of Bolshevism” লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রাথমিক সাক্ষাৎ ও আলাপের পর মিলার দম্পতি, বিশেষ করে শ্রীমতী

মিলার নেতাজীকে নিয়মিত দেখতে আসতেন এবং তার সুখ স্বাস্থ্যের জন্য যথাসাধ্য করতেন। ভিয়েনার সাহিত্যিক ও শিল্পী মহলে শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী মিলার এর বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল। তাছাড়া, তাঁরা অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রের ও ভিয়েনা প্রদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রায় সব ক'টি দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এবং তাঁদের পত্নী ও তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কতকাংশে প্রত্যক্ষভাবে এবং কতকাংশে পরোক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন। শ্রীমতী মিলার এবং পরে শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী ফেটার নামে অল্প আর একটা প্রভাবশালী দম্পতির সাহায্যে নেতাজীর সঙ্গে অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও প্রভাবশালী শীর্ষস্থানীয় নেতাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সহজ হয়ে গিয়েছিল।

ঐ সময়ে আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, নেতাজী জার্মান ভাষা ভালভাবে শেখবার মনস্থ করেন এবং রোগময় ও নানান কাজের মধ্যেও পূর্ণোচ্চমে ঐ ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে জার্মান ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি দোভাষীর সাহায্য না নিয়ে জার্মানভাষায় সরাসরি আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে পারতেন। এমন কি শুদ্ধ ও প্রাজ্ঞ ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে যেতে পারতেন। ১৯৩২-৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কয়েকবারই তিনি জার্মানীর বিভিন্ন জায়গায় জার্মান ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সেগুলি রেডিও মারফৎ শোনবার সুযোগও আমাদের হয়েছিল।

স্বাস্থ্যনিবাসে প্রায় দু'মাস থাকবার পর রোগের তীব্রতা কিঞ্চিৎ উপশম হবার সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী অন্য বাসস্থানে উঠে আসেন এবং জার্মানী যাবার ‘পাসপোর্ট’-এর জন্য স্থানীয় ‘ব্রিটিশ কন্সালেট’-এ দরখাস্ত করেন। লন্ডনে ‘ইণ্ডিয়া অফিস’-এর অফিসার নিয়মে প্রায় একমাস পরে ‘ব্রিটিশ কন্সালেট’ তাঁকে জার্মানী যাবার অফিসার দেয়। ‘যে’ মাসে ৬ ডিটলভাই প্যাটেল তাঁর আমেরিকা সফর শেষ করে

অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় ভিয়েনায় এসে পৌঁছান এবং চিকিৎসার জন্য একটা স্বাস্থ্য নিবাসে যেতে বাধ্য হন। জুন মাসে লণ্ডনে ভারতীয়রা সর্বজনীন রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচন করল নেতাজীকে। কিন্তু ঐ সময় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ইংলণ্ডে যাবার অনুমতি না দেওয়ার জন্য তিনি ইংলণ্ডে যেতে পারেন নি।

জুন মাসের শেষের দিকে নেতাজী চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী 'প্রাগ্'-এ যান এবং সেখান থেকে 'গিলসেন'-এ বিখ্যাত 'স্কোভা' কোম্পানীর কারখানা এবং কাঁচের কারখানা, ইত্যাদি পরিদর্শন করবার জন্য আমন্ত্রিত হন। চেকোস্লোভাকিয়ায় তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ-ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। 'প্রাগ্' সহরে ওখানকার মেয়র নিজে তাঁকে সতর্কতা জানান। চেকোস্লোভাকিয়া থেকে তিনি যান পোলাণ্ডের রাজধানী 'ওয়ারস'-তে। সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, প্রাচ্য বিজ্ঞান পণ্ডিত মণ্ডলী এবং জন্মান্তর সংস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। 'ওয়ারস' থেকে তিনি ১৭ই জুলাই, ১৯৩৩এ 'বার্লিন'-এ পৌঁছন। বার্লিন তথা জার্মানিতে সেই তাঁর প্রথম পদার্পণ।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে জার্মানিতে হিটলার ও তাঁর জাতীয় সমাজবাদী বা তথাকথিত National Socialist (বা সংক্ষেপে "Nazi") দল ক্ষমতায় আসীন হন। ক্ষমতা দখলের পরই ঐ দল অন্ধ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ (Chauvinism) প্রচার করতে থাকে। হিটলারের "আমার সংগ্রাম" (Mein Kampf) বই-এ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি নিদাশ্চর্য ছত্র ছিল এবং ১৯৩০ সালে 'নাজি' দলের অন্যতম নেতা এবং পরে অন্যতম মন্ত্রী ডঃ রোজেনবার্গ তাঁর এক পুস্তিকায় ভারতীয়দের সম্বন্ধে অপমানসূচক মন্তব্য করেন। নেতাজী স্বয়ং এবং জার্মানীস্থিত ভারতীয় ছাত্ররা ঐ ব্যাপারে অত্যন্ত বিফ্রু হন। নেতাজী বার্লিনে গিয়েই জার্মান সরকারের সর্বোচ্চ মহলে ঐ বিষয়ে কথাবার্তা বলে

প্রতিকারের চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই সময় ঐ ব্যাপারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়নি। বার্লিনে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ থাকবার পর নেতাজী ভিটলভাই প্যাটেলের অনুরোধে চেকোস্লোভাকিয়ার বিখ্যাত স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান, 'ফ্রান্সেন্সবাদ' (Franzensbad)-এ যান। শ্রী প্যাটেল সেই সময় ওখানে বাস করছিলেন। 'ফ্রান্সেন্সবাদ'-এ কয়েকদিন কাটিয়ে তিনি ও শ্রীপ্যাটেল ১লা সেপ্টেম্বর একত্র ভিয়েনার ফিরে যান।

ভিয়েনা থেকে ১৫ই জুন নেতাজী সুইটজারল্যান্ডে জেনিভায় যান। শ্রীপ্যাটেলও কয়েকদিন পূর্বে জেনিভায় রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। জেনিভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন International Committee for India. ১৯৩২ সালে ভারতের স্বাধীনতার দাবীর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ইয়োরোপের কয়েকজন প্রভাবশালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা মিলে ঐ কমিটি গঠন করেন এবং জেনিভায় তাঁদের প্রধান অফিস স্থাপন করেন। কমিটির সম্পাদিকা ছিলেন ম্যাডাম হরুপ নাম্নী ডেনমার্ক দেশের এক বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা। ঐ কমিটি কয়েক বছর ধরে জমাঘরে মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করতেন এবং তার মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে এবং বিশেষ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে আবশ্যকীয় সংবাদ পরিবেশিত হত। নেতাজী ঐ বুলেটিন প্রকাশ করার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান এই তিন ভাষায় বুলেটিন-এর সম্পাদনা ও তার বহল প্রচারে বিশেষ সাহায্য করেন। ভারতীয় সম্মেলন সম্বন্ধে নেতাজীর ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে জানা যায় যে "the India Conference on the 19th instant was a fair success and we had a crowded public meeting in the evening."। দুর্ভাগ্যবশত: শ্রীপ্যাটেল জেনিভায়

পৌঁছবার পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে জেনিভার নিকটবর্তী একটি বিশিষ্ট হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। ষাণ্মাস্য চিকিৎসা ও সেবাসুশ্রীসা করা সত্ত্বেও শ্রীপ্যাটেলের জীবনরক্ষা করা যায়নি এবং তিনি অক্টোবর মাসের শেষের দিকে জেনিভার নিকটবর্তী Gland এ মহাপ্রাণ করেন। শ্রীপ্যাটেলের শব নিয়ে নেতাজী ফ্রান্সের 'মার্সেলস' বন্দরে গিয়ে 'নারকুণ্ডা' জাহাজে পৌঁছে যান। ঐ জাহাজে ৯ই নভেম্বর বোম্বাই পৌঁছান এবং সেখানে শ্রীপ্যাটেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 'মার্সেলস' থেকে জেনিভার ফিরে নেতাজী সেখানে কিছুদিন বাস করেন এবং স্থানীয় চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি ফ্রান্সের 'রিভিয়েরা' জেলার 'নিস' (Nice) শহরে গিয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষাংশে পর্যন্ত বাস করেন।

ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে নেতাজী রোমে যান। সেখানে ইতালীয় সরকারের আমন্ত্রণে ইরোরোপ প্রবাসী ছাত্রদের একটি বিরাট সম্মেলন হয় এবং সেখানকার Oriental Institute এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ঐ একই সময়ে রোমে ইরোরোপস্থিত ভারতীয় ছাত্রদের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রোমে নেতাজী প্রায় পনেরো দিন ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে তাঁর ছ'বার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং ওখানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নেতৃস্থানীয় অসংখ্য ব্যক্তিদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা হয়েছিল। তাছাড়া, বিখ্যাত প্রাচ্য ও ভারতীয় শাস্ত্র মনীষী, অধ্যাপক তুচ্চির (Tucci) সঙ্গেও বৈশা ও কথাবার্তা হয়েছিল। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নেতাজী রোম থেকে জেনিভার ফিরে যান এবং সেখানে প্রায় দু'মাস বাস করেন এবং বলা বাহুল্য সেখানে থাকার সময় তিনি পুনরায় International Committee of Indiaর কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

ফাল্গুন ৩

জেনিভায় থাকার সময় নেতাজী ইরোরোপের শীতকালীন ক্রীড়া Skiing শিখা করেন।

ঐ সময়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ নেতাজীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে। ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) মাসে জেনিভা থেকে নেতাজী লেখককে এই মর্মে লেখেন, "ইন্ডিয়া আফিস না কি খুব চিন্তিত হয়েছে আমার সম্বন্ধে। তারা জানবার জন্য খুব উৎসুক আমার মতলব ও অভিসন্ধি সম্বন্ধে। রোমের সভার পর তাদের উৎসুক্য বেড়েছে।" ঐ সময়ে ইরোরোপের নানান জায়গায় ভারতীয় বাসিন্দা, বিশেষ করে ভারতীয় ছাত্রমহলের মধ্যে তারা চর সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে এবং কতকাংশে সফলকাম হয়।

মার্চ মাসের শেষের দিকে নেতাজী জেনিভা থেকে জার্মানীর মিউনিক শহরে আসেন এবং সেখান থেকে রাজধানী বার্লিনে যান। বার্লিন জার্মানীর রাজধানী হলেও 'নাজি' দলের প্রধান আশ্রয় (Head quarters) গোড়া থেকেই এবং তখনও, মিউনিকে ছিল 'নাজি' দলের প্রধান নেতৃবৃন্দ মিউনিকেই বাস করতেন। হিটলার নিজেও প্রতি সপ্তাহে মিউনিকে আসতেন। তাঁর বিশ্রাম স্থান Berchtesgaden মিউনিকের নিকটবর্তী ছিল।

'নাজি' দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও তার সঙ্গে ইহুদী ও অশেতাল জাতিদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ আন্দোলন শুরু হয়েছিল সে কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নেতাজীর উপদেশ অনুযায়ী মিউনিক, বার্লিন এবং জার্মানীর অসংখ্য শহর যেখানে ভারতীয় ছাত্রেরা অধ্যয়নরত ছিলেন সেই সমস্ত স্থানের ভারতীয় সমিতির পক্ষ থেকে জার্মানীর পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আরকলিপি পাঠিয়ে ঐ আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদ জানান হয় এবং দাবী করা হয় যেন দৈনিক সংবাদপত্র ও অসংখ্য পত্রিকায় ঘৃণা ও প্রেষণপূর্ণ প্রবন্ধাদি অচিরে বন্ধ

করা হয়। হিটলারের আত্মজীবনীতেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে মন্তব্য ছিল সেই বিষয়েও ঐ সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ জানান হয় এবং ঐ অংশ প্রত্যাখ্যান করে নেবার জন্ত দাবী করা হয়। নেতাজী কয়েকদিন পরে বার্লিনে পররাষ্ট্র দপ্তরে নিজে গিয়ে ঐ দাবী পেশ করেন। ঐ-সময় জার্মান সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র অর্থনৈতিক মন্ত্রী, ডঃ স্মিড্ (Dr. Schmidt) বার্লিনে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নেতাজী সব কথা বিস্তারিতভাবে বলেন। ডঃ স্মিড্ নেতাজীকে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি হিটলারের সঙ্গে সমস্ত বিষয়টি আলোচনা করে ভারতীয়দের অভিযোগগুলির যাতে প্রতিবিধান করা হয় তার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। ঐ ব্যাপারে জার্মানীস্থিত ভারতীয়দের প্রতিবাদ এবং পরে ভারতবর্ষের সংবাদপত্র ও অজ্ঞাত পত্রিকায় ঐ বিষয়ে আন্দোলন এবং সর্বোপরি নেতাজীর ব্যক্তিগত চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল।

মিউনিকে একজন অতি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে নেতাজীর বনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় হয় যেটা সেই সময় এবং পরবর্তীকালে তাঁর কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম অধ্যাপক ডঃ হাউসহোফার (Haushofer)। ইনি জার্মান সৈন্যবাহিনীর ভূতপূর্ব মেজর-জেনারেল এবং সেই সময়ে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বরাজনীতির অধ্যাপক ছিলেন। উপরন্তু, অধ্যাপক হাউসহোফার 'নাজি' দলের উচ্চতম মহলের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং ঐ দলের আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হিসাবে গণ্য হতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অধ্যাপক হাউসহোফার অনেকদিন জাপানে বাস করেছিলেন এবং সেখানকার সম্রাট পরিবারের সঙ্গে ঘৃণ্যবিদ্ভা ও রাজনীতির বিষয়ে উপদেশটি হিসাবে যুক্ত ছিলেন। হিটলার ও 'নাজি' দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগস্বাপন এবং আলাপ-আলোচনা করতে অধ্যাপক 'হাউসহোফার' এর সহায়তা খুবই কাজে লেগেছিল।

বার্লিন থেকে এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে নেতাজী ভিয়েনায় ফিরে যান এবং ঐ মাসের শেষের দিকে বিশেষ কার্যোপলক্ষে রোমে ঘুরে আসেন। মে মাসের মাঝামাঝি তিনি দু'সপ্তাহের জন্ত হাঙ্গেরী, রুম্যানিয়া, বুলগেরিয়া ও যুগোস্লাভিয়া পরিদর্শন করে পুনরায় ভিয়েনায় ফিরে আসেন এবং তারপর নভেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত সেখানে বাস করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই (Versailles) চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন এনেছে সেগুলি সরাসরি অমুদ্রাবন করা ছিল তাঁর হাঙ্গেরী, রুম্যানিয়া যুগোস্লাভিয়া ইত্যাদি দেশসমূহ ভ্রমণের উদ্দেশ্য। জুন মাসে নেতাজী ভিয়েনায় কয়েক মাসের জন্ত একটি 'ক্ল্যাট' ভাড়া নেন। সেই সময় বিহারের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী, শ্রীমহামায়া প্রদাণ সিংহ, চিকিৎসার জন্ত সেখানে গিয়েছিলেন। ইনি নেতাজীর আমন্ত্রণে তাঁর বাসার ওঠেন এবং সেখানে বেশ কিছুদিন বাস করেন। ১৯৩১-৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে বন্দী হয়ে জেলে বাস করার সময় শ্রীসিংহর কঠিনালীতে কঠিন ব্যাধি বেধা দেয় যার ফলে তাঁর বাকশক্তি লোপ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ সেই সময় নেতাজীকে শ্রীসিংহর পরিচয় দিয়ে তাঁকে শ্রীসিংহর চিকিৎসা ও পরিচর্যার বন্দোবস্ত করে দেবার জন্ত অমুরোধ জানান। নেতাজী শ্রীসিংহকে নিজের বাসার রেখে তাঁর চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেন। কয়েক মাস পরে শ্রীসিংহ আরোগ্যলাভ করে দেশে ফিরে যান।

ঐ সময় নেতাজী তাঁর "INDIAN STRUGGLE" বইটি লিখতে আরম্ভ করেন এবং অক্টোবর মাসে লেখা সম্পূর্ণ করে লণ্ডনে তাঁর প্রকাশক, WISHARTকে পাঠিয়ে দেন। ঐ সময় বইটির প্রতিলিপি নেবার জন্ত এবং পরে পাণ্ডুলিপি টাইপ করে দেবার জন্ত একজন উপযুক্ত, গুণশালী, ইংরেজী ভাষার অভিজ্ঞ এবং সর্বোপরি একজন সন্দেহমুক্ত ও অতিমাত্রায় বিশ্বাসী সেক্রেটারীর প্রয়োজন হয়। পুন্ড্রানুপুন্ড্র

অনুসন্ধান ও তদন্তের পর কুমারী এমিলি শেঙ্কল নামে এক মহিলাকে ঐ কাজের জন্ম পাওয়া যায়। কুমারী শেঙ্কল অপূর্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে এবং সবচেয়ে যেটা প্রয়োজনীয় ছিল, একান্ত গোপনীয়তার সঙ্গে, তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন। পরবর্তীকালে ১৯৩৫ সালে, ১৯৩৭ সালে এবং পুনরায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪১-৪৩ সালেও নেতাজী কুমারী শেঙ্কলকে তাঁর সেক্রেটারীর কাজে মনোনীত করেন।

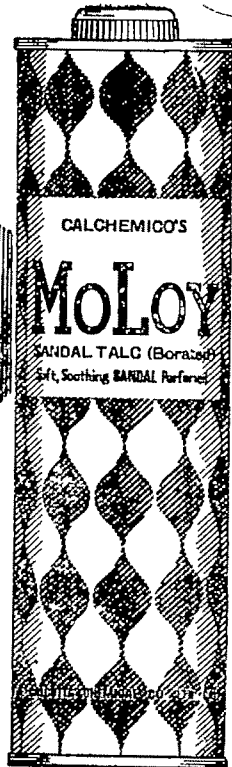
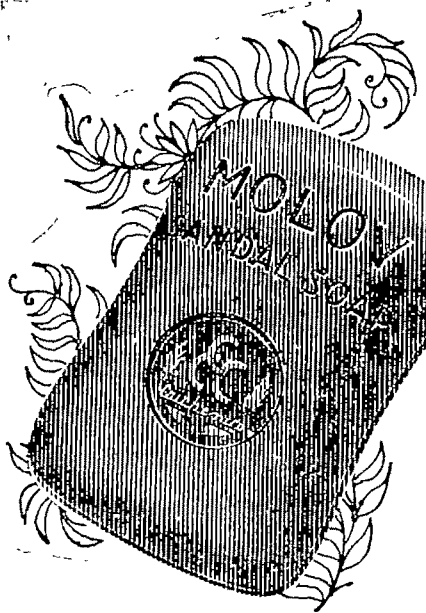
১৯৩৪ সালের মধ্যে চিকিৎসায় কোনও স্থায়ী সফল না পাওয়াতে নেতাজী নভেম্বর মাসে শল্য চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া স্থির করেন। কিন্তু ঐ সময় তাঁর কলকাতার বাড়ী থেকে পিতার গুরুতর অসুস্থতার সংবাদের সঙ্গে শল্য চিকিৎসা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখবার নির্দেশ পান। নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তিনি তাঁর কলকাতার বাড়ী থেকে তারবার্তা পান যে তাঁর পিতার অবস্থা সঙ্কটজনক এবং তিনি যেন তখনই বিমানযোগে গৃহে রওনা হন। ঐ বার্তা পেয়ে নেতাজী বিমানযোগে রওনা হন এবং ৩রা ডিসেম্বর

বিকালে কলকাতায় পৌঁছেন। [সেই সময় বিমানযাত্রা এখনকার মত দ্রুত ছিল না এবং বিমান চলাচল কেবল মাত্র দিনের বেলা হত]। গৃহে ফিরে তাঁর পিতা, জানকীনাথ বহুকে তিনি শেষ দেখা দেখতে পাননি। কারণ জানকীনাথ ২রা ডিসেম্বর অন্তিম প্রয়াণ করেন। কলকাতায় দয়দয় বিমান ঘাঁটিতে নামবার সঙ্গে সঙ্গে নেতাজীর উপর গৃহে অন্তরীণ থাকবার আদেশ জারি হয় এবং সেই অবস্থায় তিনি ৩৮/২, এলগিন রোডস্থ বাসভবনে অন্তরান থাকেন।

তাঁর পিতার শ্রাদ্ধাহিক্রিয়া শেষ হয়ে যাবার পর ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে নেতাজী পুনরায় ইয়োরোপে ফিরে যান এবং তার পর সেখানে এক বছরের উপর অবস্থান করেন। ঐ সময় তাঁর সকল চিন্তা ও সকল কর্মের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা। তিনি উত্তরকালের কর্মক্ষেত্রের ভিত্তি এই সময় শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে স্থাপিত করেছিলেন।

মলয়
স্যাণ্ডাল সোপ
ও
মলয়
স্যাণ্ডাল ট্যাল্ক

দুয়ে ঘিলে
আপনাকে সারাদিন
চক্ষন সৌরভে
ভরপুর রাখবে



মলয় স্যাণ্ডাল সোপের মনমাতানো
দীর্ঘস্থায়ী চন্দন-গন্ধ এখন মলয় স্যাণ্ডাল
ট্যাল্কেও পাবেন। এই চন্দন-স্বরভিত
সাবান ও পাউডার—দুয়ে ঘিলে
আপনাকে আরো রমণীয়, কমণীয় করে
তুলবে। মলয় স্যাণ্ডাল সোপের
স্নিগ্ধ ফেনার স্পর্শে সব অবসাদ দূর হয়ে
আপনি সতেজ হয়ে উঠবেন, আপনার
গায়ের রঙ স্নিগ্ধ উজ্জল হয়ে উঠবে।
মলয় স্যাণ্ডাল সোপ মেখে স্নান সেরে
সারাদিহে মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্ক
ছড়িয়ে দিন—দেখবেন দিন ভর কত
স্বরস্বরে ও হাস্য বোধ করেন।
মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্কের চন্দন-সৌরভ
প্রথর গ্রীষ্মের বর্ষাক্ত মুহূর্তগুলিতেও
আপনাকে ঘিরে থাকবে।

দি ক্যালকাটা
কেমিক্যাল কোং
লিমিটেডের তৈরী

পরামনোবিজ্ঞান

৩

ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব

অধ্যাপক মোহিতকুমার রায়

একদিন সকালে এক ভদ্রমহিলা তখন খাবার খাচ্ছিলেন। হঠাৎ কি হোল হাতের ছুরিকাটা ফেলে দিয়ে অসহায় আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁর প্রেমিক একজন ইঞ্জিনিয়ার, নাকি গভীর সমুদ্রে ভয়ানক বিপদে পড়েছেন। যে কোন মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার আশঙ্কা। বিশ্রান্ত মহিলা ছুটে গিয়ে রেডিওটা খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর ভেসে এলো বিস্তীর্ণ সমুদ্রের বুকে এক জাহাজের অভ্যন্তরস্থ বিস্ফোরক পদার্থগুলো হঠাৎ অগোছালো হয়ে গেছে, যে কোন সময়ে বিস্ফোরন ঘটে সমস্ত জাহাজটা একেবারে চূড়ম্বার হয়ে যেতে পারে। একটু পরেই আবার খবর এলো অনেক কষ্টে বিস্ফোরক পদার্থগুলিকে যথাস্থানে সযত্নে সংরক্ষিত করা হয়েছে আর জাহাজটিও বেঁচে গেছে। কোনমতে! ভদ্রমহিলা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না এ সাংঘাতিক বিপদের খবর তিনি কেমন করে পেলেন।

এক ভদ্রমহিলা রান্না করতে হঠাৎ কান্না জুড়লেন আমার বাবা মারা গেলেন, আমি তাঁকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখলুম। পরিবারের সকলে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন যে তিনি নিছক কল্পনা করে অকারণ কষ্ট পাচ্ছেন। সকলে তখনও বোঝাচ্ছে, এমন সময় ভদ্রমহিলার বাপের বাড়ী থেকে একটা টেলিগ্রাম এলো—তাঁর বাবা চেয়ারে বসা অবস্থায়ই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত হয়েছেন।

আর এক ভদ্রমহিলা—স্বপ্ন দেখলেন তাঁর চারটি ছেলে সাতার কাটতে গেছে, নব্বইয়েরটি লাল জামা পরে। হঠাৎ যেন ছেলেগুলি একটা স্রোতে পড়ে গেছে। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মা তখন অনেক কষ্টে ছেলেগুলিকে টেনে তুললেন। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর নব্বইয়ের টুকটুক লাল জামা পরা ছেলেটিকে কিছুতেই যেন তুলতে পারলেন না। হুচ্চিস্তার তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। আর কি আশ্চর্য্য এই স্বপ্নের করেক সপ্তাহ পরেই সেই ছেলেটি এক স্রোতের টানে পড়ে প্রাণ হারায়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় ছেলেটির নিজের কোন লাল জামা না থাকা সত্ত্বেও সে তার দাদার একটা লাল জামা পরে চান করতে গিয়েছিল।

এই ত সেদিন কলকাতায় বেড়াতে এসে এক আপাত-স্বপ্ন স্বপ্ন ভদ্রলোক পথ চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তার বসে পড়লেন এবং মারা গেলেন। খোঁজ খবর করে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখা গেল সেখানে একটা টেলিগ্রাম এসে রয়েছে যাতে তাঁর জী এঁর শরীর সযত্নে ভয়ানক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কেমন করে এই হতভাগিণী জী তাঁর স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর আভাস পেলেন?

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ এইচ এন. ব্যানার্জীর তত্ত্বাবধানে পরামনোবিজ্ঞান বিভাগে সংগৃহীত সহস্রাধিক

ঘটনা বিবরণীর থেকেই ওপরের কয়েকটি ঘটনা নেয়া হল। এইসব অদ্ভুত রহস্যময় ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা কোথায় খুঁজব? এমন কি হতে পারে যে এই—মা যার একটি সন্তান সলিলসমাধি লাভ করল তাঁর কাছে এমন কোন রহস্যে ঘেরা পথ ধরে ভাবী ঘটনার খবর এসেছিল, যার সম্বন্ধে তাঁর চোখ, কান, নাক ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয় একেবারেই কিছু জানত না অর্থাৎ সংক্ষেপে এ ধরনের ঘটনাগুলোকে ইন্দ্রিয়াতীত অমুভব বা ESP বলে ব্যাখ্যা করতে পারি কি? তার মানে কিন্তু এই নয় যে যেকোন আপাত-ব্যাখ্যাহীন ঘটনাকেই ESP বলে ব্যাখ্যা করতে হবে বা ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ ESP অভিজ্ঞতার একটি প্রয়োজনীয় সর্ত হল খবরটাকে বাস্তবে রূপান্তরিত হতে হবে। আর তার চেয়েও বড় কথা হল খবরটা কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বা স্মৃতি, অনুমান, যুক্তি ইত্যাদি কোন মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও আসবে না। তাহলে আসে কি করে? কেমন করে এক ভদ্রমহিলা ভবিষ্যতের গর্তে তার সন্তানের মৃত্যু দর্শন করলেন এবং কেমন ভাবে সে মৃত্যু ঘটবে তাও দেখলেন? এর কোন পুরো উত্তর নেই—কারণ মানব মনের প্রকৃতি, তার গতিবিধি তার ক্রিয়াকলাপ এই সবই বিজ্ঞানের কাছে আজও গভীর রহস্যে আচ্ছন্ন। কিন্তু এখনও অস্বীকৃত এক মানসিক ক্ষমতার অস্তিত্ব, থাকে Psi বলি তা মেনে নিলে এ-সব ঘটনার কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। Psi এর অল্পশীলন এবং মানব মনের যে সব গোপনপথে ইন্দ্রিয়াতীত অমুভবের আনাগোনা—তার বৈজ্ঞানিক রীতিনির্ভর গবেষণার নামই Parapsychology বা পরামনোবিজ্ঞান।

টেলিপ্যাথি (দূর থেকে অস্ত্রের মনের খবর পাওয়া) এবং clairvoyance (বা স্বচ্ছন্দ দূরদর্শন)—এ দুইই Psi এর বাহ্যিক প্রকাশ। telepathyতে খবরটা আসে অস্ত্রের চিন্তা থেকে। আর clairvoyance এ আসে ঘটনা

বা বস্তু থেকে। আর এক ধরনের ESP (Extra Sensory Perception) যাতে ভবিষ্যত ঘটনা সম্বন্ধে মানুষ নিশ্চিত পূর্বাভাস পায় তার নাম Precognition বা পূর্বজ্ঞান। বেশীরভাগ Psi ব্যাপারগুলো এই তিনধরনের কোন না কোন একটা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে এক গ্রীষ্মের বিকেলে একটি মেয়ে খুশীতে উজ্জল হয়ে বাড়ী ফিরছিল, আর ভাবছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তার যে নাচের প্রোগ্রাম আছে তার কথা। হঠাৎ কি একটা অজানা বিপদের আশঙ্কায় তার সব আনন্দ এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। বাড়ী এসে দেখে তার বন্ধুরা সব তারই অজ্ঞে অপেক্ষা করেছে সবাই মিলে একসঙ্গে নাচের প্রোগ্রামে যাবে। “আমার ছোট বোনও নাচবার জন্তে বেরুছিল, আমি ভর্যার চিংকার করে তাকে বজ্রলম্ব বোনটি ওই গাড়ীটাতে তুমি চোড়না, না কিছুতেই না, এইটাতে চড়ো। কিন্তু তারা আমার কথা শুনল না, কারণ গাড়ীটা নতুন কিন্তু জোরে চলত না। রাত্রি প্রায় আড়াইটের সময় গাড়ী রুঘটনার আমার ছোটবোন মারা গেল।

ESP বা ইন্দ্রিয়াতীত অমুভব অনেক সময় স্বপ্নের (নিদ্রিত বা জাগর) পথ ধরে আসে। অমুভাবী অমুকোন ব্যক্তিকে, যে হয়ত অনেক দূরেই রয়েছে, তাকে দেখতে পার এবং কথাও শুনতে পেরে থাকে।

একটি মেয়ে তার প্রিয়ানন্দকে বিয়ে করার জন্তে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলো। তিন সপ্তাহ পরে এই দুই প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে এক তুমুল ঝগড়া হয়ে যায়, যার ফলে শেষ-পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

“সে সময়টা আমার ভেতর একটা কামা গুমরে উঠত—

‘মা যাগো আমি কি করব, আমি কি করি বল না’। তবুও আমি ঠিক করলাম যা ঘটে গেছে সে সব জানিয়ে মাকে আর বিব্রত করবোনা। তার চারদিন পর মার কাছ থেকে একটা চিঠি এলো। তোমার কি কোন বিপদ হয়েছে বাছা? একুণি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি পরিষ্কার স্তনতে পেলাম, তুমি কাঁদছ আর বলছ মা যাগো আমি কি করব? মিলিয়ে দেখলাম মা চিঠিটা লিখেছেন সেইদিনই যেদিন আমি ভয়ানক কঁদেছিলাম।

স্বচ্ছন্দ ভবিষ্যত দর্শনের অভিজ্ঞতার কথাও টেলিগ্যাথির অভিজ্ঞতার মতই ঐরাই শোনা যায়। অনেক সময় এ ধরনের ক্ষমতার সাহায্যেই লোকে হারান জিনিষ পেয়ে থাকে।

এক ভদ্রমহিলা একদিন খাবারের থালা বাসন ধোবার সময় তাঁর আংটিগুলো খুলে মিটসেফে রেখে ছিলেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন তাঁর আংটিগুলোর কথা মনে পড়লো তখন গিয়ে সেইগুলোকে মিটসেফের ওপর পেলেন না, তিনি এবং তার স্বামী দুজনেই অনেক খুঁজলেন, প্রথমে রান্নাঘরে ও পরে সারাবাড়ী। হঠাৎ ভদ্রমহিলা রেফ্রি-জারেটারের কাছে চলে গেলেন এবং অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে একটা বরফের ট্রের ভেতর থেকে আংটি-গুলোকে উদ্ধার করলেন। আসলে তাঁর স্বামী মিটসেফের ওপর থেকে একটা গ্লাস আনতে গিয়ে ওগুলো কাঁট দিয়ে ফেলে দেন নিজের অজান্তেই। এবং আংটিগুলো সোজা ট্রের মধ্যে গিয়েই পড়ে। ‘আমি জানিনা কেন আমি হঠাৎ ঐ ট্রেটাই খুঁজতে গেলুম। চোখের সামনে দেখলাম বেন ওগুলো ট্রের বরফের মধ্যে অড়োপড়ো হয়ে রয়েছে।’

এক ভদ্রমহিলা বাজারে বেরুনের আগে তাঁর দুবছরের

মেয়েটিকে স্বামীর জিন্মায় রেখে গেলেন। ভদ্রমহিলা লিখেছেন—‘আমি তখন প্রায় সপ্তাহে পৌঁছে গেছি। এমন সময় হঠাৎ মনে হ’ল আমার একুণি বাড়ী যাওয়া দরকার। এক দুর্ঘটনার ভয় আমার পেয়ে বসল। আমি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী চলে এলাম। এসে দেখি আমার স্বামী মেয়েটিকে নিয়ে সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর গ্যাসে গোটা বাড়ী ভর্তি হতে চলেছে। আমার স্বামী যখন ঘুমিয়েছিলেন তখন মেয়েটা স্টোভ নিয়ে খেলা করতে করতে গ্যাসের সব কটা মুখ খুলে দেয়, তারপর সোফায় উঠে তার বাবার পাশে ঘুমিয়ে পড়ে।’

Pai এর সঠিক প্রকৃতি বাই হ’ক না কেন, নিঃসন্দেহে দূরত্ব প্রভাবমুক্ত অর্থাৎ অমুভাবীর থেকে যতদূরেই ঘটনাটা ঘটুক না কেন—তা পানের ঘরেই হোক আর পৃথিবীর অন্তপ্রান্তেই হোক তাতে অমুভবের তারতম্য হয় না। Precognition বা নিশ্চিত পূর্বাভাবের থেকেও তেমনি দেখি মানব মন সময় নিরপেক্ষ। যে ঘটনাটা ঘটবে বলে মন নিশ্চিত হল তা ঘটতে পারে একেবারে নিকটতম ভবিষ্যতে বা দূরতর ভাবিকালে। রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামনোবিজ্ঞান বিভাগের সংগৃহীত বিবরণগুলো থেকে মনে হয় অনেক আপাত-সাধারণ মামুযও সময়ে সময়ে ভবিষ্যত দেখতে পার।

J S P ঘটনার সঙ্গে অনেক সময় প্রবণ ও দর্শন দুইই জড়িয়ে থাকে। নিউইয়র্কে মার্চ মাসে ১৪ তারিখের রাত্রি ঠিক তিনটের সময় এক ভদ্র মহিলা হঠাৎ ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে বসলেন। ইতালী থেকে তাঁর বাবা তাঁকে ডাকছেন : ম্যারিয়া ম্যারিয়া। শৈশবের পর ম্যারিয়া তাঁর বাবাকে আর দেখেনি। তবুও হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে জানলা দিয়ে দেখলেন বাইরেই তাঁর বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ‘বাবা বলে ডেকে উঠতেই ছায়া মিলিয়ে

গেল। পরিবারের সকলে অবস্থাসের সঙ্গে এই “গল্প” তুললেন কিন্তু তিনদিন পরেই ইতালী থেকে একটা কেবল-গ্রাম এলো, ম্যারিয়ার বাবা ১৪ই মার্চ মারা গেছেন নিউইয়র্কে যখন ভোর রাত্রি তিনটে। কোন কোন ইন্ডিয়াতীত অনুভবে গন্ধও পাওয়া যায়।

এক ভদ্রমহিলার রাত্রি ছুটোর সময় ঘোঁরার গন্ধে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। তিনি ষ্টোভ, হিটার ইত্যাদি রান্নাঘরের যাবতীয় সরঞ্জাম খুব ভাল করে দেখলেন। না—সবই ত ঠিক রয়েছে। “হঠাৎ আমার মনে হল, কেমন করে জানি না, আমাদের গুদামে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্র-মহিলা গাড়ী নিয়ে নাইল দূর পৌঁছে গুদাম ঘরে গিয়ে হাজির। সেখানে দেখেন, ঘোঁরায় সমস্ত জায়গাটা ভরে গেছে। পেছন দিককার একটা ঘরে আমার স্বামী অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছেন।” ইন্ডিয়াতীত অনুভব সংক্রান্ত অভিজ্ঞতায় যদি ট্র্যাজেডি বা প্রায় ট্র্যাজেডিমূলক ঘটনাই বেশী পাওয়া যায় তাহলে তার জন্ত দায়ী বোধ হয় ‘ESP’ র প্রকৃতি নয় বরঞ্চ দায়ী করা যেতে পারে বোধ হয় মানব মনের প্রকৃতিকে। মানুষ তার জীবনের আনন্দিত মুহূর্তগুলোকে অত্যন্ত সহজে গ্রহণ করে কিন্তু গভীরভাবে দাগ রেখে যায় তার মনে জীবনের দুঃখের দিনগুলো—প্রিয়জনের ব্যথা। যুগ যুগ ধরে মানুষ এ ধরনের ঘটনার সামিথে এসেছে।

প্রায় সব ধর্মেরই এ ধরনের ঘটনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু যেহেতু আগে এ সব ঘটনার কথা মাঝে মাঝে শোনা যেত কিন্তু পারিপার্শ্বিককে পরীক্ষা করা সম্ভব হতনা তাই বিজ্ঞানীরা এগুলোকে স্বভাবতঃই সন্দেহের চোখে দেখতেন।

১৮৮২ সালে ইংল্যান্ডে কিছুলোক Psi, সংক্রান্ত সংস্থা (Society for Psychical Research) প্রতিষ্ঠা করলেন।

উদ্দেশ্য ইন্ডিয়াতীত অনুভব সংক্রান্ত অনেক ঘটনা জোগাড় করে Psi এর প্রকৃতি নির্ধারণের জন্ত একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করবেন। তার তিন বছর পর আমেরিকাতে American Society for Psychical Research তৈরী হল। এখানেই পরামনোবিজ্ঞানের জন্ম।

১৯৬৪ সালে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়েও পরামনোবিজ্ঞানের একটা বিভাগ খোলা হয়। এর পরিচালনা করছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরামনোবৈজ্ঞানিক ডাঃ এইচ. এন. ব্যানার্জী। পৃথিবীর বহু জায়গা থেকে সহস্রাধিক সম্ভাব্য ইন্ডিয়াতীত অনুভবের বিবরণী ইনি জোগাড় করে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হয়েছেন।

এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে ESP ঘটনায়—জাতির কোন ভূমিকা নেই। আগে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, স্কচ, আইরিশ এবং বেঙ্গলীরা ইন্ডিয়াতীত অনুভবে সক্ষম। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ESP মোটেই বিশেষ কোন বা কয়েকটি জাতির মধ্যে সীমিত নেই। এও দেখা গেছে পুরুষ নারী উভয়েরই ইন্ডিয়াতীত অনুভব হতে পারে এবং অনুভবে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকে না। যদিও মেয়েদের মধ্যেই ESP সচরাচর দেখা যায়। Psi সংক্রান্ত ব্যাপারে বুদ্ধিরও কোন ভূমিকা নেই। যদিও বহিঃমুখী অনুভাবীর অনুভবের তীব্রতা সাধারণত অন্তঃমুখী ব্যক্তির অনুভবের তীব্রতার চেয়ে সাগাঙ্ঘ কিছু বেশী, মনে হয় যে কোন ব্যক্তিরই Psi সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে দূরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে ভাবীকাল সম্বন্ধে কেমন করে Psi কে নিয়ন্ত্রণ এবং উপযুক্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। এ এক বিরাট বিজ্ঞানী ভূমি। অমিত সম্ভাবনাময়। হয়তো দীর্ঘ এবং একাগ্রচিত্ত বৈজ্ঞানিক অমূল্যলন অদূর ভবিষ্যতেই কোনদিন ESP র সম্পূর্ণ স্বরূপ আবিষ্কার করবে। আমরা সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় রইলুম।

মুক্তি কোন পথে ?

শশধর সিংহ

Nel mezzo del cammin di nostra vita.....

জীবনের মাঝপথ থেকে.....

আনতোল ফ্রান্স তাঁর আত্মজীবনীমূলক আধ্যাত্মিক—
Livres de Mon Ami (লিভ্র ড় মনামি) স্মৃতিপাত
করেছেন দাঁতের Divine Comedy থেকে উপরের ছত্রটি
তুলে ।

গার্সা সঙ্ঘায় এই লাইনটি তাঁর মাথায় ক্রমাগত ঘুরপাক
খাচ্ছিল । আর রাতে যখন তিনি আঙনের সামনে বসে
চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন চকিতে তাঁর মনে হল, এই কথাগুলি
যেন তাঁরই জীবনের কথা । অনেক রাত পর্যন্ত শান্তির
পরিবেশে বসে, বাগ্যকাল হাতে কত কথা তাঁর মনে পড়তে
লাগল । নিঃস্বপ্নরাতে প্রেতাঙ্গাদের বার হবার সময়, কারণ,
তার অঙ্গকারের জীব এবং স্বভাবতঃই ভীত, একটু
সাড়া পেলেই পালিয়ে যেতে চায় (qui sont timides et
fuyants par nature) নিভৃত রাতে এরা ভিড় করে
আসে, জীবিত বন্ধুদের সাথে কানে কানে কথা কহিতে ।

আমার জীবনের এটা মাঝপথ নয়, আমি শেষ জীবনে
এসে পৌঁছেছি । অতীত জীবনের অনেক স্মৃতি আমার কাছেও
ভেসে আসে এবং আমি যখন একাকী ঘরে বসে থাকি বা
অঙ্গকারে বিছানায় শুয়ে থাকি, প্রেতাঙ্গারা আমার সঙ্গেও
ফিস ফিস করে কথা কহিতে আসে । কিন্তু আমি সাহিত্যিক
নই বলে, নিজের জীবন নিয়ে উপভাস রচনা করার ক্ষমতা
আমার নাই । সেই হেতু, কতিপয় বিষয় আলোচনা করেই
দ্রুতের স্বাদ ঘোলে যেটাতে হবে ।

ফাল্গুন ৪

আগেই বলে রাখা দরকার যে, আত্মজীবনী লেখার
আত্মস্মৃতি আমার নাই, আর কেইবা এই অকিঞ্চিৎকর
জীবনের বিষয় জানতে চাইবে ?

তাই আজ এমন সব কথা নিয়ে আলোচনা করব, যা
আমার সমসাময়িক ভারতবাসী সবাইকে অল্পবিস্তর ছুঁয়ে
গেছে, আর যার প্রতিক্রিয়া বর্তমানকালে ভবিষ্যৎবংশীয়েরাও
অনুভব করছে ।

কেবলি ভাবি, আমাদের কি হল ও কি হতে পারত ?
চিরদিন দুঃখ নিয়ে যাবে যে, জীবদ্দশায় ভারতের স্বাধীন দেখে
যেতে পারলাম না । ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা এ যাবৎ
এল না ।

ভারতবাসীদের মধ্যে একমাত্র রামমোহন রায় প্রথম
থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, আমাদেরকে সামাজিক,
রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক অচলতা থেকে উদ্ধৃত করতে হলে,
যা প্রধানতঃ প্রয়োজন, তা হচ্ছে রেনেসাঁ (renaissance),
অর্থাৎ মনের মুক্তি, বিজ্ঞান, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক
জ্ঞানের প্রসারণ, যদিও সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসংস্কারের
প্রয়োজনীয়তাও তিনি অস্বীকার করতেন না । এই ভাবে
আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হল । ১৮২৮
খৃষ্টাব্দে তাঁর এক ইংরেজ বন্ধুকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন,
তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা । তিনি
লিখেছিলেন, “Supposing that some 100 years
hence, the Native character becomes elevated
from constant intercourse with European, and

the acquirements of general and political knowledge as well as of modern arts and sciences, is it possible that they (i.e. Indians) will not have the spirit as well as the inclination to resist any unjust and oppressive measures serving to degrade them in the scale of society?"

এই বিবর্তন যুরোপীয় অগ্রগতি থেকেই বোঝা যায়। বস্তুতঃ, আধুনিক যুরোপকে সম্যকভাবে জানতে ও বুঝতে হলে এবং সর্ব বিষয়ে ইহার অসাধারণ প্রগতি, প্রভাব ও সক্রিয়তা উপলব্ধি করতে হলে, যুরোপীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসের সঙ্গে সকলের পরিচিত হওয়া কর্তব্য। এই যুগ হতে, যুরোপ বহিমুখী হল, ইহার সংহতি স্ফূট হল, এমন কি যুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদেরও স্রষ্টা হল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে, তুর্কীরা কন্স্টেন্টিনোপল দখল করার পর থেকে, যুরোপে এক নবযুগের সূচনা হল। গ্রীসের ঐতিহ্য, পশ্চিম যুরোপে ছড়িয়ে পড়ল এবং এই যুগের, অর্থাৎ রেনেসাঁসের প্রভাব যারা অনুভব করলেন, তাদের মধ্যে অনেকে ধর্মসংস্কারেও অগ্রণী হলেন। বোম্বার্ডার চার্চের প্রভাব এইভাবে ব্যাহত হল এবং প্রটেস্ট্যান্ট যুরোপের উত্থান ঘটল।

এই সম্পর্কে ফ্রান্সের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। বাহ্যতঃ, ঐদেশ যদিও ক্যাথলিক রম্মে গেল, ফ্রান্সের অতুলনীয় মানবিক অবদান হল মূলতঃ বেনেসাঁস প্রসূত মনের মুক্তি। ফরাসীরা ধর্মকে পোষাকীভাবে গ্রহণ করেছে মাত্র। ভলট্যার, রুসো প্রভৃতি ফরাসী মনীষী, ধর্মে অবিশ্বাসী ছিলেন এবং এঁরাই হলেন ফরাসী বিপ্লবের অনুপ্রেরণা।

সেইজন্ম, রামমোহন রায় মনের মুক্তির উপর এত জোড় দিয়েছিলেন। আমার মতে, ধর্ম তাঁর পরিকল্পনায় গৌণস্থান অধিকার করেছিল মাত্র।

পরবর্তী যুগে, প্রথম যুগের কংগ্রেস নেতারা, তাঁরই

আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এঁরা অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষিত নেতারা তাঁরই মানসপুত্র ছিলেন। এই বিষয়ে, আমি আমার রচিত "Indian Independence in Perspective" পুস্তকে লিখেছিলাম, "Thus, although our nineteenth century forbears were proud of their country's past, they had resolutely set their hearts on recreating India in the image of the modern, just as the Japanese pioneers had done for their country, confronted as they had been with a challenge no less deadly than the one we were facing in India in the same period."

মহাত্মা গান্ধীও এই ঐতিহ্যের অধিকারী ছিলেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শেষ পর্যন্ত যদি তিনি এই অধিকারকে অনুসরণ করে যেতে পারতেন, তা হলে আমাদের জাতীয় রাজনীতি এত নিষ্ফল হত না। দেশকে বিভক্ত করার কোন প্রয়োজন হত না, হিন্দু-মুসলমান বিরোধের একটা সুসঙ্গত সমাধান পাওয়া যেত এবং ভারতবর্ষে এত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থায়িত্ব ও উচ্ছৃঙ্খলার উদ্বেগ হত না।

কিন্তু আমাদের জাতীয় স্বর্তাগ্য এই যে, জগদ্বন্দ্ব হবার উগ্র অভিলাষ তাঁকে পথভ্রষ্ট করেছে। বস্তুতঃ, তিনি কখনও প্রকৃত রাজনৈতিক নেতা হয়ে উঠতে পারেননি এবং এই ব্যর্থতাই তাঁর রাজনৈতিক অকৃতকার্যতার মূল কারণ। নিজের সম্বন্ধে তিনি এক আয়গার লিখেছেন, "Most religious men I have met are politicians in disguise. I, however, who wear the guise of a politician, am at heart a religious man."

ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় করার চেষ্টা অসফল হওয়া অনিবার্য কারণ, এই দুই পন্থা পরস্পর বিরোধী। এদের লক্ষ্য হল ভিন্ন—একটা ভূমার সন্ধানের প্রচেষ্টা ও অন্বেষণের প্রধান

উপাদান হল দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ। বলা বাহুল্য, এই দুই পথের মিলন সম্ভব নয়।

গান্ধীর বহুবিধ অমূল্য গুণ থাক। সত্ত্বেও, তাঁর মানসিক ক্ষমতা ছিল সীমিত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, তাঁর আদর্শ ছিল অতি সঙ্কীর্ণ। যথার্থতঃ, তিনি কখনও চাননি যে, ভাবত জ্ঞান, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অন্তর্দেশের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক। তিনি ধর্ম্মে ছিলেন রক্ষণশীল ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি লিখেছেন, “I call myself a Sanatanist Hindu, because (i) I believe in the Vedas, the Upanishads, the Puranas and all that goes by the name Hindu scriptures, and therefore in avatars and rebirth; (ii) I believe in the Varnashram Dharma in a sense in my opinion strictly Vedic, but not in its popular and crude sense; (iii) I believe in the protection of the cow in its much larger sense than the popular; (iv) I do not believe in idol worship.”

তিনি আরো বলেছেন, “India’s salvation consists in unlearning what she has learnt during the last fifty years. The railways, telegraphs, hospitals, lawyers, doctors and such like have all to go; and the so called upper classes have to learn consciously, religiously and deliberately the simple peasant life, knowing it to be a life giving true happiness, etc.”

আমার বিবেচনায় বর্তমান ভারতবর্ষ তাঁর ক্ষুদ্র মনোভাব ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী উত্তরাধিকার স্বত্বে পেয়েছে এবং এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী চিরদিনের জন্য আমাদের সামাজিক অগ্রগতির পরিপন্থী হয়ে থাকবে। এই স্বত্বে, আমি আমার

উপরোক্ত পুস্তক, এই বলে স্মরণ করেছিলাম, “Here lies the essential tragedy. His fatal weakness as I see it, lay in his minimal vision for India. It never became the full-blooded emblem of a rounded life as behoves a modern people, wanting to claim its rightful place among the free, intellectually alert and materially advancing peoples of the world.”

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, বাঙলা দেশের পক্ষে অসহযোগ আন্দোলন একটা সর্বনাশা আন্দোলন হয়েছে এবং বর্তমান পরিস্থিতি তারই প্রতিকলন। সুতরাং, বাঙলা দেশ কেবল যে বিভক্ত হয়েছে তা নয়, এই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব চিরকালের জন্য বিপর্যস্ত হয়েছে। চতুর্দিকের উচ্ছৃঙ্খলা, এরই একটা কুফল।

যুব সম্প্রদায় ও শ্রমিকদের দোষ দিয়ে লাভ নাই। কারণ, এখনকার চাকল্য, মহাশ্মা ও তাঁর অমুচরবৃন্দেরই অবদান। এই সম্পর্কে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে আমি যা লিখেছিলাম, তার সঙ্গে দেশবাসী অনেকেই হয়ত আমার সঙ্গে একমত হবেন। আমার প্রণীত “Social Thinking of Rabindranath Tagore” পুস্তকে তখন বলেছিলাম, “Notwithstanding the Mahatma’s non-violent teachings and example, violence has not been exorcised from India’s social life and body-politic, Indian freedom was born in violence and its persistence to-date is too potent a fact -to be brushed aside as of no significance. It lies close to the surface, ready to erupt at the slightest encouragement. Instances can be multiplied. The masses taught to defy authority during the Non-co-operation move-

ment, grew up with no positive ideal, except that of defiance and direct action—an unmistakable aftermath of the almost exclusive emphasis on the 'non'. The 'parasitic' tendency to which the poet had referred is now coming home to roost. Hatred of the foreigner instead of the positive love of the country was the dominant note. People then became for the first time conscious of their 'brute' strength and they will not easily give up the habit of getting something for nothing by threat of violence and resort to force if necessary. This can be the only satisfactory explanation of the temper of violence that is the ruling passion of the country."

মহাত্মা গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও পদ্ধতির জন্ম বাঙলা দেশের কাছে অনেকভাবে ঋণী ছিলেন। তিনি তাঁর হিন্দু স্বরাজ পুস্তকে লিখেছেন, "yet the real awakening took place after the Partition of Bengal. For this we have to be thankful to Lord Curzon At that time of the Partition the people of Bengal reasoned with Lord Curzon, but in the pride of power he disregarded all their prayers. He took it for granted that Indians would only prattle, that they would never take any effective steps. He used insulting language, and in the teeth of opposition Partitioned Bengal. That may be considered to be the day of the Partition of the British Empire. The shock the British

power received through the Partition has never been equalled by any other act."

বলা বাহুল্য, স্বদেশী আন্দোলনই হল সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে, অসহযোগ আন্দোলনের মহড়া।

তথাপি, একথাটা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, তিনি বাঙালী নেতৃত্ব সম্বন্ধে দীর্ঘার উদ্বেগ ছিলেন, তা তাঁর রাজনৈতিক আচরণ থেকেই উপলব্ধি করা যায়। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর, কংগ্রেসের অফিসকে এলাহাবাদে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত, তার একটা নিদর্শন। এরপর থেকেই বাঙলা দেশে কংগ্রেসের পতন শুরু হল এবং এই ভাবে বাঙলাদেশ তার সর্বভারতীয় নেতৃত্ব হারাতে বসল। তিনি বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাটের ভিত্তিতে কংগ্রেস সংগঠনের সূত্রপাত করলেন, কারণ, এদের উপর তিনি আস্থা স্থাপন করতে পারতেন, যা বাঙলার উপর তিনি কখনই পারেননি। গত কুড়ি বছরের ইতিহাস তার শাস্ত্য দেয়।

কিভাবে বাঙলা দেশের রাজনৈতিক, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে, তা হয়ত অনেকের জানা নাই। এই বিষয়ে একটা কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। ১৯৫৭ সালে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে, বিলাত যাবার পূর্বে, আমি একদিন স্বর্গীয় ডক্টর স্তান ঘোষের কাছে থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাই। কথায় কথায় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম 'ডক্টর ঘোষ, আপনি তো প্ল্যানিং কমিশনের একজন উচ্চপদস্থ সভ্য, বাঙলা দেশের জন্ম আপনি কিছু করেন না কেন?' উত্তরে তিনি বলেন, "কি করব বলুন, গোবিন্দবল্লভ পন্থ* বাংলার জন্ম কোন অর্থনৈতিক অর্থাৎ শিল্পায়নের জন্ম কোন সাহায্য দেওয়ার ঘোর বিরোধী। কারণ, তিনি, মনে করেন যে

* তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্ল্যানিং কমিশনের Vice-Chairman (সহকারী সভাপতি) ছিলেন।

বাঙলা দেশ ইতি মধ্যেই অতিপূর্ণ (Saturation) পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। সেখানে আর বেশী শিল্প প্রসারণ হতে দেওয়া অসুচিত হবে। শিল্পে, সর্বত্র সমোন্নতি হওয়া প্রয়োজন।”

স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতবর্ষের সব অসুন্নত রাজ্য বা স্থান অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক পর্যায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ হলে, দেশের সংহতি স্ফূট হবে সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলা প্রয়োজন যে, সংঘতির অঙ্কুরোদয়ে বাঙলা দেশকে অসুন্নত রেখে দেশের স্বায়ীস্বার্থের কোন উপকার তো হবেই না এই রাজ্যের বিবিধ জরুরী সমস্যার সমাধান তো হওয়া তো দূরে থাকুক। এই সম্বন্ধে বাঙালী নেতৃবৃন্দের গুরুদায়িত্ব আছে এবং এই বিষয়ে বাঙালীদের সতর্ক হওয়া কর্তব্য।

নিঃসন্দেহ, গান্ধীর অমুচরণের নেতৃত্বে বাঙলা দেশের প্রতি প্রভূত অবিচার করা হয়েছে এবং এই অন্যায়ের এখনও অবসান হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের সময়, মডার্ন রিভিউ-পত্রিকার সাক্ষাৎকার সঙ্ঘে যা গিয়েছেন, তার সঙ্গে সবার পরিচয় থাকা কর্তব্য। তিনি বলেছিলেন, “Alien Government in India is a veritable chameleon. To-day it comes in the guise of the Englishman; tomorrow perhaps as some other foreigner; the next day without abating a jot of its virulence, it may take the shape of our own countrymen. However determinedly we may try to hunt this monster of foreign dependence with outside lethal weapons, it will always elude our pursuit by changing its skin colour. But if we can gain within us the truth called our country all outward maya will vanish of itself.”

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, কি ভাবে সাদা সাম্রাজ্যবাদ দেশী (brown, সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে, তা আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা লক্ষ্যকর অধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের তথাকথিত “স্বাধীনতা” সংগ্রাম বিভিন্ন রাজ্য ও তাদের নেতাদের স্বার্থসিদ্ধি ও প্রাধান্য বিস্তারের সংগ্রামে পরিণত হয়েছে মাত্র। এতদিন উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাট এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিল, কিন্তু আজ এই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেস রাজনীতি তার জাঙ্ঘল্য প্রমাণ দেয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশ সাধনের উপর নানা বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে বলে গেছেন, কিন্তু তাঁর কথায় খুব কম লোকই কর্পণাত করেছে। তাঁর কথামত, বাঙালী নেতারা ও জনগণ যদি চলতেন, তাহলে, আমার মতে অল্পকাল জটিল সমস্যা উঠত না। বাঙালী সমাজ সংহত হত, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান পাওয়া যেত ও কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থার উন্নয়নের দ্বারা বাঙালী জাতি শক্তিশালী হত। বাঙলা কখনই বিভক্ত হত না এবং বাঙালীকে পরের দ্বারে অহুগ্রহ ভিক্ষা করে বেড়াতে হত না।

স্বদেশী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার পর, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়া বাঙালীদের পক্ষে বিস্তারিত কাজ হয়নি, এ করা বাঙালী জাতির উচ্ছ্বাসের অতিমাত্রা ও ভাবুকতার প্রাবল্যের নিদর্শন মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় অনেক বাঙালী, বাঙালীর পক্ষে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন, এমন কি চিত্তরঞ্জন দাশও শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা কখনিকালে আসবে না এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ব্যতিরেকে আসতেও না। সেইজন্য, ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে তিনি স্বরাজ পার্টি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৯২০ সালে, তিনি নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীর সঙ্গে

যোগদান করেছিলেন সত্য এবং তাঁর সহযোগিতায় মহাত্মা গান্ধীও প্রভুতভাবে লাভবানও হয়েছিলেন। তথাপি, দেশবন্ধু শীত্রই বুঝতে পারলেন যে কেবলমাত্র গণআন্দোলনের মাধ্যমে, স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। প্রকৃতপক্ষে, গণআন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতেন, কিন্তু একথাও তিনি জানতেন যে, এই আন্দোলনের ভূমিকা গৌণ ভূমিকা মাত্র হতে পারে। তখনও ইংরেজ ভারতে অপ্রতিষ্ঠিত এবং তার ক্ষমতা তখনও অব্যাহত ছিল। উপরন্তু, তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, "Politics is the art of the possible"। হুত্তরাং তিনি মনে করতেন যে, স্বাধীনতার প্রথম স্তর ইংরেজদের সঙ্গে বোঝা পড়া দিয়েই সাধিত হবে। এই হেতু, তিনি প্রথম পর্যায়ে সাংবিধানিক সমাধানে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই সমাধান—তখন দেশবাসী গ্রহণ করলে পর, গণআন্দোলনও এর সহায়ক হতে পারত এবং হতেই বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বস্তুতঃ, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, কে এর সত্যতাকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করতে পারে?

আমাদের পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, ১৯২৫ সালে, তাঁর মৃত্যু হল এবং তখন হতেই ভারত বিভাগ ও বাঙালির স্বর্গতির সূত্রপাত হল।

অবাঙালী নেতারা যে, এই বিভাগের জন্ত সম্পূর্ণ দায়ী ও তাঁহাদের ক্ষমতা প্রসারণের জন্ত অপরোধে তা চেয়েছিলেনও, তার অনেক ঐতিহাসিক নজীর আছে।

এই সম্পর্কে, সম্মানবাদ সম্বন্ধে দেশবন্ধুর করিমপুরের বড়ীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে সভাপতির ভাষণ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, ".....our freedom will never be won by revolutionary violence, In the next place, apart from the special psychology of the Indian people, how is it possible, by offering such violence, as it is possible for

a subject race to offer, to contend against the highly organised governmental violence of the present day? It is no use quoting the incidents of the French and other Revolutions. Those were the days when the people fought with pikes and often won. Is it conceivable that at the present moment we can overthrow any organised government of the modern type by such method?.....the application of violence cuts at the root of that consolidation, without which, as I have said, the attainment of swaraj is impossible."

তাই বহু বীরত্ব ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মানবাদ বর্তমানকালে বিফল হয়েছে এবং ফলে, বাংলাদেশের ঘরে ঘরে দুঃখ বেড়েছে মাত্র। এই নীতির আরেকটা আত্মঘাতী কুফল হয়েছে যে, এই দুর্দিনে আমরা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও কর্মক্ষম যুবক যুবতীদের হারিয়েছি, যারা এসময়ে হয়ত দেশের নেতৃত্ব করতে পারতেন ও ভারতকে তার গম্ভ্যে নিয়ে যেতে পারতেন।

I. N. A র ভূমিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় সৈনিক আন্দোলন ঐকত্রিক, সম্পূর্ণ বর্তমান রণনীতি ও কৌশলের উপর স্থাপিত ছিল, ব্যক্তিগত সম্মানবাদের উপর নয়।

অভাববাবুর নেতৃত্বে, এই জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করার পর থেকে, ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর আস্থা হারাণ ও তার উপর আর নির্ভর করতে অসমর্থ হল। ভারতের স্বাধীনতা এইভাবেই এল, গান্ধীর বা তাঁর অমুচরবৃন্দের দৌলতে নয়। এই কথাটা সর্বকালে ও সর্বসময়ে অরণ্য রাখা সব ভারতবাসীর কর্তব্য।

দেশবন্ধু বেঁচে থাকলে, সাংবিধানিক পন্থা অবলম্বন করে

দেশের স্বাধীনতা আগেই আসত, ভারত বিভাগের কোন প্রয়োজন হত না এবং আমাদের জাতীয় জীবনেও এত অস্থিরতা ও অস্থায়িত্বের স্থিতি হত না। ফলত, ভারতবর্ষ আজ প্রগতির জন্ত সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে পারত এবং পরমুখাপেক্ষী হয়ে দেশের সংহতি ও স্বাধীনতাকে এমনভাবে বিপন্ন করত না।

তথাপি, বাঙালীদের হতাশ হবার কারণ নাই। “Victory from within” আপানী মনীষী ওকাবুবা বলে গেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বাট, সর্বদেশের নিপীড়িতদের জন্ত। আমরা আজ একা নই। আমাদের সংগ্রাম আজ দেশে ও বিদেশে সকলের সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত এই হল আমাদের আশার কারণ।

বর্তমান পরিস্থিতিতে, কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের ক্ষমতা দুটিভুত করতে ব্যস্ত। সেইজন্য, কেন্দ্রীয় সরকার অনেক সময়ে বিভিন্ন রাজ্যের বকীয় স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারেন। ততরাং, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর নির্ভর কবা পণ্ডশ্রম হবে মাত্র। আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্ত যথাসম্ভব স্বয়ম্ভর ও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন, তা হলে বাঙলা তথা অন্যান্য রাজ্যের সম্মিলিত প্রয়াস কোন প্রকারেই ব্যাহত হতে পারে না।

আমার বিশ্বাস আগামী কুড়ি বছরের জন্ত যা প্রধানতঃ দরকার, তা হচ্ছে শিক্ষা, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। প্রকৃতপক্ষে, এই পরিকল্পনায় রাজনীতির স্থান হবে অতি গৌণ। এমন কি রাজনীতি কিছু কালের জন্ত স্থগিত রাখলেও কোন ক্ষতি হবে না। বর্তমানের অকারণ রাজ-নৈতিক রেযারেযি, কোন প্রগতিশীল রাষ্ট্রে থাকা অমুচিত। ইহা বাঙলাদেশের স্বায়ীস্বার্থের বিরোধী। একমাত্র শিক্ষার প্রসারণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্বারাই বাঙলার বিবিধ জাতীয় সমস্যার সমাধান হতে পারত ও হবে এবং এর মধ্যে সেই

বাঙালী জাতি শক্তিশালী হবে। কোন বিভক্ত জাতি ও অসুন্নত সমাজকে, কেউ যথার্থ সম্মান দিতে পারে না, সাহায্য দেওয়া তো দূরে থাকুক।

বর্তমান জগতে, আপানী ও জার্মানদের স্থান এত উচ্চ কেন? এদের জাতীয় সংহতি ও রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক প্রগতিই, এই গ্রন্থের এক মাত্র প্রকৃত জবাব হতে পারে।

সাম্প্রতিক ইতিহাসের সহিত যাদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন যে, আপানী জাতিকে, যা মুখ্যতঃ শক্তিশালী করেছে, তা হচ্ছে এদের ব্যাপক শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের প্রসারণ। এই হল, এদের ক্ষমতার উৎস।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর “আপান যাঈতে”, আপানী চরিত্র ও তাদের জাতীয় সাফল্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, একটা গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। তাঁর কথায়, আপানদের সাফল্যেব একটা প্রধান কারণ হল, আপানীদের “মিতব্যয়িতা।” ঐ দেশের লোক, অল্প কথা বলে, কিন্তু কাজ করে বেশী। আমরা এই গুণটা পেলেই, আমাদেরও সাফল্য স্থানচিত্ত হবে। বাঙালীর বুদ্ধির অভাব নাই, কিন্তু এই বুদ্ধিতে আমরা নিষ্ফল হয়েছি, কারণ, এই বুদ্ধিকে আমরা বাক-চাতুরীতে পরিবর্তিত করেছি। “চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয় ন,” স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন। এই কথাগুলি স্মরণ করার সময় এখন এসেছে।

পরিশেষে, এই বলেই যথেষ্ট হবে যে, শিক্ষা দ্বারা আমরা প্রধানতঃ বুদ্ধি, ধর্ম ও শ্রেণিনির্বিশেষে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, যার ফলে আমাদের সমাজ থেকে অস্তিত্ব দূর হবে, যা আপানী সমাজে প্রথম থেকেই হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, সর্ব পর্যায়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা ও শিক্ষণ, যাতে করে যে আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান হবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মূঢ়তা ও কুসংস্কারও দূরীভূত হবে।

In any language, it's sweet



In old French it was called ZUCHRE. In Arabic and Persian it is SUKKAR and SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek.

One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other has been known to mankind from the neolithic age.

Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar.

Issued by :

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD. THE OUDH SUGAR MILLS LTD. NEW INDIA SUGAR MILLS LTD. THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD. BHARAT SUGAR MILLS LTD. GOBIND SUGAR MILLS LTD.

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PVT. LTD.

Industry House, 159, Churchgate Reclamation, Bombay-1

ফুলের হৃদয়
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

নিজেকে আবার আমি খুঁজে পেতে চাই,
মুখোমুখা রুদ্ধকণ্ঠ দিনে
নম্র অন্ধকারে। চতুর্দিকে স্পষ্টতায়
চোখ ঝলে বুক কাঁপে, দিনের সন্ধানী
সমস্ত চিহ্নিত দিকরেখা
ডোবে অন্ধকারে ; হেমস্তের কিছুটা হৃদিশ
তখনই যে মেলে ; যেন শূন্য মাঠ
এখন হৃদয়; আদিগন্ত সবুজ বসল
কাটা হলে যেমন নির্জন অন্বেষণ
মাঠের হৃদয়। ঝরাপাতা স্তব্ধতার অন্তরালে

হেমস্তের শেষ তবু দক্ষিণ বারান্দা কেউ
খুলে দিল মনে হয় ; বিশাল শাখার
আন্দোলন শুরু হবে ; পাখিরা আবার
পাতাহীন গুচ্ছ ডালে সবুজ প্রাণের সঞ্চারণ
দেখে জড়ো হবে নিমেষেই ; ভোর হ'লে
নিমেষে প্রণয় জমে ফুলের হৃদয়ে।

অন্ধকার থেকে আমি এখন কোথাও
ঘেতে পারবো না। আমি যাবো অতঃপর
যেখানে পাখিরা জড়ো হবে অন্ধকার শেষে
ফুলের হৃদয়ে ॥

কবিতাগুলি

মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১.

গাছপালার দিকে ওই পুকুরের দিকে ওই বাগানে বাগানে
তাকাচ্ছি এখন
পিচের রাস্তার দিকে রাস্তার পাশের ওই ধুলোর দিকে
মোড়ে যে বাড়িটা তার শাশলী মেয়েটির দিকে
তাকাচ্ছি এখন
পিটু বলেছিলো, চলো, একদিন সীকোয় বেড়াতে নিয়ে চলো।
মিষ্টুকে একদিন খুব পাহাড় দেখাবো কথা ছিলো
গ্রীষ্মকালের ধুলোয় এক রকম গন্ধ পাওয়া যায়
পাতারেরা শুরু হ'লে আমি যেন আতিশ্রম হ'রে উঠি, হই
এ পাড়ায় বৃষ্টি খুব শব্দ ক'রে নায়ে
মনে পড়ছে নভেম্বরে রোদ্দুর প্রথম কবে ঠাণ্ডা মনে হ'ল
এ পাড়ার কিছুই তেমন দেখাই হ'লো না—
গাছপালা বাগান পুকুর বাড়িগুলি।
আর কয়েকটি দিন—তারপরেই আরেক পাড়ায় উঠে যাবো
এই রকমই আমাদের উপভোগ বুঝি—
নিম্পৃহ অক্ষম,
গাভীগুলি কখন যেন ও পাশের ঘালে মুখ দেবে ..

২.

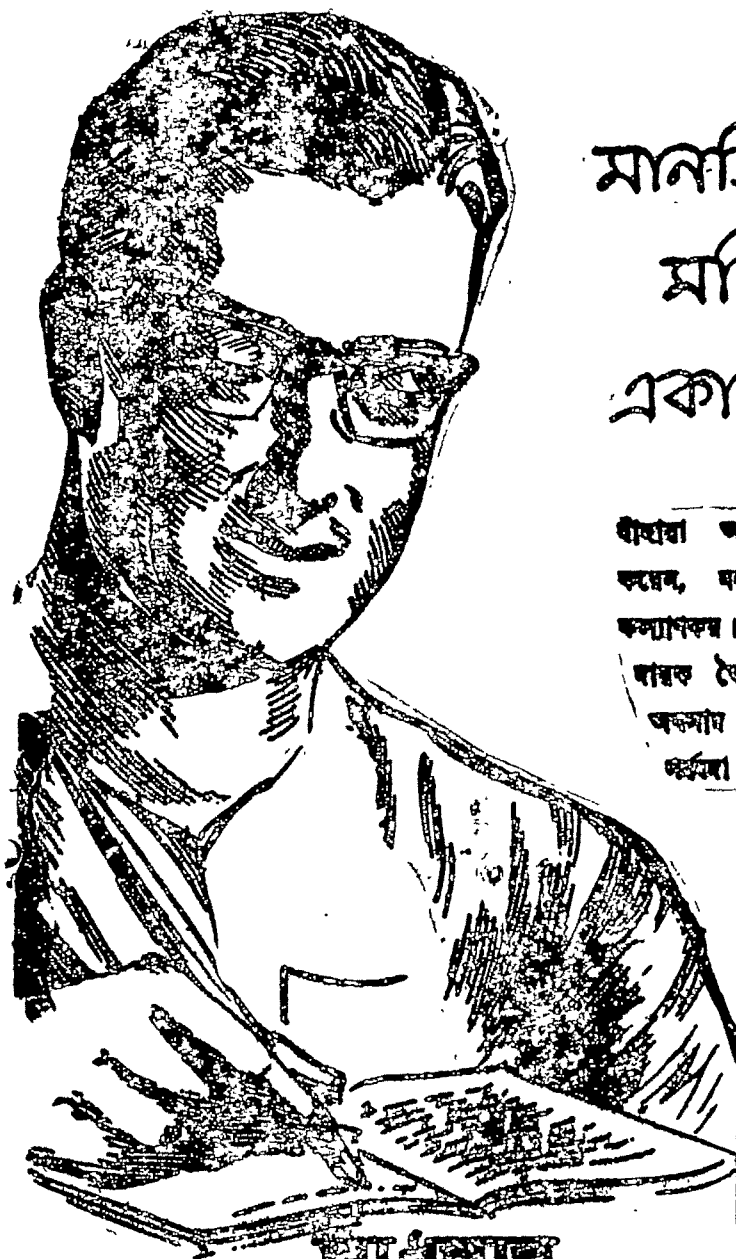
কোনো শান্ত দিঘি তার কাছে গিয়ে বসে থাকা যায়
চকিত পাতার শব্দে চম্কে ওঠে বিকেলবেলার
সমস্ত আড়াল গা-ধোবার, ছি ছি ক'রে ওঠে পাখি—
ডালপালার ঝাঁক থেকে হঠাৎ বেরিয়ে উড়তে থাকে....
মারবে যাবো এ রকম প্রকৃতির লজ্জা দেখা যায়,
কেউ কেউ মেঘকেও বধু বলে, নিভুতে মেঘের
পাশে বসে হৃদয়ের বজ্র উন্মোচন ক'রে আসে,
সব প্রশ্নেরই কিছু মানসিক অভিব্যক্তি আছে
শারীরিক প্রকাশ; আর কিছু সৌন্দর্যবোধের
পরিচয় থাকা চাই,—প্রাণীজগতেও এরকম

মাঝে মাঝে দেখা যায়,—আহারবিরত বিচরণে
 গাভীগুলি ঘুরে যায়, বিশাল ছপ্পুর ভ'রে থাকে
 নতুন বুটির পরে উড়তে থাকে প্রজাপতিগুলি—
 সবুজ ঘাসের মধ্যে সবুজ পাখার মিশে থাকে
 কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বড়ই কঠিন এ রকম
 আত্মলুপ্তি, সেই হেতু মানুষের মনে নিরন্তর
 যুদ্ধ লেগে থাকে, মানুষেরা অস্ত্রপথ পেতে চায়—
 কোনো কর্মে ব্যস্ত রাখা এ রকম প্রতিষেধকের
 কথাও অনেকে বলে, গুরুতর সমীপে যেতে বলে
 নিজের পোষাক নিজে ধৌত করা, খরের দেয়ালে
 ঝুল বেশি জমে গেলে সারাদিন মুক্ত করা যায়
 কিন্তু রিক্ত মনে হলে কারো গাঢ় সমিধান চাই—
 কেননা রিক্ততা ভাঙলে ফুল ফোটে আর ফুল রমণীরা

ভালোবাসে খুব !

৩.

পৃথিবীতে সৌধগুলি গ'ড়ে ওঠে...থাকে...ভেঙে যায়...
 তবু তারা চিরদিন অমলিন তীর্থ হ'য়ে থাকে ।
 ধূলার ভিতর থেকে আলমারির মাথা
 ঘষলে পুরনো কাল কুটে ওঠে...চিঠি...
 একটি সৌধ গ'ড়ে ওঠে মুহূর্তের—তাৎক্ষণিকের,
 হৃদয়ী যেটি পুরো পঁয়ত্রিশ দিনে
 কয়েক হাজার বার দেখেছে আমাকে—
 প্রথম মুহূর্ত হয়ত আকস্মিক, দ্বিতীয় তৃতীয়
 চতুর্থ মুহূর্তগুলি যেন বিলম্বিত, কিম্বা কোনো
 পরস্পর ক্রিয়াশীল অলৌকিক চুষকসজ্জাত
 কিন্তু অর্থহীন তবু—অহেতুক অকারণ, কোনো
 অস্ত্রগন্ধ অস্ত্ররঙ তারা কোনো গোলাপে আনে নি
 কয়েক হাজার শুধু সৌধ গড়ে উঠেছিল মনে,
 দীর্ঘ অদেখার দুঃখে সৌধগুলি, আনি, ভেঙে যাবে
 তখন শূন্যতাবোধে সেইখানে তীর্থ করতে যাওয়া.....



মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন!

দীর্ঘদিন অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম
করেন, মহাভুজরাও তাঁহাদের পরম
কল্যাণকর। এই ত্রিস্রকর ও আরাম-
দায়ক তৈল নরকপ্রকার ক্লান্তি ও
অকস্মিক ঘুম করে, মেহ ও মনকে
জরীয়া প্রকুর ও কর্মকর রাখে

সাধনায়

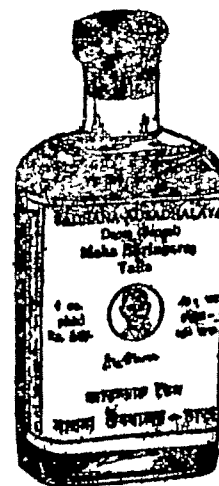
মহা ভুজরাও

তৈল



সার্বভৌম উন্নয়ন-ভাষা

দাখদা উন্নয়ন মোড় কলিকাতা-৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এম. (ভবি) বাহুবলচন্দ্র

অধ্যক্ষ শ্রীমোহনচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
বাহুবলচন্দ্র, এম. বি. এম. (ভবি) এম. বি. এম. (আমেরিকান)
কলিকাতা কেন্দ্রের প্রধান বাহুবলচন্দ্র বাহুবলচন্দ্র

প্রভু নয় বন্ধু
বা
পাকিস্তানের রাজনীতি

অশোককুমার মজুমদার

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

৪ অক্টোবর, ১৯৫৮ আয়ুব পাকিস্তানের শাসন ভার গ্রহণ করেন। পর বৎসর (১৯৫৯) আমেরিকা ও পাকিস্তান একটি বিনিময় চুক্তিতে (bilateral agreement) আবদ্ধ হইল।

“Under which the U. S. A. was to come to Pakistan's assistance should the latter be subjected to attack from any quarter. On several occasions proposals were made by the U. S. A. to fly out a task force to Pakistan, We (Pakistan) wanted to know whether such a force would carry out a contingency plan with us in which our combined forces would have definite role to play. The Americans would not agree to this; all they wanted was to demonstrate to us their ability to fly out to Pakistan from far-off bases. In this we were not interested.” (p. 153)

এই ‘contingency plan’ কি তাহা আয়ুব লেখেন নাই, কিন্তু ইহা যে ভারতকে আক্রমণ করিবার নকসা তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাহা হউক আমেরিকা এ প্রস্তাবে রাজি হয় নাই। আয়ুব লিখিয়াছেন :

“India demanded and, according to Mr.

Nehru, received a specific assurance from Washington that this agreement could not be used against India.” (p. 130)

কমুনিষ্ট আতঙ্কগ্রস্ত আমেরিকানগণ উৎকোচ দিয়া পাকিস্তানকে দলে আনিতে চাহিয়াছিল, এতদিনে তাহার ফল পাইল। কিন্তু ইহাভেও আমেরিকান নেতাগণ দমিলেন না।

এই সময়ে ভারতের সহিত চীনের শত্রুতা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, এবং পাকিস্তানের নেতাদের ভয় হইল যে হয়ত আমেরিকা ভারতকে কিছু অস্ত্র-সাহায্য করিবে। স্বতরাং ১৯৬১ জুন মাসে, আয়ুব প্রেসিডেন্ট কেনেডির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিম্নলিখিত সর্তে অঙ্গীকার আদায় করিলেন :

“...that Pakistan would be consulted before any decision was taken (by the U. S. A.) on the question of giving arms to India.” (p. 145).

কিন্তু পর বৎসর (১৯৬২) চীন হঠাৎ ভারত আক্রমণ

৮। ১৯৫০ খৃস্টে পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করে ; ফলে ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করিতে বাধ্য হয়। আয়ুব কি আশা করিয়াছিলেন যে চুক্তি অনুসারে আমেরিকা পাকিস্তানকে সাহায্য করিবার জন্ত সৈন্য পাঠাইবে।

করিলে আমেরিকা ভারতকে কিছু সামরিক সাহায্য দেয় এবং আয়ুব তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানান। (p. 143)

আমেরিকার আনুগত্যের ফলে পাকিস্তান এশিয়ায় আমেরিকার সর্বাশ্রেষ্ঠ বন্ধু (America's most allied ally in Asia, p. 180) বলিয়া অনেক সুবিধা ভোগ করিবার দরুণ রাশিয়া এবং চীনের সহিত কোনোরূপ বন্ধন স্থাপিত করিতে অপারগ হয়। এই অবস্থার পরিবর্তনই আয়ুবের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান কুতিত্ব। ভারতকে যেভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলি, বিশেষতঃ, ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে, বিচ্যুত করিয়া কোণঠাসা করা হইয়াছে, সেইভাবে রাশিয়া ও চীনের নিকট হইতেও দূরে সরাইয়া দিতে পারিলে পাকিস্তান নির্বিবাদে এই উপমহাদেশে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিবে। ইহাই আয়ুবের বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্য।

১৯৫৯ এ ভারত ও চীনের সম্বন্ধ অত্যন্ত তিক্ত হইয়া ওঠে। ঐ বৎসর (এপ্রিল, ১৯৫৯) চীনারা তিব্বতীদের বিরুদ্ধে নির্ভয়ভাবে দমন করে, এবং দলাই লামা ভারতে গলাইয়া আসেন। ওই বছরের শেষভাগে সীমানা নির্দ্ধারণের জন্ত পাকিস্তান চীনকে প্রস্তাব পাঠায়। আয়ুব বলেন যে ১৯৬১ শে তিনি আমেরিকা সফর হইতে না ফেরা পর্যন্ত চীন তাহার প্রস্তাবের কোনো উত্তর দেয় নাই। উল্লেখযোগ্য যে ঐ বৎসর আমেরিকা সফরকালে আয়ুব কমুনিষ্ট চীনকে যে রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। ইহাতে মার্কিনী সংবাদপত্রে তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়। (ইহা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট কেনেডি তাহাকে যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার করেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।)

আমেরিকা হইতে আয়ুবের প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই চীন পাকিস্তানের সহিত কাশ্মীর সংলগ্ন এলাকায় সীমানা নির্দ্ধারণের জন্ত রাজি হয়। ইহাতে বোধহয় আমেরিকা খুসী হয় নাই। আয়ুব লিখিয়াছেন :

The United States at this time^১ was beginning to show some concern about the agreement for oil exploration which we were negotiating with the Soviet Union, and the prospects of demarcation of the boundary between Pakistan and China. My position on both these issues was that in view of the changing situation it was important for us to normalize our relations with the Soviet Union and the Peoples Republic of China. We could not carry unnecessary political burdens." (p. 189) 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি' এবং 'অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বোঝা' কাহাকে বলে, আয়ুব তাহা উল্লেখ রাখিয়াছেন। অনুমান করা যায় যে 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি' অর্থ ভারতের প্রতি চীনের শত্রুতা, রাশিয়া ও আমেরিকার বৈরিতার মাত্রা হ্রাস; এবং 'অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বোঝার' অর্থ পাকিস্তানের তথা-কথিত কমুনিষ্ট বিরোধী নীতি। চীন এবং রাশিয়ার সাহায্য পাওয়া গেলে, পাকিস্তানের পক্ষে আর আমেরিকার সাহায্য পূর্বের তায় প্রয়োজন থাকিবে না; বিশেষতঃ চীন ভারত আক্রমণ করিতে উদ্যোগ, আমেরিকা কুটিত; এমতাবস্থায় তুলনামূলকভাবে দেখিলে চীনের সহিত সাম্যই আদরণীয়। দ্বিতীয়ত, আমেরিকা পাকিস্তানকে এত সাহায্য করিয়াছে, এবং কাশ্মীর ব্যাপারে আমেরিকা এমনভাবে পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে, যে অন্ততঃ কাশ্মীরের ব্যাপারে তাহার পক্ষে মত পরিবর্তন করা অসম্ভব। এইরূপ কূটনীতিব সাহায্যে আয়ুব আমেরিকা ও চীনের নিকট হইতে সাহায্য পাইলেন, এখনও পাইতেছেন।

বাকি রহিল রাশিয়া। রাষ্ট্র সংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠকে কাশ্মীর বিতর্কে প্রথম দিকে রাশিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব দেখায়, এবং কোন পক্ষকে সমর্থন করে না। ১৯৫১ ঐ সভায় কাশ্মীর বিতর্কের সময় সোভিয়েৎ দূত, মালিক, ভারতের পক্ষে বক্তৃতা দেন কিন্তু ভোট দিতে বিরত থাকেন।

১৯৫৫ তে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়। পাকিস্তান ঐ বৎসর বাগদাদ-চুক্তিতে (বর্তমান CENTO) যোগদান করে। আয়ুবের মতে এই চুক্তি আমেরিকার আশুপ্লে হয় (sponsored by the United States, p. 154) তিনি আরও লিখিয়াছেন যে সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের মতে "by joining the Baghdad Pact, Pakistan had become a member of 'an aggressive western alliance, and it responded by radically altering its stand on Kashmir,' (p. 154). ঐ বৎসরের (১৯৫৫) শেষে জুশ্চেভ ও বুলগানিন ভারত পরিদর্শন করিতে আসেন; ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৫৫ জীনগরে বক্তৃতা দান উপলক্ষে জুশ্চেভ ঘোষণা করেন যে কাশ্মীর যে ভারতের অত্যন্ত প্রদেশ তাহা কাশ্মীরবাসী নিজেরাই স্থির করিয়াছে। ইহার পর হইতে সিকিউরিটি কাউন্সিলে সোভিয়েৎ ভেটো দিয়া ভারতকে সমর্থন করিতে আরম্ভ করেন, এবং তদবধি ইংলণ্ড ও আমেরিকা কাশ্মীর সম্পর্কে তাহাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যবহার অন্ততঃ কিছু পরিমাণে বদলাইতে বাধ্য হয়। ততরাং রাশিয়ার সাহায্য পাকিস্তানের নিকট অপরিহার্য হইয়া উঠিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ১৯৬১ হইতেই পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সহিত সম্পর্কের উন্নতিসাধন করিতে আরম্ভ করে। আয়ুব লিখিয়াছেন :

"Then there is the Soviet Union. By joining SEATO and CENTO we had

alienated her and lost her sympathy. Since we had never been a party to any design against her and our membership of the Pacts was dictated solely by the requirements of our security, it would be possible to come to an understanding with the Soviet Union by removing her doubts and misgivings." (p 117) এখানে আয়ুব স্বীকার করিতেছেন যে পাকিস্তান SEATO এবং CENTO'র সভ্য হইয়াছিল। কম্যুনিষ্টদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্ত নহে, নিজের 'Security'র জন্ত। পাকিস্তানের 'Security' অংশ ভারতকে মুক্তে পরাজিত করিয়া হতবল না করিতে পারিলে হইবে না।^{১০}

১০। পাকিস্তানে তথা-কথিত 'insecurity'র অথবা অরক্ষিত অবস্থার, একটি দৃষ্টান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, যখন লিয়াকৎ বিনা কারণে ভারত আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিলেন। আর একটি দৃষ্টান্ত এই : সিন্ধু নদীর জলে বাঁধ দিবার জন্ত World Bankএর প্রেসিডেন্ট Eugene Black পাকিস্তানকে ৫০ কোটি এবং ভারত ১৭৪ কোটি ডলার দিতে প্রতিশ্রুত হয়। তাহার পর পাকিস্তানের বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করিয়া দেখেন যে আরো ২০ কোটি ডলারের প্রয়োজন। আয়ুব লিখিয়াছেন : This was a staggering figure, and I knew that when Eugene heard it he would hit the roof. And so he did. But I told him, and I quote the words as I recall using them : 'I have been around these areas which are going to be affected by the withdrawal of water by India. People have told me very plainly that if they have to

বাহা হটক রাশিয়ার নেতাগণ, যার্কিনী নেতাদের মত বিবেকহীন বা নির্বোধ নহেন। পাকিস্তান প্রথমে রাশিয়ার কোন পাক্তা পাইল না। অবশেষে ১৯৬৪ তে জুস্চেভের পতন হইল এবং রাশিয়ার নূতন নেতাগণ রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির সংশোধনের জন্ত তৎপর হইয়া উঠিলেন। পাকিস্তান তখন চীনের বন্ধু, এবং এই সময়ে সোভিয়েৎ নেতাগণ বিশেষভাবে চীনের সহিত মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯৬৫ এপ্রিল মাসে আয়ুব রাশিয়ায় গিয়া ৩রা এপ্রিল কোসিগিনের সহিত সাক্ষাত করেন এবং পূর্বের দোষ স্বীকার করেন। তিনি কোসিগিনকে বলেন :

“In the U-2 incident we were clearly at fault.” (p. 171) প্রসঙ্গক্রমে তিনি কোসিগিনকে আরও বলেন যে “Pakistan had the will and the capacity to frustrate her (India's) expansionist designs.” (p. 172)

বোধহয় নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্তই ঐ সময়েই পাকিস্তান সৈন্য কচ্ছ প্রদেশে অসুপ্রবেশ করে, ফলে ১০ই এপ্রিল, ১৯৬৫ ভারতীয় সেনা বাহিনী প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হয়।

die through thirst and hunger they would prefer to die in battle and they expected me to give them the chance. Our jawans and the rest of the people feel the same way. So this country is on the point of blowing up if you dont lend a helping hand....(p. 110)

ভয় পাইয়া Black ৭৪ কোটি ডলার দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। আয়ুব লিখিয়াছেন যে তাহার পূর্ববর্তী চৌধুরী মুহম্মদ আলি ১০ কি ১৫ কোটি ডলার ঋণ পাইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। (p. 110)

এই সকল ঘটনা বা ১৯৬৫র ভারত-পাক যুদ্ধের বিবরণ,

আয়ুব লেখেন নাই। বস্তুতঃ রাশিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্ত দিয়াই তিনি জীবনচরিতের সমাপ্তি করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আয়ুব ভারতের নামে কি রকম কুৎসা রটনা করিয়াছেন তাহার হু একটি নিদর্শন দিতেছি। কোসিগিনকে তিনি বলেন যে :

The Indian theoreticians were claiming boundaries from the Oxus to the Mekong.” (p. 172)

অজ্ঞাত তিনি লিখিয়াছেন :

She (India) then involved us in the struggle for Kashmir (p. 48)

প্রশ্ন হইতে পারে যে এইরকম নির্জলা মিথ্যা ভাষণের লাভ কি? লাভ যে আছে, তাহা পাকিস্তান বিলম্বণ জানে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ সার জাফরুল্লা খানের সিকিউরিটি কাউন্সিলের বক্তৃতা পাঠ করিলেই বোঝা যাইবে। জাফরুল্লা সিকিউরিটি কাউন্সিলে সম্পূর্ণ মিথ্যার সহায়ে কাশ্মীরে পাকিস্তানের দাবী প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়না যে ইংলণ্ড ও আমেরিকা জাফরুল্লার ভাষণে সত্যই প্রভাবিত হইয়াছিল; তখন তাহাদের স্বার্থ কাশ্মীরে পাকিস্তানের সহিত জড়িত ছিল বলিয়াই হয়ত তাহারা বিনাবিধায় জাফরুল্লার কথা বিশ্বাস করিবার ভান দেখাইয়া থাকিবে। সেইভাবে এখনও যাহাদের স্বার্থ পাকিস্তানের সহিত জড়িত তাহারা আয়ুবের মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিবে। ফলত আয়ুব একটি কথা খুব পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন : ভারতই পাকিস্তানের একমাত্র শত্রু আর সকলেই মিত্র। ভারতকে যুদ্ধে পরাজিত করিবার জন্ত, আয়ুব যে কোনো শক্তিকে মিত্র রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, চীনই হউক বা আমেরিকাই হউক : কর্তৃ-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিলে আয়ুব তাহার মিত্রগণকে ত্যাগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না।

সমাপ্ত

: উপভাস :

কঠিনতা বিষ

মি হির মুখো পাধ্যা য

ছদ্মক্ৰিশ্ণ

বাংলাদেশে তখন ভয়াবহ অবস্থা। চল্লিশ হাজার মৈত্র
নিয়ে পেশোয়া বালাজী বাজিরাও বিহারে প্রবেশ করলেন।
জমিদার মহাজনদের অবস্থা হল শোচনীয়। যারা কর দিতে
পারল, ভেটের নামে ঘুষ দিতে পারল, তারাই শুধু প্রাণে
বাঁচল। আর যারা সম্পত্তি রক্ষার জন্য অস্ত্রায় ফুলুমের
প্রতিবাদ করতে চাইল, ধনেপ্রাণে মারা পড়ল তারা। সর্বস্ব
লুট হল তাদের। তবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাকে বর্গীদের
হাত থেকে বাঁচাবার নাম করে পেশোয়া এলেন। কিন্তু সে
আগাটা বড় মর্শাস্তিক হয়ে উঠল সাধারণ মানুষের পক্ষে।
তবে মন্দের ভাল বালাজী পাটনার দিকে এলেন না। দাউদ-
নগর থেকে টিকারি, গয়া, মানপুরের পথ ধরে যুদ্ধের ও
ভাগলপুরের জঙ্গল পাহাড় পার হয়ে বীরভূমে এসে হাজির
হলেন। আগেই দুজন দূত পাঠিয়েছিলেন পেশোয়া।
গলাধর রাও আর অমৃত রাও। আলিবর্দী খাঁর শিবিরে এসে
অভিধি হলেন তারা।

পেশোয়ার অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক পিলাজী বাদব ধীরে
ধীরে মুর্শিদাবাদের দিকে এগিয়ে এলেন। নবাব তখন
আমিনগঞ্জের শিবিরে আছেন। খুব সতর্ক হয়ে আছেন।
সমস্ত জমিদার, ফৌজদারদের সাবধান করে দিয়েছেন।
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

পেশোয়া কোন্ মতলবে এসেছেন, কে জানে। সাধ্যমত
প্রস্তুত হলেন নবাব।

গোলাম মোস্তাফা খাঁকে পাঠালেন পিলাজী বাদবের কাছে।

ফাল্গুন ৬

অনেক সৌজন্ম বিনিময়, অনেক কূটনৈতিক শিষ্টাচারের
আদান-প্রদান হ'ল। অনেক আদাব-উসলিম, ইনাম-
বখশিশের ছড়াছড়ি হল। পিলাজী এসে দেখা করলেন
নবাবের সঙ্গে। এক প্রহর ধরে শলা-পরামর্শ হ'ল।
পিলাজী শপথ করলেন শিবশঙ্কর নামে, আলিবর্দী কসম
খেলেন খোদাতালায় নামে। কেউ কারো ক্ষতি করবেন
না। বিশ্বাস ভাঙবেন না, বেইমান হবেন না।

একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হবে-বাংলার দুঃখমন বর্গীদের
শ্রায়েস্তা করবেন।

কথা পাকা করে পিলাজী ফিরে গেলেন পেশোয়ার কাছে।
নবাব আরো তিন ক্রোশ এগিয়ে এসে শিবির স্থাপন
করলেন। এখান থেকে বালাজীর শিবির আরো তিন ক্রোশ
দূর। দুই পক্ষ থেকে সমান দূরে মাঝামাঝি একটা তাঁবু
খাটানো হ'ল। ঝাড়, বালর, পর্দা, গালিচা দিয়ে খুব
জমকালো করে সাজানো হ'ল।

পিলাজী বাদব, মল্লহররাও হোলকার এবং আরো কিছু
দেহরক্ষী নিয়ে পেশোয়া হাতীর পিঠে চেপে সেই তাঁবুর দিকে
এলেন। গোলাম মোস্তাফাকে আগে পাঠিয়ে কিছু পরে
নবাব নিজেও এলেন হাতীর পিঠে চেপে। মুখোমুখি এসে
দুজনেই হাতী থেকে নামলেন।

তারপর মারাঠা-রাজ্যের প্রধান পেশোয়া বালাজী বাজিরাও
এবং হবে-বাংলার নবাব মোহাম্মদ আলিবর্দী খাঁ বাহাদুর
পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁবুতে বসে আলাপ-
আলোচনা হ'ল দু'পক্ষের নায়কদের মধ্যে। নিরুপায় নবাব

মারাঠাদের শাহরাজাকে বার্ষিক চৌধ দিতে রাজি হলেন। উপরন্তু পেশোয়া তাঁর নিজস্ব খরচের জন্য নগদ আদায় করলেন বাইশ লাখ টাকা। অসহায় নবাব আলিবর্দী খান। এই শর্তে রাজি না হয়ে উপায় নেই, টাকা না দিলে রক্ষা নেই। কারণ ভাস্কর পণ্ডিতের পরামর্শে রঘুজী ভৌসলা নিজে এসেছেন। যে কাটোয়া থেকে মাত্র ছ'মাস আগে মহাষ্টমীর রাতে পালিয়ে গিয়েছিলেন ভাস্কররাম; সেই কাটোয়াতেই এসে ছাউনি ফেলেছেন রঘুজী ভৌসলা। এই বিপদের মুখে পেশোয়ার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। সেই সাহায্যের ভরসা পেয়ে আশ্বস্ত হলেন নবাব। পেশোয়ার সম্মানে শিবিরে নাচগানের আয়োজন হ'ল। ছ'চার দিনের মধ্যেই একসঙ্গে অভিযান করবেন পেশোয়া বালাজী বাজীরাও এবং নবাব মোহাম্মদ আলিবর্দী খান। দেখা যাক এবার রঘুজী কি করেন।

নবাব-শিবিরে বাজি পোড়ানো হচ্ছে। নাচ-গান আমোদ-ফুটির জোয়ার লেগেছে।

ছ'দিন পরেই হয়তো প্রবল যুদ্ধ হবে। কে মরবে, কে বাঁচবে ঠিক নেই। এই ছ'দিনের ছুনিয়ায় যত পার ফুটি করে নাও। সিপাহীরা গা-ঢেলে আমোদে মেতেছে। ওদিকে কাটোয়ার অজয় নদের কূলে বর্গীদের শিবিরে তখন তুরি-ভেরীর শব্দে রাজির দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হ'ল। ক্রকপঙ্কের রাত। রঘুজী ভৌসলার চোখে ঘুম নেই। শিবিরে পায়চারী করছেন তিনি। কয়েকজন প্রধান সর্দার, পণ্ডিত ভাস্কররাম কোলহট্‌কর, যশোবন্তরাও গুজর, নীলকণ্ঠরাও মোহিতে, গোবিন্দরাও শেলুকর কাছাকাছি বসে আছেন। প্রহরে প্রহরে গুপ্তচরের মুখে সংবাদ আসছে। সংবাদ শুভ নয়। নবাব আর পেশোয়া মিলিত হয়েছেন। এই মিলিত শক্তির সঙ্গে লড়াই দিতে হবে। সহজ ব্যাপার নয়। রঘুজীর চোখে-মুখে চিন্তার ছায়া। অজান্তে প্রধানরাও চিন্তিত মুখে বসে আছেন। দুই হাত পেছনে,

মুখ নিচু করে পায়চারী করছেন রঘুজী। অজয় নদের ওপারে গাছ-গাছালির মাথায় ভাঙা চাঁদ উঠল।

ঠিক এই সময় বিশাখা বলছিল—ঠাকুর, কি উপায় স্থির করলে—

ভারত বললো—কিসের উপায়—

— কেন, আমাকে নিয়ে যাবার, এখান থেকে বৃন্দাবন পালিয়ে যাব আমরা, আমি শুনেছি বোশেখ মাসের প্রথম দিকে মাধবদাস বাবাজী তীর্থযাত্রা করবেন, তুমিও চলে, আমাকেও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো—

কোন উত্তর দিতে পারলো না ভারত। শুধু মুগ্ধ চোখে বিশাখার হৃন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। স্নান জ্যোৎস্না পড়েছে বিশাখার মুখে, নীল ওড়নার জরীর চুম্বিতে। একটু আগে মন্দিরের আরতি-নৃত্য শেষ হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে নেচেছে বিশাখা।

একটু ক্রান্ত। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মন্দিরের পেছনে নিম্নশ্রেণীর পরিচারিকাদের বাসগৃহ। সরু গলির দু'পাশে সারি সারি মাটির ঘর, খড়ের চাল। একপাশে কুমোতলা, একটা অস্থগাছ। সামনে বিশাখার নিজস্ব পরিচারিকা ইন্দুমতীর ঘর। এখানেই খুব গোপনে দেখা হয় ছ'জনের এর আগেও কয়েকবার এখানে এসেছে ভারত। বুড়ি ইন্দুমতী ডেকে এনেছে।

অস্থগাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারত। পাতায় পাতায় অন্ধকার।

বিশাখা হঠাৎ আরো ঘন হয়ে এল। দুই হাত ভারতের দুই কাঁধে রাখল।

মুখ তুলে মুখের কাছে এনে প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো—কি ঠাকুর, কি ভাবছ, ভয় পেলে নাকি—রক্তের ভেতরে যেন রণযাত্রার কোলাহল। মন্দিরের সব কঁাসর ঘণ্টা বুকি একসঙ্গে মাথার মধ্যে বেজে উঠেছে। মাত্র দু'আঙ্গুল দূরে লাক্ষ্মীরাও ওষ্ঠাধর, কাজল আঁকা আরত চোখ, গুপ্ত হৃন্দর

লগাটে চূর্ণ-সুত্তল, খেদবিন্দু। উতলা নিখাসের সঙ্গে অন্তর চন্দনের স্ফগন্ধ। বুকের কাছে উদ্ধত যৌবনের স্পর্শ। শরীরের সহস্র শিরায় শিরায় যেন তরল আগ্নেয় স্রোত। বিছাধরের পাল্লায় পড়ে একবার সেই বিদেশী স্মরণান করার পর যেমন হয়েছিল, তার চেয়েও সাংঘাতিক নেশা। এ কোন্‌ মায়াজালে জড়িয়ে পড়ল সে।

আর কেউ না বুঝুক, রঘু কিন্তু ঠিক বুঝেছে। ছোটকর্তা আবার যেনেমানুষের পাল্লায় পড়েছেন। সেই বর্ধমানে একবার যেমন হয়েছিল। হবে না কেন, স্মরণ মাহুয দেখলেই এসব মেরেরা ফাঁদে ফেলতে চায়।

—রোজ রোজ সন্দেবেলা মন্দিরে যান কি জন্মি—রঘুর কথা শুনে গরম হয়ে উঠেছিল ভারতচন্দ্র।

—আরতি দেখতে বাই, কেন কি হয়েছে—

—ওই বুড়িটা কে, আপনারে ডাকতি আসে—

—তোর তাকে কি দরকার—

—ওসব মাইরামাহুয সন্ধানশ করবার পারে—

—তুই থাম—ধমক দিয়েছিল ভারত। রঘু থেমেছে বটে, কিন্তু মনে মনে স্বস্তি পায়নি সে। বিশাখা নিকটে এলে অস্বস্তি হয়, আতঙ্ক হয়, আবার দূরে থাকলেও অস্থিরতা বাড়ে। রোজ সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে যেতেই হবে। এক নিভৃত কোণে বসে বিশাখার নৃত্য দেখতে হবে। না দেখতে পেলে রাতে ভাল ঘুম হবে না, পরের দিনটাও কেমন বিবর্ণ বিশ্বাস মনে হবে। সবদিন বিশাখা একান্তে এসে কথা বলতে পারে না, গোপন সাক্ষাতের সুযোগ পায় না। তবু অন্তত একবার দূর হতে দেখেই ভূপ্তি। দোলপূর্ণিমার সময় থেকে প্রায় একমাস এই গোপন খেলা চলছে। এটা কি খেলা, না নেশা, না স্বপ্ন, না সত্য—কিছুই বুঝতে পারে না ভারত।

মন্দির প্রাঙ্গণে উজ্জল আলোক বৃন্তের কেন্দ্রে বিশাখা যখন নাচে, তখন অগ্নিদের এক অন্ধকার আড়ালে বসে দেখতে দেখতে মনে হয় বিশাখা যেন এক ভয়ঙ্কর অধচ অপক্লপ

অগ্নিশিখা। যার কাছে যাবার উপায় নেই, যাকে কাছে আনারও সাধ্য নেই। মনে হয়, ওকে স্পর্শ করলে হাত পুড়ে যাবে, আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে গেলে সমস্ত শরীর জ্বলে যাবে। আবার বিশাখা যখন উন্নত মস্তকে দৃষ্ট দৃঢ় পৃথক্কেপে চলে যায়, তখন মনে হয় যেন সর্বসম্পদভূষিতা এক রাজেন্দ্রাণী, কি স্মৃতিম দেহসৌষ্ঠব, কি নিখুঁত প্রতিটি অঙ্গ-সংস্থান, কি গর্বিত সেই গমনভঙ্গিমা।

আবার এক এক রাতে নিভৃত সাক্ষাতের সময় নিতান্ত নিকটে এসে যখন অমুনর করে, কখনো করুণ কান্নায় ভেঙে পড়ে, তখন মনে হয় ওর মতো অসহায়, ওর মতো দুখিনী আর কেউ নেই। উল্লাস হ'য়ে যায় ভারত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

চতুর্দিকে বিষন্ন জ্যোৎস্না। অশ্বখের অন্ধকারে দারুভ্রমের মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভারতচন্দ্র। তাঁর বুকে মাথা রেখে ফুলে ফুলে নিঃশব্দে কাঁদছে বিশাখা। পৃথিবীতে কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু স্নান জ্যোৎস্না আর রহস্যময় অন্ধকার আর অপূর্ব এক যৌবনের উষ্ণ সান্নিধ্য। একি মায়ী না মতিভ্রম, একি স্বপ্ন না বাস্তব।

রুদ্ধশ্বাস কয়েক মুহূর্তের পর শান্তকণ্ঠে আশ্বাস দিল ভারত—কৈদোনা বিশাখা, আমি যাব তোমার সঙ্গে, যেখানে যেতে বলবে, যতদূর যেতে বলবে—

মুখ তুলে ওচনার প্রান্তে চোখ মুছে সোজা হয়ে দাঁড়াল বিশাখা, মলিন মুখে একটু হাসল। তারপর কান্না ভেজা গলায় বললো—তুমি কথা দিলে ঠাকুর, আমি বাঁচলুম—ওদিকে রঘুজী ভৌসলার শিবিরে তখন কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠেছে। রাত ভোরের আগেই শিবির তুলে কাটোয়া ছেড়ে বীরভূমের পথে রওনা হলেন রঘুজী।

সাইক্রিক্স

শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দন, পাদ-সেবন দাসীরে—গান গাইছেন

মাধবদাস বাবাজী। বৈষ্ণবের দল চলেছে বৃন্দাবনের পথে। সবল্লভ বারোজন। একরকম বেশভূষা। মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, গেরুয়া চাদর, কাঁধে ঝোলা। কারো কারো কাঁধে শ্রীখোল, হাতে মন্দিরা। সকলের আগে মাধবদাস বাবাজী। দু'হাতে তালি বাজিয়ে গান গাইছেন।

পাশে পাশে মন্দিরা বাজাচ্ছে একটি কিশোর শিষ্য। অঙ্গ-বসন, মাথায় মস্ত পাগড়ি, সর্বাঙ্গে গেরুয়া চাদর, কাঁধে ঝোলা। ওদের ঠিক পেছনেই ভক্তদাস বৈষ্ণব। কাঁধে মৃদঙ্গ। চমৎকার বাজায় ভক্তদাস। বিপুল স্বাস্থ্য, মণীকৃষ্ণবর্ণ। যখন গলায় শ্রীখোল ঝুলিয়ে ভাবে বিভোর হয়ে ষেই ষেই করে নাচে, আশ্রমের মাটিশুদ্ধ যেন কাঁপতে থাকে তখন। মৃদুমন্দভাবে বাজাতে বাজাতে চলেছে ভক্তদাস। দলের সবার পেছনে রঘুনাথ আর ভারতচন্দ্র। ভাইনে সমুদ্রের বুকে অশ্লষ্ট একটা কুরাশার পর্দা তুলছে। এখনো সূর্যোদয় হয়নি। পূর্বদিগন্ত সীমায়, আকাশ আর সমুদ্রের মিলনরেখায়, একটা হুসর রক্তিম আভাস। মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন ভারত। বিশাখা বলেছিল, শেষরাতেই নুکیয়ে চলে আসবে আশ্রমে। যদিও পুরীধামের সর্বত্র চলাফেরার স্বাধীনতা আছে দেবদাসীর। কিন্তু মন্দির ছেড়ে চলে যাওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

কারাবাস তো অনিবার্য। মন্দির ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না দেবদাসী। কোথাও যাবার নিয়ম নেই। বৃদ্ধবয়সে যখন রূপখোঁবন চলে যাবে, কঠে যখন আর স্তর থাকবে না, পায়ে পায়ে থাকবে না নৃত্যের চাক্ষুণ্য, শরীরে জাগবে না ছন্দের হিল্লোল, জীবনের সেই অপরূহ বেলায় অবসর গ্রহণের অহুমতি পাবে দেবদাসী। মোহান্ত মহারাজের আদেশ নিয়ে তখন সে যেতে পারে কোন তীর্থক্ষেত্রে কিংবা ভেমন স্ববিধে পোলে অস্ত্র কোথাও গিয়ে বসবাসও

করতে পারে। কিন্তু কেউ যায় না, যেতে পারে না। সেই বয়সে আর কোথায় যাবে, কোথায় গিয়ে থাকবে, কে আশ্রয় দেবে। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছে, ভ্রমরকুঞ্চিত কেশদাম হুসর বিবর্ণ হয়ে গেছে। উজ্জল গাত্রবর্ণ মলিন হয়েছে, হৃদয়গণ স্বকশোভা বয়সের রেখায় রেখায় পরিণত হয়েছে শিথিল লোলচর্মে। নিকুপায় বৃদ্ধা দেবদাসী তখন বাধ্য হয়েই মন্দিরের ছয়ারে পড়ে থাকে। নিম্নতম পরিচারিকার কাজ করে কিংবা যাত্রীদের কাছ থেকে সাহায্যের নামে ভিক্ষা প্রার্থনা করে। যদি কোন ভাগ্যবতীর সক্ষিত কিছু অর্থের সংস্থান থাকে, তবে হয়তো শেষ জীবনটা কিছু স্বস্তিতে সে কাটাতে পারে, নিশ্চিন্তে মরবার অবসর পায়।

কিন্তু বিশাখার মত প্রবল যৌবনা, নৃত্যগীতনিপুণা কোন দেবদাসীকে মন্দির কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। মোহান্ত মহারাজ অত্যন্ত কঠিন। আরো কঠিন মন্দিরের নিয়ম-শৃঙ্খলা, প্রথাগত সংস্কার।

তোমার অভিভাবক তোমাকে ধেব-সেবার উৎসর্গ করেছেন। শুদ্ধ মনে, সঙ্কল্প পাঠ করে, পবিত্র হোমশিখার সম্মুখে নত মস্তকে সন্তোচ্চারণ শুনে তুমি দেবদাসীরূপে দীক্ষিত হয়েছ। তোমার দেহমন, রূপখোঁবন, আশা-আকাজ্জা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা—সমস্ত কিছু দেবতার পদে সমর্পণ করে তুমি ধস্ত হয়েছ, তোমার নবজন্ম লাভ হয়েছে। সমাজ-সংসারের কোন বন্ধন তোমার নেই; মানবিক কোন সংস্কার তোমাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি এখন দেবতার সম্পত্তি। এবার থেকে তুমি শুধু দেবতার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু কই বিশাখা তো এই বিধান মানতে পারলো না। সমস্ত নিম্প্রাণ নিয়মের বিরুদ্ধে, সমস্ত অন্ধ সংস্কার, প্রচলিত প্রথার প্রতিবাদে তার মাহুদী সত্তা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বহু যুগের ধর্মীয় অহুশাসন উপেক্ষা করে সমস্ত কামনা-বাসনা, সমস্ত আশা-আকাজ্জা নিয়ে তার অন্তরাত্মা হৃদয় মানবিক স্বভাব ধর্মের পথে মুক্তি প্রার্থনা করলো।

অকুত তার চরিত্র, আশ্চর্য তার জীবন-বৃত্তান্ত। একটু একটু করে ভারতকে বলেছিল বিশাখা।

ছোটবেলার কথা, বাবার কথা তেমন মনে নেই তার। নবদ্বীপের কাছে কোন গাঁয়ে নাকি তাদের বাড়ি ছিল। সেই গাঁয়ের নামও সে ভুলে গেছে। আবছাভাবে শুধু মনে পড়ে নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে বসে তার মা হাতে কাটা তুতো, তুলসীর মালা, ফুলের মালা বেচতো। সেই ঘাটেই মাধবদাস বাবাজীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মায়ের। বাবাজীর কৃপায় নবদ্বীপের বৈষ্ণব-আশ্রমে আশ্রয় পেয়েছিল মা ও মেয়ে। আশ্রমের কাজ করে দিন কাটতো মায়ের, তার স্ত্রী মেয়েটিকে স্নেহ করতো সবাই।

কিন্তু ছুটি বছর না ঘুরতেই তিনদিনের জ্বর-বিকারে মারা গেল মা।

মাধবদাস বাবাজীর সঙ্গে পুরীধামে এল মেয়েটি। তখন বোধ হয় পাঁচ ছয় বছরের বেশি বয়স হয়নি। কিন্তু খুব অন্দরী আর অলক্ষণ। এখন মেয়েকে কোথায় রাখবেন বাবাজী। অনেক ভেবে চিন্তে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সেবায় উৎসর্গ করলেন। সেখানে সেই নবদ্বীপের অসহায় মেয়েটির পুনর্জন্ম হল। নতুন নাম পেল সে বিশাখা। নতুন নিয়মের মধ্যে নতুন জীবন শুরু হল তার। তারপর এই পনের ষোল বছরে অনেক কিছু দেখেছে বিশাখা। অনেক কিছু শিখতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে। নৃত্য-শিল্পে নিপুণ হয়েছে, সংস্কৃত শিখেছে, কাব্য অলঙ্কার কিছু কিছু পাঠ করেছে। পুষ্পান্তরণ, মাল্য-রচনা, কবরী রচনা, বস্ত্ররঞ্জন, আলিঙ্গন অঙ্কন বিদ্যা ইত্যাদি চৌষট্টি কলার কয়েকটির কিছু কিছু আয়ত্ত করেছে।

কিন্তু এসব কিছু ভাল লাগে না বিশাখার। সংসার নেই, সমাজ নেই, কোন ভবিষ্যত নেই।

যখন ঘোবন এসেছে, সব কিছু বুঝতে শিখেছে, তখন থেকেই পালাবার উপায় খুঁজেছে বিশাখা। কিন্তু বিশ্বাস করার মত নির্ভর করার মত তেমন কাউকে পায়নি। এতদিন

পরে বহুভাগ্যে সেরকম মানুষের বৃষ্টি দেখা পেয়েছে সে। অমন রূপবান বলিষ্ঠ পরিপূর্ণ পুরুষ আর কোনদিন দেখেনি বিশাখা। দেখামাত্রই যেন আকর্ষণ জন্মে, শ্রদ্ধা নত হতে হয়, একান্তভাবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। মনের এশব কথা আপন মুখেই স্বীকার কবেছে বিশাখা। মন্দিরের জীবনে অনেক জটিলতা আছে, অনেক গোপন রহস্য রয়েছে। অনেক পাপ, অনেক ব্যাভিচারের স্মৃতি আছে।

আভাসে-ইচ্ছিতে সেসব কথাও ভারতচন্দ্রকে বলেছে সে। আরো বলেছে গোপন ইচ্ছের কথা। এই অপবিত্র জীবন থেকে সে মুক্তি চায়। এখান থেকে সে চলে যাবে সেই গঙ্গা-যমুনার দেশে। কাশী কিংবা বৃন্দাবন। সেখানে গঙ্গার তলে কিংবা যমুনার জলে অথবা সম্ভব হলে প্রয়াগসঙ্গমে স্নান করে সর্বকলুষমুক্ত হবে। যে কথা সাধারণ কোন মেয়ে বলতে সঙ্কোচ বোধ করে, সে কথাও সোজাশুজি বলেছে বিশাখা—ঠাকুর আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, আরো যদি স্তম্ভে চাও, তা হলে বলি, ওই কাঠের পুতুল ঠুটো জগন্নাথের চেয়ে বরাবর আমি রক্তমাংসের জ্যাক্ত কোন মানুষকে ভালবাসতে চেয়েছি, কিশোরী কাল থেকে সেই মানুষের স্বপ্ন দেখেছি। এতদিন পরে মনে হয়েছে, আমার স্বপ্ন বোধ হয় সার্থক হল, আমি বৃষ্টি সেই মনের মানুষের দেখা পেলুম—

স্তম্ভিতের মতো শুনেছে ভারত। একবার নয়, দুইবার নয়, বহুবার রাতের পর রাত। এক এক সময় মনে হয়েছে বোধহয় অনন্তকাল ধরে সে এই কথা, একই কথা বারবার শুনে যাচ্ছে।

বৃকের উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করেছে বিশাখা—কি ঠাকুর, কথা বলছেন কেন?

—হিঃ, বিশাখা, তুমি জগন্নাথদেবকে অবজ্ঞা করো না, ঈশ্বরের নিষেধ করো না, ওতে পাপ হয়—

—কিন্তু ঈশ্বর আমাকে কি দিয়েছেন বলতে পারো, এই পনেরো ষোল বছরে মন্দিরের ভেতর আমি যা

মেখেছি, যা শুনেছি, তাতে ঈশ্বরের উপর আমার যেদ্রা ধরে গেছে—

বিশাখার কথা শুনে শিউরে উঠেছে ভারত, বাধা দিয়ে বলেছে—ছিঃ বিশাখা, তুমি ক্ষেপে গেছ, তুমি নাস্তিকের মতো কথা বলছো—

—তুমি চূপ করো ঠাকুর, আমাকে বলতে দাও, নাস্তিক-আস্তিকের কথা আমি জানি না, আমি আমার নিজের কথা বলছি, ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু এই মন্দিরে যে নেই, সে কথা আমি জোর করে বলতে পারি, কোথায় ঈশ্বর আছেন আমি জানি না, আমি সামান্য মেয়ে, ঈশ্বরকে পাবার কোন আশ্রয় আমার নেই, ঈশ্বরকে খুঁজে দেবার কোন শক্তিও আমার নেই, আমি খুঁজে পেতে চেয়েছি একটি সংসার, একান্ত নিজের একটি ঘর, ঘরের স্বথ, শান্তি, স্বামী, সন্তান—বলতে বলতে এক একদিন কান্নায় ভেঙে পড়েছে বিশাখা। ভারতের বুকে মুখ শুঁজে ফুলে ফুলে কেঁদেছে। কোন কথা বলতে পারেনি ভারতচন্দ্র। শুধু তার মাথায় হাত বুগিয়ে বলেছে—স্বির হও, শান্ত হও, বিশাখা—

এদিকে সূর্য উঠেছে অনেকক্ষণ। বেশ গরম লাগছে। বসন্তের দিন চলে গেছে, সামনে প্রবল গ্রীষ্ম। ডাইনে সমুদ্র সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। কখনো কিছুদূরে সরে যাচ্ছে, কখনো কাছে আসছে। যেতে যেতে এক এক বার পেছনে তাকাচ্ছে ভারত। কিন্তু বাকি আশা করছিল, চতুর্দিকে কোথাও তার কোন চিহ্নমাত্র নেই। তবে কি আসতে পারলো না বিশাখা? গত পরশুদিন সন্ধ্যাবেলা অল্প কিছুক্ষণের জন্য আশ্রমে এসেছিল সে। শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য ভারতের সঙ্গে কয়েকটিমাত্র কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল। চাপা উত্তেজনার সুরে বলেছিল বিশাখা—বাবাজীকে সব বলে ব্যবস্থা করেছি, আমি শেষরাতেই আশ্রমে এসে তোমাদের সঙ্গে মিশব, শুধু তুমি জানো আর বাবাজী জানেন, আর কেউ জানে না, কাউকে ঘৃণাকরেও কিছু বলবে না, এর মধ্যে আর হয়তো

দেখা হবে না, তুমি খুব সাবধানে থেকো ঠাকুর, জিনিসপত্তর শুষ্কিয়ে নিও, আমি তা’হলে আসি, কেমন—

জিনিসপত্তর ভেমন আর কি, নিজের আর রঘুর ছোটো কঞ্চল, দু’খানা গুতি, চাদর, বেনিয়ান, সব গেরাম্মা রঙের, কিছু চিড়ে শুড়। এসব জিনিস রয়েছে রঘুর কাঁধে মস্ত একটা ঝোলার মধ্যে, হাতে তার পাকা বাঁশের লাঠি। শুধু বরাবর যেমন থাকে, সেই পুঁথিপত্তরের পুঁটুটিটা নিজের হাতে নিয়েছে ভারত। কিন্তু বিশাখাই যদি আসতে না পারলো, তা’হলে বৃন্দাবন যাবার দরকারটা কি? সেতো দীক্ষিত বৈষ্ণব নয়। তারতো ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার কোন প্রয়োজন নেই, ইচ্ছেও নেই। সে আর রঘু। তারা দু’জনেতো ভালই ছিল পুরীধামে।

রোজ বলরামভোগের মহাপ্রসাদ আসতো মন্দির থেকে। আহার ও আশ্রয়ের কোন অনিশ্চয়তা ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা, বাংলাদেশের বিশৃঙ্খলা থেকে, বর্ধমান-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অধিকারের সীমানা থেকে অনেকদূরে নিশ্চিত নিরাপদ ছিল সে। এখন আবার সেই বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, দণ্ডভুক্তি, বর্ধমানভুক্তির সীমানা পার হতে হবে। বর্ধমানরাজ্যের লোকজনের নজর এড়িয়ে চুপিচুপি চোরের মত পথ চলতে হবে।

বিশাখার জন্মই এই অনিশ্চিত আশঙ্কার পথে নেমেছে ভারত। নয়তো বৃন্দাবন যাবার এখন কিছু প্রয়োজন ছিল না তার। অথচ সেই বিশাখাই বোধহয় আসতে পারলো না।

মাধবদাস বাবাজীকেও কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। বাবাজীর মুখে কোন বিকার নেই। চোখ বুজে গান গাইছেন, গান গাইতে গাইতে পথ চলেছেন। বিশাখা নামে কাউকে চেনেন বলেও মনে হয় না; একজন দেবদাসীকে লুকিয়ে নিয়ে যেতে গেলে যেমন সজাগ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, বাবাজীর হাবভাবে, কই, ভেমন তো কিছু মনে হচ্ছে না।

রঘু কিন্তু মোটামুটি খুশি। প্রায় একবছর পর আবার দেশে ফেরার সুযোগ হল।

দুটি মাসের কোল ভাত খাবার জন্ম প্রাপ্তি আই-চাই করছে রঘুর। নিরামিষ খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেল, পেটে বোধহয় চড়া পড়ে গেছে। কিন্তু বৃন্দাবন যাবার হুজুগ উঠল কেন? মাধবদাস বাবাজী ছ' একবছর অন্তর ঝুগুন পূর্ণিমায় বৃন্দাবন যান, রাসপূর্ণিমায় নবদ্বীপ, আবার রথযাত্রার সময় ত্রিঙ্কোত্র পুরীধামে আসেন। বয়সকালে নাকি প্রতি বছর এই সমস্ত পথ পায়ে হেটে ঘুরতেন। এখন সে বয়স নেই। প্রত্যেক বছর আর পেরে ওঠেন না। তাই ছ' একবছর অন্তর পথে নামেন। তাও আর কতদিন পারবেন কে জানে? নিজেই বলেন—সকলই প্রভুর ইচ্ছা। কিন্তু ছোটকর্তার বৃন্দাবন যাবার বাতিক উঠল কেন?

জিজ্ঞেস করেছিল রঘু—হঠাৎ বৃন্দাবন যাবার চান কি জন্ম—পুঁথি-পস্তর গোছাছিল ভারত, যুধ না ভুলেই জবাব দিল—যাব, তীর্থ-ধর্ম করার জন্য, সুযোগ যখন এল—আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখল, ডুল্ল কুচকে পিটুপিট করে তাকাচ্ছে রঘুনাথ।

তারপর বিড়বিড় করে কি বকতে বকতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নরাণাং নাপিতো বৃত্তঃ। ব্যাটার পেটে পেটে কুবুজি। কিছু ঝাঁচ পেয়েছে কি না কে জানে? আর কোন কথা বলেনি রঘু, কিছু জিজ্ঞেস করেনি, বরং দেশে ফেরবার একটা সম্ভাবনা হওয়ায় যেন খুশি খুশি দেখাচ্ছিল।

(ক্রমশঃ)

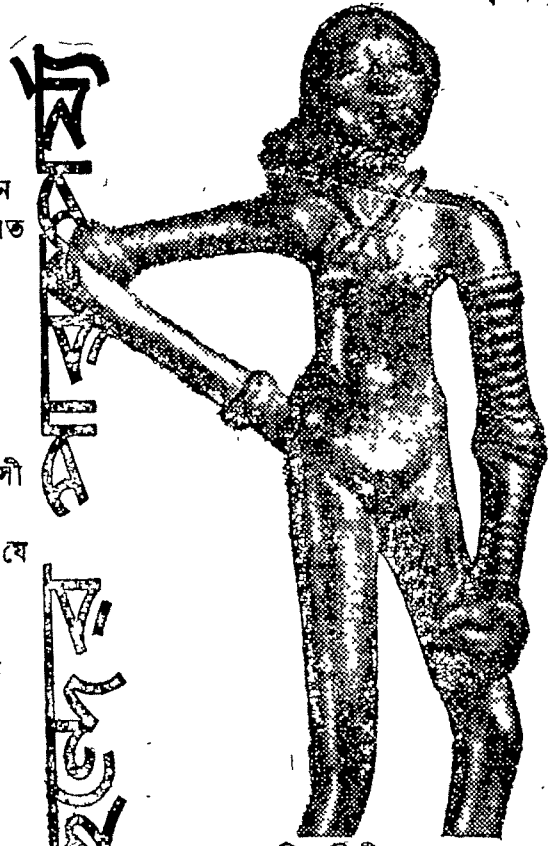
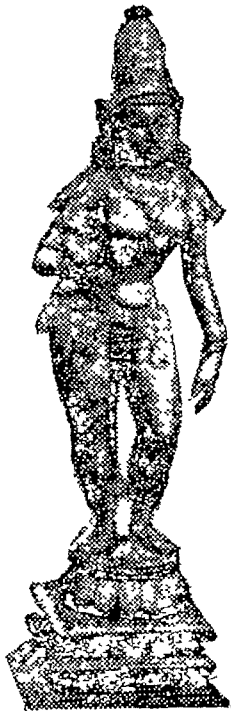
খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
শ্রীগীতা	৬'০০	বাংলার ঋষি	৩'০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫'০০	বাংলার মনীষী	১'৩০
ভারত-আত্মার বাণী	৫'০০	বাংলার বিদ্বান	২'০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১'৫০	বীরভৈ বাঙালী	১'৫০
কর্মবাণী	১'২৫	ব্যয়ামে বাঙালী	২'০০
Soul of India Speaks	5'00	বিজ্ঞানে বাঙালী	৪'০০
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.		রাজর্ষি রামমোহন	১'৫০
		রবীন্দ্রনাথ	১'২৫
বিভাসাগর	২'২৫	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১'৫০
মানুষের মত মানুষ	১'৫৫	আচার্য জগদীশচন্দ্র	২'৫০
শিশু রামায়ণ	১'৬২	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১'৫০
শিশু মহাভারত	১'৫৫	॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥	
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :		১৫ কলেজ স্কোয়ার :	কলিকাতা—১২

মহেঞ্জোদারোর কারুশিল্পী ৫০০০

বছর পূর্বে একটি ধাতু মূর্তিতে ভাবনাহীন নর্তকী মেয়েটির একটি নৃত্যভঙ্গীমা রূপায়িত করেন। এটিতে যেন ছন্দ ও আনন্দ রূপ পেয়েছে।

সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে, হাঁচে ঢালাই মূর্তি তৈরীর পারম্পর্য্য, এখনও চলে আসছে। আদিবাসী ঢালাই শিল্পীগণ, তাঁদের রক্ষাকর্তা দেব-দেবীগণের সহজ সরল মূর্তি তৈরী করেন। যে জীবজন্তু বা পক্ষীর শক্তি, সম্ভাবিতা ও আনন্দ, তাঁদের জীবনেও ছন্দ ও শক্তি যোগায় তাঁরা ধাতু ঢালাই করে সেগুলির মূর্তি তৈরী করেন।



প্রসিদ্ধ শিল্পীগণ অবশ্য

“শিল্প শাস্ত্রে” বর্ণিত দেব দেবীগণের নির্দিষ্ট বিবরণী অনুযায়ী মূর্তি তৈরী করেন। প্রতিটি মূর্তিতে মূল আকার যদিও যথাসম্ভব বজায় রাখা হয় তবুও সুপবিত্র জীবন সম্পর্কে শিল্পীর যে বিজ্ঞ কল্পনা থাকে তা সেই মূর্তিতে রূপ পায়।

এমন কি বর্তমান কালেও সুদক্ষ শিল্পীগণ যে সব মূর্তি ঢালাই করেন, সেগুলিতে তাঁদের বিশ্বাস ও ধারণা রূপ পায় এবং বিভিন্ন ধরনের ঢালাই সম্পর্কে তাঁদের সুনিপুণ কুশলতাও প্রকাশিত হয়।

অখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ড



ম হী তো য বি খা স

২৬

বোশেখ মাসের মাঝামাঝি গড়িয়ে এলো। আকাশটা এবার বড়ো রুখু-রুখু। বিটিবাদলার ছিটে-ফোঁটা নেই। বোশেখের প্রথম দিকে কয়েকদিন আকাশ জুড়ে মেঘের পাহাড় উঠেছিল। কিন্তু বিটি হয়নি। জল হয়ে গ'লে পড়বার আগেই মেঘগুলো ঝোড়ো বাতাসে উড়িয়ে নিয়েছিল। ধর-রোদের তাপে খানা খন্দ পুকুর বিলের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে লাগল। অল্পজলের পুকুরগুলো শুকিয়ে চিত্তির হয়ে গেল। জলকষ্ট দেখা দিল। কাঠুখালির বিলের গ্রামগুলো এখন খা-খা করছে। গ্রামে জোয়ান-পুরুষ বলতে একটাও নেই। কাজ-কর্মের ধান্দায় সব নানাদিকে বেরিয়ে পড়েছে। গ্রামে পুরুষমামুষ বলতে এখন কন্যাসেবী ছেলেগুলো আর বেশী-বয়েসী বড়ো মামুষগুলো। ঘন বিটি পড়বার আগে আর জোয়ানগুলো বাড়ী আসবে না। যা ছ'চার পয়সা পারে জোগাড় ক'রে আনবে। অচেনা অজানা জায়গায় সফলে নানারকমের কাজ-কর্ম ক'রে বেড়াচ্ছে। আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে আকুল হয়ে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে।—আকাশ ছাপিয়ে কখন শীতল ধারা নেমে আসবে। উখাল হয়ে উঠবে কাঠুখালির বিল। ওরা ছুটে

ফাঙ্কন ৭

আসবে। ঘামে জলে ধানবীজগুলোকে স্নান করিয়ে মুঠো মুঠো করে ছড়িয়ে দেবে কাঠুখালির সারা বিল জুড়ে।

ঘন বিটি না পড়লে চাষের কাজ জোর আসবে না। তবে একেবারে নীচের দিকে জমিগুলোর মাটি নরম। বিটি না হলেও লাঙ্গল চলে। জোয়ানগুলো বাইরে কাজ করতে গেছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই। ওদের জন্তু তো সব ফেলে রাখলে চলবে না। বাড়ীর ছোট-ছোট ছেলেগুলোকে নিয়ে বুড়োরাই তাই নীচের দিকের ক্ষেতগুলোতে যেটুকু পারল চাষ দিতে শুরু করল।

অনাহারের কালো শকুনটা আন্তে আন্তে আবার ডানা মেলেছে। ঘরের ধান একেবারে তলানীতে এসে ঠেকেছে। মাঝে মাঝে বীজ ধানেও হাত পড়েছে। একবার খাওয়া শুরু করলে ও-কটা ধান আর কতোক্ষণ! ঘরে কিছু কিছু খেসারীর ডাল আছে। চাল-ডালে মিশিয়ে কোনোমতে চলছে। আর তার সঙ্গে শুকনো খটখটে বিল থেকে তুলে আনা হাঁচি কিছা মনমধি শাকের কড়াইখানেক ভাজা ডুজি। কিছা অল্পকিছু। উম্মে হাঁড়ি চাপিয়ে মেয়েমামুষগুলোর হাত পা বুকের মধ্যে সঁধিয়ে আসে। বুকের মধ্যে কাঁপে। কদিন আর এ ভাবে চলবে। কবে যে পুরুষমামুষগুলো বাড়ী

কিরে আসবে। মাধায় মাধায় ভাবনা এখন। গোটা সংসারটার দারিদ্র রয়েছে মাধায় 'পরে। ভালোমনে সামলানো, আপদ-বিপদ ঠাকানো। ভালোম-ভালোম পুরুষমানুষগুলো ঘরে কিরে এলে ভাবনা ঘোচে।

রোশটা একটু পড়তেই নকুল বেরিয়ে পড়ে। এই এক কাজ হয়েছে আজকাল। সকাল বিকাল দুইবেলা সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া। হু' একটা বাড়ীতে হয়ত এক আধজন বুড়ো-হাবুড়া পুরুষ-মানুষ আছে। কিন্তু বেশীর ভাগ বাড়ীই তো কাঁকা। শুধু খেয়েমানুষ আর কুচো বাচ্চাগুলো রয়েছে। বাড়ী-বাড়ী গিয়ে তাই সকলের একটু খোঁজ খবর নিতে হয়। সাতটা পাঁচটা কথায় মনটাকে তুলিয়ে রাখতে হয়। হু-খ-কষ্টের নিয়মই হল তাই। যতো বেশী প্রশ্রয় দেবে ওদের, মনের উপর তত বেশীই ভর হ'য়ে চেপে বসবে ওরা। সাত-পাঁচ কথায় মনটাকে হালকা রাখার চেষ্টা করো। হু-খ-কষ্ট যতো বড়োই হোক, দেখবে, ভারটা তার কম লাগবে তখন।

দুটো-তিনটে বাড়ী ঘুরে কেউদের মজা-পুকুরের পাশ দিয়ে ঘাস-ওঠা ভাগাভুটী বেয়ে লাঠি ঠুক ঠুক করে এগিয়ে চলেছিল নকুল। পুকুরটার একটা পাশ কাঁপানো কচুরী-পানায় ভর্তি। রোদের তাপে পাতাগুলো শুকিয়ে কালুচে হয়ে গেছে। আর একপাশে ফাটল-ধরা আধ-শুকনো কাধা। মাঝখানে সর-কাঁদার পরে ফোটাখানেক জল। যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল নকুল। ভাগাড়ের পাশ ঘেষে একটা বাবলা-গাছ। তার তলায় একটা হাড়-বের করা কুকুর। অস্থির হয়ে ছটফট করছে। কি একটা যন্ত্রণায় যেন পাগল হয়ে উঠেছে কুকুরটা। ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের লেজ কাষড়াচ্ছে। দাঁতের নাগালে শরীরের বে অংশটা পাচ্ছে, সেখানেই দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে।

কুকুরটা খানিকক্ষণ আছড়া-পিছড়ি করল। তারপর কাধা ভেঙে কাঁপিয়ে পড়ল গিয়ে পুকুরের জলটুকুর মধ্যে।

একটু বাদেই হজের মতন আবার উঠে এলো। ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতে লাগল সারা ভাগাড় জুড়ে। হয়ত অখাড-কুখাড কিছু খেয়েছে। ফলে কঠিন কোনো বোগ বেধেছে। কুকুরের আর দোষ কি। ক্রিধের জালায় মানুষ-জনই অখাড কুখাড খেতে শুরু করেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নকুল আবার এগিয়ে চলল সামনের দিকে। মনটা বড়ো বিষন্ন হ'য়ে ওঠে। চালুসে-ধরা চোখের দৃষ্টিটা মেলে যতদূর পারে বিস্তৃত ক'রে তাকায় সামনের রোদ ঝলুগানো রূক্ষ বিলের দিকে। কেমন যেন হ-হ করে ওঠে বুকের মধ্যে। চোখ নামিয়ে আবার এগিয়ে চলে। বলরামদের বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কচি-গলার ডাক কানে এলো—“ও ঠাউন্দা, আমাদের বাড়ী আসো—।”

নকুল বুঝতে পারল, বলরামের ছেলে নারায়ণ ডাকছে। আন্তে আন্তে ভিটের পরে উঠে এলো নকুল। বাতাসী উঠোন কাঁট দিচ্ছিল। নারায়ণ ঠাকুরমার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নকুলকে আসতে দেখে নারায়ণ ছুটে এলো। নকুলের লাঠি ধরে টানতে টানতে বলল—“ও মা, ঠাউন্দা আইচে।”

অবাসী মাধায় একটু ঘোমটা টেনে একখানা পিড়ি এনে বসতে দিল নকুলকে।

পিড়িতে বসে নারায়ণকে কোলের কাছে টেনে নিল নকুল। তারপর অবাসীকে ডেকে বলল—“এক ঘটি জল ছাও দেখি বউমা। বড়ো তেব্গা পাইছে।”

অবাসী তাড়াতাড়ি জল এনে দিল।

ঢকঢক ক'রে খানিকটে জল খেয়ে ঘটিটা নামিয়ে রাখল নকুল। অবাসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—“খবর-অবোর সব ভালো তো বউমা?”

শুকনো মুখে অবাসী বলল—“ভালো-মন্দে আর কি কবো ঠাউর। চলে যাচ্ছে কোনো গতিকি।”

একটু চূপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করল—“তা, ও-দিগির কোনো খবর আইছে নাকি?”

নকুল বুঝতে পারে, বলরামের খবর জানতে চাইছে সুবাসী।

নকুল উত্তর দেয়—“না তো বউমা, খবর কিছু আসেনি। তা ভাবনা-চিন্তায় কি আছে। কাজকন্ডা করতিছে সগোলে ভালো ভাবে। এটু স্থানি পথ তো আর না—যে ইচ্ছে হলো আর অমনি বাড়ী চলে আসলো। একদিন বাড়ী আসলি দুডো দিন কামাই। পরের কাজ—বোঝতো।”

সুবাসী চূপ ক'রে থাকে। বলরামের পিসীর সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে নকুল। তারপর উঠবার জন্ত পা বাড়ায়। নকুল একটু এগোতেই নারাণ ডেকে বলে—“ঠাউদ্ধা, কালকে আবার আসবা কিন্তুক।—”

নকুল হেসে বলল—“আসবো রে আসবো!”—

ঘটনাটার শুরু হল বিনামায়ে বজ্রপাতের মতনই। আর দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা গ্রামের মধ্যে। আশঙ্কা আর দুশ্চিন্তায় শিউরে উঠল সারা গ্রামের অন্তরায়। দক্ষিণ পাড়ার গগনের বউয়েব ভেদবমি শুরু হয়েছে। গগন বাড়ী নেই। কোথায় কাজ করতে গেছে। আগের সারাতা দিন উপোষ ক'রে ছিল বউটা। আজ সকালে কার বাড়ী থেকে দুটো পেসারী ডাল চেয়ে এনেছে। সেই ডাল-সিদ্ধ আর কি কি নাকি খেয়েছিল। দুপুর গড়াতেই পায়খানা আর বমি। পরের দিন সকালে খবর পাওয়া গেল—গগনের বউ মারা গেছে।

এই করেই প্ৰতাপাত হল। ওলাবিবির আবির্ভাব হ'ল গ্রামে। রাজির তরল অঙ্ককারের সঙ্গে গা মিলিয়ে বাতাসে স্তর করে ঘুরে বেড়ায় ওলাবিবি;—এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে। মানুষের পাপ আর দুর্বলতার ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়। ফন্দী কিকিরের অভাব নেই তার। একটু অস্বাভাবিক পেলোই প্ৰচুর মতন প্ৰসঙ্গ পাণের রক্তপথেও অনায়াসেই

ওলাবিবি মানুষের শরীরে প্রবেশ ক'রে যায়। তার প্রাণ-বায়ুকে শোষণ করে নেয়। নানান জনে নানান কথা বলতে লাগল। অনেকেই নাকি চোখে পড়েছে। হাজরাতলার ভিটেটার পাশে সীকবেলার অঙ্ককারে কদিন নাকি একটা মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। কালো কুচকুচে রং। পাটের পাছড়ার মতন একমাথা রুখো চুল। মানুষ দেখলে দূরে সরে যায়। আর ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। কেউ তাকে ভালো করে দেখতে পায়না। দেখার আগেই বাতাসে মিলিয়ে যায়। অঙ্ককারের মতনই ওলাবিবির রূপ। অঙ্ককারের ব্যাখ্যা হয় না। ওলাবিবিরও ব্যাখ্যা হয় না। বাক্‌গী গ্রামের ভয়-চকিত মানুষগুলো যে যেমনভাবে পারল ওলাবিবির রূপের ব্যাখ্যা দিল।

এক একজনে এক একভাবে বর্ণনা দিল। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। তেনার রূপ চেনা কি মানুষের কাজ। ক্ষণে-ক্ষণে যে তিনি রূপ পাল্টান। তাই ওলাবিবির চেহারা নিয়ে মতের অমিল হলেও একটা বিষয়ে সকলেই একমত হল। সীকবেলার হাজরাভিটের পাশে থাকে ওরা দেখেছে, সে ওলাবিবি ছাড়া আর কেউ নয়। গগনের বউ মারা যেতেই বিশ্বাসটা আরো পাকা হল। আন্তে আন্তে সব খবরই বেরিয়ে পড়ল। ঘটনার আগের দিন গগনের বউ নাকি সীক হবো-হবো সময়টার হাজরা-ভিটের গিয়েছিল। বাহির-ভূতো কাজকর্মে আর কি! এয়ো জী মানুষ! ভরসঙ্কোয় অস্থানে অসাবধানে চলাফেরা করলে যা হয়, তাই হল। ঐ পাপের হিন্দ্র দিয়েই ওলাবিবি এসে তার শরীরে ঢুকল। আর ফল যা, তা তো হাতে হাতেই দেখা গেল।

গগনের বউ মারা যেতেই গ্রামস্থল সকলে শঙ্কিত হয়ে উঠল। একবার যখন গ্রামে ঢুকেছে ওলাবিবি, তখন সহজে যে রেহাই হবে তা তো মনে হয়না। হল-ও তাই। দুপুর নাগাদ গগনের পাশের বাড়ীর নিবারণের ছোটো মেয়েটার বমি-পায়খানা শুরু হল। সন্ধ্যা হতেই কচি

যেয়েটা চলে পড়ল। পরের দিন থেকে আর বাগ্ মানানো গেলনা। সারা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম দিকে মড়াগুলো গাউপারের আশানে নেওয়া হল। পোড়ানোও হল। কিন্তু আশে আশে সাধের বাইরে চলে গেল। প্রতিদিন গ্রাম থেকে দু'টো তিনটে করে মানুষকে বিদায় দিতে হচ্ছে। কষ্টে-কষ্টে হাতিনাড়ার আশান পর্যন্ত ব'য়ে নেওয়া। তারপর কোনোমতে মাটি-চাপা দিয়ে রাখা। কার যে কখন পরোয়ানা আসে, কিছুই ঠিক নেই। আশঙ্কা উৎকর্ষ আর বুকভাঙা কান্নার সমস্ত বাক্সী গ্রামটা আকুল হ'য়ে উঠল।

সকালে যুম থেকে উঠে স্বাসী রোজ দিনের মতনই ঘরের কাজকর্মগুলো সারল। উঠোন কাঁট দিল। গোয়াল পরিষ্কার করল; গরুগুলোকে ভাগাড়ে নিয়ে বেঁধে দিয়ে এলো। গ্রামের মধ্যে বা ডামাডোল কাণ্ড চলছে কদিন। সব সময়েই মনের মধ্যে একটা ভয় হুম্‌হুম্‌ করছে। কিন্তু ভয় ক'রে হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না। সংসারের নানান কাজকর্ম। সব দিক সামলাতে হবে।

ভাগাড় থেকে এসে রান্নাঘরে ঢুকল স্বাসী। বা হয় দুটো রান্না করতে হবে। রান্নাবান্নার মন বসে না। ভালো লাগেনা কিছুই। মনটার মধ্যে সব সময় দাপাদাপি করে। তবু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বা হয় দুটো রান্না করতে হয়। সব হা-হত্যাশের মধ্যে ছেলের বুক জড়িয়ে বুক বাঁধতে হয় স্বাসীর।

একটু বাদে রান্নাঘর থেকে কি একটা জিনিষ নিতে বাইরে এলো স্বাসী। হঠাৎ শোয়ার ঘরের বারান্দার দিকে চোখ পড়তেই বৃকের মধ্যে চমকে উঠল। বারান্দার পৈঠার পরে মাথা রেখে ছোটো শরীরটা এলিয়ে দিয়ে প'ড়ে আছে নারাগ। অসীম ক্লান্তিতে ওর চোখ দুটো যেন বুজে আসছে। চীৎকার করে ছুটে গেল স্বাসী। "দুই হাতে বুক তুলে নিল নারাগকে। চীৎকার ক'রে শান্তডীকে ডাকল—ওমা,

ক'নে গেলে শীঘ্রীর আসো। নারাগ য্যানো ক্যানো করজিছে।"

বুড়ী কাছেই কোথাও ছিল। স্বাসীর ডাক শুনে পড়ি-মরি ক'রে ছুটে এলো। নারাগের চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে বুড়ী ব্যাকুল গলায় ডাকতে লাগল—“ও নারাগ! দাদারে! ও দাদা! কি হলো তোর? চোখ ম্যালু!”

কিছু একট বলতে গেল নারাগ। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোলো না। শুধু টোট টোটো নড়ল বারকরেক। আর তারপরেই স্বাসীর কোল ভ'রে হড়-হড় ক'রে থানিকটে পায়খানা করে দিল। চাল-ধোয়া জলের মতন পাতলা। আশটে দুর্গন্ধ।

কপাল চাপড়ে স্বাসী আঁত চীৎকার ক'রে উঠল—“ভগোমান, এ তুমি কি করলে ভগোমান—!”

নকুল বালার বারান্দার বুড়োরা দশ বারোজন মিলে কথাবার্তা বলছিল। সকলেরই মুখে শঙ্কা আর হুশিয়ার ছায়া, শরীরে ক্লান্তির ছাপ। সকালেও একবার আশানে যেতে হয়েছে। হুশিয়ার আর পরিশ্রমে বুড়ো মানুষগুলোর বয়স যেন আরো দশ বছর ক'রে বেড়ে গেছে। সকলে পরামর্শ ক'রে উমাচরণকে খুব সকালে পাঠিয়ে দিয়েছে মান্দার-গাতি। একবেলার পথ। মান্দার-গাতি নিমে ওঝার থান। মস্ত বড়ো গুণিন্ নিমে ওঝা। গ্রামের বা অবস্থা, তাতে একটা কিছু বাধা-বন্ধ না দিলে আর চলে না। নিমে ওঝা এমনিতে যেতে চায়না বড়ো একটা কোথাও। বেজায় কড়া মেজাজের মানুষ। আসবে কিনা কে জানে। তবে হাতে পায়ে ধ'রে কেঁদে-কেঁটে পড়লে বোধহয় না এসে পারবে না। নিমে ওঝাকে একবার আনতে পারলে আর ভাবনা নেই। সেই ভরগাতেই সকলে পরামর্শ ক'রে ভোর-ভোর উমাচরণকে পাঠিয়ে দিয়েছে নিমে ওঝার কাছে।

বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসেছিল নকুল। আশ-

পাশে আর সকলে। হাঁকোটা হাতে হাতে ঘোরাঘুরি করছে।

নকুল ঝিমোনো গলাটা একটু চাঙা করে বলল—“যদি কোনো বাগ্‌ড়া না বাধে, ভালি মনে কম নিমে ওঝারে নিয়ে উষোচরণ কালকেই চলে আসতি পারবে। তা এদিগি আনাগের আর এট্টা কাজ করতি হবে।”

সকলে উৎসুক হয়ে নকুলের মুখের দিকে তাকায়।

নকুল বলে—“কেডা যে কৌনুদিগি কাজকাম করতি গেছে, তার তো হদিশ নেই। কারেই বা ক'নৈ খবর দেবা। তা মাটি কাটতি যারা গেছে, ওগের জাগাড়া তো জানা আছে। ওগের এট্টা খবর দেয়া দরকার। তাড়াতাড়ি সগোলে বাড়ী চ'লে আসুক।—এই ভারডা এবার একজনে নাও।”

কেউ কোনো উত্তর দিল না। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে সবাই।

সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে ভজহরি বলল—“আমি গেলি যদি হয় তো আমিই যাচ্ছি।”

নকুল বলল—“একজনে গেলিই হলো। আসল কথা হচ্ছে, তাড়াতাড়ি ওগের বাড়ী নিয়ে আসা। তা তুমি যদি যাতি চাও তো ভালো কথা। তাড়াতাড়ি চলে যাও।”

হঠাৎ তীব্র কান্নার শব্দে সকলে চমকে উঠল। কার

বাড়ী আবার কি হলো কে জানে। তাড়াতাড়ি করে সকলে উঠোনে নেমে এলো।

হাউ-হাউ করে ছুটে এলো বলরামের পিসী। দুইহাতে নকুলের হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল—“তোমরা একবার তাড়াতাড়ি আসো নকুলদা। আমার নারাণ ঝানো ক্যামোন করতিছে।”

“নারাণ? নারাণ ক্যামোন করতিছে? কোন্ কি তুই?”

উৎকর্ষায় নকুলের গলা যেন শুকিয়ে এলো। বিষট দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে তাকাল। কালও একবার নকুল গিয়েছে ওদের বাড়ী। নারাণকে কোলে নিয়েছে। দেখলেই ছেলেটা ডাকতে ডাকতে এসে জড়িয়ে ধরে। বড়ো মামা প'ড়ে গেছে ছেলেটার পরে। কিন্তু একি হ'ল হঠাৎ।

তাড়াতাড়ি সকলে ছুটল বলরামের বাড়ী। ভজহরি আর গেল না। কি ই বা হবে গিয়ে! সত্যিই যদি ভেমন কিছু হয়ে থাকে, তবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শেষ সময়টুকু পর্যন্ত দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি ওদের খবর দেবার ব্যবস্থা করা থাক।

ভজহরি বাড়ী চলে এলো। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে বেড়িয়ে পড়ল। ওঝা এসে গ্রাম বন্ধ দেবার আগেই সকলকে গ্রামে ফিরিয়ে আনতে হবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অসমীয়া মাসিক পত্ৰিকাৰ স্বত্ব ও অত্যাচাৰ বিষয়ে বিবৃতি
[সংবাদপত্ৰ রেজিষ্ট্ৰেশ্বন নম্বৰ ৪৮৭ কলকাতা অফিসৰ]
(৮নং কলকাতা)

- ১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা : ২০২ কৰ্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
- ২। প্রকাশের কাল : মাসিক
- ৩। মুদ্রাকরের নাম, জাতি, ঠিকানা : কীরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয়,
১০৬২এ, দেশপ্রাণ শাসনালয় রোড, কলিকাতা-৩০
- ৪। প্রকাশকের নাম, জাতি, ঠিকানা : কীরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয়,
১০৬২এ দেশপ্রাণ শাসনালয় রোড, কলিকাতা-৩০
- ৫। সম্পাদকের নাম, জাতি, ঠিকানা : লীলা রায়, ভারতীয়,
৩০২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিকাতা-৪৭
- ৬। স্বত্বাধিকারীর নাম, জাতি, ঠিকানা : লীলা রায়, ভারতীয়,
৩০২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিকাতা-৪৭

আমি কীরণচন্দ্র মিত্র, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। স্বাঃ
কীরণচন্দ্র মিত্র
প্রকাশক
১৬/৩/৬৮

পুস্তক পরিচয়

আধুনিক কবিতার ইতিহাস : আলোকরঞ্জন
দাশগুপ্ত; দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।
বাক-সাহিত্য : ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯।
দাম সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা। পৃষ্ঠা ২৭২।

যে কোনও সাহিত্যেই আধুনিকতা শব্দটিকে ঘিরে
তর্কবিতর্কের অন্ত নেই। কাকে বলবো আধুনিক, কি তার
চরিত্র-লক্ষণ, পূর্বশ্রোতা কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে তার যোগ এবং
বাবধান নির্ধারিত হ'তে পারে কোন মৌলিক সূত্রমালার
ভিত্তিতে ইত্যাদি প্রশ্নগুলি চিরকালই সমালোচকদের
ভাবিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঈষৎ উদ্বীর্ণ অন্তিমান এবং
স্বীকৃতি-স্ফুরিত 'আধুনিক কাব্য' কিম্বা 'কাব্যে নবত্ব' প্রবন্ধ
দুটি থেকে 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস' গ্রন্থটি পর্যন্ত নানা
আলোচনার যদি একটি সূত্র মনে রাখা যায় তাহলে
নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে পূর্বসূরীরা আধুনিকতার
অমুরাগী পাঠক-চৈতন্যে যে কথা বারবার নানা ভাবে
সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন পরবর্তী কালের তরুণ কবিসমাজ
(কেমনা এ গ্রন্থের অধিকাংশ আলোচকই প্রতিষ্ঠিত তরুণ
কবি) এবং প্রাবন্ধিকেরা তাকে একটি সংবদ্ধ আলোচনা-
ক্রমের মধ্যে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। ঠিক এই কারণেই
এ গ্রন্থ একটি ঐতিহাসিক মর্যাদার অপেক্ষা রাখে।

ঠিক 'ইতিহাস' বলতে আমরা যা বুঝি, এ গ্রন্থ অবশ্যই সেই
তথ্যাত্মক সংস্কার আওতার পড়ে না। কিন্তু সঙ্গে
সঙ্গেই আমরা এই গ্রন্থের উপ-শিরোনামটির প্রতি আকৃষ্ট
হই। সেখানে বলা হয়েছে যে বর্তমান গ্রন্থটি "বাঙলা

কবিতার আধুনিকতার সঞ্চার ও বিবর্তনের বৃত্তান্ত।"
'বৃত্তান্ত' শব্দের আভিধানিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে তা
"বিবরণ" 'বার্তা' 'সংবাদ'। অতএব উনবিংশ শতাব্দীতে
পুরনো দেবায়ত বাঙলা কবিতার বেদীতে কেমন করে নূতন
মন্ত্র এবং নূতন মাহুয়ের আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটলো, সেই মন্ত্র
রবীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্বের পর্বে পর্বে নানা দৃষ্টময় টানা-
পোড়েনের মধ্য দিয়ে, রবীন্দ্রবিরোধ এবং রবীন্দ্রবরণের নানা
দৃষ্টবিধুর পর্ব অতিক্রম করে কেমন করে উত্তীর্ণ হল পরবর্তী
ভিন্নভাবী এবং ভিন্ন-প্রকাশী আধুনিকতায়, তারপর এই
শতাব্দীর চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দশক অতিক্রম করে
সাম্প্রতিকতম সময় পর্যন্ত কেমন করে ঘটলো তার নানা
রূপান্তর তারই নানা 'বার্তা' 'বিবরণ' কিংবা 'সংবাদের'
আকর যে এ গ্রন্থটি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বাক্যে
'আকর' শব্দটির আগে 'নির্ভরযোগ্য' শব্দটি বসাতে পারলে
হয়তো সবচেয়ে অধী হওয়া যেত। কিন্তু, সম্পাদক দুজন এমন
কয়েকটি দারিদ্রহীন 'স্মৃতিচারণ' কিম্বা 'অসত্যক' বিচারকে
এখানে অন্তর্ভুক্তির ছাড়পত্র দিয়েছেন সেগুলির কথা মনে
রেখে উক্ত শব্দটি সমগ্রভাবে গ্রন্থটির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা
গেল না। 'সংবাদ' সেগুলি নিশ্চয়ই, কিন্তু এরকম নির্বিচার
'সংবাদ' পরিবেষণার দায়বহনই সমালোচকের একমাত্র
কর্তব্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত আধুনিক বাঙলা কাব্য সংকলনটির
ভূমিকা, আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত আধুনিক কাব্য সংকলনের ভূমিকা, বুদ্ধদেব বসু
সম্পাদিত আধুনিক বাঙলা কবিতার ভূমিকা, তাঁর স্বগ্রন্থ

‘কালের পুতুল’, ‘অ্যান এক্স অফ গ্রীন গ্রাস’ সাহিত্য চর্চার ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল’ নামক প্রবন্ধটি, বিষ্ণু দে র ‘কৃতি ও প্রগতি’ (পরবর্তী-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ) কিম্বা তাঁর সম্পাদিত একালের কবিতার ভূমিকাংশ, জীবনানন্দ দাশের ‘কবিতার কথা’; অরুণ নাথের সেই প্রসিদ্ধ কাব্যের মুক্তি নামীয় প্রবন্ধটি, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ‘তিনজন আধুনিক কবি’ এবং পরবর্তীকালে রচিত ‘আধুনিক কবিতার ভূমিকা’, অরুণ ভট্টাচার্যের আধুনিক বাঙলা কবিতার ‘ঋতুবদল’, শুক্লদত্ত বসু প্রণীত ‘আধুনিক বাঙলা কাব্যের গতিপ্রকৃতি’ দীপ্তি ত্রিপাঠীর উল্লেখযোগ্য ‘গবেষণা গ্রন্থ’ ‘আধুনিক বাঙলা কাব্য পরিচয়’, হরপ্রসাদ মিত্রের ‘কবিতার বিচিত্র কথা’, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ’, রঞ্জিত সিংহের ‘শ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি’, অমূল্য বসুর জীবনানন্দ-প্রাসঙ্গিক স্বতন্ত্র গ্রন্থ ‘একটি নক্ষত্র আসে’ কিম্বা এই গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যবিচার, ভবতোষ দত্ত প্রণীত ‘কাব্যবাণী’—আধুনিক কাব্যের উৎস এবং উজানের নানা অন্তরঙ্গ পরিচায়িকার স্বরে উল্লিখিত নানা আলোচনার কথা প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে। কিন্তু কেন জানিনা সম্পাদকেরা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ‘আধুনিক বাঙলা কবিতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা যে সব গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন সেগুলি প্রধানত : দীক্ষিতদের অঙ্ক।’ তাই সম্ভবতঃ ‘অদীক্ষিত’ পাঠক যারা আধুনিক বাঙলা কাব্যের ক্রম-পরম্পরা, তার ‘সঞ্চার’ এবং ‘বিবর্তনের’ বিষয়ে নেহাতই অনবহিত সেই ‘বৃহত্তর পাঠক-সমাজের উদ্দেশ্যে আরোজিত’ তাঁরা জানাতে চেয়েছেন ‘এই সংকলনের নামকরণ ও গ্রন্থ-পরিচয় থেকে জানা যাবে যে এর উদ্দেশ্য বহুলাংশে ভিন্ন।’

তাঁদের এই বৃহত্তর পাঠক সম্বোধন কি পরিমাণে চরিতার্থ হয়েছে সেটিই এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। বর্তমান আলোচনার একটি অচিন্তিত পূর্বলেখ রচনা করেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর ‘স্মৃতি’-শীর্ষক প্রথম আলোচনাটিতে ;

রবীন্দ্রনাথের কবিত্যভিষেকের নানাতর ‘ঋতুপরিবর্তন’ এবং তার সঙ্গে পরবর্তী সাহিত্যবোধের সংঘাত ও স্বাতন্ত্র্যের আলোচনা করেছেন শ্রী দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রনাথ নামক দীর্ঘ বিতীয় আলোচনাটির মধ্যে ; তারপর বাঙলা কবিতার চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশক এই তিনটি আপাত-বিচ্ছিন্ন কালপর্বের নানা পারিপার্শ্বিক এবং কবিতার উক্তি ও উপলব্ধিগত বিবর্তনের আলোচনা করেছেন যথাক্রমে অশ্রুকুমার শিকদার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত এবং তারাপদ রায়। এর পর এই পর্যায়বিভক্ত আলোচনার একটি সামগ্রিক পর্য্যালোচনা করেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘ফলশ্রুতি’ শীর্ষক আলোচনাটির মধ্যে। প্রাসঙ্গিক ভাবে ‘শব্দ’ ‘ছন্দ’ এবং ‘ছন্দোমুক্তি ও পয়ার’ এই তিনটি আলোচনার আধুনিক কবিতা প্রাকরণিক বিবর্তনের আলোচনা করেছেন যথাক্রমে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সজ্জ ঘোষ ও দীপকর দাশগুপ্ত। বাঙলা কবিতায় আধুনিকতার সঞ্চার ও বিবর্তনের এই ধারাবাহিক আলোচনার শেষে সম্পাদক রঞ্জন ‘পরিশিষ্ট’ অংশে ‘প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাব্যপাঠক’ ‘কবিতা ও সামাজিকতা’ ‘সংগীত কাব্য চিত্রকলা’ ‘আধুনিক বাঙলা কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহার’ ‘রূপকের সংকট’ ‘প্রতীকের প্রয়োগ’ ‘ছুরাণের প্রয়োগ’ ‘Mask বা মুখচ্ছদ’ ‘কবিতার সাময়িকী ও আধুনিকতা’ ‘বিভাগান্তর পূর্ববাঙলা কবিতা’ ‘কবিসমনীষা ও পরিভাষা’ ইত্যাদি আলোচনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে বাঙলা কবিতায় আধুনিকতার অমুঘদী কতকগুলি অনালোচিত-পূর্ব জরুরি প্রশ্নের অবতারণা করে আধুনিক কবিতার একটি সমগ্র রূপবৃত্ত রচনা করেছেন। সবশেষে যদিও অপূর্ণাঙ্গ, তবুও ১৯০০-১৯৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙলা কাব্যগ্রন্থ, প্রাসঙ্গিক আলোচনাগ্রন্থ, অরণীয় প্রবন্ধমালা এবং উল্লেখযোগ্য কবিতা-সাময়িকী গুলির কটি তালিকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

আলোচনাগুলির প্রণেতা যথাক্রমে অনীলকুমার মুখোপাধ্যায়,

কৃষ্ণ ধর, দেবভ্রাত মুখোপাধ্যায়, দেবভোষ বসু, কিরণশঙ্কর শেনগুপ্ত, অগ্নিপ্রাণ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (‘পূবাণ’ ও ‘মুখচ্ছদ’ দুটি পরপর আলোচনা), সুবীর রায়চৌধুরী, আশরাফ সিদ্দিকী এবং রঞ্জিত সিংহ। গ্রন্থপঞ্জিটির সংকলয়িতা নচিকেতা ভরদ্বাজ।

উপরের আলোচনা পরিসরটির দিকে চোখ ফেরালে যে কোনও পাঠকই সর্বাত্মক যে বিষয়ে তাকুষ্ঠ বোধ করবেন সেটি এর সুপ্রসার প্রসঙ্গ-বিচিন্তা; যে কোন পাঠকই প্রত্যাশা রাখবে যে, ঐ আলোচনাগুলির সূত্রমালা অনুসরণ করে সে তার চেতনালোকে এক অনাবিকৃত ভূখণ্ডের আনন্দিত পরিব্রাজকের স্বাধিকার অর্জন করবে। প্রথমেই বলে রাখা ভালো আধুনিক কবিতার রূপ ও রীতি সম্পর্কে যারা কিঞ্চিৎ ওয়াকিবহাল, কবিতার বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে যারা কিঞ্চিৎ অবহিত তাদের কাছে এ বই-এর মূল্য অনেকখানি, কেননা তাদের জিজ্ঞাসার বহুতর আলোকিত সমাধান পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে; কিন্তু, প্রশ্ন উঠবে ঐ ‘বহুতর পাঠকসমাজের’ পক্ষ থেকে। ‘সূচনা’ অংশে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আধুনিকতার একটি অসামান্য প্রস্তাবনা রচনা করেছেন; তাঁর আলোচনার সূত্র-নির্ভর সূত্রীকৃত রবীন্দ্র-পূর্ব এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের চারিত্র-বিচারে এবং উভয়পর্বের সংযোগবাহ রবীন্দ্রমানসের ক্রমবিবর্তমান অন্তঃস্বরূপ উন্মোচনে বিশ্বাস্যকর মনোযাত্রা প্রমাণ রেখেছে; কিন্তু তৎসম শব্দের নূতনার্থবাহী ব্যবহার, বিশ্ববিজ্ঞানসংগঠী মনোষ্যকে প্রসঙ্গমত স্বরণ করবার প্রবণতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনা এবং উল্লেখ অনীক্ষিত কাব্য পাঠকদের সঙ্গে কতদূর ‘কমিউনিকেটেড’ হবে যে সমস্তাটা বিচার্য। “উজ্জ্বলিত সকল কবিই সেই গগননিরপেক্ষ মহত্বকে কখনো না কখনো স্পর্শ করেছেন, কিন্তু তার জাফগর্ভস্থিত বৈদ্যুতিক গহবরে নিজেদের সমর্পণ করেননি।” (পৃ: ১৩) উপরের বড় অক্ষরের উল্লেখটির সামনে এসে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করতে

পারেন বলে বর্তমান আলোচকের মনে হয়েছে, যেমন একই রকম অস্বস্তির মুখোমুখি হতে হয় দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় আলোচনাটির সম্মুখীন হয়ে। দেবীপ্রসাদের দীর্ঘায় তথ্যসমাহার এবং তথ্যব্যবহার খুবই প্রতর্কসিদ্ধ কিন্তু তিনিও কখনও বা নিজেকে সমর্পণ করেছেন অশ্বজু এবং কাব্যশোভী এক ধরনের গল্প ভাবভঙ্গির হাতে—উদ্দেশ্য হয়তো বক্তব্যের ব্যঞ্জনা বাড়ানো, কিন্তু তা কতদূর পাঠকদের কাছে পৌছায় সন্দেহ থেকে যায় সে বিষয়ে; আবার মনুস্মৃতি প্রসঙ্গে যখন তিনি লেখেন ‘পরক্ষণে প্রমিথ্যুস থেকে আইভান কারামাসফ্ পর্যন্ত বিজোহী শোভাযাত্রায় অত্যন্ত সপ্রতিভ অনাম্যানে মানিয়ে যায় রাবণকে’ (পৃ: ৩৫); এবং ‘পূর্বোক্ত কীটস ‘ease my heart of verse and let me nest’ বলে সেই ক্রপণী হ্রিংকেল মানীয় আবেশিতিকটির কাছাকাছি এনে ফেলেছেন আমাদের (পৃ: ৩৬) এবং ক্রমজায়মান সামাজিক চেতনার অভিমুখী রবীন্দ্রমানস প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি যে তিনি ফিরেছিলেন ‘বোললেয়েরের মর্বিডিটি থেকে গ্যেটের অবিচল স্বাস্থ্য, ক্রমশঃ অভীষ্পিত সৌরকর সান্নিধ্যে। (পৃ: ৩৮); ও বিচারের মূল্যবস্তা স্বীকার করেও একথা বলা যেতে পারে যে বর্তমান গ্রন্থের অন্ততম সম্পাদক নিজেই হয়তো তাঁদের প্রস্তাবিত গ্রন্থ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যটি বিন্ধিত হয়েছেন। অন্তরিক্ত অক্ষণকুমার মুখোপাধ্যায় হয়তো যথার্থই ইতিহাস লিখতে চেয়েছেন ‘রবীন্দ্রমুহুর্তে’, কিন্তু তিনি আবার যতখানি তথ্যনিষ্ঠ ততখানি তথ্যসংশ্লেশী নন, ফলে তাঁর লেখায় অতি সরলীকরণের প্রশ্ন থেকে গেছে অনেকখানি। দশক ধরে কবিতার বিচার কিম্বা সাহিত্য বিচারের সঙ্গতি কতদূর সে বিষয়ে প্রশ্ন জাগলেও মোটামুটিভাবে চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট ইত্যাদি পরস্পাতিক্রম দশকের কবিতার কুললক্ষণের বিচার আধুনিকতার বিবর্তমান চরিত্র-পরিচয়ে মোটামুটি একটা পদ্ধতি হিসেবে ঘূহীত হ’তে পারে। অশ্রকুমার সিকদার

প্রভূত তথ্য, সমকালীন পরিপার্শ্বগত বিস্তার এবং অব্যবহিত উত্তরাধিকারের পটভূমিকায় বাঙলা কবিতার 'চতুর্থ দশকের' আলোচনা করেছেন; তুলনামূলকভাবে তাঁর লেখার ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষতা যে কোন সাধারণ পাঠককে আকর্ষণ করবে, তবে তাঁর ছত্রকটি ছোটোখাট মন্তব্য কিম্বা, শব্দ সম্পর্কে পাঠক অবশ্যই জিজ্ঞাস্য কিম্বা দ্বিধিত হতে পারেন। যেমন ৮৬ পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত তাঁর 'চৈতন্যচিন্তা' শব্দটি, "রোমান্টিক আন্দোলন যখন স্তিমিত শক্তি তারপর একদল কবি চিত্তল প্রি-র্যাফেলাইটে, হরিরদ্রোশ মকবইয়ে, ইমেজিজমের ছত্রঙ্গপদে জর্জিয়ান গোপগাথার নকল ভাটিয়ালে দেখা দিয়েছিলেন", (পৃ: ৮৮) ইত্যাদি পংক্তির অনুবাদধর্মী ইঙ্গিতময়তা, কিম্বা 'বিবস্ত্র বার্থতা' (পৃ: ১১), কিংবা স্বীকৃত-নাথকে একবার 'বুদ্ধির সন্ন্যাসী' নামে অভিহিত করে আবার এরকম মন্তব্য করা 'স্বীকৃতনাথ মননশীল কবি, বিয়ু দে বুদ্ধিমান কবি' প্রভৃতি উক্তি একটু অন্তরকম মনে হলেও তাঁর আলোচনায় বাঙলা কবিতায় আধুনিকতার জন্ম এবং আত্মবিকাশের একটি পালাবদলের অরুণি পরিচয় মেলে। তুলনায় 'পঞ্চম দশকের' আলোচনায় প্রণবেন্দু দশগুপ্তের লেখাটিকে বেশ একটু অসংলগ্ন এবং অমনোযোগী বলে মনে হয়। একথা ঠিক যে পঞ্চম দশকের বাঙলা কবিতায় মার্কসীয় ধ্যানধারণার প্রত্যক্ষ প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল অংশত, কিন্তু তিনি যেমন ভেবেছেন ঠিক তেমন যান্ত্রিকভাবে ঐ কালের কবিদের বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী এই দুটি জল-অচল শিবিরে ভাগ করা যায় কি? এবং তাঁর "যতদূর জেনেছি তখন বিস্তৃত বামপন্থী কবির দক্ষিণপন্থী সাহিত্যের ছায়া মাড়াতে না, সুসুধান দক্ষিণপন্থীরা প্রগতিশীল বা তথাকথিত প্রগতিশীল কবিদের সঙ্গে কলহতৎপন্ন থাকতেন" (পৃ: ১০৯) কিম্বা হুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার লঘু অথচ ক্ষিপ্ত-গতিময় শব্দশক্তি প্রসঙ্গে তার অরণোক্তি "ইমেজিষ্টদের জন্ত লেখা পাউণ্ডের সেই বিখ্যাত ফতোয়ার এই গুণটির উল্লেখ

ও সমর্থন আছে, এবং হুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাকর্মে এই গুণটির বিবর্তন লক্ষ্যীয়।" (পৃ: ১০৯)—এ সব ক্ষেত্রে তাঁর কাছে ৭১রও কিছুটা বিশ্লেষণী স্বচ্ছতা প্রত্যাশিত ছিল। সব মিলিয়ে এটুকু বলা যায় যে এই দশকের কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য তিনি হয়তো খুঁজেছেন, কিন্তু আলোচিত কবিদের চেনাতে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ তিনি উপস্থাপিত করেননি। 'ষষ্ঠ দশকের' আলোচনা করেছেন তারাপদ রায়। আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় তার নীচে 'স্মৃতি-বিচিত্রা' নামটি সম্ভবতঃ সম্পাদকেরা বসিয়ে দিয়ে একটা বিস্তারিত তথ্য এবং হুজুরিষ্ঠ আলোচনা থেকে তারাপদ রায় এবং নিজেদেরও রেহাই দিয়েছেন। এই 'স্মৃতি-বিচিত্রা'র অন্তর্ভুক্তিতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু এরই সঙ্গে যদি আর একটু বিচার শাসিত নিরাবেগ তথ্যগ্রাহ্য কোনও পরিচায়িকা সম্পাদকেরা অন্তর্ভুক্ত করতেন তাহলে হয়তো সবদিক থেকেই প্রসঙ্গটির প্রতি যথোপযুক্ত সুবিবেচনা করা হতো। অত্যন্ত 'নষ্টাল্জিক' গলায় কিছু কবি, কবিতা-সংক্রান্ত কিছু মনে পড়ার মত প্রসঙ্গ, কিছু কবিতার পংক্তি, কিছু ভালো-লাগা কবিতা পুস্তকের নাম-প্রসঙ্গ—সাহিত্যের ইতিহাসে এই উপস্থাপন-রীতি উপযোগিতায় নিজেই সন্দেহ পোষণ করে তারাপদ রায় তাঁর প্রসঙ্গটির আলোচনা-কৃত্য উদ্দ্বাপন করেছেন। তাঁর লেখার অধ্যয়নের ভার নেই, আছে মরমীর আন্তরিকতা—যে কারণে পরবর্তী ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে এই স্মৃতি স্মরণভিত্ত তথ্যগুলিরও মূল্য হয়ত নেহাতই উপেক্ষণীয় নয়।

'ফলশ্রুতি' অধ্যায়ে দেবীপ্রসাদ খুবই আন্তরিকভাবে সচেত্ন হয়েছেন বাঙলা কবিতার এই বহুদা শ্রোতের উদ্দেশ্য তরঙ্গগুলিকে অনুধাবন করার, কিন্তু এখানেও সমালোচক দেবীপ্রসাদ প্রায়শঃই কবি দেবীপ্রসাদের দ্বারা সমাক্রান্ত, আর তাঁর কবিতা প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক অভিনিবেশ বৃহত্তর পাঠক সমাজের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সেতু না হয়ে হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আশা করি

এ গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে এ সমস্তটি তাঁরা একটু ভেবে দেখবেন। ‘শব্দ’ ‘ছন্দ’ এবং ‘ছন্দোমুক্তি ও পদ্য’— এই তিনটি আলোচনার মধ্য দিয়ে-প্রকরণগত আলোচনার আলোকরঞ্জন ব্যক্তিগত শব্দব্যবহারগত তির্যকতাটুকু মেনে নিয়ে স্থলিখিত, এবং ‘কাব্যের ইতিহাস যে তার টেকনিকের ইতিহাস’—লই আরগীর এই উক্তির সার্থক বিশ্লেষণও বটে। পরিশিষ্ট অংশের প্রতিটি রচনাই প্রতীচিদীপ্ত এবং আধুনিক বাঙলা কবিতার নানা অব্যবহিত সমস্তার তথ্যময় উৎস, তবুও তার মধ্যে জগন্নাথ চক্রবর্তী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় কিম্বা আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের লেখা ‘পুরাণের প্রয়োগ’ নামক রচনাটির কথা মনে পড়ে। জুবীর রায়চৌধুরীর প্রবন্ধটি সম্পর্কে মতপার্থক্যের অবকাশ অবশ্যই থেকে যায়, কিন্তু উপযুক্ত তথ্যের সমাহারে তিনি যে প্রয়োজনীয় প্রশ্নটির অবতারণা করেছেন তার ইতিহাসনিষ্ঠ মূল্যবস্তা অনস্বীকার্য। প্রবীণ কবি আশরাফ সিদ্দিকীর লেখাতেও তথ্যের পরিমাণ কম নয়, কিন্তু তাঁর লেখাতে বিভাগান্তর পূর্ববাঙলার কাব্য-জগতের যে সমগ্র চারিত্র্য প্রত্যাপিত ছিল তা ঠিক মেনে না। একধরনের ছাত্র পাঠ্য-গ্রন্থের অতি সরলীকরণ তাঁর লেখায় যেন ছাপ ফেলেছে। আধুনিক কাব্য সমালোচনায় ব্যবহৃত পরিভাষার একটি যুগপৎ শ্রম ও বিচারনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন রঞ্জিত সিংহ। গ্রন্থপঞ্জিটির অসম্পূর্ণতা বিষয়ে সংকলক এবং সম্পাদকেরা সবাই অবহিত, জুতরাং সে

সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলে বলা যায় যে বাঙলা কবিতার একটি প্রাণাণ্য গ্রন্থসৃষ্টি রচনার প্রাথমিক কর্তব্য পালনে নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রভূত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

সম্পাদক দুজন সাধারণ পাঠক সমাজের জন্ত একটা আধুনিক কবিতা বোধিনী কেন প্রণয়ন করলেন না আমার বক্তব্য নিশ্চয়ই সে রকম নয়। কিন্তু পাঠকের দীর্ঘলিখিত আলস্যকে সচকিত করতে গেলে আলোচক যে নিতান্তই কোনও বিশেষ নির্বাচিত পাঠকের জন্ত লিখছেন না বরং তাঁর উদ্দেশ্য পরিধি যে বিস্তৃত তার প্রমাণ দিতে হয় আলোচনান্তির সর্বজনগ্রাহিতার মধ্য দিয়ে। দুঃখের বিষয় কাব্যোৎসাহী অনেক সাধারণ পাঠকের পরিসংখ্যানে জেনেছি এ গ্রন্থ পাঠ করতে গিয়ে তাঁদের আগ্রহ প্রতিহত হয়েছে আলোচনান্তির তির্যকতারই জন্ত। তবে আলোচনার প্রথম দিকে যে গ্রন্থগুলি বা প্রবন্ধগুলির কথা স্মরণ করেছি এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে তার থেকে আলাদা জাতের এমন একটি বই যা যে কোনও মনোযোগী পাঠককেই নূতনতর নানা জিজ্ঞাসায় অগ্ৰগণিত করবে। আর সেখানেই এ গ্রন্থের পরিকল্পনা এবং প্রশঙ্গ-বিচ্ছাণের জন্ত সম্পাদক দুজন ধন্যবাদার্থ। একেবারে হাল আমল পর্যন্ত আধুনিক বাঙলা কবিতা যে কত পথ পেরিয়ে এল, পেরিয়ে এল কভরীক, এই সংকলনের বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলির তাৎপর্যময় ‘ঐকিকতার’ স্বত্রে ‘বাঙলা কবিতায় আধুনিকতার’ সেই সঞ্চার ও বিবর্তনের এই বৃন্তান্ত ভবিষ্যৎ প্রাণাণ্য ইতিহাসের এক স্মরণীয় উত্তরাধিকারের মর্যাদায় অবশ্যই গ্রন্থ হবে—সেদিক থেকেও সম্পাদক দুজনের ভূমিকা মনে রাখবার মতো।

জুশান্ত বসু

সম্পাদকীয়—(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এ যাবৎ ফাঁপাই মুদ্রা (deficit financing) দিয়ে ঘাটতি মেটাবার বিরোধী ছিলেন। ঘাটতির কারণ দিতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেন অব্যবহৃত বৈদেশিক সাহায্য এবং রাজস্বের আদায়ে ঘাটতি; চলতি বাজেটে ৮৬৫ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু মন্দার দরুন তার মধ্যে ১০২ কোটি টাকা

ব্যবহৃত হয়ে গেছে। আমদানী তুচ্ছ, রেলের রাজস্ব, ডাক ও তার বিভাগের রাজস্ব এবং পাবলিক সেক্টর শিল্পে আরে ঘাটতি রাস্তা ঘাটতির জন্ত দায়ী। ফাঁপাই মুদ্রার সাফাই দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেন: “If I have reconciled to a deficit next year, it is in the expectation that by assisting the revival of the economy at this stage, we shall be able to

achieve a more satisfactory budgetary balance.” ফাঁপাই মুদ্রাব পরিণতিতে মুদ্রাস্ফোতি অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক বাজেট পরিস্থিতি বৃষ্টি কববে বলে মোবারকজী দেশাই যে আশা পোষণ করেছেন তার পেন্‌ছনকার বৃদ্ধি হল এবারকার ভাল ফসল খাচমূল্য চড়তে দেবে না এবং আগামীবারের শিল্পোৎপাদন শতকরা ৫ থেকে ৬ ভাগ বৃদ্ধি পেলে চাহিদা ও যোগানে সামঞ্জস্য স্থিতি হয়ে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করবে। এটা অমুমান মাত্র। গত তিনটি পবিত্রনায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মূল্যস্তর রোধে ব্যর্থতা এ-সম্পর্কে নুতন কোনো আশার সঞ্চার কববে না।

এমুটি ডিপজিট রদ করে মোবারকজী দেশাই অবশ্যই ধন্যবাদার্থ হয়েছেন। কিন্তু খাম, পোষ্টকার্ড, মণি অর্ডার, রেজিস্ট্রী প্রভৃতি ডাক-তারের মাণ্ডল বাড়িয়ে দরদ্রের ওপর অপ্রত্যক্ষ কর চাপিয়েছেন। কারখানায় তৈরী তামাকের ওপর শতকরা দশ ভাগ শুদ্ধ বৃদ্ধি হয়ে দরদ্রের বিড়ি-সিগারেটের ওপরও টান পড়েছে। নুতন যে ছয়টি দ্রব্যের ওপর উৎপাদন শুদ্ধ ধার্য হয়েছে, তার সব কয়টিতেই বিলাস-দ্রব্য বলা যায় না। অপর পক্ষে করপোরেট সেক্টরে নানা দিকে করভার লাঘব করে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেবার অঙ্কুহাত সম্পদশালীদের রেহাই দিয়েছে। ডিভিডেণ্ড ট্যাক্স বাতিল, ডিভিডেণ্ডের আয়ের প্রথম ৫০০ টাকা থেকে কর মুকুব, অর্জিত ও অনর্জিত আয়ের নির্দিষ্ট সীমার ওপর পৃথক সারচার্জ বাতিল, কোম্পানী আয়ের সারট্যাক্স শতকরা ৩৫ থেকে ২৫এ হ্রাস প্রভৃতি ব্যবস্থা সে-সাক্ষ্য বহন করছে। নুতন ৬৫.৭৩ কোটি টাকা ধার্য করের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ দশ কোটি, উৎপাদন শুদ্ধ ৩৫.৪৩ কোটি এবং কাষ্টমস থেকে ১২.৩০ কোটি টাকা আদায় হবে।

বাজেটে ১৮৫৯ কোটি টাকা আগামী বছর প্র্যানের জন্ম ববান্দ হয়েছে; চলতি বছরের চাইতে ৫০ কোটি টাকা

বেশী। এ-থেকে ৬১৫ কোটি রাজ্য প্র্যানগুলিতে, ৩৫ কোটি টাকা ইউনিয়ন এলাকায় ব্যয় হবে। অতরাং কেন্দ্রীয় প্র্যানের ববান্দ ১,১৭৯ কোটি টাকা, তার মধ্যে ১১০ কোটি টাকা বোকারো ইস্পাত কারখানার জন্ম। প্রতিরক্ষা ব্যয়ের মাত্রাও এ-বছরের তুলনায় ৪৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১০১৫ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। এ ছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্ম খাচ-ভাণ্ডার স্থিতিতে ১৪০ কোটি ব্যয় হবে।

সরকারী ঋণ এবং বৈদেশিক ঋণ—দুইই মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাবে। সেই অমুপাতে ঋণের দেয় অদের মাত্রাও। গত তিন বছরে সরকারী ঋণের পরিমাণ ৩৯৫০.৫৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে; চলতি-বছরের সরকারী ঋণের পরিমাণ ১১,৯৫৯.৮৪ কোটি টাকা, '৯৬৫-৬৬ সনে তা ছিল ৮০০৯.২৭ কোটি টাকা। আগামী বছর এই পরিমাণ আরও ১১৯৭.৩২ কোটি টাকা বাড়বে। বিদেশে সরকারী ঋণের পরিমাণ গত তিন বছরে দ্বিগুণ বেড়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে যেখানে এই ঋণ ছিল ২৫৯০.৬২ কোটি টাকার, চলতি বছরে তার পরিমাণ ৫৪০০.৭৮ কোটি টাকার। চলতি বছরের ৫০৮ কোটি ঋণের অদের পরিবর্তে এবারকার দেয় অদ ৫৫০ কোটি টাকার।

বাজেট পেশের পরই-রিভার্ড ব্যাক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কের অদের হার ৬ টাকা থেকে ১৯৬৪ সালের ৫ টাকায় কমিয়ে এনে অলভ টাকার পথ অগম করে দিয়েছেন। মজুতদারেরা এই অযোগ্য না নেয়, সেদিকে কঠোর দৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। এর ফলে মুদ্রাস্ফোতিও দেখা দিতে পারে। তবে বিনিয়োগের জন্ম বেশী টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা এবং কম অদে ঋণ পাবার অযোগ্যে শিল্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে কর্ম-সংস্থানের অযোগ্য যদি বৃদ্ধি পায় এবং মন্দা দূরের অমুকুল পরিস্থিতির স্থিতি হয় তবেই এই নুতন নীতির সার্থকতা।

১৬.৩.৬৮

5 APR 1968

প্রতিদিন
প্রতিঘরে



লক্ষ্মী ঘি

সকলকে তৃপ্তি দেয়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরি

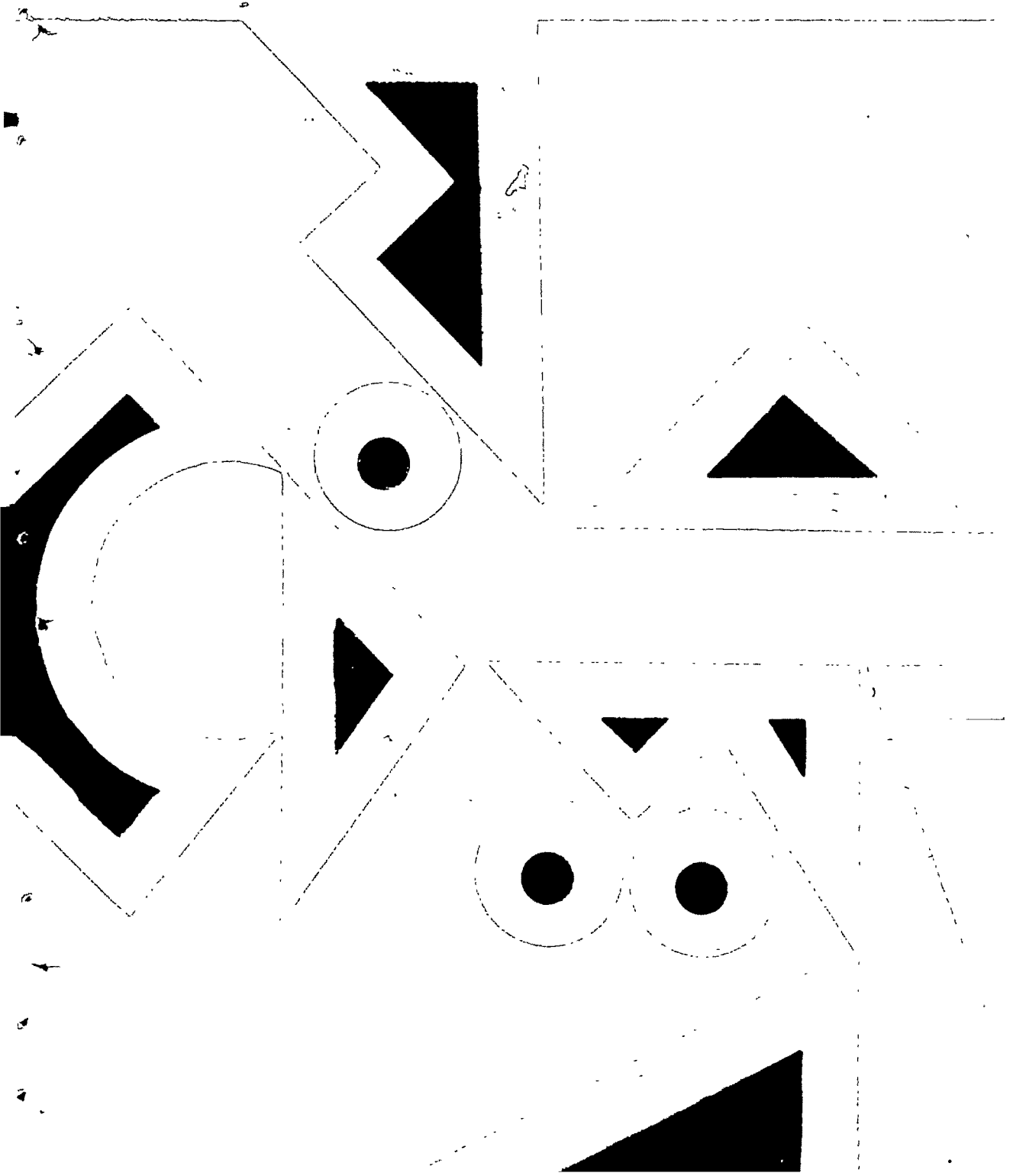
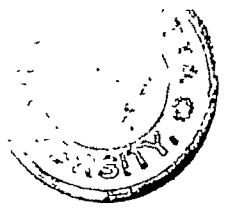
খাবার বেশ

সুস্বাদু ও রুচ্য হয়

16 4/67

ପୃଷ୍ଠା
୨୭୫୫

ସମ୍ପାଦନା :
ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ





জয়ন্তী

৩২ বর্ষ • দ্বাদশ সংখ্যা • চৈত্র ১৩৭৪

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞপ্তি

প্রায় তিন মাস হোলো শ্রীযুক্ত লীলা রায় হাসপাতালে আছেন। সাধারণভাবে তাঁর স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি হলেও, তিনি এখনও বাকশক্তি ফিরে না পাওয়ার উদ্বেগের কারণ রয়েছে। শরীরের ডান দিকের অবশ অবস্থারও খুবই ধীর উন্নতি হচ্ছে। অবস্থা দেখে মনে হয় আরও মাস দুই তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হবে। তিনি বাকশক্তি ফিরে পান এবং আবার সুস্থ হয়ে উঠুন এই প্রার্থনা জানাই।

পরিচালক মণ্ডলী
জয়ন্তী

ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়

বাংলাদেশের প্রথিতযশা সাহিত্যসেবী, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় মাত্র ৪৪ বছর বয়সে গত ৩১শে মার্চ পরলোকগমন করেছেন। কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রথীনবাবু অতি অল্প সময়েই তুল্লভ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, এবং বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের গভীর গবেষণায় নিযুক্ত থেকে সেই প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত সমৃদ্ধির

পথে অগ্রসর হবার প্রতিশ্রুতিও বহন করে চলেছিলেন। বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্ততম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিকরূপে ইতি-মধ্যেই রথীনবাবুর স্থান চিহ্নিত হয়েছিলো। তাঁর বাগ্মিতা, বাচনভঙ্গী ও শব্দচয়ন তাঁর বক্তব্যকে স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ ও প্রাণবন্ত করে তুলতো। 'জয়ন্তী'র সঙ্গে রথীনবাবুর সম্পর্ক ছিল গভীর ও নিবিড় এবং রথীনবাবুর অনেক প্রবন্ধ জয়ন্তীর পৃষ্ঠায় প্রকাশের সুযোগও আমাদের হয়েছিল। এই প্রতিভাধর

বাঙালীর অকাল বিয়োগে একটি বাঙালী মনীষার ধীর ও স্থির অভ্যুদয়ের পথে অকস্মাৎ ছেদ পড়ে গেলো। আমরা তাঁর বিদ্যুৎ সহধর্মিণী ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা এবং বিধাতার কাছে তাঁর আত্মার শান্তির জন্ত প্রার্থনা জানাচ্ছি।

ইউরী গাগারিন

পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী, সোভিয়েত রুশের গৌরব, ইউরী গাগারিন একটি মামুলী শিক্ষানবীশী বিমান পরিচালনার সময় মহাকাশচারী ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল ভল্যাডিমির সেরিওগিন সহ দুর্ঘটনায় গত ২৮শে মার্চ মারা যান। ১৯৬২র ১২ই এপ্রিল সর্বপ্রথম যেদিন গাগারিন মহাকাশ-যানে মহাকাশ প্রদক্ষিণ করেছিলেন সেদিন সমগ্র বিশ্ব সচকিত বিশ্বয়ে গাগারিনের এই কৃতিত্বে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল এবং মহাকাশ-বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সোভিয়েতের জন্ত মহাগৌরবের আসন নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গত বছর এপ্রিল মাসে মহাকাশচারী কোমারোভের মহাকাশে দুর্ঘটনায় মৃত্যু, সোভিয়েত মহাকাশ প্রোগ্রামে প্রথম দুর্ঘটনার সংবাদ বহন করে এনেছিল। গাগারিনের মৃত্যু হয়তো সোভিয়েতের মনুষ্যবাহী মহাকাশযান প্রেরণের কর্তৃত্বচী পিছিয়ে দিলো।

গাগারিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহাকাশের সোভিয়েত দূতরূপে সুপরিচিত হয়ে পৃথিবীর মানুষের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। গাগারিনের মৃত্যুতে তাই শুধু সোভিয়েত রুশের অপূরণীয় ক্ষতি নয়, সমগ্র বিশ্ব আজ ভারাক্রান্ত চিন্তে গাগারিনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা স্তাপন করছে।

বোম্বে করপোরেশনে শিবসেনা

বোম্বে করপোরেশনের নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। বিগত করপোরেশনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার

উর্ধ্বে আরও তিনটি আসন তাদের করায়ত্ত ছিল। ১৪০ সদস্য বিশিষ্ট করপোরেশনে এবার কংগ্রেস সদস্যদের সংখ্যা ৬৪ এবং কংগ্রেসের সহযাত্রী রিপাবলিকান দলের সদস্যসংখ্যা ২, অর্থাৎ কংগ্রেসের স্বপক্ষে ৬৬ জন। কিন্তু তার চাইতেও নারাজকল্পে বিপর্যস্ত হয়েছে সংযুক্ত সোশ্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট ও মাজ্জবাদী কম্যুনিষ্টদের সমন্বয়ে গঠিত সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্র সমিতি। গত করপোরেশনে এদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৪ এবং এরাই ছিল সব চাইতে বড় বিবোধী দল। এবার এদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। এবার এদের সংখ্যা ৬। সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্র সমিতিকে পরাজিত করে শিবসেনা নামক একটি স্থানীয় দল ৪০টি আসন দখল করেছে। এদের সহযোগিতায় পি, এস, পি ১১টি আসন দখল করেছে। এছাড়া রয়েছে জনসঙ্ঘের ৬টি, স্বতন্ত্র দলের একটি আসন লাভ হয়েছে।

মহারাষ্ট্রীয় ভোটারদের উপর কম্যুনিষ্ট প্রভাব শিবসেনা প্রায় নিষ্কিঙ্ক করে দিয়েছে। মহারাষ্ট্রীয়দের আর্থিক দুর্গতির ভিত্তিতে শিবসেনার অভিযান, কম্যুনিষ্ট অধ্যুষিত শ্রমিক এলাকায় মহারাষ্ট্রীয় মানসিকতাকে পুষ্ট করে কম্যুনিষ্ট ও অছাত্র বামপন্থীদের ঘায়েল করেছে। শিবসেনার বিপুল জয়, জাতীয় সংহতির পরিপন্থী কিনা সেটাই বিচার্য। মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্রীয়দের জন্ত, বাংলাদেশ বাঙালীদের জন্ত, আসাম অসমীয়াদের জন্ত এই মনোভাব প্রবল হয়ে উঠলে ভারতীয় সংহতি অনিবার্যভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু ভারতীয় সংহতির আশ্রয়ে যদি বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সমান সুযোগ সৃষ্টি না হয়, জাতীয় মানস ও আঞ্চলিক মানসের যদি সাংগঞ্জ বিধান না হয়, সমগ্র জাতির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে জাতিকে দুর্বল ও পঙ্গু করে ফেলবে। আঞ্চলিকতার বিষবৃক্ষ দূর করতে হলে জাতির অসম উন্নতির মূলোচ্ছেদ করে জাতীয় মানসের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা

দুই বছরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ৪০,০০০ অ-গভীর নলকূপ খনন করে বারোমাস ৪ লক্ষ একর জমিতে জল সেচের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তার ফলে অতিরিক্ত ২০ লক্ষ টন শস্য উৎপাদিত হবে। এই পরিকল্পনার জন্য ৪০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে, যার ত্রিশকোটি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিভিন্ন খাতে পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমান এই রাজ্যের জনসংখ্যা ১৯৬৯ সালে ৪ কোটিতে পৌঁছাবে। প্রতি বর্ষের দৈনিক ১৪.৪০ আউন্স শস্যের প্রয়োজন, এই হিসেবে ঐ বছরের শেষে রাজ্যের প্রয়োজন হবে ৬০ লক্ষ টন শস্য। শতকরা দশভাগ বীজের জন্য অপচয় হিসাব করলে বছরে শস্যের প্রয়োজন হবে ৬৬ লক্ষ টন। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় শস্যের উৎপাদন প্রায় ৫০ লক্ষ টন। সুতরাং আগামী বছর প্রয়োজন মেটাতে হলে আরও ২০ লক্ষ টন চাই।

বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ একর জমিতে চাষ হচ্ছে। এর মধ্যে ৩১ লক্ষ একরে সেচ ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বারোমাসে সেচের মাত্র একলক্ষ একরে ব্যবস্থা রয়েছে তাই আরও ৪ লক্ষ একরে সেচের ব্যবস্থা করতে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। একটি নলকূপ খননের জন্য ৫০০০ টাকা ব্যয় হবে এবং যে চাষীর নুনপক্ষে ৫ একর জমি আছে তারাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে এই পরিমাণ ঋণ নিতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই পরিকল্পনা কাগজে-কলমে খুবই উপযোগী মনে হলেও, প্রয়োগের দিক থেকে কতটা সার্থক হবে সেটাই লক্ষ্যণীয়।

স্পীকারের অরাজকতা

পাঞ্জাবের স্পীকার গত ৭ই মার্চ অকস্মাৎ দুই মাসের জন্য বিধান সভা মূলত্বী করে সাংবিধানিক অরাজকতার সৃষ্টি

করেছেন। পূর্বের দিন তার বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা হলে ১০২-সদস্য বিশিষ্ট সভার ৫৬ জন সেই প্রস্তাবের সমর্থনে উঠে দাঁড়ালে প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য দিন ধার্য করতেও স্পীকার স্বীকৃত হন। কিন্তু পরের দিন বাজেট আলোচনার গান্ধিখানে স্পীকার বিধান সভা মূলত্বী করে দেন। একটি অডিভান্স বলে পাঞ্জাবের গভর্ণর স্পীকারের সভা মূলত্বী করার ক্ষমতা বাতিল করে সভার হাতে এই ক্ষমতা হস্ত করেন। রাজ্যপাল সভা মূলত্বী করে পুনরায় সভা আহ্বান করলে সেই সভা বেআইনী এই অভ্যুত্থানে স্পীকার পুনরায় সভা দুই মাসের জন্য মূলত্বী করে চূড়ান্ত সাংবিধানিক অরাজকতা সৃষ্টি করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের স্পীকার ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ করে যে ভাবে বিধানসভার কর্তৃত্ব করে সভার সার্বভৌমত্ব শাসন বিভাগের পায়ের উল্লয় লুটিয়ে দিয়েছিলেন, পাঞ্জাবের স্পীকারও সে-পথ ধরেছেন। প্রয়োজন হলে সংবিধান সংশোধন করে এবং বিধান সভার নিয়মকানুন পরিবর্তন করে অবিলম্বে স্পীকারদের ডিক্টেটোরীর দৌরাত্ম বন্ধ করতে হবে।

সম্প্রতি লোকসভার স্পীকারের উদ্যোগে বিধান সভা ও পরিষদের স্পীকার ও সভাপতির বৈঠকে লোকসভার অধ্যক্ষ এই সমস্যাটির উপর প্রবলভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন স্পীকার সম্মেলন প্রায় তার সবটাই গ্রহণ করেছেন।

এই সম্মেলন সংবিধানে বিভিন্ন পর্যায়ে শাসন বিভাগ ও পরিষদীয় বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্কের সামগ্রিক আলোচনা করে পশ্চিম বঙ্গের ও পাঞ্জাবের অধ্যক্ষের আচরণের নিন্দা করে তাদের বিধান সভার ক্ষমতাহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। স্পীকারের মূলত্বী করার ক্ষমতা সীমিত করার অপারিশও এরা করেছেন। এরা স্বার্থহীনভাবে বলেছেন স্পীকারের কর্তব্য বিধান সভা চালু রাখা এবং পরিচালনা

করা। মন্ত্রীসভা সংখ্যালঘিষ্ঠ কিনা তার যাচাই হবে বিধান সভায়, রাজ্যপালের নিরিখে নয়। এবং বিধান সভা আহ্বানের দিন ধার্ষিক চূড়ান্ত দারিদ্ৰ মুখ্যমন্ত্রী ও তার মন্ত্রী-সভার, রাজ্যপালের নয়।

লোকসভার অধ্যক্ষ পরিষদীয় গণতন্ত্র রক্ষার জন্য অগ্রবর্তী হয়ে যে দারিদ্ৰ গ্রহণ করেছেন সেজন্য তিনি গণতন্ত্রের সকল কল্যাণকামীদেরই ধন্যবাদার্থ হবেন।

বিহারে পটপরিবর্তন

গত ১৮ই মার্চ বিহার বিধান সভায় আবার পট পরিবর্তন হয়েছে। ১৬৫-১৪৮ ভোটে বিদ্যেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডলের শোষিত দল সরকার পরাজিত হয়েছে। গত ২৫শে জুলাই ১৬৩-১৫০ ভোটে দশমাসের যুক্ত ফ্রন্ট সরকার পরাজিত হয়। শোষিত দল-কংগ্রেস কোয়ালিশনের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমণ্ডলকে যে সাংবিধানিক কারচুপী করে বিধান পরিষদে সরকারী মনোনয়ন দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের অযোগ্য দেওয়া হয়েছিল, সে কারণে এই সরকারের পতনে একটি গভীর সাংবিধানিক অনৈতিকতার সমস্ত পরাজয় হয়েছে। কংগ্রেস দলে। কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিশিষ্ট নেতার মণ্ডল মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভই এই মন্ত্রীসভার পতনের আস্ত কারণ। এরা কংগ্রেস দলভ্যাগ করে বিহার লোকতন্ত্র কংগ্রেস দল নামে যুক্ত ফ্রন্টের শরীক হয়ে প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী ভোলা পাসওয়ান শাস্ত্রীর নেতৃত্বে নূতন যুক্ত ফ্রন্ট সরকার গঠন করেছে। প্রথমত শ্রীশাস্ত্রীকেই এই যুক্ত ফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত করা হয়েছিল, শ্রীমহামায়া প্রসাদ সিং-এর পরিবর্তে। পরে দেখা গেল যুক্ত ফ্রন্ট পরিষদীয় দলের এবং যুক্ত ফ্রন্টের নেতা স্বাক্ষরে শ্রীশাস্ত্রী ও শ্রীমহামায়া প্রসাদ সিং নির্বাচিত হয়েছেন। ক্ষমতার এই দ্বৈততা, নূতন সরকারের দুর্বলতার স্বাক্ষর বহন করছে। এই সরকারের আয়ুও ক্ষণস্থায়ী অবশ্যম্ভাবী।

বেকার ইঞ্জিনিয়ার

ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে বেকারী ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। তারতবর্ষে এ-যাবৎ ৪০,০০০ ইঞ্জিনিয়ার—তাদের মধ্যে ৩৩,৫০০ জন ডিপ্লোমাদারী এবং ৬,৫০০ জন ডিগ্রিধারী—বেকার হয়েছেন এবং এই জুনের মধ্যে আরও ৫০ হাজার তাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন। ইঞ্জিনিয়ারীং পড়বার জন্য ভর্তির সংখ্যা অবিলম্বে না কমালে ৭৩-৭৫ সালে অথবা ৭৮-৭৯ সালে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রচুর আধিক্য দেখা দেবে। যদি দেশের আর্থিক স্থিতির উন্নয়নের হার গত পনের বছরে শতকরা ৩ ভাগ থেকে শতকরা ৯ অথবা ১০ ভাগে বৃদ্ধি করা যেতো, তবে ইঞ্জিনিয়ারদের বেকারত্ব ভয়াবহ হতো না।

তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি কোর্সে ইঞ্জিনিয়ারদের ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে অথচ তাদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রোজেক্টগুলির কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যে সব পরিকল্পনার প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের অবকাশ রয়েছে সেগুলি অবিলম্বে আরম্ভ করে দেশের বহু মেধাবী তরুণের জীবনে ব্যর্থতা ও হতাশা ঘূর করবার জন্য ভারত সরকারকে কাল বিলম্ব না করে এগিয়ে আসতে হবে। বেকার ইঞ্জিনিয়ারদের সাম্প্রতিক বিক্ষোভ এই ব্যর্থতাবোধে চিহ্নিত। শিক্ষামন্ত্রী ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে যে টেকনিক্যাল কোরের পরিকল্পনা করেছেন, তা একেবারে অবাস্তব। কারণ এই কোরকে ফলপ্রসূ কাজে নিয়োগ করতে হলে আরও প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। তাছাড়া বেকার ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য অর্থগততার সৃষ্টিতে অত্যন্ত বেকার গোষ্ঠীদের জন্যও সেই সম্ভাবিত সৃষ্টির দাবী উঠবে। এই ধরনের অর্থব্যয় করে তার বিনিময়ে উৎপাদনমূলক সম্পদ না পেলে একদিকে যেমন প্রচুর অপচয়ের সম্মুখীন হতে হবে, অন্যদিকে পরিণামে এদের মধ্যে হতাশা আরও বেশী বৃদ্ধি পাবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

গত ১৫ই মার্চ কলকাতার হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিলে সরকারী ও বে-সরকারী চেষ্টায় অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তা প্রশমিত হয়। গত ১৭ই মার্চ কয়েক ঘণ্টার জন্য উপকৃত অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রীর অধোষিত সফর শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সহায়ক হয়েছে। এলাহাবাদেও দাঙ্গা হয়ে গেছে একই সময়ে। কিছুদিন পূর্বে কাছারেও অসুস্থরূপ ঘটনা ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক ইন্ধন যুগিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পেছনে পাকিস্তান ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক-কারীদের কতটা হাত আছে, দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীদেরও বা কতটা সংযোগ আছে, তা অবিলম্বে খুঁজে বার করে বে-আইনী কার্যকলাপ বিরোধী আইন প্রয়োগে তাদের দমন করতে হবে।

ভারত সীমান্তে চীনের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ১৯৬৭-৬৮ সালের বার্ষিক রিপোর্টে ভারত সীমান্তে চীনের বর্ধিত সামরিক তৎপরতার এবং চীনের আনবিক সময়সূচের দ্রুত উত্তোপের ফলে ভারতবর্ষের সীমান্তে বিপদ দ্রুত বৃদ্ধি সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। উত্তর সীমান্তে চীনের অবস্থান অধিকতর শক্তিশালী করে পূর্ব সীমান্তের দুই দিকেই বিদ্রোহীদের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। এ ছাড়া ভারত সীমান্তে চীন-পাকিস্তানের যৌথ সামরিক সংঘাত সম্পর্কে উল্লেখ করে রিপোর্টে এ কথাও বলা হয়েছে চীনা বিপদ দীর্ঘমেয়াদী হলেও, পাকিস্তানী বিপদের কতকগুলি উপাদান এর প্রকৃতি দীর্ঘমেয়াদী করে তুলতে পারবে না।

আসামে নাগা অঞ্চলে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক নাগারাজ্য ও অন্যান্য পাহাড়ী রাজ্য গঠনের জন্য প্ররোচনার পশ্চাতে যে চীনাধের প্রচেষ্টা হাত রয়েছে,

আসামে দ্রুত বোমা ও অস্ত্রশস্ত্রে চীনা চিহ্ন থেকেই তা বোঝা গেছে। বিদ্রোহী নাগাদের মধ্যে কেউ কেউ চীনে ধ্বংসাত্মক কাজ শিক্ষা গ্রহণ করে ফিরে এসেছে। নাগা বিদ্রোহীদের থেকে ধ্বংসাত্মক কাজে শিক্ষা গ্রহণ করে ফেরার পথে শিবসাগর জেলার পানিনোরা গ্রামের বাপুতে সৈন্যরা দ্রুত হলে এরকম আরও তেরজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাম্প্রতি আসামে দ্রুত ব্যক্তিদের সঙ্গে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টদের সম্পর্ক আছে বলে জানাও গেছে। সুতরাং সীমান্তের এপারে ভারতের অভ্যন্তরেও যে চীনা অমুচরদের অবিসম্বাদী অনুপ্রবেশ ঘটেছে সে সম্পর্কে কোনো সংশয় নেই।

উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন

১৫ই এপ্রিল উত্তর প্রদেশের বিধান সভা বাতিল করে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষিত হয়েছে। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতির ঘোষণা বলে বিধান সভা সাময়িকভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়। সরকার গঠনের চেষ্টা প্রায় দুই মাস সময় দেবার পর “সংযুক্ত বিধায়ক দল” কিম্বা কংগ্রেস কোনো পক্ষই স্থিতিশীল সরকার গঠনে সমর্থ নয় এই অজুহাতে রাজ্যপালের অমুদান ক্রমে বিধান সভা বাতিল হয়ে গেল। বিধান সভায় কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, আদৌ কারো কোনো গরিষ্ঠতা আছে কিনা সেটা যাচাই হবে বিধান সভায় ভোটে, রাজ্যপালের অমুদানে নয়। বিধান সভার প্রাধান্তের নীতি উত্তরপ্রদেশেও লঙ্ঘন করে কেন্দ্রীয় সরকার পরিষদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলকে আর একবার আঘাত করলেন।

মুজেরে বিধায়ক গজার জল

বারোশী তৈল শোধনাগারের আবর্জনার সঙ্গে পেট্রোল ও গ্যাস গজার জলে নিষ্কিপ্ত হলে যেমন গজাবন্ধে

অধিকাংশের সৃষ্টি করে কয়েকটি নৌকা ও গাধাবোট পুড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি মুন্সেরের নিকট গঙ্গার জল দূষিত হওয়ার সমগ্র মুন্সেরে সপ্তাহকাল জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে গোটা মুন্সের শহরের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং শহরের মানুষ দারুণ জলকষ্টের সম্মুখীন হয়। কলকারখানার আবর্জনা গঙ্গার নিকশিত হয়ে গঙ্গার জল দূষিত হওয়া সম্পর্কে পূর্বেই কেন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই, সেটাই গভীর বিষয়ের। এই ধরনের মহুস্ম্যষ্ট বিপদের জন্ম কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়েই দায়িত্ব রয়েছে এবং অবিলম্বে এ-সম্পর্কে তদন্ত করে কাদের দায়িত্বহীনতা ও অবিমুখ্যকারিতার এ-ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তার মীমাংসা করতে হবে।

উত্তর প্রদেশ, বিহার ও বাংলার গঙ্গার দুই কূল জুড়ে কলকারখানা গড়ে উঠেছে এবং তাদের আবর্জনা গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হয়ে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। গঙ্গার দুই তীরবর্তী অধিবাসীদের জীবন যাতে বিপর্যস্ত ও বিপন্ন না হয় সে সম্পর্কে অবিলম্বে সতর্কতা অবগমন করতে হবে।

পি, এস, পির যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ

রায়গঞ্জে রাজ্য পার্টি সম্মেলনে পি, এস, পি যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গত জানুয়ারী মাসে কানপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে গ্রহীত প্রস্তাবে যুক্তফ্রন্ট-গুলিকে আত্মঘাতীক্রিয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছিল এবং এই দলকে যত শীঘ্র সম্ভব কমিউনিষ্ট ও তাদের চক্রের সহযোগ ত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া কংগ্রেসকে পরাজিত করবার এবং জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও সনাজবাদী বিরোধী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করবার জন্ম জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমী শক্তিগুলির সংহতি সাধনে সচেষ্ট হতে বলেছিল; তা সম্ভব না হলে পি, এস, পি একলাই চলবে এ-কথাও বলা হয়েছিল।

রায়গঞ্জে কানপুর প্রস্তাবকেই পি, এস, পি পরিপূর্ণতা দিয়েছে। যুক্তফ্রন্টের আত্মপরাজয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি ও কমিউনিষ্ট এবং তার অনুচরদের সহযোগ ত্যাগের যে নির্দেশ কানপুর সম্মেলন দিয়েছিল, রায়গঞ্জে তা কার্যকরীরূপে নিদা। অতঃপর পি, এস, পি অকংগ্রেসী, অ-সাম্প্রদায়িক, পুঁজিবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী দলগুলির সংহতি সাধনে চেষ্টিত হবে। তা সম্ভব না হোলে নিজের শক্তির উপর ভর করে পি, এস, পি অগ্রসর হবে। নীতিবিহীন রাজনীতির ব্যর্থ ভেদ করে পি, এস, পি অজ্ঞাত জাতীয়তাবাদী দলগুলিকে পথ দেখিয়েছে। আদর্শবর্জন ও দলবর্জন রাজনীতি ও রাজনীতিক সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে অনীহা সৃষ্টি করেছে, তার ফলে অ-গণতান্ত্রিক শক্তির প্রভাবই বৃদ্ধি পাবে। আদর্শভিত্তিক রাজনীতি, রাজনীতির প্রতি এই অবজ্ঞা ও উপেক্ষার মনোভাব যদি কিছুনা-দূর করতে পারে, তবেই পি এস, পি-এর এই পদক্ষেপ সার্থক। পি এস, পি দ্রুততার পরিচয় দিলে সে-সম্ভাবনা রয়েছে।

পশ্চিম বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা

গত ২৫শে মার্চ পশ্চিম বঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকদের পক্ষ থেকে দিল্লীতে বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং রাষ্ট্রপতির নিকট তাদের পক্ষ থেকে ছয়-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি-দল একটি স্মারক লিপি দাখিল করেন। পশ্চিম বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা এখনও আবশ্যিক নয়, বিনা বেতনেও নয়। কলকাতায় গত বিশ বছরে একটিও নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থা শোচনীয়। শতকরা মাত্র ৩৮ ভাগ শিক্ষক শিক্ষণপ্রাপ্ত। শহর ও গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্ম সামগ্রিক আইন প্রণয়নের দাবী বহু পুরাতন। সে-সম্পর্কেও কিছু করা হয় নাই। শিক্ষকদের জন্ম বেতন ও ভাতা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা অনুপাতে দাবী করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীও পশ্চিম বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার শেচনীয় অবস্থা স্বীকার করে বলেছেন যে শিক্ষা-ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের এজিয়ারের অন্তর্ভুক্ত, কেন্দ্র তাদের সাহায্য করতে পারে মাত্র, এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুরুতর ক্রটিগুলির কিছু কিছু নতুন পরিকল্পনায় সংশোধনের চেষ্টা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কেন্দ্র কিছা রাজ্য কোনো সরকারেরই স্তোভবাক্যে সময়ক্ষেপণ করা চলবে না। জাতির কৃষি, শিল্প, প্রশাসন সকল উন্নতির ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা। সুতরাং, অগ্রাধিকার দিয়ে তার সর্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

হাসপাতালে ধমুষ্ঠকার

নীলরতন সরকার হাসপাতালে ও আর, লি, কর হাসপাতালে অজ্ঞোপচারের পর রোগীরা ধমুষ্ঠকার রোগে আক্রান্ত হবার কালে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অজ্ঞোপচার বন্ধ করে দিয়েছেন এবং সরকার থেকে তদন্তের ব্যবস্থা হয়েছে। তদন্তের ফলাফল যাই হোক না কেন হাসপাতালে অজ্ঞোপচারের রোগীর ধমুষ্ঠকারে আক্রান্ত হবার সংবাদ হাসপাতালগুলি যে মুক্তুর ফাঁদ সে কথাই ঘোষণা করেছে। হাসপাতালগুলি সামগ্রিকভাবে, অজ্ঞোপচারের ধরগুলি এবং অঙ্গসমূহ বীজাধমুষ্ঠ করবার অল্প অবিলম্বে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। অল্পাধিক জনমতের রোষ হাসপাতালের প্রশাসন বিপন্ন করে তুলবে।

১৫. ৪. ৬৮

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্ম

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ৯৫০। বার্ষাসিক ৪৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্ম স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্ম

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাঙ্গে দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিকার হরফে ফুলফ্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।
৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান

কলিকাতা-৪৭

In any language, it's sweet



In old French it was called ZUCHRE. In Arabic and Persian it is SUKKAR and SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek. One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other has been known to mankind from the neolithic age.

Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar.

Issued by :

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD. THE OUDH SUGAR MILLS LTD. NEW INDIA SUGAR MILLS LTD. THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD. BHARAT SUGAR MILLS LTD. GOBIND SUGAR MILLS LTD.

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PVT. LTD.

Industry House, 159, Churchgate Reclamation, Bombay-1

ASPIRES-1/60

আন্তর্জাতিক প্রগতি

হুনীল দাস

বুদাপেষ্ট বৈঠক

কিছুদিন পূর্বে বুদাপেষ্টে সাতশটি কম্যুনিষ্ট দেশের সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বে সোভিয়েত রুশের পুনঃস্থাপনার উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্ট দলগুলির শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠান। চীন-রুশের প্রকাশ্য ঘন্সের পর ১৯৬০ সালে শেষবারের মত চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিরা মস্কোর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ত্যাগ করে চলে আসে। তারপর এ যাবৎ এই দুই শিবিরের নৈকট্য দূরে থাকুক, ফাটল ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছে। চীনা শিবিরের সঙ্গে আলবানিয়ার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম ও কিউবা এই দুই শিবিরের আলিঙ্গন থেকেই নিজেদের ঝাঁচিয়ে চলেছে। যুগোস্লাভিয়া তো বহুদিন যাবৎই ষ্টালিনের নাগপাশ লঙ্ঘন করে সদর্পে এগিয়ে গেছে। পরবর্তীকালে ক্রুশ্চেভ এই দেশের সঙ্গে মৈত্রীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হলেও চীন-রুশ ঘন্সে যুগোস্লাভিয়া কখনও মস্কোর শিবিরে আসন গ্রহণ করে নি, যদিও চীনের নীতির প্রবল সমালোচকরূপে যুগোস্লাভিয়া চীনের বিযোক্তারে জর্জরিত হয়েছে। বুদাপেষ্টে এরা হাজির হয় নাই। আপানের কম্যুনিষ্ট দলও না।

রুমানিয়া : বহুকেন্দ্রিকতার জনক

বুদাপেষ্টে স্থির হয়েছে আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে চৈত্র ২

মস্কোতে কম্যুনিষ্ট শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সিদ্ধান্ত ছেয়টি দেশের সম্মিলিত আলোচনার ফলশ্রুতি। রুমানিয়া বুদাপেষ্ট সম্মেলন থেকে বার হয়ে যায় এবং মস্কো সম্মেলনে যোগ দেবে কিনা সে-সম্পর্কেও গভীর সংশয় রয়েছে। রুমানিয়ার মত হোলো কোনো সম্মেলনে এক কম্যুনিষ্ট পার্টি অপার কম্যুনিষ্ট পার্টির সমালোচনা করলে রুমানিয়া সে-সম্মেলনে যোগ দেবে না। রুমানিয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সম্মেলনে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির সমালোচনা না হয় এবং এরা বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখা। তাছাড়া, পূর্ব ইউরোপে রুশ-নিরপেক্ষ অবস্থান ও রুমানিয়ার পক্ষে দৃষ্টি সমস্ত। একমাত্র চীন-সোভিয়েত বিরোধের অযোগ্যেই রুমানিয়ার পক্ষে পূর্ব ইউরোপে রুশ-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অবস্থান সম্ভব। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর সোভিয়েত রুশ যুদ্ধের খেসারতের নামে রুমানিয়া থেকে বহু কারখানা, যন্ত্রপাতি সমূলে উৎপাটিত করে জাহাজ বোঝাই করে নিজেদের দেশে নিয়ে এসেছে। রুমানিয়ার কোম্পানীর পত্তন করে তাদের উৎপাদিত মাল জবরদস্তি সোভিয়েত রুশে রপ্তানি করিয়ে খেসারতের ক্ষতিপূরণ করেছে। রুমানিয়ার শিল্পায়নে ষ্টালিনের আমলে সোভিয়েত রুশ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে রুশ শিল্পের জন্ম কাঁচামালের যোগানদারের গর্বায়ে রুমানিয়ার অর্থনীতি অবনতিত রাখবার চেষ্টা করেছে। হুতরাং, সোভিয়েত রুশের আওতার বাইরে স্বনির্ভর কম্যুনিষ্ট আন্দোলন সৃষ্টির অনিবার্যতা রুমানিয়া খীর অস্তিত্বের খাতিরেই বোধ করে এসেছে এবং বর্তমান

রুশ-চীন সংঘাতের পটভূমিতে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে সোভিয়েতের অসপত্র নেতৃত্ব অস্বীকার করে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের বহুকেন্দ্রিকতার অস্বতন্ত্র জনকরূপে রুমানিয়া কম্যুনিষ্ট জগতে স্থান করে নিয়েছে।

যুগোস্লাভিয়া অবশ্য এ-পথের প্রথম পথিক। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে মস্কোর এককেন্দ্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে বহুকেন্দ্রিক আন্দোলনের দাবী দুর্বল হয়ে ওঠার স্বাক্ষর বুদাপেস্ট সম্মেলনে রুমানিয়া বহন করেছে। ইতালীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে এই আন্দোলনের জনক বলা যেতে পারে। অবশ্য যুগোস্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির পর। বুদাপেস্টে এই বহুকেন্দ্রিক প্রবণতাকে আপাতদৃষ্টিতে মেনে নিয়েও মস্কোর নেতৃত্ব বজায় রাখবার কৌশল নিহিত রয়েছে সোভিয়েত রুশের মনোভাবে। এই বহুকেন্দ্রিকতার দুর্বল দাবীর স্বীকৃতি স্বরূপ সোভিয়েত রুশ প্রতিনিধিদের নেতা অশলভ বুদাপেস্টে বলেছেন "neither during the preparation of such a conference nor at the conference itself can we at all think of denouncing or 'excommunicating' any party from the communist movement." এই ঘোষণার পর মস্কো সম্মেলনে মাওবাদের নিন্দা সম্ভব হবে না। তা না হলেও মস্কোতে এই শীর্ষ সম্মেলনের অমুঠান আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে মস্কোর নেতৃত্ব যে আজও কার্যকরী সে কথা পৃথিবীর অধিবাসীদের স্বরণ কবিয়ে দেবে এবং এই কম্যুনিষ্ট সংহতি প্রয়োজনমত চীন ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য মস্কোর হাতিয়াররূপে কাজ করবে।

কিন্তু মস্কোর পথ অথচ সহজ নয়। পৃথিবীর কমবেশী ১০টি কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে মাত্র ৬৭টি বুদাপেস্টে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। ১৪টি কম্যুনিষ্ট দেশের—যেখানে কম্যুনিষ্টরা শাসন ক্ষমতার আসীন—মধ্যে ৬টি দেশের প্রতিনিধি বুদাপেস্টে অমুপস্থিত ছিল। উপস্থিতদের মধ্যে রুমানিয়া সম্মেলন

বর্জন করে চলে যায়। যদি রুমানিয়া মস্কোতেও অমুপস্থিত থাকে, ইতালীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি কি করবে বলা যায় না। কারণ বহুকেন্দ্রিকতার ঝটিকা কেন্দ্ররূপে ইতালীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি কখনও মস্কোর আধিপত্য মেনে নিতে চাইবে না এবং এমন কি সমান মর্যাদা সম্পন্নদের মধ্যেও মস্কোকে উচ্চতর-মর্যাদা দিতে ইতালীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি নারাজ। চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি বুদাপেস্টে মস্কোর ১৯৫৭এর ঘোষণা ও ১৯৬০এর বিবৃতিগুলি স্রাস্ত বলে বাতিল করতে চেয়েছিল। বুদাপেস্টে চেকদের এই দাবী অবশিষ্ট সমর্থন পায় নাই। কিন্তু মস্কো সম্মেলনে পরিবর্তিত অবস্থায় যে এই দাবী আবার সোচ্চার হয়ে উঠবে না, তা নিশ্চিত বলা যায় না। সে-শীর্ষ বৈঠকে হয়তো এ-সম্পর্কে আরও দাবীদার দেখা দিতে পারে। ইতালীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কথাই ধরা যাক। তারা বুদাপেস্টে এ সম্পর্কে নীরব ছিল। কিন্তু এই নীরবতা তাদের শেষ কথা নাও হতে পারে। কিন্তু মস্কোও চতুরতায় কম যায় না। হয়তো 'সর্বনাশে সমুৎপাদে অর্থ ত্যজতি' নীতি গ্রহণ করে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিতে নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে স্বাধিকার দিয়েও আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে মস্কোর প্রচ্ছন্ন নেতৃত্ব আরও স্পষ্টতর করবার কৌশল আবিষ্কার করবে। অশলভ তার ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের বর্তমান লক্ষ্য ও কার্যক্রম কি হবে সে সম্পর্কে একটি নূতন দলিল রচনার কথা অশলভ বলে রেখেছেন : "The adoption of such a document would be the logical result of the big work we are commencing here at Budapest।" এই নূতন দলিলের সূক্ষ্ম শৃঙ্খলে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট আন্দোলন বাঁধা পড়লেই মস্কোর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে।

চেকোস্লোভাকিয়ার রক্তপাতহীন বিপ্লব

কিন্তু ইতিমধ্যেই বিদ্রোহের পতাকা উড়তে শুরু করেছে

পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে। গত জাহুয়ারী মাসে চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব পদ থেকে ষ্টালিনের সহচর নভোৎনি বিদায় নিতে বাধ্য হয় এবং ডুবচেচ তার স্বস্বত্ত্ব হয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করে। নভোৎনির সমর্থক এবং সেনাবাহিনীর প্রধান রাজনীতিক কর্মকর্তা যেক্সর জেনারেল জান সেজনা নভোৎনির সহায়তার জন্য সেনাবাহিনীকে কাজে লাগাবার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ডুবচেচ-এর সাক্ষ্যের পর সেজনা আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছে। সেজনা মস্কোর অনেক সামরিক গোপন তথ্য জানতো। সেই কারণে সেজনার পলায়ন মস্কোর উদ্বেগের কারণও হয়েছে।

মোন্টাক্সিয়ার অধিবাসী আলেকজান্দার ডুবচেচের চেক কম্যুনিষ্ট পার্টিতে ক্ষমতা দখলের কয়েক মাসের মধ্যেই চেক কম্যুনিষ্ট দল ও চেক কম্যুনিষ্ট সরকার থেকে প্রাচীনপন্থী কম্যুনিষ্টরা দ্রুত উৎসাদিত হয়েছে। গত জাহুয়ারীতে নভোৎনির পার্টি সম্পাদকের পদ থেকে বিতাড়নের পরই তার ক্ষমতাচ্যুতির দিনগুলি ঘনিয়ে এসেছিল। ষ্টালিনের আমলে যারা একবার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, তাদের প্রাণহানিও অবিলম্বে ঘটেছে। কিন্তু ক্রুশ্চেভের ক্ষমতাচ্যুতির পর থেকে বিরোধীদের লাঞ্ছনা জীবনহানির পর্যায় পর্যন্ত প্রসারিত না হয়ে, অপমান ও অসম্মানের বোকা নিয়ে পুরাতন আমলের নেতৃত্বকে বিস্মৃতির অন্তরালে সরে যেতে হয়েছে। ম্যালেনকভ, মলোটভ, কাগানোভিচ তার সাক্ষ্য বহন করছে, যদিও বেরিয়ায় মৃত্যুদণ্ড তার ব্যতিক্রম।

নভোৎনির ভাগ্যেও পরাজয় দ্রুত ঘনিয়ে আসছিল, তার যথেষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া গেছে। পার্টি সম্পাদকের পদ থেকে নভোৎনির বিতাড়নের পর লেখক ও সাংবাদিকেরা দলবদ্ধভাবে অধিকতর স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। “সমাজবাদী গণতান্ত্রিকরণের” (“Socialist democratisation”) তুমুল আলোচনা ও বিতর্ক

সমগ্র চেকোমোন্টাক্সিয়ার উত্তাল হয়ে ওঠে। ষ্টালিনীযুগের কঠোর নিয়ন্ত্রণের বাধা ভেঙে নমনীয়তার নব জাগরণের মুখে ছাত্র, সাহিত্যিক, লেখক, সাংবাদিকদের অবিসংবাদী ভূমিকা রয়েছে। নভোৎনি যে সাহিত্যপত্র নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল, গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তারই স্বস্বত্ত্ব নূতন সাহিত্যপত্র আত্মপ্রকাশ করে। এই সাহিত্যপত্রে কম্যুনিষ্ট শাসনে যা অভাবনীয় সেই স্বাধীন নির্বাচনের দাবী ওঠে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চেকোমোন্টাক্সিয়ার নিরপেক্ষতা দাবী করে। ডুবচেচ সংবাদপত্রের উপর বিধি-নিষেধও শিথিল করে দেন।

ডুবচেচের গতি-প্রকৃতি অধীরভাবে সোভিয়েত রুশের নেতৃবর্গ লক্ষ্য করতে থাকেন। ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরীর কথা তাদের মনে পড়ে। ছাগীর নেতৃত্বে হাঙ্গেরীতেও ষ্টালিনী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে চিন্তার ও সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ ঘূর্ণার হয়ে উঠে হাঙ্গেরীর জীবনের উপর সোভিয়েতের আধিপত্য নির্বাসনের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। সোভিয়েত রুশের বহুমুখি থেকে হাঙ্গেরীর স্বাধীনতার দ্রুত আকৃতি হাঙ্গেরীর বুদ্ধি-জীবীদের, ডক্টরদের বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করে। সেই বিদ্রোহ দমন করতে হাঙ্গেরীর উপর সোভিয়েত ট্যাঙ্ক কাঁপিয়ে পড়েছিল। সোভিয়েতের সেই নির্মম অত্যাচারের সহযোগিত্বপে এগিয়ে চলেছিলো হাঙ্গেরীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জানোশ কাগার। সেদিন সোভিয়েত রুশে ক্ষমতায় আসীন ছিলেন ষ্টালিন নয়, ক্রুশ্চেভ, যিনি সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বাবিশতীতম কংগ্রেসে ষ্টালিনী আমলের নির্মম অত্যাচার ও সম্রাটের কাহিনী উদ্ঘাটন করে সোভিয়েত রুশের জনজীবনে নমনীয়তার স্রোত বইয়েছিলেন।

ডুবচেচ সোভিয়েত উদ্বেগকে প্রশমিত করতে চাইলেও চেকোমোন্টাক্সিয়ার আভ্যন্তরীণ জীবনে গণতান্ত্রিকরণের ঘূর্ণার দাবীর সামনে ষ্টালিনী আমলের কঠোর পন্থীদের একে একে বিদায় নিতে হোলো এবং শেষ পর্যন্ত নভোৎনি

চেকোস্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রিসিডিয়ামের পদ থেকে শুধু যে অপসারিত হলেন তা নয়, গত ২১শে মার্চ চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রেসিডেন্টের পদ থেকেও সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। তার স্থলবর্তী হলেন ডুবচেকের প্রস্তাবক্রমে ৭২ বৎসর বয়স্ক অপরিত্রিত সেনাধ্যক্ষ লুডভিগ স্ববোদা। চেকোস্লোভাকিয়ার স্বতন্ত্রপ্রসারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা পার্শ্ববর্তী অস্ফাচ্চ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রেও স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনের ঢেউ তুলবে। খাস চেকোস্লোভাকিয়ার পরিবর্তনের স্বচনা লক্ষ্য করে একজন কূটনীতিবিদ বলেছেন : "If they carry the program out to the hilt, the only thing unchanged in Czechoslovakia will be the word Communism."

ড্রেসডেন সম্মেলন

চেকোস্লোভাকিয়ার রক্তপাতহীন পরিবর্তনের ফলে পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলির গভীর চাক্ষু্য লক্ষ্য করা গেলো। অল্পসময়ের মধ্যে গত ২৩শে মার্চ পূর্ব জার্মানীর ড্রেসডেনে দ্রুত কম্যুনিষ্ট শীর্ষসম্মেলনের আহ্বানের মধ্য দিয়ে। এই শীর্ষ সম্মেলনে সোভিয়েত রুশের পক্ষ থেকে ব্রেজনেভ-কোসিগিন দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। রুমানিয়া ড্রেসডেন বৈঠক বর্জন করে। ড্রেসডেন বৈঠকে ডুবচেকের তলব পড়ে। ডুবচেक চেকোস্লোভাকিয়াকে কম্যুনিষ্ট আওতার বাইরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চান কিনা এবং তার পরিণতি কি হতে পারে এ সম্পর্কে ডুবচেকে সাবধান করাই কম্যুনিষ্ট শীর্ষ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল। চেকোস্লোভাকিয়া কম্যুনিষ্ট আওতার অন্তর্ভুক্তই থাকবে, ডুবচেকের পক্ষ থেকে এই আশ্বাস পেয়ে ড্রেসডেন সম্মেলন চেকোস্লোভাকিয়ার নূতন নেতৃত্বের উপর আস্থা স্থাপন করেও একেবারে যে নিঃসংশয় হতে পারে নাই তা বোকা যায় কম্যুনিষ্ট বিধে সাম্রাজ্য-বাদীদের চক্রান্ত সম্পর্কে নূতন হৃদয়ঙ্গারীতে "enhance-

ment of vigilance with regard to the aggressive aspirations and subversive actions of the imperialist forces."

কিন্তু ডুবচেকের আশ্বাসের পরও পূর্ব জার্মানীর প্রমুখ তাত্ত্বিক হুর্ভ হাগের চেকোস্লোভাকিয়ার পার্টি সংস্কারকর্মের ওপর প্রবল অভিযোগ উপাধন করে বলেন এরা মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদের মূল তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করেছে। ড্রেসডেনে সমবেত নেতারাও ডুবচেকের আশ্বাসকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পেরে ওয়ারস সামরিক চুক্তির শক্তিবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের কাছে প্রাগই শুধু বিপদের লালসঙ্কেত জ্বলছে। পোল্যান্ডেও ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীরা দেশের আভ্যন্তরীণ জীবনে গণতান্ত্রিকরণের দাবী তুলে তোলপাড় করেছে। সোভিয়েত রুশ নভোৎনিকে রক্ষা করতে না পারলেও চেকোস্লোভাকিয়ার কম্যুনিজমের অবিচ্ছিন্নতার স্বীকৃতির পর ডুবচেকে মেনে নিলেও, পোল্যান্ডে গোমুলকাকে নভোৎনির মত ভাগ্যবিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে হুনিশ্চিতভাবে এগিয়ে আসবে। অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ট্যাকের ওলায় হাঙ্গেরীর বিপ্লব যে ভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল সেই সম্ভাবনা দেখা দেবে।

ডুবচেক সোভিয়েত রুশের কর্তাদের ড্রেসডেনে আশ্বাস দিয়েছেন বটে, কিন্তু সোভিয়েত রুশ কতটা আশ্বস্ত হয়েছে সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। হাঙ্গেরী ও পূর্ব জার্মানীতে অবস্থিত সোভিয়েত বাহিনীকে চেকোস্লোভাকিয়ার সীমান্তে কুচ-কাওয়াজ (manoeuvres) করতে পারিয়ে সোভিয়েত রুশ তাই সপ্রমাণ করেছে। এই ঘটনায় চেকোস্লোভাকিয়ার মারাত্মক ঐতিহ্যের দেখা দিয়েছে। কলে ১৩৪ জন বিশিষ্ট লেখক ও শিল্পী দলের প্রতিনিধিদল প্রিসিডিয়ামকে হৃদভাবে জানিয়েছে যে ডুবচেকের প্রাথমিক আহ্বান্য তার নিজের দেশের প্রতি, কম্যুনিষ্ট রুকের প্রতি নয়। ডুবচেকের

সামনে উভয় সঙ্কট দেখা দিয়েছে। দেশের ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পীরা চেকোস্লোভাকিয়ার গণতান্ত্রিকরণের রক্তপাতহীন বিপ্লবের অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, অত্যাং তাদের অগ্রাহ্য করলে ভূবচক আভ্যন্তরীণ জীবনে বিপদ ডেকে আনবে। অপরপক্ষে তাদের প্রবল সোভিয়েত-বিরোধী নীতির নিকট আত্মসমর্পণ করলে ১৯৫৩ সালে পূর্ব জার্মানিতে, ১৯৫৬ সালে পোল্যান্ডের পোলনানে এবং সে বছর হাঙ্গেরীর বুদাপেস্টে যে নির্মম নিপীড়নে সোভিয়েত-বিরোধী বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল, চেকোস্লোভাকিয়াও সেই বিপদ ডেকে এনে সব কিছু খুঁইয়ে বসবে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধান ত্রেনেনভ গত ২৯শে মার্চ পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন তাদের দেশে কোনো রকম ভাস্কিক কিম্বা সাহিত্যিক অংলন (deviation) বরদাশ করা হবে না এবং কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন হলেই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কম্যুনিষ্ট বিশ্বের স্বাধীনতার সীমানা বিবৃত করে একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যই বলেছেন "As far as Moscow is concerned, freedom in the Communist world should end where it challenges the ideology and the foreign policy course of a country" (S. Nihal Singh Statesman the ২৫ March, '৬৪)

আর্থিক সংস্কার ও বন্ধন-মুক্তি

পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট চক্রের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের স্পষ্ট বীজ স্তরতে জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠার দাবীতে জাগ্রত হলেও পরিণতিতে আর্থিক সংস্কারের অনিবার্হতা এই বিদ্রোহকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। শিল্প ও উৎপাদনে কেন্দ্রীভূত প্রশাসন যেদিন উৎপাদন সম্পর্কিত

সিদ্ধান্তের অস্তিম দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisation-in decision-making) করে কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠি, সেদিন থেকেই পার্টির কঠোর নিয়ন্ত্রণ থেকে অর্থনৈতিক বুদ্ধিমানের মুক্তি কম্যুনিষ্ট চক্র যেনের মুক্তির রুদ্ধদ্বার খুলে দিল। চেকোস্লোভাকিয়াতেও অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবীর মুখে নভোৎপন্ন পশ্চাদপসরণ যে পরিমাণে দ্রুত হতে থাকে বুদ্ধিজীবীদের মুক্তির আন্দোলনে সেই পরিমাণে শক্তি সঞ্চারিত হয়। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল এই মুক্তি আন্দোলনের অগ্রণীর ভূমিকার দায়িত্ব নিয়ে জন আন্দোলনের নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নভোৎপন্ন নীতির বিরুদ্ধে ক্ষুরধার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ল্যাডিস্লাভ ম্যাকো। ম্যাকোকে আটমাস পূর্বে চেকোস্লোভাকিয়া ত্যাগ করে ইসরায়েল-এ আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার বিদ্রোহকে সোভিয়েত-বিরোধী আওতায় বর্ধিত চেকদের পক্ষে সমাজবাদের আরও প্রয়োগের দাবীদ্বারা চিহ্নিত করেছেন "It was the revolt of the generation that grew up under socialism and therefore expected more socialism than those who brought the system into being."

জন মাসারিক স্মরণ

চেকোস্লোভাকিয়ার গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক বিপ্লব সংগঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চেক বুদ্ধিজীবীরা তাদের দেশের শেষ অকম্যুনিষ্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন মাসারিকের সমাধিস্থলে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে। ১৯৪৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়া কম্যুনিষ্ট শাসনের কয়রাত্ত হবার পর তৎকালীন চেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী রহস্যজনকভাবে লোকাভরিত হন। কম্যুনিষ্টরা এ-যাবৎ প্রচার করেছে জন মাসারিক আত্মহত্যা করেছেন, যদিও তাকে হত্যা করা হয়েছে, এই সম্মোহের

যথেষ্ট কারণ আছে। তাই দেখক সংঘের একজন পদাধিকারী খোলা চিঠি দিয়ে মাসারিকের মৃত্যুরহস্ত উদ্ঘাটনের দাবী জানিয়েছেন। কম্যুনিষ্ট শাসনে এই প্রকার প্রকাশ্য দাবী এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

অন্ত্যায় কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে উদ্বেগ

চেকোস্লোভাকিয়ার গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক বিপ্লব পূর্ব জার্মানীর উল্লিখিতকে গভীরভাবে চিন্তিত করে তুলেছে। পোল্যান্ডের গোমূলকাও জন্ত। বুলগেরিয়ায়ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। শাস মস্কোর উদ্বেগ, বুদ্ধিজীবীদের প্রতি ব্রেকেনেভের হুমকি থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আশা করা যায় বার বছর পূর্বে হালেরীর বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা থেকে ডুবচে ক শিক্ষাগ্রহণ করবেন এবং সোভিয়েত ক্রশের সঙ্গে আন্তঃ সংঘাত এড়িয়ে যাবেন। কিন্তু ডুবচে কের সদিচ্ছা ও সতর্কতা সত্ত্বেও চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতার টেউ সারা পূর্ব ইউরোপে তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। হয় সেই উত্তাল তরঙ্গের সম্মুখে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সাধারণ মানুষের মনের বন্ধন মুক্তি পূর্ণতা পাবে আর না হয় দ্বন্দ্বসহ পীড়নের মধ্য দিয়ে তাদের মনের মুক্তি প্রতিহত হয়ে তারা নূতন মানসিক শৃঙ্খল বরণ করে নেবে। এর মাঝে কোন বিকল্প পথ নেই।

মার্কিনী পরিস্থিতি

কম্যুনিষ্ট ব্লকে যেমন উদারপন্থার ও গণতান্ত্রীকরণের বিপ্লব প্রসারিত হয়ে পূর্ব ইউরোপ ভোগপাড় করে তুলেছে, তেমনি প্রেসিডেন্ট জনসনের ভিয়েৎনাম নীতির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আলোড়নে মার্কিনী জীবন তীব্র বিভেদে জীর্ণ হয়ে পড়ে। আপাতী ৪৪টা নভেম্বর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডেমোক্রাট দলের প্রার্থী নিয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা তুল্ল হয়েছিল। জনসনের ভিয়েৎনাম যুদ্ধনীতির প্রতিবাদ,

প্রথমে ম্যাকাৰ্থি ও পরে রবার্ট কেনেডির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে গড়ে। দলীয় একটি প্রাথমিক নির্বাচনে জনসনের সমর্থন যে কি পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং জনসনের ডেমোক্রাটিক পার্টির মনোনয়ন লাভ সম্পর্কে গভীর সংশয় দেখা দেয়। রিপাবলিকান পার্টিতেও অনিশ্চিতি রয়েছে নিজন না অপর কেউ। কিন্তু জনসনের বেলায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পৃথক। জনসন রাষ্ট্রপতি পদে আসীন রয়েছেন, পুনর্মনোনয়নের জন্ত তাকে প্রার্থী হতে হবে। অতীতে একবার মাত্র একজন ক্ষমতায় আসীন রাষ্ট্রপতি পুনর্মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হয়েছেন। জনসনের ভাগ্যে কি সেই শোচনীয় পরিশ্রুতি অপেক্ষা করছে?

আর মাত্র দুই দিন পর উইলসনসিন প্রাইমারী নির্বাচনে জনসনকে ম্যাকাৰ্থির কাছে নিশ্চিত পরাজয় মেনে নিতে হতো। এবং তারপরের প্রাইমারী নির্বাচনগুলি জনসন-কেনেডী-ম্যাকাৰ্থীর ত্রিমুখী দ্বন্দ্বও জনসনের ভাগ্যবিপর্যয়ের তীব্র সম্ভাবনার মুখে পত ৩০শে মার্চ জনসন শুধু আমেরিকাবাসীদের নয়, দুইটি ঘোষণায় সারা পৃথিবীতে বিশ্বয় সৃষ্টি করলেন। জনসন ঘোষণা করলেন উত্তর ভিয়েৎনামের বৃহৎক্ষেত্র ওপর বোমাবর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হল, কেবলমাত্র নিরস্ত্রীকৃত এলাকার উত্তরে, যেখানে উত্তর ভিয়েৎনামের সেনাবাহিনী দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সময়সম্ভ্র প্রেরণের জন্ত এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অগ্রবর্তী দাঁটিগুলি বিপন্ন করার জন্ত উত্তরাঙ্গী থাকবে সেখানেই, বোমা বর্ষিত হবে। সেই সঙ্গে জনসন ঘোষণা করলেন তিনি আর একবারের জন্ত নির্বাচন প্রার্থী হবেন না কিছা ডেমোক্রাটিক দলের মনোনয়নও গ্রহণ করবেন না। জনসনের এই ঘোষণার পশ্চাতে মার্কিনীজীবনে ভিয়েৎনাম সহস্রা বিভেদ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে মার্কিনী মানসিকতায়, যে চির ধরিয়েছে, মার্কিনী জীবনের সেই সমূহ বিপদের কথা রয়েছে। আজাহাম

লিঙ্কনের অমুসরণে জনসন বলেন 'A house divided against itself cannot stand'। জনসনের এই সিদ্ধান্ত তার বিরোধীসমত সমস্ত আমেরিকা প্রথম ধাক্কা উৎপন্ন করে উঠে বিচার করতে শুরু করেছে এটা কি একটা কূটনৈতিক চাল? না জনসনের তীব্র নৈতিক প্রেরণার পরিণত ফল। এটা সত্য জনসনের এই সিদ্ধান্ত ভিয়েতনামের যুদ্ধে শান্তি স্থাপনেও যেমন তার উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে, তেমনি শেষ পর্যন্ত যদি শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, অপ্রতিরোধ্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হবার পথে জনসনও নিবিষ্ট হবে। আর যদি জনসন শান্তি স্থাপনে সফল হয়, এটাও সম্ভব সর্বসম্মতিক্রমে ডেমোক্রেট দলের কনভেনশনে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য জনসনের পুনর্মনোনয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। জনসনের প্রস্তাবে স্থানীয় সাড়া দিয়েছে এবং বর্তমানে আলোচনা বৈঠকের স্থান নির্ধারণে মতভেদ দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় ওয়ারশ কিম্বা নর্থ ফেন-এর নাম প্রস্তাব করেছিল। আমেরিকা তাতে রাজী নয়। রাওয়ালপিণ্ডি, দিল্লী, রেজুন পর পর রাজধানীর নামগুলি প্রস্তাবিত হয়েছে। জেনেভার নামও উঠেছে। এই স্থান নির্ধারণ নিয়ে মতভেদে স্থানীয় দিক থেকে কালক্ষেপণের উদ্দেশ্য যে নাই সে কথা লোর করে বলা যায় না। স্থানীয়-এর দিক থেকে এক কথা উঠতে পারে যে বিদ্যায়ী প্রেসিডেন্ট জনসনের চাইতে নুতন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করাই সার্থক। অবশিষ্ট জনসন উত্তর ভিয়েতনামের নিকট আবেদন জানিয়ে বলেছেন "It is our hope that North Vietnam, after ১০ years of fighting that has left the issue unresolved, will now cease its efforts to achieve a military victory and join us in moving towards peace." উত্তর ভিয়েতনামের সমস্তির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালের জেনেভা সম্মেলনের যৌথ সভাপতি সোভিয়েত

রুশ ও ব্রিটেনের উভোগী হয়ে সম্মেলন আহ্বানের সময় এসেছে।

জনসনের এই ঐতিহাসিক বিবৃতির পাঁচদিনের মধ্যেই গত ৪ঠা এপ্রিল শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এবং নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার সংগ্রামের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ডঃ মার্টিন লুথার কিং মেমফিস-এর এক হোটেলে খেতাব আততায়ীর দূর পাল্লার বন্দুকের গুলিতে নিহত হন। ডঃ মার্টিন লুথার কিং নৈতিক শক্তির ওপর বলীয়ান হয়ে শান্তিপূর্ণ পথে নিগ্রোদের নাগরিক অধিকারের জন্য ১৯৫৫সাল থেকে সংগ্রাম করে আসছেন এবং তার সংগ্রামের পরিণতিতে পূর্বতন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি ব্যাপকতর ভিত্তিতে নিগ্রোদের নাগরিক অধিকারের বিল প্রণয়ন করেন। ডঃ মার্টিন লুথার কিং গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের শিক্ষা গ্রহণ করে নিগ্রো আন্দোলন পরিচালনা করলেও, কিছুদিন যাবৎ নিগ্রোদের উগ্রপন্থীরা ডঃ কিং-এর অহিংস আন্দোলনের পথ বর্জন করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে মেমফিসে ডঃ কিং পরিচালিত একটি শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার সময় উগ্রপন্থীদের বিশৃঙ্খলতার শোভাযাত্রা ভেঙ্গে যায় এবং লুটপাটও অস্বীকৃত হয়। ডঃ কিং এর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আমেরিকায় বর্ণ বিবেচের আন্দোলন জলে উঠে আমেরিকার প্রমুখ চল্লিশটি শহরে দাঙ্গা, হত্যা, লুট, অগ্নিগংযোগ ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। জনসন সৈন্ত তলব করেন। এপ্রিলের সাড়দিন আমেরিকার শহরগুলিকে যেমন দক্ষ-বিক্ষিপ্ত করেছে—তেমনই মার্কিনী জীবনের ওপর বর্ণবিবেচের ছরপন্থ্য কলঙ্কের কালমা লেগন করে দিয়ে গেছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ভিয়েতনামে শান্তি স্থাপন—এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে পেছনে ফেলে দিয়ে মার্কিনী সমাজ-জীবনের ক্রোধান্বিত বৈষম্য ও বিভেদের স্বরূপ মার্কিনী জীবনকে যেমন প্রবলভাবে

৯৮ জয়ন্তী, চৈত্র ১৩৭৪

আলোড়িত করে দিয়ে গেল, তেমনি আভ্যন্তরীণ ও
আন্তর্জাতিক সমস্তা সমাধানে, জাতীয় জীবনে প্রচণ্ড
দুর্বলতার ফাঁদ অতিক্রম না করতে পারলে, আমেরিকার
নৈতিক অধিকার স্বীকৃত হবে না, সে-কথা আজ মার্কিনী
সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের কর্ণধারদের গভীরভাবে
চিন্তা করবার সময় এসেছে। এই মর্মবাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে
জনসনের নীচের কথায় “...If we are to have the
America we mean to have, men of all races...
must stand their ground to deny violence their
victory”

সমানাধিকারের বেশে দৃঢ়মূল বৈষম্য, জনসনের এই
বেদনার্ত ভাষাকে পরিহাস করেছে।

১৫. ৪. ৬৮

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly
Founded in 1931

Advertisement Rate Schedule

Current from April, 1966

Ordinary

Full Page :	Rs. 100.00
Half Page :	Rs. 55.00
Quarter Page :	Rs. 30.00

Cover Page

Second Cover :	Rs. 175.00
Third Cover :	Rs. 200.00
Fourth Cover :	Rs. 350.00

For Special Position contact *Advt. Manager*
Jayasree.

Advertising Space 20.5Cm × 15.24Cm.
(8" × 6")

ক্রেডিট স্বীকার

কাল্ভন ১৩৭৪ সংখ্যায় অশোকনাথ বসু রচিত ‘ইয়োরোপে
নেতাজী স্বভাষচন্দ্র’ প্রবন্ধের মুখবন্ধে একটি ভুল হয়েছে
—“১৯৩৭ সালে নেতাজী তৃতীয়বার ইয়োরোপে যান”—এটি
হবে “১৯৩৩ সালে নেতাজী দ্বিতীয়বার ইয়োরোপে যান।”
অসাবধানতাবশতঃ এই ভুলের জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

জয়ন্তী, সম্পাদকীয় বিভাগ

Contact

Manager, Jayasree
309, Ganguli Bagan,
Calcutta—47
Phone : 46-4116

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র

[একটি স্মরণীয় সাক্ষাৎ]

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

“লাখে ন মিলল এক”—মহাপুরুষের সমগ্র সম্বন্ধে একথা বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্যক্রমে কয়েকটি সমগ্র মিলেছিল। তাঁদের কেউ কেউ অকালে প্রাণত্যাগ করেন। যেমন অধ্যাপক সত্যচন্দ্র রায়, অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী।

সমগ্রীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ স্বতোৎসারিত নিষ্করের ছায় শতধারে বর্ষিত হতো। শেষ বয়সে তাঁর অবশিষ্ট সমগ্রীগণ প্রায় সকলেই তাঁকে একে একে ছেড়ে চলে যান।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব—তিনি সকলকেই ভালবাসতে পারতেন, সমগ্রী না হলেও সকলের সঙ্গেই পরমাগ্রেহে মেলামেশা করতেন। যে যেমন তাঁর সঙ্গে তেমনি ভাবেই মিশতেন। যিনি হাঙ্গা প্রকৃতির তাঁর সঙ্গে হাঙ্গা কথাবার্তা, লঘু হাস্যপরিহাসে সময় কাটাতেন। এইভাবে অকুমার শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, ছাত্র, শিক্ষক, সাধারণ কর্মী, গ্রামবাসী চাষী, গৃহস্থ, এবং ভৃত্যদের সঙ্গেও সাগ্রহে বার্তালাপ করতেন।

কিন্তু সমগ্রী পেলে তাঁর অন্তরের সমস্ত আগল খুলে যেতো। তাঁর আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো।

১৯০৭-০৯ সালের কোনো এক সময়ে, একদিন অপরাহ্নে, রবীন্দ্রনাথ উদয়গের দক্ষিণের বারান্দায় বসে আছেন। আমার প্রদ্বাদ আচার্যদেবের সঙ্গে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক তিনি নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। তারপর কতকটা অস্বস্তি হয়ে পড়লেন। ইঙ্গিতস্বরূপে আচার্যদেব বুঝলেন এবার তিনি ক্লান্ত হয়েছেন, স্বতরাং বিদায় নেওয়া উচিত।

প্রণাম করে’ আমরা বিদায় নিচ্ছি—এমন সময় অকস্মাৎ মূলধারে বর্ষণ শুরু হলো। আমাদের আর বিদায় নেওয়া হলো না।

প্রায় চূপচাপ বসে আছি। রবীন্দ্রনাথের ক্লান্তি তাঁর চোখে মুখে পরিস্ফুট। তবু মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বলছেন। হঠাৎ ভেতরের দিক থেকে শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তীর প্রবেশ। তিনি সেই বিকেলের ট্রেনে নেমেছেন এবং নেমেই কবির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—“অমিয়।”

তাঁর চোখমুখ উদ্ভাসিত হলো। কোথায় গেল বৃদ্ধের ক্লান্তি। কোথায় গেল তাঁর অবসাদ। “উজ্জীবিত”—কথাটার অর্থ অক্ষরে অক্ষরে বোধগম্য হলো।

পুনরায় ষণ্টাধিক কাল কবির কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠলো। হাশ্বোচ্ছল মুখে উভয়ের আলাপ চললো। আগরাত্ত সেই হাসি ও আনন্দের ভাগ পেলাম।

সেদিনের সেই আলাপের মধ্যে কয়েকটি বেশ মজার কথা নিয়ে—হাস্য পরিহাস চলে।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনো কবি (লেখক বা লেখিকা) অনেক কাছানিক কাছা লিখেছিলেন। যেমন :

“প্রভাতে অকল্পিত তরুণীগণ গান গেয়ে কবির ঘুম ভাঙান। স্নানের পূর্বে তাঁরা তাঁদের অকোমল করপল্লবে কবির দেহে তৈল মর্দন করেন—অগন্ধি জলে স্নান করান—” এমনি বা এই ধরনের অনেক কথা।

রবীন্দ্রনাথ পরিহাসচ্ছলে বলেন—“কল্পনা করতে মন্দ লাগে না। হ’লে তো ভালই হতো। কিন্তু এ জন্মে আর হলো না।”

তাঁর বলার ভঙ্গিতে আমরা হেসে উঠলাম।

যা হোক, সমধর্মী কাকে বলে সেদিন তা বেশ ভালভাবেই বুঝেছিলাম। এমন একজন সমধর্মীও শেষবয়সে কবিকে ছেড়ে যান। এ যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কত দুঃখদায়ক—তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

শ্রীশান্তী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
শ্রীগীতা	৬.০০	বাংলার ঋষি	৩.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫.০০	বাংলার মনীষী	১.৩০
ভারত-আত্মার বাণী	৫.০০	বাংলার বিদ্বান	২.০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১.৫০	বীরভৈ বাঙালী	১.৫০
কর্মবাণী	১.২৫	ব্যায়ামে বাঙালী	২.০০
Soul of India Speaks	5.00	বিজ্ঞানে বাঙালী	৪.০০
●		রাজর্ষি রামমোহন	১.৫০
		রবীন্দ্রনাথ	১.২৫
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.		মুগাচার্য বিবেকানন্দ	১.৫০
বিদ্যাসাগর	২.২৫	আচার্য জগদীশচন্দ্র	২.৫০
মানুষের মত মানুষ	১.৭৫	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১.৫০
শিশু রামায়ণ	১.৬২	॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥	
শিশু মহাভারত	১.৭৫		
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :		১৫ কলেজ স্কোয়ার :	
		কলিকাতা-১২	

স্মৃতি কথা

স্বধাকান্ত রায় চৌধুরী

বৰ্তমান স্মৃতি-কথায় রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর সহিত ৬ ডাক্তার কালিদাস নাগ মহাশয়ের সম্বন্ধের বিষয়ই বিশেষভাবে বলিতেছি। ষাঁহার কালিদাস বাবুর অসাধারণ মণীষার বিষয় অবগত আছেন তাঁহাদের কাছে এই স্মৃতি-কথা হয়তো চিন্তাকর্ষক না হইতে পারে, কিন্তু ষাঁহার রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর (বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হইবার পূর্বে) সহিত ৬ কালিদাস বাবুর কী গভীর সংযোগ ছিল তাহা জানিতে চাহেন তাঁহাদের কাছে এই স্মৃতি-কথা আশাকরি নিশ্চয়ই পাঠযোগ্য হইবে।

যতদূর মনে পড়ে ১৯১১ সাল হইতে কালিদাস বাবুর সহিত আমি পরিচিত ছিলাম। যতদূর মনে পড়ে ১৯১১ সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের “রাজা” অভিনয়ের সময় কালিদাসবাবু ও আরো কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের অনুরোধক্রমে শান্তিনিকেতনে সেই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। সেই প্রথম পরিচয়েই তাঁহার প্রতি আমার অন্তরে একটি গভীর শ্রদ্ধা জন্মায়—কারণ তাঁহার সম্বন্ধে সেই যুগেই যতটা প্রশংসাবাক্য রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনিয়াছিলাম সেইজন্মাই তাঁহার প্রতি মনে মনে একটা শ্রদ্ধা পূর্ব হইতেই ছিল। বলা বাহুল্য সেই সময়ের পরবর্তীকাল হইতে তাঁহার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি মণীষীদের জগতে যে বিপুল খ্যাতি, শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন, ১৯১১ সালে ততটা খ্যাতি লাভ করেন নাই। তবু সেই সময়েই তাঁহার কথাবার্তায়

আলাপ আলোচনার ভারী পাণ্ডিত্যের বেটুকু পরিচয় পাঁহিয়াছিলাম তাহাই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল; যথেষ্ট কারণ এই জন্মই ছিল যে, বিজ্ঞান, জ্ঞানে আমার অবস্থা ছিল তাঁহার জ্ঞান ও বিজ্ঞান তুলনায় নিতান্ত শিশুর মতো। কাজেই তিনি স্বচ্ছন্দে সহজ সরোয়া মানুষের মতন আলাপ-আলোচনা কথাবার্তা যখন আমাদের সহিত করিতেন তখন মনেই হইত না যে তিনি আমাদের তুলনায় কত জ্ঞানী কত বিদ্বান।

তারপর ধীরে ধীরে নানা উপলক্ষে তাঁহার সহিত পরিচয়-স্বত্বে যত লম্বা হইতে লাগিল বন্ধুত্বও ততো গাঢ় হইতে লাগিল। তিনি, রবীন্দ্রনাথের বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে (শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে) বহুবার নানা উপলক্ষে আসিতেন এবং এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া যখন বিশ্বভারতী সৃষ্টি হইল তখনও তিনি বহুবার শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর যুগে আরও কয়েকজন ষাঁহার প্রায় প্রতি রবিবারে শান্তিনিকেতনের আশ্রমভূমিতে নানা শিক্ষণীয় বিষয় বক্তৃতা দিতে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে ষাঁহাদের সহিত আমার পরিচয় ভালরকম ভাবেই হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে কতকটা বন্ধুত্বের সম্বন্ধ হইয়াছিল তাঁহাদের কয়েকজনের নাম এখনও আমি ভুলি নাই, ভুলিতেও পারিব না। ষাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছি তাঁহাদের নাম ডঃ সরোজ দাস, শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী তটিনী দাস (যিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল

ছিলেন।) আরও ষাঁহার আশিতেন এবং ষাঁহাদের সহিত আমার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছিল তাঁহাদের নাম শ্রীযতীন্দ্র বাগচী (কবি), শ্রীগভ্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রী রত্ননাথ সরকার, শ্রীঅমল হোম, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশ, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ষাঁহারা ব্যতীত আরও বহুজ্ঞানী ও গী ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে আশিতেন দেশী এবং বিদেশী। এই সব জ্ঞানী ও গীজনের কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা বহুতাদি দূর হইতেই শুনিতাম, কাছে গিয়া আলাপ-আলোচনা করিবার সাহস হয় নাই।

কালিদাস বাবুর সহিত ক্রমে ক্রমে বন্ধুত্বলভ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বহুমুখী জ্ঞানের এবং বহু বিষয় জানিবার এবং বুদ্ধিবার অস্পষ্ট আগ্রহ দেখিয়া ক্রমশই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধার ভাব বাড়িতে লাগিল। এই শ্রদ্ধার ভাব ও বুদ্ধির প্রধান কারণ ছিল তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য অথচ সেই পাণ্ডিত্য সম্পূর্ণ অহংকার বর্জিত। যখন দেশে-বিদেশে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যখন তিনি দেশে বিদেশে একজন মণীষীরূপে সম্মানিত তখনও তাঁহার সহিত যখনই আলাপ আলোচনা করিবার সৌভাগ্য ঘটিত দেখিতাম তিনি আমার সহিত এমন ভাবে আলাপ আলোচনা করিতেন যেন আমি তাঁহারই সমপঙ্ক্তির একজন। তাঁহার আলাপ আলোচনার বিশেষ বিষয় ছিল ভারতীয় উচ্চাদর্শের এবং উচ্চ সংস্কৃতির বিষয় এবং সেই উচ্চাদর্শ এবং সংস্কৃতির প্রভাব কত বিচিত্র প্রণালীতে ভারতের বাহিরে কোন কোন দেশে গিয়া পড়িয়াছে এবং সেইসব দেশবাসীরা অনেকেই কী কী ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এইসব আলাপ-আলোচনায় স্পষ্টই বুদ্ধিতে পারিতাম, তিনি ঐতিহাসিক হইলেও তাঁহার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তাঁহার নিজস্ব চিন্তাধারায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি ভারতীয় নানা সমাজের নানা জাতির সম্বন্ধে প্রচলিত ইতিহাসের ধারার সহিত পরিচিত হইলেও সেই

ধারাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই। তিনি ইতিহাস বর্ণিত জাতি এবং সম্প্রদায়গুলির বহু প্রচলিত অবাঞ্ছনীয় রীতিনীতির, এবং যুদ্ধে জয় পরাজয়ের বিষয়টিকে বড় করিয়া দেখিতেন না—তিনি দেখিতেন কোন কোন জাতির কোন কোন সম্প্রদায়ের রীতি নীতির ভালমিকের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকায় তাঁহার মধ্যে একটি বিশ্বমানবিকতার মহত্ত্ব ছিল। সেই মহত্ত্ব-গুণেই সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সকল জাতির প্রতি তাঁহার প্রীতি ছিল। তিনি শুধু যে বই পড়িয়াই ইতিহাসের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে—তিনি তাঁহার ইতিহাসগুরু জ্ঞানকে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী যাচাই করিতেন দেশে-বিদেশের নানা জায়গায় গিয়া সেখানকার সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিল্পকলা ইত্যাদি যথাসম্ভব স্বচক্ষে দেখিয়া। তিনি উচ্চস্তরের সংগীতজ্ঞ না হইলেও সংগীতের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, তিনি গাহিতেও পারিতেন। চিত্রকলা ভাস্কর্য্যকলা সম্বন্ধেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তিনি যে শুধু পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ লিখিতেন তাহা নহে, তিনি অপরূপ কবিতাও লিখিতেন। এই সব কারণেই তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজনদের মধ্যে ছিলেন অন্ততম।

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের বক্তব্য আর বেশি না লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের স্মৃতিকথা তাঁহার ভাষাতেই জয়শ্রীর পাঠক পাঠিকাদের উপহার দিতেছি।

১৯৬৪ সালে তাঁহার সম্বন্ধে এবং রামানন্দবাবু সম্বন্ধে কিছু স্মৃতিকথা লিখিবার চিন্তা আমার মাথায় আসে। তদনুযায়ী আমি অযোগ্য বুদ্ধিয়া একদিন আমি তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসায় গিয়া উপস্থিত হই এবং আমার স্মৃতির বিষয় তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করি,—কিন্তু তিনি তখন অসুস্থ থাকায় বেশিক্ষণ আলাপ করা সমীচীন মনে করি

নাই। আমার সৌভাগ্যবশতঃ আমার অমরোদেই তিনি অতি সংক্ষেপে তাঁহার স্মৃতি কথা আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন অক্ষততা সত্ত্বেও। এই পত্রে লিখিত বিষয়গুলি তাঁহার সহিত আলাপের সময় আমার স্মৃতি কথার অন্তর্গত অনেক বিষয় ছিল। যাই হোক আমার সেই স্মৃতি-কথা নিজের ভাষায় না লিখিয়া তাঁহার ভাষাতেই বজায় রাখিলাম।

তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্রের অমূল্যপি এই স্মৃতি-কথার অন্তর্গত করা হইল। একটি প্রস্তাবের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল ভারত রাষ্ট্রে জাতীয় পতাকায় গেরুয়ারঙ, সবুজরঙ, এবং স্বেতরঙ,—এই তিনটি রঙ কেন থাকা প্রয়োজন তাহার বৌদ্ধিকতা সহ একটি প্রস্তাব পত্র ৬দীনবন্ধু এণ্ডসন্স মারফতে ১৯২৪ সালে মহাত্মাগান্ধীজীকে পাঠানো হইয়াছিল। এই প্রস্তাবটি—“ইয়াংইণ্ডিয়ার” ১৯২৪ সালের ১১ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রস্তাবটির কল্পনা ছিল জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের। তিনি ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে জন্ম শান্তিনিকেতনে ৬ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হইলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সানন্দে ঐ লিখিত প্রস্তাবের নীচে প্রথমেই নিজের নাম সহ করেন। এই প্রস্তাবে অল্প বাহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন ওমাথ্যে সুনীতি বাবু, কালিদাসবাবু, মহানন্দোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতিও ছিলেন।

পরে যখন তিন বর্ষ সম্বলিত জাতীয় পতাকার আবির্ভাব হইল, দেখা গেল তাহাতে, স্বেতবর্ণ, সবুজ বর্ণ ঠিকই আছে, কিন্তু গেরুয়া বর্ণের পরিবর্তে আছে জাকরাণী বর্ণ। কেন গেরুয়া রঙের পরিবর্তে জাকরাণী বর্ণ দেওয়া হইল তাহার রহস্য এবং কারণ আমার জানা নাই।

৬ কালিদাস বাবুর চিঠিটি এই—

“বন্ধুবরেন্দ্র—

১৯১০—১১ সালে আমি (কালিদাস) কবির সান্নিধ্য লাভে বৃত্ত হই ও দেহলী বাগী রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য লাভ করি। ১৯১৭ সাল থেকে কবির সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করি; তখন আমি সাহিত্য পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ ও Scottish Church College এর ইতিহাস অধ্যাপক (1915-1919) সেখান থেকে লিংহল Mahinda College, Galli চলে যাই বৌদ্ধ কলেজের Principal (1919-1920) হয়ে সে কথা শুরুদেব তখন শান্তিনিকেতন পত্রিকায় ছেপেছেন। গল্প-ভারতী—রবীন্দ্র যুগ প্রবন্ধ ত্রুটব্য। 1920-21 সালে, শুরুদেবের সঙ্গে Europe পৌঁছে Sylvain Levi ও Romain Rolland র সঙ্গে পরিচিত হই তাঁদের Diary আমার কাছে আছে।

1923-24 Paris থেকে ফিরে ৭ পৌষ উৎসবে প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ দিই তখন শুরুদেব উপস্থিত ছিলেন যেখন আমার Europe ও চীন জাপান ভ্রমণের ভাষণও রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন এবং আমাকে দিয়ে তাঁর গানও গাইয়ে ছিলেন। রথীবাবু ভাল এন্সাল বাজাতেন। আমার গানের সঙ্গে রথীবাবু সঙ্গত করতেন। সুর শেখাতেন শুরুদেব ও ৬দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁদের নামে আমি কলিকাতার “গীতবিতান এ দিনেন্দ্র সঙ্গীতায়তন” চালিয়ে এসেছি বহু বৎসর ধরে। এবং গগনেন্দ্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপায় চিত্র-শিল্পের আলোচনা ও করেছি। বিদেশী মণীষীরা এদেশে এলেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্র সকাশে যেতেন। Nogucho কে আমিই শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাই। Sylvain Levi প্রভৃতিকে আমি “বিশ্বভারতী”র জন্য নিয়ে আসি। হরত সব কথা প্রভাত মুখোঁর জীবনীতে ছাপা হয়নি। শ্রীনিকেতনে Elmhorist (Mr. Mrs) Andrews ও Pearson প্রভৃতির সঙ্গে যেতাম।

Methodist পাদ্রী ও তাঁদের সহকর্মী অধিকারী রায় চৌধুরীর সঙ্গে আমার ভাব ভারও বহু আগে ১৯১১ 'রাজা' অভিনয়ের সময় থেকে। তাঁর কাছ থেকে সেকালের শান্তিনিকেতনের বহু ভুলে যাওয়া কথা স্তনবার আশা রাখি। কালীমোহন ঘোষ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গেও বহুকালের পরিচয়। শান্তিনিকেতন থেকে Java ভ্রমণের পথে পরিচয় পত্র দিয়েছিলাম। শিল্পীগুরু নন্দলাল বসুর সঙ্গেও গভীর ভাব আমার ছিল হয়ত তাঁর আত্মীয় স্বরেন কর গৈ কথা বলতে পারবেন রথীবাবু ২ বিধা জমি আমাকে দেন কিন্তু বাড়ী করতে পারিনি। তাই বিশ্বভারতী সে জমি ফেরত নিয়েছেন তবু আমি নিজেকে শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাণী বলে গর্ব করি যদিও এখনকার বেশি কেউ জানেন না।

পি-২৬ রাজা বসন্ত রায় রোড } শ্রীকালিদাস নাগ
১৩।৫।৬৪

(পুনঃ) ১৯১৭র গ্রীষ্মের ছুটিতে রামানন্দ বাবু সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করেছিলেন। দেহলীর পাশের বাড়ীতে নেপাল বাবুর ব্যবহৃত ঘরে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ লেখেন "রামানন্দ বাবুকে আমাদের এই আগ্রহে আবদ্ধ করে ফেলবার জন্তে অনেকদিন থেকে সাধনা করছি।"

এই বৎসরই জুলাই মাসে মাটির বাড়ীটি ভগ্ন করা হয় এবং ছুটির পর এইখানে দুই বৎসর রামানন্দবাবু মূল্যে ও কল্যাণের নিয়ে বাস করেছিলেন। মূল্য মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে আর তিনি সে সময় যান নাই। বাড়ীটি বিশ্বভারতীর কাছে কেনা নয়, কারণ বিশ্বভারতী তখনও হয় নাই। পরে এই বাড়ী বিশ্বভারতী গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কলকাতায় যখন জাপানী বোম্ব

পড়ে তখন ১৯৪২ শান্তাদেবী সীতা দেবী ও কল্যাণী গুরু-পদ্মীতে স্থজিতবাবুর বাড়ী ভাড়া করে কয়েক মাস বাস করেছিলেন। পুরুষরা কলকাতাতেই বেশীর ভাগ সময় থাকতেন। কল্যাণী শ্রীভবনে ভর্তি হন।

রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ বাবুর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়ীতে মাঝে মাঝে পদব্রজে আসতেন। তখন তাঁর মোটর গাড়ি ছিল না। কিরবার সময় ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে দেওয়া হত।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রামানন্দ বাবু একটানা অনেক দিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ১৯২৫-এ ও ছিলেন। তাঁহার জন্ম রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট বাড়ী একবার দিয়েছিলেন। কিছুদিন উত্তরায়ণেও ছিলেন। ১৯৩০ এবং ৩১শে অক্টোবর দেবী বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতেন। কিছুদিন আশা অধিকারীদের সঙ্গে প্রাক্তন ছাত্রদের বাড়ীতে ছিলেন।

১৯২৫ এর জুলাই মাসে তিনি বিশ্বভারতী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সার্ভে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের পরীক্ষা দিবার অমুমতি দিতে চান তাহাতে রামানন্দ বাবু রাজী না হওয়ায় তিনি প্রিন্সিপ্যালের কাজ ছাড়িয়া দেন। অধ্যক্ষ থাকাকালীন মালিকজীও Andrew সাহেব তাঁহার নোচে কাজ করিতেন।

অল্পকালের জন্ম বীরেন সেনের বাড়ীতে তিনি অনেকবার বাস করিয়াছেন।

১৯২৬ এ অশোক চট্টো, কালিদাস নাগ ও সরোজ দাস প্রভৃতি নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করতে যেতেন। সেই সময় উইনটারনিটজ ও সেজনী ছিলেন। তটিনী দাস ছাত্রী ছিলেন তাঁদের।

কবিতাগুলি : শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

একটি ঘোঁতাবাসের খোঁজে

চোখের ওপর হাতের পাখনা মেলে ধরে
লাল রক্ত শিরাউপশিরা দিয়ে বয়ে যায়
বয়ে যায় ভালবাসা বনচর পেখমেলানো
সমস্ত শরীরে।
দৃশ্য কিংবা শব্দ সব
কুচকাওয়াজের জন্তে মাঠের নিকটে ঐ প্রস্তুত এখন
ভালবাসা বুকের ভিতর দিকে উল্টে। হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
কাতর পথে যায় হাঁফ লাগে একটু হেঁটে গেলে
দুঃখের বিছুটি-লাগা মুখচোখ ফুলে ওঠে ফেঁপে ওঠে শুধু...
তুমি বুঝি ভালবাসা দেখো নি হাতের পাখনা মেলে ধরে
ক্ষতি নেই,
খালিপায়ে সারাদিন টো-টো করে ঘোরা ঢের ভাল
রাজার মুকুটও ব্যবহারে ম্লান হলে
মন্ত্রী রোজই খোঁজে ঘোঁতাবাস।

ইতিহাসের পথিক

কোথায় বিকট শব্দে হা-হা করে বেজে উঠলো হাসি
পুরনো ঘণ্টাটা কেউ টেনে টেনে বাজায় সহরে
মার্চের রাতে শহরের চারিদিকে মরা ইঁহরের গন্ধ
আরশোলারা চায়ের কাপের কিনার এখন চেটে গেছে
হুগন্ধ বুকের মধ্যে পুবেছি এতকাল...
এখন নতুন গন্ধ ফুল ফুটেছে কোণ এক রাজেন্দ্রসঙ্গম
এখন বুকের মধ্যে জেগে উঠেছে তীব্র অহঙ্কার
এখানে ধুলোর রঙে মনে হয় কাস্টনের বসন্তবিজুরী
চমকে উঠেছে অস্ত্রআবিরের হেলাফেলা...
আমি এক একটা ষ্ট্রেকের মধ্যে ঢুক ঢুক
আঘোষাঙ্গ পরধ করছি

দূরে বারুদের ছয়দাম
সাঁজোয়াবাহিনী কিছু বড় বড় কামানসমেত
আমবাগানে দাঁড়িয়ে আছে, বিশ্বাসঘাতক কে কে

রণে ভল দেয়...

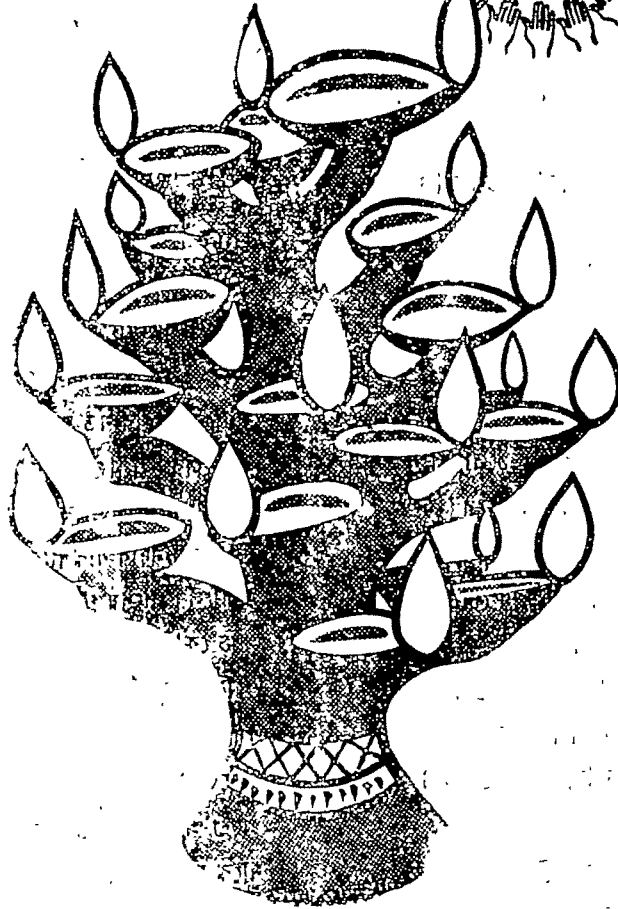
শিরজ্ঞাণ, শিরজ্ঞাণ, রাজমুকুট বলে আমি টেঁচিয়ে উঠেছি...
আমার এক এক তাঁবু-রসদ, অজ্ঞের জন্তে বিশ্বাসঘাত, এবং
শেষতম তাঁবুগুলি অসজ্জিত অগ্নি হারেম
পচা সহরের মধ্যে এই ইতিহাস কানাকড়ি দামে
বিক্রয় যে কোন ছেঁড়া বইয়ের দোকানে...
অস্ত্র আবিরের লাল গোলাপী সবুজ ঝরে পড়ে
বস্তির মুন্সিলাল এতকাল পরে আজো
রঙ খেলছে পথের ধুলোয়।

কাল একবার শুধু

কাল এক অস্পষ্ট গোলাপি
আমায় মাতাল করেছিল
আমি পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে
এমন এক আয়গায় পৌঁছে গেলাম
সেখানে ছেঁড়ার মত আর কিছু অবশিষ্ট নেই।
পেরাজের খোলাগুলি ছাড়াতে ছাড়াতে সব শেষ...
ঝড় খেমে গেলে ভাবি অন্ধ করা যাবে
চর পড়বে নদীর মাঝখানে
ভূগোলের পাতায় পাতায় পৃথিবীতে সর পড়ে...
অথচ কোথাও দাঁড়িয়ে নেই প্রেম
কোন বিন্দু ছুঁতে পারি এরকম হওয়া অসম্ভব
শুধু পাপড়ি ছিঁড়ে বাই
ছিঁড়ে যেতে যেতে গন্ধ
অদৃশ্য আলোর আভাটুক
মাঝে মাঝে মাতাল এবং উদালপাতাল মোলাচল
কাল একবার শুধু শুক হয়ে সেকথা ভেবেছি।

একতাই শক্তি

সাধারণতঃ দিবস এল এবং চলে গেল ।
সাধারণতঃ দিবসের উৎসবগুলির কথা মনে করার সময় আমাদের
এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে ঐক্যের মধ্যেই আমাদের শক্তি
নিহিত রয়েছে এবং একমাত্র একতার মাধ্যমেই আমরা
আমাদের ইচ্ছিত লক্ষ্য শাস্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারি ।
এই মহান দেশের অধিবাসী বলে আমরা যখন গর্ব
অনুভব করি তখন আমাদের সম্মুখে যে কর্তব্য রয়েছে
তা সন্দেহ করে তোলার জন্ত আত্মন আগর সকলো
আবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি । সেই কর্তব্য ও লক্ষ্য হ'লঃ
এক মহান দেশ, এক মহান জাতি ।



পল্লশমনি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার

ঘুরে ফিরে আবার দিল্লী। সেই কালীবাড়ী আর তের নম্বর ঘর। যবে ঢুকতেই পুরানো পরিচিত বন্ধু অধ্যাপক কুণ্ডু কলরব করে আমাদের অভ্যর্থনা করে উঠলেন। কাজের খাতিরে প্রায়ই দিল্লী আসি। গত কয়েক বছরে অনেকের সঙ্গে এই কালীবাড়ীতে দেখা হয়েছে, জানাশুনা হয়েছে ও আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। ১৯৬৪র মাঝামাঝি প্রথম দিল্লীতেই অধ্যাপক কুণ্ডুর সাথে আলাপ পরিচয়। ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন। সাদা-মাটা লোক। ঘোর-পাঁচ জানেন না বলেই অনেক ইন্টারভিউ দিয়েও কিছু করে উঠতে পারছেন না। লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট। খুব কষ্ট করে বিলেতে পড়াশুনা করেছেন। গল্প করেছেন। কঙ্গদামী আপেল খেয়ে অনেক দিন বিদেশে কাটাতে হয়েছে। তাঁর সরলতা আমাদের মুগ্ধ করেছে, আত্মীয়তা গভীর হয়েছে। ছোট্ট ছোট্ট করে বিলেতের গল্প করেছেন। আজও যেন সব মনে করতে পারছি।

তিনি আবার আমার গল্প শুনেছেন। দেশ, বিদেশের, শিশু বয়সের, বন্দীজীবনের আরো কত কি। ঘুরেছি অনেক। দেখতেও পেয়েছি অনেক। তিনি শুনে চাইতেন সব, কতো কি—বিশেষভাবে রাজপুতনার কাহিনী। বলতাম আমি গভীর দরদ দিয়ে। দিল্লী কালীবাড়ীতেই দেখা হলো তাঁর সঙ্গে বার চারেক। দেখলেই জড়িয়ে ধরে নতুন নতুন জায়গার গল্প শুনেতেন আর আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। পাঁচ ছয় বার ইন্টারভিউ দিয়েও অধ্যাপক কুণ্ডু আশাহুতর উন্নতি না হওয়ায় একটু মনমরা

হয়ে গেলেন। হুঃখ ভুলতে শুধু আমাদের নিয়ে গল্প করতেন। আমি তাঁকে বরাবর ভরসা দিয়ে এসেছি। ভগবানে বিশ্বাস রাখতে বলেছি।

অনেকদিন পর এবার দেখা হলো। দেখা হতেই চেপে ধরলেন, বলতে বললেন কোন্ কোন্ জায়গা হয়ে দিল্লীতে এলুম। এবারকার কাজের তালিকাটা ছিল একটু বিচিত্র। কলকাতা থেকে বোম্বাই, বোম্বাই হয়ে আমেদাবাদ। আমেদাবাদের কাজ সেরে এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর গাড়ী করে উদয়পুর। ঘুরে বেড়ালুম রাজপুতনার অনেক দেখা গ্রাম ও সহর। দেখলাম বৈষ্ণব মন্দির নাথদার। আজমীরের পুষ্কর হ্রদ, ব্রহ্মার মন্দির। জয়পুরে আমেরের যশোরেশ্বরী আর গোবিন্দজীর মন্দির আরো কত কি। কুণ্ডু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক। নাথদার বলতেই তিনি যেন অনেক ভাবনায় পড়লেন। তাঁর দেখা হয়নি শ্রীনাথজীর বিগ্রহ। ভাববারও সাহস হারিয়ে ফেলেছেন কোনদিন দেখবেন বলে। আমাদের মধ্যবিস্তার ব্যর্থতা। আমি কথা বলে চলছি তিনি যেন কিছুই শুনছেন না। কোথায় কোন এক হুঃখের দেশে যেন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দৃশ্যত চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে মনে হয় কিন্তু সে চোখ পলকে পলকে নতুন ভাবনার উপর দিয়ে ছুটে চলছে। মুখখানা দেখতে দেখতে বিষাদে স্নান হয়ে উঠলো। আমি আনমনা হয়ে গেলুম। বন্ধুর হুঃখ বুঝতে দেয়ী হল না। চোখের সামনে হেসে উঠলো এক বিচিত্র অমৃভূতির ছবি।

১৯৬৬র নভেম্বর, আমি পঞ্জিচরীতে। আমার বিচিত্র

জীবন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার পেছনে মাঝে মাঝে উকি দেয় ব্যাবসায় জগতের আমার গভীর ব্যর্থতা। আমার অনেক সময় তারা কেড়েও নেয়। অন্তরঙ্গদের বলি আমার মনের দুঃখ। স্তন্যদেহ না চেয়ে উর্পেটা তাঁরা জানতে চান, আমার সৌভাগ্যের সিক্রেট। তুলে ধরেন এক এক করে গত পাঁচ বছরের মায়ের অজস্র করুণার কাহিনী আমাকে ঘিরে। কৃতজ্ঞতার স্মরণ করি সে সব। দেখতে পাই সেই করুণাধারার তরঙ্গ বয়ে চলেছে দেহ মনকে বিধৌত করে। স্বর্গীয় স্নহমার ফুলের ছাতা মাথার ওপর খোলা। আলোকে ও সৌরভে স্ফীত হয়ে ওঠে দেহ ও মন। ঠিক করে নিলুম দুঃখকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। আর বলা চলবে না এসব গল্প কাউকে কোন অছিলায়। সেদিন বিকেলে শ্রীঅরবিন্দের সমাধিতে প্রণাম করতে গিয়েই মনে হলো যে দুঃখের পোষাকটাকে আজ খুলে রেখে যাব তাঁর পায়ের কাছে। কোটটা খুলতে গিয়ে দেখি এক অবাক দৃশ্য। শত শত কোট যেন সমাধিটিকে ঢেকে ফেলেছে। আর কোট রাখবার যায়গা কোথায়? রাখতে গেলে টুপ টাপ করে সব পড়ে যাবে। মহাবীর ধ্যান ভেঙ্গে যাবে। কত বিচিত্র কোটে যে ছেয়ে আছে সে সমাধি। এ যেন কোটের এক চলন্ত মিছিল। মিছিলের সাড়িতে ভিড় করে আছেন কত চেনা অচেনা মুখ তার শেষ নেই। কত স্তন্যদেহ। একে স্তন্যদেহে গেলে ওকে হারিয়ে ফেলি। এ যেন এক রঙের রথযাত্রা। সে ভিড় কাউকে অসুপস্থিত দেখলুম না। ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সব মিলে মিশে গেছেন সে মিছিলে। সবাই ব্যস্ত তাদের দুঃখের কোট খুলে ধরতে—কাঁদছে সবাই সেই মহামুনির পদতলে। আমি যেন মাথা তুলতে পারছি না। বোজা চোখের সামনে এক আলোর পথ। সে পথে কত রঙ-বেরঙের কোট। চোখের সামনে চলছে তারা ছবির রীলের মত ধীরে ধীরে—যুরে চলছে আর মনের গভীরে একটু একটু

করে নতুন কথা শুনিতে যাচ্ছে।

ধামীদানী গাড়ীগুলো মিছিলের পিছনে মুখ লুকিয়ে আছে। চলবার কথা যেন গেছে ভুলে। সমাধির ওপরের সেই সার্ভিসস্ট্রি থেকে কিছু ফুল ও পাতা পড়ে পড়ে গাড়ীগুলোকেও যেন নিয়ে গেছে কোন এক দেশে। বিস্ময় জাগে।

আমারো যেন সব কিছু খোয়া গেছে সেই মিছিলের হিড়ে। খুব ভালো লাগছে—খুব হালকা বোধ হচ্ছে। মিষ্টি গানের সুর যেন এদিকে ওদিকে। উপনিষদ খুলে কে যেন আমাকে কিছু কিছু পড়ে শোনাচ্ছেন। সব ভয় মুছে গেল। দুঃখ, সে তো আমাদের জীবনের সাথী—জীবনের দিকদর্শন। একে অব্যাহিত ভাবা সে তো নিবুদ্ধিতা। একে মত্ত করে আদর দিয়ে সসম্মানে জীবনের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। তবেই তো সে হবে জীবনের সোনার কাঠি। দুঃখের কোট ঝাঁকড়ে ধরে রাখলুম, দিলুম না আর তাঁর পায়ে।

অনেক ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত চিত্র চোখের সামনে হেটে চললো। দেশ ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় চলে এসেছি। ফেলে এসেছি নিজের হাত গড়া স্পিনিং মিল। কলকাতায় অফিস নিলুম। চেষ্টা করে চলছি মিলটিকে চালিয়ে যাবার। কিন্তু দেশ ভাগের পঁচাত্তর দিন দিন শক্ত দেওয়াল খাড়া হয়ে উঠছে দেশের দুদিকে। ওদিকে টাকার অভাব বেড়েই চলছে। কিছু কিছু করে যোগাড় করে শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে পাঠাতে হচ্ছে। শীতের দিন। গায়ের গরম চাদর নেই। ভোর সকালে স্টেশনে যেতে হয় চিটি ও টাকা নিয়ে। ঠাণ্ডায় বড় কষ্ট হয়। একদিন বৈঠকখানা বাজার হয়ে শিয়ালদা ছুটছি। মনে মনে দুঃখ করছিলাম—শীত, চাদর নেই। হঠাৎ চোখ গেল এক বাড়ীর রোয়াকে একটি মুটে একখানা ছেঁড়া গামছা গায়ে শুয়ে আছে। তা দেখে

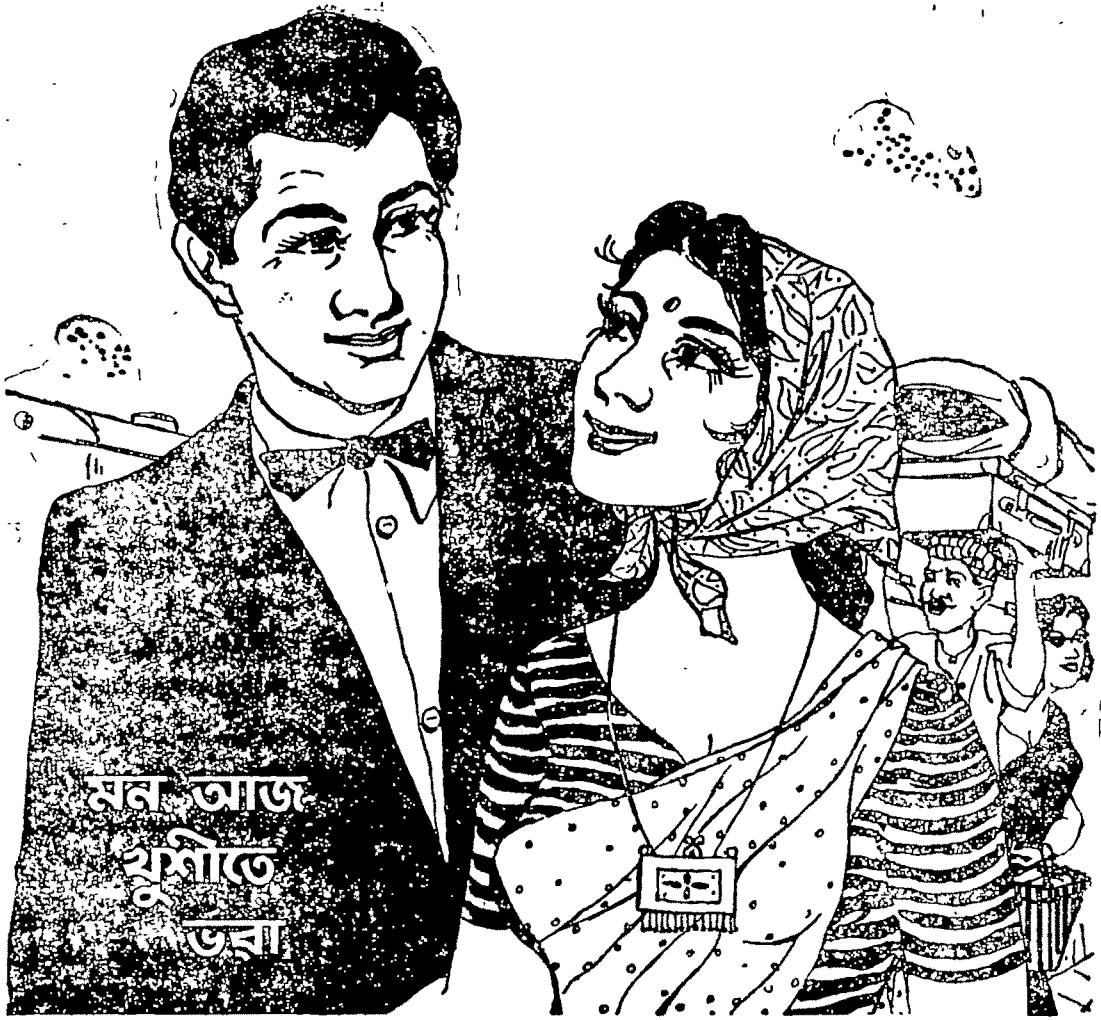
আমার দুঃখ এক নিমেষে উবে গেল। কত যে কাজে লেগেছে এই ছোট্ট ছবি। জীবনের অবিরল দুঃখের বর্ষার অস্ত্রে যেন উজ্জ্বল প্রভাত।

আরো নতুন ছবি। ১৯৫০ ইংরেজী। তিন নম্বর অইনো ষ্টীটে বন্ধুর বাড়ী, অথ দুঃখের গল্প হচ্ছে। দুঃখের ছায়াই বেশী। দুঃখের পর্দাটা একটু একটু করে নারতেই বন্ধু অপ্রত্যাশিত ভাবে এক আশ্চর্য গল্প তুলে ধরলেন তাঁর এক বন্ধুর কাছে শোনা। বন্ধু ব্যারিষ্টার, বর্তমানে হাইকোর্টের জজ। আমিও তাঁকে চিনি। কিছুদিন, আগেও দেখা হতেই অনেক গল্প করলেন। যাবার পথে গাড়ীতে আমাকে লিফ্ট দিলেন। বিদায়ের মুহূর্তে গভীর আবেগে আমার কল্যাণ কামনা করলেন।

গল্পটি তিনি আমার বন্ধুকে অনেককাল আগে বলেছিলেন—পৃথিবীর নীচে এক মুনি আবহমান কাল ধরে তপস্যা করছেন। তিনি একটানা বলে চলেছেন তথাস্তু, তথাস্তু। আমরা দুঃখে ক্ষোভে আনন্দে-আরামে, মনে মনে চাইকি উচ্চারিত কর্তে যা বলি—তার পিঠে যদি সেই মুনির তথাস্তু উচ্চারিত হয়—তবে তাই হবে।

আমার জীবনে এ গল্পের দাম আমিই শুধু বুঝি। দুঃখ বুচতে পারিনি আমার সংগ্রামের চৌহদ্দিতে। এ গল্প কতবার যে কত রকমে শুনিয়েছি কত বন্ধুকে কত দরদে। এক বন্ধু গল্প করছিলেন তাঁর দুঃখের। মনে হলো বন্ধু যেন দুঃখ কাটিয়ে, শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাদের দুঃখের গল্প শোনাচ্ছেন। নিজকে খাতির করছেন—দাম দিতে চাচ্ছেন।

রেগে গেলুম। দুঃখের বিরুদ্ধে টুকরো টুকরো কথা বলতে যেতেই বন্ধু খেপে গিয়ে আরো বেশী জোরালো করে দুঃখের কাহিনী বলতে লাগলেন। আমাকেও পেয়েছে নেশায়। টুকরো টুকরো করে দুঃখকে উড়িয়ে দিতে চাইলুম। তিনি শুনবেন কেন? শেষে বন্ধুকে আমার এক বন্ধুর দুঃখের কথা বলতে চাইলুম। কি মনে করে যেন তিনি শুনতে রাজী হয়ে গেলেন। এ গল্প, সে গল্প করতে করতে এসে গেলুম সেই গল্পে। বন্ধু গেলী ছাড়া জামা পরতে পারেন না। একদিন দেখেন যে গেঞ্জীতে গা দেবার আর কিছু নেই। সবটাই ছেঁড়া। টাকার চেঁচায় বেরুবেন। একটু হকচকিয়ে গেলেন। মুহূর্তে টেনে নিলেন জীর ব্লাউজ। জামা চাপিয়ে বেরিয়ে পরলেন। শুনেতো বন্ধু অবাক। এমন দুঃখও যে আছে ভাবতেও যেন পারছেন না। বেচারী যেন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলনায় ছলছেন। টক করে আমি জামার বোতাম খুলে জীর ব্লাউজটি দেখিয়ে দিতেই তিনি যেন একেবারে নিঃশ্ব হয়ে গেলেন। বোধহয় সে বন্ধুর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়ে ওঠেনি। কোথায় যে তিনি আছেন আজ, ভেবেই চোখ খুলতেই দেখি অধ্যাপক বিন্দ্রয়ে আমার মুখের দিকে তাঁকিয়ে আছেন। চোখে মুখে তাঁর প্রশান্ত দীপ্তি। কেন যেন আমার মনে হলো তিনি আগাগোড়া ছবিটি আমার মুখের পর্দায় চোখ রেখে দেখতে পেয়েছেন। আমি হাত জোড় করে শ্রীঅরবিন্দের সমাধির উদ্দেশ্যে আবার প্রণাম জানালুম। মনের দৈশান কোণে কে যেন বলছেন—স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি।



মন আজ
খুশীতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য মাখনার
অব্যর্থ মহোষ্য প্রতিদিন আহায়ে পর
দুইবার করে দু'চামচ মুন্ডসজীবিমীর সঙ্গে
চার চামচ মহাজাঙ্কারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা উষ্মাচলক চাকা



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেন চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আইকর্পোরেশন, এক্স, সি, এস, (লন্ডন),
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের সূতপূর্ব
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি, বি-এস, আইকর্পোরেশন।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

কঠিনতা বিষ

মি হির মুখো পাধ্যায়

আটক্রিশ

তিন প্রহর বেলায় গরমে যেমে ধুলোয় ধুলর হয়ে প্রায় ছয় ফোশ পথ হেটে যাত্রিদল পৌছুল সাক্ষীগোপালের মন্দিরে। খুব ক্লান্ত সবাই। ঠাকুর প্রণাম করে, সামনের নাট-মণ্ডপে মৃদঙ্গ, মন্দিরা ঝোলাগুলি নাগিয়ে বিশ্রামের আয়োজন করছে সকলে। কেউ কেউ গেছে মন্দিরের জলসজে। জল খাবে, হাত মুখ ধোবে।

হঠাৎ হুকুম দিলেন মাধবদাস বাবাজী—ওহে ওঠো সবাই, এখানে বসবো না, চলো ওই দীঘির পাড়ে চলো—

আধক্রোশটাক দূরে পুরনো প্রায় মজা দীঘি। কয়েকটি পলাশ, পিপুল আর একসার তালগাছ। আবার কিছুটা পথ ভাঙতে হবে।

বাবাজীর মুখে বললো ভক্তদাস—কেন প্রভু, এখানে কি অসুবিধে হ'ল?

সোজাসজি কোন জবাব দিলেন না বাবাজী। নিজের ঝোলাটি কাঁধে নিয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই কিশোর ভক্তটি। ছেলেটির মুখ এখনো স্পষ্টভাবে দেখতে পায়নি ভারত। অনুমান করল, বাবাজির সেই ওড়িয়া শিষ্যটি নিশ্চয়। নাম, নীলমণি প্রধান। সতেরো আঠারো বছর বয়স, হুন্দর চেহারা, চমৎকার গলায় কীর্তন গায়। বাড়ির অবস্থা ভাল। প্রায়ই লুকিয়ে আশ্রমে আসে। বাড়ির লোকেরা তেমন পছন্দ করে না। কার বাড়িতেই বা পছন্দ করে যে, ছেলে এই বয়সেই বিবাহী হোক, বোষ্টমের দলে নাম লেখাক। বোধহয় বাড়িতে কিছু না বলেই বাবাজীর সঙ্গে চলে এসেছে

নীলমণি। বাবাজী যখন উঠলেন, অগত্যা সকলকেই উঠতে হ'ল। যেতে হ'ল সেই দীঘির পাড়ে। যেতে যেতে বিড়-বিড় করে বললো রঘুনাথ—আশ্চর্য্য মানুষ বাপু। এমন মন্দির থাকতি, বন বাদাড়ে মন্দির তুচ্ছ চায় কি জন্তি— জায়গাটি একেবারে বন-বাদাড় না হলেও, বেশ নির্জন। কয়েকটি আকন্দের ঝোপ।

পরন্তু বেলায় রোদে পলাশের মাথায রক্তবর্ণের সমারোহ। অজস্র ফুল ধরেছে গাছে গাছে। সামনে পুরনো দীঘি। পরিষ্কার টলটলে জল। অনেক পদ্মপাতা। বর্ষাকালে হয়তো জল বাড়ে, কিন্তু এখন চৈত্রের শেষে অনেকটা কাদা ভেঙে জলের কাছে যেতে হয়। দীঘির পশ্চিম পাড়ে একসার তালগাছ। তাদের বাকড়া মাথার পেছনে সূর্য নেমেছে। গাছের ছায়াগুলি ক্রমশঃ দীর্ঘ হচ্ছিল। একটি পলাশ গাছের নিচে কমল বিছিয়ে বসল ভারত। একটু পরে কাপড়ের পুটুলিটা মাথায় দিয়ে শুয়েই পড়ল।

মন্দির থেকে চাল-ডাল কাচাকলার লিখে পাওয়া গেছে। সঙ্গে তেল-মুদ-মসলা।

মাধবদাস বাবাজী বললেন—ওহে শিচুড়ি ভোগ লাগাও, চটপট রান্না সেরে নাও—

রঘু বিড়বিড় করলো—এই অবেলার আবার রান্না, উঠুন কর্তা, চান-টান সেরে নিনু—

অগত্যা উঠতে হ'ল। মন্দির থেকে একটা লোহার শাবল জোগার করেছে রঘু।

তাড়াতাড়ি তিনটে উঠুন খুঁড়ে ফেলল। এক বোঝা কাঠও

পাওয়া গেছে। নতুন তিনটি মাটির হাঁড়িতে রান্না চাপল। তারপর বড় বড় পদ্মপাতায় চাল-ডালের খিচুড়ি আর কাচাকলা সিদ্ধ নিয়ে যখন বসল সবাই, তখন বিশাল মাঠের শেষে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। সেদিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল ভারত। বাণভট্টের সেই অপক্লপ বর্ণনা মনে পড়ল, দিনশেষে রক্তচক্ষু তপোবনের কপিলবর্ণা ধেমুটির মত ধূসরকায়্য সন্ধ্যা অবতীর্ণ। কিছুসময় পরে যে যেমন স্থবিধে পেল আসন পেতে বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল।

ভক্তদাস আপন মনে বসে বসে মৃদলে মৃদমন্দ বোল ভুলছিল। পাকা বাঁশের লাঠিটি হাতে নিয়ে রঘু বোধহয় একটু টহল দিতে বেরিয়েছে। আহারের ঠিক পরক্ষণেই স্ততে চায় না সে। ওতে নাকি মেদবৃদ্ধি হয়, বাতব্যাদি হয়। স্বাস্থ্য-রক্ষার অনেকরকম নিয়ম মানে রঘু। ভারত কিন্তু কোন-দিনই কোন নিয়ম মেনে চলেনি, বরং সবরকম অনিশ্চিত অনিয়মের মধ্যেই এতকাল কেটেছে তাঁর। অথচ স্বাস্থ্যটি খারাপ নয়। তাঁর দীর্ঘ স্থগতিত দেহে কোন রোগ-ব্যধির বালাই নেই। কিছুক্ষণ চোখ বুজে ছিল ভারত। একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। হঠাৎ দূরের গন্দির থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘন্টার ধ্বনি শুনে উঠে বসল। দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল ভক্তদাস। একটু দূরে আর একটা পলাশ গাছের নিচে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন মাধবদাস বাবাজী। তার পেছনে গাছের গায়ে ছায়ার মত মিশে আছে কিশোর ভক্তটি। একটুকাল বসে থেকে আবার স্তরে পড়ল ভারত।

কিছু সময় পরে স্তনতে পেল ভক্তদাস বলছে—প্রভু, নীতি-মন্দিরের আশ্রয় ছেড়ে এই খোলা মাঠেই কি রাত কাটাবেন স্থির করলেন—

একটু নড়েচড়ে বসলেন মাধবদাস, তারপর শান্ত গভীর গলায় বললেন—এখানে রাত কাটাবো কেন, আর কয়েক দণ্ড পরেই রওনা হব, কাল রিকলে মুকুন্দপুর পৌছে

পুরো রাতটা বিশ্রাম করবো—

বোধহয় একটু অবাক হ'ল ভক্তদাস, গিন্গিন্ করে বললো—
সেকি, এত তাড়াহড়ো করে এই অন্ধকারে—

—অন্ধকার কোথায়—বাধা দিলেন মাধবদাস—তিন গ্রহর রাতে দিব্যি চাঁদ উঠবে, আর এতকালের চেনা এই পথ অস্ববিধেটাই বা কি—

আর কথা বাড়াল না ভক্তদাস। আশ্রমের সবাই জানে মাধবদাস বাবাজীর কথার নড়চড় হয় না। একবার যখন স্থির করে ফেলেছেন, তখন আর কেউ যাক বা না যাক, অন্ধকার যতই ঘন হোক, পথ যতই দুর্গম হোক, বাবাজী একলাই চলে যাবেন।

এত তাড়াহড়ো করে দুপুর রাতে রওনা হবার কারণটা আর কেউ না বুঝলেও কিছুটা অসুমান করেছে ভারত। ওই নীলমণি ছোকরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। তার আত্মীয়স্বজন এসে যদি পাকড়াও করে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছেন বাবাজী। রাতারাতি যতটা দূরে চলে যাওয়া যায়, ততই মজল। কিন্তু যার জন্ত এদের সঙ্গে পথে নাগল ভারত, সেই বিশাখাই যেতে পারলো না।

এখন হয়তো জগন্নাথদেবের মন্দিরে আরতি নৃত্য শুরু হয়েছে। উজ্জল আলোক-বস্তুর কেন্দ্রে মৃদু জলতরঙ্গের আন্দোলনে একটি স্বেতকমলের মতো মন্দ মন্দ ছলছে বিশাখার সর্ব শরীর। নেত্র, গ্রীবা আর চম্পক অঙ্গুলিতে দেবতার আবাহন মূদ্র। সমবেত বাতবৃন্দের তালে তালে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে নৃত্যের হন্দ। তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ। বিশাখা ছলছে, ঘুরছে। কখনো এ পাশে, কখনো ও পাশে। এক এক সময় চটুল পদক্ষেপের লীলায়িত ছন্দে এগিয়ে আসছে, আবার দূরে সরে যাচ্ছে। হাতে হাতে, আঙ্গুলে আঙ্গুলে করণদ্বয়ের বিভিন্ন বিভ্রাস অলৌকিক মূদ্রার প্রকাশ। কখনো গুণ্ডলী রচনা, কখনো রেচক নির্মাণ।

বিশাখার চঞ্চল চোখে, স্তম্ভের মুখে বিচিত্র ভাবের ব্যঞ্জনা।

কখনো যেন আকুল প্রার্থনার ভেঙে পড়ছে, পরক্ষণেই আবার উল্লাসে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে।

আধো ঘুম, আধো জাগরণের মধ্যে বুঝি স্বপ্ন দেখছে ভারত। সমস্ত স্মৃতির ছবিগুলি যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। যেন অগ্নিনেত্রের এককোণে একটি স্তম্ভের পাশে বসে, আরতি-নৃত্য দেখছিল ভারত।

চারপাশে আর কেউ নেই, কিছু নেই, শুধু সে আর বিশাখা। হঠাৎ এক সময় যেন নাচতে নাচতে নিকটে এলো বিশাখা। একেবারে ভারতের কাছে এসে হাঁটু ভেঙে বসলো। সর্বাঙ্গ বিশাখার উত্তলা নিঃশ্বাসের উত্তাপ। বুকে হাত রেখে ডাকলো—ও ঠাকুর, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি, ওঠো, ওঠো—

ধড়মড় করে উঠে বসল ভারত। সত্যিই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিছুদূরে, কার হাতে যেন একটা জ্বলন্ত মশাল। তার আবছা আলোয় দেখতে পেল ভারত, মাথায় মস্ত পাগড়ি, কপালে নাকে ফোঁটা তিলক কাটা বাবাজীর সেই কিশোর ভক্তটি, পাশে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু অবিকল বিশাখার মত গলা। মাথার মস্ত পাগড়ি দু'লিখে হাসি হাসি মুখে আবার বললো ছেলেটি—কি ঠাকুর, ভেবেছিলে বুঝি আমাকে ফেলে পালিয়ে যাবে—বিশ্বাসে বিমূঢ় ভারত শুধু বলতে পারলো—একি, বিশাখা তুমি—

—হ্যাঁগো, আমি, খুব অবাক হয়েছো, না?

—অবাক হবো না, বলকি, আমি তো ভেবেছিলাম নীলমণি—

—নীলমণির বদলে আমি এসেছি—হাসিমুখে বললো বিশাখা

—এখন আমার নাম নীলমণি, নীলমণি প্রধান, কেউ যদি নাম জিজ্ঞেস করে, বলবো, যু নীলমণি অছি—বলতে বলতে হেসে উঠল বিশাখা।

কিন্তু রঘুনাথ কোথায়? শঙ্কিত চোখে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো ভারত—রঘুকে দেখছি না যে—

—ওইতো মশাল হাতে ঘুরছে—হাত তুলে দেখাল বিশাখা—তুমি জিনিষ পসব শুছিয়ে নাও ঠাকুর, এখনি রওনা হবো আমরা—

যেবার জিনিস পসর পোটলাপুটলি গুছিয়ে নিচ্ছে। রঘু একটা মশাল হাতে এক একবার এক একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তদারক করছে।

গৌরগোপাল জয়ছে। বৈষ্ণবের দল আবার পথে নামল। সকলের আগে আগে পাকা বাঁশের লাঠি হাতে রঘুনাথ। পাশে পাশে মৃদঙ্গ কাঁধে ভক্তদাস বৈরাগী।

একটু পেছনে গন্দিরা হাতে ঝোলাকাঁধে, রোগামত, বনমালী দাস। তারপর ব্রজদাস আর কেঁদাসেব কাঁধে আরো দুটো মৃদঙ্গ। তারপর পাশাপাশি গৌরদাস, গোপালদাস, হরিদাস।

ওদের পেছনে আরো একটা মৃদঙ্গ কাঁধে মথুরাদাস।

মশালটা এখন নিবিয়ে রেখেছে রঘু। দরকার হলে জ্বালাবে। স্নান পাণ্ডুর চাঁদ উঠেছে। সকলের পেছনে পাশাপাশি তিনজন। একপাশে মাধবদাস, আরেকপাশে ভারতচন্দ্র, মাঝখানে বিশাখা। সেই শেষবাজির বিবর্ণ জ্যোৎস্নায় ছায়ামুখিব মত বিশাখার হাত ধরে বাংলাদেশের পথে ফিরে চলেছে ভারতচন্দ্র।

উনচল্লিশ

বৈষ্ণব বাজীদল চলেছে। বৈশাখের প্রথম। প্রথর সূর্যের দিন। ভর দুপুরে তাই পথ চলা মুক্তি। সকাল-সন্ধ্যায় যতটা সম্ভব চলতে হয়। শেষরাজিতে যাত্রা শুরু করে দুপুরের আগেই কোন গাছের ছায়ায় কিংবা পথের পাশে কোন গাঁয়ের চটিতে আশ্রয় নিতে হয়। স্নানাহার বিশ্রামের পর রিকেলের পড়ন্ত আলোয় আবার পথ চলা। দীর্ঘ ক্রীড়ার বেলা, সহজে ফুরায় না। সূর্য অস্ত যাবার পরও গোমুগি বেলায় অনেকক্ষণ পথ চলা যায়।

ছোট ছোট গ্রাম, মুকুন্দপুর, পিলপি। বায়ে ভার্গব নদী সঙ্গে

সঙ্গে চললো কিছুদূর। কটকের কাছে ভার্গব বিশেষে মহানদীর সঙ্গে। কটক শহরে ঢুকলেন না মাধবদাস বাবাজী। শহরের ফ্রেশখানেক দূরে মহানদীর খেয়া পার হ'ল যাত্রীগণ। তারপর আরো দুটো বড় নদীর খেয়া। ব্রাহ্মণী নদী, শালন্দী নদী। মধ্যে মধ্যে কোন গাঁয়ের গেরস্থ বাড়িতে বিশ্রাম কিংবা পথের পাশে কোন গাছ তলায় বসে চিড়ে গুড়ের জলপান। এ পথে অনেকবার যাতায়াত করেছেন মাধবদাস বাবাজী। কোন কোন গাঁয়ের ছ'চার ঘর গেরস্থ অনেক কালের জানাশোনা। এর আগেও অনেকবার অতিথি হয়েছেন। পরম যত্নের সঙ্গে বৈষ্ণব ভীর্থযাত্রীদের সেবা করেন তারা। তবে দেশে এখন আকাল।

আগের মত আদর আপ্যায়ন করার অবস্থা নেই কারোর। সেই কথাই বলছিল জলেশ্বরের পাঁচু মোড়ল—বড় অসময়ে এলেন গো প্রভু ধানপান সব লুঠ হয়ে গেল, এখন কি দিয়ে যে আপনাদের সেবা করবো—

—তুমি কিছু হেবো না পাঁচুবাবা, কুণ্ঠিত হয়ে না, তোমার যা লাগ্য তাই দেবে—বললেন মাধবদাস। স্ববর্ণ বেথার পূর্বকূলে জলেশ্বর গ্রাম। পুরীধাম থেকে বেরিয়ে ঠিক এক পক্ষকাল পরে এক ছপূর বেলায় স্ববর্ণরেখার খেয়া পার হয়ে জলেশ্বর পৌছুল যাত্রীদল।

গাঁয়েব মোড়ল পাঁচুগোপাল পাড়। সম্পন্ন চাষী গৃহস্থ। লোকেবলে, পাঁচু মোড়ল।

মাধবদাস ডাকেন, পাচুবাবা। বহুকালের পরিচয়। বাবাজীর পরম ভক্ত পাঁচুমোড়ল।

যন্ত আটচালা খড়ের ঘরের দাওয়ায় এধার-ওধার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরাম করে বসেছে সবাই। বরাবর এই ঘরেই এসে থাকেন বৈষ্ণব যাত্রীরা। বয়স হয়েছে পাঁচুমোড়লের, তবু নিজের হাতে হাওয়া দিতে লাগল। ছেলেদের নাতিদের হাঁকডাক করে জল গামছা দিতে বললো।

মাধবদাস তাঁর হাত ধরে বললেন—তুমি থামো হে পাঁচুবাবা,

বসো এখানটায়, এই আমার পাশে, তারপর বলো দেশগাঁয়ের হালচাল শুনি—

কি আর বলবে পাঁচুমোড়ল, বাবাজীই বা নতুন কি শুনবেন। বেশের হালচাল মোটেই ভাল নয়। জলেশ্বরেও বারতিনেক এসেছিল বর্গীর দল। খুনজখম তেমন হয়নি বটে, কিন্তু ঘরদোর কিছু জালিয়েছে, ধান-পান লুঠ করেছে। প্রায় দুটি বছর বাধে এদিকপানে এলেন বাবাজী। এখন দলভুক্তির ভেতর যতই যাবেন, ততই এমনধারা অবস্থা আরো দেখতে পাবেন।

পাঁচুমোড়লের মুখে আর কিছু বলতে হবে না। মোড়লের কথাবর্তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল ভাবতচন্দ্র। বেশ লাগছিল তাঁর। অনেকদিন পরে বাংলাদেশের চাষী গেরস্থ মানুষের সঙ্গে দেখা হ'ল। সেই বিশেষ টানে কথা বলার ভঙ্গিটি ভারী মিষ্টি শোনায়। সারা গায়ে রোদহরের গন্ধ, মাটির গন্ধ, সহজ সরল মাটির মায়া। শহরে বন্দরে, রাজধানীর রাজসভার কিংবা ভীর্থক্ষেত্রের দেবমন্দিরে এদের দেখা পাওয়া যায় না।

বীরভদ্রপুরের ভূপতি জানাও ছিল এই দলের। বীরভদ্রপুর ঠিক কোনদিকে আন্দাজ করতে পারলো না ভারত। অসুস্থমান করল, এখান থেকে বোধহয় কয়েককোশ উত্তর পশ্চিমে হবে। স্ববর্ণরেখা যদিও পূর্ববাহিনী নদী। কিন্তু এখানে এই জলেশ্বরের কিছু উত্তরে এসে বাঁক ঘুরে কিছুদূর পর্যন্ত সোজা দক্ষিণে নেমে গেছে।

উত্তর পূর্বগামী বাংলা দেশে যাবার পথ কিছুটা ডাইনে বঁকে স্ববর্ণরেখার পশ্চিম কূলে এসেছে।

এখান থেকে সোজা উত্তরে দাঁতন, তারপর নারায়ণগড়। গুরুপক্ষ গুরু হয়েছে কয়েকদিন আগে। সামনে পূর্ণিম। মাধবদাস বললেন—তাঁতাতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নাও হে, কিছু বিশ্রাম করে ছপূর রাতে বেরিয়ে পড়ব, দিব্যি ফুটফুটে জ্যোত্স্নাম ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চলে যাব, কাল সকালে

- দাঁতন পৌছব, সেখানে শ্রামলেখর শিবমন্দিরে অনন্তঠাকুর
আছেন, খুব খুশি হবেন, অয় গৌর গোপাল জয় হে —
- সবাই চুপচাপ স্তনল। শুধু ব্যাঙ্গার মুখে বললো ভক্তদাস
প্রভু যেন এ যাত্রা ঘোড়ায় জিন দিয়ে যাচ্ছেন, এই ত্রীখোল
কাঁধে নিয়ে হাঁটছি, একটু দম ফেলারও সময় দিচ্ছেন না—
- দাঁতন গিয়ে দম ফেলো—একটু হাসলেন মাধবদাস—
ক্লান্ত হলে তো চলবে না ভক্তদাস, এখনো অনেক পথ,
দাঁতন গিয়ে না হয় দুটো দিন বিশ্রাম করবে, ওখানে
জগন্নাথদেবের মন্দির আছে, শ্রামলেখরের মন্দির আছে,
পূর্ণিমায় কীর্তন করবে, এখানে বেশিদিন থাকতে চাই না—
বলতে বলতে একবার চোখ টিপলেন বাবাজী—তোমরা এক
একজন, বলতে নেই, মহাপ্রভু বৃষ্ণায় দেড়সের চিড়ে দিয়ে
জলপান করো, পথে নেমে যেন খিদেটা আরো বেড়েছে
সকলের, এখন কথা হল পাঁচুবাবুর অবস্থা তো স্তনলে, এখন
বিবেচনা করো, তার ঘাড়ে বসে দুদিন সেবা আদায় করা—
- পেছনে বসেছিল বিশাখা, মুখ নীচু করে হাসল একটু।
পাঁচু মোড়ল লম্বা জিভ কেটে, হাত জোড় করে বললো—
ওকথা বলে আমাকে মহাপাতকের ভাগী করবেন না প্রভু,
আপনারা যতদিন ইচ্ছে থাকুন না —
- আরে না না, আমি ঠাট্টা করছিলাম—বাবাজী প্রসন্ন হাস্তে
প্রসারিত হলেন—পথে তো দেরি করা ঠিক নয় পাঁচুবাবা,
তেমন বর্ষা নামার আগেই বৃন্দাবন পৌছতে হবে, তারপর
এখন বর্গীর উৎপাত কিছু কম আছে, হয়তো আবার বর্ষার
পর শুরু হবে, তখন পথ ঘাটের অবস্থা কেমন থাকবে কে
জানে—
- অতএব সেই কথাই স্থির হল। ছপুরে কলায়ের ডাল,
কুমড়োর ঘ্যাট, তেঁতুলের টক, ঘন দুধ আর মর্তমান কলা
দিয়ে পরিপাটি অন্নভোগের পব দীর্ঘ দিবানিদ্ৰা দিল সকলে।
সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণ নামকীর্তন হল। তারপর চিড়ে দই
ফলার করে কয়েক দণ্ড বিশ্রামের পর রাত দুই প্রহরে জয়
গৌর গোপাল জয় হে' বোল তুলে পথে নামল যাত্রীদল।

চৈত্র ৫

সবচেয়ে অসুবিধে হচ্ছিল বিশাখার। রোজ স্নান করার
সুযোগ পায় না, এমন কি বেশভূষা বদল করার মত কোন
আড়ালও পায় না। এরকম পথ চলার কষ্টকর অভিজ্ঞতাও
কোনদিন হয়নি। পাঁচবছর বয়সে সেই যে পুরীধামে
এসেছিল, তারপরতো আর কোথাও যাননি। সেবারও
এসেছিল একরকম মাধবদাস বাবাজীর কোলে পিঠে চেপে,
ঘন ঘন বিশ্রাম করে। মাথার উপর চুড়ো করে বাঁধা ব্রহ্ম
চুলে ধুলোয় ঘামে জট পাকিয়েছে, গাধের রঙ মগ্নি হয়েছে,
মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে, একটু যেন রোগাও হয়ে গেছে
বিশাখা। শুধু মুক্তির আনন্দে চোখ দুটি সর্বক্ষণ উজ্জ্বল,
পথের এই কষ্টকে তৃণের মতোও স্তান করছে না স্তনস্তু
করে গান গাইছে বিশাখা—

ভোহরি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল, ছোড়লু গৃহস্থখ আশ।

পশুক দুখ তৃণ হেন মানল, কহতহি গোবিন্দদাস।

অমল ধবল জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক। শুক্লপঙ্কর
এমন মুগ্ধ রাতে পথ চলতেও আনন্দ। আগের মতই সকলের
আগে আগে যাচ্ছে রঘুনাথ। তার পেছনে ভক্তদাস,
কৃষ্ণদাস, বনমালীদাস, ব্রজদাস বৈরাগী মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজিয়ে
গান জুড়েছে।

সকলের পেছনে আগের মতই তিনজন পাশাপাশি। মাধব
দাস, বিশাখা আর ভারতচন্দ্র। কখনো আপন মনে স্তনস্তু
করছে বিশাখা, কখনো বা চুপ করে অস্ত্রের গান স্তনছে,
কথা স্তনছে। বিশাখার এই আনন্দ উপলব্ধি করে ভারত
চন্দ্রও বেশ খুশি মনে তার হাত ধরে পথ চলছে।

চলতে চলতে কথা বলছেন মাধবদাস—আমরা এখন যাচ্ছি
দাঁতন, সেখান থেকে ন কোশ পথ নারায়ণগড়, দাঁতন নাম
হল কেন জানো, পুরীধাম যাবার পথে মহাপ্রভু এখানে
এসে নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেজেছিলেন, আর নারায়ণ গড়ে
আছে ধলেশ্বর শিবের মন্দির, মহাপ্রভু সেখানে নাম-কীর্তন
করেছিলেন, নারায়ণ গড়ের ভূস্বামী কেশব সামন্ত মহাপ্রভুর
মহিমায় মুগ্ধ হয়ে শিষ্য-গ্রহণ করেছিলেন.... (ক্রমশঃ)

পথ : দুর্গাদাস সরকার

পথ খুঁজছি সবাই । তাই পথ দেখাচ্ছে সবাই ।

আজ এনে যে আজই খাচ্ছে, জন্ম দেবে কাল,

সে ও দেখাচ্ছে পথ ।

রেলের বাজি যে হেরেছে : চাপরাচ্ছে কপাল :

সে ও বলেছে পথ ।

সভা হচ্ছে, মিটিং স্বর,

পথের মধ্যে হাট,

কমিশন, কনফারেন্স,

ভেলি পেপার, নভেল ও সারসন,

এবং এই কবিতা

চারিদিকেই পথ দেখাবার টাট ।

অথচ পথ নিজেই জানে নাক’

পথ যে জানে নিজে সে বেপথে

কিংবা পেছে চিরদিনের মতন পথে বসে ।

এবং কুকুর যেমন ড্রাগের জন্তে

পথের চিহ্নে বোরে

ভেমনি ঠিক কেউ সহজ পথের অন্ত জানে নাক’ ।

কেউ বা বলেন চটকদারী কথা :

‘পাঠশালাতে পথের স্বর—যেখানে সেই লেজভাঙা নীল গরু

জাবর কাটে ঘাস ;

পাকস্থলী থেকে

মুখের ভিতর

খড়কুটোদের আসা যাওয়া চলছে ।

সেইখানে, সেইখানে ॥’

বলছে সবাই বলছে

“পথ জানে না কেউ ।”

মদ-মাতাল সেই গাঁয়ের লোকটি হাসছে এবং বলছে

“সেই যে কবে এসেছিলেন ধর্মপ্রচারক,

এই আশাতে—গেঁয়ো লোককে পথ দেখাবেন বলে

ভগবানের পথ ;

হায়রে নিজে ধর্ম প্রচারক

পান নি খুঁজে গ্রামে ঢোকান একটি সরল পথ !”

পথ দেখাবে কে ?

ক্রব তারা ?

আলোতে তার ফসল ফলবে ?

হবে

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ,

স্বক রণাঙ্গন ?

ছোট্ট এই প্রাঙ্গণ

একটি ফুলের গন্ধে

থেকে থেকে

পথ পেল কি আপন অমৃতবে ?

গন্ধ যেমন সেই পুরাতন বাতাস করে নুতন,

বাতাসও দেয় পথের খবর তাকে ।

পথ আছে : পথ আছে

মনের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে, আয়ুধ মধ্যে পথ ;

যদিও বা দিগদর্শী যন্ত্র ছোটো ভিন্নমুখী কাঁটা

অন্ধকারে ঢাকা ।

বেহেতু তা যায় না দেখা,

দেখা যায় না বলেই জানা যায় না

উত্তর বা দক্ষিণ ।

স্তম্ভ নাটক জানে :

কাঁটা আছে উত্তরে দক্ষিণে ।

ভীষণ অন্ধকার

তেমনি মনে

বার মধ্যে আছে পাতা পথ দেখাবার যন্ত্রে ছুটি কাঁটা ।

আলো যে চাই । আলো স্তম্ভ আলো । কে আলোগো ?

কি সেই আলো ?

কে দেয় আলো ? ভীষণ খবর

খুঁজি নিরন্তর ।

দীপ্তি

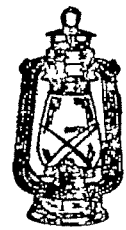
আপনার
নিত্য
প্রয়োজন

দীপ্তি লম্বন—এর পরিচয় নিম্নরোজন,
এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে
আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর
কম কেরোসিন খরচ।

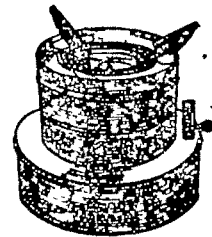
বাস জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য
প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিস।
এই কেরোসিন ঠোঁড় ব্যবহারে কোন
ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, বেগতে
সুন্দর, খরচে সাশ্রয়। অল্প সময়ে যে
কোন রান্না করা যায়।

‘দীপ্তি’ মার্কা এনামেলের বাসন—
অল্প বিনিয়োগে তার বৈশিষ্ট্য আর
গুণের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে।

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল
ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
৩৭ ও ১২ বিপিন বিহারী গান্ধী স্ট্রিট,
কলিকাতা-১২



দীপ্তি লম্বন



বাস জনতা



এনামেলের বাসন

জল

মাটি

মন

ম হী তো য বি খা স

২৭

মাটি-কাটাদের খাদে গিয়ে পৌছতে ভজহরির বেশ রাগি হয়ে গেল। একে তো বুড়ো মানুষ। তার পরে এতোখানি রাস্তা। বাড়ী থেকে বেরিয়েছে-ও খানিক বেলা ক'রে। তাই পৌছতে বেশ রাগিই হয়ে গেল। অনেকই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছিল। ডাকাডাকিতে সকলে জেগে গেল। ভজহরিকে ঘিরে বসল। অনেকদিন বাড়ীর খবর পাওয়া যায় না। মনটা ব্যস্ত হয়ে রয়েছে সকলেরই। ভজহরি কিন্তু ভিতরের কথা কিছু ফাঁস করল না। খাটুয়ে মানুষগুলোর কানে এখন আর এ-দুঃসংবাদের কথা তুলে দেওয়া ঠিক হবে না। যা জানার তা তো গাঁয়ে ফিরে গিয়েই জানতে পারবে।

ভজহরি চারিদিকে একবার তাকিয়ে লিঙ্গাঙ্গা করল—
“কাজকন্মো ক্যামোন চলতিছে তোমাগের?”

কেউ জবাব দিল—“তা এক র'ম চলতিছে মন্দ না। মূজরো বড়ো কম দেখে। উউ কাজ করতিছি সগোলে। কয়দিন হলো ফুরোনের কাজ পাইছি। এতে নান্ডা এট্টু বেশী হচ্ছে। দুই চারডে টাহা-ও হাতে জমিছে। তা বাড়ীর খবর-অবোর কি কও দেখি।”

ভজহরি একটু গম্ভীর হয়ে থাকল—। তারপর বলল—
“খবর আর কি। ভালই।”—একটু থেমে আবার বলল—
“নিবারণ, বলরাম—ওরা সব গেল ক'নে?”

নিবারণ, বলরাম এবং আরো কয়েকজন এ পাশে বসে ভজহরির কথা শুনছিল। ভজহরির ডাক শুনে উঠে এসে ওর পাশে বসল।

বলরাম বলল—“কবা না কি কিছু আমাগের?”

ভজহরি যথাসম্ভব সহজ গলায় বলল—“হয়, কবো এট্টা কথা তোমাগের। নকুলদা আমারে পাঠিয়ে দেছে। সগোলরে বাড়ী যাতি কইছে।

নকুলের তিন ছেলে পাশে বসা ছিল। বড়ো ছেলে হারাধন লিঙ্গাঙ্গা করল—“বাবার শরীল গতিক ভালো আছে তো?”

ভজহরি বলল—“আছে। ভালোই আছে তোমার বাবা তোমাগের বাড়ীর খবর-অববও ভালো।”

বলরাম বলল—“এদিগি কাজকন্মো চলতিছে। দুই চারডে পয়গাও হাতে আসতিছে। তা সব থুয়ে বাড়ী যাওয়ার এ্যাতো তাগেদা পড়লো কি জন্তি? আমি তো কচ্ছিলাম যে, আরো কয়ডা দিন পরে যাবো।”

ভজহরি চুপ করে থাকল একটুকাল। তারপর বলরামের দিকে তাকিয়ে বলল—“না বাবা বলরাম, গেডা হয়না। তোমাগের সগোলের যাতিই হবে। নকুলদা আমারে বারেবারে কইরে দেছে।”

নিবারণ উদ্বিগ্ন গলায় বলল—“ক্যানো, কিছু খারাপ-টারাপ খটিছে নাকি?”

ভজহরি গম্ভীর হয়ে বলল—“হয়, এট্টা খারাপের ভাব হইছে। গেরামে এট্টু ওলাবিবির স্চনা জাহা দেছে।”

কথাটা শুনে সকলে হুম্‌ড়ি খেয়ে এগিয়ে এলো। ব্যস্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল—“কও কি কথাডা? ভালো-সন্দ হইছে নাকি কারো কিছু?”

ভজহরি আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করে বলে—“না, না, —তোমাগের অতো ভাবতি হবে না। ভালো আছে সগোলে। তা কালকে যাতে বাড়ী যাতি পারো, তার জোগাড় করো।”

সেই রাতেই কট্টাক্টরবাবুর তাঁবুতে গিয়ে পরসাকড়ি ষার যা বাকী ছিল মিটিয়ে নিল। ভোরের দিকে বেশ অন্ধকার থাকতেই ঝুড়ি-কোদাল পোটলা-পুটলি নিয়ে সকলে চলতে শুরু করল। সকলেরই মনটার মধ্যে ধুক-পুক করছে। ভজহরি অবশ্য বলেছে যে, ভালো আছে সকলে। কিন্তু মনটা যেমন মানতে চায় না। ভয়-ভীতির ধরণই তো তাই। মনটা একবার কাঁপিয়ে দিতে পারল তো আর কথা নেই। ধুক-পুকানি চলবে সারাক্ষণ।

পথে আজ আর কেউ বিশ্রামের কথা ভুলল না। সকলেরই মন বাড়ীতে চলে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌছতে পারলেই এখন যেন স্বস্তি পাওয়া যায়। টাচি-পাড়ার জঙ্গলে জায়াগাটা পার হতেই কাঁঠুখালির বিল আর আশপাশের গ্রামগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল। দুপূর্ব গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে। কিন্তু রোদের কাঁজ এখনো কমেনি। থেকে থেকে গরম বাতাসের হলুকা বইছে।

এক-নাগাড়ে খানিকক্ষণ কাঁকা মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকলে মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্‌ করে ওঠে। শরীর অবশ হয়ে আসতে চায়। সারাদিন রোদ্দুরের মধ্যে হেঁটে হেঁটে সকলেরই কান-মাথা দিয়ে যেন আগুন ছুটেছে। ক্ষিধে তেঁয়ালি বুকের মধ্যে জ্বলছে। তবু ওরই মধ্যে বাড়ী ফিরে আসার আনন্দে সকলের মনটা ভরে উঠল।

বলরাম সকলের থেকে একটু এগিয়ে পড়েছিল। যে যার মতন এখন এগিয়ে-পিছিয়ে চলছে। বাড়ী পৌছানো নিয়েই কথা এখন। একটু জোর পায়ে সকলের আগে-আগে হাঁটছিল বলরাম। আর খানিক-ক্ষণ পরেই বাড়ী পৌছে যেতে পারবে। সুবাসী, নারায়ণ—তার জন্ত অপেক্ষা করে আছে। নারায়ণ তো দেখতে পেলেই হাই-কাই করে ছুটে আসবে। বেশ মনে রাখতে পারে ছেলেরা। আগার দিন ষোড়া কিনে নিয়ে বাওয়ার কথা বলেছিল। ঠিক মনে করে রেখেছে। কোলে উঠে গলা জড়িয়ে ধরেই বলবে—“বাবা, আমার ষোড়া কই?”

বলরাম পিঠের পরে ঝোলানো পোটলাটার গায়ে একবার হাত বুলোলো। পোটলার মধ্যে মস্তবড়ো মাটির ষোড়াটা হাতে ঠেকল। উৎফুল্ল হয়ে উঠল বলরামের মন। পা ছুটো যেন আরো তাড়াতাড়ি এগোবার জন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

একটুখানি অস্তমনস্ক হয়ে পড়েছিল বলরাম। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছোট একটা পায়-চলা পথ। দু’পাশে শুকনো খটখটে শূন্য-ক্ষেত। রোদের তাপে যেন পুড়ে ঝলসে গেছে। বলরাম থমকে দাঁড়িয়েই পথের ও-পাশটায় তাকাল। একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণী-বাতাস সোঁ-সোঁ করে ছুটে চলেছে। শুকনো পাতা খড়কুটো বুলো বালি চকর দিতে দিতে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে গেছে ও পাশটা। বলরাম দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। আগে ওটা পরিষ্কার হয়ে যাক। আগ্নে-বান্ধে বাতাস।

বাতাসটা ভালো না। গতি না-হওয়া অতৃপ্ত আত্মাগুলো নাকি ঐ-বাতাসে ভর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ও-বাতাসের মুখে গিয়ে পড়তে নেই।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলরাম আবার চলতে শুরু করল। কিছুক্ষণ হাঁটতেই সকলে নিজেদের গ্রামে এলে পড়ল। যে ষার বাড়ীর কাছে এসে এবার দল ছেড়ে ঘরে যেতে লাগল। বলরাম কোথাও আর দেরী না করে হনু হনু করে এগিয়ে চলল বাড়ীর দিকে। গ্রামের চারদিকে যেন একটা থমথমে ভাব। বলরামের মনটা ভালো লাগতে লাগল না। বাড়ী চুকবার মুখে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, ভলহরি পিছনে পিছনে আসছে। কিন্তু বলরাম আর কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা ভিটের উপর উঠে গেল। গোয়াল ঘরটা ছাড়িয়ে উঠোনে গিয়ে পড়তেই চোখে পড়ল বারান্দার নীচে জন-কয়েক বউঝি আর বুড়ী মুখে হাত দিয়ে বসে আছে।

বলরামকে দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠল বলরামের পিনী—
—“ও বাবা বলা-রে—সোনার চাঁদ আমার কনে গ্যালোরে—”

নতুন আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বুড়ীকে সরিয়ে দিয়ে বলল—“ঘরে যাও বলরাম—ঘরে যাও—!”

বলরাম টান ঘেরে কাঁধের ঝড়িকোদাল আর পোঁটলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। বুকভাঙা অর্তনাদে গলাটা ওর ফেটে পড়ল—“নারাণেরে—!” তারপর একলাফে বারান্দা ছেড়ে ঘরে গিয়েই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছেঁড়া একটা মাস্তুরের পরে কাঁধা দিয়ে নারণের শরীরটা ঢাকা রয়েছে। বেড়ার পায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে স্বাসী। গায়ের কাপড় এলোমেলো। হাঁশ নেই কোনো। বলরামকে দেখে হি-হি করে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো স্বাসী। বলরামের হাত জড়িয়ে ধরে বলল—“তুমি আইছো বুঝি বাড়ী? নারাণকে দেখতি আইছো? তা ছাড়া, ছাড়া—কতো আখু বা ছাড়া—”

বলরামের হাত ছেড়ে দিয়ে স্বাসী এগিয়ে গেল নারাণের বিছানার দিকে। নারাণের মুখের উপর থেকে কাঁধাখানা সরিয়ে দিল। পরম মমতায় কপালের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—“ও নারাণ,—নারাণেরে! আখু কেডা আইছে। তুই না কইলি ঘোড়া আনতি। উঠে আখু না ক্যামোন ঘোড়া আনিছে।”

হঠাৎ নারাণের মাথাটা ধরে ঠক করে মাটিতে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল স্বাসী। চীৎকার করে ওঠে—“না উঠিল, না উঠগে। পারবো না আমি কারো খোসামোদ করতি।”

তারপর ছুটে গিয়ে কাঁপিয়ে পড়ল বলরামের বুকের উপর। আঁচড়ে কামড়ে বলরামকে একেবারে দিশেহারা করে তুলল। আঁচল দিয়ে চোখের জল চেপে স্বাসীর মা এসে স্বাসীকে ধরে সরিয়ে নিল অন্তরিক।

আস্তে আস্তে পৃথিবীতে দিনের দাহ কমে এলো। সারাদিন ধরে যে জলন্ত ষাতব-পিণ্ডটা কাঠুখালির বিল জুড়ে অগ্নিবৃষ্টি করে চলছিল, এবার তা ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে ডুব দিল।

পরদিন পহর-খানেক বেলায় সময় নিমে-ওঝাকে সঙ্গে নিয়ে এসে পৌঁছল উমাচরণ। আরো একটু আগে আসা উচিত ছিল। কিন্তু নিমে ওঝার বেরোতে দেরী হয়ে গেল। গুণিন্ মাস্তুরের বিপদ অনেক। সাবধানে চলাফেরা করতে হয়।—পরের ঘরেও বিপদ বন্ধ করতে যাবার আগে নিজের ঘরের ঘাট-ঘোট বন্ধ করে যেতে হয়। কোন্ এক গুণিনের গল্প আছে। গুণিন্ গিয়েছিল অল্প এক গাঁয়ে ওলাবিবির বন্ধ দিতে। আঙণের মতন গুণিনের মস্তরের জোর। গ্রাম ছেড়ে পালাল ওলাবিবি। কিন্তু অতো সহজে গুণিন্কে রেহাই দিল না। বাড়ী ছাড়বার সময় ভুলোমন গুণিন্ নিজের বাড়ী বন্ধ দিতে ভুলে গিয়েছিল। তাড়া খাওয়া ক্ষেপী ওলাবিবি এসে আশ্রয় নিল গুণিনের

বাড়ী। কাজকর্ম গেরে গুণিন্ যখন বাড়ী ফিরল তখন ওলাবিরি কাজ হাসিল। গুণিনের বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখেনি। গুণিন্কে তাই বড়ো সাবধানে থাকতে হয়। একটু বে-চাল হ'লে তার মরণই আগে।

নিমে-ওঝা এসে বগল উমাচরণের বারান্দাষ। খানিকটে লম্বা, রোগা কালো মানুষটি। ছোপানো লাগ কাপড় পরা। খালি গা। গাঁজার ধোঁয়ার চোখ দুটো সব সময় জবা ফুলের মতন টকটক করছে। চুল-দাড়ির মধ্যে মুখখানা হঠাৎ চোখে পড়লে বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে ওঠে। নিমে-ওঝা এসে পৌঁছতেই গ্রামের লোকের অর্ধেক সাহস যেন ফিরে এলো। একে বিশ্বাস বেলো—বিশ্বাস। সংস্কার বেলো সংস্কার। কিন্তু এর জোর বড়ো সাংঘাতিক। সেই সংস্কার আর বিশ্বাসের জোরেই সারা গাঁয়ের মানুষগুলো শক্ত হ'য়ে দাঁড়াইল। নিমে ওঝা গভীর হয়ে বসে আদি—অস্ত্র সব কিছু গুনল। তারপর মুখে মুখে লম্বা একটা ফর্দ তৈরী করল। সবই পূজোর জিনিষ। উমাচরণের দিকে তাকিয়ে বলে—“ফন্দের জিনিসপত্তরগুলো আজই জোগাড় হওয়া চাই। আজকে রাত্তিরেই আমি খান বসাবো। গেরাম বন্ধ দেব।”

কছেটায় বার কয়েক টান দিল নিমে ওঝা। এক ফোঁটা ধোঁয়াও বাইরে ছাড়ল না। গিলে ফেলল। তাবপর সকলের দিকে তাকিয়ে বিধান দিল—“তোমরা শোনো সগোলে আমার কথা। মন দিয়ে শোনুবা। এর য্যনো কোনো হের-ফের না হয়। সাত দিনির বন্ধ দেবো আমি গেরাম। এই সাত দিনির মধ্য আমার অমুমতি বিনে কেউ গেরাম ছাড়ে কোনো জাগায় বাতি পারবানা। আসতিও পারব না। রাত্তির ব্যালায় তোমাগের বাপ-ও যদি আসে তো গেরামের গীমেনায় ঢুকতি দেব না। সওদা-পাতি যা কেনাকাটি আছে, আজকেই কিনে ছাও। ঘরের পুরোনি হাড়ি-কলস সব ফেলে ছাও। নতুন কল্‌সিতি জল খাবা।

নতুন হাড়িতি রান্না করবা। বিনি দরকারে কেউ কারো বাড়ী যাবা না। বাসি পচা খাবা না। মোটের উপর পন্ন-পোস্কের হ'য়ে থাকবা সব সোমায়।”

ওঝার নির্দেশমতন কাজ শুরু হ'য়ে গেল। আজ বাহুন্দের হাটবার। দুপূব নাগাদ আট-দশজনকে হাটে পাঠিয়ে দেওয়া হল। হাটে সকলেরই দরকার। ঘরে চাল নেই। হাট থেকে চাল আর কিছু আনা-পাতি এনে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে কিনতে হবে পূজোর জিনিষপত্র। হাতে টাকা-পয়সা খুব বেশী নেই। তবে যা আছে তাই দিয়ে এখনকার মতন তো চলুক। তারপরে যা হয় করা যাবে।

সন্ধ্য হতেই যে যেখানে ছিল গ্রামে ফিরে এলো। দুর্গাপূজো হয় যে বটতলায়, সেইখানে খান পাতল নিমে ওঝা। বাঁশ আর কাঁচা তালপাতা দিয়ে বানানো চারটি তীর চারপাশে পুতে তার মাঝখানে সিঁদুর-মাখানো স-ভাব মাটির কলসী স্থাপন করা হল। তারপর ঘটা করে পূজো দিল। রাত একটু গভীর হতেই একহাতে বড়ো একটা ধোঁয়ায় ধুমুচি আর অস্ত্রহাতে প্রকাণ্ড একখানা লাঠি নিয়ে নিমে ওঝা বেরিয়ে পড়ল। পিছনে পিছনে সাহসী জোয়ানগুলো বড়ো বড়ো লাঠি হাতে অনুসরণ করে চলল। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে নিমে ওঝা সারা গ্রামের চারপাশে সীমানা ঘুরে এসে গ্রাম বন্ধ দিল। তারপর আবার ফিরে এলো বটতলায় খানের কাছে। অস্ত্রকারে নিমে ওঝার চোখ দুটো ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। কপালের দুই পাশ দিয়ে ঘাম জমেছে। কিন্তু ওরই মধ্যে গাঁজার কছেটা সেজে দু'টানে শেষ করে ফেলল। সকলের দিকে তাকিয়ে এবার বিলম্বভাবে খিস্তি দিয়ে উঠল। অস্ত্রকারের মধ্যে নিমে ওঝার সেই ভয়াল চেহারার দিকে তাকিয়ে সকলের বুকের মধ্যে যেন কেঁপে উঠল। একটা জীবন্ত পিশাচের মতন নিমে চীংকার ক'রে উঠল—“শোনু শালারা

শোন্। সারা রাত ধরে গেরামে পহরা দিয়ে ব্যাড়াবি। যে শালা ডরাবি, সে শালা বেজন্মা। সে শালার চোদ্দগুটি বেজন্মা। সে শালার গুটির মাথায় পেছাপ করি আমি।—যা শালারা—যা এবার—।”—বলেই নিমে ওঝা লাঠি হাতে তাড়া করল সবাইকে। সকলে সরে গেল ওঝার সামনে থেকে। কিন্তু কেউ বাড়ী গেল না। সারা গ্রামের মধ্য দিয়ে রাত-ভর পাহারা দিয়ে বেড়াতে লাগল।

কটা দিন অদ্ভুত একটা উদ্ভেজনার মধ্যে কাটে। সন্ধ্যা হতেই খোল করতাল নিয়ে সংকীর্ণনের দল বেরিয়ে পড়ে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে নাম কীর্তন করে বেড়ায়। নাম কীর্তনের গগন-কাটা আওয়াজে বুকের মধ্যে ছমছম করে ওঠে। তবু যেন মনের মধ্যে একটা সাহস জন্মায়। ভয়ে-শঙ্কায় একদিনে গ্রামটা একেবারে অসাড় হ'য়ে পড়েছিল। দিন-রাত্তিরের ভেদ ছিল না। কিন্তু এখন সেই ভাবটা যেন অনেকখানি কেটে গেল। এর মধ্যেও যে ছুঁচুরজন মরল না, তা নয়। তবে আগের চেয়ে বেগটা যেন একটু কমছে।

নিপট সাত দিনের শেষ দিনে এসে সকালবেলায় খালের কাছে মস্ত-বড়ো একটা ধুনি জ্বালল নিমে ওঝা। সারা দিন ধরে জ্বলে ধুনিটা। আগুনের শিখা লকলক করে উঠে গিয়ে নীচু বটপাতাগুলোকে ঝলসে দিতে লাগল। নিমে ওঝার চেহারা আজ যেন আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে। আজ হল শেষ দিন। আজকেই গ্রাম থেকে ওলাবিকেকে চালান দিতে হবে অল্প কোনো জায়গায়। ওলাবিকের আর নিমে ওঝার শেষ শক্তি পরীক্ষার দিন আজ। গ্রামের ভালোমন্দ আর নিমে ওঝার মান-সম্মান নির্ভর করছে এই দিনটার উপর। সকলকে ডেকে নিমে ওঝা হুকুম আরী করল—“ব্যালা ডোবা পঙ্কজ তোমাগের সোমায় দেলায়। তার ও-পাশে যানো না যায়। গেলি কারো নিশ্চর দেবো না। গেরামের যে যানে আছে, একখান করে ক্রাঠো আ'নে

চৈত্র ৬

ধুনির আগুনি দিয়ে যাব। বুড়ো গুঁড়ো, মাইয়ে-পুরুষ—কেউ যানো বাদ না পড়ে। কচি-কাচা যেগুলো হাঁটিতি পারে না, সেগুলোকে কোলে কঁাকে ক'রে নিয়ে আসবা। খবদার,—বাদ পড়বা না কেউ।”

নিমে ওঝার আদেশ অমান্য করার সাধ্য নেই কারো। সারাদিন ধ'রে বাকুনী আগের মানুষগুলো কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে এক একজন ক'রে এসে ধুনিতে একখানা করে কাঠ গুঁজে দিয়ে যেতে লাগল। দপ্ দপ্ করে জ্বলে চলল ধুনির আগুন।

বলরাম, স্বাসী কদিনে শোকের ধাক্কাটা একটু সামলে উঠেছে। স্বাসীর সেই উদ্ভ্রান্ত ভাবটা এখন আর নেই। তবে কেমন যেন একটু হত-চেতন হয়ে পড়েছে। কেউ দুটো খাইয়ে দিল তো দিল। নইলে খাওয়া হয় না। কোথাও বসল তো বসেই থাকল। ওঠার কথা মনে থাকে না। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সবসময়েই একটা আচ্ছন্ন, উদাস ভাব।

স্বাসীকে নিয়ে বলরাম যখন ধুনিতে কাঠ দিয়ে বাড়ী ফিরল, তখন বেলা আর বেশী বাকী নেই। স্বাসী এসেই উঠোনের কোণে আমগাছের তলায় বসে পড়ল। এতোটা পথ হেটে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কি একটা জিনিষ আনতে বলরাম ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। কিন্তু বারান্দায় উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাপা কান্নার আওয়াজ এলো কানে। মুখ বাড়িয়ে ঘরের ভিতরে তাকাল। লক্ষ্মীর পিঁড়ির পাশে নারায়ণের ছেঁড়া জামাকাপড় আর বিছানা-বালিশ জড়ক'রে তার মধ্যে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে পিলী বুড়ী। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর লক্ষ্মীর পিঁড়ি পরে মাথা ঠুকতে-ঠুকতে বলছে—“ঠাউর, এও আমার কপালে নেহিলে তুমি ঠাউর। ভে-কাপে যাকি আমি! আমারে তুমি চোখে দেখলে না ঠাউর।”

বলরামের চোখ দুটো ছাপিয়ে জল এলো একটু কাল

দাঁড়িয়ে থেকে চোখ মুছে ঘরে ঢুকল। পিসিকে ধরে বাইরে নিয়ে এলো। গলাটা যথাসম্ভব সহজ করে বলল—“ধুনিতি কাঠো দিতে যাওনি তুমি পেশী?”

বুড়ী কঁদতে কঁদতে বলল—“না রে বাবা, আমারে আর তোরা যাতি কোসনে কোনো জাগায়। যা হবে আমার, বাড়ী বসেই হোক।”

কিন্তু তা বললে তো হয় না। ওঝা রেগে যাবে। ব’লে করে বলরাম পিসিকে পাটিয়ে দিল।

লাঠি ঠুকঠুক করে বুড়ী যখন ধুনির কাছে এসে পৌছলো, তখন বেলা ডুবে গেছে। কিন্তু বুড়ীর অতোসব খেয়াল নেই। একথানা কাঠ নিয়ে প্রায়-নিভে-যাওয়া ধুনির অশ্বিনের মধ্যে গুঁজে দিল। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল নিমে ওঝা। বুড়ীকে দেখেই মুখ ভুড়ে গালাগালি দিয়ে উঠলো—“শুধেগোর বেটি, তুই আর সোমায় পালি না? মরতি আলি শাষকালডায়! তাও আলি এহেবারে ব্যালাডা ডুবোয়ে! তো যা—মরগে যা—। তোরে নিয়েই ওলাবিবি বিদেশ নিক!”

বুড়ীর কানে ওসব গেলোনা। লাঠি ঠুক-ঠুক করে যেমন এসেছিল, তেমনি আবার চলে গেল।

সারারাত ধরে নিমে ওঝা ধুনির পাশে ব’সে চালান-মস্তুর আউড়ে চলল।

পরদিন সকালে ভেদ-বসি উঠে বলরামের পিসি মারা গেল।

২৮

হঠাৎ-ই সেদিন ঈশান--কোণে গুর-গুরু ক’রে ঘন কালো মেঘ জমল। শামল মায়া বিস্তার করে বিষ্টি নামল ক্রমবৎ করে। ক্ষেত-খানার আর গ্রাম-গাঁয়ের খাঁ-খাঁ—করা বুকে শীতল শান্তি নেমে এলো। পরপর কদিনই বেশ ঘন বিষ্টি হল। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল বোশেখ দাস।

নিমে ওঝার চালান-মস্তুরের জোরেই হোক, কিম্বা

বাক্সী গাঁয়ের মানুষগুলোর বিশ্বাসের জোরেই হোক, কিম্বা ক’দিনের সাবধানতা আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্তই হোক, —রোগটা আর ছড়াতে পারল না। আশ্বে আশ্বে ভয় আর উৎকর্ষা কেটে গেল সকলের মন থেকে। বিষ্টি পড়াতে মনের মধ্যে সাহসও ফিরে এলো।

জেগে উঠলো ঝিমিয়ে পড়া বাক্সী গ্রাম। কোলাহলে কলরোলে মুখর হয়ে উঠল কাঠুখালির বিলের আশপাশের আর দশ বারোখানা গ্রাম। পরুষ হাতের কর্ষণ বর্ষণ পাবার লোভে উন্মুখ হয়ে উঠল কাঠুখালির বিলের জবজবে মানময়ী উদলা মাটি। ক্রিধে তেষ্ঠা ঘুচে গেল মানুষগুলোর। উদয়াস্ত সমান তালে খেটে চলল। লাঙলের ফলায়-ফলায় চৌচির হয়ে গেল মাটির বুক। কুড়িয়ে বাড়িয়ে বীজধান-গুলোকে মুঠো-মুঠো করে ওরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিল মাতৃ-সন্তবা মাটির গর্ভে। আশ্বে আশ্বে শামল রঙের ছোঁয়ায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠল কাঠুখালির রুদ্ধ হৃদয় বুক।

দিন গড়িয়ে যেতে লাগল। উপযুক্ত যত্ন আর পরিচর্যায় আউশ ও আমন ধানের গাছগুলো আর পাটের লক্কলকানো ডগাগুলো কোমর ছুলিয়ে বেড়ে চলল।

শ্রাবণের কয়েকদিন হতেই আউশ ধানে পৌঁচ পড়ল। দেখতে দেখতে বড়ো-বড়ো ধানের পালায় ভ’রে উঠল সারা উঠোন। ক্ষেত ছাপিয়ে এবার ধান হয়েছে। বড়ো ঝংখের মধ্যে সকলের মুখে হাসি ফুটল। গত সনটা বড়ো কষ্টে কেটেছে! অভাব-অনটনের আর অনাহার ছাড়া একটা দিনও অখের মুখ চোখে পড়েনি। এবার বৃষ্টি ঝংখ-কষ্টের দিন শেষ হলো।

মনের শোক মনে চেপে রেখে বলরামও সমান তালে খেটেছে। ক্ষেতে চাষ দিয়েছে। বীজ ছড়িয়েছে। কাঠুখালির আর সব চাষী মানুষের মতন ধান কেটে ভারে ভারে বয়ে এনে উঠোন ভরে পালা সাজিয়েছে। মলা-ডলার ব্যবস্থা করেছে।

একজন নীলকণ্ঠ : গোর্কি জন্মশতবর্ষ

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

গোর্কি যে তাঁর ছদ্মনামটি ‘গোর্কি’ (তিস্তা) বলে চালু করেছিলেন তা বোধ করি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, জীবনযন্ত্রণার তিস্তা অভিজ্ঞতাই তাঁকে ঐ নামটি গ্রহণ করতে প্ররোচিত করে। আগাদের দেশের পৌরাণিক দৃষ্টান্ত কি আশ্চর্যভাবে এই সামান্য বিষয়টির সঙ্গে মিলে যায়। নীলকণ্ঠ শিবের কথাই বলছি। কণ্ঠে তিনি সব হলাহল ধারণ করে তাবৎ বিশ্বচরাচরের জন্তে রেখে দিলেন তাঁর মুখের সৌগভ্যাব, দৃষ্টির নিমীলতা। সেই শিবও আবার জনসাধারণের দেবতা—গাছের তলায়, ঘরের তাকে যখন যেখানে তখন সেখানে তাঁর অধিষ্ঠান! গোর্কি কি প্রাচ্যদেশের এই বিশ্বকর দেবতাটির কথা ভেবেছিলেন?

গরীব শ্রমজীবীর ঘরে জন্মেও সাত বছর বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে আরো গরীব অবস্থার সম্মুখীন হন এই প্রতিভাবান কিশোর। সেই অল্পবয়সেই কঠিন কায়িক শ্রম, বেকার অবস্থা, ক্ষুধার জ্বালা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর। নিচুতলার জীবনের ঘটনাবলি উঁচুনিচু ঢেউগুলির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে তাঁর সাহিত্যেও সেই জীবনের প্রতিফলন হয়েছিল স্পষ্টভাবে—জারের আমলের রাশিয়ার ভয়াবহ অবস্থা তিনি নিখুঁতভাবে দেখাতে পেরেছেন। কিন্তু সেই দুঃখের জীবন তাঁকে ও তাঁর সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে কাবু করতে পারে নি, তিনি সর্বদাই জীবনের জয়যাত্রার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর আশাবাদ এক মহান আদর্শবাদেরই নামান্তর। সমাজচেতনা তাঁর

জন্মাবধি গুণবিশেষ—একবার তিনি বলেছিলেন : পৃথিবীতে আমি জন্মেছি মতবিরোধ হবে বলেই। সমস্ত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্তে তাঁকে মাঝে মাঝেই দেশত্যাগী হতে হয়েছে, পরে ১৯১৭-র আন্দোলন জয়যুক্ত হওয়ার পর থেকেই তিনি স্বদেশে যোগ্য মর্যাদার অধিষ্ঠিত হন, বিদেশে তাঁর মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

টমাস মান গোর্কির ৬০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বলেছিলেন যে গোর্কি যদি সত্তা চটকদার হাফা রচনা লিখতেন তাহলে পৃথিবীতে তাঁর এই জন্মদিন নিয়ে এত সাত্তা পড়তো না। আমাদের কালে ভোতা মনন ও স্বল্প উদ্দীপনার সাহিত্যের কোন দাম নেই। গোর্কির সাহিত্যের সমাজচেতনা এক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ তুলে ধরেছে সকলের সামনে। টমাস মানের এই উক্তি আজকের বিশ্ব সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে গোর্কির রচনার আলোচনা করলে আমরা এক মারাত্মক সত্য বলে স্বীকার করি, এবং স্বীকার করে চমকে উঠি। স্টেফান ৎসভাইগ নানা লেখকের পাণ্ডুলিপির পাতা সংগ্রহ করতে ভালবাসতেন। তিনি গোর্কির কাছেও এরকম পাণ্ডুলিপির পাতা চেয়েছিলেন এক চিঠিতে—এবং তা শুধু গোর্কির প্রতি পরম শ্রদ্ধাবশেই তিনি করেছিলেন।

সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর রচনাকে চারিটি বিভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথম বিভাগে পড়ে নিচুতলার জীবন নিয়ে তাঁর রোমান্টিক ও অলঙ্কারবহুল রচনা। দ্বিতীয়

বিভাগে পড়ে তাঁর কিছু সমাজসচেতন রচনা (যেমন ‘মা’)। তারপরের বিভাগে তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা: শৈশব (১৯১৩), শিক্ষানবীণী (১৯১৫) ও বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২৩) —পড়ে। শেষ ও বৃহত্তম কালব্যাপী বিভাগে পড়ে তাঁর অসম্পূর্ণ রচনা যার অধিকাংশই মননধর্মী, বিশ্লেষণধর্মী ও গভীর তত্ত্বশ্রয়ী। ‘ফোমা গডিয়েভ’ থেকে আরম্ভ করে ‘ক্লিম শামগিন’ প্রভৃতি যাবতীয় উপন্যাস, নাটক ও অসম্পূর্ণ রচনা এই বিভাগে পড়ে। নিজের এসব রচনা ছাড়াও গোর্কি ছিলেন নানা পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, রাশিয়ার সাহিত্যসম্মেলনের প্রধান পুরোহিত এবং তৎকালীন সর্বহারাদের সাহিত্যের বিরাট উদ্বোধক। ভারের আমলের সাহিত্যকৃতি ও সোভিয়েট রাশিয়ার সাহিত্যকৃতির মধ্যে গোর্কি এক প্রোজ্ঞগ্ন সেতুবন্ধ রচনা করেছেন। সাহিত্যে কিন্তু তিনি শুধু যে সমাজবাদ ও মানবিকতাবাদের সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন তাই নয়, অক্টোবর বিপ্লবের পর সাহিত্য যাতে একপেশে ‘সর্বহারার’ সাহিত্য না হয় সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। এ ছাড়া তিনি বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে দেশের সাহিত্য পর্যালোচনা করার শাণ্ড সংকল্প মনে মনে পোষণ

করতেন; সে কারণে বিশ্বসাহিত্যে অনুবাদের ক্ষেত্রে দেশে একটি সংস্থাও গড়ে তোলেন।

আমাদের দেশে গোর্কিকে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এক বিরাট অভিভাবক বলেই বোধ হয়। এখন আমাদের দেশের সাহিত্যের কোন অভিভাবক নেই, কোন বিবেকবান পৃষ্ঠপোষক নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন সৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্যের এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। গোর্কি নতুন সমাজতান্ত্রিক দেশে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি এক মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ তথা নিরুপিত করতে চেয়েছিলেন। আজ আমরা যদি তেমন একজন অভিভাবক পেতাম, তাহলে সাহিত্য নিশ্চয়ই দিগন্তান্তের মত এলোমেলো ছোটোছুটি কংতো না। বাংলাদেশে গোর্কির জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন বস্তুত যে কোন দেশেরই আদর্শবান সাহিত্যের প্রতিই শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই নীলকণ্ঠ পুরুষটি জীবনের সমস্ত হলাহল নিজে ধারণ করে সাহিত্যে যেমন ফুল ফুটিয়ে গেছেন, সাহিত্যের আন্দোলনেও তেমনি সক্রিয় থেকে সেই ফুলের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখার সযত্ন প্রয়াস করে গেছেন। বর্তমানের বাংলা-দেশে তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

সময় সব কিছুই ভুলিয়ে দেয়। ভূগাতে না পারুক,—
অন্ততঃ মনের পরে একটা পর্দা ফেলে দেয়। সংসারের সব
দুঃখ শোক আঘাত বেদনা আস্তে আস্তে তার তলায় আড়াল
পড়ে যায়। সুবাসীও দিনে দিনে সহজ আর স্বাভাবিক
হয়ে এসেছে। একান্তে অগম্য চোখেব জল মুছে স্বামীর
পাশে পাশে দাঁড়িয়ে সংসারের কাজ কর্মে মন বসিয়েছে।
দুঃসহ দৃষ্টিটাকে ভুলতে না পারুক, মনের মধ্যে চাপা দিয়ে
রাখার চেষ্টা করেছে।

সারা সকালটা ধান কেটে দুপুর বেলায় কয়েকটা ভেজা
ধানের আঁটি মাথায় নিয়ে বাড়ী ফিরল বলরাম। জল-
কানার মধ্যে কাজ। বেকার পেরে ওঠা যায় না।
উঠানের পরে বোঝাটা নামিয়ে রেখে বলরাম তেল মেখে
স্নান করতে গেল। সুবাসী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের বারান্দায়
পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করে দিল। গা-হাত-পা মুছে কাপড়
পড়ে বলরাম এসে খেতে বসল। সুবাসী খালাভরে ভাত
সাজিয়ে সযত্নে এনে নামিয়ে রাখল বলরামের সামনে।
নতুন রাতুল ধানের ভাত। শিউলি ফুলের মতন ফুর-ফুর
করছে। অগন্ধেই পেটের মধ্যে ক্ষিধে জমে ওঠে।

খালটা নামিয়ে দিয়ে সুবাসী রান্নাঘরে ঢুকল একটু
ডাল কি তরকারী আনতে। পরম পবিত্রস্থিতে বলরাম
খালটাকে কোলের কাছে টেনে নিল হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে
একমুঠো গরম ভাত তুলে নিয়ে মুখে দিতে গেল। হঠাৎ
মনে হলো, দু'খানি কচি নরম হাত যেন বলরামের মুঠো-ভাতি
ভাতে হাতখানাকে টেনে ধরেছে। কুখার্ড অসহায় চোখ
ছুটো মে'লে বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে “বাবা—বাবা—”
বলে ডাকছে।

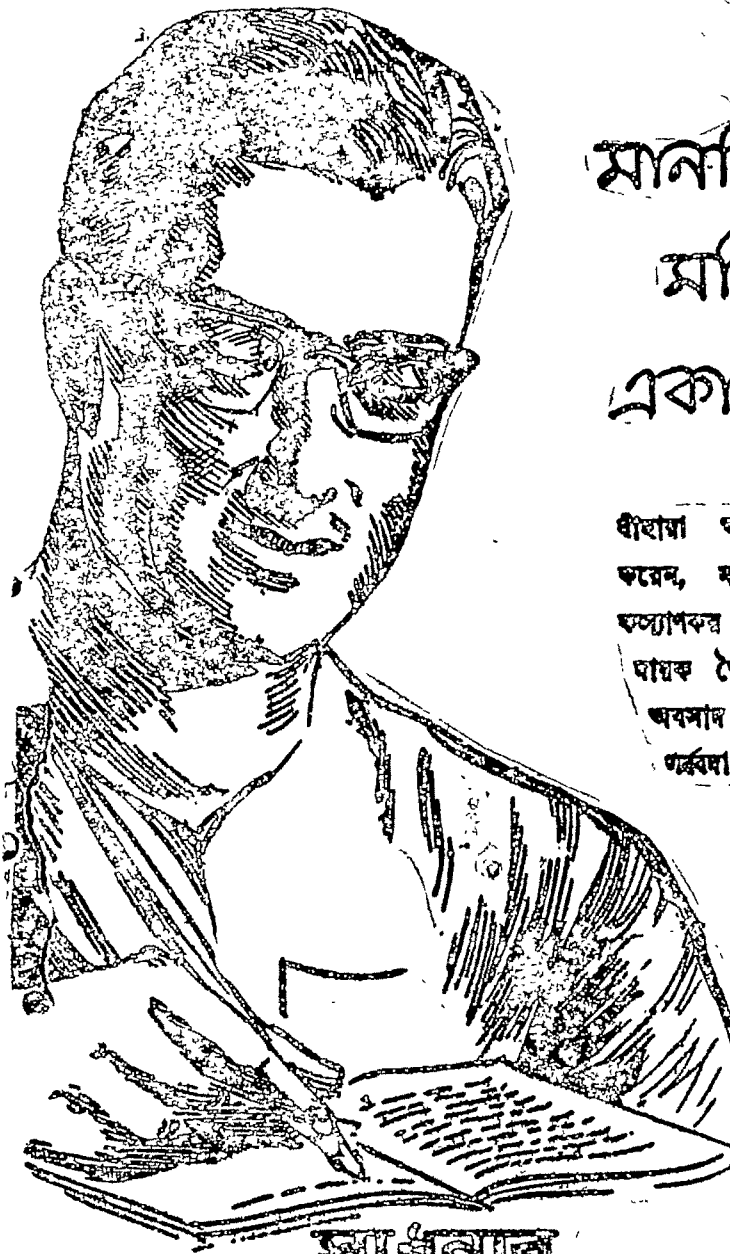
জালা ক'রে উঠল বলরামের চোখ দুটো। ভাত
কটকে নামিয়ে রাখল খালার উপরে। তারপর খালটা
ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে এসে
দাঁড়াল গোরালঘরের পাশটিতে। ডাকল সামনের দিকে।
প্রসারিত কাঠুখালির বিল খররোদের আলোর স্বকৃষ্ণ
করছে। যতদূর চোখ যায়, কোথাও দৃষ্টি বাধা মানে না।
তুখু ধান আর ধান। জলে হাওয়ার নাচছে। দোল খাচ্ছে।

আস্তে আস্তে বলরামের মন একটা অদ্ভুত প্রশান্তিতে
ভরে উঠল। দিগন্তর-জোড়া কাঠুখালির ভাগ্যদেবতা ওর
চোখের সামনে যেন একটা পরম সত্যকে তুলে ধরল।
বিচিৎরপিণী কাঠুখালির বিল। রূপে রূপে অপরূপ।
শ্রামলতা, কোমলতা এবং প্রাচুর্যে কখনো সে মগুর। আবার
ছলনায়, বকনায় কখনো সে নিষ্ঠুর। কখনো বা সে উদার
দাক্ষিণ্যে দু'হাতের অঞ্জলি কানায় কানায় পূর্ণ করে ঢেলে
দেয়। আবার কখনো বা রুদ্ধ ক্রুদ্ধ উদাসীন্ডে বিমুখ হয়ে
বসে থাকে। কাঠুখালির বিল কারো খেয়ালের ধার
ধারে না। আপন খেয়ালই তার খেয়াল।—মামুষ যাবে,
আগবে। হাসবে, কাঁদবে। সমস্ত জন্ম-মৃত্যু আর হাসি-
কান্নার মধ্যে কাঠুখালির বিল স্থির। অবিচল। মামুষের
অর্থ-দুঃখ আর আনন্দ-বেদনার নীরব সাক্ষী হয়ে অপরূপে
দাঁড়িয়ে থাকবে নিষ্পৃহ কাঠুখালির বিল।

কাঠুখালির বিল নিষ্ঠুর। ছলনাময়ী। তবু বলরাম বুঝতে
পারল, কাঠুখালির সমস্ত মামুষের প্রাণপাখি এখানেই বাঁধা
পড়ে আছে। এখানেই তাদের সারাজীবনের অর্থ-দুঃখের
খেলা চলে। আনন্দ বেদনার মেলা বসে। ম'রে গিয়েও
তারা যেন এখান থেকে বিদায় নিয়ে যেতে পারে না।
কাঠুখালির আকাশে-বাতিসে, পাকা ধানের শিহরণে,
বুড়ুকার দীর্ঘশ্বাসে সেই সব বিদেহী আত্মাগুলো ঘুরে
বেড়ায়। কাঠুখালির ছয়কুঁড়ুর ছয়রূপের আলো হাওয়ার
তারাত হায়ে। কাঁদে। আনন্দ-বেদনা অনুভব করে।

ছুটো অপরূপ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে বলরাম।
চোখের সামনে গাছপালা, ক্ষেত-প্রান্তর যেন একাকার হয়ে
যাচ্ছে। বহু দূরে শ্রাম-দিগন্তের শেষ মাথায় একটা অস্পষ্ট
ধোঁয়ার আভাস। আর তার মধ্য দিয়ে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে
গন্ধ,—নারাণ। কেউই যেন ওরা হারিয়ে যায়নি। অদৃশ্য
মায়ার বাঁধনে বলরামের আশেপাশে কাঠুখালির ক্ষেত-প্রান্তরে
ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়াল সুবাসী। বলরাম-ধীরেধীরে
ওকে কাছে টেনে নিল।



মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন!

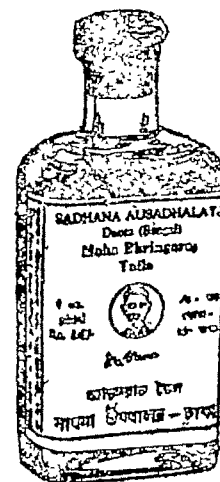
বীহায়া অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম
করেন, মস্তিষ্করাজ তাঁহাদের পরম
কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আশ্বা-
দায়ক তৈল জরুরীপ্রকার স্নান ও
অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে
জরুরী প্রকৃষ্ট ও কর্মকর রাখে।

সাধনার মহা ভৃঙ্গুরাজ তৈল



স্বাস্থ্যনা ঔষধালয়-ভাঙ্গা

মাথলা ঔষধালয় গেট কলিকাতা-৩৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলি:) ডায়গনোস্তিক

অধ্যক্ষ ত্রিবেণেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
ডায়গনোস্তিক, এম. বি. এস. (কলি:) এম. বি. এস. (আমেরিকান)
কলিকাতা কলেজের স্বাস্থ্যনা শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত অধ্যাপক

বাংলায় গোর্কী

[২৮শে মার্চ ১৮৬৮ গোর্কীর জন্ম। গোর্কীর শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাঙ্গালী পাঠক সমাজ নানা অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করেন। ১৯শে মার্চ জাতীয় গ্রন্থাগারে এই সব অনুষ্ঠানাদির একটি অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে 'ভারতে গোর্কী' শীর্ষক একটি প্রদর্শনীও আয়োজন হয়। ভারতীয় ভাষা সমূহে প্রকাশিত গোর্কী-রচনাবলীর একটি নির্বাচিত গ্রন্থপ্রদর্শনী করা হয়েছিল, ঐ উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার ভাষায় গোর্কীর গ্রন্থপঞ্জীও প্রকাশ করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় এবং

সাহিত্যপ্রেমী পাঠক সমাজে এবমবিধ সাহিত্যনিষ্ঠ ক্রিয়াদিই আদরণীয়।

আমরা জয়ন্তীর পাতায় ঐ গ্রন্থপঞ্জীর বাংলা ভাষায় গোর্কী অংশ সংকলিত করে দিলাম। এই অনুবাদ পঞ্জী বা রচনা পঞ্জী অসম্পূর্ণ। আমরা আশা করবো ভবিষ্যতে জাতীয় গ্রন্থাগার লেখক-কেন্দ্রিক পূর্ণাঙ্গ রচনাপঞ্জী প্রকাশের প্রচেষ্টা করবেন। ইতিমধ্যে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রখ্যাত লেখকদের বহু দুর্লভ রচনাপঞ্জী সংগ্রহে উদ্যোগী হলে আমরা পাঠক হিসেবে বিশেষ উপকৃত হব। জঃ সঃ]

গ্রন্থপঞ্জী

১। একদিন যারা মানুষ ছিল, অনুবাদ, পবিত্র গঙ্গো-পাধ্যায়, কলিকাতা ত্রিগুরু লাইব্রেরী, ১৯৪১, ১০৬ পৃঃ

২। ডাকনি কি, অনুবাদ, সময় সেন, মস্কো, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, ১৯৬০, ১৩৯ পৃঃ

৩। তিন পুরুষ ১ম খণ্ড, ক্ষয় দ্বিতীয় খণ্ড, অনুবাদ সীতাংশু মৈত্র, ভারতী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৫২-১৯৫৪,

৪। আমার ছেলেবেলা : অমুঃ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বুক এম্পোরিয়াম, ১৯৪৫, ২৯৮ পৃঃ

৫। আমার ছেলেবেলা : অমুঃ অমল দাশগুপ্ত, মস্কো, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, ১৯৫৭, ৪+৪৪২ পৃঃ

৬। ঝড় বখন এলো, অমুঃ গঙ্গেশ রায়চৌধুরী, বর্ধন পাবলিশিং হাউস ১৯৫৭, ৪+১১৬ পৃঃ

বুলিচভ ও অ্যান্ড্রা নাটকের উপস্থানে রূপান্তর।

৭। ফোমা গরদিয়েফ : অনুবাদ : সত্য গুপ্ত, সংস্কৃতি-ভবন, কলিকাতা, ২+২৮৪ পৃঃ

৮। অঙ্কুশ, চলন্তিকা প্রকাশক, কলিকাতা ১৯৬৫, ৬+৩০৮ পৃঃ

৯। মনিষ, অমুঃ অমল দাশগুপ্ত, র্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাতা ১৯৫৫, ১৭০ পৃঃ

১০। অবদ্বন্দ্বা, অনুবাদ : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কলিকাতা, ১৯৫১, ৮+১৪৪ পৃঃ

মালভা ও রেড গার্ল-এর অনুবাদ

১১। মালভা : অনুবাদ : শঙ্কর সেন, চক্রবর্তী ব্রাদার্স ১৯৫৪, ১২৭ পৃঃ

১২। মা, অমুঃ বিমল সেন, ১০ম সংস্করণ, বর্ধন পাবলিশিং হাউস কলিকাতা, ১৯৫২, ৬+২০৪ পৃঃ

প্রথম প্রকাশ ১৯৩০

১৩। মা, প্রথম খণ্ড। অনুঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শুভ ফ্রেণ্ডস্ কলিকাতা, ১৯৩৩, ৪টি চিত্র, ১৬১ পৃঃ

১৪। মা, অনুবাদ। অশোক গুহ, ভারতী লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৯৫৪, ১০+৩১৬ পৃঃ সম্পূর্ণ অনুবাদ।

বাণী, জ্যোৎস্নারানী বিশ্বাস, ১৯৬১, ৬+৩৬৫ পৃঃ

১৫। মা, অনুবাদ। পুষ্পময়ী বসু, স্ট্যান্ডার্ড বুক এজেন্সী, কলিকাতা ১৯৫৪, ২+২৯১ পৃঃ

১৬। ছোটদের গোর্কীর মা। অনুবাদ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, তৃতীয় সংস্করণ, শিশু সাহিত্য সংঘ, ১৯৫৬, ৪+১৩৭ পৃঃ

১৭। মা; মস্কো, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, ১৯৬২, ৪৫৮ পৃঃ

১৮। যৌবন স্মৃতি। অনুবাদ : খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ইণ্ডিয়া পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা ১৯৪৭, ৪+২৫৭ পৃঃ

১৯। পৃথিবীর পাঠশালায় : অনুবাদ : রবীন্দ্র সরকার, মস্কো, বিদেশীভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, ১৯৫৭, ২৬৬ পৃঃ

২০। মামুষের জন্ম : অনুবাদ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, ১৯৫৭, (গ) ১২০ পৃঃ

২১। ইতালীর রূপকথা : অনুবাদ ননী ভৌমিক, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো, ১৯৬১, ১৭৪ পৃঃ

২২। বুড়ো। নাটক : অনুবাদ : সমর সেন, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয় মস্কো, ১৯৬২ পৃঃ

২৩। নতুন আলো : অনুবাদ। শৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৫৪, ১৫৫ পৃঃ

২৪। তাদেরই তিনজন : অনুবাদ : সুনীলকুমার দত্ত, ওরিয়েন্ট বুক, কলিকাতা ১৯১৫, ২+৫০৫ পৃঃ

২৫। শিল্প ও সংগ্রাম : প্রথম খণ্ড সংকলিত গ্রন্থসমূহ, অগ্রণী বুক ক্লাব, কলিকাতা, ১৯৩৮ ৬+২২২ পৃঃ

২৬। গোর্কীর চোখে আমেরিকা : অনুবাদ সরোজ কুমার দত্ত, স্ট্যান্ডার্ড বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৫৪+৬৯৩ পৃঃ

২৭। লেনিনের সহিত : অনুবাদ মণিলাল শ্রীমানী, কল্যাণময় শ্রীমানী, কলিকাতা, ১৯৩৫, ২০ পৃঃ

২৮। পৃথিবীর পথে : অনুবাদ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পুরবী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৪৮ ৬+২৫০ পৃঃ

২৯। পৃথিবীর পথে : অনুবাদ সত্য গুপ্ত, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো, ১৯৫৮, ৫১০ পৃঃ

৩০। স্মৃতিচিত্র : অনুবাদ প্রমোদ গুহ পপুলার লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৫৮, ২১৫ পৃঃ

৩১। টলষ্টয়ের স্মৃতি : অনুবাদ ঋষি দাশ, ওরিয়েন্টেল বুক, কলিকাতা, ১৯৪৮, ৮+২০ পৃঃ

৩২। গোর্কীর ডায়রী : অনুবাদ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ইউ, এন, ধর, কলিকাতা, ১৯৪২ (৩ চিত্র,) ২০১ পৃঃ

৩৩। ক্রিম সাময়িন [১৯৫০-এর রুশ বিপ্লব ও তার আগে ও পরে] অনুবাদ সৌবীন রায়, র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব, ১৯৬৪, ৫৭০ পৃঃ

৩৪। মাতৃভি কোরেমিয়াকিনের জীবন ; অনুবাদ চিত্তরঞ্জন ঘোষ, বিংশ শতাব্দী, কলিকাতা, ১৯৬৫ ৪+৫৩৫ পৃঃ

৩৫। দু'টি গল্প : অনুবাদ রমাপতি বসু : ব্রজবিহারী বর্মন, কলিকাতা, ১৯৪১, ৪৮ পৃঃ

৩৬। গোর্কীর ছোট গল্প : অনুবাদ খগেন্দ্রনাথ মিত্র ইউ, এন, ধর, কলিকাতা, ১৯৪২ (৩ চিত্র,) ৩৫৭ পৃঃ

৩৭। গোর্কীর তিনটি গল্প : অনুবাদ খগেন্দ্র মিত্র, ইউ, এন, ধর, কলিকাতা, ১৯৪৬ ৫+১৯৪ পৃঃ

৩৮। গোর্কীর ছোট গল্প : অনুবাদ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ইউ, এন, ধর, কলিকাতা, ১৯১৭ ৪+১৬৪ পৃঃ

৩৯। নবজাতক : অনুবাদ নীহার দাশগুপ্ত, (লেখকের আত্মজীবনী সহ) ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা ১৯৪৭ ৩৫+২১৩ পৃঃ

৪০। সহস্রাব্দী : অনুবাদ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, জ্ঞানদীপ
বুক এজেন্সি, ১৯৫৩, ৯৩ পৃঃ

৪১। গল্প সংগ্রহ : (ছোট গল্পেব সংকলন) অনুবাদ
শীলা মিত্র এবং অন্তান্ত, র্যাডিকাল বুক ক্লাব, কলিকাতা,
১৯৫৪ ১০+১২৬ পৃঃ

৪২। নানা লেখা : অনুবাদ সরোজকুমার দত্ত :
জ্ঞানদীপ বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৫৪ ১০+২২৩ পৃঃ

৪৩। নীচের মহল : গোর্কার লোয়ার ডেপথস্
অবলম্বনে উমানাথ ভট্টাচার্য, সবুজ বলাকা চক্র, ৩০ জুন ৫৮,

৪৪। যে দিবস : [ম্যাক্সিম গোর্কার মা অবলম্বনে]
(ঘুম নেই—যে দিবস—দীপ) উৎপল দত্ত, জাতীয় সাহিত্য
পরিষদ, ১লা বৈশাখ, ১৩৬৮

৪৫। ম্যাক্সিম গোর্কা : অমল দাশগুপ্ত, স্বাক্ষর,
কলিকাতা, ১৯৫৫ ৪+৬১, (২ চিত্র)

৪৬। ম্যাক্সিম গোর্কার মৃত্যু ও মর্কো বিচার :
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও নির্মলকান্তি মুখোপাধ্যায়,
মিত্রালয়, ১৯৫৭ ৪+১৪০

৪৭। ম্যাক্সিম গোর্কা : মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, বেঙ্গল
পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৫৫ ৩+২৬৭ পৃঃ

৪৮। ত্রয়ী : সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অভিযান পাবলিশিং
হাউস, কলিকাতা, ১৯৪৮ ২+৩৪ পৃঃ

[গোর্কার সহিত সাংসারের বিবরণীসহ]

অনিষ্ট নান্দন

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩.৫০ টাকা

“...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য
পরিষ্কার করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতন্ত্র। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স
যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতন্ত্র ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যো
করিয়েছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।
... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১.২৫

“...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহ
করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতা
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবা
নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে
ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদে
অবগম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষে
সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া ‘নান্ত পন্থা বিহনে
অয়নায়।’ (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে
এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়ন্তী—৩০৯, গান্ধী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

পুস্তক পরিচয়

অমুবাদ :

কাদম্বরী। শ্রীবাণভট্ট। অমুবাদক শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর। পৃ ২৭+৩০৭ রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানি। কলিকাতা ১২। দাম বারো টাকা।

‘প্রদীপ’ পত্রিকায় প্রকাশিত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের একখানি তেলরঙে আঁকা কাদম্বরী-চিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে ‘বর্ণচ্ছটায় অঙ্কিত’ কাদম্বরী-কথার যে বর্ণনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাণভট্টের ঐ রচনা সম্বন্ধে বাঙালি পাঠককে এলোভিত করার সমস্ত রূপান্তরই তার মধ্যে ধরা ছিল। যার তিনেকের মধ্যেই কাদম্বরী-কাহিনীর অনাদৃত্য এক স্নেহময়ী—পত্রলেখকে তিনি উপেক্ষিত বলে সিদ্ধান্ত করে তাকে আরো অপক্লপা এবং রচনাটিকে আরো মহিমাম্বিত করে তুলেছিলেন আমাদের কাছে।

গত শতাব্দীর মধ্যদশকে অর্থাৎ আজ থেকে শতাব্দিক বছরেরও আগে কাদম্বরী-কথার বাঙলা অমুবাদ সাধিত হয়েছিল। অমুবাদক তারাশঙ্কর তর্করত্ন। এই অমুবাদ ঠিক অবিকল অমুবাদ নয়, তারাশঙ্কর কাদম্বরীর গল্পাংশটুকুমাত্র বাঙলায় বর্ণনা করেছিলেন। তারপর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ঐ অমুবাদটিকেই আশ্রয় করে এবং মূল্যের কোনো কোনো বর্ণনার কিছু কিছু অংশ তাতে ছুঁড়ে দিয়ে নতুন একটি বাঙলা কাদম্বরী প্রণয়ন করেন। কিন্তু এই অমুবাদও নিরতিশয় খণ্ডিত। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যে অংশও বাঙলা কাদম্বরীর প্রত্যাশা করেছিলেন, তা পূর্ণভাবে যথার্থভাবে ও

শিল্পাভিরাগভাবে প্রণীত হয়ে ওঠে প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরেরই হাতে। প্রমথ চৌধুরী প্রবোধেন্দুনাথের ঐ অমুবাদের স্মৃতি যা লিখেছিলেন তা হলো :

মূল কাদম্বরী যারা পড়তে পারেন না, অথবা ঈর্ষ কষ্ট করে পড়েন না, তাঁরাও যাতে কাদম্বরীর রস আশ্বাসন করতে পারেন তার জন্তই আমি বাঙলা কাদম্বরীর সাক্ষাতের প্রত্যাশী ছিলাম। আর আশা ছিল যে, একদিন না একদিন কোন নূতন লেখক আমাদের সঙ্গে কাদম্বরীর পরিচয় করিয়ে দেবেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দু ঠাকুরের অমুবাদ আমার সে আশা পূর্ণ করেছে।

শ্রীমান প্রবোধেন্দুর অমুবাদ প্রথমত সংক্ষিপ্ত নয়, দ্বিতীয়ত তাঁর ভাষা বাঙলা। অতএব তা যথার্থ বাঙলা কাদম্বরী।

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের এই উর্জমা প্রায় বছর তিরিশ আগেকার। তখন থেকেই এই অমুবাদ বহু পরিচয় এবং বহুতর সমাদর লাভ করেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত ভাষায় মন্তব্য করেছেন : ‘কাদম্বরীর মতো গভ্রকাব্যকে সমাসের গ্রন্থি ছাড়িয়ে নিতান্ত সহজ বাঙলায় এমন রসিয়ে উর্জমা করতে পারা কম কথা নয়। এ যেন স্বর্গের মন্দাকিনীকে বাংলার মাটিতে ভাগীরথীধারার মতো নামিয়ে আনা।’ এবং শুধু রবীন্দ্রনাথের দেওয়া এই সম্মানের জন্তই নয়, বাঙলা ভাষাভাষী অজস্র জনই যে তাঁরই অমুবাদ পড়ে অমুপ্রেরণা লাভ করেছেন, তাতে সংশয়ের কারণ নেই। প্রবোধেন্দুনাথ শুধু যে কাদম্বরীর নির্ধাশটুকু অবিকলভাবে

বাঙলায় সঙ্কলন করে দিয়েছেন তাই নয়, তাঁর এই অনুবাদ এতদূর স্বমহিম যে তা অতীত সৃষ্টির কোঠাতেও গিয়ে পৌঁছেছে।

নিজের অনুবাদরীতি সম্বন্ধে ভূমিকায় তিনি কৈফিয়ত দিয়েছেন, অক্ষরের উপাসনা ত্যাগ করে পদাবলীজনীন ভাবাধিত রলের অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছি এবং ত্রীবাণভট্টের ভাষা ও পদলালিত্যের মার্ঘ্যচন্দন চয়ন করে বাংলার সরস্বতীর বেষ্টীমূলে রচনা করেছি অর্থাৎ তাঁর রচনায় যে সাবলীল স্পর্শময়তার গুণ এসেছে, তা বোধ করি এই অনুবাদ পদ্ধতিরই গুণে।

কাদম্বরীর এই সংস্করণের ভূমিকায় বিগুণেশ্বর ভট্টাচার্যের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা স্থাপিত আছে। আর পরিশেষে কাদম্বরী-কথার যে উৎস—শোমদেব-কৃত কথাসরিৎসাগরের শক্তিকণ্ঠ নামক লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গ-স্থিত সেই মূলটির অনুবাদ ও সঙ্কলন করে দেওয়া আছে। আরও আছে শঙ্করার্থবহ একটি পরিশিষ্ট।

যারা এই বইয়ের পুরোণো সংস্করণ দেখেছেন, কাদম্বরীর এই নতুন রূপা-সংস্করণ কিন্তু তাঁদের প্রত্যাশাকে একটু ক্ষুণ্ণ করবে। বইয়ের আকার নতুন সংস্করণে খাটো হয়েছে। অবশ্য পরিচ্ছন্ন লাইনো-হরফে মুদ্রণ শৌকর্যও বিধান করা আছে। কিন্তু প্রচ্ছদ চিত্রটি আমরা কোনোক্রমেই পছন্দ করতে পারিনি।

উজ্জয়িনী বন্দ্যোপাধ্যায়

উপজ্ঞাস :

জল দাও ৪ সন্তোষকুমার ঘোষ। আনন্দ পাবলিশার্স।
প্রাঃ লিঃ। কলকাতা-৯ পৃঃ ১১৪। মূল্য : ৩.৫০

জল দাও আমায় জল দাও,

রৌদ্র প্রখরতর, পথ অদীর্ঘ,

আমায় জল দাও।

আমি তাপিত নিপাসিত,

আমায় জল দাও।

আমি শান্ত,

আমায় জল দাও।

—আনন্দের উক্তি, চণ্ডালিকা

“ক্রুশ কাঁধে নিয়ে...এক-গলা জলে দাঁড়িয়েছি। নদী, আমার হুঁটি প্রার্থনা : হয় তুমি শব আর ঘাতক দু'জনকেই তোমার স্রোতে ভাগিয়ে নিয়ে যাও, নয় এক গণ্ডুষ জল দাও, যাতে পুনর্জন্ম পেতে পারি।”

—ভিমিরকুমার চাকলাদারের ডায়েরির পরিশেষপ্রার্থনা

আমরা নিশ্চিতভাবে অবগত আছি, উক্তি হুঁটি, হুঁটি ভিন্ন প্রসঙ্গ থেকে এসেছে। স্পষ্টত, আনন্দের কীসের পিপাসা, কেন শ্রান্তি—আমরা জানতে পারিনি। আশাধের ধারণা তার সব পিপাসার ক্ষান্তি হয়েছিল বুদ্ধশরণ নিয়ে। তা ছাড়া ‘চণ্ডালিকা’ নাটকে আনন্দের ভূমিকা নিরতিশয় পরোক্ষ, এবং তার কোনো নিবেদনও নেই।

অপর দিকে ‘জল দাও’ উপজ্ঞাস আগাগোড়া ভিমির কুমারের যাত্রা ও নিবেদন, যে আবার এই উপজ্ঞাসের নায়কও বটে। ভিমিরকুমার আপাদমস্তক দীর্ঘব্যবহিত, নিজের কাছেও অবিচ্ছাদী। তার কোনো প্রত্যাশা পোয়েনি, সমস্ত প্রত্যাশা শরীর থেকে তার আত্মায় গিয়ে জমে আছে। আর তার সমস্ত পৰ্বণরিক্সা উন্মার্গ দিয়ে।

অথচ সেই সমস্ত কিছু প্রত্যেক মুহূর্তে টের পেয়ে আত্মাকে সে দেহের আগে স্থাপিত করে রেখেছে। বোধ-করি সেইদিক থেকে সে আনন্দের থেকেও অধ্যাত্মসচেতন। বিবেকবাদী। অবিমিশ্র ইন্দ্রিয়ের উপরে তার অধিষ্ঠান, কিন্তু সেই সঙ্গেই প্রত্যেক মুহূর্তে সে জেনেছে কোনখানে রয়েছে তার আত্মার শান্তি। তরঙ্গভঙ্গিল অগাধ জলরাশি, সেই জল অনেক দূরের দেশের কিংবদন্তীও নয়, সেই জল

তার শরীরোপান্তে। কিন্তু তার গলায় যা। সে জল খেতে পারে না।

সমস্ত উপভাসখানিতে জলের প্রার্থনা প্রায় মস্তের মতো ক্ষরিত হয়েছে। আগাগোড়া অমুচ্চারিত, কিংবা স্তন্যে না পাবার মতো অমুচ্চ, কিন্তু ক্রুবাব মতো অস্বাভিত নাভিমূল পর্যন্ত পিপাসা নিয়ে সে এসে প্রকাশিত হয়েছে। একের পর এক সংগ্রহ করেছে তৃষ্ণার উপকরণ, বলা যায় গেলার পর গেলান। কিন্তু সেই জল তার মুখে ওঠে নি। আর শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটেছে সেই পিপাসায়।

সবচেয়ে বড় কথা, তিমিরকুমার সবসময়েই জানতো যে সে নিজে হাতে হত্যা করেছে তার সেই পিপাসার্ত সন্তাটিকে। সে জানতো তা তার নিজেরই অপরাধ, সে পাপ করেছে। এবং জানতো ঐ জল একদিকে তার অনিবার্যীয় নিয়তিভূল্য অপরাধ আর অপরাধজাত পাপ পারে হুইয়ে দিতে; আরো পারে তাকে পুনর্জন্ম দিতে। তার প্রার্থনা তার নিভৃত্তম অভিলাষও ছিল তা-ই। কেননা সে জেনেছিল, আর কোনো নিসর্গশক্তির সাধ্য নেই তাকে বাঁচায়। অতএব : জল আশায় পাপ থেকে পুত করে নাও, জল আশায় বাঁচাও—মাপঃ শুদ্ধ মৈনসঃ, শম আপঃ—এই প্রত্ন ও চিরন্তন অব্যক্ত-প্রার্থনায় সে দীর্ঘ হয়ে রইলো। এই প্রার্থনা নিয়েই সে একেবারে বিপরীত স্রোতের চলচ্ছবিতে গেল জড়িয়ে, নিজেকে কুণ্ঠিত করে নিজের-বিপরীত-নিজের ভিতরে অনবচ্ছিন্নভাবে পরিমূর্ত হয়ে চললো।

সন্তোষকুমার ঘোষের ইদানীন্তন এই উপভাসখানির তুল্য আধ্যাত্মিক রচনা খুব সম্প্রতিকালে আর পড়েছি বলে মনে পড়ে না। অত্যন্ত গুঢ়ভাষী : এর যা কিছু বস্তুব্য তা এত অঙ্গরে রাখা যে খুব নিবিষ্ট কাণে ছাড়া হয়তো ধরা পড়তে চায় না। আর আপাতত ভয়ানক দেহোপকণ্ঠি বাস্তবতার মণ্ডিত, ভয়ানক চট্টলভাবে সপ্রতিভ, আলিষ্ট থাকার মতো ধারাবাহিকতাও নেই কাহিনীতে, কিংবা মুখ

ধাকার মতো রচনাশৃঙ্খ। কিন্তু কাপ পাতলে মনে হয় তির তির-করে ফল্গুধারার মতো সংগোপিত রোগা ও স্কুমার আত্মা নির্গলিত হয়ে চলেছে তলে তলে। সেই নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার ভিতর থেকে গল্পটি বাঁধা।

সবটুকুই অবশ্য এতখানি লুকোনো নয়, অন্তত শুরু থেকেই লেখক তাঁর দ্ব্যর্থ-প্রণবতার হতোটি যে ধরিয়ে দিয়েছেন তাতে ভুল নেই। যেভাবে গল্প বুনেছেন এবং সেই গল্পের শব্দাঙ্কের ফাঁকে ফাঁকে যেভাবে তাঁর অভীষ্ট চরিত্রটি ক্রমশ রূপায়িত হয়ে উঠেছে তাতে তাঁর পরোক্ষ-প্রিয়তা অব্যক্ত নয়। বরং বোঝাই যায়, এখানে প্রত্যক্ষ কথা বলার ব্যাপারটি কম, সব কথাই এখানে অমুরগনে ভরা—প্রতীকার্ধে গ্রহণীয়।

যদি কোনো প্রত্যক্ষ প্রতিপাদ্য বলতে হয়, বলা যায় তা হলো তিমিরকুমার নামে বিবেক ও আবেগের টানাপোড়েনে শতচ্ছিন্ন, সময়-সমাজের হাতে অপব্যবহৃত, অন্তর্দেবতার কাছে অপ্রমাণিত এক আধুনিক মানুষের কাহিনী। সবাই যাকে নানানরকমভাবে চেনে এবং নানানরকম ভুলভাবে চেনে, অর্থাৎ সত্যিই কেউ যাবে জানেনা যার সব জবান-বন্দী একমাত্র তার নিজের কাছে রাখা। এই উপভাসে সেই রকম স্পষ্ট দুটি পরিচ্ছেদ-বিভাগও আছে। এক : জগতের কাছে ব্যক্তি। দ্বিতীয় : নিজের কাছে ব্যক্তি। তিমিরকুমারকে আমরা অন্তত চারজনের কাছে থেকে চার-রকমভাবে চেনবার পর তার স্বরচিত আঙ্গুরিত থেকে আরেকরকমভাবে চিনতে পারি। এবং সেই লেখাও যেহেতু পরার্থে—সম্পাদকের সমীপে এবং পাঠকসমাজের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, তাই তা-ও দেখা যায় দ্বিধাধীন। তিমির খুব প্রতীকী ভাষায় এইটুকুমাত্র সেখানে বোঝাতে পেরেছিল, সে কারোকে খুন করেছে, বা সে কারোকে খুন করেছে। সেই কার্যকারণের আভাসটুকুও হয়তো বোঝাতে পেরেছিল সে। কিন্তু সেই পরম-আন্তরিক আত্মনিবেদন ও অন্ত যে

কারো কাছে নিবেদিত হবার মুহূর্তেই স্বভাববদল করে যেতে চায়, স্বভাববদল কবে রোগহর্ষক উপাখ্যানে পরিণত হবার প্রার্থনায় মুয়ে যেতে চায় দেখে সেই কাহিনীও তার শেষ করা হয়নি। এই উপন্যাসের শেষ অংশ আসলে স্বগতোক্তি, অকথিত বা একমাত্র নিজের কাছে শুদ্ধতার কথিত কথা। যা কারোকে জানাবার কথা নয়, যা কারোর জানারও কথা নয়। শুধু উপন্যাসকার সেই কথাগুলিকেও দাবি করেন বলে, তাঁকে সেই স্বগতোক্তিনিচয়কে স্বীকারোক্তির বেশ পরিয়ে নিতে হলো।

সন্তোষকুমারের এই লেখার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব অবশ্য তাঁর অতিসুপ্রতিভা বলার ভঙ্গিটি, যাকে দোষ বা গুণ উভয়তাই প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। অনেকে এই গুণেই হয়তো উপন্যাসটিকে ভালোবেসে ফেলবেন। অনেকের ঐ অতি-চটুলতা বশতই হয়তো মন বসবে না উপন্যাসে। কিন্তু এই লেখার মূল কথাটি যে ঘরে লুকোনো আছে দেখানো যারা পৌঁছাতে পারবেন, তাঁরাই বুঝবেন, এই লেখা শুধু ভালো বা মন্দ বলে চেনা ভুল চেনা। এই বই আসলে ভালোও নয়, মন্দও নয়, কিন্তু খুব নৈতিকভাবে মূল্যবান। লেখক এই উপন্যাসে খুব নীতিগ্রাহ্য ছ'একটি কথা লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন—ভিতরকার নিভৃত আত্মার কথা, যাতে আনন্দ যদি পাওয়া যায় তা বাড়তি, পরামর্শটুকুই প্রধান।

শ্রীনিবাস আচার্য

মনোনয়ন : বিমল কর। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২—দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

সাহিত্যে অনেক বিভাগের মতোই বোধ হয় ছোট গল্পেও কোনো সংজ্ঞা হয় না। ছোটগল্পের রূপের, রীতির, অন্ত প্রকৃতির স্পষ্ট স্পষ্ট বর্ণনা দেখেছি কিন্তু স্বরূপের এমন

কোনো বিশ্লেষণ দেখিনি যাতে নিশ্চিত বিচারে বলা চলে-এই হলো ছোট গল্প। অথবা এই না হলে ছোটগল্প হয় না, অথবা এই বিষয় আদৌ ছোটগল্পে অন্তর্ভুক্তই নয়। এই সব প্রশ্ন আরো একবার মনে এলো বিমল করের মনোনয়ন পড়তে পড়তে।

আজকের আলোচনায় একথা বলার সার্থকতা এই যে হালেক ছোটগল্প পড়তে গেলে অনেক সময়েই এমন কোনো কথা মনে পড়ে না। কুচিৎ কখনো বিদ্যুতের মতো চকিত চমক বা তীব্র দীপ্তি কারো কারো লেখাতে নিশ্চয়ই পাওয়া যায় কিন্তু তাতেও সেই অনিশ্চিত প্রাথমিক পথে বিচরণ, হয় মনোহরণ প্রেমের পুর্বানো কাহিনী, অথবা সংসারের চিরায়ত দুঃখ বিষাদ সমস্তা সংকট, বড়জোর মনোবিকলন বা চেতনা প্রবাহ। ভাবতাম, গল্পের জগতের পরিশীলিত কি তবে আমাদের চেনা হয়ে গেছে? তার প্রত্যন্ত প্রদেশে কোনো বিষয় নেই বলে কি পুর্বানো পথে গভীরতার সন্ধান? যেমন চাঁদের উল্টো পিঠের শাদামাটা রূপের আলোকচিত্র দেখে নিরাশঙ্ক এ যুগের কবি-বিজ্ঞানীরা। কিন্তু ছোটগল্পের এই পরিণতিই যদি সত্য বলে মনে নিতে হয় সেই বৈচিত্র্যহীন অবস্থার রূপ দেখতে আর নতুন করে ছোটগল্প পড়বো কেন আমরা? মনোনয়ন গল্পগুলো প্রকৃত কথালিঙ্গী আমাদের বহুদিনের এই ক্ষোভ দূর করেছেন। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তার মানে এ নয়, মনোনয়ন তাঁর আশ্চর্য সিদ্ধির সাহিত্য। বিমল কর শক্তিমান ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। এবং স্বভাবতই এমন লেখকের যে বৈশিষ্ট্য তার অঙ্কে যখন তার বই পড়তে গেছি তখন মনে অহেতু প্রত্যাশাও রাবিনি অথবা হতাশাও। জানি কাহিনীর রাগরূপ হবে নিটোল, স্থায়ী বাণী বিভ্রাস, এবং একটি ছোট চমকপ্রদ অথবা হৃদয়স্পর্শী কাহিনীও প্রত্যাশা করা যেতে পারে। তার চেয়ে বেশীও কিছু চাইনি, কম হবে তাও ভাবিনি, কিন্তু

গল্পগুলো পড়ে দেখলাম প্রবীণের প্রস্তার পথে বিমল কর হাঁটেননি—বরং যে পথ বেছে নিয়েছেন তা ছঃসাহসী এবং নিঃসঙ্গ।

মাত্র সাতটি গল্পের এই সংকলনে ব্যাপ্তিও বৈচিত্র্যই শুধু লক্ষ্য করবার। প্রথম গল্প ‘অপেক্ষা’ একটি প্রতীকের বিস্তার মাত্র। প্রতীকটি খুব সার্থক এবং সুপ্রযুক্ত এমন বলা যায় না। কিন্তু গল্প হওয়ার জন্তে তার যে প্রয়োজন আছে খুব, তাও মনে হয় না। একটি হারিয়ে ফেলা চিঠিকে কেন্দ্র করে একটু বিচিত্র স্বভাবের মানুষ শিবতোষের মনের এই উদ্বেগ, অস্থিতি এবং অশান্তি এই কি গল্প নয়।

‘নীরজা’ গল্পের বিষয়ে অভিনবত্ব নেই কিন্তু জীবনের একটা সত্যতর স্পর্শ আছে—মানুষের মন তার আশা, স্বপ্ন, বিশ্বাস, তার প্রেম সম্পর্কে ধারণা কি ভাবে আশৈশব নানা স্মৃতিশ্রুতির নিষ্কৃতিতে গড়ে ওঠে তারপর বাস্তব জীবনে সেই সব বোধ কিভাবে যা খেতে খেতে চলে, কি ভাবে যে অস্থ মানুষ চায়, নিজের স্বভাবের অতিরেকে দাস্তিকতার জেদে অহমিকায় তাকে নিজেই টুকরো করে বসে থাকে তারপর শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে সেই আশাতে অতীতের দিকে তাকিয়ে থাকে ক্লান্ত করুণ তার বোধ হব, ফিরে পাওয়া যায় না ফিরে চাওয়া যায় না পুরানো প্রিয়জনকে। জয় পরাজয় একটা দীর্ঘস্থায়ের মধ্যে এসে দমিত হয়ে যায়। রূপকথার সৌমভীর প্রেম নীরজার মধ্যে ছিল না, ছিল না হিরণের মধ্যেও। তবু হিরণ নীরজার কাছে সেই প্রেম আকাঙ্ক্ষা করেছিল। কিন্তু সময় যখন তাদের বিয়েকে ব্যর্থ প্রমাণ করে অনেক দূরে সরিয়ে দিল তখন একদিন অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে হিরণ বুঝলো “মানুষ জানে না, সে কেন অপেক্ষা করে, আমি চলে আসার পর থেকেই অপেক্ষা করছি। তবু যখন নীরজার সেই শবের বাড়ি, অহমিকা দস্ত স্বচ্ছাচারিতা সমস্তই চলে গিয়েছে, তখনও মনে সৌমভীর সংকল্প রেখেও হিরণ তাকে আনন্দভবনের দরজায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলো।

‘উদ্বেগ’ গল্পটি একটি কল্যাণকামী মানুষের মহানারীতে মৃত্যুর ভয় এবং উদ্বেগ যাকে ঘিরে ধরেছে কোনো স্বার্থপর চিন্তা যা নয়, যা অহেতু মৃত্যুর আক্রমণের যোকাবিলা করতে এগিয়ে আসতে চায় সকলকে আসতে বলে তার সেই হাত নিষ্ঠুর অপমানের ভেঙে দেওয়া হয়। কেননা, আপাতত এই শহর কেবলমাত্র এবং অধিকারী ব্যক্তিদের উপদেশ মতন পরিচালিত হবে। রাজারামবাবু আরও দেবার ব্লিচিং পাউডার ছড়াতে ‘হুজুম’ করবেন, তিনি চেয়ারম্যান। মুখার্জি সাহেব ইঁদুর মশা মাছি থেকে সাবধানে থাকতে বলবেন, কেন না তিনি হাকিম, শিশির কিছু বলতে পারবেনা—কেন না প্রতিটি মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন ও অস্থির বোধ করছে। সে শুধু লজ্জিত হবে। অমৃতপ্ত হবে।

‘স্বপ্ন’ গল্পটি রূপকথার চংয়ের প্রতীকী কিন্তু সহজ। অর্থ, তৃপ্তি, আনন্দ ভালবাসা শাস্তি ভগবান—এই সব কত যে সহজ লভ্য কত সুলভ সেটাই যেন লেখক এখানে বলতে চেয়েছেন, অথচ আশ্চর্য তবু আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে জৈবিক ভাবে স্ফূর্ত হয়ে এই সব সন্ধান না করে চলে যাচ্ছি। এ কাহিনীতে যে গল্প হতে পারে নীতি গল্পের খোঁশ ছাড়িয়ে বেরিয়ে থাকতে পারে এ ভাবতেও বিশ্বাস। এ সংকলনের বোধহয় সার্থকতম গল্প (অন্তত আমি বলব তাই) জননী মায়ের মৃত্যু হয়েছে। নানা দুঃখে ব্যর্থতায় তার সন্তানদের জীবন পঙ্গু। তারা অভিপ্রেত স্বাচ্ছন্দ্য পায়নি, অর্থ পায়নি, তার মূলে জীবনের কোথাও একটা প্রবঞ্চনা ছিল। যার উৎস মুখে জননীর কিছুটা দায়িত্বও ছিল হয়তো। আজ মায়ের শ্রাদ্ধের পরে একদিন তাঁর চিতার বেদিতে ভাইবোন পাঁচজনে এক ইচ্ছায় পৌঁছালো—মার হাতে আজ তারা কি দিতে পারে যা নিয়ে মার মৃত্যুর পর দীর্ঘপথ যাত্রা সহজ হবে। মার মনে অনেক দুঃখ ছিল অনেককে নিয়ে, কিন্তু বড়ছেলেকে নিয়ে তার যে সাধ এক স্ত্রীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার সাধ যা পূর্ণ হয়নি কেননা

এই মেয়েটি ছেলের রক্ত অবনীকে ভালবাসত এ জেনেও
হলে তাকে বিয়ে করতে পারেনি। সে বলল 'আমি
সামান্য ভালবাসি কিন্তু ভালবাসা আরও বেশী ভালবাসি।
। এই কথাটা কেন যে বুঝল না। আমি মাকে আমার
সই ভালবাসার মন দিতে পারি বড় মেয়ে বলেছিল 'মা
খাদ্য চাইত আমি সাহস চাইতাম, মাকে আমি মামুষের
চিত্ত সাহস দিতে পারিনি। মা যেন সেই সাহস পায়।'
হাট বলেছিল 'মা আমার অস্থখটাই দেখেছিল, স্থ দেখিনি।
। জানত না, জগতে সব রোগ কেবল ডাক্তার দিরে
সারানো যায় না। আশা পাওয়া অনেক ভরসা পাওয়ার
কত শক্তি। মা যেন মনে ভরসা পায়। অমূল্য বলে 'মা
স্বার্থভাগ জানত না.....আমায় যদি কিছু দিতে হয় আমি
কি স্বার্থভাগদেব, আর কিছু না। অন্ধ মেজলা অবশেষে
দেখিল মাকে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল। মা
সামান্য স্বপ্ন চক্ষু পাক।' সর্বগ্রাস এই স্থখেও ওরা মার
নিবিল্ল যাত্রা কামনা করছিল। ওদের যা দেবার সাধ্যমত
য়েছে।

'জিলোচন নন্দীর নামে ছড়া' গল্পটি বিচিত্র। এবং
নোবিকলনের। হুতরাং অর্ধশুট দুর্বোধ্য। জিলোচন
ন্দী এক পাখি কিনেছিল, তাকে ঠকিয়েছিল পাখিওয়ালী।
রং করা পাখি দিয়ে। তার নামে ছড়া হলো সেই পাখি
য়ে তার বোঁএর উপরে। তার বোঁ যেন সেই পাখি।
খচ ফুল্লরার ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েও গল্পকার মুরারী জিলোচনের
জ্যাতিধীর চোখে ধরা পড়ে গেছে ভাবল, ভেবে ভয় পেল।
এয় পেয়ে অপমান করতে গেল সেই ছড়ার কথাটা বলে।

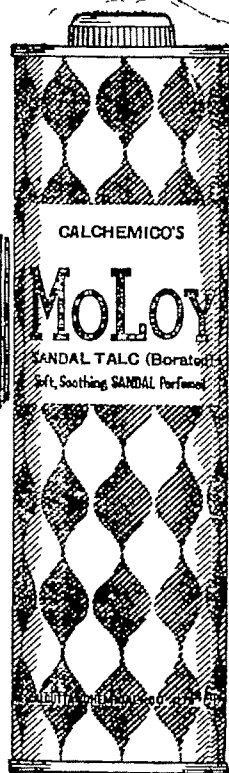
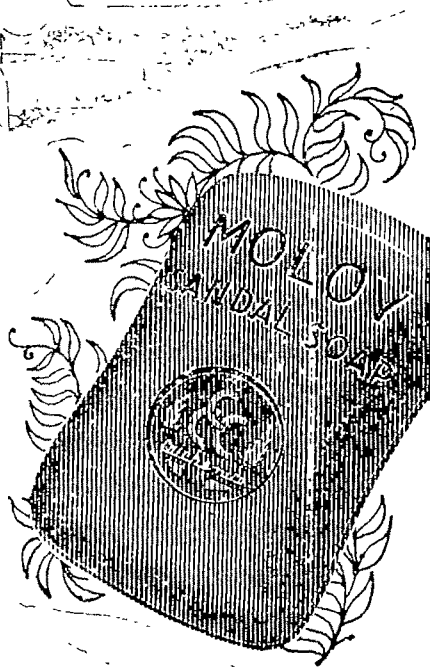
সে ইচ্ছাটা বুঝে যাঁএর মতো ফিরে এলো। আর সেই
বর্ষার প্রমত্ত রাত, শরীরের উত্তেজিত চেতনা জিলোচন নন্দীর
আত্মস কাঁচের মত চোখের নিচে রয়েছে মনে করে জেগে
উঠে অনুভব করলো জিলোচনের কথার সত্যতা যে, আমার
হাতে আমি ধরা আছি।

স্বধাময় স্বধার সন্ধানে বেরিয়েছিল, প্রেম সেই স্থধা, যে
মেয়েটিকে সে প্রথম ভালবেসেছিল তার যৌবনের রঙে সে
মেয়েটিকে হারিয়ে ফেলতো বলে ভেবেছিল সেখানে প্রেম
নেই। সে তাকে এড়িয়ে চলে গিয়েছিল। তারপরে
টি. বি. সেনিটরিয়মে সে মেয়েটির চোখে যে আশ্চর্য
নিখরতার বুনন অনুভব করেছিল। অদে প্রত্যঙ্গে রূপে যে
হৈমন্তী অত্যন্ত শীমিত—ভেবেছিল সেই জন্মেই এক
দেহাতীত অদৃশ অধঃ অস্তিত্ব তাকে গাঁথছে—এই তার
অভীপ্সার প্রেম। কিন্তু হৈমন্তীর দেহটা যখন শূন্যে মিশে
যেতে চলেছে, মিশে গেল তখন অনুভব করল আবার তার
আগের চিন্তার পিছনে কি ভ্রান্তি রমে গেছে। রাজেশ্বরীর
মধ্যে তার দেহের বাইরে আলোর ভুবন খুলেছিল পারিনি।
হৈমন্তীর মধ্যে তার মনের আলোয় অস্তিত্ব অনুভব করে
সার বস্তু পেয়েছে ভেবেছিল। সে জানত না তার দেহের
সঙ্গে এত গভীরভাবে সে অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে। তবে কি
তার ভালবাসা অন্ধকারের মতন। প্রদীপের কাছে যতক্ষণ
আছে ততক্ষণ আলোকিত, একে ভালবাসা বলে। এ প্রশ্নের
জবাব পেতে সে কোথায় গিয়ে পৌঁছালো?

অম্বজ বস্তু

মলয় স্যাণ্ডাল সোপ ও মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্ক

দুয়ে মিলে
আপনাকে সারাদিন
চন্দন সৌরভে
ভরপুর রাখবে



মলয় স্যাণ্ডাল সোপের মনমাতানো
দীর্ঘস্থায়ী চন্দন-গন্ধ এখন মলয় স্যাণ্ডাল
ট্যাল্কেও পাবেন। এই চন্দন-স্বরভিত
সাবান ও পাউডার—দুয়ে মিলে
আপনাকে আরো রমণীয়, কমণীয় করে
তুলবে। মলয় স্যাণ্ডাল সোপের
স্নিগ্ধ ফেনার স্পর্শে সব অবসাদ দূর হয়ে
আপনি শতেজ হয়ে উঠবেন, আপনার
গায়ের রঙ স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।
মলয় স্যাণ্ডাল সোপ মেখে স্নান করে
সারাদেহে মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্ক
ছড়িয়ে দিন—দেখবেন দিন ভর কত
ঝরঝরে ও হাল্কা বোধ করেন।
মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্কের চন্দন-সৌরভ
প্রথর ঐশ্বের ঘনাক্ত মুহূর্তগুলিতেও
আপনাকে ঘিরে থাকবে।

দি ক্যালকাটা
কেমিক্যাল কোং
লিমিটেডের তৈরী

7 MAY 1968

প্রতিদিন
প্রতিঘরে



লক্ষ্মী ঘি

সকলকে তৃপ্তি দেয়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরি

খাবার বেশ

সুস্বাদু ও রুচ্য হয়

LG 4/67